॥ শ্রীঃ ॥

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

॥ নবম বর্ষ ॥

[ভাদ্র ১৩৬৩ হইতে শ্রাবণ ১৩৬৪ পর্য্যন্ত]

॥ সম্পাদক ॥

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন

॥ কার্য্যাধ্যক্ষ ॥

শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ, বি-এস্-সি, এম্-বি,

॥ কার্য্যালয় ॥

দেবযান—পোঃ মগরা, হুগলি।

শ্রীরামাশ্রম—পোঃ ডুমুরদহ, হুগলি।

[বার্ষিক মূল্য—পাঁচ টাকা, প্রতি সংখ্যা—৷৹]

বর্ষসূচী

॥ ভাদ্র ১৩৬৩ হইতে—শ্রাবণ ১৩৬৪ পর্য্যন্ত ॥

[বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী]

—০—

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ,
প্রথম সংখ্যা

ভাদ্র
১৩৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।

নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

—০—

গান

[শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর]

দাও হে নয়ন নয়নমণি !

দেখি তোমায় কেমন তুমি !

শুনেছি হে লোকমুখে

সবই তোমার লীলাভূমি।

তুমি হে সংসারময়

তুমি ছাড়া কিছু নয়

তোমাতে উদয় লয়—

পালন করিছ তুমি।

পুরাণ-ভারতী সত্য,
বল যদি চিরসত্য
তাহ'লে সকলি নিত্য—
তবে তো আমিও তুমি।
তব মায়া বিভীষিকা
কেবল মনে লাগায় ধোঁকা
হয়ে থাকি বিষম বোকা—
বুঝি না কে তুমি আমি।
খুলে দিয়ে চোখের ঠুলি
জ্বালি' জ্ঞানের দীপাবলী
দেখি মায়া মোহ ভুলি'—
আমি দাস তুমি স্বামী।

—০—

সন্তবাণী

১০৮। এখন তোমায় পেয়ে অপরের কাছে হাত কেমন ক'রে পাতি, প্রভুর হ'য়ে—আবার জগতের কাছে চাইব ?

১০৯। যা কিছু পাওয়া যায় তাতে সন্তোষ আর শ্রীহরির চরণে প্রীতি, ব্যস এর আগে সুখ কি বস্তু !

১১০। জীবন-নির্ব্বাহের জন্য যিনি চিন্তা অথবা প্রপঞ্চ করেন না তিনি যথার্থ বিশ্বাসী।

১১১। যার মন পবিত্র নয় তার কোন কাজ পবিত্র হয় না।

১১২। যে চোখ ঈশ্বরের তাঁবেদারীতে থাকা ভাল বলে মনে করে না তার কাণা হ'য়ে যাওয়াই ভাল। যে জিভ ঈশ্বরের চর্চ্চা করে না—তার বোবা হ'য়ে থাকাই উত্তম। যে কান সত্য শোনেনা সে কালা হ'য়ে যায় তো ভাল। যে তনু দেহ ঈশ্বরের সেবায় লাগে না তার না থাকাই ভাল।

১১৩। জন্মের প্রথমে ঈশ্বরের যেমন প্রিয় ছিলি মরণ পর্য্যন্ত সে রকম থাকতে পারিস এরূপ আচরণ কর্।

৭১৪। ধন দৌলত উপার্জ্জনের পশ্চাতে কেন প'ড়ে আছ, তোমার প্রয়োজন পূরণ এবং সব দেখবার ভার তো ঈশ্বরই নিয়ে রেখেছেন। যদি তাঁর ভরসা কর তা হ'লে সবদিক থেকে শান্তি-সুখ পাবে।

৭১৫। যিনি এই নাশবান সংসারে আসক্ত নন তিনি অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানী ঋষি। তাঁতে লীন হয়ে ঈশ্বরের গুণগান করা, মত্ত হ'য়ে সংগীত শ্রবণ এবং প্রভুর অধীনতা মেনে কাজ করাই সন্তের ধর্ম্ম।

৭১৬। প্রায়শ্চিত্তের তিনটী সোপান—আত্মগ্লানি, দ্বিতীয়বার পাপ না করার নিশ্চয় এবং আত্মশুদ্ধি।

৭১৭। প্রভুর পথে প্রাণ পর্য্যন্ত দেবার জন্ম যদি তৈরী না হয়ে থাক তা'হলে তাঁর প্রতি প্রেম আছে এইরূপ মনে করা উচিত নয়।

৭১৮। ঈশ্বরে নিমগ্ন হ'লেই আপনার মনের নাশ হয়।

৭১৯। অন্তরে ঈশ্বর দর্শনের কণামাত্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হ'লে যেরূপ উৎসাহ, স্বর্গে যাবার আনন্দ তা অপেক্ষা কম।

৭২০। যথার্থ সন্ত যখন বাহিরে চুপচাপ নীরব হন তখন তিনি ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের সহিত কথা কইতে থাকেন। আর যখন তাঁর নেত্র মুদ্রিত হয় তখন তিনি ঈশ্বরের মহিমা অথবা স্বরূপ দেখ্‌তে থাকেন।

৭২১। তুমি পদব্রজে চল্‌তে থাক—মনের উপর লক্ষ্য রাখ।

৭২২। ঈশ্বরকে জেনেও তাঁর সঙ্গে প্রেম না করা অসম্ভব। যে পরিচয় প্রেমশূন্ম তাহা পরিচয়ই নয়।

৭২৩। ঈশ্বর যাঁর প্রতি প্রসন্ন হন তাঁকে নদীর ন্মায় দানশীলতা, সূর্য্যের ন্মায় উদারতা এবং পৃথিবীর ন্মায় সহনশীলতা প্রদান করেন।

৭২৪। এইসব বাদ বিবাদ শব্দ—আড়ম্বর এবং অহংতা মমতা তো পর্‌দার বাইরের কথা, পর্‌দার ভিতরে তো নীরবতা স্থিরতা ও শান্তি ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে।

৭২৫। সাধনার জন্ম যাকিছু কর্‌তে হয় কর, পরন্তু তাতেও প্রভুকৃপার প্রতাপই বুঝতে হবে আপনার পুরুষার্থ নয়।

৭২৬। যিনি ঈশ্বরের নিকটে এসে গেছেন সব পদার্থ এবং সারা সম্পত্তি তাঁর, যেহেতু তাঁর পরম প্রিয় সখা সর্ব্বব্যাপী এবং সমস্ত সম্পত্তির মালিক।

৭২৭। যে ব্যক্তি আপনার পরিচয় ঈশ্বরজ্ঞানী বলে দেয় সে মূর্খ, যিনি বলেন আমি তাঁকে জানিনা তিনি জ্ঞানী।

৭২৮। সারা সংসার তোমাকে আপনার ঐশ্বর্য্য এবং স্বামীত্বও সমর্পণ করে তো তাতে গর্ব্বিত হয়ো না এবং সমস্ত জগতের দারিদ্র্য যদি তোমার ভাগে

আসে তাতে অসন্তুষ্ট হয়ো না। যেমন কেন অবস্থা আসুক না কেন, একমাত্র ঐ প্রভুর কর্ম্ম কর্‌বার ধ্যান রাখ্‌বে।

১২৯। যে মানব লৌকিক লালসার বশীভূত হ'য়ে ঋষি মুনির হৃদয়স্থ হরির বাণী অবহেলা করে তাকে তো গ্লানির শব ঢাক্‌বার বস্ত্র মুড়ি দিয়ে অপমানের শ্মশান ভূমিতে জ্বলিতে হবে। আর যিনি ইন্দ্রিয় ও ভোগেচ্ছাকে দুর্ব্বল করে লৌকিক পদার্থ থেকে দূরে থাকেন তিনি সত্য সুখ শান্তির চাদর ঢাকা দিয়ে সম্মানের ভূমিতে স্বয়ং শ্রীহরির কোলে শয়ন করেন।

১৩০। ঈশ্বরকে যিনি জানেন তাঁর হৃদয় নির্ম্মল কাঁচের হাঁড়ীতে প্রজ্বলিত প্রদীপের মত। তাঁর প্রকাশ সর্ব্বত্র বিস্তৃত। তাঁর আর ভয় কি?

১৩১। এই অসংখ্য তারা এবং আকাশ মণ্ডলের সৃজনকর্ত্তার দৃষ্টি তুই যে কোন স্থানে থাক্‌বি সেইখানেই থাক্‌বে, এইরূপ বিচার করে সদা সর্ব্বদা সাবধানে থাক্‌বি।

১৩২। কোন্ উপায় দ্বারা ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয়? প্রভু ভিন্ন কিছু বল্‌বে না, শুনবে না, এবং দেখবে না—তবে তাঁকে পাবে।

১৩৩। মানুষের যথার্থ কর্ত্তব্য কি? ঈশ্বর ভিন্ন কোন দ্বিতীয় বস্তুতে প্রীতি না করা।

১৩৪। ঈশ্বরের ভজনপূজনে যে ব্যক্তি জগতের সমস্ত দ্রব্য ভুলে যায় তার সকল দ্রব্যে ঈশ্বরই ঈশ্বর দেখিয়ে দেন।

১৩৫। সকল অবস্থাতেই প্রভুর এবং প্রভুভক্তের দাস হ'য়ে থাকাই অনন্ত এবং একনিষ্ঠ ভক্তি।

১৩৬। আপনার প্রিয়তমের শ্রবণ মনন কীর্ত্তনাদিতে যে বাধা তাহা দূর করা যথার্থ প্রভুপ্রেমের চিহ্ন।

১৩৭। ভিতরে প্রভুকে গাঢ় ভক্তি করা কিন্তু বাইরে প্রকাশ হোতে না দেওয়া সাধুতার মুখ্য চিহ্ন।

১৩৮। ঈশ্বরের উপাসনায় মানুষ যেমন যেমন ডুবে যায় তেমন তেমন প্রভু দর্শনের জন্য তার আতুরতা বেড়ে যায়। যদি এক কালের জন্যও তার প্রভু-সাক্ষাৎকার হয়ে যায়, তাহা হ'লে সে সেই স্থিতির অধিক অধিক ইচ্ছায় লীন হ'য়ে যায়।

১৩৯। যে সাধক হাজার ভুবনের ধন ঐশ্বর্য্যের লোভে লুব্ধ হয় না, সেই ঈশ্বরের দ্বারে কথা কওয়ার যোগ্য।

১৪০। যিনি মনের মলিনতা রহিত দুনিয়ার জঞ্জাল হ'তে মুক্ত এবং লৌকিক তৃষ্ণা-বিমুখ তিনি যথার্থ সন্ত।

১৪১। যিনি কোনও সাধু পুরুষের সহবাস ক'রেছেন তিনি ঈশ্বরকে পেতে সমর্থ হ'য়েছেন।

১৪২। যখন আমার জিব অদ্বিতীয়—ঈশ্বরের মহিমা এবং গুণগান কর্‌তে থাকে তখন আমি দেখি ভূলোক এবং স্বর্গ লোক আমায় প্রদক্ষিণ কর্‌ছে। অন্য লোক এ দেখতে পায় না।

১৪৩। ঈশ্বরকে পাবার জন্য যার হৃদয় ব্যাকুল হ'য়েছে তার জন্ম ধন্য, তার মাতা ধন্যাকারণ তার সর্ব্বস্ব তো ঐ ঈশ্বরে সমর্পণ করা হ'য়েছে।

১৪৪। যে মানব ঈশ্বরে লীন থাকেন এবং শোনা ও দেখার যোগ্য তাকে বুঝেন, তিনি সব কিছু শুনে দেখে এবং জেনে নিয়েছেন।

১৪৫। যদি তুমি দুনিয়ার সন্ধানে যাও তাহলে দুনিয়া তোমার উপর চড়ে বস্‌বে। তা থেকে বিমুখ হও তো, তা'হলেই তা থেকে পার হ'তে সমর্থ হবে।

১৪৬। ফকির তিনিই যাঁর আজ বা কাল কোন দিনের ভয় নাই। যিনি আপনার এবং প্রভুর সম্বন্ধের আগে ইহলোক এবং পরলোক দুইটাকে তুচ্ছ বুঝেন।

—০—

শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী

॥ সপ্তম উচ্ছ্বাস ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

বিশ্বতঃ পাণিপাদন্তং বিশ্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
অলক্ষং বিশ্বমাবৃত্য তেজোরাশিং শিবং স্মরেৎ॥

ব্রহ্ম কে?

ব্রহ্ম শিব।

"যৎ পরং ব্রহ্ম স একো যঃ একঃ স রুদ্রো যো রুদ্র স ঈশানো য ঈশানঃ স ভগবান্ মহেশ্বরঃ।"

—অথর্ব্ব শিরোপনিষৎ।

যিনি পরম ব্রহ্ম তিনি এক, যিনি এক তিনি রুদ্র, যিনি রুদ্র তিনি ঈশান, যিনি ঈশান তিনি ভগবান মহেশ্বর।

কোন কোন বৈষ্ণব শিবের নামে উদ্বিগ্ন হন, বিষ্ণুর চেয়ে শিব ছোট একথা বলেন, শিবকে একটী প্রণাম করতেও চান্‌না। শাস্ত্রে একথা আছে?

তিনি এখনও সত্য লাভ করেননি। ভাগবত বিষ্ণু পুরাণাদি পুরাণে বিষ্ণুকেই বড় বলা হয়েছে, শিবপুরাণ, লিঙ্গপুরাণাদি পুরাণে শিবকেই বড় বলা হয়েছে। দেবী ভাগবত, দেবী পুরাণ মহাভাগবত মার্কণ্ডেয় চণ্ডী প্রভৃতিতে দেবীকেই বড় বলা হয়েছে।

একি ব্যাপার! এক ব্যাসদেবই তো সকল পুরাণ প্রণয়ন করেছেন, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে বড় বল্‌বার কারণ কি?

মহাপুরুষ বলেছেন, "পুরাণে দেবনিন্দা বা দেবতা বিশেষের মহিমার ন্যূনতা এবং আধিক্য বর্ণনা দেখিয়া যিনি অন্তরে দুঃখিত বা আনন্দিত হন তিনি দেবতা বিশেষের ভক্ত হইলেও পুরাণের মর্ম্মজ্ঞ নহেন। দেবনিন্দা বা দেবতা বিশেষের মহিমার অপকর্ষ বর্ণনা পুরাণের তাৎপর্য্য নহে, উপাস্যের প্রতি উপাসকের অবিচলিত ভক্তি একাগ্র নিষ্ঠা স্থাপনই পুরাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহাই চিত্ত-শুদ্ধির একমাত্র উপায়। এই কথাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া পুরাণ পাঠ করিলে, পাঠকের সাম্প্রদায়িকতা নিবন্ধন রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তী হইতে হয় না। মূল লক্ষ্য এককে ধরা, তার জন্য পুরাণ বিশেষে একজনেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম লীলাগুণ প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে।

তিনি যদি এক তাহলে এত রূপে এত নামে উপাসনা কেন কবা হয়?

মূল সূত্র "বহু হব জন্মাব"। বহু হবার মূল পদার্থ পাঁচটী—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত দিয়ে দেহটী তৈরী হয়েছে। এই পঞ্চ তত্ত্বকে অতিক্রম করবার জন্য সাধনা করতে হয়। যার শরীরে যে তত্ত্বের আধিক্য আছে সে স্বভাবতই সেই তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভক্ত হয়।

পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে?

আকাশস্যাধিপো বিষ্ণুরগ্নেশ্চাপি মহেশ্বরী।
বায়োরগ্নি ক্ষিতেরীশো জীবনস্য গণাধিপঃ॥

—মন্ত্রযোগসংহিতা।

বিষ্ণু আকাশতত্ত্বের অধিপতি, অগ্নিতত্ত্বের মহেশ্বরী, বায়ুতত্ত্বের অগ্নি, ক্ষিতিতত্ত্বের মহাদেব এবং জলতত্ত্বের গণপতি অধিপতি।

যোগ কুশল গুরুগণ শিষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় ক'রে মন্ত্র দেন। শিষ্য আপনার অভিমত দেবতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ উপনিষদাদির সাহায্যে জেনে নিয়ে একাগ্রচিত্তে সাধনা করতে করতে তন্ময় হয়ে যায়। শ্রীভগবান সেইরূপে দর্শন দান করে বর

দেন। সাধক তত্ত্বাতীত হয়ে পরম মন্ত্র লাভ করে তখন তার আর ভেদবুদ্ধি থাকে না।

পরম মন্ত্রটী কি ?

ওঙ্কার।

যদি ওঙ্কারই পরম মন্ত্র তাহলে আগে থেকেই ওঙ্কার জপ করলেই তো হয় ?

না, তা হয় না। যতদিন কাম, ক্রোধাদি দোষে চিত্ত দুষ্ট থাকে ততদিন ওঙ্কার জপে বিপরীত ফল হয়। কাম ক্রোধাদিই বেড়ে যায়। মহাভারত-অনুগীতা পর্ব্বে কথিত হয়েছে, প্রজাপতির মুখ-উপদিষ্ট ওঙ্কার মনন করে দেবগণের দেবভাব, মহর্ষিগণের সাত্ত্বিক ভাব। অসুরগণের আসুর ভাব ও সর্পগণের দংশন-বৃত্তি বর্দ্ধিত হয়েছিল। ওঙ্কার ব্রহ্ম, তার স্বভাব বাড়িয়ে দেওয়া। কামী ক্রোধী ওঙ্কার জপ করলে তাদের কাম ক্রোধ বেড়ে যাবে। ইষ্ট মন্ত্র অবলম্বন করে থাকলেই যথাকালে নাদাত্মক জ্যোতির্ম্ময় প্রণব আবির্ভূত হন, সাধক তত্ত্বাতীত হয়ে যান্।

তা হলে যে যে দেবতার উপাসক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াবার জন্যই পুরাণাদি পাঠ করতে হয় ?

হাঁ, পুরাণাদিতেও যে দেবতা যে পুরাণের প্রতিপাদ্য তিনি স্বমুখে সবই যে এক একথা বলেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান বলেছেন—

অহং ব্রহ্মাচ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগ্ বিশেষণঃ ॥ ৫০ ॥
আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজং।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্য দ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্ম রুদ্রৌচ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥

—৫।২।৪।৭

"আমি ব্রহ্ম ও শিব, আত্মেশ্বর স্বয়ং দৃগ অধিশেষণ, জগতের পরম কারণ স্বরূপ। সেই আমি গুনময়ী আত্ম মায়া আশ্রয়ে বিশ্বসৃজন পালন নাশ কার্য্যে তত্তৎ ক্রিয়োচিত অর্থাৎ সৃজন কর্ম্মে ব্রহ্মা, পালন ও সংহার কার্য্যে বিষ্ণু ও রুদ্র সংজ্ঞা ধারণ করি। সেই কেবল অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্রহ্মে ব্রহ্ম রুদ্র ও ভূতসকলকে অজ্ঞ ব্যক্তিই পৃথক ভাবে দর্শন করে।" কথা হল, আপনার ইষ্টে অনন্য হতে হবে। কোন ভক্ত যদি আপনার ইষ্ট ভিন্ন অন্য দেবতার দ্বেষ করেন তাহলে তিনি অগ্রসর হতে পারবেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা এমনকি যা কিছু সব হরির শরীর বলে প্রণাম করবার উপদেশ করেছেন। কুকুর চণ্ডাল গো গর্দ্দভকে দণ্ডবৎ প্রণামের কথা বলেছেন। সেই বৈষ্ণব যদি শিবের নিন্দা বা উপেক্ষা করেন তাহলে কি হয় বুঝে দেখ। যাক্ তুমি নাম কর। শিব শিব জপ কর।

নমঃ শিবায়েতি সকৃজ্ জপিত্বা
পাপং মহদ্ ঘোর মুপৈতি নাশনম্।
ভূম্যন্তরীক্ষাৎ পরিপূর্ণ কাষ্ঠং
স্বল্পাগ্নিনা দগ্ধ মুপৈতি নাশম্॥
—আদিত্য পুরাণে।

একবার 'নমঃ শিবায়' এই পরম মন্ত্র জপ করলে মহদ্ ঘোর পাপ নাশ হয়ে যায়। যেমন গগনস্পর্শী স্তূপীকৃত কাষ্ঠরাশিতে স্বল্পমাত্র অগ্নি সংযোগ করলে ভস্মে পরিণত হয়, তদ্রূপ 'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র পাপের চিহ্নমাত্র অবশেষ রাখেন না।

রসনে রচিতোঽয়মঞ্জলি স্তে
পরনিন্দা পরুষৈরলং বচোভিঃ।
নরকাপহনং নমঃ শিবায়ে—
ত্যমুমাদি প্রণবং ভজস্ব মন্ত্রম্॥ —ঐ

"হে রসনে, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করছি পরনিন্দা, কর্কশ বাক্য আর উচ্চারণ করোনা, নরকান্তকারী আদি প্রণব 'নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র ভজনা কর।

আদি প্রণব ?

হাঁ, প্রণব স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ, স্থূল প্রণব "নমঃ শিবায়" এই পঞ্চাক্ষর; আর সূক্ষ্ম প্রণব ওঁ; অ উ ম নাদ বিন্দু এই পঞ্চাক্ষর।

আদি প্রণব বল্লেন কেন ?

নমঃ শিবায় এই মন্ত্র অবলম্বনে ভস্তাতীত হয়ে সূক্ষ্ম প্রণব লাভ হয়।

রজসা তমসা বিবর্দ্ধিতং
ক্ব নু পাপং পরিতাপদায়কম্।
ক চ তে শিব নাম মঙ্গলং
জন জীবাতু জগদ্রুজাপহম্॥
—কাশীখণ্ডে।

রজ তম গুণ দ্বারা বিবর্দ্ধিত পরিতাপদায়ক পাপ কোথায়! জগতের ব্যাধিনাশক, জনগণের জীবনের ঔষধ মঙ্গলময় তোমার শিবনাম।

যদি জাতু চিদন্ধকদ্বিষ
স্তব নামোষ্ঠ পুটাদ্‌বিনিঃস্রুতম্‌।
শিব শঙ্কর চন্দ্রশেখরে
ত্যস কুত্রস্থ ন সংস্থিতি পুনঃ ॥

যদি কখনও কারও অন্ধক রিপু শিব শঙ্কর চন্দ্রশেখর এই তোমার নাম বার বার উষ্ঠপুঠ হতে বিগলিত হয়, তাহলে তার আর সংসারে আসিতে হয় না।

শিব নাম কখন জপ করতে হয়?

সর্ব্বদা, একটী নিঃশ্বাস যেন ব্যর্থ না হয়। এতো আর সহজ কথা না, প্রথমে অভ্যাস করতে হবে।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
শিবেতি কীর্ত্তয়ন্‌ সর্ব্বৈঃ পাতকৈস্তু বিমুচ্যতে ॥

—সুত সংহিতায়াং।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠে শুচি ও সমাহিত হয়ে 'শিব শিব' এই নামকীর্ত্তন করলে সমস্ত পাতক হতে বিমুক্ত হয়। বল—

শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব।
শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব ॥

—০—

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ]

ঈশ্বর বদ্ধ অথবা মুক্ত ঃ—

পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে, "স সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত ইতি"। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সর্বদা বিদ্যমান ও তাঁহার মুক্তিও সর্বদা বিদ্যমান। ঈশ্বর নিত্য ঐশ্বর্য্যশালী ও নিত্য মুক্ত। (পাতঞ্জল সূত্র ১।২৪)।

ন্যায় বার্তিককার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, "অথ-কিময়ং বদ্ধো মুক্ত ইতি" ঈশ্বর কি বদ্ধ অথবা মুক্ত? উত্তরে বলিয়াছেন—ঈশ্বর বদ্ধ হইতে পারেন না যেহেতু তাঁহার দুঃখ নাই। ঈশ্বর মুক্তও হইতে পারেন না যেহেতু যাহার বন্ধন থাকে তাহারই মুক্তি হইতে পারে। যাহার বন্ধন সম্ভাবিত নয় তাহার মুক্তিও সম্ভাবিত নহে। বন্ধবানেরই মুক্তি হইয়া থাকে। মুচ্‌৯ ধাতুর অর্থ—

বন্ধবিমোচন। ঈশ্বরের বন্ধন নাই বলিয়া তিনি মুক্তও হইতে পারেন না। এজন্য বার্তিককার বলিয়াছেন ঈশ্বরবদ্ধও নহেন, মুক্তও নহেন। (৯৫২ পৃঃ)।

ঈশ্বরের শরীর আছে কি না?ঃ—

ন্যায়ভাষ্যে বলা হইয়াছে—"গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ"। (এই প্রবন্ধের ৬১ পৃঃ)। জীবাত্মার মত ঈশ্বরেও আত্মত্ব জাতি আছে। জীবাত্মা যেমন জ্ঞানাদি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরও সেইরূপ জ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি গুণ নিত্য, জীবের জ্ঞানাদি গুণ অনিত্য। জীব বুদ্ধ্যাদি গুণবান্ বলিয়া তাহার যেমন শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আছে, ঈশ্বরেরও সেইরূপ আছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের শরীরাদি স্বীকার করিলে তাহা নিত্য অথবা অনিত্য—ইহার একটী অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা নিত্যও নহে, অনিত্যও নহে—এইরূপ হইতে পারে না। ঈশ্বরের শরীরাদি যদি অনিত্য হয়, তবে অনিত্য শরীরাদির জনক ধর্মাধর্মাদিও স্বীকার করিতে হইবে। যাহার ধর্মাধর্মাদি নাই, তাহার শরীরাদিও নাই। যেমন মুক্ত পুরুষের ধর্মাদি নাই বলিয়া তাহার শরীরাদি নাই। ঈশ্বরের ধর্মাদি স্বীকার করিলে—ঈশ্বর স্বীয় ধর্মাদির অধীন হইবেন, যেমন জীব স্বীয় ধর্মাদির অধীন। ঈশ্বরও জীবের মত স্বীয় ধর্মাধর্মের আয়ত্ত হইলে ঈশ্বরের অনীশ্বরত্বের আপত্তি হইবে। আর যদি ঈশ্বরের নিত্য শরীরাদি কল্পনা করা যায় তবে দৃষ্ট বিপরীত কল্পনা করিতে হইবে। শরীর ভোগায়তন, ঈশ্বরের স্বীয় সুখ দুঃখ সম্বিত সমবায়রূপ ভোগ নাই বলিয়া ঈশ্বরের শরীর কল্পনাই হইতে পারে না। ভোগরহিত ঈশ্বরের শরীর কল্পনা ও সেই শরীরে নিত্যত্ব কল্পনা—সমস্তই দৃষ্ট বিপরীত। ঈশ্বরের জ্ঞানাদি নিত্য বলিয়া ঈশ্বরের কোনরূপ শরীর কল্পনার অবসর নাই। (বার্তিক ৯৫১ পৃঃ)।

আমাদের উদ্ধৃত ঋক্‌গুলির মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও নবম দশম মন্ত্রে ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের এই জগৎস্রষ্টৃত্ব উপপাদনের জন্য ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে নানাবিধ উপপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে ও নানাবিধ অনুপপত্তির সমাধান প্রদর্শিত হইয়াছে।

বার্তিককার ঈশ্বরের ছয়টী গুণ স্বীকার করিয়া পরে সপ্তগুণ অথবা অষ্টগুণ স্বীকার করিলেন কেন?—সর্ব্ব বিষয়ক নিত্য অপরোক্ষ জ্ঞান মাত্রই যদি ঈশ্বরের বিশেষ গুণ স্বীকার করা যায়, ইচ্ছাদি বিশেষ গুণ যদি ঈশ্বরের স্বীকার না করা যায়, তবে ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কেবলমাত্র নিত্য বিজ্ঞান-শালী ঈশ্বর বিশ্ব নির্মাণ করিতে পারে না। "কেবলমাত্র বিশ্ব কার্য্যের উপাদানাদির অভিজ্ঞ হইলেই বিশ্ব-নির্মাতৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেমন কুম্ভকার কুম্ভের

উপাদানাদি মাত্রের অভিজ্ঞ হইয়াই কুম্ভের নির্মাতা হইতে পারে না। কুম্ভের উপাদানাদির অভিজ্ঞ হইয়াও যদি কুম্ভকার কুম্ভের চিকীর্ষু না হয়, অর্থাৎ কুম্ভের উপাদানাদি জানিয়াও যদি কুম্ভ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা না করে, অথবা চিকীর্ষু হইয়াও যদি আলস্য বশতঃ কুম্ভোৎপাদনে যত্নবান্ না হয় তবে কুম্ভকার কুম্ভের নির্মাতা হইতে পারেন না। জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্ন এই তিনটী বিশেষ গুণ না থাকিলে কার্যের কর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না। ঈশ্বরেরও জগৎ কর্তৃত্ব সমর্থনের জন্য প্রদর্শিত তিনটি গুণ ঈশ্বরেরও স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বলা যায়,—অল্পজ্ঞ, অনিত্যজ্ঞানবান্ শরীরী জীবের কর্তৃত্ব সম্পাদনের জন্য উক্ত তিনটি বিশেষ গুণেরই আবশ্যকতা আছে, ইহা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু ঈশ্বর জীব হইতে অতি বিলক্ষণ। ঈশ্বরের জ্ঞান সর্ববিষয়ক, নিত্য এবং অপরোক্ষ। এতাদৃশ জ্ঞানী ঈশ্বরের কেবল জ্ঞান বশতঃই বিশ্বকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। জীবের জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্ন সহকৃত হইয়াই জীবের কর্তৃত্বরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান অসহায় হইয়াই, অন্য সহকারীর অপেক্ষা না করিয়াই অর্থাৎ চিকীর্ষা ও প্রযত্নের অপেক্ষা না করিয়াই বিশ্বকার্যের কর্তৃত্বরূপ হইয়া থাকে। ঈশ্বরজ্ঞান মহিমাই তাদৃশ। কিন্তু জীবজ্ঞানের তাদৃশ মহিমা নাই। ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের লোকাতিশায়ী মহিমা স্বীকার করিয়া ঈশ্বরীয় জ্ঞান, চিকীর্ষা ও প্রযত্ন নিরপেক্ষভাবে ঈশ্বরের জগৎ কর্তৃত্বরূপ হইতে পারিলে ঈশ্বরের জ্ঞান স্বীকার করিবারই বা আবশ্যকতা কি? ঈশ্বরের স্বরূপই এতাদৃশ অসাধারণ যে, জ্ঞান চিকীর্ষা প্রভৃতি না থাকিলেও ঈশ্বর স্ব-স্বরূপের মহিমা বশতঃই সমস্ত কার্যের কর্তা হইবেন। তাঁহার স্বরূপই মাত্র তাঁহার সহায়, জ্ঞানাদির কোন অপেক্ষা নাই—এরূপ বলিলে আরও ভাল হইত, অজ্ঞ শরীরই জগতের কর্তা হইতে পারিতেন।

যদি বলা যায়, কোন কার্যই এক অসহায় কারণ হইতে পারেনা, একটি কারণ হইতে ক্রমিক কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না এবং অসহায় কারণ হইতে বিচিত্র কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না। অথচ ঈশ্বর ক্রমিক, নানাবিধ বিচিত্র কার্যের কর্তা। এইজন্য ঈশ্বরের জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের জ্ঞান স্বীকার না করিলেও ঈশ্বরের সহকারী অভাব হইবে না। কারণ অসংখ্য জীবগত ধর্ম ও অধর্ম এবং পরমাণু সমূহ ঈশ্বরের সহায় বিদ্যমানই রহিয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরের সহায়ক রূপে জ্ঞান স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। যদি বলা যায়, ঈশ্বরকর্তৃক অবিজ্ঞাত জীবগত ধর্মাধর্মসমূহ ও পরমাণু সমূহ প্রবৃত্ত হইতে পারিবেনা, এজন্য ইহাদের প্রবৃত্তির উপপাদন করিতে হইলে

ঈশ্বরের জ্ঞান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর কর্তৃক অবিজ্ঞাত ধর্মাধর্মাদি ঈশ্বরের সহায়ক হইবে না কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—কুম্ভকারাদি কুম্ভাদি নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলে তাহার সহায়ক দণ্ডচক্রাদি কুম্ভকারাদি কর্তৃক জ্ঞাত হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এইরূপই দেখা যায়। কিন্তু কুম্ভকার কর্তৃক অবিজ্ঞাত দণ্ডচক্রাদির কুম্ভজননে প্রবৃত্ত হইতে কখনও দেখা যায় না। ইহাতে বক্তব্য এই যে, কুম্ভকার কর্তৃক জ্ঞাত দণ্ডচক্রাদি যেমন কুম্ভজননে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় এইরূপে কুম্ভকারের চিকীর্ষা ও প্রযত্ন কুম্ভকারের কুম্ভজননে অপেক্ষিত হইয়া থাকে ইহাও দেখা যায়। চিকীর্ষা ও প্রযত্ন রহিত কুম্ভকারকে কুম্ভ উৎপাদন করিতে দেখা যায় না। এজন্য কুম্ভকারের মত ঈশ্বরেরও চিকীর্ষা ও প্রযত্ন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কুম্ভকারের জ্ঞান কুম্ভকারের চিকীর্ষার জনক হইয়া থাকে। অজ্ঞাত বিষয়ে চিকীর্ষা জন্মাইতে পারে না। এইরূপ চিকীর্ষাও প্রযত্ন বিশেষের জনক হইয়া থাকে। চিকীর্ষা ব্যতীত প্রযত্ন বিশেষ উৎপন্ন হইতে পারে না। আর প্রযত্ন বিশেষই কার্যের উৎপাদনে সাক্ষাৎ হেতু। কার্যের উৎপত্তিতে সাক্ষাৎ হেতু প্রযত্ন, প্রযত্নের হেতু চিকীর্ষা ও চিকীর্ষার হেতু জ্ঞান। সুতরাং যাহা কার্যের সাক্ষাৎ হেতু প্রযত্ন তাহা না থাকিলে কেবল জ্ঞান ও কেবল চিকীর্ষা অথবা জ্ঞান ও চিকীর্ষা কার্যের জনক হইতে পারে না। যেমন অন্নপাকে বহ্নি সাক্ষাৎ কারণ, তৃণ ফুৎকারাদি সহায়ক। সাক্ষাৎ কারণ বহ্নি নাই, কিন্তু সহায়ক তৃণ ফুৎকারাদি আছে সে অবস্থায় কি অন্নের পাক হইবে? যদি বলা যায়, জ্ঞান যেমন ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সম্পাদক বিশেষ গুণ স্বীকৃত হইয়াছে এরূপ চিকীর্ষা ও প্রযত্ন ঈশ্বরের স্বীকার করিব। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বরের জ্ঞান যেমন নিত্য, এইরূপ ঈশ্বরের চিকীর্ষা ও প্রযত্নও নিত্য স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বরের শরীরেন্দ্রিয়াদি নাই বলিয়া তাহা যেমন তাঁহার জ্ঞান অনিত্য হইতে পারে না, সেইরূপ চিকীর্ষা প্রযত্নও অনিত্য হইতে পারিবেনা। ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব বেদাদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া তাহার উপপাদনের জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এই তিনটী বিশেষ গুণ নিত্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্বেই বলা হইয়াছে কার্যের উৎপত্তি বিশেষে প্রযত্নই সাক্ষাৎ কারণ। চিকীর্ষা ও জ্ঞান তাহার জনকরূপে অপেক্ষিত হইয়া থাকে। জগৎরূপ কার্যের উৎপত্তিতে ঈশ্বরের প্রযত্ন বিশেষই সাক্ষাৎ কারণ। প্রযত্নই কৃতি। কৃতিমান্‌কেই কর্তা বলা হয়। ঈশ্বরের প্রযত্ন যদি নিত্য হয় তবে সেই প্রযত্নের কারণ চিকীর্ষা ও নিত্য চিকীর্ষার কারণ জ্ঞানের অপেক্ষা

কোথায়? জ্ঞান অনিত্য-চিকীর্ষা উৎপত্তিতে ও চিকীর্ষা অনিত্য কৃতির উৎপত্তিতে অপেক্ষিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের কৃতি বা প্রযত্ন নিত্য; তাহার উৎপত্তিই নাই। জ্ঞান ও চিকীর্ষা অনিত্য কৃতির উৎপত্তিতে অপেক্ষিত হইলেও নিত্য কৃতির উৎপত্তি নাই বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও চিকীর্ষা ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অনপেক্ষিতই বটে। প্রযত্ন বিশেষের মত জ্ঞান ও কার্যের উৎপত্তিতে সাক্ষাৎ কারণ নহে। প্রযত্ন বিশেষের দ্বারাই কর্তা উপাদানাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে। কর্তা যে সময় প্রযত্ন বিশেষের দ্বারা উপাদানাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে সে সময়ে জ্ঞান বা চিকীর্ষার কোন উপযোগিতা নাই। জ্ঞান—চিকীর্ষা জননে ও চিকীর্ষা প্রবৃত্তি-জননে উপরত ব্যাপার হইয়া থাকে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের শ্রুতিসিদ্ধ কর্তৃত্ব সমর্থন করিতে যাইয়া দার্শনিকগণ অতি সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা ঈশ্বরকে অজ্ঞরূপেই পর্যবসিত করিলেন। ঈশ্বর জগৎ কর্তৃত্বে ঈশ্বরের জ্ঞান বা চিকীর্ষার কোন আবশ্যকতা নাই। নিত্য কৃতিমান্ ঈশ্বর অজ্ঞ ও চিকীর্ষা রহিত হইয়াই জগতের কর্তা হইতে পারেন। যে জগৎ কর্তৃত্বের অনুরোধে দার্শনিকগণ ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব সিদ্ধি করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাহা নিষ্ফলতাতেই পর্যবসিত হইল। শান্তিকর্মে বেতালের উদয় হইল। ঈশ্বরের জ্ঞান চিকীর্ষা প্রভৃতি অনিত্য স্বীকার করিলে যে দোষ হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায় ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য। এই নিত্য জ্ঞানই জগৎ উৎপত্তির মূল কারণ, ঈশ্বরের চিকীর্ষা বা প্রযত্নের কোন অপেক্ষা নাই। এইরূপ বলা অতি অসঙ্গত। কারণ নৈয়ায়িকগণ কি এইরূপও বলবেন যে, আত্মমনঃসংযোগরূপ অসমবায়িকারণ ব্যতীতও ইচ্ছা ও প্রযত্ন উৎপন্ন হইবে। ইচ্ছার নিমিত্তকারণ জ্ঞান ও প্রযত্নের নিমিত্তকারণ ইচ্ছা। এইরূপ ব্যবস্থিত থাকিলেও আত্মমনঃ-সংযোগরূপ অসমবায়ি কারণ ব্যতীতই কেবল নিমিত্তকারণ জ্ঞান মাত্র হইতে প্রযত্ন বা ইচ্ছা উৎপন্ন হইবে? ক্লৃপ্ত কারণ ব্যতীতই কার্যের উৎপত্তি হইবে। এরূপ বলিলে তো তণ্ডুল ব্যতীতই অন্নমণ্ড প্রস্তুত করা যাইবে। প্রদর্শিত দোষ-গুলি ষড়্গুণ ঈশ্বরবাদীর মতে বুঝিতে হইবে। (ন্যায়কণিকা ২১৭ পৃঃ)।

ঈশ্বরের প্রযত্ন নিত্য স্বীকার করিলে আর ঈশ্বরীয় জ্ঞান ও ইচ্ছার আবশ্যকতা কি? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন—প্রযত্নের দুইটী ধর্ম আছে। প্রযত্ন বিশেষকেই কর্তৃত্ব বলে। এই কর্তৃত্বরূপ প্রযত্নের দুইটি ধর্ম আছে —একটী জ্ঞানকার্যত্ব, অপরটী জ্ঞানৈকবিষয়ত্ব। নিত্য প্রযত্ন জ্ঞান কার্য নহে। এজন্য নিত্য প্রযত্ন স্বোৎপত্তিতে জ্ঞানের অপেক্ষা না করিলেও নিত্য প্রযত্ন বিষয় লাভের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা অবশ্যই করিবে। প্রযত্ন জ্ঞানবিষয় বিষয়ক হইয়া

থাকে। জ্ঞানের যাহা বিষয় নহে তাহা প্রযত্নের বিষয় হইতে পারে না। এজন্য ঈশ্বরের নিত্য কৃতি, স্বীয় বিষয়লাভের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করিবেই। যদি বলা যায়, ঈশ্বরীয় নিত্য প্রযত্ন স্বভাবতঃই সবিষয়ক হইবে, ঈশ্বরীয় প্রযত্ন স্বভাবতঃই বিষয়প্রবণ এরূপ বলা অতি অসঙ্গত। স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণকেই জ্ঞান বলে। ঈশ্বরীয় প্রযত্ন যদি স্বভাবতই বিষয়-প্রবণ হয়, তবে ঈশ্বরীয় প্রযত্নের জ্ঞানত্বাপত্তি হইবে। জ্ঞানের সহিত প্রযত্নের ইহাই ভেদ যে, জ্ঞান স্বভাবতঃই বিষয়প্রবণ এবং প্রযত্ন স্বভাবতই বিষয়াপ্রবণ। এজন্যই ইচ্ছা ও প্রযত্নের যে সবিষয়কত্ব তাহা যাচিতমণ্ডন ন্যায়েই হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, ঈশ্বরের প্রযত্ন নির্বিষয়কই হইবে, আর প্রযত্নই কর্তৃত্ব। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব উপপাদনের জন্য প্রযত্ন স্বীকার করা আবশ্যক। ঈশ্বরের সর্ববিষয়ক জ্ঞান স্বীকারে আবশ্যকতা কি? ঈশ্বরীয় প্রযত্নের সবিষয়ত্ব সিদ্ধের জন্যই যদি জ্ঞান স্বীকার করিতে হয় তবে আমরা ঈশ্বরীয় প্রযত্নকে নির্বিষয়ই বলিব। এতদুত্তরে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন যে, নির্বিষয়ক প্রযত্নই অসম্ভাবিত। জ্ঞানেচ্ছাকৃতি প্রভৃতি নিয়ত সবিষয়ক হইয়া থাকে। আর নির্বিষয়ক প্রযত্ন স্বীকার করিলেও তাহা কর্তৃস্বরূপ হইবে না। যদি বলা যায়, ঈশ্বরীয় প্রযত্ন তো সর্ব-বিষয়ক, নিত্য প্রযত্নের বিষয় নিয়মনের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নিত্য প্রযত্ন ও স্বভাবতঃ সর্ববিষয়ক হইতে পারে না। প্রযত্ন স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ নহে, ইহা বলাই হইয়াছে।

ইহাতে আপত্তি এই যে, প্রযত্ন যদি নিয়ত জ্ঞানবিষয়বিষয়কই হয়—এরূপ স্বীকার করা যায় তবে নৈয়ায়িকগণেরই অগতি হইবে; কারণ, তাঁহাদের মতে প্রযত্ন ত্রিবিধ বলা হইয়াছে—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। সুষুপ্তি দশায় প্রাণাদি ব্যাপার বিষয়ক জীবনযোনি যত্ন থাকে। ইহা নৈয়ায়িকগণেরই সিদ্ধান্ত। অথচ সুষুপ্তি দশাতে জ্ঞানও থাকে না, ইচ্ছাও থাকেনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে জীবনযোনি যত্ন জ্ঞান-বিষয়বিষয়ক নহে। জ্ঞান না থাকিলেও যত্ন সবিষয়ক হইতে পারে। আর জীবনযোনি যত্নের ন্যায় ঈশ্বরীয় প্রযত্নও জগতের কর্তৃস্বরূপ হইবে। অচেতন সুষুপ্তি পুরুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসাদির মত অচেতন ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তি হইবে। আর তাহাতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা সিদ্ধি কখনও হইবে না। এতদুত্তরে আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন যে, জীবনযোনি যত্নে যত্নত্ব জাতিই নাই। অর্থাৎ জীবনযোনিযত্ন যত্নই নহে। যত্নই জ্ঞান বিষয় বিষয়ক হইয়া থাকে। জীবন যোনি যত্ন যে, যত্নত্ব জাতীয় নহে তাহাতে আরও যুক্তি এই যে, যত্নমাত্র ইচ্ছাজন্য হইয়া থাকে। জীবন-যোনিযত্ন যদি

যত্ন হইত তবে তাহা নিয়ত ইচ্ছাজন্য হইত। আর যত্ন যদি ইচ্ছা ব্যতীতও হইতে পারে তাহা ইচ্ছার যত্ন কারণতা সিদ্ধ হইত না। সুতরাং যাহা কৃতি জাতীয় তাহার সবিষয়ত্ব ব্যবস্থা জ্ঞান এবং ঈশ্বরীয় ইচ্ছা হইতেই হইবে। এজন্য সবিষয় ঈশ্বরীয় ও সবিষয় ঈশ্বরীয় ইচ্ছা আছে বলিয়াই ঈশ্বরীয় কৃতির বিষয়ব্যবস্থা হইয়াছে। (আত্মতত্ত্ববিবেক ৮৩৬-৩৭ পৃঃ)।

ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, জীবনযোনিযত্ন যদি স্বীকার না করা যায় তবে সুষুপ্তিদশাতে প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়া হইবে কিরূপে? প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়া তো প্রযত্ন সাধ্য। এতদুত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছেন—বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া যেমন জীবনযোনিসাধ্য নহে কিন্তু অদৃষ্টবদাত্মসংযোগবশতঃই বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া হইয়া থাকে, এইরূপ আন্তর বায়ু প্রাণাদির ক্রিয়াতেও জীবন যোনি যত্নের আবশ্যকতা নাই, কিন্তু অদৃষ্টবদাত্মসংযোগবশতঃই আন্তর প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়া হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, মৃত ব্যক্তির প্রাণাদি বায়ুর ক্রিয়া হয় না কেন, মৃত্যু দশাতেও আন্তর বায়ুব সহিত আত্মসংযোগতো আছেই? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আন্তর বায়ুর সহিত আত্মসংযোগই আন্তর বায়ুর ক্রিয়ার জনক নয়, কিন্তু অদৃষ্ট-বদাত্মসংযোগ। মৃত পুরুষীয় আত্মার অদৃষ্ট বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া সেই আত্মা আর অদৃষ্টবদাত্মা নহে। (আত্মতত্ত্ববিবেক, রঘুনাথ শিরোমণির টীকা, ৮৩৮ পৃঃ)।

—০—

উপাসনা অভ্যাস

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

বর্ষ বর্ষ ধরিয়া স্মরণ অভ্যাস, উপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে ভাবনা যখন আয়ত্ত হইয়া যায়, যখন সর্ব্বদাই এক ভাবনা লইয়া থাকা যায়, তখন ব্যবহারিক কার্য্যও প্রবাহ-পতিত মত হইয়া যায়, আর ধারণাভ্যাসীও হওয়া যায়। ধারণাভ্যাসীর উর্দ্ধগতি সুনিশ্চিত। পাঠ বা ভাবনা, ক্রিয়া, উপাসনা, বিচার বহু বর্ষ ধরিয়া এক নিয়মে করা উচিত। তাই উপাসনা আলোচিত হইতেছে।

হে রমণীয় দর্শন! তোমার সহিত মিলিত হইতে না পারিলে আমাদের সকলই বৃথা। বৃথা আমার চেষ্টা, বৃথা আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, বৃথা আমার জীবন, বৃথা আমার জগতে আগমন।

কে আমায় তোমার সহিত মিলন করাইয়া দিবে? যাঁহারা তোমার নিকট সর্ব্বদাই থাকেন তাঁহারাই পারেন! রাজদর্শন কিরূপে হইবে, রাজার সহিত পরিচয় কিরূপে হইবে, যদি রাজার সহচর কেহ রাজার নিকটে লইয়া না যান্?—যদি কোন রাজ-সহচর রাজার সহিত পরিচয় করিয়া না দেন? আমি আপনি সেখানে যাইতে পারি না। তাঁহার সমীপে যাঁহারা থাকেন তাঁহারাও সেই রমণীয় দর্শনের মত। সেই শক্তি, সেই আনন্দ, সেই জ্ঞান, তাঁহাদেরও আছে। তাঁহার সহিত সমান হইয়াও তাঁহারা তাঁহার সেবা করিতে ভালবাসেন। এক হইয়াও তাঁহার সহিত পৃথক্ত্ব রাখিয়া তাঁহাকে ভালবাসেন। একায় ভালবাসা নাই, একায় প্রেম নাই। আপনাতে আপনি থাকা, আর আপনাকে আপনি আস্বাদন করা—দুইই উত্তম—শেষটীতে থাকাও আছে আস্বাদনও আছে, ইহা আরও উত্তম। তাই এক হইয়াও বহু হওয়া।

কে তবে সেই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলাইয়া দিবে? কে তবে আমায় রক্ষা করিবে? আমি কোন্ প্রতীকের উপাসনা করিব?

যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম তখন কে রক্ষা করিয়াছিল? স্তন্যরস। এই স্তন্যরসের অধিষ্ঠাত্রী মা আমায় রক্ষা করিয়াছিলেন। এই পরিদৃশ্যমান বৃক্ষলতা আকাশ নক্ষত্র, জল বায়ু, কি এক রসে যেন সরস হইয়া আছে—কোন এক রস যেন জগতকে রক্ষা করিতেছে—কোন এক সরস্বতী, যেন জগতকে রসযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কত সুন্দর মনে হয় সেই অঙ্গে রস আছে বলিয়াই সুন্দর। আঙ্গীরসই অঙ্গের প্রাণ। যে অঙ্গে রস থাকে না তাহাই প্রাণহীন।

অন্ন না থাকিলে দেহের রসও হয় না। যিনি অন্ন দিয়া জীবন রাখিতেছেন, তিনিই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন করিয়া রক্ষা করিবেন—তাই সেই রস-স্বরূপিনীর উপাসনা আমরা করি। বাহিরে এই জল তাঁহার মূর্ত্তি। অন্তরে এই প্রাণ তাঁহার মূর্ত্তি।

কে বলিল জলের সামর্থ্য নাই? কে বলে জল জড়? মাতার স্তন্য যখন মাতার অঙ্গে থাকে—তখন স্তন্যরস কোন্ শক্তি ধারণ না করে? যে জল রস রূপে জগৎ রক্ষা করিতেছে, তুমি যদি দেখ উহা রসাধার স্তনের ন্যায় মাতার অঙ্গ, তবে কেন বলিবে না, মা স্তন না দিলে শিশুর রক্ষা হয় না—শিশু যখন বড় হয় তখন মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া স্তন ধরিয়াই পান করে, স্তন যেমন মাতার অঙ্গ জল সেইরূপ মাতার অঙ্গ—শ্রীমাতেশ্বরীই জলের মধ্যে—রস রূপে থাকিয়া জগতকে সরস করিতেছেন। তাই জলের সামর্থ্য আছে—ইহা শুধু জল নহে

—ইহা মাতাই—তাই মাকে বলি—মা অন্ন দিয়া ইহলোকে রাখিলে, রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন করাইয়া অনন্ত জীবন দিয়া দাও। মা! বড় ত্রিতাপ তাপিত হইয়াছি। সংসার মরুভূমে নীচে তপ্ত বালুকা, উপরে প্রখর সূর্য্য, শূন্যে তপ্ত বায়ু—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ হইতে আমার কর্ম্মদোষে ত্রিতাপ আসিয়া আমায় দগ্ধ করিতেছে—শরীর ঘর্ম্মদগ্ধ, মললিপ্ত। ছায়াময়ি! ছায়া দান করিয়া ঘর্ম্ম শুষ্ক করিয়া দাও—জলময়ি! সুশীতল জল দিয়া আমার শরীরের মলা অপসারিত কর! আর মনের মলা? মা মনের মলা ধুইয়া দিয়া আমায় রমণীয় দর্শনের সহিত মিলাইয়া দাও।

কিরূপে মনের মলা যাইবে—কিরূপে মিলন হইবে? ভাবনা—বিষয় ভাবনাই মনের মলা। মা! সেই রমণীয়-দর্শনের ভাবনা দ্বারা আমার বিষয় ভাবনা ভুলাইয়া দাও। ইহাই মিলনের একমাত্র পন্থা।

আহা! কি মধুর ভাবনা। "ঋতঞ্চ সত্যং পরব্রহ্মমাত্রমাসীৎ।" মহাপ্রলয় সময়ে সমস্ত জগৎ যখন শব্দমাত্রে লয় হয়, আবার সমস্ত জলরাশি এক মহাশক্তিতে লয় হইবার জন্য প্রধাবিত হয়—যখন লয় হইতেছে, তখন যে স্পন্দনে জগৎ ভাসিয়াছিল, সেই স্পন্দন জগৎকে আপন সত্তায় লীন করিয়া ধীরে ধীরে সেই রমণীয় দর্শনের বক্ষে লয় হইয়া যায়। যেমন শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি প্রথমে ভারি শব্দ তুলিয়া কোন্ সীমাশূন্য অবকাশে লয় প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ।

প্রকৃষ্টরূপে লীন হওয়াই প্রলয়। স্থূল স্থূল বস্তু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থায় লীন হইতে হইতে শেষে সমস্ত দৃশ্য-জগৎ আর থাকে না—থাকে এক মহা স্পন্দন। স্থূল পৃথ্বী জল হইয়া যায়, জল অগ্নি হইয়া যায়, অগ্নি বায়ু হইয়া যায়, বায়ু আকাশ হইয়া যায়, আকাশ শব্দরাশিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, শব্দরাশি লয় হইয়া এক মহা স্পন্দন মাত্র থাকে। সেই স্পন্দন ক্রমে ধীরে ধীরে সীমাশূন্য অনন্ত ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়। থাকে সেই সচ্চিদানন্দ পরম শান্ত, পরম রমণীয় দর্শন। তিনিই ঋতং তিনিই সত্যং। "ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম"। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি।" পরমাত্মভাবই ঋত। ভাবের স্পন্দনই সত্য। ভাবনাই আদি স্পন্দন আদি স্পন্দনই আদি ভাষণ! পরমাত্মভাবই ব্রহ্ম—পরমাত্মশক্তিই যখন স্ফুরিত হয়েন, তখনই শব্দ ব্রহ্ম। ইহাই প্রণব ও ব্যাহৃতি। ইহার পরে ইহার আচ্ছাদন এক মহা অন্ধকার। সৃষ্টি এই মহান্ধকার। মহান্ধকারের ভিতরে এক মহা প্রকাশ। "প্রণবেণ ব্যাহৃতিভিঃ প্রবর্ত্ততে তমসস্ত পরং জ্যোতিঃ।" এই "তমসস্ত পরং জ্যোতিই" মহাপুরুষ স্বয়ম্ভু বিষ্ণু। মহাপুরুষ মহা প্রকৃতি যখন প্রকৃষ্ট রূপে লীন থাকেন তখনই মহাপ্রলয়।

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্"। কে ইঁহাকে জানিবে—কে ইঁহাকে বলিবে? "যন্নবেদা বিজানন্তি মনোযত্রাপি কুণ্ঠিতম্।" আবার মহা প্রলয় অবসানে সৃষ্টি আরম্ভ। মহাপুরুষ আপন প্রকৃতিকে ঈক্ষণ করেন, এই ঈক্ষণই ভাবনার ঈক্ষণ। ঈক্ষণে 'আমি ইহা' বা "ইহা নহি" সন্দেহ। "আমি ইহা" যখন নিশ্চয় হয়, তখন প্রকৃতির সান্নিধ্য হয়। যাহা মিশিয়াছিল তাহার পৃথকত্ব হয়। সগুণ ব্রহ্ম আপন শক্তিলীন অনন্ত জীবপুঞ্জ দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি আরম্ভ করিবার ইচ্ছা করেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। ব্রহ্ম তপস্যা দ্বারা উজ্জ্বলিত হইলে যখন পরম ভর্গকে অবলোকন করেন, তখন রাত্রি সৃষ্ট হয়। পরম জ্যোতি দর্শন করিয়া মহা অন্ধকারের অনুভব হয়। কেন জগৎ সৃষ্ট হয়?

জীব স্বপ্নশূন্য নিদ্রা অবস্থায় যখন আচ্ছন্ন তখন মহাপ্রলয়। জীব-মধ্যে অনন্ত অনন্ত জীবপুঞ্জ আপন আপন কর্ম্মবশে জড়প্রায় ছিল। ক্রমে কর্ম্মসমূহ যখন ফলদানোন্মুখ হয় তখন ফলদানোন্মুখ জীবের জাগ্রত অবস্থা আইসে। এই জাগ্রতাভিমানী পুরুষই সপ্তাঙ্গ, একনোবিংশতি মুখ, বহিঃপ্রজ্ঞ, স্থূলভুক্। ক্রমে সৃষ্টি।

ক্রমে রাত্রি, সমুদ্র, অর্ণব, সংবৎসর, দিনরাত্রি, সূর্য্যচন্দ্র, মহজনাদি লোক, অন্তরীক্ষ লোক, স্বর্গ-লোক—এই সমস্তের প্রকাশ।

এই মহাপ্রলয় ও সৃষ্টিভাবনা ভিন্ন সংসার-ভাবনা দূর হয় না। পরে স্থিতি ভাবনা দ্বারা উপাসনা। সপ্রণব ব্যাহৃতি যুক্ত এই বিশ্বরূপের উপাসনা ভিন্ন—এই মহাশক্তির নিকট প্রার্থনা ভিন্ন, ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন জীবশক্তি সেই অপরিচ্ছিন্ন রমণীয় দর্শনের সহিত মিলিত হইবে কিরূপে? যে সূর্য্য জগদেক চক্ষু, যিনি সেই রমণীয় দর্শনকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, প্রভু! তুমি তোমার প্রবল জ্যোতিঃ একবার সরাইয়া লও, লইয়া আমাকে আমার রমণীয় দর্শনের সহিত মিলাইয়া দাও। আমি পারি না, তুমি করিয়া দাও। হে প্রভু! তুমি আমাদিগকে প্রাপ্ত হও, আমরা তোমায় প্রাপ্ত হইতে পারি না।

এই ভাবনাগুলি হৃদয়ে ধারণা করিয়া প্রাণকে বড় করিতে হইবে। প্রাণকে বড় করাই প্রাণায়াম। গ্রহণ করা ও পরিত্যাগ করা পুনঃ পুনঃ ভাল লাগে না; তাই গ্রহণ ও ত্যাগ না করিয়া, একভাবে থাকিতে চাই তাই কুম্ভকে স্থিতি ভিন্ন সেই রমণীয় দর্শনের সহিত মিলন হয় না। প্রাণকে স্থির করিলেও যাহা হয়, মনকে উপাসনা দিয়া শান্ত করিলেও তাই হয়; আবার বুদ্ধিকে

বিচার দ্বারা ব্রহ্মমুখে লইলেও তাই হয়। প্রাণ, মন ও বুদ্ধি—এই ত্রিবিধ শক্তির সাহায্যেও মিলন হয়। যোগ, উপাসনা, আত্মবিচার, এইজন্য রমণীয় দর্শনের প্রাপ্তি ক্রম। যাহার যাহা রুচি। একটি ছাড়িয়া একটিতে আটকাইয়া থাকিলে হয় না।

হৃদয়কে বাড়াইতে অভ্যাস করা চাই। আমরা সকলেই ভালবাসি আপনাকে। স্বামীর জন্য স্বামীকে ভালবাসা হয় না। পত্নী নিজের সুখের জন্য স্বামীকে ভালবাসে। "নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতি প্রিয়োভবতি। আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি"। ব্রহ্মের সুখের জন্য ব্রহ্মকে ভালবাসিনা। আপনার সুখের জন্য ব্রহ্মকে ভালবাসি। শ্রুতি ইহা বলেন, এই যে "আপনা" বলিয়া বস্তুটি ইহাই আত্মা, এই আত্মাই সকলের মধ্যে। তুমি ইহাকে খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন মনে করিয়া কষ্ট পাও। কিন্তু যদি হৃদয় বাড়াও, তবে নিজের দুঃখ দূর করিবার জন্য যাহা কর, অন্যের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহাই করিতে হয়। ক্রম এইরূপ। কন্যার বিবাহ দিতে না পারিয়া একজন ক্লেশে আছে। তুমি চিন্তা কর, যদি তোমার এইরূপ হইত, তবে কত ক্লেশ পাইতে; যদি তোমার একজন বন্ধুকে একখানি চিঠি লিখিলে উহার সাহায্য হয়, তাহা তোমার দ্বারা অনায়াসে হইতে পারে। রাস্তায় কোন বালক ক্ষুধায় কাঁদিতেছে। তুমি যখন ঐ স্থান দিয়া যাইতেছ তখন একবার দাঁড়াও। দাঁড়াইয়া চিন্তা কর, যদি তুমি ক্ষুধায় পীড়িত হও, তবে তোমার কত ক্লেশ হয়। ইহা চিন্তা করিলেই তুমি দান করিতে পারিবে। এইরূপে তোমার হৃদয় বাড়িবে। ইহাই করুণা অভ্যাস। এইরূপে মৈত্রী, মুদিতা ও উপেক্ষা অভ্যাস কর—হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূর হইবে। তোমার আত্মাকেই সর্ব্বত্র দেখিবে; সর্ব্বজীবে দয়া আসিবে। তুমি তখন সাধনা দ্বারা আত্মতৃপ্তির সহিত আত্মজ্ঞানলাভ পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

—০—

সভ্যতার সঙ্কট

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া যদি কাহারও হাত বা পা নষ্ট হয় তাহা হইলে দুঃখের কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষা অনেক বেশী দুঃখের কারণ কাহারও যদি বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিকৃত হইলে পাগল হইয়া যায়। পাগলের স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য্য সব কিছু থাকিলেও তার মত দুঃখী কে? অপর পক্ষে যাহার বুদ্ধি সম্পূর্ণ নির্মল তাহার পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা কঠিন নহে। তাহার ন্যায় ভাগ্যবান পুরুষ বিরল। যাহার বুদ্ধি সম্পূর্ণ নির্মল এবং যাহার বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিকৃত, ইহার মধ্যেই অধিকাংশ ব্যক্তি কমবেশী বুদ্ধির দোষ যুক্ত হইয়া অবস্থান করে।

পাগল হইবার কারণ কোনও ব্যাধি বিশেষ। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল বুদ্ধির দোষ দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার কারণ অহঙ্কার। 'আমি খুব বুদ্ধিমান, আমি যা বুঝি তাই ঠিক, অন্য লোকের উপদেশ গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই।' অনেকেই এইরূপ মনে করেন এবং ভুলপথে চলেন। বুদ্ধি নির্মল করিতে হইলে অহঙ্কার ত্যাগ করা প্রয়োজন। এজন্য উপনিষদ বলিয়াছেন "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব।" শৈশবে মায়ের কথা শুনিবার প্রয়োজন বেশী। যে শিশু তারও অহঙ্কার আছে, অবাধ্য ও স্বেচ্ছাচারী হইবার প্রবৃত্তি শিশুরও আছে। সে অবস্থায় তাহাকে শেখান প্রয়োজন মাতৃদেবো ভব। মাতাকে অবশ্য আজীবন দেবতার ন্যায় সেবা করা প্রয়োজন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বেদ পাঠ করিবার পর ব্রহ্মচারীকে বলা হইয়াছে "মাতৃ দেবো ভব।" কিন্তু মাতার বাক্য পালন করিবার প্রয়োজন বেশী হয় অল্পবয়সে, তাহার পর পিতার বাক্য পালন করা। তাহার পর গুরুগৃহে গিয়া আচার্যের বাক্য পালন করা প্রয়োজন। অহঙ্কার খর্ব করিবে। নিজের ইচ্ছামত চলিবে না। মাতার আদেশ, পিতার আদেশ আচার্য্যের আদেশ পালন করিবে। হইতে পারে তুমি তোমার পিতা অপেক্ষা বেশী বিদ্বান বেশী বুদ্ধিমান। তুমি হয়ত এম্-এ পাশ করিয়াছ তোমার বাবা হয়ত ম্যাট্রিক পাশও করেন নাই। তথাপি "পিতৃ দেবো ভব"। ইহাতে তোমার কল্যাণই হইবে। তোমার বুদ্ধির মধ্যে প্রবল কামনা —বাসনা থাকিতে পারে। মানুষ অন্যায় কাজ করে অধিকাংশ স্থলে তাহার কারণ বুদ্ধি কম বলিয়া নহে, কিন্তু কামক্রোধ প্রভৃতি দোষের জন্য। তোমার পিতার বুদ্ধি কম থাকিতে পারে কিন্তু তোমার মধ্যে যে কামনা বাসনা তাহা

তোমার পিতার মধ্যে নাই। এবং তিনি আন্তরিকভাবে তোমার হিতৈষী। এজন্য তিনি যাহা করিতে বলিবেন তাহাতে তোমার উপকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। মাতার সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

পিতা মাতার পর আচার্য্যকে সম্মান করা উচিত, তাঁহার আদেশ বা উপদেশ পালন করা উচিত। আচার্য্য সাধারণতঃ বেশী বিদ্বান বুদ্ধিমান হন। তাহা না হইলেও তিনি শিষ্যের হিতাকাংক্ষী। অহঙ্কার খর্ব করিবার জন্যও তাঁহার উপদেশ পালনীয়।

পিতামাতা আচার্য্য ব্যতীত শাস্ত্রের আদেশও পালন করা কর্ত্তব্য ইহা গীতাতে বলা হইয়াছে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণংতে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ

—গীতা ১৬:২৪

কর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। নিজের বুদ্ধি অনুসারে না চলিয়া শাস্ত্র অনুসারে চলা উচিত। তাহাতেও অহঙ্কার খর্ব হয়। অধিকন্তু পিতা মাতা আচার্য্য ইঁহাদের বুঝিবার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শাস্ত্রের ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত—শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনও মনুষ্য রচিত নহে। স্বয়ং ভগবানের দ্বারা প্রকাশিত সুতরাং অভ্রান্ত। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ বেদের মর্ম বুঝাইবার জন্য যে সকল ধর্মগ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা স্মৃতি। বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্মৃতিও অভ্রান্ত।

হিন্দুর আচার ব্যবহার ও সামাজিক ব্যবস্থা শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ এসকল ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহাদের বুঝিবার ভুল হইতে পারে না। বুঝিবার ভুল আমাদের হইতে পারে। যেখানে ঋষিদের ব্যবস্থার সহিত আমাদের মত মিলেনা সেখানে বুঝিতে হইবে আমাদের ভুল হইতেছে। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। আমরা মনে করি আমাদের ভুল হইতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ অহঙ্কার। আমরা Science পড়িয়াছি। অনেক কথা জানি। ঋষিরা সে সকল কথা জানিতেন না। এইরূপ ভাবিয়া আমরা ঋষিদের ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে চাহি। বলি জাতিভেদ খারাপ, বাল্য বিবাহ খারাপ, বিধবার বিবাহ দিলে তাহার কল্যাণ করা হয়, ইত্যাদি।

এরূপ মনে করিবার একটি কারণ অহঙ্কার। আর একটি কারণ দাস-জনসুলভ মনোভাব। মুসলমান এবং ইংরাজ আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল সুতরাং আমরা মুসলমান ও ইংরাজ সমাজের অনুকরণ করিলে উন্নত হইতে পারিব এইরূপ অনেকে মনে করেন। তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে মুসলমানগণ

প্রথমে হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিলেও শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুরাই (শিখ ও মারাঠারা) মুসলমান শক্তি চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল, এবং ইংরাজগণ সহস্রবৎসরের মধ্যে রোমাণ, স্যাক্সন, ডেনিশ, নর্ম্মাণ অনেক জাতির দ্বারা বিজিত হইয়াছিল, তাহাদের আদিম ধর্ম্ম ও সংস্কার কিছুই রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার তুলনায় হিন্দুরা বৈদিক যুগ থেকে অন্তত: চার পাঁচ হাজার বৎসর স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, মুসলমান ও ইংরাজ দ্বারা বিজিত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত অবার স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছিল, বৈদিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। এই সকল কারণে এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত যে হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলি তাহাদের রক্ষাকবচ। কিন্তু যাঁহাদের মনোভাব দাসজনসুলভ তাঁহারা মনে করেন যে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের দুর্ব্বলতার কারণ, সেগুলি বর্জন করিতে হইবে,অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজকে ধ্বংস করিতে হইবে। কারণ কোনও দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি নষ্ট করিলে ঐ দ্রব্যকেই নষ্ট করা হয়। সমাজ সংস্কারের নাম দিয়া তাঁহারা এই সকল করিতে চাহেন। পাশ্চাত্যদেশে সমাজ সংস্কার হয়, আমরাও সমাজ সংস্কার করিব। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সমাজ সংস্কারের একটা প্রয়োজন আছে। তাহাদের সামাজিক ব্যবস্থা ধর্ম্ম প্রচারকদের উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাসকল ঋষিদের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি বর্জন করিলে আমরা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিব। আমাদের দেশে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন খুব কম।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি কিন্তু বুদ্ধির স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি নাই, পাশ্চাত্য দেশবাসিগণ যাহা ভাল মনে করেন আমরা তাহা ভাল মনে করি, তাহাদের অনুকরণ করা আমরা গৌরবের বিষয় মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "সমাজ সংস্কারের গাড়ীতে বিলাতী মাল বোঝাই দিয়া রসের বাজারে চোলাই করিতেছে" (বিবিধ প্রবন্ধ—অনুকরণ)। পুনশ্চ তিনি লিখিয়াছিলেন, "হে ইংরাজ তোমার যাহা অভিমত তাহাই আমি করিব। আমি বুট পেণ্টেলুন পরিব, নাকে চশমা দিব, কাঁটা চামচ ধরিব, টেবিলে খাইব—তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। * * * আমি বিধবার বিবাহ দিব, কুলীনের জাতি মারিব, জাতিভেদ উঠাইয়া দিব, কেন না, তাহা হইলে তুমি আমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব হে ইংরাজ, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" (লোক রহস্য-ইংরাজ স্তোত্র)। আমাদের বুদ্ধি এতদুর বিকৃত হইল যে আমরা ভাবিলাম যে শঙ্কর ও রামানুজ অপেক্ষা ম্যাক্সমুলর এবং উইণ্টারনীজ বেদ-বেদান্ত ভাল

বোঝেন। এবিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ে ইউরোপীয়েরা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত বেদ স্মৃতি দর্শন পুরাণ প্রভৃতির অনুবাদ টীকা সমালোচনা পাঠ করার অপেক্ষা গুরুতর মহাপাতক সাহিত্য জগতে আর কিছুই হইতে পারে না।" (বিবিধ প্রবন্ধ—দ্রৌপদী দ্বিতীয় প্রস্তাব)। কিন্তু সাহিত্যজগতে নূতন সূর্য্যের উদয় হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব কমিয়া গেল। বিশ্বপ্রেমের নামে পাশ্চাত্য মোহ আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। ঋষি-দিগকে উপহাস করা আমরা প্রতিভার পরিচয় মনে করিলাম। এইরূপ আইন প্রণয়ন হইল যে ঋষিদের ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে (যথা সর্দা আইন, অস্পৃশ্যতা বর্জন আইন), পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ বেদান্ত সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত নিন্দা করিয়াছেন সেগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পাশ্চাত্যবিষ ব্যাপকভাবে প্রসারিত হইয়াছে, তাহার ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমাদের উপকার হইতেছে না, এক্ষণে অহঙ্কার এবং পরানুকরণ বর্জন করিয়া বুদ্ধির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, তাহা হইলে ভারতের ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়বিধ উন্নতি হইবে, তাহা ভারতের জন্য এবং পৃথিবীর আধুনিক সঙ্কট হইতে মুক্তির জন্যও একান্ত প্রয়োজন।

আছে শান্তির ঠাঁই !

[শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী]

সুখের আশায় ছুটিছে মানুষ,
পেতেছে দুঃখ শুধু !
সকল স্বপ্ন টুটিয়া জাগিছে
রুক্ষ মরুভূ ধূ ধূ !

বেদনার 'পরে বেদনা জাগিছে,
শান্তি কোথাও নাই,
হাহাকার-ধ্বনি চারিদিক হ'তে
শুনিবারে শুধু পাই ।

আলসে বিলাসে আজ যে শয়ান
সুখ-শয্যার তলে,
কাল সে দুঃখ-কবলে পড়িয়া
কাঁদিবে অশ্রুজলে ।

আজ যে উচ্চে তুলিয়াছে শির
গর্ব্বে অহঙ্কারে,
উদ্ধত হ'য়ে কাঁপায় ধরণী
কণ্ঠের হুঙ্কারে ।

সবার নিম্নে হ'বে সে পতিত—
এই তার পরিণাম !
কভু কারো কাছে পাবে নাক' সেত'
জীবনের কোন দাম !

ভ্রান্ত মানব, ফিরিয়া দাঁড়াও
আশার ছলনা হ'তে,
কতদিন আর ভাসিয়া বেড়াবে
অকূল জীবন-স্রোতে !

সুখ সুখ ক'রি কতই কেঁদেছ,
পাওনি সুখের কণা,
এ ভুবন মাঝে ক্ষণিকের তরে
মেলে নাই সান্ত্বনা।

দুঃখ-সাগর পার হ'তে চাও ?
চাও কি পরিত্রাণ ?
আঁখি মেলে দেখ—কাণ্ডারী তব
সমুখে বর্ত্তমান !

কিবা তবে ভয় ? কেনরে হতাশা ?
মুছে ফেল আঁখি-ধারা ;
অকূলের মাঝে ওরে পাবি কূল,
হ'স্‌নে ধৈর্য্য-হারা !

শান্তির ঠাঁই আছে আছে আছে
ডাক্ তোরা ভগবানে,
জীবন-তরীর কাণ্ডারী তিনি,
রাখ্ মন তাঁর পানে !

কি ভাবনা তবে এ বিপুল ভবে ?
ওরে আয় ছুটে আয় !
সঁপে দে জীবন তনু প্রাণমন
তাঁহারি রাতুল-পায় !

—০—

অর্চাবতার

[শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজ দাস]

আমাদের বঙ্গদেশে 'অর্চাবতার' শব্দটির প্রচলন বেশী নাই। তৎপরিবর্ত্তে আমরা 'প্রতিমা' 'শ্রীমূর্ত্তি' 'শ্রীবিগ্রহ' শব্দগুলির সঙ্গে বেশী পরিচিত। অর্চাবতার শব্দটি দুটী শব্দের সংমিশ্রণে গঠিত অর্চা এবং অবতার। যাঁহাকে অর্চ্চনা করা হয় তিনি অর্চা। এই অর্থে অর্চামূর্ত্তি শব্দটি শ্রীমূর্ত্তি অথবা শ্রীবিগ্রহের সমপর্য্যায়ভুক্ত। অবতার শব্দের অর্থ অবতরণকারী অর্থাৎ যিনি উপর হইতে অবতরণ করেন তিনি অবতার। সুতরাং অর্চাবতার শব্দের প্রকৃত মর্মার্থ এই যে, মঠ মন্দিরে বা গৃহে কুটীরে যে সকল বিগ্রহ নিত্য নিয়মিত অর্চিত হইয়া থাকেন সেই সকল দিব্যমূর্ত্তিকে শ্রীভগবান আদরপূর্বক স্বীকার করিয়া তন্মধ্যে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া বিরাজমান থাকেন।

এই অর্চাবতার মূলতঃ দুই প্রকার। প্রথম, স্বয়ং প্রকট অর্চাবতার যিনি কোন দেব বা মানব নির্ম্মিত নহেন। তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় পাষাণ প্রভৃতি উপাদান অবলম্বন করিয়া দেবমণ্ডলে বা ভূমণ্ডলে প্রকট হন—যেমন শ্রীবদ্রীনাথ শ্রীরঙ্গনাথ। কোন কোন স্বয়ং প্রকট অর্চাবতার যজ্ঞাগ্নি হইতে উত্থিত হন—যেমন কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ। দ্বিতীয় প্রকার অর্চাবতার, মনুষ্য নির্মিত শ্রীবিগ্রহ। আমাদের অবিশ্বাসী মনে সন্দেহ হইতে পারে যে মনুষ্যনির্মিত শ্রীমূর্ত্তিতে সত্যই কি ভগবান অবতীর্ণ হন? ইহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ে মুখ্য প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য। অনুভব, উপলব্ধি, যুক্তি, তর্ক বিচারও ইহার সাক্ষ্য দেয়। শাস্ত্র এই অর্চাবতারের বিলক্ষণ লক্ষণের নির্দ্দেশ দিতেছেন—

'অর্চাবতার নাম, দাসানাং যদভিমতং তদ্রূপবান্, তদভিমতং যৎ নাম তদ্ নামবান্, ইত্যুক্তপ্রকারেণ স্বার্থরূপনামরহিতঃ আশ্রিতাভিমতরূপঃ তৎ-কৃতনামঃ। সর্বজ্ঞোঽপি অজ্ঞ ইব, সর্বশক্তিরপি অশক্ত ইব, অবাপ্ত সমস্তকামোঽপি সাপেক্ষ ইব, রক্ষকোঽপি রক্ষ্য ইব, স্বস্বামীভাবং বিপরীতং কৃত্বা নেত্রবিষয়তয়া সর্বসুলভঃ, আলয়েষু গৃহেষু চ বর্ত্তমানঃ। (অর্থপঞ্চক)।

অর্থাৎ অর্চাবতার মানে—ভক্তগণের অভিমতানুযায়ী রূপবিশিষ্ট এবং নামবিশিষ্টরূপে বিগ্রহবান হইয়া অবস্থিত। তিনি স্বেচ্ছাধৃত নাম ও রূপ পরিত্যাগ করতঃ ভক্তগণের ইচ্ছানুরূপ রূপ ও নাম স্বীকার পূর্বক এই অর্চাবিগ্রহে ঈশ্বর স্বয়ং বিরাজমান থাকেন। এই অবস্থায় তিনি সর্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞের ন্যায়, যাবৎ

কাম্যবস্তু পরিপূর্ণ হইয়াও বসন ভূষণ ভোজনাদি যাবৎ বস্তুর প্রাপ্তির জন্য পরাধীনের ন্যায় (অর্চকের পরাধীন—অর্চকপরাধীনাখিলাত্মস্থিতিঃ) সর্বরক্ষক হইয়াও রক্ষণীয় বস্তুর ন্যায়, সর্বস্বতন্ত্র সর্বনিয়ামক হইয়াও ভক্তের অধীন নিয়াম্য-রূপে, সমস্ত মানবের সুলভ এবং দৃষ্টিগোচর হইয়া, ভক্তগণের নিজ নিজ ভাবনা এবং প্রেম অনুযায়ী বিভিন্ন মঠ মন্দিরে অথবা ভক্তগৃহকুটীরে অবস্থান করেন।

এই অর্চাবতার সকলের সঙ্গে ভাষণাদি ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু যাহাকে তিনি কৃপা করেন তাহাদের সহিত তিনি বহুপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকেন। বহু সিদ্ধমহাপুরুষ এই মহাসৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন, যথা—আড়বারগণ, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি।

এই অর্চাবতারের প্রতিষ্ঠা এবং পূজার বিধেয়তার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নির্দেশ দিয়াছেন—

'মদর্চাং সম্প্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ম্'।

শৌনক মহর্ষির বচন—

সুরূপাং প্রতিমাং বিষ্ণোঃ প্রসন্নবদনেক্ষণাম্।
কৃত্বাত্মনঃ প্রীতিকরীং সুবর্ণরজতাদিভিঃ॥
তামর্চয়েৎ তাং প্রণমেৎ তাং পূজেৎ তাং বিচিন্তয়েৎ।
বিশত্যপাস্তদোষস্তু তামেব ব্রহ্মরূপিণীম্॥

সুবর্ণরজতাদির দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর মনোহর প্রসন্নবদন প্রীতিকরী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাঁহার অর্চনা প্রণাম পূজা এবং ধ্যান করিবে। সকল হেয়বর্জ্জিত শ্রীবিষ্ণু সেই প্রতিমার মধ্যে প্রবিষ্ট থাকেন।

ইতিপূর্বে অর্চাবতারের যে গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে তাঁহার সৌলভ্যগুণটী সর্বোৎকৃষ্ট। সৌলভ্য মানে সকলের নয়নগোচরত্ব। এই সৌলভ্যগুণটীকে অতুলনীয় গুণ বলিয়া উপদেশ দিতেছেন, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা পুরুষ শ্রীশঠকোপ আড়বার "অসদৃশোগুণঃ"। তিনি বলিতেছেন—এই অর্চাবতার 'অন্ধকারব্যাপ্তে গৃহে দীপবৎ প্রকাশস্তে'। যাঁহাকে এই অর্চাবতার কৃপা করিয়া দিব্যচক্ষু প্রদান পূর্বক দর্শনদান করেন তাঁহার নিকট আড়বারগণের ন্যায় এই অর্চাবতার জ্যোতির্ময় দিব্যমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন—'ভক্তানাং ত্বং প্রকাশসে'।

আমাদের বিশেষভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন যে আমরা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যত উৎসুক জীবোদ্ধারের জন্য তিনি তদপেক্ষা অধিক আগ্রহশীল। এই জীবোদ্ধারের উদ্দেশ্যে ভগবান পাঁচটী উত্তরোত্তর সুলভ অবস্থার ভিতর দিয়া আমাদের নিকট ক্রম-অবতরণ করেন। তন্মধ্যে পর-অবস্থাপন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

অতীত পরমপদবাসী পরবাসুদেব শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ আমাদের নিকট হইতে অতিদূরে, তৎপরবর্ত্তী অণ্ডান্তর্গত ক্ষীরসমুদ্রশায়ী চতুর্ব্যূহ-অবস্থায় আমাদের পক্ষে তিনি দুর্লভ। বিভব-অবস্থায়ও (রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারে) তাঁহাদের অবতারকালে বর্ত্তমান ভাগ্যবান লোকের পক্ষে তিনি সুলভ ছিলেন বটে কিন্তু অধুনা আমাদের সে সৌভাগ্য কোথায়! এখন তাঁহাদের লীলাবিগ্রহ আমাদের নিকট সুলভ নহেন। তারপর, অন্তর্য্যামী অবস্থায় তিনি সর্বদা আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন বটে কিন্তু কয়জনই বা সেই হৃদয় পুণ্ডরীক মধ্যে তাঁহার দর্শনলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছে? এই দর্শনের জন্য যে চিত্তসমাধান আয়াস এবং অধ্যবসায় প্রয়োজন এই যুগে তাহা কয়জনই বা করিতে সমর্থ? সর্বসুলভ অর্চাবতার কিন্তু সকল সময়ে সকলেরই নয়নগোচর হইয়া বিরাজ করেন।

শ্রীভগবানের স্বেচ্ছাধৃত এই পাঁচটী অবস্থার তারতম্য অনুধাবনপূর্বক শ্রীলোকাচারীস্বামী তাঁহার শ্রীবচনভূষণ গ্রন্থে একটি উৎকৃষ্ট হৃদয়গ্রাহী উপমার অবতারণা করিয়াছেন—

'আবরণ জলবৎ পরত্বং, ক্ষীরার্ণববৎ ব্যূহঃ, প্রবহন্ নদীবৎ বিভবঃ' ভূগত-জলবৎ অন্তর্য্যামিত্বং, তত্র স্থিতা হ্রদা ইব অর্চাবতারঃ'। অর্থাৎ তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে ব্রহ্মাণ্ডের বহিরাবরণরূপ সমুদ্রের জল যেমন সুদুর্লভ এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ক্ষীরাব্ধিও যেমন দুর্লভ পর-অবস্থাপন্ন পর-বাসুদেব এবং চতুর্ব্যূহরূপ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ) অবস্থাও ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য আর্ত্তব্যক্তির পক্ষে তদ্রূপ। মধ্যগত জল সন্নিহিত থাকিলেও খননাদি কার্য্য বিনা যেমন তৃষিত সেই জলপানে তৃপ্ত হইতে পারেনা সাধকের পক্ষে অন্তর্য্যামী অবস্থাটিও তদ্রূপ, অষ্টাঙ্গযোগাদি বহু আয়াসসাধ্য ও দুর্লভ। কতকগুলি নদী কেবল বর্ষাকালেই জলপূর্ণ থাকে বলিয়া তৎকালে তাহার জলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় বর্ষাশেষে জল শুখাইয়া গেলে যেমন সে তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণানিবারণে সক্ষম হয় না, সেইরূপ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিভব অবতার তাঁহাদের আবির্ভাবের সমসাময়িক সৌভাগ্যবান জীবের পক্ষেই সুলভ ছিলেন এখন আমাদের পক্ষে তাঁহারা দুর্লভ। কিন্তু অর্চাবতারের মহিমা স্বতন্ত্র। তাঁহাকে সর্বদা সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ হ্রদ বা জলাশয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই জলাশয়ের জল যেমন সকল সময়ে সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে সহজলভ্য এবং উপভোগ্য অর্চাবতারের মহিমাও তদ্রূপ। স্ত্রী পুরুষ ব্রাহ্মণ শূদ্র পাপী পুণ্যাত্মা আদরকারী অনাদরকারী সকলের কাছেই এই অর্চাবতার অবস্থায় তিনি সুলভ। এই কারণেই মর্মজ্ঞপুরুষগণ অর্চাবতারকে সৌলভ্যের সীমাভূমি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—'সৌলভ্যস্য

সীমাভূমিঃ অর্চাবতারঃ'। প্রকৃতি অনুভবি মহাপুরুষগণ এই অর্চাবতারের বিশেষ বৈভবের কীর্ত্তন করিয়াছেন অর্চাবতার প্রথমতঃ সংসার-প্রবণ জীবের নিকট নিজ সৌন্দর্য্যের দিব্যদর্শন প্রদান করিয়া ভগবদ্বিষয়ে তাহার রুচি উৎপাদন করেন। এই রুচি উৎপন্ন হইলে তখন ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠা আসে। এই অবস্থায় ভগবান স্বয়ং যে তাঁহাকে প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় তাহা এই ভক্তকে তিনি উপলব্ধি করাইয়া দেন। এই অর্চাবতারকেই ভক্ত তখন উপায়রূপে পরিগ্রহ করে। এই পরিগ্রহণান্তর ক্রমশঃ অর্চাবতারের বিবিধ অনুভব অভিবৃদ্ধ হইয়া উঠে, পরিশেষে এই অর্চাবতারই ভক্তের হৃদয়ে পরম উপভোগ্য হইয়া পড়েন। আড়্বার বলিতেছেন—'মম মধু মম ক্ষীরং মম ইক্ষুরসখণ্ডং শ্রীমান্ বাণাদ্রিনাথঃ'। সৌন্দর্য্যপূর্ণ বাণাদ্রিনাথ * মধুর ন্যায় দুগ্ধের ন্যায় মিশ্রীখণ্ডের ন্যায় আমার অতি উপভোগ্য। সিদ্ধমহাপুরুষগণ গাহিয়াছেন—'অর্চাবতারঃ বিমুখানাং চেতনানাং বৈমুখ্যং দূরীকৃত্যরুচিং উৎপাদয়তি, রুচ্যুৎপত্তৌ উপায়ো ভবতি, উপায় পরিগ্রহে কৃতে ভোগ্যো ভবতি।'

অর্চাবতার-বৈভবের একটি দিগ্‌দর্শন উল্লেখের চেষ্টা করা হইল মাত্র। সাধনমার্গে অবতরণ করিলে এবিষয়ে যে সকল উপলব্ধি আসে তাহা বর্ণনার বাহিরে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এতৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্বে বা তথ্যে প্রবেশ না করিয়াই হিন্দুদিগকে পৌত্তলিকতার অপবাদ দেন। দুঃখের বিষয় কোন কোন পাশ্চাত্য শিক্ষিত আমাদের স্বদেশবাসীও বিনা বিচারে তাহাদের পশ্চাদ্‌গামী হন।

অর্চাবতারের পূজার্চনা কি পৌত্তলিকতা!

—০—

* বাণাদ্রিনাথ—দক্ষিণভারতে মাদুরার নিকট বাণনাম পর্বতের পাদদেশে একটি বিরাট মন্দিরে বিরাজমান সুন্দরবাহু নামক অর্চাবতার।

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

॥ চতুর্থ প্রকরণ, নবম উচ্ছ্বাস ॥

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

॥ শ্রীরামঃ শরণং মম ॥

উৎফুল্লামলকোমলোৎপলদলশ্যামায় রামায়তে
কামায় প্রমদা-মনোহর গুণগ্রামায় রামাত্মনে।
যোগারূঢ় মুনীন্দ্র মানসসরোহংসায় সংসারবি
ধ্বংসায় স্ফুরদোজসে রঘুকুলোত্তংসায় পুংসে নমঃ ॥

ভবাব্ধিপোতং ভরতাগ্রজং তং
ভক্তপ্রিয়ং ভানুকুলপ্রদীপম্।
ভূতাধিনাথং ভুবনাধিপং তং
ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যং ॥

সংসার সাগরের বৃহৎ নৌকা; ভক্ত প্রিয় সূর্য্যকুলমণি; নিখিল প্রাণীর প্রভু; ত্রিভুবনের অধিপতি, ভবরোগের চিকিৎসক সেই রামকে ভজনা করি।

যাবচ্ছ্রীরামনামস্য স্মরণং নাস্তি ভো মুনে।
তাবদ্ যমভটাঃ সর্ব্বে বিচরন্তীহনির্ভয়াঃ ॥

—বৃহস্পতি স্মৃতি।

হে মুনে, যতক্ষণ শ্রীরাম নাম স্মরণ না করা হয় তৎকাল পর্য্যন্ত যমদূতগণ এখানে নির্ভয়ে বিচরণ করে।

রাম নাম শুন্‌লে যমদূতগণের ভয় হয়?

যমদূতগণের অধিকার পাপীর উপর। রাম নাম শুনলে বোঝে যে এখানে আমাদের থাক্‌বার অধিকার নাই এবং স্বয়ং ধর্ম্মরাজ নিষেধ করেছেন যেখানে নাম হয়, যে স্থানে তুলসী কানন, সে স্থানে যেওনা। সেই কথা মনে ক'রে নাম শুনে পলায়ন করে।

আচ্ছা, মানুষ গ্রহপীড়ায় কষ্ট পায়—রাম নাম স্মরণ কর্‌লে কি তা দূর হয়?

অবশ্যই হয়। স্বয়ং শনি বলেছেন—

মৎকৃতা যা ভবেদ্বাধা মহাদুঃখৌঘদায়িনী।
রামনাম জপাৎ সা হি মুচ্যতে স্বল্পকালতঃ ॥

আমার দশায় মানুষের মহা বিপত্তি উপস্থিত হয়। মৎকৃত অত্যন্ত দুঃখ

বায়ক উপদ্রব সকল রাম নাম জপ করলে অতি অল্পকালের মধ্যে নিশ্চিত প্রশমিত হয়।

প্রমাদ বশে যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কোন স্থানে পতিত হয় সে যেমন দাহ্য পদার্থকে ভস্মিত করে তদ্রূপ কেহ যদি 'রাম' ব'লে ওষ্ঠ স্পন্দন করে (ঠোঁট নাড়ে) তাহ'লেও তার পুঞ্জীকৃত পাপ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গেনাপি শ্রীরামনাম নিত্যং বদন্তি যে।
তে কৃতার্থা মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদোষোজ্ঝিতাঃ সদা॥

—বিষ্ণুপুরাণ।

প্রসঙ্গক্রমেও হে মুনে যাঁরা নিত্য শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করেন তাঁরা সমস্ত দোষশূন্য হয়ে কৃতার্থ হন।

প্রসঙ্গ ক্রমে মানে কি?

কেহ রামভক্ত-মনীষের কাছে চাকরী করে, প্রভুর মুখে নাম শুনে যদি সে বলে। অথবা অযোধ্যায় কেহ অর্থোপার্জ্জন করবার জন্য দোকান করেছে, অযোধ্যাবাসিগণের মুখে শুনে যদি সে নাম উচ্চারণ করে। বিহারবাসিগণের পরস্পরের দেখা হলে 'রাম রাম' বলে তবে তাঁরা কথা আরম্ভ করেন এও প্রসঙ্গক্রমে। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে পরিশ্রম করে রাত্রে শোবার সময় 'রাম রাম' বলে শয়ন করাকেও প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যেতে পারে।

ব্রহ্মা বলেছেন—

অহঞ্চ শঙ্করোবিষ্ণু স্তথা সর্ব্ব দিবৌকসঃ।
রাম নাম প্রভাবেন সংপ্রাপ্তাঃ সিদ্ধিমুত্তমাম্॥
নির্বর্ণং রামনামেদং বর্ণাণাং কারণং পরম্।

—বিষ্ণুপুরাণ।

আমি শঙ্কর বিষ্ণু ও অখিল অমর নিকর আমরা রাম নাম প্রভাবে উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছি। এই রাম নাম নির্বর্ণ সমস্ত বর্ণের কারণ।

সাবিত্রী ব্রহ্মণা সার্দ্ধং লক্ষ্মীনারায়ণেন চ।
শম্ভুনা রাম রামেতি পার্ব্বতী জপতি স্ফুটম্॥
রাম নাম প্রভাবেন স্বয়ম্ভূঃ সৃজতে জগৎ।
তথৈব সর্ব্বদেবাশ্চ সর্বৈশ্বর্য্য সমন্বিতা॥

—পুলস্ত্য সংহিতা।

সাবিত্রী ব্রহ্মার সহিত, লক্ষ্মী নারায়ণের ও পার্ব্বতী শঙ্করের সহিত এই রাম নাম জপ করেন। ব্রহ্মা রাম নামের প্রভাবে জগৎ সৃষ্টি করেন। তদ্রূপ

সমস্ত দেবগণও এই রাম নাম জপ করত অখিল ঐশ্বর্য্য লাভ করেছেন।

বিষ্ণু নারায়ণ এরাও রাম নাম জপ করেন?

তাঁর নাম তিনি যদি জপ না করেন তা'হলে অপরে কর্‌বে কেন! তাঁর নাম ভিন্ন আরতো কিছু নাই। কাজে কাজেই জপ করে থাকেন। কালো ঠাকুরটী বলেছিলেন—"যদিহ্যহং ন বর্ত্তেয়ং" আমি যদি কর্ম্ম না করি লোকে আমার অনুবর্ত্তন কর্‌বে। সেই জন্য অনলস হ'য়ে সতত আমায় কাজ করতে হয়।

যখন রাম ও কৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁরা নিত্য যথা কালে সন্ধ্যা জপাদি কর্‌তেন, রামায়ণ ভাগবতাদিতে দেখা যায়।

রামনাম্নঃ সমুৎপন্নঃ প্রণবোমোক্ষদায়কঃ।
রূপং তত্ত্বমসেশ্চাসৌ বেদতত্ত্বাধিকারিণঃ॥
যথাচ প্রণবোজ্ঞেয়ো বীজং তদ্বর্ণসম্ভবম্।
সশব্দেন হকারেণ সোঽহমুক্তং তথৈবচ॥

বেদতত্ত্বাধিকারিগণের সেই তত্ত্বমসির রূপ মোক্ষদায়ক প্রণব রাম নাম হ'তে সমুদ্ভূত, প্রণব হংস সোহং সমস্তই রাম নাম হতে উৎপন্ন হ'য়েছে।

ইত্যাদয়ো মহামন্ত্রাবর্ত্ততে সপ্ত কোটয়ঃ।
আত্মাতেষাঞ্চ সর্ব্বেষাং রাম নাম্না প্রকাশতে।
অংশাংশৈ রাম নামশ্চ ত্রয়সিদ্ধা ভবন্তি হি॥
বীজমোঙ্কার সোঽহঞ্চ সূত্রমুক্তমিতিশ্রুতিঃ ॥ —ঐ ॥

সোহং হংসাদি সপ্তকোটী মহামন্ত্র আছে সেই সকলের আত্মা রাম নামের অংশাংশের দ্বারা বীজ ওঙ্কার ও সোহং তিনটী সিদ্ধ হ'য়েছে।

সমস্তই রাম নাম থেকে হ'য়েছে?

শেষের শ্লোকটী মহারামায়ণেও আছে। কি ভাবে রাম নাম থেকে সোহং হংস ওঁ হয়েছে তাহা দেখিয়েছেন। শ্রীরামের বর্ণ বিশ্লেষ বিপর্য্যয়াদিক্রমে সিদ্ধ প্রণবোৎপত্তি—মহারামায়ণে আছে।

সাধন রাজ্যেও দেখা যায়, 'রাম রাম' জপ কর্‌তে কর্‌তে তা থেকে ওঙ্কার আবির্ভূত হন।

গবাময়ুতকোটীনাং কন্যাদানাযুতাযুতৈঃ।
তীর্থকোটী সহস্রাণাং ফল শ্রীনামকীর্ত্তনম্॥
রাম নাম সমং চান্যং সাধনং প্রবদন্তি যে
তে চণ্ডাল সমাঃ সর্ব্বে সদা রৌরববাসিনঃ॥

—পুলস্ত্য সংহিতা।

কোটি গো দান; অযুত অযুত কন্যা দান; কোটী সহস্র তীর্থের ফল শ্রীনাম কীর্ত্তন। যাঁরা অন্য সাধন রাম নামের সমান বলে তারা চণ্ডাল তুল্য, রৌরব নরকে গমন করে।

রিপবস্তস্য নশ্যন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চতম্।
রাক্ষসাশ্চ ন সীদন্তি নরং রামেতি বাদিনম্॥

—সূতসংহিতা।

যিনি রাম নাম জপ করেন তাঁর শত্রুগণ বিনষ্ট হয়। গ্রহ সকল কোনরূপ ব্যাঘাত উৎপন্ন কর্‌তে পারে। রাক্ষসগণও কোনও অনিষ্ট করতে সমর্থ হয় না।

• একটি সত্য ঘটনা বলি—, একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক জেলখানা দেখ্‌তে যান্। তিনি দেখলেন জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কেবল অবিরাম 'রাম রাম' জপ কর্‌ছেন। জেলারকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লেন যে এঁর ফাঁসির হুকুম হ'য়েছে তাই ওরূপ রাম রাম কচ্ছেন।

যখন প্রহরীগণ ফাঁসির পূর্ব্বে তাঁকে বিচারালয়ে নিয়ে গেল—বিচারক তাঁর শেষ প্রার্থনা কিছু আছে কিনা জান্‌তে চাইলেন। ব্রাহ্মণ কোন কথার উত্তর না দিয়ে অবিরাম ঘন ঘন 'রাম রাম' জপ কর্‌তে লাগলেন। এমন সময় কয়েকটী স্ত্রী পুরুষ কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বিচারালয়ে প্রবেশ করে বল্‌লে—ধর্ম্মাবতার ওঁর কোন দোষ নাই, উনি নির্দ্দোষ, ওঁকে খালাস দিন। আমরা অপরাধী, আমাদের যা দণ্ড হয় দিন। বিচারক তাদের কথা শুনে ব্রাহ্মণকে মুক্তি দান কর্‌লেন। ব্রাহ্মণ রাম রাম করে চলে গেলেন।

যত বড় বিপদ আসুক না কেন, বিপন্ন ব্যক্তি যদি আকুল প্রাণে রাম নাম জপ করে তাহ'লে সে বিপদ হ'তে পরিত্রাণ পায়। এ জগৎ জয়ের একমাত্র মহা-অস্ত্র রাম নাম। সতত রামনাম জপে কাম ক্রোধাদি রিপুদল, রোগ শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা আধিব্যাধি কিছু থাকবে না। কেবল কেবল জপ কর—রাম রাম রাম! রাম রাম রাম! শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

—০—

ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী

[শ্রীনেপালচন্দ্র দাশ]

সবে সাত বৎসরের বালক কৃষ্ণদাস শয্যায় নিদ্রিত রহিয়াছে, বালক যেন স্বপ্ন ঘোরে শুনিল—"কৃষ্ণদাস, উঠ! আমি আসিয়াছি।" সহসা এই কথাগুলি বালকের কর্ণে প্রবেশ করিল—মোহন মুরলীধ্বনির ন্যায় কথাগুলি বালকের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল—বালক চক্ষু মেলিয়া চাহিল, চাহিয়া দেখিল সমগ্র ঘর দিব্য হরিদ্রা রঙের জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে, সে দেখিল তাহার সম্মুখে এক গৌরবর্ণ মনোহর বিগ্রহ দাঁড়াইয়াছেন। ইহাতে বালক অপূর্ব্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইল। সেই সুন্দর মূর্ত্তির বদনে মৃদু মৃদু হাসি রহিয়াছে, সে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেও ভয় পাইল না,—সে দেখিল অপরূপ মনোহর গৌরাঙ্গ সুন্দর মূর্ত্তি—তাঁহার অপরূপ বেশ,—তাঁহার অঙ্গে অপরূপ ভূষণ—তাঁহার রাতুল চরণে উজ্জ্বল নূপুর,—পরিধানে পট্ট বস্ত্র, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চিত্তমুগ্ধকর, চন্দনচর্চ্চিত, গলায় দিব্য মালতী ফুলের মালা, মস্তকে ফুলের চূড়া বাঁধা—প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটে—অলকা তিলক—বদনে বিন্দু বিন্দু ফাগুর বিন্দু, রাঙা অধরে অমিয় হাসি। বালক কি যেন কি এক দিব্য ভাবে বিবশ, জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?" সেই অপরূপ সুন্দর বিগ্রহ উত্তর করিলেন—"আমি গৌরাঙ্গ" "তুমি বৃন্দাবন যাও" "আমি এখন চলিলাম, বৃন্দাবনে গিরি গোবর্দ্ধনে আমার সহিত তোমার আবার দেখা হইবে।" এই কথাগুলি বলিবামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণদাসের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অমনি বালক "কোথা গেল গৌরাঙ্গ আমার" বলিয়া মর্ম্মভেদী ক্রন্দন আরম্ভ করিল। ক্রন্দনের শব্দে তাহার পিতামাতা ও গৃহের সকল লোক জাগ্রত হইলেন, তাঁহারা তাহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক রোদন করিতে করিতে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। সে বলিতে লাগিল "আমি বৃন্দাবনে সেই গৌরাঙ্গের নিকট যাইব।" গৌরাঙ্গের সহিত মিলিবার জন্য এই যে ব্যাকুলতা ও রোদন তাহার কিছুতেই বিরতি ঘটিল না। মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজন কত বুঝাইলেন, কিন্তু সে কোন ভাবেই সুস্থ বা শান্ত হইল না। বালক শয়ন ভোজন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তাহার অবস্থা দেখিয়া তাহাকে তাঁহারা আর গৃহে রাখা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না; তাঁহারা ভাবিলেন জোর করিয়া গৃহে রাখিলে, তাহাতে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। তাঁহারা অবশেষে ঈশ্বর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে যাইবার

অনুমতি দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপাত্র ছাড়া পাইল—'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিল। কিন্তু কোথা বৃন্দাবন, কোথা গোবর্দ্ধন কিছুই জানা নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা-আকর্ষণে উন্মত্তের মত চলিতে লাগিল।

এই ঘটনা ঘটিয়াছিল লাহোরে। পাঁচ বৎসর বয়সে ধ্রুব যেরূপ শ্রীহরি অন্বেষণে বন গমন করিয়াছিলেন, এই বালক কৃষ্ণদাসও তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গ অন্বেষণে চলিল। বালক বৃন্দাবনে পৌঁছিল। বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া সেখানকার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"এই বৃন্দাবনে, আমার গৌরাঙ্গ কোথায় আছেন বলিতে পার?" বালকের ব্যাকুলতা ও আর্ত্তি দেখিয়া সবাই মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু কেহ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না—তাহারা তাঁহাকে বুঝাইলেন—"বালক, এই বৃন্দাবনে গৌরাঙ্গ কেহ নাই। এইখানে কৃষ্ণ আছেন, তুমি তাঁহাকে দেখিতে চাও, দেখিতে পাইবে।" সে কোন কথা মানিল না—গৌরাঙ্গশূন্য জীবনে তাহার গৌরাঙ্গ চাই। সে ভাবিল ঠাকুর তো বলিয়াছেন গোবর্দ্ধনে তাহার সহিত আমার দেখা হইবে। এই ভাবিয়া তখনি গোবর্দ্ধনে গমন করিল। তাহার ক্রন্দনে গোবর্দ্ধনের প্রতি শৈলচূড়া প্রতিধ্বনিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। কত দিবা কত যামিনী কত গ্রীষ্ম কত বর্ষা অপগত হইল। অনাহারে ক্লেশে শীর্ণ দেহখানি অবশিষ্ট রহিল মাত্র। কতবার উঠিতেছে, কতবার পড়িতেছে, আঘাতে আঘাতে দেহ যে তাহার ভাঙিয়া যাইতেছে, কিন্তু সে সম্বিত নাই—একেবারে আত্মহারা! কখন কুসুম চয়ন করিতেছে,—ভাবিতেছে এই কুসুম দিয়া প্রাণনাথের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া তাহার অর্চ্চনা করিব। কিন্তু সকলই বিফল হইতেছে—তাহার মর্ম্ম বেদনার কথা মরমীজন অনুভব করুন।

শ্রীগৌরাঙ্গ কতকদিন পরে নীলাচল হইতে বৃন্দাবন অভিমুখে ছুটিলেন। 'বৃন্দাবন' কথাটী পর্য্যন্ত প্রভুর নিকট কত প্রিয় ছিল তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে যখন তিনি নবদ্বীপে ছিলেন তখন একদিন এই বৃন্দাবন নাম করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন—অবিরল অশ্রু ধারায় ভাসিতে ভাসিতে বলিয়াছিলেন—"কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা আমার ভাণ্ডীর বন, মধুবন; যমুনা পুলিন, গোবর্দ্ধন; কাঁহা শ্রীদাম সুদাম, কাঁহা নন্দ যশোদা, কাঁহা বলিতে বলিতে রাধাকৃষ্ণের নাম আর মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না—অমনি ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সেই প্রভু সন্ন্যাসের পরও কয়েক বৎসর নীলাচলে অতিবাহিত করিয়াছেন, বৃন্দাবনে আর যাওয়া হয় নাই। আজ ভক্তগণের সম্মতি লইয়া নীলাচল চন্দ্রের নিকট মিনতি জানাইয়া বৃন্দাবন অভিমুখে চলিলেন

—প্রভু গভীর বনপথে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া চলিলেন— পথের কণ্টক কঙ্করের আঘাতে কোন বেদনা অনুভব করিলেন না। আর যেখানে যেখানে যমুনা দর্শন হইতেছে সেইখানে যমুনায় ভাবঘোরে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন—"পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন। তাহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥" সঙ্গের ভৃত্য তাহাকে প্রত্যেক বার জল হইতে উত্তোলন করিতেছেন। পূর্ব্বে বৃন্দাবন নামে তাঁহার অন্তরে যে রস উথলিত হইত তাহাতে ত্রিজগৎ ভাসিয়া যাইতে পারিত। দূর দেশে থাকিয়া বৃন্দাবনের রজ পাইলে একবার গায়ে মাখিয়া যে আনন্দ পাইতেন তাহা তাঁহাকে একমাস পর্য্যন্ত আপ্লুত করিত, সেই প্রভু আজ বৃন্দাবন চলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের ভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ত্রিজগতে এসাধ্য কাহার নাই যে, শ্রীপ্রভুর বৃন্দাবন দর্শন লীলা সম্যক বর্ণনা করিতে পারেন। পথে যে যে লীলা হয় তাহা এখানে বর্ণনা করিবার সাধ্য আমার নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রমে বৃন্দাবন পৌছিলেন। শ্রীপ্রভু বৃন্দাবনের যে বৃক্ষটী দেখিতেছেন, তাহাকেই আলিঙ্গন করিতেছেন, আলিঙ্গন করিয়া—আনন্দ ধারায় ভাসিয়া যাইতেছেন—যেন এই বৃক্ষ তাঁহার কত আদরের, কত পরিচিত আত্মীয়, বাহু বেষ্টনে বৃক্ষকে ধরিয়া নিবিষ্ট ভাবে হৃদয়াবেগ জানাইতেছেন। বৃন্দাবনের রজঃ আনন্দ ভরে দুই হাতে ভরিয়া অঙ্গে মাখিতেছেন; কোন বৃক্ষের বৃন্ত ছিন্ন পত্র দেখিলে পত্রটীকে সযত্নে বক্ষে ধারণ করিতেছেন—অশ্রু ধারায় প্লাবিত হইয়া কত স্নেহে পত্রটীকে চুম্বন করিতেছেন যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। বৃন্দাবনের সেই শাল তাল তমাল বকুল আদি অসংখ্য বৃক্ষরাজির মধ্যে প্রভু একেবারে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার অন্তরে প্রতিক্ষণে নূতন নূতন আনন্দ তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে, আর তাহাতে তাঁহার ঘন ঘন আনন্দ মূর্চ্ছা হইতেছে। তিনি আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া চলিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে অসংখ্য পুষ্প বৃক্ষ বিরাজিত। সমগ্র বন প্রভুর আগমনে যেন প্রফুল্লিত হইল, যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দা দেবী বহু দিন পরে আপন প্রাণনাথকে পাইয়াছেন—তাই প্রভুর গায়ে মাথায় অসংখ্য পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল—এই পুষ্পের একটীই শুষ্ক বা পুরাতন নহে। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের পুষ্প হইতে পুষ্প মধু বর্ষিত হইতেছে। তখন কোথা হইতে দলে দলে ভ্রমর আসিয়া প্রভুকে বেষ্টন করিয়া গুঞ্জন করিতে লাগিল। বহু ময়ূর ময়ূরী আনন্দে কেকা ধ্বনি করত পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। বৃক্ষ হইতে শুক সারিকা আসিয়া প্রভুর গায়ে হাতে বসিতে লাগিল—মৃগদল আসিয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে

লাগিল—প্রভু মৃগের গলা ধরিয়া তাহাদের মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন—আর তাহাদের নয়ন দিয়া প্রেম ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনতিদূরে একদল গাভী দেখিতে পাইলেন। প্রভু গাভীদল দেখিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, আর গাভীদল প্রভুর নিকট ছুটিয়া আসিল। গাভীর রাখালেরা গাভীদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। তখন গাভীগণ আসিয়া নাসিকার দ্বারা প্রভুর অঙ্গের পদ্ম গন্ধ শুকিতে লাগিল এবং জিহ্বার দ্বারা তাহার গাত্রলেহন করিতে লাগিল। গাভীদল প্রভুর সাথে সাথে চলিল।

লীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপে বন ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে উপনীত হইলেন। গোবর্দ্ধনের সানুদেশে পৌছিলে, একটী অপরূপ লাবণ্য মণ্ডিত কিশোর বালক আসিয়া তাঁহার চরণ তলে পতিত হইল। সেই কিশোর বালক তাহার প্রভুকে দেখিবামাত্র আপনার প্রাণনাথ বলিয়া চিনিতে পারিল, সে বুঝিল যাঁহার লাগিয়া সে দেশত্যাগ করিয়াছে, যাঁহার লাগিয়া সে বৃক্ষতলবাসী উদাসীন হইয়াছে, যিনি তাহাকে পাগল করিয়া আত্মীয় স্বজন পিতামাতা হইতে এত দূর দেশে লইয়া আসিয়াছেন ইনি সেই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত মনোরম। সে ভাবিতে লাগিল আমিত তাহাকে চিনিলাম—ইনি কি আমাকে চিনিবেন এইরূপ দ্বিধায় ভয়ে ভয়ে প্রভুর পদতলে পতিত হইল —আকুল ক্রন্দনে তাঁহার পদতল অশ্রু ধারায় ধৌত করিল। প্রভু অমনি সমুদয় ভাবসম্বরণ করিয়া মধুর হাসিয়া চির পরিচিতের মত সেই ব্রাহ্মণ কিশোরকে বক্ষে ধারণ করিলেন—আর সে তন্মুহূর্ত্তে মূর্চ্ছিত হইল। প্রভু তাহা শুশ্রূষা করিলেন—তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"তোমার নাম কৃষ্ণদাস? তুমি যাও, পশ্চিম দেশ উদ্ধার কর।" যুবক প্রভুর সঙ্গ ছাড়িতে চাহিল না, অনেক অনুনয় মিনতি করিতে লাগিলেন, এইজন্য প্রভু তাঁহাকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিলেন। কিশোর বলিল—"আমি কাঙাল, বিদ্যাবুদ্ধিহীন, আমি কিরূপে তোমার ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিব?" তখন শ্রী:গৌরাঙ্গ নিজের গলা হইতে গুঞ্জমালা খুলিয়া যুবকের গলায় পরাইয়া দিলেন—আর বলিলেন—"এইমালা পরিধান কর, এখন শীঘ্র গমন কর।" ইহার দ্বারা তিনি জীব উদ্ধারের শক্তি প্রাপ্ত হইলেন—যে শক্তি পাইলেন তাহাতে তিনি যেখানেই গমন করেন সেখানকার লোক সমুদয় অমনি আসিয়া তাঁহার চরণ তলে শরণ লইতে আরম্ভ করিল। এই অল্প সময়ের জন্য প্রভু ভক্তের মিলন। আর ইহাতেই ভক্তি ধর্ম্মের সমুদয় তত্ত্ব ও শক্তি তাহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। শ্রীপ্রভু আদরে তাহার নাম রাখিলেন কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী।

এই কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালীর সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বড়ই প্রতাপ হইল লোকে চমৎকার।
অলৌকিক দরশন আকার প্রকার॥
গৌরাঙ্গ ভজয়ে লোক তাঁর উপদেশে।
প্রভুর দোহাই দিয়া ফিরিল দেশে দেশে॥"

এই কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী প্রথম মালাবারে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিলেন। সেখানে তিনি গৌর নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বনোয়ারী চন্দ্রকে ভক্তি ধর্ম্মে দীক্ষা এবং শিক্ষা দান করিয়া সেই গদীর ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া তাহাকে মোহন্ত করিলেন,—পরে অন্যস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করিলেন। এইরূপে তিনি গুজরাটে উপনীত হইয়া সমগ্র গুজরাট ভক্তিবন্যায় প্লাবিত করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য শ্রীচক্রপাণিও পশ্চিমদেশে ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সময়ে কৃষ্ণদাসের ভক্তি মহিমার কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে এই দুই ভক্ত মহাজনের কৃপায় ঐসকল দেশের লোক প্রেমভক্তির আস্বাদন পাইয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই পৃথক পৃথক ভাবে নিতাই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ স্থাপন ও সেবা প্রবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীচক্রপাণির গদীর নাম ছোট গৌড়িয় আর কৃষ্ণদাসের গদীর নাম হইল বড় গৌড়িয়। "ছোট গৌড়িয় আর বড় যে গৌড়িয়া। অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া॥" (ভক্তমাল গ্রন্থ)।

গুজরাট হইতে ফিরিয়া কৃষ্ণদাস পরে নিজদেশ লাহোরে আসিলেন—সেখানে সর্ব্বপ্রথম নিজ গ্রাম ওলম্বা বা ওলম্বাতে গৌর নিতাই বিগ্রহের সেবা প্রবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে লাহোরে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। লাহোর হইতে তিনি সিন্ধুদেশে গমন করেন।

"পাঞ্জাবের পশ্চিমে নাম সিন্ধু দেশ।
উদ্ধার করিতে জীবে করিলা প্রবেশ॥
হিন্দুত যতেক ছিল বৈষ্ণব করিল।
মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হইল॥
গোসাঞির সংকীর্ত্তন শুনিয়া যবন।
বৈষ্ণব আচার করে নাম সংকীর্ত্তন॥
যবনের আচার ত্যজিল সর্ব্বজন।
হরিনাম জপে মালা তিলক ধারণ॥" —ভক্তমাল গ্রন্থ॥

সেই সময়ে ইহা সম্ভব হইয়াছিল—এখন আর তাহা হইতে পারে না। অন্যত্র দূরের কথা, এখন এই বাংলা দেশেই বা ভক্তি ধর্ম্ম কতটুকু আছে! এই গৌর মণ্ডল ভূমিতেই বা এখন কি ঘটিতেছে! বাঙ্গালী আজ আপনা ভুলিয়াছে, তাই বাংলার আর সে প্রাচীন গৌরব নাই। বাংলা তথা সমগ্র ভারতের শক্তির উৎস কোথায় তাহা আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বাংলার অধ্যাত্ম শক্তিকে হারাইয়া বাঙ্গালী আজ নিঃস্ব হইয়াছে, ভারতের তপঃ শক্তি হারাইয়া ভারতবর্ষ আজ অধর্ম্মের গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইতে চলিয়াছে। এই দুর্য্যোগে অধ্যাত্মের এই চরমতম বিপর্য্যয়ে যদি জাতিকে আবার বাঁচিতে হয়, তবে তাহাকে তাহার ঘরের ঠাকুরকে চিনিতে হইবে—আপন ঘরের হারাণ মাণিক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বস্তুতান্ত্রিকতা, নীতিতান্ত্রিকতা, বচন তান্ত্রিকতা কিছুতেই আমাদের রক্ষা নাই। সত্যিকার অধ্যাত্মশক্তির প্রয়োজন! ঐ শোন! আজও বিশ্ব বিপর্য্যয়ের কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া পাঞ্চজন্যহস্তে শ্রীকৃষ্ণ মেঘগম্ভীরস্বরে ভারতের সাধক সব্যসাচীকে বলিতেছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" হে অর্জ্জুন, আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমায় নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি— তুমি আমার প্রিয়, এইরূপ করিলেই আমাকে পাইবে।

—ঃ০ঃ—

উৎকল সাহিত্যে রামকথা

[শ্রীসরলা দেবী এম্-এল-এ]

আমাদের ওড়িয়াদেশে শ্রীচৈতন্য দেবের এবং তৎ সমসাময়িক পঞ্চসখা সিদ্ধ পুরুষদের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু উৎকলের জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র করে পূর্ব্ব শতাব্দীর বহু ভক্ত বৈষ্ণব কবিরা ওড়িয়ায় কাব্য কবিতা লিখেছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালের ভক্ত কবিরা শ্রীরাধাকৃষ্ণকে নায়ক নায়িকাভাবে বর্ণনা করে পরকীয়া রসের উপর সাহিত্য রচনা করেছিলেন। অবশ্য যে পঞ্চসখার কথা লিখছি, তাঁরা কেহই শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সাথে জড়িয়ে কাব্য রচনা করেন নাই। ওড়িয়ার জগন্নাথ দাস সেই যুগে সাধারণের বোধগম্য হবে বলে অতি সরলভাবে ও ভাষায় দুরূহ সংস্কৃত

ভাগবত রচনা করেছিলেন। সেই ভাগবত ওড়িষ্যার প্রতিঘরে গ্রামে আগে পঠিত ও পূজিত হ'তো। তারপর শ্রীবলরাম দাস সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সরল ভাষায় পয়ারে রচনা করেছিলেন। ভবিষৎ বক্তা শ্রীঅচ্যুতানন্দ ভবিষ্যতে সংসারে কি ঘটনা ঘটবে সেইগুলি লিখেছিলেন। এবং শ্রীঅনন্ত ও যশোবন্ত দাস ভগবৎ-ভজন বিশেষ করে লিখেছেন। শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁরা ভগবান বলে লিখেছেন। চৈতন্য পূর্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণেরা স্মার্ত্ত মতে শ্রীনারায়ণ শ্রীনৃসিংহাদির পূজো করতো। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই উৎকলে দেবতা এবং শ্রীজগন্নাথদেব তাঁর প্রতীকরূপ বলে সকলে মনে করে।

উড়িষ্যায় রামজন্ম, রামনবমী পালিত হয়। নাচ-যাত্রা, রামলীলা হয়। কিন্তু উত্তর ভারতের এবং দক্ষিণ ভারতের মত এত রামমন্দির কিংবা রামনাম কীর্ত্তন—রাম সীতার পূজার ঘটা এদেশে হয় না। খুব কম লোকের গৃহ-দেবতা সীতারাম, কিন্তু যাদের ঠাকুরবাড়ী বা মঠ বা মন্দির রয়েছে তারা গোপাল, শালগ্রাম, নারায়ণ বা রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি পূজা করে। চৈতন্য এবং গৌড়ীয় গোঁসাইরা উড়িষ্যায় রাধাকৃষ্ণের ধর্ম্ম এবং মানুষের সাধ্য ভগবানকে কান্তরূপে পূজা করা ধ্যান করা প্রবর্ত্তন করবার পরে নিতাই গৌর মূর্ত্তিও বহু বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির সাথে রেখে পূজা করে। উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে হরিকীর্ত্তন, অষ্টপ্রহর, চব্বিশ-প্রহর নামযজ্ঞও হয়ে থাকে। সাধারণতঃ 'হরেকৃষ্ণ হরেরাম নিতাই গৌর রাধেশ্যাম' বলে সকলে কীর্ত্তন করে এবং কেউ কেউ 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ' বলেও নাম কীর্ত্তনাদি করে। যাই হোক কেন্দ্রাপাড়া সাবডিভিশন ও নয়াগড় রাজ্যে রাম দেবতাই মুখ্যভাবে পূজিত হন। জগন্নাথের ধারায় কেন্দ্রাপাড়ায় সিদ্ধ বলদেব জীউ এবং নয়াগড় ষ্টেটে শ্রীরঘুনাথ জীউই প্রসিদ্ধ দেবতারূপে খ্যাত এবং পূজিত হন।

এঁদের বিশাল মন্দির ও বিশাল সম্পত্তি আছে। কতক মফস্বল-গ্রামেও বলদেব বা বলরাজার বড় মন্দির ও মঠাদি আছে। জগৎসিংপুর পলাশোল গ্রামে বলরামের বৃহৎ মন্দির ও সম্পত্তি মঠাদি আছে। সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণই উৎকলের ভগবান বলে পূজা পান। কৃষ্ণ যেন মুখ্য, রাম গৌণ। রাম সাহিত্যও উৎকলের ভাষায় অল্প আছে। উৎকলের আদি কবিসম্রাট উপেন্দ্র ভঞ্জ রাজপুত্র ছিলেন। তিনি বড় কবি হওয়ার বাসনায় রাজগৃহ সম্পত্তি ছেড়ে তাঁর বাড়ী ঘুমুসর থেকে অল্পদূর নয়াগড় রাজ্যে গিয়ে শ্রীরঘুনাথের মন্দিরে সন্ন্যাসব্রত নিয়ে বার বছর রামতারক মন্ত্র জপ করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই তাঁর অমরকাব্য সংগীতে এবং ছন্দমাধ্যমে লেখা "বৈদেহীশ বিলাস" নামক বিচিত্র বিশাল

রামায়ণকাব্যে তিনি শ্রীরামসীতার অনন্ত বিভূতি বর্ণনা করেছেন। তাঁর ইষ্ট-দেবতা শ্রীরামের কৃপায় তিনি উৎকল কি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি হয়েছিলেন। তাঁর মতো আজ পর্য্যন্ত যমক, অনুপ্রাস, আদ্য যমক, প্রান্ত যমক, ছন্দবন্ধ অলংকার দিয়ে কাব্যসুন্দরীকে কোন কবি এমন সাজাইয়া দেখাতে পারেন নাই। তিনি তারক ব্রহ্মনাম জপ করে সিদ্ধিলাভ করে তাঁর কাব্যে ওই নামের মহিমা প্রচার করেছেন। তিনি ছিলেন রামভক্ত। যাই হোক, ওড়িয়ায় বিষ্ণু সহস্রনাম ছাপা ছিল। দুর্গা সহস্রনাম ছাপা হয়েছে—কিন্তু রাম সহস্রনাম কখনো হয়নি। আজ হঠাৎ দেখলাম রামসহস্রনাম বই বেরিয়েছে। কিভাবে লেখক রামনামসহস্র লিখেছেন, তারই পরিচয়ের জন্য আমার এই অবতরণিকা! রামসহস্রনাম বইয়ে যে অনুক্রমণিকা আছে এবং যে নাম আছে, তাকে বাংলা না করে মৌলিক ওড়িয়া ভাষায় লিখে ভক্তজনদের পরিবেশন করছি। ভক্তেরা ক্ষমা করবেন—এই আশায় লেখা।

* * * *

॥ অনুক্রমণিকা ॥

রামনাম রামনাম রামনামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

* * * *

কলিকালে প্রাণীমানে অল্পায়ু হোইবে,
ধর্ম্ম কর্ম ছাড়ি দেই অধর্মে রহিবে।
কামিনী কাঞ্চন প্রতি রহিব লালসা
পর ধন পর নারী প্রতি রখি আশা।
কুকার্য্যে কুপথে নিত্য গমন করিবে
পাপ কর্মে রত হই কাল কাটাইবে।
মোক্ষ মার্গ সুপথকু মনু ভুলি যিবে
গুরুজন মানঙ্কুসে টাপরা করিবে।
মনে মনে পরস্পর হিংসাভাব বহি
কাহারি শীরিকুন্তিলে ন সহিবে কেহি।
দড় বোলাইবে সর্বে মনে বহি গর্ব
মহা পাপ হেব, নাশ হেবে খর্ব খর্ব।
কিন্তু একমাত্র পথ অছি কলিকালে
কহু অছি মন দেই শুনন্তু সকলে।

যে নাম ভজিলে থরে সর্ব সিদ্ধি হুত্র
জীবগণে মুক্তি প্রাপ্ত হুঅই নিশ্চয়ে।
বিষ্ণুকুট মায়ারে যে মুগ্ধ প্রাণীগণ
মহাপাপ ক্ষয় হেব স্মরিলে যে নাম।
ভক্তি করি যে হু নিত্য সে নাম ভজই
নিত্য পাঠ কলে মনস্কামনা পুরই।
সহজে লভয়ে মুক্তি বাস বিষ্ণু পরে
এ ভব বন্ধন কষ্ট নিশ্চয় উদ্ধরে।
এহা শুনি করি শিষ্য যোড়ি কহে কর
শুনাই সে নাম প্রভু নরকু উদ্ধর।
তুম্ভে কৃপা কলে মোর পাপ ভষ্ম হেব
সে নাম স্মরণে ভব মায়ামো তুটিব।
শিষ্যর ভকতি দেখি শ্রীগোবিন্দ দাস
শ্রীরাম সহস্র নাম করিলে প্রকাশ।

*

ওঁ তৎ সৎ

॥ শ্রীরামনাম ভজন ॥

ওঁকার মুরতি রাম রাম রাম রাম
ব্রহ্ম ছায়া জ্যোতি রাম রাম রাম রাম।
ভূর্ভুর্বস্বঃ রাম রাম রাম রাম
কৈবল্য মুকতী রাম রাম রাম রাম।
মুলাধার স্মৃতি রাম রাম রাম রাম
বিরাট মুরতী রাম রাম রাম রাম।
অকার উকার রাম রাম রাম রাম
মকার অক্ষর রাম রাম রাম রাম।
হ্রীং বীজতত্ত্ব রাম রাম রাম রাম
পরম গুপত রাম রাম রাম রাম।
ব্রহ্ম সনাতন রাম রাম রাম রাম
সগুণ নির্গুণ রাম রাম রাম রাম।
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর রাম রাম রাম রাম
দেব মুলাধার রাম রাম রাম রাম।

• দূর্বাদল শ্যাম রাম রাম রাম রাম
ভীম পরাক্রম রাম রাম রাম রাম।
ত্রিভুবন বিজয়ী রাম রাম রাম রাম
দেবেন্দ্র বিজয়ী রাম রাম রাম রাম।

* * *

এমনভাবে রামের বিশেষণ দিয়ে সহস্রনাম রচনা করা হয়েছে। তাতে 'ফলশ্রুতি'র প্রলোভন-ও লেখক খুবই দেখিয়েছেন।

আমার মাননীয় পাঠক পাঠিকারা চাইলে আমি সহস্র নাম ছাপিয়ে দেবো "দেবযানে"। এই নাম লিখিত—কীর্ত্তন পদাবলীর মত, তা বহুসুরে গান হয় এবং কীর্ত্তন হ'তে পারে। ওড়িষ্যার যে কবিগণ শ্রীরামসীতাকে কেন্দ্র করে লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি উপেন্দ্র ভঞ্জ, বিশ্বনাথ খুন্টিয়া, বলরামদাসের কাব্য পয়ার দেখে তাঁদের সীতারাম বিষয়ক কাব্যকবিতার পরিচয় দেবো। তাঁদের কবিত্ব-মাধুরী ও উৎকলের রাম সাহিত্য কিছু কিছু দেবযানের মাধ্যমে ভক্তগণকে উপহার দেবো। ভক্ত পাঠকেরা আনন্দ পাবেন। আমি ভালো বাংলা জানিনা, ভুল হলে ক্ষমা করবেন।

—০—

এমন প্রভুরে ভজলুঁ না মুই

[শ্রীপাঁচুগোপাল হাজরা বি-এ, বি-টি]

(১)

কে গায় ওই—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

ঝারিখণ্ডের জঙ্গলে শুনি কার মধুর সঙ্গীত? লোকগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছেন বৃন্দাবনের উদ্দেশে। শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্য। কোথায় পথ? কিছুই বিচার করিবার শক্তি নাই প্রেমোন্মাদের। ব্যাঘ্র ভল্লুক গজগণ আসিতেছে। প্রভু বলিতেছেন—"কৃষ্ণ কহ"।

নির্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লঞা।
হস্তীব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া॥

একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে—কহ কৃষ্ণ, ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥

—চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ১৭।

প্রভু বনপথে 'অনর্গল' প্রেমদান করিয়া চলিয়াছেন। নামের কৃপায় হিংস্র পশুগণ নিজ নিজ হিংসাভাব পরিত্যাগ করিয়া গলদশ্রু নয়নে মহাপ্রভুর অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গমন করিয়াছিল। সে এক রমণীয় দৃশ্য! মানস নয়নে উপভোগের বস্তু।

প্রভু চলিয়াছেন। বনের পশু বশ হইয়াছে। আর আমি মানুষ? 'এমন প্রভুরে ভজনুঁ না মুই'—আমি এমন প্রভুকে ভজনা করিলাম কৈ? হুঁস নাই আমার। কামিনী কাঞ্চনের মোহে বেহুঁস হইয়া ধর্মবিসর্জ্জন দিয়া কতই না কুকর্ম অপকর্ম করিতেছি। দয়াল প্রভু কাঙ্গাল বেশে জীবের দ্বারে দ্বারে ডাকিয়া ডাকিয়া নাম বিলাইতেছেন—ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম। পরম অভাজন আমি, পরম উপাদেয় নামকে, অসাধন চিন্তামণি নামকে উপেক্ষা করিতেছি। দুরদৃষ্টবশতঃ আমার কঠিন হৃদয় লেশমাত্র দ্রব হইতেছে না। তাঁহার ভববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত লক্ষ্মীসেবিত চরণযুগল ভজনা করিতেছি না তবু ক্ষমাসার প্রভু আমার! আমারই কল্যাণ কামনায় আমার সবদোষ উপেক্ষা করিয়া অদোষদরশী গোরা রায় বলিতেছেন—

"কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্ সব দায় মোর॥

—চৈতন্য ভাগবত, মধ্যঃ ১৩।

আর এক দৃশ্য। আষাঢ় মাস। রথযাত্রা। নীলাচল। কাশীমিশ্রালয়ে শ্রীগম্ভীরামন্দিরে দয়াল প্রভু গৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলীবেষ্টিত। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গগণ আসিয়াছেন মধুর নীলাচলে গৌরহরি দর্শনে। আর নদীয়ায় গৌরবিরহিণী বৈষ্ণবজননী বিষ্ণুপ্রিয়া জগতের কল্যাণ সাধন জন্য পরম পতিকে বিলাইয়া দিয়া গম্ভীরা মধ্যে নর্মসখী কাঞ্চনা অমিতাসঙ্গে ভজনানন্দে ও কঠোর তপশ্চর্য্যায় মগ্না। শচীমাতা সব হারাইয়া একমাত্র পুত্র নিমাইকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া চতুর্দ্দশবর্ষীয়া। পুত্র বিশ্বম্ভর অপূর্ব রূপবান গুণবান ও অল্পবয়সে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। হঠাৎ ঈশ্বরপুরী কি মন্ত্র দিলেন। সেই দিন হইতে গোরাচাঁদ পাগল হইলেন। তাঁহার প্রাণসর্বস্ব

নিমাই সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া নীলাচলে আছেন। শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপে কাষ্ঠ পাষাণও বিগলিত হয়। প্রভু নীলাচলে গণবেষ্টিত—কৃষ্ণকথায় ডুবিয়া আছেন। ত্যাগী চূড়ামণি নবদ্বীপ-গঙ্গা-শচীমাতা-প্রেয়সী ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নদীয়া অন্ধকার করিয়া নামের প্লাবনে ভারত প্লাবিত করিতেছেন।

গঙ্গা যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে॥ —চৈঃ চঃ

নামপ্রেমে উন্মত্ত কৌপীনসর্বস্ব প্রভুটি আমার যে 'ত্যাগ' করিয়াছেন তাহার পরিচয় কি আমরা কোথাও আর পাই? তিনি কেন এরূপ করিলেন? আমার জন্য। আমি জীবাধম, নরপশু। প্রভুর এই চিত্রটি আমার মনে কি অঙ্কিত হয়! অমি কি বিন্দুমাত্র ত্যাগ সহিতে পারি? আমার ত্যাগ কতটুকু! আরামশয্যা, ভোগবিলাসের মধ্যে জীবনযাপনে অভ্যস্ত আমি দিনান্তেও একবার অকপটে তাঁহার নাম লই? "কলার শরলাতে গায়ে ব্যথা লাগে" বলিয়া জগদানন্দ নীলাচলে প্রভুর জন্য 'তুলীগাণ্ডু' প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া প্রভুটি আমার কপট ক্রোধে বলিয়াছিলেন—জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে। পাষাণ শয্যার উপরে সামান্য ছিন্নকদলীপত্র সমষ্টিতে তিনি এতই বিরক্ত। আর আমি আমার বিষয়ের কীট, দুগ্ধফেননিভশয্যা বিহনে নিদ্রা হয় না। তাহাতেও দুঃখ নাই। কিন্তু তিনি যে বলিয়াছেন—

"বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয় সবার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥

হায় প্রভু! "কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত" সব কিছুতেই আমার রুচি। আমি কতদিনে বলিতে পারিব—

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥ —শ্রীঅদ্বৈতের প্রথমস্তব

কতদিনে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিয়া ধন্য হইব? 'কতদিনে হবে সে প্রেম-সঞ্চার'? মহাত্মা শিশিরকুমার, প্রভুপাদ হরিদাস, শ্রীল ভাগবত স্বামীজি মহারাজ, শ্রীল হরিহর মহারাজ ও শ্রীল বাবাজী মহাশয় প্রদর্শিত পথে কবে নিষ্কপটে গাহিব—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কবে প্রার্থনা করিব—

শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে॥

— চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০

(২)

"ডাক দেখি মন ডাকার মতন, কেমন শ্যামা থাকতে পারে"—এই প্রাণ-গলানো মনমাতানো গান কার? ভাগীরথী তটে পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরের পাগল সন্ন্যাসী গাহিতেছেন। জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ গৃহের ছাদে দাঁড়াইয়া অনাগত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—"আয়রে তোরা কে কোথায় আছিস্—আয়। মা, তোর ত্যাগী ভক্তগণকে এনে দে।" ফুল ফুটিয়াছে। মধুকর শীঘ্রই সৌরভের সন্ধান পাইল। গুণ্ গুণ্ গুণ্ রবে নরেন্দ্র, গিরীশ, কেশব, বিজয়, রাখাল, কালী, তারক, বাবুরাম, শরৎ, শশী, লাটু, যোগেন, মাষ্টার প্রমুখ অলিকুল আসিয়া জুটিলেন। পাণিহাটির চিঁড়া মহোৎসব। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে বলিলেন—"সেখানে হরিনামের হাট বাজার বসে। আনন্দ মেলা। তোরা ইয়ং বেঙ্গল কখন ওরূপ দেখিস্ নাই চল্ দেখে আসি।" তথায় কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে একলম্ফে কীর্ত্তনের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই ভাবাবেশে বাহ্যসংজ্ঞা লোপ পাইল। ভাবোল্লাসে দেহ যেন নাই—তিনি যেন একখানি প্রাণময় নৃত্য। ভাবোন্মত্ত ঠাকুরকে দেখিয়া কীর্ত্তন সম্প্রদায় গান ধরিল—

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কেরে।
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে॥

ঠাকুরও নাচেন—তাঁহারাও নাচেন। দেখিতে দেখিতে অযুত কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল "প্রেমদাতা নিতাই এসেছে"॥

এহেন প্রেমময় ঠাকুর বলিয়াছেন—"তাঁহাকে চিন্তা করিলেই হইবে। আর কিছু করার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরের নামে অনুরাগ, বিশ্বাস হওয়া চাই। শরণাগত—শরণাগত। শুধু স্মরণ—মনন। মা, নিষ্কাম অমলা অহৈতুকী শুদ্ধাভক্তি দাও। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন। কৃপা করে শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি দাও। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু।"

শ্রীচৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাগতিক সুখস্পৃহা মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহাই 'আন্তর সন্ন্যাস'। ইহা সাধক

মাত্রেরই অপরিহার্য্য। সন্ন্যাসীপতির নিকট সন্ন্যাসিনী পত্নী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীও আধ্যাত্মিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া জগজ্জননীরূপে পুজিতা হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্য যেমন ষড়ভুজমূর্ত্তি দেখাইয়াছেন সেইরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরও "আমি যুগে যুগে অবতার" "আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন" "যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ" প্রভৃতি ঘোষণা বিভিন্ন সময়ে করিয়া স্বরূপ পরিচয় দিয়াছেন। আবার গুহ্যকথা বলিয়াছেন—"দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই। দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু।" বীরভক্ত গিরীশ যখন বলিয়াছেন "তুমিই পূর্ণব্রহ্ম" তিনি হাসিমুখে বলিয়াছেন—"তুই যা ভাবিস্—তাই।"

হায়! হায়! এমন প্রভুরে ভজলুঁ না মুই। পড়াশুনা, অধ্যাত্মচর্চা, পাণ্ডিত্য, সবই আছে। কিন্তু শ্রীবঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন ঠাকুর বলিয়াছিলেন "দিনরাত ঐ কামিনীকাঞ্চন ভাব তাই তোমায় ঐ সব কথা বেরুচ্ছে।" কাক বড় স্যায়না, বিষ্ঠা খাবার সময় ভাবে সে বড় চতুর, আমিও যে প্রভু তাই! ডাকার মত ডাকা দূরের কথা, লোকদেখানো ডাকারও যে অবসর নাই। বিদ্যার সংসার তো করি না, অবিদ্যার সংসারে ডুবিয়া আছি। পরস্ত্রীকে মনেপ্রাণে 'মা' ডাকিতে পারিলাম কৈ? সত্য কথাই কলির তপস্যা, কিন্তু মিথ্যা ভিন্ন জলগ্রহণ করি না যে। স্বামীজির উদাত্ত আহ্বান যে প্রাণে সাড়া জাগায় না! হে শান্তির পারাবার, শান্তি দাও প্রভু অধমতারণ। 'রামেরুচি' 'নামেরুচি' দাও পরিত্রাতা।

জনমে জনমে প্রভু দেহ এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম॥

(৩)

গৌর গৌর গৌর বল জয় নিত্যানন্দ।
গৌর স্মরণে বড় লভিবে আনন্দ॥
সংসার বিষম রোগে নাম সংকীর্ত্তন।
জেনো তুমি একমাত্র মহারসায়ন॥

—এ কার কণ্ঠস্বর? কে এ প্রাণারাম? গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির নিভৃত পল্লী ডুমুরদহ। সেই পুণ্যতীর্থে আবির্ভূত যে দেবমানব তিনিই আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত করিয়া 'জয়গুরু' জয়ন্তী উড়াইয়া সকলকে বলিতেছেন—"মাভৈঃ। সর্ব ধর্ম সমন্বয় কারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-অভিন্ন-বিগ্রহ নামমূর্ত্তি শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজ আজ নামপ্রেমের বন্যায় ভারত ভাসাইতেছেন। অগণিত ভক্তিগ্রন্থ, নাটক অভিনয়, অপূর্ব ভাষণ নামের মধুর শ্লোকও বিভিন্ন উপায়ে

বলিতেছেন—'নাম কর্‌—কোন ভয় নাই।' এই মাতৃভক্ত চূড়ামণি কৌপীনসর্বস্ব প্রেমময় সন্ন্যাসী সর্বপ্রকার ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া বলিতেছেন—"তুই নামামৃত সাগরে ডুব দিয়ে নির্ভয়ে পরমানন্দে আমার বুকে অবস্থান কর্‌"। আজ 'মানব-দুয়ারে দেবতা ভিখারী' আমার নিকট নাম-যাঞ্চা করিতেছেন। অপরূপ দৃশ্য! আমার জন্য তাঁহার কী ত্যাগ! কী কঠোর সাধনা! স্নেহময়ী জননী, স্নেহের পুত্র কন্যা আত্মীয় বান্ধব কেহই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন না।

এই শীর্ণকায় বিগ্রহটি আমার মত তাপিতের জন্য কী কৃচ্ছ্র সাধনাই না করিতেছেন? নিভৃত শৈলাসনে গুহাভ্যন্তরে কঠোর ব্রতাবলম্বী তিনি কলির জীবের মঙ্গলের জন্য জগৎ কল্যাণের জন্য। এই অর্দ্ধনগ্ন তাপস কাহার জন্য কৃশতনু হইয়াছেন? আমারই জন্য। আমার শান্তির পথ উন্মুক্ত করার জন্যই তাঁহার এত প্রচেষ্টা। তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই—তবু "আপনি আচরি ধর্ম্ম" তিনি জীবশিক্ষা দিতেছেন। আর আমি? আমি তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের জন্য কতটুকু চেষ্টা করিতেছি। নিজের অভ্যুন্নতির জন্য কতখানি বাসনা পোষণ করিতেছি? বিন্দুমাত্র না। হা হতোঽস্মি মন্দভাগ্য! এই আমার দুর্দৈব। এমন প্রভুরে আমি ভজিলাম না। আমার প্রতি শ্রীনামের কৃপা কত কিন্তু "দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ—নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না। রে প্রমত্ত মন, এখনও সময় আছে—যদিও তোর ভাগ্যাকাশের পশ্চিম কোণে আয়ুঃসূর্য্য ডুবু ডুবু তবু তুই ওঠ, জাগ্‌—তাঁর 'নাম' নে, শান্তিলাভ কর্‌। "হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হ'লো পার কর আমারে" বলিতে বলিতে করজোড়ে জীবন সায়াহ্নে প্রার্থনা কর্‌ঃ—

জয় জয় সীতারাম শ্রীওঁকার নাথ।
মোর প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥

—০—

মনোনিবেশ

[শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন—"ময্যেব মন আধৎস্ব ময় বুদ্ধিং নিবেশয়" অর্থাৎ আমাতে মন ধারণ কর এবং আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর। নানা কর্মে ও চিন্তায় মানবের বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল মন সহজে তাঁহাতে নিবিষ্ট হয় না, তাই তিনি আবার বলিলেন—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে" অর্থাৎ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিরোধ করিবে। জড়বস্তু অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি অপেক্ষা সাক্ষিস্বরূপে সকল জীবের অন্তঃকরণে যিনি অবস্থিত আছেন তিনি শ্রেষ্ঠ। এইরূপ বিচার দ্বারা সেই সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের চরণ কমলে মন প্রযুক্ত করিলে, তিনি মানবগণকে সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার নিত্য পরমধামে আশ্রয় দান করেন। যাঁহারা অনন্যমনে একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি সেই ভক্তগণের যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকেন। তিনি পাণ্ডিত্য চান না, ঐশ্বর্য্য চান না, হোম, যাগ ও কীর্ত্তি চান না, চান শুধু মন—নির্ম্মল শুদ্ধ শান্ত মন, যাহাতে কোনরূপ বিষয়বিষ নাই। তিনি আত্মারাম, তাই তাঁহাকে পাইতে হইলে নিষ্কাম ও নিস্পৃহ হইতে হইবে। বিষয় বাসনা লইয়া বনে যাইলেও তাঁহাকে মিলিবে না। পরন্তু বিষয় বাসনা মুক্ত হইয়া গৃহে থাকিলেও তাহা তপোবনতুল্য মোক্ষপ্রদ হয়। তাই সাধক কবি গাহিয়াছিলেন—"মন না রাঙায়ে কি ভুল করিয়ে কাপড় রাঙালি যোগী।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে সংসারে থাকিতে হয় বড় মানুষের ঘরের চাকরাণীর মত। সে যেমন বাবুর ছেলেমেয়েদের কোলে করে, আদর করে, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়, ভালবাসে ও যত্ন করে; কিন্তু মনে মনে জানে তাহারা কেহই তাহার নিজের নয়, তেমনি যে এই সংসারে ভগবানের দাস হইয়া তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত নিরহঙ্কার, নিষ্কাম ও নিরাসক্ত হইয়া থাকিতে পারে, সেই তাঁহার অব্যয় পদ প্রাপ্ত হয়। আর পাঁকালমাছ যেমন পাঁকে থাকিলেও তাহার গাত্রে পাঁক লাগে না, সেইরকম সংসারে থাকিয়াও যাহাতে সাংসারিক আবিলতা স্পর্শ করিতে না পারে, সে বিষয়ে মানবের যত্নবান হওয়া উচিত।

শ্রীভগবানে মন অর্পণ করিলে, তাঁহাকে ভক্তি করিলে, তাঁহার প্রীত্যর্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ও তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার করিলে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া

যায় সন্দেহ নাই। তিনি গীতায় বলিয়াছেন—"মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ" এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটি কাহিনী বর্ণিত হইল। একদা যমুনার উপবনে গোপালগণ গরু চরাইতে চরাইতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রাম ও কৃষ্ণের সমীপে আসিয়া বলিল যে তাহারা ক্ষুধায় অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াছে। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপালগণকে ব্রজবাসী ব্রাহ্মণেরা যেথানে স্বর্গকামনা করিয়া যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেইখানে যাইয়া অন্ন চাহিয়া আনিতে বলিলেন। গোপালগণ যজ্ঞস্থানে যাইয়া বিনীতভাবে রাম কৃষ্ণ ও তাহাদিগের নিমিত্ত অন্ন প্রার্থনা করিলে, ব্রাহ্মণেরা তাহা শুনিয়াও শুনিলেন না। তাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন ও শ্রীকৃষ্ণে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়াছিলেন। গোপালগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বলিলে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করতঃ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট যাইতে বলিলেন। গোপালগণ ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট যাইয়া সবিনয়ে বলিল যে শ্রীকৃষ্ণ ও তাহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, সেইজন্য অন্নের নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট আসিয়াছে। ব্রাহ্মণ পত্নীদিগের মন শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে তাঁহাতেই অর্পিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিয়া অন্ন চাহিতেছেন শুনিয়াই তাঁহারা নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন। তাঁহারা বন্ধু বান্ধব ও পতিদিগেরও নিষেধ মানিলেন না। কারণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে মনোধারণ-যোগে ভগবানের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে দাস্যভক্তি দিয়া কৃতার্থ করতঃ যজ্ঞস্থলে পতিদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ সেই অন্ন গোপালদিগকে দিয়া নিজেও গ্রহণ করিলেন। ভগবৎ কৃপাবশতঃ পত্নীগণকে আনন্দিত ও শান্ত দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের রাম ও কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া বোধ হইল এবং নিজেদের অহঙ্কার ও ভগবদ্ বিমুখতার জন্য অনুতাপ হইল। তাঁহারা অনুতাপানলে নিরভিমান ও বিগতমোহ হইয়া বারংবার শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ব্রজবাসী গোপ গোপী ও বিপ্রপত্নীদিগের শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ মনোনিবেশ ও ভক্তি, সেইরূপভাবে তাঁহাতে চিত্তার্পণ করিলে, সমস্ত গৃহ সংজ্ঞক পাশ ছিন্ন হয় ও পরাগতি লাভ হয়।

—•—

কাঙ্গালের ঠাকুর

[শ্রীযোগেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ ই]

হে দীনদয়াল, দীনে দয়া তব
অসীম অতুলনীয়,
আমা দিয়ে তার পেয়েছি প্রমাণ
হে মোর পরাণ-প্রিয় !

দীন হ'তে দীন করিয়া আমায়
তবে দিলে মোরে ঠাঁই তব পায় ;
এ কী অপূর্ব, এ কী বিস্ময়, এ কী অচিন্তনীয়।

যত দিন কিছু ছিল আপনার তুমি ছিলে দূরে দূরে,
কাঙ্গাল করিয়া হইলে আপন আসিলে হৃদয়-পুরে ;
রাখিলে না কিছু ক্ষোভ মোর মনে,
বাঁধিলে আমারে প্রেমের বাঁধনে,
পূর্ণ করিলে সকল প্রকারে যা' ছিল অপূরণীয়।

তুমি যে ঠাকুর কাঙ্গালের ধন পেয়েছি সে পরিচয়,
কাঙ্গাল করিয়া করিয়াছ মোর অন্তর তোমাময়
ধন সম্পদে পাই নাই যাহা
নির্ধন হ'য়ে পেয়েছি যে তাহা
বুঝেছি তোমার দীনে অনুরাগ অপরিবর্ত্তনীয়।

—•—

মহাভারতের মণিমুক্তা

[শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ রায় বি-এ]

মাতা ঃ

মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতরা।

যাহার জননী বিদ্যমান আছে, সে পুত্র পৌত্রাদি সম্পন্ন এবং শতবর্ষ-বয়স্ক হইলেও আপনাকে বালকের ন্যায় জ্ঞান করে। পুত্র সক্ষম হউক আর অক্ষম হউক, কৃশ হউক আর স্থূল হউক, মাতা সর্বদা তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। মাতা ব্যতীত পুত্রের পোষণ কর্ত্তা আর কেহ নাই। মাতার সমান আপনাদের স্থান, গতি, পরিত্রাণ ও প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। মাতা জঠরে ধারণ করেন বলিয়া ধাত্রী, জন্মের কারণ বলিয়া জননী, অঙ্গাদি পরিপোষণ করেন বলিয়া অম্বা এবং পুত্রে প্রসব করেন বলিয়া বীরসূ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

মাতাকে তৃপ্ত করিলে পৃথিবীকে তৃপ্ত করা হয়।

মাতা, উপবাস যজ্ঞ এবং মঙ্গলানুষ্ঠান দ্বারা গর্ভধারণ করিয়া দশমাস সেই দুর্বহ গর্ভভার বহন করিয়া মনে মনে চিন্তা করেন আমার সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হইয়া বহুদিন জীবিত থাকিবে এবং বলিষ্ঠ ও সমাদৃত হইয়া আমাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী করিবে।

আচার্য অপেক্ষা উপাধ্যায়ের, উপাধ্যায় অপেক্ষা পিতার এবং পিতা ও সমুদয় পৃথিবী অপেক্ষা জননীর গৌরব দশগুণ অধিক—অতএব জননীর তুল্য গুরু আর নাই।

পিতা ঃ

পিতা আকাশ অপেক্ষা গুরুতর।

ভরণ পোষণ ও অধ্যাপনা নিবন্ধন পিতা প্রধান গুরু। পুত্র পিতাকে কেবল প্রীতিদান করে, কিন্তু পিতা পুত্রকে শরীরাদি সমুদয় দেয় বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন। অবিচারিত চিত্তে পিতার আজ্ঞা পালন করিলে পুত্র সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। বৃক্ষ হইতে ফল, পুষ্প নিপতিত হয় কিন্তু পিতা ক্লেশ গ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না।

সমাজ নীতি ঃ

মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ—এই ঋণত্রয় গ্রস্ত হয়।

নকুল কহিলেন—লোকের বুদ্ধিবৃত্তির স্থিরতা নাই। যৎ কালে আমরা বনে

ছিলাম, তৎকালে আমাদের এক প্রকার বুদ্ধি ছিল, যখন অজ্ঞাতবাস করি, তখন একপ্রকার হইয়াছিল। এখন দৃপ্তভাবে রহিয়াছি, বুদ্ধিও ভিন্নপ্রকার হইয়াছে।

পরিচ্ছদসম্পন্ন ব্যক্তি সভা জয় করেন, গোধনসম্পন্ন ব্যক্তি মিষ্টভোজনাভিলাস জয় করেন, যানসম্পন্ন ব্যক্তি পথ জয় করেন এবং শীলসম্পন্ন ব্যক্তি সকলকেই জয় করেন—শীলই প্রধান গুণ।

স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উহাতে সেই স্ত্রী পবিত্রতা লাভ করিতে পারে—স্বামীকেও কোন পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।

অজ্ঞান বশতঃ বা উৎকট পীড়ার সময়ে মদিরা সেবন দোষণীয় নহে।

যে যেরূপ ব্যবহার করিবে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে। যে মায়াবী তাহার সহিত শঠতাচরণ, যে সাধু তাহার সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

একবার যে ব্যক্তি বিরক্ত হইয়াছে, তাহার সন্তোষ উৎপাদন সহজ ব্যাপার নহে। বিরক্ত ব্যক্তিকে আয়ত্ত করিলে তাহার যে প্রীতি জন্মে তাহা কপটতাপূর্ণ সন্দেহ নাই।

কার্য্য সাধন বিষয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বাহু মধ্যম ও অন্যান্য অধম উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বলবানের সহিত শত্রুতা করা দুর্বলের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তুল্য পরাক্রম ব্যক্তির সহিতও সহসা শত্রুতা করা বিধেয় নহে। ঐ প্রকার ব্যক্তির সহিত ক্রমে ক্রমে বল প্রকাশ করা উচিত। বুদ্ধিজীবির সহিত বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া অতি অকর্ত্তব্য। ইহলোকে বুদ্ধি ও বলের তুল্য উৎকৃষ্ট পদার্থ আর নাই।

ধনে ও জ্ঞানে যাহারা আপনার সদৃশ তাহাদের সহিতই বৈবাহিক সম্বন্ধ বা মিত্রতা করা উচিত।

সুপুষ্পিত হইয়াও ফলিত হইবে না, ফলিত হইয়াও দুরারোহ হইবে না ও অপক্ক হইয়া আপনাকে পক্কবৎ প্রদর্শন করিবে না—তাহা হইলে কোন কালেই বিদীর্ণ হইবে না।

অনাহারে প্রাণনাশ উপস্থিত হইলে অভোজ্য বস্তুও ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

লোক চরিত্র ঃ

ঋষি, নদী, মহাত্মাগণের কুল ও স্ত্রীলোকের চরিত্র অবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ।

ব্যক্তি মাত্রেরই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক পৃথক। সকলেই আপনাকে অন্য অপেক্ষা সমধিক বুদ্ধিমান জ্ঞান করিয়া নিতান্ত আত্মবুদ্ধি প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে।

অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, একব্যক্তির বুদ্ধিও সকল সময় সমান থাকে না। বিষম দুঃখ বা অধিক সম্পদের সময় মনুষ্যের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া থাকে।

লোকে নিমিত্ত বশতঃই প্রিয় বা অপ্রিয় হয়। এই জগতে সমুদয় লোকই স্বার্থের বশীভূত—কেহ কাহারও যথার্থ প্রিয়পাত্র নাই। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতীদিগের মধ্যেও প্রীতি নিঃস্বার্থ নহে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যেরূপ ব্যবহার করেন—সাধারণ ব্যক্তিরাও ক্রমশঃ সেইরূপ ব্যবহারে লিপ্ত হয়।

মনুষ্যকে দেখিবামাত্র যে হাস্যমুখে বাক্যালাপ করে সেই সকলের প্রিয় পাত্র হয়।

সাধু ব্যক্তিরা মান্য লোকদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া যাদৃশ সুখী হন, অসাধুগণ সজ্জনগণের অপমান করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে।

দুষ্ট ব্যক্তিরা পরোক্ষে অপরের দোষ কীর্ত্তন, লোকের সদ্‌গুণে অসূয়া প্রদর্শন বা অন্যের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ পূর্বক মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে।

যাহারা মূর্খের ন্যায় বাক্যবাণ প্রয়োগ পূর্বক অন্যের অপবাদ দ্বারা স্বীয় বিদ্যার গৌরব প্রকটিত করিবার চেষ্টা করে—তাহাদিগকে নর-রাক্ষস ও বিদ্যা-বণিক বলিয়া পরিগণিত করা উচিত।

অন্যের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা না করেন—এমন গুণসম্পন্ন লোক, এ জগতে দুর্লভ।

স্বয়ং আপনার গুণকীর্ত্তন করিলে আত্মবিনাশ করা হয়। স্ত্রীলোকগণ সাতিশয় ভোগাভিলাষ পরতন্ত্র—সম্পদ পাইলেই তাহারা শোক পরিত্যাগ করে।

নীতিবাক্য ঃ

যে কার্যের দ্বারা সমুদয় জীবের অভয় লাভ হইয়া থাকে তাহাই ধর্ম। কেবল লোকাচার ধর্ম হইতে পারে না।

ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা। কেবল মাত্র উপবাসকে সাধুগণ তপস্যা বলিয়া গণ্য করেন না। মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতাই পরম তপস্যা—সর্বধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মিথ্যাবাদীর পক্ষে ধর্মাচরণ একপ্রকার চৌর্য্য।

মনে মনে ধর্মাচরণ করিলেও পুণ্য হয়—পাপের অনুষ্ঠান না করা পর্য্যন্ত পাপ হয় না।

—০—

আল্‌বার লীলামৃত

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

শ্রীগোদাদেবী

(পূর্বানুবৃত্তি)

পিতার আদেশে গোদাদেবী ধীরে ধীরে শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে 'জয় রঙ্গনায়কী' 'গোদাদেবীর জয়' শব্দে আকাশ বাতাস কম্পিত হইল। গোদা বিষ্ণুচিত্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পিতাকে প্রণাম পূর্ব্বক অতি সন্তর্পণে শ্রীরঙ্গমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অনন্ত শয্যায় শ্রীরঙ্গনাথ শয়ন করিয়া আছেন, মুখে মৃদু হাসি, গোদা রমণীয়রূপলাবণ্য-মণ্ডিত শ্রীরঙ্গনাথের রূপসুধা নয়নযুগলের দ্বারা পান করিয়া আত্মহারা হইয়া যাইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার চরণে প্রণাম করত শেষতল্পে উঠিয়া পাদমূলে উপবেশন করিলেন। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে রঙ্গনাথের সপ্ত প্রাকারমণ্ডিত শ্রীমন্দির মুখরিত করিয়া 'জয় রঙ্গনাথের জয়' 'জয় গোদাদেবীর জয়'-রব গগন স্পর্শ করিল।

সহসা অলৌকিক জ্যোতিতে রঙ্গনাথের মন্দির উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শুধু জ্যোতি—জ্যোতি, সে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিদর্শনে সকলে নয়ন নিমীলিত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর চাহিয়া দেখিলেন—শ্রীরঙ্গনাথ শেষ শয়নে শায়িত আছেন, গোদাদেবী নাই।

শ্রীরঙ্গনাথ তাঁহাকে আপনার সহিত মিশাইয়া লইলেন, একথা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

বিষ্ণুচিত্ত হর্ষে ও বিষাদে আকুল হইয়া শ্রীরঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রঙ্গনাথ বলিলেন, বিষ্ণুচিত্ত! আজ হইতে তুমি আমার শ্বশুর হইলে, তোমার গোদা আমার হইল। তিনি মাত্র সে কথা শুনিলেন। অর্চ্চকের দ্বারা তীর্থ প্রসাদ ও মালা দিলেন।

বিষ্ণুচিত্ত তাঁহার সাধের জীবন্ত স্বর্ণ-প্রতিমা রঙ্গনাথ সাগরে বিসর্জন করিয়া অসহ-মধুর-বাঞ্ছিত-বেদন লইয়া বল্লভদেবসহ ধন্বিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা বল্লভদেব তাঁহার আদেশ লইয়া চতুরঙ্গবল সহ স্বীয় রাজ্যে গমন করিলেন।

বিষ্ণুচিত্ত পূর্ব্ববৎ সুগন্ধ তুলসী মালা ও পুষ্পমালার দ্বারা বটপত্রশায়ী নারায়ণের সেবা করিতে লাগিলেন। গোপীভাবে শ্রীগোবিন্দের আন্তরসেবায়

সতত নিমগ্ন থাকিতেন। মধুরভাবে মধুররস রসিকের সেবা করিতে করিতে অবশিষ্ট জীবন আনন্দে অতিবাহিত করিয়া পরমধামে গমন করিলেন।

গোদা দেবীর শুভমিলনের পর হইতে সমস্ত দিব্যদেশে শ্রীবিগ্রহের সহিত গোদা দেবীর শিলা বা লৌহময়ী প্রতিকৃতি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়।

—০—

(১১)

॥ শ্রীপরকাল, তিরুমঙ্গাই আলবার নীলম্ ॥

বৃশ্চিকে কৃত্তিকাজাতং চতুষ্কবি শিখামণিম্।
ষট্ প্রবন্ধ কৃতং শার্ঙ্গমূর্ত্তিং কলিহমাশ্রয়ে॥

চোলদেশে কলাপূর্ণ পট্টন্ (তিরিকুড়িয়ামুর) নামক একটী সর্ব্বজন মনোহর নগর আছে। সেই নগরে কোন শূদ্রের গৃহে শ্রীভগবানের শার্ঙ্গধনুর অবতার পরকাল কার্ত্তিক মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।

সমজায়ত তত্র পাদজ প্রমুখে কশ্চননীলনামকঃ।
পুরুষোত্তম কার্ম্মুকাংশজঃ স্ফুরিতে কার্ত্তিককৃত্তিকোড়ুনি ॥৩৪॥

—প্রপন্নামৃত ৯৮ অঃ

এই পরকালই সত্যযুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য কর্দ্দম ঋষিরূপে, ত্রেতায় ক্ষত্রিয় কুলে উপরিচর বসু নামে, দ্বাপরে বৈশ্যকুলে শঙ্খপাল নামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি আছে।

ইঁহার পিতা রাজার সেনাপতি ছিলেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তিনি পরম আনন্দিত চিত্তে নীলা নামকরণ করাইলেন। শ্যামবর্ণ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ বালকটী দর্শকমাত্রেরই মনোহরণ করিতেন। তিনি বালসূর্য্যের ন্যায় দিনদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। পিতা উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। নীলা অল্পকালের মধ্যে শস্ত্র-শাস্ত্রনিপুণ হইয়া উঠিলে তাঁহার গুণের কথা কণ্ঠে কণ্ঠে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। চোলরাজ ইঁহাকে সেনাপতির পদ দান করিলে ইনি অপূর্ব্ব বলবীর্য্য সমরকৌশলের দ্বারা চোলরাজের শত্রু কুল সংহার করিয়া দিগন্তব্যাপী যশঃ লাভ করিলেন। চোল নরপতি ইঁহার অমানুষিক বীরত্বে পরম সন্তুষ্ট হইয়া একটী প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার দান করেন। তিনি পুত্র নির্ব্বিশেষে তথাকার প্রজাগণ পালন করিয়া চোল রাজের প্রিয় পাত্র হন। পরকাল বীর হইলেও আপনার প্রকৃত শত্রু কামাদিকে জয় করিতে পারেন নাই। তিনি নৃত্যগীত আমোদপ্রমোদ বারনারী ও দুশ্চরিত্র সঙ্গীগণ সহ আনন্দে

কাল যাপন করিতেন। অমূল্য চরিত্ররত্নকে তিনি রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, এ কথা রাজার অজ্ঞাত ছিল না। চোলনরেশ তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যে মুগ্ধ ছিলেন, ওদিকে লক্ষ্য করিতেন না।

তিরুভানি অঞ্চলে নাগপুর "তিরুভেল্লাকুলাম" বলিয়া একটী অতি পবিত্র তীর্থ আছে। তথায় ফুল্লকমল সুশোভিত শ্বেতহ্রদ নামক এক সরোবর ও তাহার তীরে বিষ্ণু মন্দির ছিল।

মানস সরোবরের ন্যায় পঙ্কজাবৃত সেই জলাশয়ে স্বর্গ হইতে অপ্সরাগণ জলক্রীড়া করিতে আসিতেন। কোনদিন কমলকুসুম চয়নরতা জনৈকা সঙ্গিনীকে না লইয়া তাঁহারা স্বর্গে গমন করেন। তখন সেই স্বর্গবাসিনী আপনার দেহরূপ পরিত্যাগ করিয়া মানবদেহ ধারণ পূর্ব্বক তথায় বিচরণ করিতে থাকেন, এমন সময়ে নাগপুর হইতে কোন বৃদ্ধ বৈষ্ণব চিকিৎসক যদৃচ্ছাক্রমে সেইস্থলে উপস্থিত হইয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'মা তুমি কে? একাকিনী এখানে কেন রহিয়াছ—?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমার সহিত যাঁহারা আসিয়াছিলেন আমাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। আমার পিতা মাতা কেহ নাই। সেইজন্য একাকিনী বেড়াইতেছি, আপনি কি আমায় আশ্রয় দিবেন?' তাহা শুনিয়া বৈদ্যবর আনন্দের সহিত বলিলেন, 'মা তুমি যদি আমার সঙ্গে গমন কর তাহা হইলে আমি তোমায় কন্যার ন্যায় পালন করিব। আমার কন্যা পুত্র কিছুই নাই, তুমি আমার সঙ্গে এস—তোমাকে পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।'

অনন্তর সেই কন্যা তাঁহার সহিত নাগপুরে গমন করিলে বৈদ্যরাজ দেব-কন্যাটীকে পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরমা সুন্দরী কন্যাটীকে পাইয়া চিকিৎসকপত্নী আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

কবিরাজ মহাশয় তাহার 'কুমুদবল্লী' নামকরণ করিলেন। তাঁহারা স্বীয় কন্যার ন্যায় দেববালাকে পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কুমুদবল্লীর যৌবনকাল উপস্থিত হইল। অলৌকিক রূপলাবণ্যদর্শনে ইনি মানুষী নহেন—দেবী, একথা সকলেই মনে করিত; তাঁহার রূপের খ্যাতি দেশদেশান্তরের লোকেরা বর্ণনা করিতে লাগিল। পরকালের কোন চর সেইকথা শুনিয়া তাহার নিকট কুমুদ-বল্লীর কথা বলিল। রূপপিপাসু সেনাপতি পরকাল রাজকার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া সত্বর নাগপুরে বৈদ্যরাজের গৃহে উপস্থিত হইয়া আপনার পরিচয় দান করিলে চিকিৎসক মহাশয় সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরকাল কুমুদবল্লীকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'আপনার তো পুত্র কন্যা কিছু হয় নাই, এ কন্যাটী কোথায় পাইলেন?' তখন বৈদ্যবর কুমুদবল্লীকে কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা বলিলেন। 'কন্যাটী বয়ঃ-প্রাপ্তা হইয়াছে অধুনা ইহার বিবাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—এই অজ্ঞাত-কুলশীলা কন্যার পাত্রই বা কোথায় পাইব, তজ্জন্য চিন্তিত হইয়াছি।'

পরকাল তাহা শুনিয়া কহিলেন, 'আমার কথা তো জানেন? আমি অবিবাহিত—একটী প্রদেশের শাসন কর্ত্তা, আপনি আমাকে কন্যাটী দান করুন।'

বৈদ্যবর আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—'আপনার মত সুপাত্র লাভ করা ভাগ্যের কথা। মেয়েটী বড় হইয়াছে, ইহাকে একবার বলিয়া তার মত জিজ্ঞাসা করি'। তিনি পরকালের প্রস্তাব কুমুদবল্লীর কাছে উথাপন করিলে দেববালা তদুত্তরে বলেন—'আমি পঞ্চ সংস্কারে সংস্কৃত বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না।'

তাহা শুনিয়া, 'উত্তম কথা' বলিয়া পরকাল নাগপুর হইতে শ্রীনিবাসপুরে এক দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া, কাতরভাবে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে তাপপুণ্ড্র নাম মন্ত্র যোগাদি পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দিলেন। পরকাল উর্দ্ধপুণ্ড্র, শঙ্খচক্রাদি ধারণ পূর্ব্বক বৈদ্যগৃহে আসিয়া বলিলেন—'এই দেখুন আমি বৈষ্ণব, দীক্ষা লইয়াছি। কুমুদবল্লীকে এইবার দান করুন'। কুমুদবল্লী বলিলেন, 'আমার অপর একটী কথা যদি আপনি পালন করিতে পারেন তাহা হইলে তবে আপনাকে বরণ করিব।'

পরকাল কহিলেন, 'কি কথা বল। অমি অবশ্যই তাহা রক্ষা করিব।' কুমুদ-বল্লী বলিল, 'একবৎসরকাল স্বয়ং উপবাসী থাকিয়া আপনাকে একহাজার আটটী করিয়া বৈষ্ণব ভোজন করাইতে হইবে। বৈষ্ণবগণের ভোজনান্তে তাঁহাদের পাদোদক পান করত প্রসাদ গ্রহণ করিতে হইবে। একবৎসর কাল ঐরূপ বৈষ্ণব ভোজন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার পর আমি আপনাকে বরমাল্য দান করিব।' পরকাল বলিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এক বৎসরকাল তোমার কথামত নিত্য ১০০৮ টী বৈষ্ণব ভোজন করাইব। বৈষ্ণব ভোজন না করাইয়া কোনদিন জলগ্রহণ করিব না। আমার কথায় বিশ্বাস কর। শুভ বিবাহ হইয়া যাক্। তুমি এ বিষয়ে কোনরূপ সংশয় করিও না।' কুমুদবল্লী তাঁহার দৃঢ়তা দর্শনে বিবাহে সম্মতা হইলেন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ

৬ই শ্রাবণ শ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে হেমাঙ্গিনী-মঠে (মেমারী, বর্দ্ধমান) অষ্টপ্রহর ব্যাপী নামযজ্ঞ, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

* * * *

শ্রীকাশী-রামাশ্রমে গুরুপূর্ণিমায় উদয়াস্ত নামযজ্ঞ ও পূজাদি সম্পন্ন হয়।

* * * *

শ্রীদাশরথি মঠের (কলাপুকুর, বর্দ্ধমান) সেবকগণ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বর্দ্ধমান জেলার কয়েকখানি গ্রামে নাম প্রচার করেন।

* * * *

শালকিয়া (হাওড়া) জয়গুরু সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের বাসভবনে ও নির্দ্ধারিত দিবসে নিয়মিত নাম কীর্তন হইতেছে—শ্রীপঞ্চানন রায়—প্রতি মাসের একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা; শ্রীবসন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়—প্রতি বৃহস্পতিবার; শ্রীপার্ব্বতীচরণ সরকার—শুক্রবার; শ্রীশীতাংশু কুমার দত্ত—প্রতি শনিবার; শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়—রবিবার; শ্রীরাখালদাস মুখোপাধ্যায়—প্রতি সংক্রান্তি; শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতি মাসের ১লা।

* * * *

শ্রীরমানন্দ কিঙ্কর এবং শ্রীবৃন্দাবন কিঙ্কর জ্যৈষ্ঠমাসে বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু গ্রামে নাম প্রচার করেন। ইঁহাদের প্রচার-তালিকায় প্রায় চল্লিশ খানি গ্রামের নাম আছে।

* * * *

জ্যৈষ্ঠের তৃতীয় সপ্তাহে বেতালন-(বাঁকুড়া) গ্রামে শ্রীতারাপদ পণ্ডিতের বাসভবনে চব্বিশ প্রহর ব্যাপী শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ হয়।

* * * *

১৩৬২-ফাল্গুন হইতে প্রতি একাদশীতে কোতুলপুর (বাঁকুড়া) গ্রামে শ্রীবিনয় কৃষ্ণ বসুর বাটীতে হরিবাসর অনুষ্ঠিত হইতেছে। গুরুপূর্ণিমায় শ্রীযুক্ত বসুর বাসভবনে অষ্টপ্রহর ব্যাপী শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে।
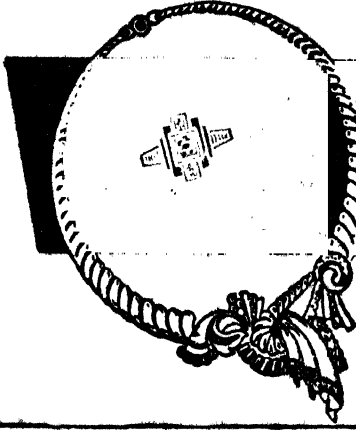
—০—

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ,
দ্বিতীয় সংখ্যা

আশ্বিন
১৩৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

—০—

দুর্গা পূজা

[শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়]

আধুনিক পণ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে বেদে দুর্গার নাম পাওয়া যায় না এজন্য দুর্গাপূজা অনার্য্যদের কাছে লওয়া হইয়াছে।* ইহা যে অনার্য্যদের কাছে লওয়া হইয়াছে তাহার কোনও প্রমাণ দেওয়া তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন না। না হয় মানিয়া লইলাম যে বেদে দুর্গার নাম নাই। তাহা হইলেও ইহাও ত হইতে পারে যে আর্য্য ভক্তগণ তাঁহাদের সাধনার জোরে দুর্গাদেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন। অথবা তাঁহারা এইরূপ দেবীর কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা প্রচার করিলেন। অনার্য্যগণ দুর্গার পূজা করিত এবং আর্য্যগণ তাহাদিগের নিকট এই পূজা গ্রহণ করিয়াছিল এরূপ কোনও প্রমাণ কেহ দেন নাই।

* কিছুদিন পূর্বে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় Statesman-এ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে দুর্গাপূজা অনার্য্যদের নিকট গৃহীত।

দুর্গাপূজার মূলতত্ত্ব হইতেছে চরম তত্ত্বকে স্ত্রীরূপে কল্পনা। ঋগ্বেদ সংহিতা ১০।১২৫ সূক্তে (দেবী সূক্ত) এবং ১০।১২৭ সূক্তে (রাত্রি সূক্তে) এই কল্পনা পাওয়া যায়। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ নামক রমণী দেবী সূক্তের ঋষি। অর্থাৎ দেবী সূক্ত তাঁহার নিকট প্রকাশ হইয়াছিল। তাঁহার যখন ব্রহ্মজ্ঞান হইল তখন তিনি দেখিলেন যে তিনিই রুদ্র বসু আদিত্য প্রভৃতিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনি যজমানের দ্বারা যজ্ঞ করাইতেছেন, যজ্ঞের ফলও তিনি দান করিতেছেন, তিনিই জগতের ঈশ্বরী, তাঁহার শক্তিতে লোকে অন্নভোজন করে, দর্শন করে, শ্রবণ করে, প্রাণ ধারণ করে, ঈশ্বরের শক্তিকে যাহারা মানে না তাহাদের অনিষ্ট হয়, এই শক্তি যাহাকে রক্ষা করেন তাহার শক্তি বাড়িয়া যায়, সে ঋষি হইতে পারে, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা হইতে পারে, ব্রহ্মের শক্তিতে রুদ্রের ধনুতে শরযোজনা হয় এবং ঐ শরদ্বারা ব্রাহ্মণদের দ্বেষ্টাগণ বিনষ্ট হন। ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর ঋষি দেখিলেন যে ঈশ্বরের যে শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি হইতেছে তিনি তাহার সহিত অভিন্ন। রাত্রি সূক্তে ব্রহ্মের মায়া শক্তির সহিত রাত্রিকে অভিন্নভাবে দর্শন করা হইয়াছে, এই শক্তির দ্বারা অন্ধকার অপসারিত হইতেছে, জগৎ সৃষ্টি ও ধারণ হইতেছে।

দুর্গাপূজা বা শক্তিপূজার মূল কথা হইতেছে ব্রহ্মকে পুরুষরূপে কল্পনা এবং ব্রহ্মের শক্তিকে রমণীরূপে কল্পনা। "শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ" শক্তি ও শক্তিমানে কোনও ভেদ নাই। এজন্য ব্রহ্মের শক্তি (যাঁহাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে) তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এইভাবে স্ত্রীমূর্ত্তিকে সর্বশক্তিমান্ পরব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়া শক্তি পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ বৈদিক কল্পনা। অনার্য্যদের নিকট হইতে এই কল্পনা গ্রহণ করা হইলে ইহা হিন্দুর বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মগ্রন্থে এত ব্যাপক ভাবে দেখা যাইত না। মাত্র দুই চারিস্থলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইত।

শক্তি পূজার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য বা চণ্ডীগ্রন্থে। বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গীতা যেমন মহাভারতের অন্তর্গত, শাক্তদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ চণ্ডীও সেইরূপ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭০০, চণ্ডীরও শ্লোক সংখ্যা ৭০০। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতি ঋষি প্রণীত গ্রন্থ সকলের উদ্দেশ্যই বৈদিক ধর্ম প্রচার করা। সকলে বেদ পড়িতে পারে না, পড়িলেও বুঝিতে পারে না, এজন্য ঋষিরা সকলকে বৈদিক ধর্ম বুঝাইবার জন্য এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ব্যাসদেব মহাভারতে বলিয়াছেন "বেদের অর্থ ভালভাবে বুঝিবার জন্য ইতিহাস (রামায়ণ, মহাভারত)

এবং পুরাণ পড়িবে। যে ব্যক্তি এই সকল গ্রন্থ না পড়িয়া বেদের ব্যাখ্যা করে সে সাধারণতঃ বেদের ভুল ব্যাখ্যা করে এজন্য বেদ এরূপ ব্যক্তিকে ভয় করেন।"

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্প শ্রুতাদ্বেদঃ মাময়ং প্রহরেদিতি ॥

—মহাভারত ১ ১।২৬৭

শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝানে না যায়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥"

-- শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

সুতরাং মার্কণ্ডেয় পুরাণে শক্তিপূজার কথা যাহা লেখা আছে তাহা বেদের তাৎপর্য্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। চণ্ডীতে কোথাও এরূপ কোনও কথা নাই যাহা হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে শক্তিপূজার উৎপত্তি প্রথমে অনার্য্যদের মধ্যে হইয়াছিল। অপর পক্ষে ইহা যে বেদমূলক তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। চণ্ডীকে ঋগ্‌বেদ যজুর্বেদ ও সামবেদের শব্দরাশির সহিত অভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্‌যজুষাং নিধানম্।
উদ্‌গীতরম্য পদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্ ॥

চণ্ডীর উৎপত্তি দেবতাদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য—

'দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থম্ আবির্ভবতি'।

দেবগণ আর্য্যদের রক্ষক, অনার্য্য অসুরদের আক্রমণ হইতে দেবগণ আর্য্যদিগকে রক্ষা করেন। প্রথম মাহাত্ম্যে দেখা যায় বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মাকে মধু ও কৈটভ বধ করিতে চেষ্টা করে। চণ্ডী মধু ও কৈটভবধের সহায়তা করেন। মধু কৈটভকে অনার্য্যদের প্রতীক বলা যায়। মধ্যম ও উত্তম চরিত্রে দেবাসুর যুদ্ধে চণ্ডী দেবতাদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া অসুর সংহার করেন। দেবাসুর যুদ্ধকে আর্য্য ও অনার্য্যদের যুদ্ধ মনে করা যায়। সুতরাং সর্বত্রই চণ্ডী অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহাকে অসুরদের দ্বারা পূজিত মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সমগ্র বৈদিক দেবতার শক্তি সমূহের মিলিতরূপ যিনি তাঁহাকে অনার্য্য দেবতা কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভুল। চণ্ডী সকল শাস্ত্রের সার বিদিত আছেন,—

'মেধাসি দেবি বিদিতাখিল শাস্ত্রসারা'

শাস্ত্রের মধ্যে বেদই প্রধান, অন্য শাস্ত্রে বেদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে বলিয়াই

তাহাদের মহত্ত্ব। চণ্ডীকে দেবতারাই সর্বদা পূজা করিতেছে কোথাও অসুরগণ তাঁহাকে পূজা করিতেছে ইহা দেখা যায় না। যদিও কোথাও দেখা যাইত যে অসুরগণ চণ্ডীকে পূজা করিতেছে তাহা হইলে এরূপ বলা সম্ভব হইত যে ইনি প্রথমে অনার্য্যদের দেবতা ছিলেন, পরে আর্য্যগণ ইঁহাকে পূজা করেন। উপনিষদে ব্রহ্মের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—যাহা হইতে সকল প্রাণীর উৎপত্তি হয়, যিনি সকল প্রাণীকে ধারণ করেন, প্রলয়ের সময় সকল প্রাণী যাহাতে বিলীন হয়।

যতো বা ইমাণি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি
জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি।

চণ্ডী গ্রন্থে চণ্ডীর স্বরূপও এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে—

ত্বয়ৈতৎ ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎ স্যন্তেচ সর্বদা॥

—চণ্ডী ১।১।৭৫,৭৬।

এইভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ বৈদিক ধর্ম ভিন্ন অন্য কোথাও করা হয় নাই। সুতরাং চণ্ডী যে বৈদিক কল্পনা তাহাতে সন্দেহ নাই।

নিশুম্ভ বধের পর শুম্ভ বলিয়াছিল, "চণ্ডি, তুমি অন্য দেবতার বল লইয়া যুদ্ধ করিতেছ। তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।" তখন চণ্ডী বলিলেন, "জগতে আমি একাই আছি। আমার দ্বিতীয় কেহ নাই। এই সকল দেবী আমার বিভূতি। দেখ উহারা আমার দেহেই প্রবেশ করিবে।" এই অদ্বৈতবাদ তত্ত্ব বৈদিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনও ধর্মে নাই। চণ্ডী গ্রন্থ গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বৈদিক ভাবে পরিপূর্ণ। ইঁহাকে অবৈদিক বা অনার্য্য দেবতা কল্পনা করা ভুল।

কালী রক্তবীজের রক্ত পান করিয়াছিলেন। এই কথা অনেকে বীভৎস অনার্য্য কল্পনা মনে করে। Hronzy তাহার Ancient History of Asia Minor, India and Crete গ্রন্থে লিখিয়াছে "Durga the bloodthirsty wife of Siva". কিন্তু দুর্গা যদি রক্ত পিপাসু হইতেন তাহা হইলে দেবতাও অসুর সকলের রক্ত পান করিতেন। অসুরের রক্ত পানের অর্থ এই যে আসুরিক বা মন্দ প্রবৃত্তিকে কালী নিজের মধ্যে আহুতি দিলেন। এই ভাবেই আসুরিক প্রবৃত্তির একান্ত বিনাশ সম্ভব হয়। নচেৎ অসুরকে বধ করিলে তাহার আত্মা নূতন দেহ গ্রহণ করিয়া আসুরিক কার্য্য করিতে থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের চিন্তা করা উচিত যে যখন এই কালীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়াই রামকৃষ্ণ পরমহংস সিদ্ধি

লাভ করিয়াছিলেন তখন কালীমূর্ত্তি মন্দ হইতে পারে না। কিন্তু তাহারা ইহা বিবেচনা করে না। হিন্দু ধর্ম্মকে জঘন্য প্রতিপাদন করিতে পারিলে তাহারা উল্লসিত হইয়া উঠে। যাহারা বর্ত্তমান ভারতীয় সভ্যতাই বুঝিতে পারে না তাহারা পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বের সভ্যতা কিরূপে বুঝিবে? দুঃখের বিষয় আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শিষ্য হইয়া সর্বদা গুরুর বাক্য প্রচার করিতে তৎপর।

—০—

ক্ষেপার ঝুলি

॥ সহজ সাধনা ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

ক্ষেপা গঙ্গার ধারে 'রাম রাম রাম' ক'রে বেড়াচ্ছে এমন সময় রামদাস এসে বল্‌লে ও ক্ষেপা বাবা, সহজে কি করে ভগবানকে পাওয়া যায় বলতে পারো—?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম প্রণাম প্রণাম—কেবল প্রণাম করতে পারলে আর কিছু করতে হয়না, শ্রীভগবান্ গীতায় বলেছেন 'মাং নমস্কুরু।' রাম রাম রাম।

রাম। শাস্ত্রে প্রণামের কথা আছে? প্রাণামের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়—শাস্ত্র বলেছেন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম! নিশ্চয়ই—

একোঽপি কৃষ্ণে সকৃৎ প্রণামী
দশাশ্বমেধী নচ যাতি তুল্যম্।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম
কৃষ্ণ প্রণামী ন পুনর্ভবায়॥ —পাণ্ডবগীতা।

—একবার যে কৃষ্ণকে প্রণাম করে দশাশ্বমেধকারী তার তুল্য হয় না। দশাশ্বমেধী পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, কৃষ্ণকে প্রণামকারী আর জন্মান না। রাম রাম সীতারাম।

রাম। এ কি বাড়ান কথা নয়?

ক্ষেপা। না, রাম রাম সীতারাম! আরও শোন, নমস্কার করা তো

দূরের কথা, যে শ্রদ্ধাসহকারে 'নমঃ' এই শব্দটী বলে সে যদি কুকুরভোজী চণ্ডালও হয়, তাহ'লেও তার অক্ষয় লোক লাভ হয়, এ শ্রীভগবানের কথা—

নম ইত্যেব যো ব্রূয়ান্ মদ্ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তস্যাক্ষয়ো ভবেল্লোকঃ শ্বপাকস্যাপি নারদ॥ — অনুস্মৃতি

রাম রাম সীতারাম রাম রাম রাম। আরও শোন, রাম রাম!

নমস্কার স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ব্ব যজ্ঞেষু চোত্তমঃ।
নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ॥ —নারসিংহে

রাম রাম! নমস্কার সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে উত্তম যজ্ঞ, একটীমাত্র নমস্কারের দ্বারা মানব পবিত্র হয়ে হরিলোকে গমন করে। রাম রাম সীতারাম।

রাম। একটী প্রণামে মানুষ পবিত্র হয় একথা যে আমি বিশ্বাস কর্‌তে পারছিনা ক্ষেপা বাবা!

ক্ষেপা। রাম রাম! সকল শাস্ত্রে ঋষিরা একথা বলেছেন, তুমি যদি বিশ্বাস করতে না পারো সীতারাম, তোমার দুর্ভাগ্য! রাম রাম রাম সীতারাম। আচ্ছা শাস্ত্রের কথা শোনো—

দণ্ডপ্রণামং কুরুতে বিষ্ণবে ভক্তিভাবিতঃ।
রেণু সংখ্যং বসেৎ স্বর্গে মন্বন্তরং শতং নরঃ॥ —স্কান্দে

—যে মানব ভক্তিভাবে বিষ্ণুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন তিনি তাঁর গায়ে যত ধুলো লাগে তত সংখ্যক শত মন্বন্তর স্বর্গে বাস করেন। রাম রাম।

রাম। যদি কেউ লোক দেখিয়ে প্রণাম করে?

ক্ষেপা। রাম রাম জয় জয় রাম।

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতো শার্ঙ্গধন্বনে।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥ — স্কান্দে

—শঠতা পূর্ব্বক-ও যে শার্ঙ্গধনুধারী হরিকে প্রণাম করে, তার শতজন্মের সঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। রাম রাম সীতারাম। জয় জয় রাম সীতারাম।

রাম। মহাপাপী যদি প্রণাম করে?

ক্ষেপা। বিষ্ণোর্দণ্ড প্রণামার্থং ভক্তেন পততাভুবি।
পতিতং পাতকং কৃৎস্নং নোত্তিষ্ঠতি পুনঃ সহ॥
— হরিভক্তি সুধোদয়ে

—ভক্ত ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর্‌বার জন্য যখন মাটীতে পড়েন, তাঁর সঙ্গে তাঁর সমস্ত পাতক মাটীতে পড়ে যায়, তিনি উঠেন, পাতক আর উঠেনা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

রাম। বড় আশ্চর্য্য কথা! শঠতা করে পাপী ভগবানকে নমস্কার করলেও তার পাপ দূর হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। তোমার আমার কথা নয়, শাস্ত্রের কথা!

শাঠ্যেনাপি নমস্কারং প্রযুঞ্জং চক্রপাণিনে।
সপ্তজন্মার্জ্জিতং পাপং গচ্ছত্যাশু ন সংশয়ঃ॥ —রেবা খণ্ডে

—শঠতা করে চক্রধারী ঠাকুরটীকে প্রণাম করলে সপ্তজন্মার্জিত পাপ সত্বর নষ্ট হয়, এতে কোন সংশয় নেই। রাম রাম সীতারাম। আমার চক্রধারীটী প্রণামে বড় সন্তুষ্ট হন্।

পূজায়াং প্রীয়তে রুদ্রো জপ হোমৈর্দিবাকরঃ।
শঙ্খচক্রগদাপাণি প্রণিপাতেন তুষ্যতি॥ —রেবা খণ্ডে

—রুদ্র পূজার দ্বারা প্রীত হন, জপহোমের দ্বারা দিবাকর তুষ্ট হন, আর শঙ্খচক্র-গদাধারী ঠাকুরটী প্রণিপাতের দ্বারাই পরম পরিতুষ্ট হন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম। আরো শুনবে সীতারাম?

রাম। খুব শুনবো। বল—

ক্ষেপা। রাম রাম জয় রাম।

যদন্য দেবতার্চ্চায়াঃ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতেন তৎ ফলং লভতে হরেঃ॥ —রেবা খণ্ডে

—মানব অন্য দেবতার পূজা করে যে ফল পায়, হরিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর্‌লে সেই ফল লাভ করে। রাম রাম।

রেণুগুণ্ঠিত গাত্রস্য যাবন্তোঽস্য রজঃ কণাঃ।
তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥ —রেবা খণ্ডে

—দণ্ডবৎ-প্রণাম কালে গায়ে যতগুলি ধূলি কণা লেগে থাকে তত সহস্রবৎসর-প্রণাম কারী বিষ্ণুলোকে পূজিত হন। রাম রাম সীতারাম।

রাম। প্রণামের মাহাত্ম্য শুনে প্রাণে আশার সঞ্চার হচ্ছে, আর কিছু করতে না পারি প্রণাম করেই কৃতার্থ হব।

ক্ষেপা। রাম রাম, তাতে আর সন্দেহ আছে!

কৃত্বাপি বহুশো পাপং নরো মোহসমন্বিতঃ।
ন যাতি নরকং ঘোরং নত্বাপাপ হরং হরিম্॥

—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে

—মোহান্ধ মানব বহু বহু পাপ করেও পাপহারী হরিকে প্রণাম করত ঘোর নরকে যায় না। রাম রাম সীতারাম। রাম রাম।

তস্মাদ্ যো বাসুদেবায় প্রণামং কুরুতে নরঃ।
স যাতি ধ্রুব সালোক্যং ধ্রুবত্বং তস্যতৎ তথা॥

— লিঙ্গ পুরাণে ৬১ অঃ

—অতএব যে মানব বাসুদেবকে প্রণাম করে সে ধ্রুব সালোক্য লাভ করে থাকে, তার ধ্রুবত্ব প্রাপ্তি হয়। রাম রাম রাম রাম।

ভূমৌ নিপত্য যঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণেঽষ্টাঙ্গনতিং সুধীঃ।
সহস্রজন্মজং পাপং ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাপ্নুয়াৎ॥ — তন্ত্রসারে

—যে সুধীব্যক্তি ভূমিতে পতিত হয়ে কৃষ্ণকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন তিনি সহস্র জন্মজাত পাপ হতে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করে থাকেন। রাম রাম সীতারাম।

রাম। এমন সহজ সাধনা আর শুনিনি। আমার ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে সকলকে বলিগে, ওরে তোরা প্রণাম কর, তাহলেই তরে যাবি। ক্ষেপাবাবা, তুমি প্রণামের কথা আরও বল।

ক্ষেপা। রাম রাম জয় জয় রাম। যমরাজ দূতগণকে বলেছিলেন—

হরি মমর গণার্চ্চিতাঙ্ঘ্রি পদ্মং
প্রণমতি যঃ পরমার্থতো।
তমপগত সমস্ত পাপবন্ধং
ব্রজপরিহ্নত্য স যথাগ্নি মাজ্যসিক্তম্॥ —(যমগীতা)

—যে ব্যক্তি একান্তচিত্তে অমরগণ-পরিপূজিতপাদপদ্ম হরিকে প্রণাম করে, হে দূত, তার সমস্ত পাপবন্ধ বিমোচিত হয়, আজ্যসিক্ত অগ্নির ন্যায় মনে করে তুমি তাকে পরিত্যাগ কর্‌বে। রাম রাম রাম রাম জয় রাম।

রাম। আচ্ছা ক্ষেপা বাবা, গুরুজনকে প্রণাম করলে কি হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম।

উর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভি বাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে॥
অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি তস্য বর্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশোবলম্॥ মনু ২।১২০।১২১।

—জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সমুখে এলে যুবকের প্রাণ উর্দ্ধে উৎক্রমণ করে, প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনের দ্বারা পুনরায় স্বস্থান প্রাপ্ত হয়। নিত্য বৃদ্ধসেবিরও প্রণামকারীর আয়ু বিদ্যা যশ বল এই চারিটী বৃদ্ধি হয়। রাম রাম সীতারাম।

রাম। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, গুরুজন ও বৃদ্ধ ব্যক্তি কাছে এলে প্রাণ উৎক্রমণ করে কেন?

ক্ষেপা। রাম রাম জয় জয় রাম সীতারাম। এই জগৎটাই প্রাণের রূপ, প্রাণই জগদাকারে দৃষ্ট হয়, প্রাণ জমে স্থূল বস্তু জাত হয়েছে, আবার সূক্ষ্মরূপে প্রাণ সকলকে ধরে রেখেছে, দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের আধ্যাত্মিকরূপ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ প্রাণের আধিদৈবিক রূপ ও শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রাণের আধিভৌতিক রূপ। প্রাণই মূর্ত্ত হয়ে মনুষ্য পশুপক্ষী বৃক্ষলতা কীট পতঙ্গ নদ নদী সাগর ভূধর হয়েছেন, বিরাট্ প্রাণেরই কার্য্য বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কারণ প্রাণ। সঙ্কল্পশক্তিবিশিষ্ট প্রাণের নাম মন। অধ্যবসায় শক্তিবিশিষ্ট প্রাণের নাম বিজ্ঞান। এই প্রাণের অপর নাম প্রণব। সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার প্রথম প্রকাশই প্রাণ, যাঁরা সব ভগবান জেনে সত্য প্রতিষ্ঠা করে সব প্রাণ এইভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাঁরা কৃতার্থ হন। বৃদ্ধকে আগত দেখে কনিষ্ঠের প্রাণ স্বতঃই আকর্ষিত হয়ে উৎক্রান্ত হতে থাকে। প্রণাম করলে প্রাণ আবার যথাস্থানে স্থিত হয়। রাম রাম সীতারাম।

রাম। আচ্ছা ক্ষেপা বাবা, প্রণাম কত রকম?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধ প্রণাম, তার মধ্যে কায়িক প্রণাম সর্ব্বোত্তম।

কায়িকৈস্তু নমস্কারৈর্দেবা স্তুষ্যন্তি নিত্যশঃ। — কালিকাপুরাণে

—কায়িক প্রণামের দ্বারা দেবতাগণ নিত্য সন্তুষ্ট হন্। রাম রাম রাম রাম সীতারাম। কায়িক বাচিক আদিরও ভেদ আছে রাম রাম।

রাম। উপনিষদে প্রণামের কথা আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম নিশ্চয়ই। প্রণামের মত অন্য সাধনা নাই। "তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ"। (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৩।১০।৪)। সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে "নমঃ" এই বলে (নম্রকাগুণবিশিষ্টরূপে) উপাসনা করবে। এই ভাবে যিনি প্রণাম করেন সেই ভক্তের প্রতি ভোগ্যবিষয়সমূহ নত হয়ে, তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে থাকে। যিনি কোন কামনা না করে প্রণাম করে থাকেন তিনি ভগবানের দর্শন লাভ করেন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম।

নমঃ পদং সুবিজ্ঞেয়ং পূর্ণানন্দৈক কারণং।
সদা নমন্তি হৃদয়ে সর্ব্বে দেবা মুমুক্ষবঃ ॥৩॥

— শ্রীরামোত্তরতাপিন্যুপনিষদি

—'নমঃ' এই পদটী পূর্ণানন্দ লাভের একমাত্র কারণ। সমস্ত দেবতা ও মুমুক্ষুগণ হৃদয়ে অন্তরতমকে সতত প্রণাম করেন। রাম রাম রাম রাম জয় রাম সীতারাম।

রামদাস। নিত্য কত প্রণাম করতে হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম।

সহস্রমযুতং লক্ষং কোটিং বা কারয়েদ্বুধঃ।
নমস্কারাত্মযজ্ঞেন তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥

— ১৩৩ শিবপুরাণ বিশ্বেশ্বর সংহিতা ১৬ অ।

—বিদ্বান্ সহস্র অযুত লক্ষ কোটী বার প্রণাম করবে, নমস্কাররূপ আত্মযজ্ঞের দ্বারা সকল দেবতা পরিতুষ্ট হন্। রাম রাম জয় রাম।

তৎস্বরূপেঽর্পিতা বুদ্ধি র্নতেঽশূন্যেচ রোচতি।
যাচাস্ত্যস্মদদহস্তেতি ত্বয়ি দৃষ্টে বিবর্জ্জিতা॥ —ঐ, ১৩৪॥

—পরমাত্মস্বরূপে অর্পিতাবুদ্ধি অশূন্যে রুচিসম্পন্না হয় না। আমার যে অহন্তা আছে তোমাকে দেখলে তা চলে যাবে।

নম্রোঽহং হি স্বদেহেন ভো মহাংস্ত্বমসি প্রভো।
ন শূন্যো মৎ স্বরূপো বৈ তব দাসোঽস্মি সাম্প্রতম্॥ —১৩৫

—হে প্রভো! তুমি মহান্, আমি স্বদেহের দ্বারা তোমায় প্রণাম কর্‌ছি। আমার স্বরূপ শূন্য নয়, (আমি তোমারই অংশ) অধুনা তোমার দাস।

যথাযোগ্যং স্বাত্মযজ্ঞং নমস্কারং প্রকল্পয়েৎ॥ —ঐ

—যথোচিত স্বাত্মযজ্ঞ নমস্কার করবে। রাম রাম জয় জয় রাম সীতারাম।

রাম। আচ্ছা, জ্ঞানী যাঁরা তাঁরাও প্রণাম করেন?

ক্ষেপা। রাম রাম জয় রাম জয় জয় রাম। রাম রাম রাম রাম।

প্রহ্বতা লক্ষণঃ প্রোক্তো নমস্কারঃ পুরাতনৈঃ।
প্রহ্বতা নাম জীবস্য শিবাৎ সত্যাদি লক্ষণাৎ॥
ভেদেন ভাসমানস্য মায়য়া ন স্বরূপতঃ।
সম্বন্ধ এব তেনৈব সোঽপি তাদাত্ম্যলক্ষণঃ॥

* * *

মকার মম শব্দার্থো লুপ্তস্তেকো মকারকঃ॥ — সূত সংহিতা

—প্রাচীনগণ নমস্কার-প্রহ্বতা লক্ষণ বলেন। প্রহ্বতার অর্থ সৎচিৎ আনন্দময় লক্ষণ শিব হ'তে মায়ার দ্বারা ভেদ; স্বরূপতঃ নয়। ভাসমান জীবের নমস্কারের দ্বারা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, সেই সম্বন্ধ অভেদ, তৎ স্বরূপতা লক্ষণ।

মকারেণ স্বতন্ত্রঃ স্যান্নকার স্তন্নিষিধ্যতি।
তস্মাচ্চ নম ইত্যত্র স্বাতন্ত্র মপনেষ্যতি॥ — বৃদ্ধ হারীত

—মকারের দ্বারা স্বতন্ত্র বোঝায়, নকার তা নিষেধ করে। তজ্জন্য নমঃ শব্দের দ্বারা

স্বতন্ত্রতা অপনীত হয়। রাম রাম সীতারাম সীতারাম। মন্ত্র ব'লে প্রণামের ফল অধিক।

দ্বাদশাব্দান্নমস্কারাদ্ভক্ত্যা যল্লভতে ফলং।

মন্ত্রযুক্ত নমস্কারাৎ সকৃৎ তল্লভতে ফলং॥

—রেবাখণ্ডে-১২৫।

—বার বৎসর ভক্তি সহকারে নমস্কারের ফল একটী মন্ত্রযুক্ত নমস্কারে লাভ হয়।

গীতা চণ্ডী রামায়ণ ভাগবত অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ উচ্চকণ্ঠে প্রণামের কথাই বল্‌ছেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনতো—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ

পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে

নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্বঃ॥

ব'লে প্রণাম করতে আরম্ভ করেছেন। ঠাকুরটী গীতার চরম সাধনার কথা বললেন—মন্মনা হও, মদ্ভক্ত হও, মদ্‌যাজী হও, কিছুনা কর্‌তে পার কেবল 'মাং নমস্কুরু' ব্যস্, এক নমস্কার করলেই 'মামেকং শরণং ব্রজ' হয়ে যাবে। চণ্ডীতে শক্রাদি স্তুতি দেখা যায়—

"তাং তুষ্টুবুঃ প্রণতি নম্র শিরোধরাং সা

ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু সানঃ॥"

"তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্" ॥

উত্তর চরিত্রে প্রথম স্তবটী সবই প্রণামময়। তার মধ্যে দুটী মন্ত্রকে ব্রহ্মর্ষি বলেন সমস্ত চণ্ডীর সার।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

শেষে নারায়ণিস্তুতি, তাও প্রণামময়।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

রাম রাম শুধু তাই নয়। শেষ পর্য্যন্ত দেবতারা বলেন, হে বিশ্বার্ত্তিহারিণী দেবী, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ত্রিভুবনবাসিগণের আরাধ্যা দেবি, তোমার চরণে প্রণতগণের প্রতি বরদা হও।

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনা মীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥

রামায়ণে দেখা যায়, ব্রহ্মাকে দেখে বাল্মীকি—

পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘাসনবন্দনৈঃ।
প্রণম্য বিধিবচ্চৈনং পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্ ॥

রামায়ণের বীজটী পেয়ে ব্রহ্মাকে দেখে পাদ্য অর্ঘ্য আসন বন্দনার দ্বারা পূজা করত বিধিবৎ প্রণাম করে নিরাময় জিজ্ঞাসা করলেন। আমার মহাবীরজীর তো কথাই নাই। তাঁর মুখের বুলি—

নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায়
দেব্যৈচ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ।
নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র যমানিলেভ্যো
নমোঽস্তু চন্দ্রার্কমরুদ্গণেভ্যঃ ॥

গোঁসাইজীতো 'শ্রীরামচরিত মানসে' প্রথম সোপানটী বন্দনা প্রণামময় করেছেন।

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্ব্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্ ॥

আকর চারিলাখ চৌরাসী। জাতি জীব জল থল নভবাসী।
সীয় রাম ময় সব জগজানি। করউঁ প্রণাম জোরি যুগপানী।

'অধ্যাত্মরামায়ণ' বলেছেন—

চেতসৈবানিশং সর্ব্বভূবানি প্রণমেৎ সুধী।
জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্ ॥

সকল শাস্ত্রের পাঠের প্রথমেই—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

বলে আরম্ভ করতে হয়।

বিষ্ণু পুরাণের প্রথম শ্লোক—

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ মহাপুরুষ পূর্ব্বজঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে "সূত" তো প্রথমেই আরম্ভ করলেন—

যং প্রব্রজন্ত মনুপেত মপেত কৃত্য
দ্বৈপায়ন বিরহ কাতর আজুহাব।

পুত্রেতি তন্ময় তয়া তরবোহভিনেদু-
স্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনি মানতোহস্মি ॥

ব্যাসদেবও নারদমুনিকে আস্‌তে দেখে পূজা কর্‌লেন, ভাগবতের বীজ দিয়ে গেলেন নারদ—

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিং।
পূজয়ামাস বিধিবন্নারদং সুরপূজিতম্‌ ॥

নারদের মুখে উপদেশ পেয়ে ব্যাসদেব যে ভাগবত করলেন, তাতে প্রায় অধ্যায়ে অধ্যায়ে প্রণাম বন্দনা—পূজার কথাই দেখা যায়। রাম রাম সীতারাম। সীতারাম রাম রাম।

রাম। সর্ব্ব শাস্ত্রেই কি এইভাবে প্রণামের কথা আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, শাস্ত্র প্রণামময়। ভগবতে কবি বলেছেন—

খং বায়ু মগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্‌।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ। —শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪১

—অনন্যভক্ত আকাশ বাতাস অগ্নি জল, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব সকল, দশদিক্‌, বৃক্ষসমূহ, নদী সমুদ্র সবই আমার শরীর এই বোধে প্রণাম করবে।

ভগবান্‌ কপিল বলেছেন—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্বহুমানয়ন্‌।
ঈশ্বরোজীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত। ৩।২৯।

—জীবের অন্তর্যামীরূপে ভগবান সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট, এইরূপ দেখে সম্মানের সহিত ভূত সকলকে মনে মনে প্রণাম কর্‌বে। রাম রাম সীতারাম রাম রাম। শেষে ঠাকুরটী স্থির থাকতে না পেরে উদ্ধবকে খোলাখুলি বল্লেন, মনে মনে নয়—

বিসৃজ্য স্ময়মানান্‌ স্বান্‌ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্‌।
প্রণমেদ্‌ দণ্ডবদ্‌ ভূমা বাশ্ব চাণ্ডাল গোখরম্‌ ॥১৬॥ ঐ ১১।২৯ ॥

—বন্ধুগণ হাসে হাসুক—আমি ব্রাহ্মণ—এ চণ্ডাল—এই দৈহিক দৃষ্টি ত্যাগ ক'রে কুক্কুর চণ্ডাল গো গর্দ্দভ সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম।

রামদাস। একে বারে দণ্ডবৎ প্রণাম!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম এক প্রণামেই কাজ শেষ। রাম রাম

সীতারাম। আমার প্রেমের ঠাকুরটীও এই সুরে সুর মিলিয়ে বলেছেন—

ব্রাহ্মণ আচণ্ডাল কুকুরান্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥
সেই সে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি মতি॥

রাম। ক্ষেপাবাবা, বেদে উপনিষদে কি চণ্ডী-গীতার মত প্রণামের ব্যাপার আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম রাম জয় জয় রাম রাম।

আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবিক্ত
নমস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ —ঋগ্‌বেদ।

'রুদ্রাধ্যায়' তো আরম্ভ করলেন—

নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ব ইষবে নমঃ।
নমস্তে অস্তু ধন্বনে বাহুভ্যামুতত নমঃ।

তারপর সমস্তই প্রায় প্রণামময়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেছেন—

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥ ২।১৭॥

—যে সচ্চিদানন্দ ঘন পরমাত্মা অগ্নিতে জলে ওষধীসমূহে নিখিল বনস্পতিতে বিরাজিত, যিনি অখিল জগতে অনুপ্রবিষ্ট সেই জ্যোতির্ম্ময়কে নমস্কার। রাম রাম রাম।

অথর্ব্ব শিরোপনিষদে দেখা যায়—"ওঁ যোবৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ"। এইরূপ বত্রিশটী মন্ত্রের দ্বারা নমো নমঃ করেছেন। নৃসিংহপূর্ব্বতাপিনীতে পাওয়া যায়—

ওঁ যো বৈ নৃসিংহো দেবো ভগবান্ যশ্চ
যশ্চ ব্রহ্মা ভূ ভুবঃ স্ব স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ॥

রাম রাম সীতারাম। এই রকম বত্রিশটী মন্ত্রে নমো নমঃ করেছেন। রামোত্তর-তাপিনী উপনিষদে—

"ওঁ যোহবৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবানদ্বৈত পরমানন্দ আত্মা যৎপরং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ সুবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।" এই রকম ৪৮টী মন্ত্রের দ্বারা নমো নমঃ করেছেন। রাম রাম রাম জয় জয় রাম সীতারাম।

রাম। উপনিষদে-ও তো খুব প্রণামের কথা আছে।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম প্রণাম ছাড়া পথ নাই। আরো শোনো, রুদ্রহৃদয়োপনিষদে—

শ্রীরুদ্র রুদ্র রুদ্রেতি যস্তং ব্রূয়াদ্বিচক্ষণঃ।
কীর্তনাৎ সর্ব্বদেবস্য সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
রুদ্রো নর উমা নারী তস্মৈ তস্যৈ নমো নমঃ।

এই রকম আটটী মন্ত্রে নমো নমঃ করেছেন। রাম রাম সীতারাম। জয় জয় রাম সীতারাম। তারসারোপনিষদে—

'ওঁ যোহবৈ শ্রীপরমাত্মা নারায়ণঃ সত্
ভগবানকার বাচ্যো জাম্ববান্ ভূর্ভুবঃ স্বুবস্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ।'

এই রকম আটটী মন্ত্রে নমো নমঃ কয়েছেন। গোপালউত্তরতাপিনী উপনিষদে—

'ওঁ প্রাণাত্মনে ওঁ তৎসদ্ ভূর্ভুবঃ স্বুবস্তস্মৈ—প্রাণাত্মনে নমো নমঃ।'—এই রকম সতেরোটী মন্ত্রের দ্বারা নমো নমঃ করেছেন। রাম রাম সীতারাম। কত বলবো! বেদ উপনিষদ্ পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই নমো নমঃতে ভরা। রাম রাম।

রাম। আচ্ছা, শাস্ত্রে এত প্রণাম দেখা যায় কেন—?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম—সংসার রোগের মূল শিকড় হল "অহং" "মম" "আমি" "আমার"। যার যত 'আমি-আমার' বেশী তার তত দুঃখ বেশী। যার যত 'আমার' কম হয়ে গেছে—সে তত আনন্দে আছে, "আমির" কাছে গেছে। 'আমি'কে ধরতে হলে 'আমার' শেষ করে দিতে হবে। সব আমার-এর মূল হল "আমার দেহ"। নমঃ—ন "মম", নম—একটী মকার লোপ হয়ে গেছে. এ দেহ ন মম আমার নয়। দেহটাকে উৎসর্গ করবার জন্য এত নমো নমঃ। দেহটাকে তোমার করে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত, এই দেহটাকে নিবেদন করবার জন্যই নমঃ নমঃ করবার কথা শাস্ত্র বলেছেন। রাম রাম সীতারাম। রাম রাম জপ আর প্রণাম কর, নম নম কর, সংসার রোগের জড় মরে যাক্! দেহটা সত্যি সত্যি ভগবানের। জড় চেতন—তাঁর শরীর, তাঁর দেহকে আমার দেহ ব'লে, আমার ছাপ মেরে দুঃখের অবধি নাই। রাম রাম। তাঁর ধন তাঁকে দিয়ে বুড়ী যায় দুহাত নাড়া দিয়ে—কেবল নমো নমঃ। রাম রাম নমঃ নমঃ। তিনি এলেন বলে—ক্ষেপা রাম রাম করে নাচ্‌তে আরম্ভ করলে, রামদাসও সঙ্গে সঙ্গে নাচতে সুরু কর্‌লে।

জয় রাম সীতারাম!

মায়ের আগমনে

[অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ]

ডাকার মত মাকে ডাক। কৈ মা?—আরে, মা কি দূরেরে! মা যে কাছেই আছেন। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে", "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা", ইত্যাদি বাক্যে দেবগণ মায়ের সত্তার কথা নিজেরা অনুভব করিয়া, মাকে ডাকিয়া, মায়ের কৃপায় শুম্ভ নিশুম্ভাদি দুর্জ্জয় দৈত্যের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। মা ত সর্ব্বশক্তিরূপিণী। তোমার আমার,—সৃষ্ট পদার্থের সকলের—উপাদান যে মায়েরই। ভিতরেও মা, বাহিরেও বিরাট মূর্ত্তিতে তোমার আমার সকলের সম্মুখে মা নিত্য বিরাজমানা। "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী)। আমি যে ভাবে মাকে পাইলে, মায়ের কাছে সব সম্পর্কে থাকিয়া প্রাণের কথা বলিতে পারি, মাকে প্রাণ ভরিয়া প্রাণের প্রিয় জিনিষ সমর্পণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারি—সেইভাবে মাকে পাই কৈ? কি করিলে সেইভাবে মাকে পাই, পাইয়া এই দুর্লভ মানব জীবন সার্থক করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারি?—মধুকৈটভভয়ে ভীত ব্রহ্মা প্রাণের যেমন ব্যাকুলতা লইয়া মাকে ডাকিয়াছিলেন, যে ভাবে মহিষাসুরভয়ে ভীত হইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে পীড়িত দেবগণ মায়ের শরণাগত হইয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক নানাবিধ রোগ শোক, জলপ্লাবন ভূমিকম্প, আসুরাস্ত্র আসুরিকমায়া, দুর্ভিক্ষ মহামারীর ভীষণতা অশেষ প্রকার দুঃখের জ্বালায় সর্ব্বদা জর্জ্জরিত আমরা। এস, প্রাণ ভরিয়া তেমনি ব্যাকুল হইয়া মাকে ডাকি। সর্ব্বহৃদয়বিহারিণী সর্ব্ব জীবের নিত্য আশ্রয় মা, স্বরূপে অব্যক্তা হইয়াও ব্যক্ত হইয়া আমাদের দুঃখ দূর করিবেন, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদায়িনী মা আমাদের সকল কামনা পূরণ করিবেন। সন্তানের আকুল ডাকে মা আসেন, বর প্রদান করেন। ব্রহ্মার ডাকে আসিয়াছিলেন, দেবগণের ডাকে আসিয়া বর দিয়াছিলেন। সুরথ ও বৈশ্যকে দেখা দিয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন।

আজ বড় শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। মা যে আসিয়াছেন। কৈ মা আসিয়াছেন? কোথায় মা?—আরে দেখিস্ না, মায়ের শুভ আগমনে চতুর্দ্দিকে কিরূপ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরের প্রতিচ্ছবির আবরণখানি স্বীয় বক্ষে পবনহিল্লোলে প্রকম্পিত করিয়া স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী কতভাবে নৃত্য

করিতে করিতে প্রিয় পতির কাছে গিয়া আপন দেহ এলাইয়া সাগরকে মায়ের আগমন বার্ত্তা জানাইয়া দিতেছে। আনন্দময়ীর আগমনবার্ত্তা পাইয়া আনন্দে সাগর তাহার উদ্বেল উত্তাল তরঙ্গরাজি স্বীয় বক্ষে লুক্কায়িত করিয়া মায়ের পূজার সম্ভার বহনকারী নানা দিগ দেশ হইতে আগত অর্ণবযানগুলির পথ সুগম করিয়া দিতেছে। বল্লরী হরিতচ্ছদের গাত্রাভরণ দুলাইয়া দুলাইয়া কুসুমগুচ্ছের কবরী ঈষৎ হেলাইয়া সহকারের কাণে কাণে চুপি চুপি জানাইয়া দিল, 'দেখ, মা আসিয়াছেন।' বিহঙ্গমকুল গলা ছাড়িয়া মায়ের আগমনী গানের মধুর ঝঙ্কারে বর্ষাস্নিগ্ধা বনানীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। পুষ্পাভরণা বনানীও শতসহস্র কুসুমরাজির ডালি সজ্জিত করিয়া মায়ের শারদীয়া পূজার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। গন্ধবহ কুসুমের পরাগ গায় মাখিয়া দিগ্‌দিগন্তে মায়ের শুভাগমন বার্ত্তা জানাইয়া দিল। দেখনা, কাশ কুসুমের কি শুভ্রহাসি! সরোবরে সরোবরে সরোজিনী, কুমুদ, কহ্লার,—সকলের চেয়ে অতি সুন্দরী মায়ের শ্রীচরণে স্থান পাবার সুযোগ বুঝিয়া—পবন হিল্লোলে যেন হেলিয়া দুলিয়া উতলা হইয়া পড়িয়াছে। শেফালিকার রূপ দেখ, আনন্দ আর ধরে না, হাসিতে হাসিতে ধরণীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সদ্যস্নাতা শস্যশ্যামলা ধরিত্রী, নীলাম্বরের সাড়ী ও সমুদ্রের মেখলা পরিয়া মায়ের পূজার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। নূতন নূতন পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত আবালবৃদ্ধবনিতাগণ গৃহে গৃহে, নগরে নগরে, জনপদে জনপদে উৎসবে মত্ত হইয়াছে। ব্যাবসায়িগণের—পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, শতশত চিত্তাকর্ষক পণ্যসম্ভার স্তরে স্তরে সজ্জিত—বিপণিতে বিপণিতে উৎফুল্ল নরনারীর সমাবেশ! সকলেই মায়ের সাড়া পাইয়া আত্মহারা হইয়া উৎসবে মগ্ন হইয়াছে।

ঐ শোন, বোধনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শুভ্রজ্যোৎস্নার হাসি ছড়াইয়া নক্ষত্রবেষ্টিত ষষ্ঠির চাঁদ পশ্চিমাকাশে উদিত হইয়াছেন। মা—জগন্মূর্ত্তি, তথাপি বিল্বমূলে মায়ের বিশেষ রূপে অধিষ্ঠান। অকাল বিধায় ভক্তসাধক বিল্বমূলে চিরজাগ্রতা মায়ের ভক্তাভিমুখে উদ্বোধন করিলেন। শুকতারার উজ্জ্বল টিপ্‌টি ললাটে পরিয়া, শুভ্রাঞ্চল নীলাভ উত্তরীয়খানিতে গাত্রাবরণ করিয়া গোলাপী রংএর শাড়ীখানি পরিধান করিয়া উষাদেবী অগ্রে, তাহার পশ্চাতে অরুণদেব দিগ্বলয়ে ভর করিয়া মায়ের পূজা দেখিবার জন্য পূর্ব্বাকাশে আগমন করিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খল অভ্রকুন্তলগুলি ঈষৎ অপসারিত করিয়া দিগ্‌বধূগণ স্ব স্ব পতিগৃহে থাকিয়াই দূর হইতে মর্ত্যলোকে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজোৎসব নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিথি নক্ষত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ। প্রতিবৎসরই মহাকালগৃহিণী কালরাত্রি-

স্বরূপিণী মা ভক্তের প্রতি করুণা করিয়া মর্ত্যলোকে আত্মপ্রকাশ করিয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে আসেন।

নবরাত্রিব্রতে কৃশতনু সংযমী সদ্যস্নাত ভক্ত সাধক নিত্য ক্রিয়া সমাপন করিয়া মায়ের অর্চ্চনার জন্য শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট। অতিসুন্দরী চিন্ময়ী মায়ের সুন্দর মৃন্ময়ী প্রতিমা মণ্ডপ আলো করিয়া পূজকের সম্মুখে। ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়ামের দ্বারা অন্তঃকরণ নির্ম্মল করিয়া লইয়া, নানা প্রকারের ন্যাসাদিদ্বারা ভক্ত, আজ মাতৃভাবে তন্ময় হইয়া—ভিতরে হৃৎপদ্মের কর্ণিকায়—জটাজুটসমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা লোচনত্রয়ভূষিতা, অতসীপুষ্পবর্ণাভা, সুলোচনা, নবযৌবনসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা, ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানা, দশপ্রহরণধারিণী জগদম্বার অলক্ত-রাগরঞ্জিত সর্ব্বদেবগণপূজিত, সিদ্ধমুনিগণসেবিত, ভক্তবাঞ্ছিত, সিংহাসনোপরি স্থাপিত শ্রীশ্রীচরণকমল দেখিতে দেখিতে ভাবে বিহ্বল। মায়ের অনিন্দ্যসুন্দর হাসিমাখা করুণাময় শ্রীমুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ ভক্ত ত্রিনয়নার নয়নে আপন নয়ন স্থাপিত করিয়া স্থির হইয়া গিয়াছেন। পূজা করার সাধ জাগিয়া উঠিল। শতশত কল্পিত উপচারে মনে মনে মায়ের অর্চ্চনা করিয়া, কামক্রোধাদি রিপুগুলি বলি দিয়া, শুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তবৃত্তিসকল জ্ঞানময়ী মায়ের চরণে আহুতি দিয়া সন্তান আজ মাতৃসাধনায় তন্ময়।—এক বৎসর পরে দুলালী কন্যাটি আসিলে বাপ মায়ের প্রাণে কত আকাঙ্ক্ষা—তাকে কত কি দিয়া তৃপ্ত করিতে। আজ বৎসরের পর প্রাণের প্রাণ মা আসিয়াছেন। ভক্ত তাঁকে প্রাণ ভরিয়া মনের সাধে সেবা করার জন্য ব্যাকুল। যার যাহা আছে সব প্রিয় দ্রব্য দিয়া মায়ের অর্চ্চনা করিলেও মনের সাধ মিটে না। ধ্যানান্তে নয়ন উন্মীলন করিয়া সম্মুখে দেখিল ধ্যানের বরাভয়া প্রতিমা হাসিমুখে সম্মুখে। প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্রে মৃণ্ময়ী আজ চিন্ময়ী। সাধক মহাস্নানের মন্ত্রে নানা দ্রব্যে মায়ের মহাস্নান সম্পন্ন করিল। গন্ধপুষ্প ধূপদীপ দ্বারা, চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা, অন্যান্য উপচার দ্বারা প্রাণ ভরিয়া মাকে সেবা করিয়া মানব জীবন সার্থক করিল। মা বহ্নিমূর্ত্তিতে সাজা বিল্বপত্রের আহুতি গ্রহণ করিয়া সন্তানকে কৃতার্থ করিলেন। মায়ের সম্মুখে মায়ের লীলামাহাত্ম্য পাঠ করিয়া অশ্রুপুলকে রোমাঞ্চিতকলেবর ভক্ত সাধক প্রাণের কামনা—আশা আকাঙ্ক্ষা—শ্রীজগদম্বার কাছে নিবেদন করিয়া করিয়া জানাইল 'ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।' বিপদনাশিনি সকল বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, জগৎকে রক্ষা কর। "ত্রাহি দুর্গে, বিশ্বেশ্বরি, পাহি বিশ্বম্"। "সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া মায়ের শ্রীচরণে লুটাইয়া

পড়িল। এইরূপে মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমীতে মায়ের পূজা সম্পন্ন হইল।

তুমিও ভক্তাভীষ্টপ্রদায়িনীকে প্রাণ ভরিয়া ডাক। মায়ের করুণা বরুণালয় দয়মান দীর্ঘনয়নের পানে একবার নয়ন অর্পণ করিয়া মনে প্রাণে প্রার্থনা কর,—মা আমাকে সকল ভয় হইতে রক্ষা কর,—"সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে। ভয়েভ্য স্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে।" ডাকার মত ডাকিতে পারিলে অনুপায়ের উপায়, অগতির গতি মা তাঁর সন্তানের দুঃখ সর্ব্বদাই দূর করেন। তোমার আমার দুঃখ দূর করিবেনই, কামনা পূরণ করিবেনই। মায়ের মত এমন আর আপন কে আছে রে। লৌকিক মা, জগন্মাতা মায়েরেই মূর্ত্তি। সন্তানের জন্য সর্ব্বত্র মা কি না করেন। জগন্মাতা সর্ব্বদাই সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়াই আছেন। অজ্ঞানাবরণে বুদ্ধি মলিন, তাই মাকে দেখিনা, হা হুতাশ করি। মাকে স্তব করিয়া যে ডাকে মা তার হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রকটিত ভাবে থাকেন। "হৃদি দেবী সদা বসেৎ"। তুমি মাকে শ্রীশ্রীদেবীসূক্তটি পাঠ করিয়া শুনাও। মায়ের সম্মুখে মায়ের লীলামাহাত্ম্য পাঠ কর। ব্রহ্মার মত, দেবগণের মত, সুরথ সমাধির মত প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাক, কাতর হইয়া মায়ের শরণ লও। "দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং" ইত্যাদি স্তব পাঠ করিতে করিতে মাকে প্রদক্ষিণ কর আর নমস্কার কর। কৃপাময়ীও কৃপা করিবার জন্যই ব্যাকুল।

সন্তবাণী

৭৪৭। ঈশ্বরের নাম না নিয়ে কোনও কথা বিচার করলে বড় বিপদের সামনে পড়তে হয়।

৭৪৮। যিনি প্রভুকে পান তিনি আপনার রূপে না থেকে প্রভুর রূপে এক হ'য়ে যান।

৭৪৯। মুখ বন্ধ রাখো, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য (দ্বিতীয়) কথাই বোলো না। মনেও ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন কথার চিন্তা ক'রো না। ইন্দ্রিয় এবং আপনার কার্য্যের দ্বারা এমনই কাজ কর যাতে ঈশ্বর প্রসন্ন হ'ন।

৭৫০। একান্তে প্রভুর সহিত উপবেশনকারীর লক্ষণ পৃথিবীর সব বস্তু এবং অন্য সমস্ত মানুষ অপেক্ষা প্রভুকে অধিক প্রেম করা।

৭৫১। যে ছোট ছোট প্রাণিগণকে ভালবাসতে না পারে সে ভগবানের সঙ্গে কি প্রীতি কর্‌বে!

৭৫২। সাধু এবং ভক্তের সেবা করা, তাঁদের উপদেশ শোনা, তাঁদের সঙ্গ করা, তাঁদের আচরণের অনুকরণ করা এই যথার্থ সুখ প্রাপ্তির উপায়।

৭৫৩। ভগবান নারায়ণই সকলের উপরে আছেন, আর তাঁর চরণে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পিত ক'রে দেওয়াই কল্যাণের একমাত্র উপায়।

৭৫৪। যদি মাতা রাগ ক'রে পুত্রকে আপনার কোল থেকে নামিয়েও দেন তা হ'লেও শিশু তাতেই আপনার ইচ্ছা লাগিয়ে থাকে এবং তাঁকে স্মরণ করে কাঁদে আর ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। ঐ প্রকার হে নাথ, তুমি চাহতো আমাকে অত্যধিক উপেক্ষা কর এবং আমার দুঃখ সকলেও ধ্যান নাও দাও তবুও আমি তোমার চরণ ছেড়ে আর কোথায় যেতে সমর্থ হবো না, তোমার চরণ ভিন্ন আমার আর কোন গতিই নাই।

৭৫৫। যদি পতি আপনার পতিব্রতা স্ত্রীকে সকলের সুমুখে তিরস্কারও করেন তা' হলেও পত্নী তাঁকে পরিত্যাগ ক'রতে পারে না। ঐ প্রকার চাহতো তুমি আমাকে অত্যধিকও ভৎর্সনা কর, দূরে সরিয়ে দাও, আমি তোমার অভয় চরণ ছেড়ে অন্যত্র কোথাও যাবার কথাও চিন্তা কর্‌তে পারছিনা। তুমি আমার দিকে চোখ তুলেও না দেখ, তবু আমার তো কেবল তুমি এবং তোমার কৃপাই অবলম্বন।

৭৫৬। তোমার চরণ ছেড়ে আমি যাবোই বা কোথায়, আমার জন্য অন্য আশ্রয়ই কি আছে, তুমি আমার কষ্ট সকল নিবারণ না কর আমার হৃদয় তো তোমার দয়াতে দ্রবীভূত হবে।

৭৫৭। মেঘ যদি কৃষককে ভুলে যায়—কৃষকতো সর্ব্বদা অপলকে মেঘের দিকেই তাকিয়ে থাকে। এই প্রকার হে নাথ, আমার অভিলাষের একমাত্র বিষয় তুমিই। যে তোমাকে চায় তার ত্রিভুবনের সম্পত্তিতে কোন অভিপ্রায় নাই।

৭৫৮। যাঁর চিত্ত অখিল সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার ভগবান নারায়ণের চরণ কমলের ভ্রমর হ'য়ে গেছে সে কি নারীর রূপে আসক্ত হতে পারে? যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগতের কোনও পদার্থেতে আসক্তি আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভুর চরণে প্রেম কোথা?

৭৫৯। হে প্রভো, অধুনা এরূপ কৃপ কর যে আমার বাণী কেবল তোমারই গুণগান করে, আমার হাত তোমার চরণ সেবা করে, আমার মস্তক তোমারই

চরণে প্রণত হয়, আমার নয়ন সর্ব্বত্র তোমাকেই দর্শন করে, আমার কান তোমারই গুণাবলী শ্রবণ করে, আমার চিত্তের দ্বারা তোমারই চিন্তন হয় আর আমার হৃদয় তোমারই স্পর্শ প্রাপ্ত হয়।

১৬০। কোনও বন্য হরিণকে বন্দী কর্‌বার জন্য পালিত হরিণের আবশ্যক হয়, ঐ প্রকার ভগবান নারায়ণও ভক্তগণের দ্বারাই সংসারাসক্ত জীবসকলকে উদ্ধার করেন।

১৬১। যে পুরুষ আপনার সমস্ত সংসার এবং আপনার জীবন প্রভুকে অর্পণ করে না দেয় সে দুনিয়ার এই ভয়ানক জঙ্গল উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয় না।

১৬২। ঈশ্বরের স্মরণ করতো এই রকমই কর যেন দ্বিতীয় বার তাঁকে স্মরণ কর্‌তে না হয়।

১৬৩। শরীর, বাণী, মন্ত্র এ তিনটী আমার নয়, ও তো আমি ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দিয়েছি। আমার না ইহলোক না পরলোক, দুই স্থানেই পরমেশ্বর আছেন।

১৬৪। আপনার সকল কাজ ভুলে সর্ব্বদা ঈশ্বরের স্মরণ কর্‌তে থাকো।

১৬৫। যদি ঐ করুণাসাগরের করুণার একবিন্দু তোমার উপর পতিত হয় তা'হলে সংসারে কারো কাছে কিছুই চাইবার আবশ্যকতা থাক্‌বে না।

১৬৬। প্রকৃত সন্ত ঈশ্বরের ক্রোড়ে খেলা-হাসি-করা সুন্দর বালক।

১৬৭। আপানার প্রিয় হতে প্রিয় বস্তু আপনার পরম প্রিয় সখা পরমাত্মার জন্য পরিত্যাগ করো, ইহাই প্রভুপ্রেমের লক্ষণ।

১৬৮। মনুষ্যের কোন প্রযত্নের দ্বারা ভগবানের প্রাপ্তি অসম্ভবই, প্রভু প্রাপ্তির একমাত্র পথ প্রেমই। এই প্রেম শুদ্ধ সাত্ত্বিক এবং নিষ্কাম হওয়া চাই।

১৬৯। পরমাত্মার দর্শন হয়ে যাওয়ার পর নয়ন আনন্দিত হয়ে জল বর্ষণ কর্‌তে থাকে, ওষ্ঠ মৃদু হাস্য করে, হৃদয়পদ্ম বিকসিত হয়ে উঠে। আনন্দের তরঙ্গে মস্তক আন্দোলিত হ'তে থাকে। প্রতিক্ষণ ঐ প্রিয় সখার নাম উচ্চারণ হোতে থাকে এবং প্রেমের মত্ততা ঐ প্রভুর গুণগানে মশ্‌গুল করে দেয়।

১৭০। পরমাত্মার দর্শনে লীন হয়ে তাঁর স্মরণ করা ভুলে যাও। ইহাই উচ্চ হ'তে উচ্চ স্মরণ।

১৭১। সারা সংসারকে এক গ্রাস করেও যদি মুখে দিয়ে দেওয়া হয় তবুও ক্ষুধার্ত্ত থাক্‌বে। যার মন ভোজন-পান-গহনা-কাপড়েই আসক্ত তার স্থিতি পশু হতেও নীচ হয়ে গেছে।

৭৭২। সংসারের সমস্ত দ্রব্য হতে মুখ ফিরিয়ে প্রভুর দিকে লেগে যাও, এই পৃথিবীকে আজ না হয় কাল ছাড়তেই হবে।

৭৭৩। ঈশ্বর আপনার ভক্তগণকে বারবার বলেন যে তুই সংসার হ'তে বিমুখ হ'য়ে যা, আমার দিকে আয়, আমার দিকে আসা ব্যতীত তোর প্রকৃত শান্তি এবং সুখ মিলবে না। কতদিন তুই আমার কাছ থেকে পালাবি, কতদিন তুই আমার প্রতি বিমুখ হ'য়ে থাক্‌বি।

৭৭৪। পরিধানের বস্ত্র ও চাদর সম্বন্ধে সাদাসিদার কথা মনে রাখ্‌বে, সৌখীন পোষাক এবং আড়ম্বর থেকে দূরে থাক্‌বে।

৭৭৫। ভক্ত যখন সর্ব্বভাবে প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করে তখন পরমেশ্বর তাহার রক্ষা যোগক্ষেমের (প্রাপ্তের রক্ষা অপ্রাপ্তের আনয়ন) সমস্ত ভার আপনার হাতে নিয়ে নেন।

৭৭৬। ঈশ্বরের উপর সতত দৃষ্টি রাখাই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের কথা।

—০

কর্ম্মদুরাচার

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

(১)

লোক ব্যবহারও ঠিক হইল না, যেহেতু সর্ব্বচিত্ত আরাধনা করা গেল না—সকলকে সন্তুষ্ট রাখা গেল না। আর বৈদিক কর্ম্মও অভ্যাসবদ্ধ হইল না—যেহেতু ভাব স্থায়ী হইল না, চিত্ত সর্ব্বদা ভগবান্ লইয়া থাকিল না।

হে প্রভু! হে আত্মদেব! আমি আবার প্রাণপণ করিব—তুমি প্রসন্ন হও—তুমি আমায় প্রাপ্ত হও। পতি যেরূপ জায়াকে প্রাপ্ত হন সেইরূপ।

লৌকিক কার্য্যে সকলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিতে পারিলাম না। বহুলোকের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কৃতঘ্ন হইতে আদৌ ইচ্ছা নাই—কৃতজ্ঞ থাকিতেই সম্পূর্ণ ইচ্ছা, তথাপি কৃতজ্ঞ হইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। হে আত্মহৃদয়বাসিনি! আমি নিতান্ত তোমার আশ্রিত। আমি তোমার সন্তোষার্থে প্রাণপণ করিতে পুনরারম্ভ করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হও, তবে জগৎ আর আমায় কৃতঘ্ন বলিবে না।

হরি হরি! "কৃতঘ্নতা" নামেই আমি ভীত হই। শাস্ত্র সকল অপরাধের ক্ষমা ব্যবস্থা করিয়াছেন—গোহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, ভগ্নব্রত—সাধুগণ এ সমস্ত

অপরাধের নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন কিন্তু "কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ"। শাস্ত্র আরও বলেন "কৃতঘ্ন সর্ব্বভূতানাং বধ্যঃ"। হে ভগবান্, আমি তোমাকে প্রসন্ন করিতে প্রাণপণ করি, তুমি তোমার সর্ব্বজীবকে আমার উপর প্রসন্ন করিয়া দিও। আমি জনে-জনের সন্তোষ সাধন করিতে পারিলাম না।

লৌকিক কর্ম্মদুরাচারত্বের কথা আর কি বলিব! আর বৈদিক কর্ম্মদুরাচারত্ব? হায়! কথায় যাহা করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম, কাজে তাহা করিলাম না। আমি বড়ই কর্ম্মদুরাচার—হে প্রভু আমায় পরিত্রাণ কর। বড় সাধ ছিল—এখনও আছে—সংসার হইতে আমায় মুক্ত কর—আমায় আত্মজ্ঞান প্রদান কর—ইহার জন্য আমায় কর্ম্ম করাইয়া লও। আমিও প্রাণপণ করিয়া কর্ম্ম করি—জ্ঞান লাভ করিয়াও আমার প্রাণের সাধ যেন থাকিয়া যায়। আমার মনে হয় আত্মজ্ঞানী হইয়া তোমার সেবা করি। আত্মজ্ঞানী হইলে কি সেবার কেহ থাকে না? না থাক্ জীবাত্মায় পরমাত্মায় প্রভেদ। নির্গুণ ব্রহ্ম যে কারণে সগুণ হয়েন, আমিও সেই কারণে এক হইয়াও পৃথক হইয়া যাহা করিতে হয় করিব। মুনি জ্ঞানী ভগবান্ শ্রীবশিষ্ঠ ইহাই করেন, ভক্ত ভগবান্ শ্রীনারদ শুকাদিও এইরূপ করিয়া থাকেন। মহৎজনে লোকশিক্ষার্থ কার্য্য করেন। আমরা আর শিখিব কোথা হইতে?

এ সাধ পূর্ণ করিতে হইলে কর্ম্ম চাই। কর্ম্মও করিলাম না। ইহা বলি না যে করিতে পারিলাম না। যাঁহারা বলেন পারিলাম না, তাঁহারা ত চেষ্টা করিয়া পরে বলেন পারিলাম না। আমি বলি করিলাম না। কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ করিলাম না। যাহা করি বলিয়া মনে হয় তাহা প্রাণপণ করিয়া করিনা। এ কর্ম্ম করা সখের। যখন ভাল লাগিল করিলাম যখন ভাল লাগিল না করিলাম না। এ সখের সাধনায় তোমায় পাওয়া যাইবে না। বেলা আর কতটুকু আছে জানি না। যতটুকু থাক্ একবার সখ মিটাইব। এ সখটুকু আর থাকে কেন? সব মিটিয়াছে—সংসারও দেখা হইল, লোকসঙ্গও করা হইল, ভারত উদ্ধারও দেখা হইল—এখন সখ মিটিয়াছে—এখন ঋষিদিগের দিকটা বাকী। সখ মিটাইব!

(২)

এতদিন ধরিয়া যাহা করিয়াছি—যেন কিছুই করি নাই। আর একবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিব। যেন কল্য হইতেই আমার নূতন জন্ম হইল। দেহত্যাগের পরে যে জন্ম, তাহাতে বাল্যকাল থাকিবে, যৌবন থাকিবে—

কতদিন বৃথা যাইবে আবার কত অজ্ঞের মত কার্য্য হইয়া যাইবে, আবার কত পাপ হইয়া যাইবে, কত ন্যায় অন্যায় সংস্কার আবার পড়িবে। আবার কত ক্লেশ ভোগ করিয়া—কত দাগা পাইয়া এখানকার এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে—কতবার চোর পলায়নের পরে বুদ্ধি বাড়িবে। তায় কাজ কি, অনেক ঠকিয়া, অনেক ঠেকিয়া এখন একরূপ দাঁড়াইয়াছে। মনে করা হউক অদ্য আমার মৃত্যু হইল। কাল জন্মিলাম। যাহারা পরিচিত তাহারা গত জন্মের পরিচিত। ইহাদের নিকট কোন না কোন বিষয়ে ঋণী। এ ঋণ আমায় শোধ করিতে হইবে নতুবা কর্ম্মক্ষয় হইবে না। বাহিরে চেনা লোকের মত ব্যবহার করিতে হইবে কিন্তু ভিতরে দেখি এরা কেহই নহে। কোন সম্পর্ক ইহাদের সহিত আমার নাই। তথাপি একটা ব্যবহারিক সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। লৌকিক ব্যবহার পালন করিতে সকলেই বলেন।

(৩)

৺কাশী ক্ষেত্র। আনন্দ কানন। বল ভাই সংসারী—বল ভাই পরিবার-জঠর-ভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা, বল ভাই সত্য বল ৺কাশীধাম আনন্দকানন কিসে? চারিদিকে কি দেখিতে পাও? এখানে সর্ব্বত্রই ত মৃত্যুর চিহ্ন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা যে গৃহে নাই এমন গৃহ কম দেখা যায়। রাস্তায় বাহির হইলে বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, জরাজীর্ণ মানুষ যে সময়ে না দেখা যায় সে সময়ই নহে। যেদিন "রাম রাম সত্য হ্যায়" "হরি হরি বোল" না শুনা যায় সে দিনই নয়। তা ছাড়া বালক বালিকা প্রায়ই মরে। কে বলে ভাই ৺কাশীক্ষেত্র আনন্দকানন?

তথাপি ৺কাশী আনন্দ-কানন!—সংসারীর পক্ষে নহে, মৃত্যুভীত মানুষের জন্য নহে, কর্ম্মের জন্য যাহাকে সংসার করিতে হয় তাহার জন্য নহে। ৺কাশী আনন্দ কানন ভক্তের জন্য, ৺কাশী আনন্দ কানন সাধকের জন্য, ৺কাশী আনন্দ কানন মুমুক্ষুর জন্য। যিনি গান বাঁধিয়াছিলেন "আমি চল্‌লেম রে ভাই আনন্দ-কাননে। সংসারের লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে"। তিনি সত্যই বলিয়াছেন ৺কাশী মহাশ্মশান। সংসারীর এই শ্মশানে সর্ব্বদা ভয়। যাহারা মরিতে আসিয়াছে—যাহারা মরিতে প্রস্তুত, তাহাদের জন্য ৺কাশী। সংসারীর বড় বিপত্তি এই ৺কাশীক্ষেত্র। কাশী পুরাধিশ্বরী, বারাণসী পুরপতি স্থানে-অস্থানে সময়ে-অসময়ে যাহাকে তাহাকে পুত্রহীন বা কন্যাহীন বা পিতৃহীন বা মাতৃহীন বা কোন স্বজনহীন করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন—রে সংসারি! ৺কাশী তোমার জন্য। প্রায়ই শুনি, ভাই মরিল, কন্যা মরিল, স্ত্রী মরিল, পুত্র মরিল—ইহারা

জীবনের কোন কার্য্য না সারিয়া, কোন আশা পূর্ণ না করিয়া কোন সাধ না মিটাইয়া মরিল। প্রভু বিশ্বেশ্বর বালক বালিকাকে ক্রোড়ে লইলেন সত্য—বালক বালিকাকে মুক্তি দিলেন সত্য কিন্তু সংসারী পিতা মাতা তাঁহার দয়া প্রাণে ধারণা করিতে পারিল না। শোকে আচ্ছন্ন হইয়া ভগবানের চরণ আশ্রয় করিতে অনিচ্ছুক হইল। আর যাঁহারা সাধক তাঁহারা ভগবানের কৃপা বুঝিয়া—ভগবানের ইঙ্গিত দেখিয়া মহাশ্মশানে প্রাণ-প্রয়াণোৎসবে যোগ দিল।

প্রাণ-প্রয়াণ কতবারই হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকবারেই নিদারুণ যাতনা ভোগ করা গিয়াছে। সকলেই ইহা ভুগিয়াছে তাই সকলেরই মৃত্যুকে বড় ভয়। "ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়" এই যে কথা ইহাও ভূতের ভয় পাইয়া বালকে যেমন বলে—রাম লক্ষণ বুকে আছে আমার ভয় কি—সেইরূপ মাত্র। যতদিন ধর্ম্মজীবন লাভ না হইতেছে, যতই ভারত উদ্ধার বা জগৎ উদ্ধারে প্রাণপণ কর না কেন শেষে মনে হইবে, হায়! কি করিয়া গেলাম? হায়! তখন কেন বুঝিলাম না প্রকৃত শক্তিমান না হইয়া জগতের কার্য্য করিতে গেলে জগতের কার্য্যও হয় না, নিজেরও শান্তি হইতে পারে না। ঋষিগণ মনুষ্যদিগকে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশে আত্মোদ্ধার ও ভারতোদ্ধার সমকালে করিতে হইবে। সন্ধ্যাবন্দনাদি ঠিক ঠিক না করিয়া ভারতোদ্ধার করিতে গেলে ভারত যাহা তাহাই থাকিয়া যাইবে, তুমি কেবল শক্তিহীন হইয়া—শক্তির কার্য্য করিতে গিয়া চরিত্রহীন হইয়া—লোককে উপদেশ করিতে গিয়া, প্রকৃত পথ ছাড়িয়া—কপটাচারী হইয়া অকালে পশু-পক্ষ্যাদি জীবের মত প্রাণ হারাইতেছ এই মাত্র—জগতের প্রকৃত কল্যাণ কি করিলে ভাই?—তোমার মত যাহারা ভারত ভারত করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছে তাহারা ভারতকে কতদূর ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল দেখিলেই বেশ বুঝিবে। তাই বলিতেছি—একবার পুনরারম্ভ করা যাউক। বড়ই কর্ম্মদুরাচার হইয়া গিয়াছি এখন একবার ঠিক মত কর্ম্ম করা যাউক। প্রাণ-প্রয়াণ যাতনা বড় ভোগ করিয়াছি একবার প্রাণ-প্রয়াণ-উৎসব করা যাউক।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই কাশীক্ষেত্রে এই জাহ্নবী লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

মাতঃ শাম্ভবি! শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং
ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্।
সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণ-প্রয়াণোৎসবে
ভূয়াৎ ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী॥

মা! হরজটাটবীচারিণি! মা তুমি কাশীপুরাধিপতি শিবশম্ভুর অঙ্গে

মিলিত আছ। গঙ্গাজল তোমার বড় প্রিয়। আমি মৌলীদেশে অঞ্জলি ধরিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি "মা তোমার তীরে দেহাবসান-সময়ে—এই প্রাণ-প্রয়াণ উৎসবকালে আমি যেন উৎসব রক্ষা করিতে পারি—আমি যেন যম যাতনা অগ্রাহ্য করিয়া নারায়ণের চরণারবিন্দ আনন্দে স্মরণ করিতে পারি, আমার যেন সেই অন্তিম কালে অদ্বৈত হরিহরাত্মক পরব্রহ্মে ভক্তি অচলা থাকে।"

শুধু মুখে বলিলে কি হইবে? যে বেলাটুকু আছে সেই সময়টুকুরও যদি সদ্‌ব্যবহার কর, যাহাদের অনেক সময় আছে তাহারা যদি এখন হইতে সময়ের ব্যবহার করিতে অভ্যাস করে তবে নিশ্চয়ই কাঙ্গালের বন্ধু অধমতারণ অধমকে ত্রাণ করিবেন।

তবে এস একবার চেষ্টা করি, আবার একবার অভ্যাস করিতে প্রাণপণ করি—যে চেষ্টা করে তিনি তাহার সহায় হন্। কৃপা তাহাকেই করেন যে আপন শক্তি দ্বারা প্রাণপণ করে।

এ কার্য্যে আবার দিনক্ষণ কি? অদ্যই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান করিয়া হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনান্তর রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া শরীরের মলাদি আর্দ্র-গাত্রমার্জ্জনী-যোগে দূর করিয়া প্রথমেই সন্ধ্যা-উপাসনা করা যাউক। প্রথমেই পরিপূর্ণ আত্মার কথা মনে কর। আত্মা অখণ্ড জ্ঞান। এই যে জগৎ ভাসিয়াছে, ইহার যেখানে যাহা আছে তাহার অনুভবকর্ত্তা একজন আছেন। তিনিই আত্মা. তিনিই জ্ঞানময় দেহ ধারণ করেন।

আমি যখন নিদ্রায় ছিলাম, তখন যে কি অনুভব করিতেছিলাম কিছুই ত মনে নাই। এখন জাগিয়াছি। জাগিয়াই আপন দেহ এবং আপন সঙ্কল্পপূর্ণ মনের কার্য্য অনুভব করিতেছি। অনুভব করিতেছি তাই বলিতেছি ইহারা আমাতে আছে। যতক্ষণ অনুভব না করিয়াছিলাম ততক্ষণ অন্ততঃ আমাতে ছিল না। কিন্তু ইহারা ছিল এই জন্য যে আর একজনের অনুভবে ছিল—সেই সামান্যচৈতন্যে ইহা ছিল। বিশেষচৈতন্য যে চিদাভ্যাস তাহা তখন জাগ্রতাবস্থায় ছিল না।

আত্মার চিন্তা করিয়া একবার দেহের কথাও ভাব। যত দুঃখ দিতেছে এই দেহটা, আত্মার সহিত ইহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। মূঢ় ব্যক্তিই নিজ সঙ্কল্প দ্বারা দেহের সহিত একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া পুনঃপুনঃ তাহার অভ্যাসে দেহের সুখ দুঃখকে আত্মার সুখ দুঃখ মনে করিয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। তুমি মূঢ় হইও না, পণ্ডিত হও। প্রতিদিন স্মরণ কর—আত্মা বস্তুতঃ আর্ত্ত হন না। তবে দেহ আর্ত্ত হওয়ায় তিনি আর্ত্ত বলিয়া প্রতিভাত হন। আত্মাতে কোন পীড়া নাই।

আলস্য অনিচ্ছা আত্মাতে নাই, জড়তা আত্মাতে নাই। চর্ম্মের থলিয়া পূর্ণ থাক তাহাতে আত্মার কি, অপূর্ণ থাক তাহাতেই বা আত্মার কি? দেহ নষ্ট ক্ষত বা ক্ষীণ হউক তাহাতে আত্মার ক্ষতি কি? কামারের জাঁতা বা ভস্ত্রা দগ্ধ হইলে তদন্তর্গত বায়ু কি কখন দগ্ধ হয়? দেহ পতিত হউক বা উত্থিত হউক তাহাতে আত্মার ক্ষতি কি? পুষ্প নষ্ট হইলে তদীয় সৌরভের ক্ষতি কি? সৌরভ আকাশ আশ্রয় করিবে। আমাদের শরীর রূপ পদ্মে সুখ দুঃখ রূপ তুষারপাত হউক না কেন, আমাদের ক্ষতি কি? আমরা আকাশে উড্ডয়নশীল মধুকর; আকাশে উড়িয়া যাইব। দেহ পতিত হউক, উত্থিত হউক, বা আকাশ মধ্যে গমন করুক, আমি যখন দেহ হইতে পৃথক তখন আমার কি ক্ষতি হইবে? মেঘের সহিত বায়ুর যে সম্বন্ধ, ভ্রমরের সহিত পদ্মের যে সম্বন্ধ, শরীরের সহিত আত্মার সেই সম্বন্ধ।

এইরূপে দেহ থাক্ বা না থাক্ আত্মদেবের কোনই ক্ষতি নাই ইহা ভাবনা করিয়া সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ আত্মদেবকে আমি এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্মরণ করি। তিনি সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া আছেন। সেই দ্যুতিমান্ বিভু তাঁহার উপাসনীয় শক্তির সহিত এক—সেই শক্তিমান্ সেই শক্তি আমাদিগের বুদ্ধিকে তাঁহার নিজের দিকে প্রেরণ করেন।

ব্রাহ্মণ যে গায়ত্রীর উপাসনা করেন সেই শক্তিরূপা ব্রহ্মবাদিনী তিনিই। মা আমার কেহ নাই মা। যাহারা ছিল তাহারা ভুলে ছিল। তাহারা সকলে চলিয়া যাইতেছে, কেহবা গিয়াছে, কেহবা যাইতেছে, কেহবা শীঘ্রই যাইবে। ইহাদিগকে 'আমার আমার' করিতাম ভুলে। যে আমার সেত চিরদিনই আমার থাকিবে। সে কেবল তুমি। তাই বলি তুমিই আমার। আমার আর কেহ নাই। মা আমি তোমায় প্রসন্ন করিবার জন্য সন্ধ্যা বন্দনাদির মন্ত্রে তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে অভিলাষ করি। মা জগজ্জননি! আমি বলহীন, আমায় বল দিয়া আমাকে প্রাপ্ত হও। আবার বলি পতি যেমন জায়াকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। মা যেমন দুর্ব্বল বালককে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, গাভী যেরূপ বৎসকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ। আমি তোমার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শাস্ত্রবিধি মত সন্ধ্যা করিতেছি, সন্ধ্যার কার্য্যই প্রথম।

পরে দ্বিতীয় কার্য্য। দ্বিতীয় কার্য্যে মাতার আশ্বাস পাইয়া শক্তিমূর্ত্তি বা শক্তিমানের মূর্ত্তি দর্শনে ব্যাকুলতা। তাঁহাকে দর্শন করিব তজ্জন্য জপ। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের জপ। ইষ্ট মন্ত্র জপে যতক্ষণ না দেহের তমোভাব ছুটে ততক্ষণ ঘন ঘন মুখস্থ করার মত—দরকার হইলে স্থির আসনে শরীরকে নৃত্য করাইয়া

মন্ত্র জপ। এই মন্ত্র জপে কূটস্থে এক প্রকার স্পন্দন হয়। ইহা যাহাদের অনুভবে আইসে না তাঁহারা কল্পনায় ইহা চেষ্টা করিবেন। ইহার পরে মানসে ইষ্ট দেবতার পূজাদি।

তদনন্তর তাঁহাকে স্থির ভাবে হৃদয়ে ধরিয়া প্রাণায়ামাদি ব্যাপারে তাঁহার দর্শনে ব্যাকুলতা। ইহার পরে ধ্যানে দর্শন উৎকণ্ঠা। পরে স্তবস্তুতি, বিচার গ্রন্থ পাঠ। প্রত্যহ ইহার অভ্যাস। প্রত্যহ এই সমস্ত প্রথম প্রথম পাঠ করিয়া অভ্যাস চেষ্টা করা।

প্রাতঃকৃত্যাদির পরে সমস্ত দিনের জন্য, সর্ব্বক্ষণের জন্য তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকা। ইহাই শাস্ত্রবিধি। এই বিধিতে কার্য্য করিলে জপ ধ্যান আত্মবিচার নিষ্পন্ন হইবে। ইহাতেই জ্ঞান লাভ হইয়া নিশ্চয় জ্ঞানময় দেহে তিনি দেখা দিয়া চির দাস বা চির দাসী করিয়া রাখিবেন। ইহাই জীবন্মুক্তি। ইহার অভ্যাসে যতটুকু অগ্রবর্ত্তী হওয়া যাইবে ততটুকুই উৎসব।

সকলের জীবনেই প্রাণত্যাগ কালে একটা ব্যাপার ঘটে। জীবের সমস্ত শক্তি হৃদয়ে আসিয়া একত্র হয়। নাভিশ্বাস ইত্যাদি যাহা হয় তখন লোকে হাহাকার করে কিন্তু প্রাণ তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শক্তিগুলিকে শরীরের সর্ব্ব অঙ্গ হইতে আহরণ করিয়া হৃদয়ে আনিতে থাকেন। এদিকে পা হইতে শীতল হইতে লাগিল আর এদিকে শক্তিগুলি হৃদয়ে আনীত হইল। শক্তি সমস্ত একত্র হইলেই যেমন কুম্ভকে জ্যোতিঃ বাহির হয় সেইরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ হয়। প্রাণ সেই সময়ের মধ্যে ভাবনাময় দেহ গড়িয়া প্রস্তুত থাকে। জ্যোতিঃ প্রকাশ হইবামাত্র মুমূর্ষু হয় কাঁদে, নয় হাসে। পরক্ষণে প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করে। সকলেরই ইহা হয়। তবে যাহাদের জ্ঞাতসারে ইহা হয় তাঁহারাই সাধক। তাঁহাদের উৎসবই প্রাণ-প্রয়াণোৎসব।

—০—

ধর্মবণিক্

[ডক্টর শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম্‌-এ, ডি-লিট্‌]

দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবগণ যখন দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন সায়াহ্নকালে পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয়তমা মহিষী অশেষ বিদ্যা ও বুদ্ধির অধিকারিণী দ্রৌপদী ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ!

"ধর্মার্থমেব তে রাজ্যং ধর্মার্থং জীবিতং চ তে।
ব্রাহ্মণা গুরবশ্চৈব জানন্ত্যপি চ দেবতাঃ॥
ভীমসেনার্জুনৌ চোভৌ মাদ্রেয়ৌ চ ময়া সহ।
ত্যজেস্ত্বমিতি মে বুদ্ধির্ন তু ধর্মং পরিত্যজেঃ॥

(মহা. বন. ৩০।৬-৭)

"আপনার রাজ্য ও জীবন যে কেবল ধর্মের জন্য, তাহা ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবগণও জানেন। আমার মনে হয়, যে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আপনি ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও আমাকেও ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্মকে ত্যাগ করিতে পারেন না"। দ্রৌপদী আরও বলিলেন,—"আমি জ্ঞানিগণের নিকট শুনিয়াছি, যে-রাজা ধর্মকে রক্ষা করেন, ধর্মও সেই রাজাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনার বেলায় তাহার বিপরীত ফল দেখিতেছি। আপনি চিরদিন ধর্ম ধর্ম করিয়া পাইলেন কি? পরম অধার্মিক দুর্যোধন রাজ্যসুখ ভোগ করিতেছে, আর ধার্মিকশ্রেষ্ঠ আপনি বনবাসে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। সুতরাং এরূপ ধর্মচর্যার ফল কি?"

দ্রুপদরাজপুত্রী যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, উহা যে তাঁহার একার সন্দেহমাত্র এরূপ নহে। আজিও যখন আমরা দেখি যে সাধু ব্যক্তিরা নানা কষ্টভোগ করিতেছেন, আর দুষ্টলোকেরা ধন যশঃ, মান প্রভৃতির অধিকারী হইতেছে, তখন এই সংশয়ই আমাদের মনে উদয় হয়—ধার্মিক হইবার চেষ্টা করিয়া লাভ কি? ধর্মের ফল ত অনিশ্চিত। ইহজীবনেই যখন নিত্য দুঃখভোগ করিতে হইল, তখন অজ্ঞাত পরজীবনে কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে?

দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা দ্বারাই উপরোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। যুধিষ্ঠির বলিলেন—"যাজ্ঞসেনি! তুমি যে কথা বলিলে তাহা শাস্ত্রসঙ্গত নহে, উহা নাস্তিক্য বুদ্ধি-প্রসূত। তোমার মত এই,—যে, যদি ধর্মের সেবা করিয়া জীবনে সুখভোগ না হয়, তবে উহা

নিরর্থক মাত্র। অর্থাৎ তুমি যে কথা বলিতেছ উহা ধর্মব্যবসায়ীদের কথা। আমি যখন ধর্মের সেবা করিলাম, তখন ধর্মই বা আমাকে সুফল দিবেন না কেন? আমি বলি, যাহারা এই বুদ্ধিতে ধর্মাচরণ করে, তাহারা কখনও ধর্মের মঙ্গলময় ফল লাভ করিতে পারেনা, ধর্মের নামে তাহারা দোকানদারি করিতে চাহে,—তাহারা অতি নীচ, তাহাদিগকে ধর্মবণিক্ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। "ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্॥ ন ধর্মফলমাপ্নোতি যো ধর্মং দোগ্ধুমিচ্ছতি।" (মহা. বন. ৩১।৫-৬)।

যুধিষ্ঠির আরও বলিলেন, "আমি লোভের বশবর্তী হইয়া লাভের আশায় ধর্মের সেবা করি না। 'ধর্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্'—আমার মন স্বাভাবতই ধর্মের অনুগামী। সুতরাং আমি ফলান্বেষী না হইয়া দান বা যজ্ঞ কেবলমাত্র কর্তব্যজ্ঞানেই করিয়া থাকি।" এই প্রসঙ্গে গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি স্মরণীয়—"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—স্বধর্ম-বিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু তাহার ফলে অধিকার নাই। ইহারই নাম নিষ্কাম কর্মযোগ—ইহা দ্বারা কর্ম বন্ধনের হেতু না হইয়া মুক্তিরই কারণ হইয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে ধন-জন, পুত্র-কলত্র ও পরলোকে স্বর্গলাভের লোভে কর্মের বা ধর্মের অনুষ্ঠান করে গীতার চরম অধ্যায়ে ভগবান তাহাদিগকে "রাজস-কর্তা" আখ্যা দিয়াছেন। যতদিন পর্যন্ত রজোগুণের বিলয় হইয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বের অভ্যুদয় না হয়, ততদিন পর্যন্ত জীবের এই দীর্ঘ ও ক্লেশবহুল সংসারপথে যাতায়াতের নিবৃত্তি হয় না।

যাঁহারা ফলের লোভে ধর্মাচরণ করেন, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে 'ধর্ম-বণিক' ও 'জঘন্য' বলিয়া যতই নিন্দা করুন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ইঁহারাই সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায়। কেবলমাত্র কর্তব্যবুদ্ধিতে বা ধর্মের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে যাঁহারা ধর্মপথের পথিক হন, জগতে চিরদিনই তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র। শাস্ত্রো-পদেশক ঋষিগণও একথা বিশেষভাবে জানিতেন, তাই জনসাধারণকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা বিভিন্ন যাগ-যজ্ঞ, দান-ধ্যান, ব্রত-উপবাস প্রভৃতির মাহাত্ম্য বা ফলশ্রুতি বিশেষভাবে কীর্তন করিয়াছেন। গীতার বিচারে এইরূপ ধর্মানুষ্ঠানকে রাজস কর্ম বলা যায়। ইহার দ্বারা কর্মকর্তা হয়ত একদিন সৎসঙ্গের ফলে নিষ্কাম কর্মের ভূমিকায় অধিরূঢ় হইতে পারেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা ধর্মকে যেভাবে ব্যবসায়ের বস্তুতে পরিণত করিয়াছি, তাহাতে যুধিষ্ঠিরকৃত তিরস্কার একমাত্র আমাদের প্রতিই প্রযোজ্য। মনে করুন, বাড়ীতে পুত্রের সংকটাপন্ন পীড়া হইয়াছে, অমনই স্নেহময়ী মাতা মা-কালীর নিকট মানত

করিলেন,—"মা! আমার ছেলেকে বাঁচাও, আমি জোড়া পাঁঠা দিয়া তোমার পূজা দিব।" ধর্মকে কত নীচস্তরে নামাইয়া আনিলে তবেই না এই প্রকার মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইতে পারে! ধর্মের জন্য ধর্মাচরণ এখন সত্যই বড় দুর্লভ! রোগমুক্তি, শত্রুবিনাশ, পরীক্ষায় কৃতকার্যতা, চাকুরি বা ব্যবসায়ে উন্নতি, লটারির খেলায় জয়লাভ—এই গুলিই এখন হইয়া দাঁড়াইয়াছে ধর্ম সাধনের হেতু। যে সকল সাধুপুরুষ নিছক্ ধর্মের কথা শোনান, তাঁহাদের ভিক্ মিলে না; কিন্তু যে সকল ধর্মধ্বজী মাদুলি-কবচ, তন্ত্রমন্ত্রের বুজরুকি দেখাইতে পারেন, পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া তাঁহারাই দিন দিন উদর পুষ্ট করিতেছেন।

কিন্তু সত্যই কি ধর্মসাধনের কোন মহত্তর আকর্ষণ নাই? নিশ্চয়ই আছে; নহিলে ব্যাস, বশিষ্ট, নারদ, শুক, ভীষ্ম, বিদুর, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ইহার জন্য এত কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন না। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মতে—নিষ্কাম ধর্ম আচরণের মুখ্য ফল হইতেছে চিত্তশুদ্ধি বা আত্মপ্রসাদ। নিষ্কপটভাবে ধর্মসাধন করিলে মনে এমন একটি অপূর্ব ভাবের উদয় হয় যে তখন আর দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে হয় না। দিনের পর যেমন রাত্রি, রাত্রির পর আবার দিন—ধার্মিকের নিকটও তেমনি সুখের পর দুঃখ, আবার দুঃখের পর সুখ। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই তিনি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন।

"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্" —(গীতা)।

সংসারের সহস্র প্রকার দুঃখে জর্জরিত মানুষ যদি ধর্মাচরণের দ্বারা এমন একটি মনোভাবের অধিকারী হইতে পারে যে দুঃখকে আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না—সে কি বড় কম লাভ? দুঃখবোধ ও অসন্তোষই ত জীবনকে বিসময় করিয়া তুলে। গীতায় উক্ত হইয়াছে, 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ' (৫।১৯)—অর্থাৎ যাঁহাদের মন সাম্যে স্থিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহলোকেই সংসার জয় করিয়াছেন।

শোকস্থান সহস্রাণি ভয়স্থান শতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥ (মহা. বন. ।২।১৬)

সহস্র সহস্র শোকস্থান (মনস্তাপ) ও শত শত ভয়স্থান (মৃত্যুভয়) প্রতিদিন মূর্খকে আশ্রয় করে, পণ্ডিতকে আশ্রয় করিতে পারেনা। কারণ "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"। ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী পণ্ডিত ব্যক্তি কোন কিছুতেই বিচলিত হন না। তিনি ধীর, স্থির। সংসারযুদ্ধে যিনি স্থির থাকিতে পারেন, তাঁহারই নাম যুধিষ্ঠির।

দ্রৌপদী কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির ইহাও বলিয়াছেন, যে ধর্মকে

আশ্রয় করিলে ইহলোক বা পরলোক কোথাও ঠকিতে হয় না। যাঁহারা ধর্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, সাময়িকভাবে তাঁহারা হয়ত বিষয়সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে পারেন, কিন্তু পরিণামে তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। "যতো ধর্মস্ততঃ জয়ঃ"। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকে বড় মনে করিয়া ধর্মের নিন্দা করে, কোন লোকেই তাহাদের গতি হয় না। মানুষ সাধারণতঃ তাহার সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বস্তুর বিচারে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত, তাহা হৃদয়ংগম করিবার শক্তি তাহার থাকে না। ধর্মের তথা কর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ" (গীতা, ৪।১৬), "কোন্‌টি কর্ম আর কোন্‌টি অকর্ম তাহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাও স্থির করিতে পারেন না।" সুতরাং অহংকার বশতঃ নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া শাস্ত্র নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে হয়. তাহা হইলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। "মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থা"। ধর্মের উৎকর্ষ বর্ণন প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠির আরও বলিয়াছেন,—

"অফলো যদি ধর্মঃ স্যাচ্চরিতো ধর্মচারিভিঃ।
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেত জগন্মজ্জেদনিন্দিতে ॥
নির্বাণং নাধিগচ্ছেয়ুর্জীবেয়ুঃ পশুজীবিকাম্।
বিদ্যাং তে নৈব যুজ্যেয়ুর্নচার্থং কেচিদাপ্নুয়ুঃ ॥

(মহা. বন. ৩১।২৫-২৬)

অর্থাৎ হে অনিন্দিতে! যদি ধার্মিকগণের অনুষ্ঠিত ধর্ম বিফল হয়, তাহা হইলে এই জগৎ নিরাকার অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। তাহা হইলে কেহ নির্বাণ লাভ করিতে পারিত না, কেহ বিদ্যার্জনেও নিযুক্ত হইত না, এবং কাহারও অর্থলাভ হইত না, সুতরাং সকলেই পশুর মত জীবন যাপন করিত। ("ধর্মেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ")।

"ধারণাদ্ ধর্মঃ"। ধর্ম আছে তাই জগৎ আছে। যুগভেদে এবং দেশকাল ভেদে ধর্মের হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিন্তু ধর্ম কখনও বিলুপ্ত হইতে পারে না। ধর্মের যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আসিতে হয় যুগাবতারকে। ধর্মের অপব্যাখ্যা ও ধর্মের নামে অধর্মাচরণ ধর্মের সব চেয়ে বড় গ্লানি। ধর্মের ব্যাপারে যাঁহারা "পাটোয়ারি" বুদ্ধির দ্বারা চালিত হন, যুধিষ্ঠিরের ভাষায় তাঁহারাই ধর্মবণিক্। মানুষ জন্ম লাভ করিয়া তাঁহারা দেবত্বলাভ ত করিতেই পারেন না. উপরন্তু দেবতাকে ঘুষের লোভ (মানত) দেখাইয়া দেবতার আসন হইতে নামাইয়া আনেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুনঃ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" (৭ ১৬)

অর্জুন! চারি প্রকারের সুকৃতী ব্যক্তিরা আমার ভজন করেনা,—আর্ত (দুর্গত), জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী (কোন কিছুর কামনাকারী) ও জ্ঞানী। ইঁহাদের মধ্যে আর্ত ও অর্থার্থীর সংখ্যাই সমধিক. জিজ্ঞাসু (বা তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু) ও জ্ঞানী অতি কম। বিপদে পড়িলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং কোন বস্তুর প্রাপ্তি কামনা করিয়া ভগবানকে ডাকা দোষের নহে, বরং শাস্ত্রসঙ্গত। কিন্তু প্রার্থনা পূরণের বিনিময়ে ভগবানকে কোন কিছু দেওয়ার লোভ দেখানো বড়ই অপকর্ম। এইরূপ মনোভাব নিয়া যাঁহারা ধর্মের অনুষ্ঠান করেন, ধর্মবণিক্ বলিতে তাঁহাদিগকেই বুঝায়। ভগবান্ সর্বেশ্বর—তাঁহার নিকট সব কিছুই চাহিব,—যাহাতে আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হয় তিনি সে বস্তু আমাদিগকে নিশ্চয়ই দিবেন। কিন্তু যাহা দ্বারা আমাদের অকল্যাণ হইতে পারে সে বস্তু আমরা চাহিলেও তিনি দিবেন না। কারণ, তিনি হইতেছেন "সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যঃ"। —যাহা দ্বারা অকল্যাণ হয় এমন কোন বস্তু তাঁহার হাত দিয়া আসিতে পারে না। আমাদের বুঝিবার ভুলে আমরা তাঁহার প্রতি দোষারোপ করি। ধর্মের ক্ষেত্রে এই বণিক্ বুদ্ধি ছাড়িয়া একান্তভাবে তাঁহার শরণ নিলে তবেই যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে। অন্যথা "নৈব চ নৈব চ"॥

—০—

প্রতীক্ষা

[শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী]

হে ভারত, একদিন তব তপোবনে
দাঁড়াইয়ে বলেছিলে তুমি—
"অমৃতের পুত্রগণ,
আছ যারা দিব্য ধামে,
শোন শোন তোমরা সকলে,
মহান্ পুরুষ যিনি—যিনি জ্যোতির্ময়-
জেনেছি তাঁহারে !"

সেদিন ভারত তুমি,
অমৃতের মহাযজ্ঞে সমস্ত মানবে,
অমৃতের পুত্র বলি' করিলে আহ্বান !
কারো প্রতি ঘৃণা তব ছিল না কিছুই,
অহঙ্কার নাহি ছিল মনে !
তব পুণ্য আমন্ত্রণ-ধ্বনি,
সঙ্কুচিত হয় নি কোথাও—
এই মহা ভুবনের মাঝে !
মহাবিশ্ব সঙ্গীতের সাথে,
তোমার তপস্বী-কণ্ঠ
নিত্যকালে হইল ধ্বনিত !

সে দিন ভারত তুমি,
নিখিল-লোকের মাঝে
দাঁড়াইয়ে স্থির শান্ত বেশে
জল-স্থল-আকাশেরে
দেখেছিলে পরিপূর্ণ রূপে !

দেখেছিলে উর্দ্ধে পূর্ণ,
মধ্য পূর্ণ অধঃ পূর্ণ—সচ্চিৎ-সাগর !
সেদিন তোমার কাছে
উদ্ঘাটিত হয়েছিল,
নীরন্ধ্র আঁধারে ভরা নিরুদ্ধ দুয়ার !
সত্য করি' তাই তুমি বলেছিলে—
"জেনেছি—পেয়েছি তাঁরে !"
তাই সর্ব মানবেরে অমৃতের পুত্র ব'লি,
অমৃতের দিলে অধিকার !

তারপর কি যে হ'ল—
নির্বাপিত প্রদীপের মত
আপনার মাঝে
নিভে গেলে ক্রমে !
তোমার যে প্রাণ-ধারা—
দূরে দূরান্তরে—
দেশে দেশান্তরে,
ছিল প্রাণ-সঞ্চারিণী—
বিশ্বের কল্যাণী,
হ'ল তাহা গতিহীনা !
সহস্র বিভাগ আর বাধার প্রাকারে—
তুমি হ'লে বিখণ্ডিত !
বিশ্ব-প্রাণ-তরঙ্গের দোলা,
প্রাণে তব জাগালো না আর আলোড়ন !
ঘৃণ্য দীন জীর্ণতার সুনিবিড় অন্ধকার-কূপে,
আপনি হইলে মগ্ন !
তব কণ্ঠ বিনিঃসৃত আমন্ত্রণ বাণী—
হ'ল নাক' উচ্চারিত আর !

অন্ধকারে তবু জাগে
যেন কোন্ জ্যোতির্ম্ময় আলোর আভাস !
হতাশার মাঝে শুনি
যেন কোন্ সুমহতী বাণীর প্রকাশ !
সাধনার যেই ধন হে ভারত !
একদিন ক'রেছিলে লাভ,
কালের কবল মাঝে হ'য়নিক' আজো কবলিত !
মোরা আজো হইনি নিরাশ !
তোমার তপস্যা মাঝে—সে ধন আবার
ফিরে পাবে নিখিল জগৎ !
যে ভ্রান্তির মায়া ছেয়ে আছে দিকে দিকে,
হ'বে পুনঃ দূরীভূত !
অন্ধকারে দেখা দিবে সত্যের আলোক !
তুমি হ'বে উজ্জীবিত—উজ্জীবন-মন্ত্র তুমি শুনাবে সবারে !
অমৃতের পুত্রগণ—অমৃতের অধিকারী হ'বে পুনর্বার !
কবে হ'বে সেইদিন—তারি প্রতীক্ষায়—
দিগন্তের অন্ধকার পানে—চেয়ে আছি মোরা আশা ভরে।

—০—

শ্রীমৎ ভাগবতের একটি শ্লোক

[অধ্যাপক শ্রীবিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ]

মহারাজ পরীক্ষিতের উপর ব্রহ্মশাপ হইয়াছে, পরীক্ষিত গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থানে প্রয়াগতীর্থের তটভূমিতে বসিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সম্মুখে লক্ষ লক্ষ গৃহী, সাধু, সন্ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত, স্বয়ং ব্যাসদেব ও দেবর্ষি নারদ নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন, —রাজার অকাল মৃত্যুতে ভারতবর্ষের শোচনীয় অবস্থা কল্পনা করিয়া সকলেই

বিষণ্ণ। সভা নিস্তব্ধ, মৃত্যুর করাল ছায়ায় সমগ্র মণ্ডলী মলিন, প্রতিকারবিহীন ব্রহ্মশাপের আশঙ্কায় সকলেই মৌন ;—কেবল গঙ্গার মৃদু কলধ্বনি চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে ভীষণ হইতে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে।

এমন সময়ে ষোড়শ বর্ষীয় শ্যামবর্ণ, দিগম্বর, পিঙ্গলবর্ণ জটাকলাপ, আশ্রম চিহ্নবিহীন এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আসিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন—মহারাজ পরীক্ষিত ও অন্যান্য সকলে উত্থিত হইয়া সেই সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করিলেন, এমন কি সন্ন্যাসীর পিতা স্বয়ং ব্যাসদেব তাঁহাকে করজোড়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিলেন। এই সন্ন্যাসী ব্যাসদেবের পুত্র শ্রীশুকদেব।

শ্রীশুকদেব আসন গ্রহণ করিলে মহারাজ পরীক্ষিত করজোড়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কথয়স্ব মহাভাগ! যথাহমখিলাত্মনি,
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্তক্ষ্যে কলেবরম্ ॥

—হে মহাভাগ, আমাকে উপায় বলিয়া দিন, যেরূপে আমি বিষয়সঙ্গ রহিত মনকে অখিল জগতের পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া দেহত্যাগ করিতে পারি।

বড় কঠিন প্রশ্ন। আজন্ম ভোগসুখ লালসায় বর্দ্ধিত মহারাজ "নিঃসঙ্গ" অর্থাৎ বিষয়চিন্তারহিত মন প্রার্থনা করিতেছেন। যে মন সমগ্র জীবনটাই রাজোচিত বিষয়সুখ ভোগ করিয়া কাটাইল সেই মনকে তিনি বিষয় চিন্তা হইতে উঠাইয়া লইবার উপায় জানিতে চাহিতেছেন, সেই বিষয়-কলুষিত মনকে "নিঃসঙ্গ" করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে নিঃশেষে নিবেদিত করিবার শক্তি অন্বেষণ করিতেছেন। ইহা কি সহজে হয়? সারা জীবন যে কর্ম্ম, যে চিন্তা আমরা করিয়া আসিতেছি মন মৃত্যুকালে অবশ হইয়া সেই চিন্তাই করিবে,—ইহাই বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান। পরীক্ষিতও সমগ্র জীবন মৃগয়া করিয়া শত সহস্র পশু বধ করিয়াছেন, কামিনী কাঞ্চনের উপভোগে ডুবিয়া ছিলেন, দেহটাই পরীক্ষিত —এই বিশ্বাস তাঁহার জীবনে বদ্ধমূল হইয়া কার্য্য করিতেছিল। আজ তিনি বিপদে পড়িয়া হঠাৎ একটা উপায় জানিতে চাহিতেছেন, অথচ তাঁহার প্রার্থনা তাঁহার সমগ্র জীবন স্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীতগামী। মহারাজ ভরত ছিলেন সসাগরা ভারতবর্ষের রাজা, কত জনহিতকর কর্ম্ম তাঁহার রাজত্বকালে তিনি করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইতেই আমাদের জন্মভূমির নাম ভরতবর্ষ হইয়াছে। রাজ্য পরিত্যাগের পর কঠোর তপস্যায় দিন অতিবাহিত করিয়াও মৃত্যুকালে হরিণ শিশুর চিন্তা করিয়া তিনি পরজন্মে মৃগশরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কর্ম্মী

ও তপস্বীরই এই অবস্থা, অন্যাপরে কা কথা। সুতরাং "কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্" কি করিয়া হইবে!

এই শ্লোকটি ভাগবতের একমাত্র প্রশ্ন, সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত এই একটি মাত্র প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন। এই প্রশ্নই সমগ্র মানব জাতির সমষ্টিগত প্রাণের প্রশ্ন,—কি উপায়ে মৃত্যুকালে মনকে বিষয় নির্মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে জীব নিঃশেষে নিবেদিত করিতে পারে! ইহাই যুগযুগান্তরের প্রশ্ন, এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য বেদবেদান্ত, পুরাণ, গীতার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাই দেবর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি, বদ্ধজীব, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী, ধনী ও দরিদ্রের মর্ম্মকথা। শ্রীশুকদেবের মুখ নির্গলিত দ্বাদশ স্কন্ধ কথাগুলি এই মূল প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন,—কি করিয়া "কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্।"

শ্রীভাগবতের শেষ শ্লোকটি এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে,—এই শেষ শ্লোকটি যেন জ্যামিতির "Q. E. D."—অর্থাৎ যাহা প্রতিপাদ্য করিবার বিষয় ছিল তাহা এখন সত্যরূপে প্রমাণিত হইল।

নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম॥

—যাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং যাঁহাকে প্রণাম করিয়া আত্মনিবেদন করিলে সর্ব্ব দুঃখ—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক—নিবারিত হইয়া থাকে, আমি সেই পরমাত্মাস্বরূপ শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

এই যে প্রশ্ন ও এই যে সমাধান তাহার ভিতর দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীভাগবত বসিয়া আছেন। প্রশ্নটি বুঝিবার ও তাহার সমাধান গ্রহণ করিবার জন্য অসংখ্য শ্লোক, চিন্তাধারা, অসংখ্য যুক্তি তর্ক ও আখ্যানভাগের অবতারণা করা হইয়াছে।

মূল কথা অতি সংক্ষেপে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে তাঁহার মৃত্যুর কথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য! সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।

—হে কুরুনন্দন, তোমার মৃত্যুর আর সাতদিন মাত্র বাকী আছে।

মহারাজ পরীক্ষিতের জীবনের আর সাতদিন মাত্র বাকী আছে, অপর কাহারও হয় সাত মাস, কাহারও বা সাত বর্ষ, এমনকি ত্রিশ, চল্লিশ বৎসরও বাকী থাকিতে পারে। কিন্তু অনন্ত কালসমুদ্রে সাতদিন যেমন ক্ষণস্থায়ী সাতমাস অথবা ত্রিশবৎসরও সেইরূপ তুচ্ছ ও চঞ্চলগতিশীল! দেখিতে দেখিতে কাল অতিবাহিত হইতেছে, আয়ুষ্কালও অনিশ্চিত। সুতরাং মানুষ আজই

সচেতন না হইলে হয়ত আর সচেতন হইবার সময় পাইবে না, একটা অমূল্য মানব জীবন বৃথাই নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই মৃত্যু সম্বন্ধে এই বাণী—"তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য। সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ",—ইহা প্রত্যেক মানুষের প্রতি শ্রীশুকদেবের কৃপাবাণী বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—"সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ, সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।"

শ্রীশুকদেব আরও বলিলেন :

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈ র্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটেত শ্রেয়সে যতঃ॥

—এই সংসারে দেহ ও কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত ব্যক্তির ভগবৎ বিস্মৃত বহুবর্ষ পরমায়ুলাভে কি ফল? কোনও ফলই নাই। কিন্তু "মৃত্যু আসিতেছে" —জীবনের যেটুকু বাকী আছে তাহা যেন বৃথা না যায়, মুহূর্ত্তের জন্যও এই চেতনা, সংসার-মাতাল মানুষের শত বর্ষ ব্যাপী পশু জীবন অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ও পরমার্থপ্রদ।

এই শ্লোকটি সাধারণ মানুষের, বিশেষ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের অতীত জীবনের ইতিহাস এবং বর্ত্তমান জীবনের উপায় স্বরূপ। পরীক্ষিত বহুবর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়াছেন, তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, কলি নিগ্রহ করিয়াছেন, মৃগয়া করিয়া বহু পশু নিধন করিয়াছেন, রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধি প্রদীপ্ত মন লইয়া অর্থ, পদগৌরব ও ইন্দ্রিয়ভোগের লালসায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু আজ মৃত্যুর সম্মুখে তাঁহার সেই সমগ্র ভোগসমৃদ্ধ দীর্ঘজীবন মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। বাকী আছে জীবনের আর সাতদিন মাত্র। এখনও যদি তাঁহার চেতনা হয় এবং এই সাতদিন নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন তাহা হইলে মহারাজের এই সাতদিন তাঁহার অতীত বহুবর্ষ এমন কি বহুজীবন অপেক্ষা মূল্যবান্ হইয়া দাঁড়াইবে—আমেরিকান্ ভক্ত Emerson র ভাষায় "This one drop balances the whole sea"—এইরূপ একবিন্দু বারিই সমগ্র মহাসাগরের মত গভীর ও অনন্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। মানুষ দীর্ঘজীবনের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে, কিন্তু বার্দ্ধক্য যদি ভগবৎ চিন্তায় অতিবাহিত হয়, তবেই বৃদ্ধের দীর্ঘ জীবন সার্থক, নতুবা চিরজীবনের অভ্যাসমত শুধু বিষয়বস্তুর চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া শেষ জীবন কাটাইলে তাহার কুড়ি বৎসরে মৃত্যু অথবা আশি বৎসরে মৃত্যু, দুইই সমান। বৃদ্ধ জীবনে যিনি ভগবৎ চিন্তন করিতে শিখেন নাই তাঁহার তো পশুজীবন! —পশুজীবনের আবার আয়ুর হিসাব কেন?

তাই পরমজ্ঞানী শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের ভিতর দিয়া আমাদিগকে

মৃত্যুর কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে উপদেশ দিতেছেন। দেহের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মৃত্যু,—ইহা ভুলিলে চলিবে না। সাধারণ মানুষ তাহা মনে রাখেনা। মানুষ নিজের দেহটিকে অনেক রকম হিসাব করিয়া আশার প্রদীপে দীর্ঘ ও চিরঞ্জীবিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। মানুষ হিসাব করে তাহার বাবা, খুড়া, ৮৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, তাহার বংশ দীর্ঘজীবী সুতরাং সে অন্ততঃ ৮২ বৎসর বাঁচিবে। আবার জন্মপত্রিকার হিসাব আছে। জ্যোতিষী বলিয়াছেন স্ত্রীর বৈধব্য যোগ নাই, সুতরাং আগে স্ত্রী মরুক্ তাহার পর নিজের মৃত্যুকথা চিন্তা করিলেই চলিবে। এখনও তো অনেক সময় আছে। এইরূপ হিসাব নিকাশ কিন্তু মিলেনা—এমন উদাহরণ শত শত দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকাল একদিন হঠাৎ অতর্কিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অনুনয় বিনয় মানে না, চুলের মুষ্টি ধরিয়া দেহাভিমানী বিস্মিত জীবকে আকর্ষণ করিয়া কোথায় লইয়া যায়! তাই মৃত্যুকে মনে রাখিয়া অহরহঃ ভগবৎ স্মরণ করিতে হয়,—কর্ম্ম কর, বিষয় ভোগ কর, হাসপাতাল তৈয়ার কর, ভাল; কিন্তু ভগবৎ নাম ভুলিও না,—ইহাই আমাদের শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, ইহাই সাধু সন্তের উপদেশ বাণী। শ্রীকৃষ্ণ ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রেও অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন;

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।

—অতএব আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া যুদ্ধ কর। আগে স্মরণ পরে যুদ্ধ, স্মরণ ও যুদ্ধ একসঙ্গেই চালাইতে হইবে। শ্রীভাগবতেও ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় মহাত্মা বৃত্রাসুরের একহস্ত যখন ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছিন্ন, তখনও অপর হস্ত দিয়া ইন্দ্রের আঘাত নিবারণ করিতে করিতে বৃত্রাসুর শ্রীহরিকে অবিরত স্মরণ করিতেছেন। সে কী বিচিত্র ভাষায় বিচিত্র আত্মনিবেদন। ইহাই মানবধর্ম্ম—সুখে দুঃখে ভগবৎ স্মরণ, রোগে সুস্থতায়, দিবসে রাত্রিতে, আহারে বিহারে আশা নিরাশায় ভগবৎ স্মরণ,—ইহাই উপায়,—মৃত্যুকে জয় করিবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই।

হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে যে মৃত্যুকে জয় করিয়া "গতাগতি পুনঃ পুনঃ" রোধ করিবার আরও উপায় আছে,—ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সাধনের দ্বারাও পরমার্থ-লাভ হইতে পারে। নিশ্চয়ই। নাম সাধনের পরিপাকে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় আপনা হইতেই হইবে,—জ্ঞান ও ভক্তির জন্য সচেতন ভাবে অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিলেও চলিবে। কিন্তু জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির জন্য যে বিশেষ বিশেষ সাধনের নির্দ্দেশ আছে তাহা কলিহত, অন্নগত প্রাণ সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। জ্ঞান ও ভক্তির কথা আমরা মুখে বড় সহজেই ব্যবহার

করি। মুখের জ্ঞান ও মনের জ্ঞানের ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ;—আমরা শাস্ত্র পাঠ করিয়া, সাধুবাক্য শ্রবণ করিয়া অনেক কিছুই সত্য বলিয়া জানি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেই জ্ঞানকে জীবনে প্রতিফলিত করা অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অসম্ভব। দেহ আত্মা নহে, দেহ ও আত্মর মধ্যে বিশাল ব্যবধান, ইহা আমরা বুঝিতে পারি, তথাপি দেহাত্মবোধ আমরা সহজে ছাড়িতে পারিনা। যোগ অভ্যাস তো ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিলুপ্ত। পাতঞ্জলের চিত্তবৃত্তিনিরোধ শিক্ষা দিবার গুরু আজকাল নাই বলিলেও চলে, অথচ পুঁথি পড়িয়া যোগ অভ্যাস করার মত ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক উপায় আর নাই। যোগ বিশেষভাবে গুরুমুখী শিক্ষা। ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না চিনিতে অনেক দেরী লাগে, সদ্‌গুরু ব্যতীত ইহা দেখাইবার দ্বিতীয় লোক আর কেহই নাই।

প্রসুপ্তভুজগাকারা, আধার পদ্মবাসিনী, চিরনিদ্রাগতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন সেই ধৈর্য্য, সংযম ও সাধনা গৃহীর পক্ষে দুর্লভ, নাদ বিন্দু ভেদ করিয়া সহস্রার ভূমিতে প্রণবধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরমাত্মার আনন্দের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার ভাগ্য লইয়া সাধারণ গৃহী জন্মগ্রহণ করেনা। ভক্তিমার্গও যতটা সহজ ভাবা যায় ততটা সহজ নহে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলিতেছেন "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকী অনুরক্তির নাম ভক্তি। ইহা কি সহজ কথা! ধন, জন, মান, গৌরব, কামিনীকাঞ্চন কিছুই ভাল লাগেনা, শুধু ঈশ্বরকে ভাল লাগে, ঈশ্বরীয় কথা কহিতে ও শুনিতে ভাল লাগে, সুখে সম্পদে ভাল লাগে, রোগশোকেও ভাল লাগে, ব্যবসায় লাভ হইলেও ভাল লাগে, ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়া সর্ব্বস্ব হারাইয়াও ঈশ্বরকে ভাল লাগে, পুত্র কৃতী ও সম্মানী হইলেও ভাল, আবার বজ্রাঘাতে পুত্র মরিয়া গিয়াছে শুনিলেও ঈশ্বরীয় কথায় রুচি নষ্ট হয় না; ইহাই তো "পরানুরক্তিরীশ্বরে।" কয়জন লোকের পক্ষে মনের এই অবস্থা সম্ভবপর? অথচ সাধারণ মানুষ মনে করে ভক্তির পথ অত্যন্ত সহজ।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন অধ্যাপকের কার্য্য প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন জনৈক ছাত্রের আচরণ লক্ষ্য করিয়া যাহা শিক্ষা পাইয়াছিলাম তাহা আজিও ভুলি নাই। ইহসংসারে দয়াময় প্রভু মানুষকে কত উপায়ে শিক্ষা দিতেছেন, তাহার নির্ণয় নাই। এই ছাত্রটির একটি গণেশের মৃন্ময়মূর্ত্তি ছিল, প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পরম ভক্তি সহকারে সে গণেশের পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিত, সিদ্ধিদাতা গণেশকে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভূমিতে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিত। তাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষা আরম্ভ হইলে প্রতিদিন পরীক্ষা

গৃহে যাইবার পূর্ব্বে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সে গণেশকে প্রণাম করিত, পরীক্ষা শেষ হইলে ছাত্রাবাসে ফিরিয়া গণেশজীকে প্রণাম করিয়া তবে অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিত। একদিন ছাত্রাবাসে হৈ হৈ ব্যাপার। আমি যাইয়া দেখি যে ছাত্রটি অঙ্কের পরীক্ষা দিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার ত্রিতলের ঘর হইতে গণেশকে আমর্হার্ষ্ট ষ্ট্রীটে'র ফুট্‌পাথের উপর নিক্ষেপ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে, পুচ্ছবিমর্দ্দিত সর্পের মত ক্ষণে ক্ষণে তাহার অবরুদ্ধ গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে ছাত্রটি অঙ্কের পরীক্ষা খুবই খারাপ দিয়াছে, পাশ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং গণেশ ঠাকুরের উপর তাহার সমস্ত ভক্তি চটিয়া গিয়াছে অক্ষম ও অপদার্থ গণেশটিকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ব্যর্থভক্তি, নৈরাশ্য ও নিষ্ফলতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে। আমাদেরও ভক্তির পুঁজি সাধারণতঃ ইহার অধিক আর কিছুই নহে। ছেলের অসুখ হইলে ভগবানকে কত ডাকা-ডাকি, কত কাকুতি মিনতি, কিন্তু ছেলেটি মারা যাইলে স্তব্ধভাব, মনের সন্দেহ, বুকের ভিতর হাহাকার;—ভগবানকে এতো ডাক্‌লুম, তবু ছেলেটা বাঁচলনা। ভক্তির এই অভিনয় গৃহস্থের জীবনে অহরহ ঘটিয়াছে, এবং ঘটিতেছে। এই ক্ষীণপ্রাণ, ক্ষণভঙ্গুর, গণেশ-ভাঙ্গা ভক্তি লইয়া আমাদের কী পরমার্থ সাধিত হইবে!

এই সম্বন্ধে আরও ভাবিবার কথা আছে। আমরা গৃহীগণ আমাদের মনস্কাম সিদ্ধির জন্য দেবদেবীর নিকট পূজা মানত করি, সত্যনারায়ণের সিন্নী দিই। মাহিনা বাড়ুক্, অথবা ছেলে পাশ করুক, অথবা ব্যাধি আরোগ্য হউক,—কালী ঠাকুরের নিকট পূজা দিব,—কখনও বা মনের উচ্ছ্বাসে জোড়া পাঁঠা বলি দিবার সঙ্কল্পও করিয়া ফেলি। মাহিনা বাড়িল না অথবা ছেলে পাশ হইল না, অথবা ব্যাধি নিরাময় হইল না,—তখন আর পূজা দিই না, দেবী অথবা সত্য-নারায়ণের সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিনা। ঠাকুর যদি কিছু উপকার করেন তবেই তো প্রতিদানে পূজা দিব, উপকারই নাই তখন আবার পূজা কিসের! ইহা পাটোয়ারী ভক্তি,—ফেল কড়ি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর? অথচ প্রতি কাজের পর "শ্রীকৃষ্ণমর্পণমস্তু" বলি, আবার ফলের আকাঙ্ক্ষার উপরও তীব্র দৃষ্টি রাখি। ইহা ধর্ম্মের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা। কিন্তু মাহিনা না বাড়িলে, অথবা, ছেলে ফেল করিলে তো দেবীকে একথা বলিনা—"প্রভু তুমি অনন্ত জ্ঞানময়ী তুমি যাহা কর মঙ্গলের জন্য। পাশ ফেল, সুস্থতা অসুস্থতা, সবই তোমার দান, তুমি যাহা দিয়াছ তাহা দুইহাত প্রসারিত করিয়া গ্রহণ করিব, মাথায় তুলিয়া

ধরিব, কারণ তুমি যাহা বুঝিতে পার, আমি তাহা পারিনা। তুমি যাহা দিয়াছ তাহাই গ্রহণ করিয়া তোমার পূজা দিলাম।" এমনটি তো হয়না, এমনটি তো বলিনা। দেবতার সহিত এই বিষয়লাভের সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে "ন চ তৎ প্রেত্য ন ইহ"—ইহকাল অথবা পরকাল কোন কালেই তাহা উপকারে আসেনা। এমন কাজ-আদায়-করা-ভক্তি, এমন ব্যবসাবুদ্ধিপ্রসূত ভক্তি, এমন গণেশ-ভাঙ্গা ভক্তি লইয়া আমাদের কি হইবে! ভক্ত কবি বলেন—

পারিনা সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া আসা।

তাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি বহু দূরের কথা।

তাহা হইলে কি লইয়া থাকিব? জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি, যদি গৃহীর পক্ষে সুলভ না হয় তাহা হইলে গৃহীর উপায় কি? উপায় আছে। শ্রীভাগবত বলিতেছেন—

নামসঙ্কীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

—নাম করিলেই জন্মান্তরের কর্ম্মফল কাটিয়া যাইবে, জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইবে, শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি হইবে।

কিন্তু তবু মনে সন্দেহের উদয় হয়। মুখে নাম করিতেছি, কিন্তু মন চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ইহাতে নামসঙ্কীর্ত্তনের ফল হইবে কি? নিশ্চয়ই হইবে। নাম করিতে করিতে যুবকের মন হয়ত ফুটবলের মাঠে চলিয়া যাইতেছে, বৃদ্ধের মন সংসারের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—তাহাতে ক্ষতি নাই। নাম কর, নামই সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। একটা প্রচলিত ঠাট্টা আছে। গৃহিণী নামের মালা ঘুরাইতেছেন অথচ চক্ষু ও অঙ্গুলির ইঙ্গিতে জেলের নিকট মাছের দর করিতেছেন —এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া কেহ কেহ নামের প্রতি, নামকারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা নামের রস পান নাই, এবং নামের মাহাত্ম্য অবগত নহেন তাঁহারাই এইরূপ হালকা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া কৌতুক বোধ করেন। কিন্তু নাম কখনও ব্যর্থ হয়না, হেলায় শ্রদ্ধায় যেরূপে হউক নাম করিলেই তাহার কার্য্য হইবে, একটি নামও বৃথা যাইতে পারেনা। শ্রীভাগবতের সেই বিখ্যাত শ্লোক

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেববা
বৈকুণ্ঠ নামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদুঃ॥

—পুত্রাদির নামচ্ছলেই হউক, পরিহাসচ্ছলেই হউক, গীতালাপের পরিপূরণার্থেই হউক অথবা অবজ্ঞাপূর্ব্বকই হউক ভগবান শ্রীহরির নাম যেন তেন প্রকারেণ উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

নাম করা সরস হইবে, ভাবভক্তি মিশ্রিত হইবে, ইহা তো বহুদূরের কথা। নাম করিতে হইবে, সরসই লাগুক, বিরসই লাগুক ক্ষতি নাই, শেষ পর্য্যন্ত নাম কৃপা করিবেন, তখন নামে রতি হইবে।

মানুষের এই মনের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন ;

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগেনা যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ, প্রণমি তোমায়
গাহি বসে তব গান।

*　　*　　*　　*

ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরসা বরষা
যদি নেমে আসে মনে॥

নাম করিতে করিতে সরস প্রেমের নিবিড় বরষা একদিন আসিবেই আসিবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে,—একজন্মে? অত সহজে নহে, ধীরে ধীরে জন্মজন্মান্তর অতিবাহিত করিতে করিতে ক্রমশঃ শুদ্ধা ভক্তি আসিয়া চিত্তকে অধিকার করিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন :—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন্ ভাগ্যবান্ জীব
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

—তখন কৃষ্ণ কথায় রতি হইবে, তখন 'বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োঃ নঃ'—জিহ্বা সর্ব্বদাই হরিনাম কীর্ত্তন করে, কর্ণদ্বয় হরিকথা শুনিতে ভালবাসে, হস্তদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া কৃতার্থ হয়, মন সর্ব্বদাই শ্রীহরির পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া আনন্দ পায়। এই অবস্থা নাম হইতেই আসে, কিন্তু তাহা সময় সাপেক্ষ, হয়ত জন্মজন্মান্তর সাপেক্ষ। দেরী হইতে পারে, কিন্তু ফল অবশ্যম্ভাবী।

জ্ঞানভক্তিবিরহিত হরিনাম করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞান ভক্তির অধিকারী হইতে হইলে মানুষকে একটি সর্ত্ত পালন করিতে হইবে। নামকে মূল্যরূপে ব্যবহার করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ধন জন মান যশ ক্রয় করিবার উদ্দেশ্য করিলে

নামের গৌরব মলিন হইয়া যায়, নাম তখন বুদ্ধিদোষে সেই মানুষের জীবনে খাটো হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার পক্ষে জ্ঞান, ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণচরণে রতিলাভ করার আশা সুদূর পরাহত। নামকে খর্ব্ব করিলে চলিবেনা, নামকরাই নামকরার চরম সার্থকতা বলিয়া বিশ্বাস রাখিতে হইবে। নাম সম্পদের সেতু নহে, যদি কেহ নামের পরিবর্ত্তে সম্পদ প্রার্থনা করে তাহা সে পাইবে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তাহা মহারাণীর কাছে লাউ কুমড়া প্রার্থনা করার মত হাস্যাস্পদ ও নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইবে। যে নাম পরমার্থসিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ তাহার নিকট লাউ কুমড়া ভিক্ষা করা একান্ত মূর্খতার পরিচায়ক। এই একই কারণে সাধারণতঃ বিষয়ী ভক্তগণ তাহাদের গুরুদেবের নিকট হইতে পরমবস্তু লাভ করিতে সমর্থ হয়না। এমন দেখা যায় যে গুরু হয়ত মহাশক্তিশালী সিদ্ধপুরুষ, তিনি অনায়াসে শিষ্যকে পরমার্থলাভের পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, হাত ধরিয়া উপরের দিকে লইয়া যাইতে পারেন। অথচ গুরু হারিয়া যাইতেছেন, বিষয়লোলুপ বুদ্ধিহীন শিষ্য গুরুদেবকে নীচের দিকে টানিয়া ধরিয়াছে, বিষয়প্রয়াসী শিষ্যকে গুরুদেব নিত্যবস্তুর দিকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। গুরুশিষ্যের এই অবস্থা কল্পনা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন—"শিষ্য করলে গুরুকে তার পাপতাপ নিতে হয়।" শিষ্যের পুত্রের অসুখ হইয়াছে, শিষ্য গুরুদেবের নিকট তাহা জানাইয়া প্রতিকার ভিক্ষা করিতেছে, দুইটি চাকরি আসিয়াছে, কোন্‌টি লওয়া সমীচিন হইবে তাহা স্থির ক'রতে না পারিয়া শিষ্য গুরুর উপদেশ জানিতে চাহিতেছে, কোথায় ওকালতি করিতে বসিলে অর্থাগম সহজ হইবে তাহা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। ইহাতে যে, নিজ গুরুদেবকে ছোট করা হইতেছে তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি বিষয়ী লোকের নাই। ইহা যেন শালগ্রাম শিলা দিয়া বাট্‌না বাটা হইতেছে। পরম পূজ্যপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জনৈক শিষ্য তাঁহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে গুরুর উপদেশ লইয়া একজন পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পর দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই কন্যা বিধবা হইল। তখন কন্যার পিতা তাঁহার গুরুদেবের উপর সমস্ত আস্থা হারাইয়া ফেলিলেন। ইহাই স্বাভাবিক। গুরুর সহিত শিষ্যের সর্ব্বমলিনতাবিহীন, সর্ব্ব-প্রয়োজনাতীত পবিত্র সম্বন্ধ;—পৃথিবীর অন্য কোন দুইটি মানুষের ভিতর এমন মধুর ও পবিত্র সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। শাস্ত্র গুরুর সম্বন্ধে বলিতেছেন

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—কই গুরুদেবকে তো অর্থ, যশ অথবা বিষয়বুদ্ধি প্রদানকারী বলিয়া এখানে স্তুতি

করা হয় নাই ! অজ্ঞান শিষ্য জ্ঞানের জ্যোতিতে চক্ষুষ্মান্ হইয়া উঠিবে,—ইহাই গুরুবরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ও সার্থকতা আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য নাই। সংসার রক্ষা করা গুরুর কর্ত্তব্য নহে, আত্মার কল্যাণ সাধন করিবার দায়িত্বই গুরুদেব গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত ক্রীশ্চান সাধু Ignatius Loyola একদিন দেশ হইতে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া এই একই বাণী প্রচার করিয়াছিলেন :—

What is a man profited if he gains the whole world but loses his own soul ?

—আত্মার কল্যাণ যদি মানবজীবনের দ্বারা সাধিত না হয়, তাহা হইলে সেই চরম কল্যাণের পরিবর্ত্তে সমগ্র পৃথিবীর ধনজনমান পাইলেও কি মানুষের কোন লাভ হইবে ? নিশ্চয়ই না। সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য, শত গুণবান পুত্র অপেক্ষাও আত্মার কল্যাণ অনেক বেশী বড়। কিন্তু ইহা মানুষ বুঝিতে পারে না, গুরুরূপী কল্পতরুর নিকট লাউ কুমড়া চাহিয়াই খুসী হয়। মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবের নিকট ব্রহ্মশাপ খণ্ডন করিবার উপায় প্রার্থনা করিলেন না, তিনি বলিলেন—

কথয়স্ব মহাভাগ ! যথাহমখিলাত্মনি
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্।

তাই হরিনাম অথবা গুরুর নিকট অর্থ, যশ, আয়ু, সম্মান প্রার্থনা করিলে, গুরুর সহিত বৈষয়িক সম্বন্ধ স্থাপিত করিলে বিষয়ীর ভ্রমবশতঃ হরিনাম ও গুরুদেব উভয়ই মলিন হইয়া দাঁড়ান, তখন উদ্দেশ্যভ্রষ্ট শিষ্য আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিয়া চিরদিনের জন্য বঞ্চিত ও অনুতপ্ত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। জনৈক সাধকের একটি গান উদ্ধৃত করা হইতেছে,—এই গানই প্রকৃত শিষ্যের প্রাণের মর্ম্মকথা।

আমার অজ্ঞান তিমির
হে গুরু নাশ কর,
জ্ঞান-অঞ্জন নয়নে দাও।
শলাকয়া দিয়ে চক্ষু উন্মীলিয়ে
কৃপা ক'রে মোরে চেতন করাও ॥
ভ্রান্ত জীব আমি ভ্রম তো গেলনা
অসার সংসার সার তো হলনা,
আমার আসা-যাওয়া বড় পাই হে লাঞ্ছনা
গর্ভযন্ত্রণা আমার ঘুচাও ॥

মায়ায় মোহিত হয়ে ভুলিয়ে তোমারে
আমি মরি ঘুরে ঘুরে এই ভবঘোরে
আমারে কৃপা ক'রে আলো দেখাও ॥
তোমা বিনা আমার কেহ নাই জগতে
তুমি অগতির গতি শুনি পুরাণেতে,
দাস রাধাশ্যামের গতি করহে শীঘ্রগতি
আমি করিহে মিনতি ফিরিয়া চাও ॥

শিষ্যের প্রাণের এই আকূতির ভিতর ধনৈশ্বর্য্য অথবা বিষয়বুদ্ধির কোন কামনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "যারা অতি নীচু থর, তারাই ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্য।" অতি সত্য কথা, কিন্তু ইহাও সত্য যে, যাহারা নীচু থাকের শিষ্য তাহারাই গুরুর নিকট বিষয় বুদ্ধির পরামর্শ সন্ধান করে। মানুষের এই ভ্রম ও দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া ভক্তকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই
যাহা পাই তাহা চাইনা ॥

সর্ব্বশাস্ত্রের শেষ কথা শরণাগতি। শিশুর মত মায়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে, বেশী চালাক সাজিতে যাইলে আধ্যাত্মিক হানি অবশ্যম্ভাবী। সংসারে দুঃখকষ্ট তো আছেই,--দেহধারণ করিলে রোগশোক দুঃখ দৈন্য কিছুতেই এড়াইতে পারা যাইবেনা। তাই বলিয়া কি হরিনাম অথবা গুরুদেবকে রোগ-শোকের বৈদ্যরূপে ব্যবহার করিব? শালগ্রাম শিলা দিয়া বাট্‌না বাটিব? নিশ্চয়ই না। হরিনামের শরণ লইব এবং এই শরণাগতি হইতে নাম ও নামীর উপর বিশ্বাস আসিবে, অন্তরে ভক্তকবির বাণী অবিরত প্রতিধ্বনিত হইবে।

আসুক্ না কো গহন রাতি
হোক্ না অন্ধকার,
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার ॥

মূলকথা এই দাঁড়াইতেছে যে, "কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্তক্ষ্যে কলেবরম্"— এই প্রার্থনা সফল করিতে হইলে অহরহ, শ্বাস প্রশ্বাসে হরিনাম করিতে হইবে, "তং নমামি হরিং পরম্" বলিয়া নাম ও নামীর চরণে শরণাগত হইয়া, মাতৃক্রোড়ে শিশু সন্তানের মত জীবনের সর্ব্বভার মাতার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া সরলভাবে দিনযাপন করিতে হইবে। মৃত্যুকালে নিঃসঙ্গ মন শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবেদিত করিবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় সাধারণ গৃহীর পক্ষে নাই।

বেলা শেষে

[শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক]

বুড়া হইয়াছি, বয়স হয়েছে, বুঝি যবে সরি' গ্রাম ছেড়ে—
গ্রামেতে এখনো শিশু হয়ে আছি—আরামেতে দিন যায় বেড়ে।
ছোট ছেলে মেয়ে ঘিরে রয় মোরে—ভেঙে আসে যেন গ্রাম গোটা
বাধা মানেনাক—ষষ্ঠীদেবীর দধি হলুদের দেয় ফোঁটা।
প্রাচীন অশথ নূতন পত্রে সুশোভিত হয়ে প্রান্তরে—
হেসে বলে মোরে, 'দেখিছ বন্ধু—বেশ কাঁচা আছি অন্তরে।'
কোকিল শুধায় 'কেমন আছ হে?' বক বলে 'উড়ে যাচ্ছি ভাই',
'ভাল আছ আর ভাল থেকো যেন'—সবাকার মুখে এক কথাই।

কৃষ্ণচূড়া যে চূড়া বেঁধে দেয়—টোপর পরাতে বট চাহে,
বংশ বংশী লয়ে কাছে আসে— তবুও যায় না খট্‌কা হে।
বুড়া আকন্দ ফুলে ফুলে ভরা বলে কই দেখা পাই নে আর?
ফিরিবার পথে দেখা হল আজ—ঘনায়ে আসিছে অন্ধকার।
ফুল চেয়ে বেশী কাঁটাই পেয়েছি—কাহারো উপর নাইকো রাগ
সুবোধ বালাক 'গোপাল' ছিলাম—'বেণী' করিয়াছে মা'র সোহাগ।
ক্ষীর কই? কই মিঠাই কোথায়? জোগাইতে হয় আজ তাঁরে
জগজ্জননী ঝালাপালা হ'ল অকৃতী সুতের আবদারে।

—০—

শ্রীভগবতীমানসপূজাস্তবঃ

[শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ]

রে মায়ামহিষীকুতূহলকৃতে স্বপ্নেন্দ্রজালোপমে
গান্ধর্বে নগরে মৃষা নরপতীভূতং ত্বয়া মানস।
এবং তাবদনন্তকোটিজনয়োর্ব্যর্থং ত্বয়া যাপিতাঃ
শ্রান্তিশ্চেদিত এহি পশ্য নয়নপ্রেমাস্পদং মাতরম্ ॥

বঙ্গানুবাদ :

—রে মন, বিশ্বরাজ মহিষীমায়ার কৌতূহলরচিত স্বপ্ন ও ইন্দ্রজাল সদৃশ এই গন্ধর্বনগরে মিথ্যা রাজা হইয়া রহিলে! এইরূপে তুমি অনন্ত কোটি জন্ম বৃথাই যাপন করিয়াছ। যদি পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, এই দিকে এস নয়নাভিরাম জননীকে দর্শন কর।

(২)

পশ্যানন্দসুধাসমুদ্রবিলসচ্চিন্তামণিমণ্ডপম্
পুষ্পোদ্ভাষিত-রত্নসৈকতমণিদ্বীপান্তরালস্থিতম্।
দিব্যা কল্পমনল্পকল্পলতিকাজল্পদ্দ্বিরেফাকুলম্
কূজৎ কোকিলসারিকাশুককুলৈরোঙ্কারঝঙ্কারিতম্ ॥

—ঐ দেখ আনন্দময় সুধাসমুদ্রের মধ্যে রত্নবালুকামণ্ডিত পুষ্পোদ্ভাষিত মণিদ্বীপ। তাহার অভ্যন্তরে চিন্তামণি মন্দির, এই মন্দির স্বর্গীয় শোভায় সুশোভিত, কত কল্পলতার সৌরভাকৃষ্ট ভ্রমরকুলে এই মন্দির মুখরিত, কোকিল শারিকা ও শুককুলের ওঁকারধ্বনিতে এই মন্দির ঝঙ্কারিত।

(৩)

দিগ্‌বালাকুলকোমলাঙ্গুলিদলৈর্হারাবলীভূষিতম্
দ্বারাবস্থিত-দর্শনাগত-মুনিচ্ছায়াস্তবদ্ভূতলম্।
মোহস্যৈব বিড়ম্বনাং কলয় রে যত্র ত্বয়া যাপিতম্
কা মায়া নগরী ক্ব বেদৃশপুরী ত্রৈলোক্যরত্নাঙ্কুরী ॥

—দিগ্‌বালাকুলের কোমল অঙ্গুলিদল ইহাকে মাল্যশ্রেণি দ্বারা সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। জগজ্জননী দর্শনের নিমিত্ত সমাগত মুনিগণের ছায়াচ্ছলে

ভূতল নিজেও যেন এই মন্দিরের স্তুতি করিতেছে। রে মন তুমি অনন্তকাল যেখানে যাপন করিয়াছ তাহা মোহের ছলনা। মায়ারচিত নগর কোথায়, আর ত্রৈলোক্যের রত্নরাশির অঙ্কুরস্থানীয় ঈদৃশ পুরীই বা কোথায়?

(৪)

সৌভাগ্যং যদি মন্দিরে প্রবিশ রে লব্ধোঽবকাশস্ত্বয়া
দূরাদেব নিরীক্ষ্যতাং ত্রিভুবনাহ্লাদায়মানং বপুঃ।
জ্যোতীরাশিতলে সুশীতলসুধাসূতেরধিষ্ঠাত্রিকা
পশ্যাসৌ ভুবনৈকমোহনতনুঃ শ্রীরাজরাজেশ্বরী॥

—রে মন, যদি সৌভাগ্যের উদয় হইয়া থাকে তবে মন্দিরে প্রবেশ কর; এইবার তুমি অবকাশ পাইয়াছ। দূর হইতে ত্রিভুবনের পুঞ্জীভূত আহ্লাদের ন্যায় শ্রীজননীর তনু দর্শন কর। ঐ দেখ জ্যোতিরাশির মধ্যে সুশীতল সুধাকরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভুবনমোহিনী শ্রীরাজরাজেশ্বরী বিরাজমানা।

(৫)

সেয়ং তে জননী জনৈকশরণীভূতেয়মালক্ষ্যতাম্
অস্যাঃ শ্রীচরণে শ্রিয়োঽপি রমণে বিশ্রব্ধমারম্যতাম্।
ভ্রাতঃ পশ্য সুদূরতোঽপি জননী প্রস্যন্দমানস্তনী
ক্রোড়ীকর্ত্তুমনাঃ প্রসারিতকরা ত্বামীক্ষতে সাগ্রহম্॥

—ইনিই তোমার সেই জননী, বিশ্বজনের একমাত্র শরণস্বরূপা ইঁহাকে ভাল করিয়া দেখ। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরও মনোভিরাম ইঁহার চরণকমলে বিশ্বস্ত হৃদয়ে রতি লাভ কর। ঐ যে ভাই দেখ, সুদূর হইতেও (তোমাকে দেখিয়া) তাঁহার স্তনদ্বয় হইতে স্তন্যক্ষরণ হইতেছে। তিনি তোমাকে কোলে লইবার অভিলাষে হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া তোমাকে সাগ্রহে দেখিতেছেন।

(৬)

চিত্তাকর্ণয় কর্ণভূষণমিদং তত্ত্বামৃতং শোভনম্
ভ্রাতস্তত্ত্বমসীতি সত্যবচনং মাতুঃ সরূপঃ সুতঃ।
সঙ্কল্পাদিয়তীং দশামুপগতো মাতুর্বিয়োগং গতঃ
দুঃখং তে বত ভূতপঞ্চকময়ং কারাগৃহং নির্মিতম্॥

—চিত্ত কর্ণভূষণ সুমধুর এই তত্ত্বামৃত শ্রবণ কর—তত্ত্বমসি এই শ্রুতিবচন

সত্য। পুত্র জননীর সমান রূপ পাইয়া থাকে। তুমি কেবল সঙ্কল্পেরই ফলে এতদূর দুর্দ্দশার গ্রাসে পড়িয়া মাতৃবিয়োগ যাতনা ভোগ করিতেছ, তোমার জন্য দুঃখময় পঞ্চভূতের কারাগার নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৭)

তৎকারাগৃহমুক্তিমিচ্ছসি মনঃ তৎ সর্ব্বমেকৈকশো
দত্ত্বা মাতৃপদে স্বয়ং সুখময়ে তত্রৈব রে লীয়তাম্‌ !
রে চেতো দয়মানদীর্ঘনয়নস্নেহাম্বুনঃ প্লাবনাৎ
সর্ব্বং ক্ষালিতমত্যপাপময়ি ভোঃ জাতোহবকাশঃ শুভঃ ॥

—মন যদি সেই কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা কর, কারাগার রচনার উপকরণ সমূহ একটি একটি করিয়া মাতৃচরণে সমর্পণ কর। পরিশেষে স্বয়ং সেই সুখময় শ্রীচরণে লীন হইয়া যাও। রে মন শ্রীশ্রীজননীর দয়মান দীর্ঘনয়ন হইতে বিগলিত স্নেহ সলিলের প্লাবনে তোমার সকল পাপ প্রক্ষালিত হইয়াছে। তোমার শুভ অবসর আসিয়াছে।

(৮)

ভাগ্যং ভাগ্যমহো মহোবহুতিথে কালে গতে শ্রীমতী
মাতেয়ং তব দর্শনাতিথিরহো জাতা রহো মানস।
এহি ভ্রাতরতস্তদীয় চরণে পূজাবিধীরচ্যতাম্
মাতঃ স্নেহময়ি প্রসীদ দয়য়া পূজেয়মাদীয়তাম্ ॥

—অহো ভাগ্য অহো কি উৎসব ! বহুকাল পরে আমার শ্রীশ্রীজননী আমার নয়নপথে অতিথি হইয়াছেন। অহো মন, গুপ্ত প্রকোষ্ঠে জননীর দর্শন লাভ করিয়াছি। অতএব এস ভাই তাঁহার চরণে পূজা করা যাক। স্নেহময়ি মাতঃ তুমি প্রসন্ন হও, দয়া করিয়া আমাদের এই পূজা গ্রহণ কর।

(৯)

এতং ভূমিময়ং গৃহাণ বিমলং গন্ধম্, ত্বয়া লিপ্যতাম্
সর্ব্বব্যাপিনি তে নভোময়মিদং পুষ্পঞ্চ হারাবলিঃ।
এবং তৈজসদীপ এষ চ মরুদ্ধূপোয়মাদীয়তাম্
এতত্তে সলিলস্বরূপময়ি ভো নৈবেদ্যমাবেদ্যতে ॥

—এই ভূমি (পৃথিবীবীজ) স্বরূপ বিমল গন্ধ গ্রহণ কর এবং অঙ্গে লেপন

কর। সর্ব্বব্যাপিনি, এই যে আকাশতত্ত্বরূপ পুষ্প এবং মালিকাশ্রেণী তোমারই জন্য নিবেদন করিতেছি। এইরূপ তেজস্তত্ত্বরূপ দীপ ও বায়ুতত্ত্বরূপ ধূপ নিবেদন করিতেছি তুমি ইহা গ্রহণ কর। অয়ি মাতঃ, এই যে তোমার জন্য জলতত্ত্বরূপ নৈবেদ্য নিবেদন করিতেছি।

(১০)

তন্মাত্রাদিকমেতদত্রভবতীস্পর্শান্ময়া কল্পিতম্
তৎ সর্ব্বং ভবতী দয়া পরবশা গৃহ্ণাতু দাসার্পিতম্।
এতন্নেত্রযুগং তবৈব চরণধ্যানে ময়া যোজিতম্
কর্ণৌ তে মধুরে গুণাবলিরসে হ্যনাস্বাদিতে লোলুপৌ॥

—তন্মাত্র প্রভৃতি যাহা কিছু আমি তোমারই সংস্পর্শে কল্পনা করিয়াছিলাম তুমি দয়াপরবশ হইয়া তোমার দাসজনের অর্পিত তৎসমুদয় গ্রহণ কর। আমার এই নয়নযুগল তোমারই চরণধ্যানে নিয়োজিত হইতেছে কর্ণদ্বয় তোমারই মধুর ও সরস অনাস্বাদিতপূর্ব্ব গুণাবলি শ্রবণে লোলুপ হইয়াছে।

(১১)

নাসা তে কমনীয় সৌরভযুতে পাদাম্বুজে সঙ্গতা
জাতা তে গুণকীর্ত্তনব্যসনিনী দীনা রসজ্ঞা মম।
তৎ প্রাপ্তোঽবসরস্ত্বগিন্দ্রিয়মপি স্পর্শায় লালায়তে
যৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়মন্যদত্রভবতী—পূজোৎসবং কার্য্যতে॥

—আমার এই নাসা কমনীয় সৌরভযুত তোমার পাদাম্বুজে মিলিত হইয়াছে। আমার দীনা রসনা তোমার গুণকীর্ত্তনে আসক্ত হইয়াছে। অবসর মিলিয়াছে মনে করিয়াছে আমার ত্বগিন্দ্রিয়ও তোমার স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়াছে। আমার অন্য কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ পূজার উৎসবে নিযুক্ত হইয়াছে।

(১২)

প্রাণাস্তে প্রিয়নামকীর্ত্তনবশাদাবদ্ধধৈর্য্যাঃ শনৈঃ
নাসাভ্যন্তরচারিণঃ স্থিরতরা দৌবারিকা স্থাপিতাঃ।
মাতস্তচ্চরণে মনোঽহমধুনা লীয়ে সুধাসাগরে
ইত্যুক্ত্বা চিরশান্তিধামনি মনো লীনং জলে বীচিবৎ॥

—আমার এই প্রাণবর্গ তোমার প্রিয়নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমশ

ধৈর্য্যলাভ করিয়াছে ; এবং নাসাদ্বারে স্থিরতর দৌবারিকরূপে স্থাপিত হইয়াছে। মাতঃ আমি মন তোমার চরণরূপ সুধাসাগরে লীন হইতেছি এই বলিয়া সেই চিরশান্তিনিকেতনে মন লীন হইল—জলরাশিতে বীচিমালা যেরূপ লীন হয় সেইরূপে।

(১৩)

তস্মিন্নির্মক্ষিকমত্র জাতময়ি ভো মাতর্দয়াম্ভোনিধে
দাসী বুদ্ধিরিয়ং ত্বদীয়চরণে জ্ঞানার্থিনী বর্ত্ততে।
কা ত্বং কাহমিদং মনঃ কলকলান্নালং সমালোচিতুম্
তন্মাং বোধয় সাম্প্রতং কথময়ং সংসার আড়ম্বরঃ ॥

—অয়ি মাতঃ এতদিনে আজ সম্পূর্ণ নির্জন অবস্থায় তোমাকে পাইয়াছি। দয়াম্ভোনিধে (দয়াসাগর স্বরূপে) তোমার এই দাসী বুদ্ধি তোমার চরণ সমীপে জ্ঞানার্থিনী। কে তুমি আমিই বা কে, মনের কোলাহলে এতদিন তাহা আমি আলোচনা করিবার অবসর পাই নাই। এখন তুমি আমাকে বুঝাইয়া বল এই সংসার আড়ম্বর কিরূপে উঠিল।

(১৪)

ইত্যুক্ত্বা বিররাম বুদ্ধিরিহ ধ্যানৈকতানা তদা
তাম্ জ্যোতিঃ পরিবেষরাজদমলজ্যোৎস্নাময়াঙ্গীং প্রতি।
চিত্রং তৎক্ষণ এব বাঙ্মনসয়োস্তৎ কিঞ্চনাগোচরম্
আবির্ভূতমভূৎ নিজেন সহসা সংপ্লাবয়ৎ সর্ব্বতঃ ॥

—এইরূপ বলিয়া বুদ্ধি জ্যোতির পরিবেষে বিরাজমান জ্যোৎস্নাময়ী মায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া ধ্যানে একাগ্র হইল। অদ্ভুত ব্যাপার, তৎক্ষণাৎ এক অবাঙ্মনসগোচর বস্তু নিজের অভৌতিক তেজোরাশিতে সকল পরিব্যাপ্ত করিয়া আবির্ভূত হইলেন।

(১৫)

বিসর্জ্জিতা মূর্ত্তিরহো পয়োদধৌ
তেনৈব মচ্ছিদ্রামিদং বিনির্মিতম্।
বৈগুণ্যকার্য্যঞ্চ কৃতং গুণাত্যয়াৎ
সর্ব্বং কৃতং ভক্তকৃতার্থতা যতঃ ॥

॥ ইতি ভগবতীমানসপূজাস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

—অহো সেই জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি পরমাত্মসাগরে বিসর্জিত হইল এবং তাঁহা দ্বারাই অচ্ছিদ্র হইয়া গেল অর্থাৎ নিশ্ছিদ্ররূপে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল পক্ষান্তরে পূজার অচ্ছিদ্রাবধারণ সম্পন্ন হইল। গুণাতীত বস্তুর উদরে বৈগুণ্যভাবে প্রকাশিত হইল, পক্ষান্তরে পূজার বৈগুণ্যোপশমন হইয়া গেল। যাহাতে ভক্তগণের কৃতার্থতা লাভ হয় তৎসমুদয়ই কৃত হইল।

—০—

আগমনী

[শ্রীনকুল চন্দ্র নায়ক, বি-এ]

এস শারদীয়া শ্যামল শস্যে
শালির মধুর গন্ধে,
আজি নির্ম্মল দীঘি-কালোজল
চঞ্চল মৃদু মন্দে।
এস গগনের ওই নীলিমায়
ভাসমান শ্বেত অভ্রে,
আজি ছায়াপথ তারকা-উজল—
এস গো শারদা শুভ্রে!
এস ভকতের কামনা পূরণে,—
সাজানো অর্ঘ যতনে,
এস গো জননী ভুবনমোহিনী
রূপময়ী স্মিতবদনে!
এস অধমের আগমনী-গানে—
শোক তাপ আঁধি হরণে,
এস সবাকার রিপু পরাজয়ে
এস গো জগত-পালনে।

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ]

॥ ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ॥

ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তে জীবাত্মা ও পরমেশ্বর উভয়েই বিভু দ্রব্য। অথচ জীবাশ্রিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই সুখ ও দুঃখের জনক হইয়া থাকে। ইহাই উক্ত আচার্য্যগণের অভিপ্রায়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অচেতন বস্তু। অচেতন বস্তু চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্যের জনক হইয়া থাকে। যেমন মৃত্তিকা, দণ্ড প্রভৃতি অচেতন বস্তু চেতন কুম্ভকারের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্যের জনক হইয়া থাকে। এইরূপ জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মও ঈশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই কার্য্যের জনক হইয়া থাকে। জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর তবেই হইতে পারেন যদি জীবের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ সম্ভাবিত হয়। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধই সম্ভাবিত না হইলে ঈশ্বর জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। এজন্য ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ না থাকিলে জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ঈশ্বরে সম্ভাবিত হইবে না। আর ইহাই বার্তিককার উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন—"আত্মান্তরাণামসম্বন্ধাদধিষ্ঠাতৃত্বমনুপপন্নমিতি চেৎ।" (ন্যাঃ সূঃ- ৯৫২ পৃঃ) ইহার অভিপ্রায় এই যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জীবাত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত থাকে। জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধও নাই, পরম্পরা সম্বন্ধও নাই। আর ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ না থাকিলে ঈশ্বরের সহিত অসম্বন্ধ ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর হইবেন কিরূপে? সম্বন্ধ নাই বলিয়া ঈশ্বর যদি ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হইতে না পারেন তবে চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবৃত্তিই সম্ভাবিত হইবে না। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন যে, জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অজ সম্বন্ধ আছে। ইহা কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন। "অজঃ সম্বন্ধ আত্মান্তরাণামিত্যেকে ইচ্ছন্তি।" (ন্যাঃ সূঃ ৯৫২ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, জীবাত্মার সহিত পরমেশ্বরের অজ সংযোগ অর্থাৎ নিত্য সংযোগ আছে—ইহা কোন কোন আচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। ততঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন—ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার নিত্য সংযোগ ন্যায়শাস্ত্রেও নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অজ সংযোগ নিষেধ না করায় ইহা নৈয়ায়িকগণেরও সম্মত বটে। "ন চৈতদ্ হি প্রতিষিধ্যতে,

ইতি অপ্রতিষেধাদনুপাত্তঃ স ইতি।" আবার বার্তিককার বলিয়াছেন—যাঁহারা এই অজসংযোগ স্বীকার করেন তাঁহারা প্রমাণ দ্বারা অজসংযোগের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের কেবল স্বীকারোক্তি মাত্র নয়। অজসংযোগ সাধক অনুমান এইস্থলে বার্তিককার প্রদর্শন করিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ ব্যাপকৈ রাকাশাদিভিঃ সম্বদ্ধঃ, মূর্তিমদ্দ্রব্যসম্বন্ধিত্বাদ্ ঘটবদিতি। যথা ঘটাদি মূর্তিমতা ঘটাদিনা সম্বন্ধিত্বেন ব্যাপকৈরাকাশাদিভিঃ সম্বধ্যতে তথা ঈশ্বরোঽপি মূর্তিমৎ সম্বন্ধীতি। তস্মাদয়মপি ব্যাপকৈরাকাশাদিভিঃ সম্বধ্যত ইতি। (ন্যাঃ সূঃ-৯৫২ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায়—পরমেশ্বর আকাশ, দিক্, কাল ও জীবাত্মার সহিত সম্বদ্ধ অর্থাৎ সংযুক্ত হইবে যেহেতু ঈশ্বর মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত। যে যে দ্রব্য মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে সে সমস্ত দ্রব্য আকাশাদি বিভুদ্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন ঘটাদি দ্রব্য ঘটপটাদি মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া আকাশাদি বিভুদ্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ ঈশ্বরও ঘটপটাদি মূর্তদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত বলিয়া আকাশাদি বিভুদ্রব্যের সহিতও সংযুক্ত হইবে। এস্থলে বার্তিককারের অভিপ্রায় এই যে আকাশ, দিক্, কাল, জীবাত্মা ও ঈশ্বর ইহারা বিভুদ্রব্য, সর্বগত দ্রব্য। ইহা ন্যায়বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন সমস্ত মূর্তদ্রব্যের সহিত যে দ্রব্য সংযুক্ত থাকে তাহাকে বিভুদ্রব্য বা সর্বগতদ্রব্য বলা হয়। সর্বগত বা সর্বব্যাপী দ্রব্য বলিলে সেই দ্রব্য সমস্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত ইহা বুঝিতে হইবে। কিন্তু বার্তিককার বলিতেছেন—সর্বদ্রব্যের সহিত যাহা সংযুক্ত তাহাই সর্বগত বা সর্বব্যাপী দ্রব্য। সর্বদ্রব্যসংযোগী স্বীকার না করিয়া সর্বমূর্তদ্রব্যসংযোগী এইরূপ বলিলে বস্তুতঃ সর্বগতত্বের হানিই ঘটে। এজন্য সর্বদ্রব্যসংযোগিত্বই বিভুত্ব বা সর্বগতত্ব। আর এজন্য বিভুদ্রব্যের সহিত বিভুদ্রব্যের সংযোগ আছে। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য বার্তিককার অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্তিককার প্রদর্শিত এই অনুমান প্রমাণ মীমাংসকগণের সম্মত ইহা আমরা পরে প্রদর্শন করিব। (৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এই মীমাংসা সিদ্ধান্ত নৈয়ায়িক মতে অনিষিদ্ধ বলিয়া বার্তিককার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। ততঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন—বিভুদ্রব্যের সহিত বিভুদ্রব্যান্তরের অজসংযোগ স্বীকার করায় জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরেরও অজ-সংযোগ স্বীকৃত হইয়াছে। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের এই অজসংযোগ ব্যাপ্যবৃত্তি কি অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন যে এই প্রশ্নের উত্তরদানের কোন আবশ্যকতা নাই। "স পুনরাত্মেশ্বরসম্বন্ধঃ কিং ব্যাপকোঽব্যাপকো বেতি অর্থাভাবাদব্যাকরণীয়ঃ প্রশ্নঃ। আত্মেশ্বরসম্বন্ধো-

ইত্যতোতদেব শক্যতে বক্তুম্। স পুনরীশ্বরাত্মানৌ ব্যাপ্নোতি ন ব্যাপ্নোতি ইতি ন ব্যাক্রিয়তে।" জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর বলা হইয়াছে। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ না থাকিলে জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ঈশ্বরের থাকিতে পারে না, এজন্য ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার অজসংযোগ আছে ইহা দেখান হইল। কিন্তু সেই সংযোগ জীবাত্মা ও ঈশ্বরকে ব্যাপন করিয়া আছে কি অব্যাপন করিয়া আছে ইহা নিরূপণের কোন প্রয়োজন নাই। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেও জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব ঈশ্বরে সম্ভাবিত হইবে। ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধির জন্য জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধই অপেক্ষিত কিন্তু সম্বন্ধের ব্যাপ্যবৃত্তিতা বা অব্যাপ্যবৃত্তিতা অপেক্ষিত নহে।

—০—

(ক্রমশঃ)

সংবাদ

গুরুপূর্ণিমার দিন কানপুরস্থ বিঠুর-আশ্রমে অষ্টপ্রহর ব্যাপী নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই আশ্রমে অন্যান্য উৎসব-ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতেছে। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় আশ্রম ও উৎসবগুলি সুপরিচালিত হইতেছে—কিঙ্কর শ্রীমোহনানন্দজী, শ্রীশিবকান্ত বাজপেয়ী, শ্রীহেমেন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীসুশীল কুমার বাজপেয়ী, শ্রীদুলাল দাস, শ্রীশৈলেন বসু, শ্রীঅনিল চক্রবর্তী, শ্রীরামু ভট্টাচার্য, শ্রীসুনীল ঢোল, শ্রীনীলকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

* * * *

কিঙ্কর শ্রীগোবিন্দদাসজীর নেতৃত্বে জয়গুরু সম্প্রদায়ের একটি কীর্তনমণ্ডলী নাসিক-কুম্ভমেলায় শ্রীশ্রীনাম প্রচার শেষ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই মণ্ডলীতে ইঁহারা ছিলেন—কিঙ্কর শ্রীসেবানন্দজী, শ্রীকুমারনাথজী, শ্রীভগবানদাসজী প্রভৃতি।

* * * *

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ চুঁচুড়া, তোলাফটক জেলেপাড়ায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় ৩।৪ ঘণ্টা নামকীর্তন হইতেছে। স্থানীয় ভক্তদের দ্বারা এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে।

* * * *

বর্ধমান-জেলার করন্দা-গ্রামে ১৩৬০ মাঘ হইতে প্রত্যহ নিয়মিত নামকীর্তন হইতেছে। শ্রীশ্রীদাম গোস্বামী, শ্রীবিভূতি ভূষণ গোস্বামী, শ্রীপঞ্চানন মোদক, শ্রীকমলাকান্ত কোয়ার, শ্রীমতী আশালতা দেবী প্রভৃতির সহায়তায় এই কীর্তনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে।

* * * *

২৮শে শ্রাবণ ধানবাদ-লোয়াবাদ কোলিয়ারীর অন্তর্বর্তী শ্রীযুক্ত বাসুদেব প্রসাদজীর বাসভবনে অষ্টপ্রহর ব্যাপী নামযজ্ঞ হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ পাঠকজী এই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন। স্থানীয় বাঙ্গালী ভক্তগণ ও অন্যান্য নরনারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

* * * *

১লা শ্রাবণ শ্রীরামানন্দ মঠে (চিতারমার পড়া, রামানন্দ মঠ) হরিবাসরের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে চতুষ্প্রহর ব্যাপী অখণ্ড নামযজ্ঞ হয়। দিগসুই, তারাগুণ, মগরা, খলসী প্রভৃতি গ্রামের ভক্তগণ এই উৎসবে যোগদান করেন।

* * * *

শ্রীপঞ্চানন-আশ্রমে (সোৎপানি, বর্ধমান) আষাঢ় মাস হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিত নামকীর্তন হইতেছে। আশ্রমসেবক শ্রীরামদাস কিঙ্কর ও শ্রীএককড়ি বৈরাগীর নেতৃত্বে কয়েকজন যুবক এই কীর্তন পরিচালনা করিতেছেন।

* * * *

শ্রীভক্তিভূষণ সরকার (বিবিগঞ্জ, মেদিনীপুর) তাঁহার বাসভবনে ১লা বৈশাখ হইতে প্রতিদিন অপরাহ্নে নামকীর্তন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সরকারের স্ত্রী-পুত্র ও অন্যান্য ভক্তগণ এই কীর্তনে অংশ গ্রহণ করেন।

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ,
তৃতীয় সংখ্যা

কার্ত্তিক
১৩৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

—০—

মুরলীধারীর মাধুর্য্য

[শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম্‌-এ, পি এইচ-ডি, ডি-লিট্‌]

অস্তি স্বস্তরুণি করাগ্র বিগলৎ কল্পপ্রসূনাপ্লুতম্
বস্তু প্রস্তুত-বেণু-নাদ-লহরী-নির্ব্বাণ-নির্ব্যাকুলম্।
স্রস্ত স্রস্ত নিরুদ্ধ নীবি-বিলসৎ গোপীসহস্রাবৃতম্
হস্ত ন্যস্ত নতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি ॥

লীলাশুক শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের প্রলাপোক্তি উপরোক্ত শ্লোকটি। প্রলাপ হইলেও প্রমাদহীন, ভক্তিরসসিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ। হস্তী মৃত হইলেও মূল্য লক্ষ মুদ্রা। প্রেমবান ভক্ত মোহগ্রস্ত হইলেও সিদ্ধান্ত বিরোধী বা রসাভাস দোষযুক্ত কথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইবে না।

প্রেমোন্মাদ লীলাশুক শ্রীবৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন। সঙ্গে কয়েক মূর্ত্তি বৈষ্ণব আছেন। তাঁহারা সুধাইলেন "স্বামিজী, এত ব্যাকুলতা লইয়া কোথায়

ছুটিয়াছেন?" লীলাশুক উত্তর করিলেন, "ব্রজভূমি অভিমুখে যাইতেছি।" পুনরায় প্রশ্ন হইল "কেন, সেখানে কী আছে?"

"কী আছে?" প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাতুর ভক্তবরের নয়নপথে ব্রজ-রাজনন্দন স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইলেন। উপর্য্যুক্ত শ্লোকটি প্রলাপোক্তির মত কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হইল। শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত শ্রীগ্রন্থের ওটি বস্তু নির্দ্দেশাত্মক দ্বিতীয় শ্লোক। বস্তুতঃ কোন সিদ্ধান্তের দিকে লক্ষ্য করিয়া ইহা লেখা হয় নাই। তথাপি এই প্রেম-প্রলাপে শুদ্ধ রসসিদ্ধান্ত প্রকটিত। ব্রজভূমিতে কী আছে প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—সেখানে একটি পরমতম বস্তু আছে। (বস্তু অস্তি)। সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি সদ্‌গুণসমূহ যাহাতে বাস করে তিনি বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত এই বস্তুর কথা বলিয়াছেন "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং" তিনিই বেদ্য, বাস্তব ও শিবদ বস্তু।

অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ এই তিনকালে যিনি বিকাররহিতভাবে বিরাজিত তিনি বস্তু। বস্তু মূলতঃ কালাতীত। ভাগবত বলিয়াছেন "বিনাচ্যুতাৎ বস্তু-তরং ন বাচ্যং" শ্রীঅচ্যুত বিনা আর কোন বস্তু নাই। প্রিয়জনের মনপ্রাণ যিনি প্রেমদ্বারা আচ্ছাদন করেন (বস্তে) তিনিই বস্তু। এই পরম বস্তু শ্রীবৃন্দাবনে আছে।

প্রশ্নকারী জানিতে চাহেন, সেই বস্তুটি কি। তিনি কি পরব্রহ্ম? নির্গুণ নির্বিকার নিরাকার সত্তামাত্র? লীলাশুক বলিতেছেন, 'না, তাহা নহে, তিনি নিরাকার নহেন। তিনি নিত্য নিরুপম নিরুপাধি একটি কিশোরাকৃতি। আকারটি জড়ীয় বিকারজ নহে। উহা সচ্চিদানন্দ ঘনীভূত বিগ্রহ॥

তিনি কী করেন? জিজ্ঞাসার উত্তর বলিতেছেন—তিনি যমুনাতটে বংশী-বটে ধীর সমীরে বেণু করে ধরিয়া বাদন করিয়া থাকেন। তিনি নিজেই নিজ বেণুনাদের লহরীমালার আনন্দে (নির্ব্বাণ) বিভোর হইয়াছেন! নিজেই নিশ্চল (নির্ব্ব্যাকুল) হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

অই বেণুর ধ্বনিতে আর কী হইতেছে? স্বর্গের দেবতরুণীরা সন্ধ্যাবেলা কল্পবৃক্ষের ফুল তুলিতেছিলেন। মোহন মুরলীর তান শুনিয়া তাঁহারা অবশাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছেন। ভাবাবেশে তাঁহাদের হস্ত কাঁপিতেছে। ফলে, অবশ হস্ত হইতে কল্পপুষ্পগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে মুরলীধরের চতুর্দ্দিকে। তাহাকে যেন পুষ্পস্নান করাইয়া আপ্লুত করিয়া দিতেছেন।

পরম আকর্ষণকারী ঐ বেণুনাদে আর কি হইতেছে? সহস্র সহস্র গোপী ছুটিয়া আসিতেছে। তাঁহাদের দেহ ভাবে বিবশ হওয়ায় নীবিবন্ধ খসিয়া

যাইতেছে। পাছে গুরুজনের চোখে পড়ে এই আশঙ্কায় তাঁহারা নীবিবন্ধ সুদৃঢ় করিতেছে। কিন্তু হায়! আবারও যে খসিয়া যাইতেছে। শেষে নিজেরাই উন্মাদিনী হইয়া ছুটিতেছে। নীবি বন্ধন করিবার আর অবকাশ নাই। হাতে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতেছে। এইভাবে আলুথালু বেশে ধাবমানা হইয়া আসিয়া তাহারা মুরলীধারীকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে।

ব্রজসুন্দরীগণ কৃষ্ণোন্মুখী হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের আসিবার পক্ষে কতিপয় বাধা বিপুল। গুরুজনের বারণ, লজ্জা, সমাজধর্ম, দেবধর্ম্ম এই সকলই নিদারুণ শৃঙ্খলের মত বাধাজনক। এই শৃঙ্খল হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিবার উপায়টি শ্রীকৃষ্ণ হস্তেই ন্যস্ত। অর্থাৎ ঐ চাঁদমুখে বেণুধ্বনি করিলে আর কোন বাধাই বাধা দেয় না। দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খলা ছেদন করিয়া গোপীরা কৃষ্ণের কাছে আসিয়াছে। একথা তিনি নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন। 'যা মা ভজন্ দুর্জ্জর গেহশৃঙ্খলা সংবৃশ্চ্য।'

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিলোদার। তাঁহার ঔদার্য্যের তুলনা নাই। কল্পবৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিলে দান পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই কতশত প্রকারে দান করেন। অখিল সদ্‌গুণে শ্রীকৃষ্ণ নিরুপম, নায়কশিরোমণি।

এই পরমবস্তু ব্রজে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। চতুর্ভুজ নারায়ণাদি অন্যান্য দেবদেবীগণ তাঁহারই বিভূতি। তত্ত্বতঃ সবই এক। ব্রহ্মবস্তুতে ভেদজ্ঞান অপরাধের। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মতত্ত্ব একটি বই দুটি নাই। "একং সৎ" বস্তুকে বিপ্রগণ বিবিধ নামে ও রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং তত্ত্বাংশে সবই এক। কিন্তু ভেদ আছে রসাংশে। যেমন ক্ষীর ছানা মাখন ঘৃত—এই সকল বস্তু তত্ত্বতঃ দুগ্ধই কিন্তু রসতঃ আস্বাদনে ইহাদের মধ্যে পৃথকত্ব আছে, প্রচুর তারতম্য আছে।

সুতরাং বস্তুতত্ত্ব এক হইলেও আস্বাদন বৈচিত্র্যে শ্রীকৃষ্ণ অসমোর্দ্ধ। শ্রীকৃষ্ণে নিখিলরস বিরাজমান—তিনি অখিলরসের অমৃতঘন বিগ্রহ। তাঁহাকে মল্লগণ দেখে ভীষণ অশনিতুল্য; রাজন্যবর্গ দেখেন মহারাজচক্রবর্ত্তী। স্নেহপ্রবণা নারীগণের চক্ষে তিনি সাক্ষাৎ কামদেব। অসৎ রাজাগণের দৃষ্টিতে তিনি মহাশাসক। কংশের অগ্রে তিনি মূর্ত্তিমান কালান্তক। সাধারণের চক্ষে নরশিশু, যোগীগণের দিব্যদৃষ্টিতে তিনি পরাৎপর তত্ত্ব। পিতামাতার শিশু, গোপগণের খেলার সাথী, যাদবগণের পরম্ দেবতা, ব্রজবধূগণের প্রাণবল্লভ।

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর—এই দ্বাদশটি রসের তিনি পরম বিষয় একই কালে। কৃষ্ণ সর্ব্ব রসাধার

সর্ব্ব গুণাধার, সর্ব্বপ্রেমাধার। অসমোর্দ্ধ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের ঘনীভূত প্রতিমা সেই কিশোরাকৃতি ব্রজদুলাল।

শ্রীনন্দনন্দনে চারিটি মাধুর্য্য অনন্যসাধারণ। রূপমাধুর্য্য, বেণু-মাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য ও লীলামাধুর্য্য। শ্রীভগবান চিরসুন্দর। তাঁহার সকল রূপেই সৌন্দর্য্য। তথাপি শ্রীব্রজবিহারীর রূপের মাধুর্য্য শব্দাক্ষরে বর্ণনীয় নহে। ঐ-রূপে রূপের মানুষ তিনি স্বয়ং পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ।

বেণুমাধুর্যের কথা এতক্ষণ বলা হইল। বেণুর তানে ধেনু বনে ফিরে, গোবর্দ্ধন গলিয়া যায়, যমুনা উজানে বয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মাধুর্য্যে বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত পুলকিত। প্রীতিরসের পূর্ব্বরাগাদি যত প্রকার বৈচিত্র্য হইতে পারে সকলই অশেষ বিশেষে গোপীজনবল্লভে পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত।

শ্রীগোবিন্দের লীলামাধুর্য্যও নিরুপম। স্তন্যপান করিতে করিতে পুতনার মত মায়াবিনীর বিনাশ। মধুর নৃত্য করিতে করিতে কালীয় নাগের ফণাগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে দমন। বালমাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই যে অসুরবধাদি কার্য্য সাধন ইহা এক অলৌকিক সামর্থ্য, অনন্যসাধারণ মাধুরী।

যাহারা শ্যামসুন্দরের এই চতুর্ব্বিধ মাধুর্য্যে বিমুগ্ধচিত্ত এই সংসারে আর কোন বস্তুই তাহাদের মন আকর্ষণ করিতে পারেনা। বংশীধ্বনি যে কর্ণে শুনিয়াছে সেই কর্ণে অন্য শব্দ আর প্রবেশ করেনা। বৃন্দাবনীয় রসমধুরিমায় যে ডুব দিয়াছে তাহার আর অন্যকথায় রতি থাকিবে না। তদ্ রসামৃততৃপ্তানাং নান্যত্র স্যাদ্ রতি কচিৎ॥

তাই শ্রীরূপ গোস্বামীচরণ কহিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ রূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

যদিচ শ্রীনাথ নারায়ণ ও রাধানাথ কৃষ্ণে স্বরূপতঃ সিদ্ধান্তগত কোন ভেদ নাই তথাপি সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমরসবত্তা নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণ রূপ মাধুর্য্যেই সর্ব্বোৎকর্ষতা। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমে হৃতচিত্ত একান্তী ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তি ত তুচ্ছ করেনই, শ্রীনারায়ণের পরমপ্রসাদও তাহাদের মন হরণ করিতে পারেনা। মনো হর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ॥

—০—

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

॥ চতুর্থ প্রকরণ, দশম উচ্ছ্বাস ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

॥ শ্রীরামঃ শরণং মম ॥

মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদং
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হ্যঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্।
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটলবিধৌ খেসম্ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলকলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্ ॥

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ুসূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥

রাম, লক্ষণ, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও হনুমানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

মনোভিরামং নয়নাভিরামং
বচোভিরামং শ্রবণাভিরামম্।
সদাভিরামং সততাভিরামং
বন্দে সদা দাশরথিঞ্চ রামম্ ॥

মনের প্রীতিপ্রদ, নয়নসুন্দর, বাক্যমনোহর, শ্রবণমনোরম, সর্ব্বদা অভিরাম, নিরন্তর অভিরাম দাশরথি রামকে বন্দনা করি।

কাল বল্লে, রাম নাম হতে প্রণব, হংসঃ, সোহং ইত্যাদি সপ্তকোটী মন্ত্র হ'য়েছে। এখানে ওঙ্কার ও রাম নাম অভিন্ন, এইকথাই বলা হলো তো ?

ভেদ নাইও, আছেও। প্রণবে সকলের অধিকার নাই, রাম নামে অতি নীচ মহাপাপী তারও অধিকার আছে। এই রাম নাম জপ কর্লে নির্গুণ সগুণ যে যেরূপে দর্শন প্রার্থনা করবে, সে সেই রূপেই দেখা পাবে।

নির্গুণ সগুণের কথা কেমন মনে রাখতে পারিনে একটু ভাল করে বুঝিয়ে বল।

শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীভগবান্ বেদব্যাস বলেছেন—যে অদ্বয় জ্ঞানকে তত্ত্ববিদ্-গণ 'তত্ত্ব বা ব্রহ্ম' বলেন, যোগিগণ তাঁকে পরমাত্মা এবং ভক্ত তাঁকেই ভগবান্ বলে থাকেন।

খোলসা করে বুঝিয়ে বল।

জ্ঞানিগণ সেই বহুরূপীকে অসীম পরম ব্যোমরূপে ধ্যান করে তাঁতে বিলীন হন। যোগিসমূহ অপরিমিত জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মারূপে ধ্যান করে তাঁতে আত্মাকে বিলয় করে দেন। আর ভক্তগণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কিম্বা ধনুর্ব্বাণধারী অথবা বেণুবাদন মনোহারীরূপে তাঁকে লাভ করতঃ সেবাপূজা করে কৃতার্থ হন। ভক্তের ভগবান্ পূজা নেন, দর্শন দেন, কথা কন, হাস্য পরিহাস করেন, ভক্তের চিন্তায় সতত ব্যাকুল হ'য়ে যোগক্ষেম বহন করে থাকেন।

অনন্ত সীমাশূন্য মহাকাল অমিতনিরবধিক জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মা ধনুর্দ্ধারী বেণুধারী হন। এর রহস্য ভেদ করা অতি কঠিন ব্যাপার দেখছি।

কঠিনও বটে আবার কঠিন নয়ও বটে। তার কথা—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" যে আমায় যেরূপে ভজনা করে, আমি সেইরূপেই তাকে ভজনা করি। যদি কেহ বলেন—সাকার ঠিক নিরাকার ভুল অথবা নিরাকার ঠিক সাকার কিছু নয়, তা'হলে বুঝতে হবে এখনও ঠাকুরটির সেই ভক্তের উপর সম্পূর্ণ কৃপা হয়নি। কৃপা হলেই বুঝতে পারবেন্ ভুল কিছু নাই সব ঠিক, একমাত্র তিনিই আছেন। নির্গুণ সগুণ সবই সেই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের লীলাতনু।

গৌরী, শঙ্কর, গণেশ, সূর্য্যও কি তিনি?

তিনি ভিন্ন যে আর কিছু নাই। এক সেই পরম বস্তুকে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, সীতারাম, কৃষ্ণরাধা, গৌরীশঙ্কর, গণেশ, সূর্য্য বলে। শুধু তাই নয়, অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড—পশুপক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, হিমালয় পর্ব্বত, মহাসাগর, ধূলিকণা কাঁকর বালি, অণুপরমাণু সবই সেই বহুরূপীর লীলাতনু।

বল—বল, কবে আমি মনে প্রাণে একথা বুঝতে পারবো। কি কর্‌লে আমি এতে স্থিতি লাভ কর্‌তে পারবো।

কেবল রাম রাম কর্‌লেই সব হ'য়ে যাবে।

আচ্ছা শ্রুতিতে কি ভগবানের সাকারের কথা আছে?

সূর্য্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। অধুনা শুন—

"সর্ব্ব পরিপূর্ণস্য পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারং বিনা কেবলনিরাকারত্বং যদ্যভিমতং তর্হি কেবল নিরাকারস্য গগণস্যেব পরব্রহ্মণোঽপি জড়ত্বমাপদ্যেত"

—ত্রিপাদ বিভূতি মহা, না, উ।

সর্ব্বপরিপূর্ণ পরব্রহ্মের সাকার বিনা কেবল নিরাকার যদি অভিমত হয়, তা'হলে কেবল নিরাকার গগনের ন্যায় পরব্রহ্মেরও জড়ত্ব উপস্থিত হয়।

"তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ সাকারনিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ॥" —ঐ

সেই হেতু পরব্রহ্মের সাকার নিরাকার স্বভাবসিদ্ধ।

সাকার অবলম্বনে নিরাকার পৌঁছিতে হবে এমন নয় ?

না, না, সেই সচ্চিদানন্দঘন পুরুষোত্তম,—সাকার নিরাকার, সাকার নিরাকারের অতীত।

আচ্ছা, তুমি নামের মহিমা বল।

শ্রীরামনাম নিখিলেশ্বর মাদিদেবং
ধন্যা জনাঃ ক্ষিতিতলে সততং স্মরন্তি।
তেষাং ভবেৎ পরমমুক্তি রযত্নতস্তথা
শ্রীরাম ভক্তি রচলা বিমলা প্রসাদদা॥

—শিবপুরাণ।

শ্রীরামনাম অখিলের ঈশ্বর আদিদেব। জগতে সেই মানবগণই ধন্য, যাঁরা সতত তাহা স্মরণ করেন। তাঁদের অনায়াসে পরম মুক্তিলাভ ও নিশ্চলা নির্ম্মলা প্রসন্নতাদায়িনী শ্রীরামভক্তি লাভ হয়ে থাকে।

যে মুক্তি—জ্ঞান না হ'লে হয় না, সে মুক্তি অনায়াসে হয় কেমন করে ?

শ্রুতি বলেন—

অশেষেন পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স এব বিমল ক্রমঃ॥

অশেষভাবে বাসনা ত্যাগের নাম মুক্তি। ভগবন্নাম কীর্ত্তনে কিভাবে যে বাসনা সকল নির্ম্মূল হয়ে যায় ভক্ত তা জান্‌তেও পারেন না। "আমি" "আমার" রূপ হৃদয়গ্রন্থি চিরতরে বিভিন্ন হয়ে যায়।

রামনাম সদা সেব্যং জয়রূপেন নারদ।
ক্ষণার্দ্ধং নামসংহীনং কালং কালাতিদুঃসহম্॥

—শিবপুরাণ।

হে নারদ! রাম নাম জয়রূপে অর্থাৎ জয়রাম এমন ভাবে সতত সেবনীয়। নামহীন অর্দ্ধক্ষণকাল, তাহাও যমের ন্যায় অতি দুঃসহ॥

কথাটা কি হ'লো ?

কাউকে জলে ডুবিয়ে ধরে থাক্‌লে সে যেমন হাঁক পাঁক করে, নাম শূন্য হলে ভক্তের প্রাণের অবস্থা সেইরূপ হয়। মাছকে জল থেকে তুললে সে যেরূপ বাঁচেনা তদ্রূপ প্রকৃত অনন্যভক্ত নামশূন্য হলে বেঁচে থাক্‌তে পারেননা। প্রাণ নামের সঙ্গেই চলে যায়।

ধ্যেয়ং জ্ঞেয়ং পরং সেব্যং রামনামাক্ষরং মুনে।
সর্ব্বসিদ্ধান্তসারং হি সৌখ্য-সৌভাগ্যকারণম্ ॥
নাম্নৈব পরমং জ্ঞানং ধ্যানং যোগং তথা রতিম্।
বিজ্ঞানং পরমং গুহ্যং রামনাম্নৈব কেবলম্ ॥

—মৎস্যপুরাণ।

হে মুনে! রামনামের ক্ষরণহীন অক্ষরদুটী ধ্যানযোগ্য নিখিল জ্ঞাতব্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র জানবার যোগ্য, উত্তম সেবনীয়। ইহা সতত সেবনে ইহলোক পরলোকের কোন চিন্তা থাকেনা। রাম নামই "রামই নিখিল জগৎ এই পরম জ্ঞান," ধ্যান, যোগ, রতি, পরম গোপনীয় বিজ্ঞান, কেবল একমাত্র রামনাম।

বিজ্ঞান কি?

পূর্ব্বে ভগবদুক্তে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে—(ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস)। "এই জ্ঞানই কিঞ্চিৎ বিকৃত আকারে বিজ্ঞান হয়। যে একমাত্র পরমাত্মার সহিত বিশ্ব অনুগত, যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তাহা দেখায় না। জ্ঞান দশায় ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত ভাব অনুগত দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিজ্ঞান দশায় কেবল পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া দৃষ্ট হইয়া থাকেন; সেই দর্শনানন্দে অনুভবানন্দে নয়ন মুদ্রিত হওয়ায় তদীয় অনুগত কিছুই বিজ্ঞানের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না।"

কথাটা ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

জ্ঞানেতে—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, নরনারী, পশুপক্ষী, সব ভগবান, সব থাকে ও ভগবান থাকেন। বিজ্ঞানে আর কিছুই থাকেনা। কেবল তরঙ্গহীন সমুদ্রের মত শান্ত একমাত্র শ্রীভগবানই থাকেন। হাঁড়ী কলসী মালসা বোধ থাকে না। বিজ্ঞানে কেবল মাটী বোধই থাকে। জ্ঞান ধ্যান রতি পরম গোপনীয় বিজ্ঞান, কেবল একমাত্র রাম নাম জপের দ্বারা সব লাভ হয়।

উচ্চকণ্ঠে সর্ব্বশাস্ত্র একবাক্যে সেই কথা বলেছেন—

রামনাম প্রভাবোঽয়ং সর্ব্ববেদৈঃ প্রপূজিতঃ।
মহেশ এব জানাতি নান্যো জানাতি বৈ মুনে ॥

—পাদ্মে ক্রিয়াযোগসারে।

হে মুনে! সমস্ত বেদে উত্তমরূপে পূজিত রামনামের এই প্রভাব কেবলমাত্র মহেশ্বরই জানেন, অন্য কেহ জানেন না।

শিব বলেছেন—

যদি কেহ রামচন্দ্রে করয়ে আশ্রয়।
তবে মোর কতই পরমানন্দ হয়।

দেখ দেখ সংসার অসংখ্য জীবময়।
তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয়॥
তার কোটি মধ্যে একজন ধর্ম্মপর।
তার কোটি মধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর॥
তার কোটি মধ্যে একজন হয় মুক্ত।
তার কোটি মধ্যে এক রামভক্তিযুক্ত॥
হেন রামভক্ত যদি হয় কোন জন।
তাঁর গুণে কত লোকে পায় বিমোচন॥
অতএব সতত বাসনা মোর মনে।
ভজুক সকল লোক শ্রীরাম চরণে॥

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

—o—

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ]

॥ ঈশ্বরের সহিত জীবের সম্বন্ধ ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

বার্তিককার এইরূপে জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অজসংযোগ সমর্থন করিয়া পরে আবার বলিয়াছেন—যাঁহারা অজসংযোগ স্বীকার করেন না, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার পরম্পরাসম্বন্ধ স্বীকার করেন অর্থাৎ সংযুক্তসংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। ন্যায়সিদ্ধান্তে মন অণুপরিমাণ বলিয়া তাহা মূর্ত দ্রব্য। সমস্ত বিভু সহিত সংযুক্ত। এজন্য মন যেমন জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত এরূপ ঈশ্বরের সহিতও সংযুক্ত। সুতরাং জীবাত্মসংযুক্ত মনঃসংযোগ ঈশ্বরে আছে। এবং ঈশ্বরসংযুক্ত মনঃসংযোগ জীবাত্মাতে আছে। জীবাত্মসমূহের মনঃ সমূহ সমস্তই ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত। এজন্য সম্বন্ধসম্বন্ধ ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার আছে। আর তদ্দ্বারাই ঈশ্বর জীবাত্ম সমবেত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। (৯৫৭ পৃঃ, ন্যাঃ সূত্র)

এস্থলে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের এবং জীবাত্মসমবেত ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার না করিলে ঈশ্বর জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন

না। সম্বন্ধ সাক্ষাৎ সংযোগ বা সমবায় নহে। এই দুইটি মাত্রই সম্বন্ধ নহে। পরম্পরাসম্বন্ধও সম্বন্ধ বটে। সংযুক্ত সংযোগি সমবায়ও সম্বন্ধই বটে। পরমাণ্বাদি ঈশ্বরের সহিত সংযুক্তই বটে। ঈশ্বর সংযুক্ত পরমাণ্বাদির সহিত জীবাত্মাও সংযুক্তই বটে। জীবাত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম সমবেত আছে। সুতরাং ঈশ্বরের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সংযুক্ত সংযোগি সমবায় আছে। ঈশ্বরসংযুক্ত পরমাণ্বাদি সংযোগী জীবাত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের সমবায় আছে। অথবা ঈশ্বরের সহিত জীবাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মের সংযুক্ত সমবায়ই সম্বন্ধ হইবে। ঈশ্বর সংযুক্ত জীবাত্মাতে ধর্ম্মাধর্ম্ম সমবায় সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সংযোগ বার্তিককার স্বীকার করিয়াছেন। এবং অজসংযোগসাধক অনুমান প্রমাণও দেখাইয়াছেন। তাৎপর্য্য টীকাকার বলিয়াছেন—"সংযুক্তসমবায়ো বা ক্ষেত্রজ্ঞেন ঈশ্বরস্য সংযোগাৎ অজসংযোগস্যাপি উপপাদিতত্বাৎ। (তাৎপর্য্যটীকা ৯৫৭ পৃঃ)

বার্তিককার অজসংযোগ স্বীকার করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারও তাহার সমর্থন করিয়াছেন ইহা প্রদর্শন করা হইল। কিন্তু ৪।২।২০ ন্যায়সূত্রের বার্তিকে বার্তিককার বলিয়াছেন—যাবন্মূর্তদ্রব্যসংযোগিত্বই সর্বগতত্ব। যন্মূর্তিমত্তেন সর্বেণ সম্বধ্যত ইতি সর্বগতত্বার্থঃ। (১০৬১ পৃঃ, ন্যাঃ সূঃ) এই বার্তিকের টীকাতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, সর্বমূর্ত্তসংযোগিত্বই সর্বগতত্ব স্বীকার করায় বার্তিককার যে অজসংযোগ স্বীকার করিয়াছেন তাহা প্রৌঢ়িবাদ বলিয়াই মনে হয়। "মূর্তিমতা সর্বেণ সম্বন্ধত্বং সর্বগতত্বম্ বদতো বার্তিককারস্যাজসংযোগস্যাভ্যুপগমঃ প্রৌঢ়িবাদতয়ে বিলক্ষ্যতে।" (১০৬১ পৃঃ, ন্যাঃ সূঃ)।

প্রশস্তপাদভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—"নাস্তি অজসংযোগো নিত্যপারিমণ্ডল্যবৎ পৃথগনভিধানাৎ। যথা চতুর্বিধপরিমাণ সমুৎপাদ্যমুক্ত্বা আহ নিত্যং পারিমাণ্ডল্যামিতি এবমন্যতরকর্মজাদি সংযোগমুৎপাদ্য মুক্ত্বা পৃথগ্ নিত্যং ব্রূয়াৎ ন ত্বেবমব্রবীৎ। তস্মান্নাস্তি অজসংযোগঃ।" ইহার অভিপ্রায় বৈশেষিক সিদ্ধান্তে অজসংযোগ স্বীকৃত হইতে পারে না কারণ সূত্রকার কণাদ নিত্যসংযোগ স্বীকার করেন নাই। সূত্রকার যেমন অণুত্ব-হ্রস্বত্ব-মহত্ত্ব-দীর্ঘত্ব এই চতুর্বিধ অনিত্য পরিমাণের কথা বলিয়া পরে "নিত্যং পারিমাণ্ডল্যম্" এইরূপ বলিয়াছেন। উক্ত চতুর্বিধ পরিমাণ উপপাদ্য হইলেও পরমাণু পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য নিত্য, তাহা উৎপাদ্য নহে এরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু সূত্রকার কণাদ অন্যতরকর্মজ সংযোগ, উভয়জসংযোগ ও সংযোগজসংযোগ এই ত্রিবিধ সংযোগ উৎপাদ্য অর্থাৎ অনিত্য বলিয়া পরে অজসংযোগ নিত্য অথবা বিভুদ্বয়ের সংযোগ নিত্য এরূপে নিত্যসংযোগের কথা বলেন নাই। তাহাতে বুঝিতে পারা যায় অজসংযোগ বলিয়া

কিছুই নাই, থাকিলে সূত্রকার অবশ্যই বলিতেন। (প্রশস্তপাদভাষ্য, সংযোগ-গুণনিরূপণ)

বৈশেষিক সিদ্ধান্তে অজসংযোগ প্রত্যাখ্যাত হইলেও বার্তিককার অজ-সংযোগের সমর্থনও করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন ন্যায়সিদ্ধান্তে অজসংযোগ নিষিদ্ধ না হওয়ায় এবং অজসংযোগ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ন্যায়সিদ্ধান্তে অজসংযোগও গৃহীত হইতে পারে। আমরা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি—বার্তিককার প্রদর্শিত মীমাংসক সম্মত অজসংযোগাণুমান আমরা পরে প্রদর্শন করিব। এস্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আত্মা আকাশসংযোগী ঈশ্বরসংযোগী বা ঘটসংযোগিত্বাৎ পটবৎ। এই অনুমানে আত্মা পক্ষ, আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগ সাধ্য, ঘটসংযোগিত্বহেতু, পটাদিমূর্ত্তদ্রব্য দৃষ্টান্ত। যাঁহারা অজসংযোগ মানেন না, তাঁহাদের নিকটে এই পরার্থানুমান প্রদর্শিত হইতেছে। পটাদিমূর্ত্তদ্রব্যে ঘট-সংযোগিত্ব আছে এবং তাহাতে আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগও আছে। এইরূপ বিভু আত্মাতেও ঘটসংযোগিত্বরূপ হেতু আছে বলিয়া তাহাতে আকাশ-সংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগরূপ সাধ্যত্ব থাকিবে। যে যে দ্রব্য ঘটসংযোগী তাহারা সকলে আকাশ সংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী হইয়া থাকে। বিভু আত্মা ঘটসংযোগী বলিয়া আত্মাও আকাশসংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী হইবে। ইহাতে পূর্বপক্ষিগণ ঘটসংযোগিত্বহেতুর ব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য বলেন যে, দিক ও কালে ঘটসংযোগিত্বরূপ হেতু আছে বটে কিন্তু দিক্ ও কালে আকাশ-সংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগরূপ সাধ্য নাই। এজন্য উক্তহেতু সাধ্যাভাববৎ দিক্ ও কালে আছে বলিয়া এই হেতুটি ব্যভিচারী হইয়াছে। ইহার উত্তরে স্থাপনানুমানবাদী বলেন যে, দিকে ও কালে উক্ত হেতুর ব্যভিচার উদ্‌ভাবন করা যায় না। কারণ দিক্ ও কাল পক্ষসম। পক্ষে বা পক্ষসমে ব্যভিচার উদ্‌ভাবিত হইতে পারে না। পক্ষে বা পক্ষসমে ব্যভিচার দোষ হইলে সমস্ত অনুমানের উচ্ছেদ হইবে। যাঁহারা আত্মাকে আকাশসংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী বলেন তাঁহারা দিক্ ও কালকেও আকাশসংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী স্বীকার করেন। কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যে দিক ও কাল উল্লিখিত হয় নাই এইমাত্র। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যভিচার অকিঞ্চিৎকর। আরও কথা এই যে, আত্মা যদি আকাশ সংযোগী বা ঈশ্বরসংযোগী না হয় তবে আত্মার সর্বসংযোগিত্ব বা বিভুত্বই ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আত্মার বিভুত্ব শ্রুতিসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। সর্বসংযোগিত্বই বিভুত্ব। আত্মা আকাশাদিসংযোগী না হইলে সর্বসংযোগিত্বরূপ বিভুত্বই আত্মার অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য যে দ্রব্যে ঘটসংযোগিত্বরূপ হেতু আছে তাহাতে যদি আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগ না

থাকে তবে তাহা বিভুদ্রব্য হইতে পারিবে না। আত্মাতে ঘটসংযোগিত্ব হেতু থাকিয়াও যদি তাহাতে সাধ্য আকাশসংযোগ বা ঈশ্বরসংযোগ না থাকে তবে আত্মার বিভুত্বই ভঙ্গ হইবে। যদি বলা যায়, যাবন্মূর্তসংযোগিত্বই বিভুত্ব কিন্তু যাবদ্দ্রব্যসংযোগিত্ব বিভুত্ব নহে আর তাহাতে আত্মা আকাশাদি বিভুসংযোগী না হইলেও আত্মার বিভুত্ব ভঙ্গ হইবে না। পূর্ব্বপক্ষিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। পূর্বপক্ষীর মতে ক্রিয়াবদ্দ্রব্যত্ব বা পরিচ্ছন্ন পরিমাণবদ্দ্রব্যত্বই মূর্তত্ব। এই উভয়বিধ মূর্তত্বকে অপেক্ষা করিয়া দ্রব্যত্ব লঘু। সুতরাং যাবন্মূর্তসংযোগিত্ব অপেক্ষা যাবদ্দ্রব্যসংযোগিত্ব লঘুভূত। মূর্তধর্ম্ম জাতি নহে কিন্তু প্রদর্শিতরূপ সখণ্ড ধর্ম্ম। দ্রব্যত্ব জাতি সুতরাং সখণ্ড ধর্ম্ম হইতে জাতি লঘুশরীর। এজন্য যাবন্মূর্তসংযোগিত্ব অপেক্ষা যাবদ্দ্রব্যসংযোগিত্ব লঘুভূত। এই লঘুভূত ধর্মই বিভুত্ব কিন্তু প্রদর্শিত গুরুভূত ধর্ম বিভুত্ব নহে। আর যাঁহারা মূর্তত্ব ধর্মকেও জাতি বলিয়া থাকেন তাঁহারা মনে করেন ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে মূর্তত্ব জাতি সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহাদের এরূপ কল্পনা অতি অসঙ্গত। ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদক-রূপে যদি মূর্তত্ব একটি জাতি সিদ্ধ হয় তবে স্পর্শসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়েও আর একটি জাতির সিদ্ধি হইবে। এইরূপ রস-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে পৃথিব্যাদি ভূতদ্বয়ে আর একটি জাতি সিদ্ধ হইবে। এইরূপ রূপসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ে আর একটি জাতি সিদ্ধ হইবে। এইরূপে অপ্রামাণিক বহুতর জাতির কল্পনার আপত্তি হইবে। এজন্য ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে কোন জাতির কল্পনা হইতে পারে না, হইলে স্পর্শাদি সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপেও জাত্যন্তর কল্পনা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। এজন্য মূর্তত্ব জাতিই হইতে পারে না। যাঁহারা মূর্তত্বকে জাতি স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা অনবধানতাবশতঃই তাহা করিয়াছেন। সুতরাং সর্বমূর্ত-সংযোগিত্ব অপেক্ষা সর্বদ্রব্যসংযোগিত্বই লঘু বলিয়া বিভুত্ব হইবে। বিভুদ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার না করিলে বিভুদ্রব্যের বিভুত্বের ভঙ্গই বাধক হইবে। লাঘব তর্ক সর্ব্বপ্রমাণেরই অনুগ্রাহক।

যদি বলা যায়, যেরূপে অজসংযোগ সিদ্ধ হইয়াছে এইরূপে অজবিভাগও তো সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন আত্মা আকাশাদিবিভক্তঃ ঘটাদিবিভক্তত্বাৎ পটবৎ এইরূপ অনুমানেরও তো প্রয়োগ হইতে পারে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অজসংযোগ স্বীকার না করিলে বিভুত্বেরই ভঙ্গ ঘটে কিন্তু অজবিভাগের অনঙ্গীকারের কোন বাধক নাই। এজন্য অজবিভাগসাধক অনুমান অপ্রয়োজক সাধ্যের অসাধক। যদি বলা যায় আকাশ-বিভাগ লাঘবপ্রযুক্ত দ্রব্যমাত্রবৃত্তি

হইবে কিন্তু গৌরববশতঃ মূর্তদ্রব্যমাত্রবৃত্তি হইবে না আর তাহাতে দ্রব্যমাত্রবৃত্তি আকাশ সিদ্ধ হইল বলিয়া আত্মাদি বিভুদ্রব্যে আকাশবিভাগ অজবিভাগই হইবে, এইরূপে অজবিভাগ সিদ্ধ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অজসংযোগের মত অজবিভাগও যদি সিদ্ধ হয় তবে হউক্, ইহাতে হানি কি? যদি বলা যায়, যে সময়ে যন্নিরূপিত সংযোগ যাহাতে আছে সেই সময়ে সেই বস্তুতেই তন্নিরূপিত বিভাগও আছে ইহা তো বিরুদ্ধ। আত্মাদিতে আকাশসংযোগও আছে, আকাশ-বিভাগও আছে—এরূপ কখনও স্বীকার করা যাইতে পারে না। অজসংযোগের মত অজবিভাগও স্বীকার করিলে বিরুদ্ধ সংযোগবিভাগদ্বয় একসময়ে এক বস্তুতে আছে, স্বীকার করিতে হইবে। এজন্য অজসংযোগ ও অজবিভাগ সিদ্ধ হইতে পারে না।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অজসংযোগ ও অজবিভাগ উভয়েই প্রমাণসিদ্ধ হইলে বিরুদ্ধ হইবে কেন? প্রমাণ সিদ্ধও বটে বিরুদ্ধও বটে ইহা ত হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণসিদ্ধ বস্তুতে বিরোধই অসিদ্ধ। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে, অজসংযোগবিভাগবাদী কি সংযোগবিভাগের বিরোধিতা স্বীকার করেন না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অনিত্যসংযোগ ও অনিত্যবিভাগের বিরোধিতা আছে বটে, অনিত্যসংযোগ ও অনিত্যবিভাগের বিরোধিতাতে প্রমাণ আছে কিন্তু নিত্যসংযোগ ও নিত্যবিভাগের বিরোধিতাতে কোন প্রমাণ নাই। আর যদি নিত্যসংযোগ ও নিত্যবিভাগের বিরোধ স্বীকার করা যায় তবে নিত্যবিভাগই অসিদ্ধ হইবে। আর তাহাতে এক সময়ে সংযোগ বিভাগ স্বীকার করিতে হইবে না। আত্মা আকাশ সংযুক্তও বটে, বিভক্তও বটে এইরূপ হইবে না। নিত্যবিভাগের অস্বীকারেই প্রদর্শিত বিরোধের সমাধান হইবে। (অদ্বৈত রত্ন রক্ষা ৫ পৃঃ)।

এস্থলে বার্তিককার প্রভৃতি "মূর্ত্তদ্রব্যসংযোগিত্বাৎ" এই হেতুর দ্বারা নিত্য সংযোগের অনুমান করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই স্থলে "সংযোগিত্বাৎ" এই মাত্র হেতু। "মূর্তদ্রব্য" শব্দটি পরিচায়ক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এইমাত্র। এই জন্য চিৎসুখাচার্য "আকাশমাত্মনা সংযুজ্যতে সংযোগিত্বাৎ ঘটবৎ।" এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন (চিৎসুখী ২০১ পৃঃ)। এই অনুমানটি যে মীমাংসক সম্মত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মীমাংসক সম্মত এই অনুমানটি খণ্ডন করিবার জন্য অতি প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য মানমনোহরকার বাদি বাগীশ্বর বলিয়াছেন যে, এই অনুমানে ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্তত্বাদি উপাধি হইবে। সাধ্যের ব্যাপক, হেতুর অব্যাপক ধর্মকে উপাধি বলে। এই উপাধি উদ্‌ভাবনে অতি সহজ রীতি এই যে, যে ধর্ম

দৃষ্টান্ত ধর্মীতে আছে এবং পক্ষরূপ ধর্মীতে নাই—তাহাই উপাধি হইবে। যে ধর্ম যাবৎ দৃষ্টান্ত ধর্মীতে আছে বলিয়া তাহা সাধ্যের ব্যাপক হইবে এবং পক্ষরূপ ধর্মীতে নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইবে।

এজন্য প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন যে, "তস্মাদুপাধিমিচ্ছদ্ভিঃ পক্ষভূমিমনাপ্নুবন্। সপক্ষান্ ব্যাপ্নুবন্ ধর্মোমৃগ্যতামিতি সংগ্রহঃ।" যাহা হউক, প্রদর্শিত অনুমানে ক্রিয়াবত্ত্ব ও মূর্ত্তত্ব উপাধি। উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইয়া থাকে বলিয়া সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য হইয়া থাকে। অন্বয়-ব্যাপ্তিতে যে দুটি ধর্মের যাদৃশ ব্যাপ্যব্যাপক ভাব হইবে ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে সেই দুইটি ধর্মেরই বিপরীতভাবে ব্যাপ্যব্যাপক ভাব হইবে। এজন্য ন্যায়কন্দলীতে বলা হইয়াছে যে—"নিয়মত্বনিয়ন্তৃত্বে ভাবয়োর্যাদৃশে মতে। বিপরীতে প্রতীয়েতে তে এব তদভাবয়োঃ॥" ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্ত্তত্ব আত্মসংযোগরূপ সাধ্যের ব্যাপক। যে যে স্থলে আত্মসংযোগ আছে সেই সেই স্থলেই ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্ত্তত্ব, পরত্ব, অপরত্ব প্রভৃতিও আছে। এই জন্য ক্রিয়াবত্ত্বাদি ধর্ম আত্মসংযোগরূপ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। এই অনুমানে ঘটরূপ দৃষ্টান্তে আত্মসংযোগরূপ সাধ্যত্ব আছে এবং ক্রিয়াবত্ত্বাদি ধর্মও আছে। এইজন্য ক্রিয়াবত্ত্বাদি সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং ক্রিয়াবত্ত্বাদি ধর্ম আকাশরূপ পক্ষে নাই বলিয়া হেতুর অব্যাপক হইয়াছে। এজন্য মানমনোহরকার এরূপ প্রতিরোধানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন যে, "আকাশমাত্মনা ন সংযুজ্যতে। অমূর্ত্তত্বাৎ রূপাদিবৎ।" সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। এজন্য সাধ্যাভাব উপাধ্যভাবের ব্যাপক হইবে। সম্ভবদ্ ব্যতিরেক স্থলে ব্যতিরেক ব্যাপ্তি না থাকিলে অন্বয় ব্যাপ্তিও সিদ্ধ হইবে না। এজন্য মানমনোহরকার যে সাধ্যহেতুর অন্বয় ব্যাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন তাহার ব্যতিরেকব্যাপ্তিও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা অন্বয় ব্যাপ্তিও সিদ্ধ হইবে না। তাঁহার প্রদর্শিত প্রতিরোধানুমানে রূপাদি দৃষ্টান্ত ধর্মীতে অমূর্তত্বও আছে, আত্মার অসংযোগও আছে। এজন্য অমূর্ত্তত্ব আত্মার অসংযোগের ব্যাপ্য। যে যে স্থলে অমূর্ত্তত্ব থাকিবে সেই সেই স্থলে আত্মসংযোগাভাবও থাকিবে, যেমন রূপরসাদিতে অমূর্ত্তত্বও আছে, আত্মসংযোগাভাবও আছে। মানমনোহরকারের এই অনুমান সোপাধিক বলিয়া দুষ্ট। এই অনুমানে অসংযোগিত্বই উপাধি। রূপাদিতে যে আত্মসংযোগ নাই তাহার প্রযোজক অসংযোগিত্ব কিন্তু অমূর্ত্তত্ব নহে। যে যে স্থলে আত্মসংযোগ আছে সেই সেই স্থলে সংযোগিত্বও আছে। যে স্থলে সংযোগিত্ব নাই সে স্থলে আত্মসংযোগিত্ব নাই। রূপাদিতে সংযোগিত্ব নাই বলিয়াই আত্মসংযোগিত্বই নাই। সুতরাং মানমনোহরকার মীমাংসকের স্থাপনানু-

মানে যে মূর্ত্তত্বকে উপাধি বলিয়াছিলেন তাহা সাধ্যের অব্যাপক হইয়াছে। তাহার কারণ, উপাধিমূর্ত্তত্বের ব্যাপ্তি আত্মসংযোগরূপ সাধ্যে নাই; কারণ ব্যতিরেকব্যাপ্তিতে উপাধি রহিয়াছে। সুতরাং অজসংযোগ স্থাপনানুমানে মানমনোহরকার যে উপাধি শঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা নিরস্ত হইল। কারণ, উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই। উপাধি নিরূপিতা ব্যাপ্তি সাধ্যে নাই।

আরও বিশেষ কথা এই যে, 'আকাশমাত্মনা সংযুজ্যতে'—এই প্রতিজ্ঞা বাক্যের অর্থ এই যে, আত্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সংযোগ সেই সংযোগের অধিকরণ আকাশ। সংযোগদ্বিষ্ঠ বলিয়া যে সংযোগ আত্মাতে আছে সেই সংযোগ বিশিষ্ট আকাশ হইবে। আত্মাশ্রিত সংযোগের দ্বারা আকাশ আত্মসংযোগী হইবে। প্রতিজ্ঞা বাক্যের এইরূপ অর্থ গৃহীত হওয়ায় আর মূর্ত্তত্ব উপাধির শঙ্কাই হইতে পারে না। যে সংযোগ সাধ্য তাহা আত্মাতে আছে। কিন্তু আত্মাতে মূর্ত্তত্ব উপাধি নাই বলিয়া উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হইল না। বেদান্ত কল্পতরুতেও অমলানন্দ এই কথাই বলিয়াছেন (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩ অধিকরণ)। কল্পতরুকার, চিৎসুখাচার্য্যের গ্রন্থ হইতেই এই কথাটি গ্রহণ করিয়াছেন। কল্পতরুকার চিৎসুখাচার্য্যের প্রশিষ্য। চিৎসুখাচার্যের শিষ্য সুখপ্রকাশ ও সুখপ্রকাশের শিষ্য কল্পতরুকার অমলানন্দ। আরও কথা এই যে, মানমনোহরকার যে মূর্ত্তত্ব উপাধি প্রদর্শন করিয়াছেন সেই মূর্ত্তত্ব অবিচ্ছিন্ন পরিমাণবত্ত্ব। অবচ্ছিন্ন পরিমাণবত্ত্বকে উপাধি বলায় পক্ষেতর তুল্যতা হইয়াছে। উপাধির পক্ষে অবৃত্তিতা সম্পাদনের জন্য উপাধিতে বিশেষণ যোগ করিলে পক্ষেতর তুল্যতা হইয়া থাকে। সমস্ত অনুমানেই পক্ষের ভেদ উপাধি হইতে পারে, আর তাহাতে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইবে। পক্ষের ভেদরূপ উপাধির দ্বারা হেতুর সাধ্য-ব্যভিচারানুমানেও পক্ষের ভেদই উপাধি হইবে বলিয়া পক্ষের ভেদ স্বব্যাঘাতক। এজন্য পক্ষের ভেদ উপাধিরূপে উদ্‌ভাবিত হইতে পারে না। ভেদমাত্রকেই উপাধি বলা যায় না যেহেতু তাহা কেবলান্বয়ী। ভেদ পক্ষেও আছে—এজন্য পক্ষের ভেদকে উপাধি বলা হইয়াছে। পক্ষের ভেদ পক্ষে নাই—স্ব-এর ভেদ স্ব-তে থাকিতে পারে না। এজন্য উপাধির পক্ষে অবৃত্তিতা সম্পাদনের জন্যই ভেদকে উপাধি না বলিয়া পক্ষের ভেদকে উপাধি বলা হইয়াছে। উপাধি পক্ষে না থাকিলে উপাধি হেতুর অব্যাপক হইবে। সাধ্যের ব্যাপক, হেতুর অব্যাপক-কেই উপাধি বলে। এজন্য পক্ষের ভেদ সর্বত্রানুমানে উপাধি হইতে পারিলেও তাহা বিচারে উদ্‌ভাবনীয় নহে। ইহাতে অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হয় ও স্বব্যাঘাত দোষও হয়। এইরূপ পরিমাণবত্ত্বকে এস্থলে উপাধি না বলিয়া অবচ্ছিন্ন পরিমাণ-

বস্তুকে উপাধি বলার অভিপ্রায় এই যে উপাধির পক্ষাবৃত্তিত্ব সম্পাদন। কিন্তু তাহা সাধ্যে উপাধির ব্যাপ্তিগ্রহে উপযোগী নহে। সাধ্য উপাধির ব্যাপ্য হইয়া থাকে। পরিমাণবত্ত্ব আত্মসংযোগরূপ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। যে যে স্থলে আত্মসংযোগ আছে সেই সেই স্থলে পরিমাণবত্ত্বও আছে। কিন্তু পরিমাণবত্ত্ব পক্ষ গগনেও আছে, উপাধি পক্ষে না থাকুক। মাত্র এই অভিপ্রায়েই পরিমাণে অবচ্ছিন্নত্ব বিশেষণ যোগ করা হইয়াছে। আর তাহাতে পক্ষেতর তুল্যতা হইয়াছে। মীমাংসক মতে অজসংযোগ সমর্থনের ইহাই রীতি। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও এই অজসংযোগের সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাতসংযোগ অথবা সংযুক্তসংযোগরূপ সম্বন্ধ আছে ইহা দার্শনিক রীতিতেও সিদ্ধ হয়। আর এই সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঈশ্বর জীবগত ধর্ম্মাধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকেন। ঈশ্বর যে সর্বাধিষ্ঠাতা ইহা আমাদের উদ্ধৃত বেদমন্ত্রে বলা হইয়াছে। দার্শনিকগণও যুক্তির দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ঈশ্বরের সহিত জীবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে—ইহা উপপাদন করিলে জীবের হর্ষাতিশয় হওয়া উচিত।

—০—

লইয়া চল

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

আমাদিগকে তোমার ধামে লইয়া চল, অথবা আমার দেশে তুমি আসিয়া আমার দেশকে তোমার ধামে পরিণত কর। মানুষের তপস্যার প্রধান কথাই—'প্রচোদয়াৎ'। তোমার ধ্যান করিলেই তুমি তোমার ধামে লইয়া যাও। তোমার ধ্যান জানিনা, তাই বুঝি আমার কলুষিত বুদ্ধি তোমার দিকে প্রেরিত হয় না। চেতন হইয়া চেতনের ধ্যান করিতে হয়, তবে ত বুদ্ধি তোমার ধামে প্রেরিত হইবে। আমি চেতন, জড় যাহা কিছু তাহা আমি নই; আমি দেখি আমার মধ্যে যাহা কিছু পরিস্পন্দন—তাহা প্রকৃতির কার্য্য; দ্রষ্টা-চেতনের নহে, ইহা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারিলে আমি যে আমার সমস্ত আত্মীয় হইতে পৃথক, সমস্ত ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার-চক্ষুকর্ণাদি-হস্তপদাদি সমস্ত হইতে পৃথক্ ইহার ধারণা হয়। তথাপি বহুদিন ইহাদের সঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া আপনার স্বরূপ না হারাইয়াও যেন হারাইয়াছি—মহান্ হইয়াও—অখণ্ড হইয়াও—আপনাকে ক্ষুদ্র আপনাকে খণ্ড এই ধ্যান করিয়া করিয়া যে বড় ক্ল

হইয়া গিয়াছি—নিতান্ত খণ্ড হইয়া গিয়াছি, আজ তোমার ধ্যানে—আজ অখণ্ডের ধ্যানে—ক্ষুদ্রত্ব ত্যাগ করিয়া আমার স্বরূপ যে তুমি—সেই স্বরূপই পাইতে চাই।

আহা! তোমার ধাম কত সুন্দর, কত শান্ত কত আরামের। আর আমাদের দেশে যেখানে তুমি থাক সেস্থানও কত সুন্দর, কত শান্ত, কত আরামপ্রদ। কত ফুল সেখানে ফুটে আর তোমার হাস্যে হাস্যময় হইয়া বিকাশ পায়; বৃক্ষসকল এখানে কত শান্ত—এ বুঝি 'শান্ত তুমি' তোমাকে ছুঁইয়া অত শান্ত হইয়া থাকে; আবার বায়ুর শন্ শন্ শব্দ কত মধুর, পাখীর কাকলী কত পীযুষ ধারা বর্ষণ করে। তুমি নিরাকার, তোমার স্বরূপ ছাড়িয়া আবার যখন আনন্দের মূর্ত্তি ধরিয়া আসিতে থাক, আপনাকে যবনিকার অন্তরালে রাখিয়া, সুন্দর রঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শুষ্ক পত্রের উপরে ধীরে ধীরে চরণ বিন্যাস করিয়া যখন তুমি আগমন কর, তোমার আগমনে সবাই যেন আর এক তরঙ্গে ভাসে, তখন সবার কি হয় কেমন করিয়া বলিব। তুমি তবু লুকাইতে চেষ্টা কর, তথাপি অমানুষিক কত কিছু দিয়া প্রকাশ কর; এই তুমি। আমার সাধ্য কি যে তাহার বিন্দুমাত্র প্রকাশ করি। শুধু মনে মনে তোমায় নমস্কার করি—নমঃ করি, আর মনে মনে বলি সব তুমি সব তুমি—ন মম—ন মম—আমার কিছুই নাই—সব তোমার—সব তুমি। আহা! এতো বর্ণনা করা যায়না—ধরা দাও—আবার ভুলাইয়া দাও। থাক্ এসব কথা!

আমার দেশে তোমার ধাম একরূপ, আবার তোমার দেশে তোমার ধাম—পরম ধাম—ইহা তুমি না বলিলে কে বুঝিত—কে ধরিতে পারিত?

তোমার পরম ধাম—কত সুন্দর!

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

সেখানে সূর্য্য ভাসেনা, চন্দ্র তারকার প্রকাশ নাই। এই বিদ্যুৎ সমূহও ভাসেনা, এই অগ্নি আবার কোথায়? তুমিই ভাস—আর তোমার ভাসার পশ্চাতে সব তোমার গায়ে ভাসিয়া উঠে—তোমার প্রকাশ পরিদৃশ্যমান সমস্তকে ফুটাইয়া তুলে।

তোমার পরম ধামে তুমিই আছ, তোমার প্রকাশই আছে, আর কিছুরই প্রকাশ নাই। আহা! এই ত অমর ধাম।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।

অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্।

পরম ধামে তুমিই তুমি। এই অমৃত ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই দক্ষিণে, ব্রহ্মই বামে, অধে উর্দ্ধে, ব্রহ্মই সমন্তাৎ প্রসারিত। অধিক কি, পরে এই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত।

আহা! কি অপূর্ব্ব!

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবা ভূমৌ জনয়ন্ দেব একঃ॥

এই দেবতা বিশ্বতশ্চক্ষু—সমস্ত দেখেন ইনি, সমস্তই জানেন ইনি; ইনি বিশ্বতো-মুখ—সকল মুখের দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করেন ইনিই,—সর্ব্ব বক্তা ইনিই; ইনি বিশ্বতোবাহু—সকল হাতে হাত দিয়া ইনিই সব করেন। ইনি বিশ্বতস্পাৎ—সকল পায়ে পা দিয়া ইনিই গতিশীল, সর্ব্বব্যাপী; ধর্ম্মাধর্ম্ম বাহু দ্বারা ইনিই লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এই এক দেবতা সর্ব্বত্র বিচরণ করেন—ইনিই সমস্তের জন্মদাতা। ইঁহারই প্রকাশে মায়া ভাসিয়া ইঁহারই উপরে জগৎ ভাসায়।

লইয়া চল তোমার ধামে, তোমার দেশে। যেখানে তুমি আনন্দে সব কর। তড়িতের মত এই আছ এই কোথাও ছোট—আবার হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া রঙ্গ কর। তোমার কাছে লইয়া চল। আবার আমার বুদ্ধিকে উল্টাইয়া তোমার দিকে ফিরাও—আমি দেখি আমার বুদ্ধি আর মায়িক কিছুই লইয়া নাই—"দৃশ্যতে শ্রূয়তে স্মর্য্যতে বা" সব ছাড়িয়া—একনিষ্ঠ হইয়া—শুধু তোমাকে লইয়া তোমাতে মিশিতেছে—আবার তোমার সঙ্গে সব সাজিয়া তোমাকে লইয়া খেলা করিতেছে।

লইয়া চল—লইয়া চল—আর কি বলিব?

এত বলি তবুও যেন কিছুই বলা হয় না মনে করি। কেন এমন হয়? তুমি নাকি অনন্ত—তাই কে তোমায় কি বলিবে? তথাপি একটা শেষ কথা না বলিয়া যেন থাকিতে পারিনা।

সকলের অন্তরালে তুমি আছ—সকলের কোলে কোলেই তুমি। তোমার অঙ্গে যখন জগৎ ভাসিয়াছে তখন তুমি সর্ব্বত্র। ইহা ভাবিতে পার কি? আবার তুমি ক্ষুদ্র দেহই ধর বা বিরাট দেহে আবির্ভূত হও সবই তোমার অঙ্গে ভাসিয়াছে—তোমাকে সর্ব্বত্র দেখি বলিলে যাহা পাই আবার সমস্তই তোমাতে দেখিতেছি বলিলেও সেই একই পাই। যেখানে যাই সেখানেই তুমি যাও—আবার মানুষের শরীরে যেমন অনন্ত জীবাণু—তাদের ভিতরে যেমন অনন্ত

জীবাণু—আবার তাহাদের ভিতরেও তাই—হায়! সবই যেন অনন্ত। সেই বৃক্ষ লতা আকাশ বায়ু সমুদ্র পর্ব্বত, পশুপক্ষী সবই তোমাতে—ইহা হইলেও, তোমার এই মূর্ত্তিই আমার সবার সব।

লইয়া চল কি প্রচোদয়াতের কথা?

যেমন বুঝ। কিন্তু "লইয়া চল" ইহা যাহার তীব্র ইচ্ছা তাহাকে কি করিতে হইবে জান? আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমার প্রতিবিম্বে বিম্বিত হইয়া, যার প্রতিবিম্ব তাহার দিকে না ফিরিয়া যে, এটা ওটা সেটা দেখিতে ছুটে তাহাকে আমি লইয়া যাইনা। কিন্তু যেমন সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া সূর্য্য দেখিলে সূর্য্যের জ্যোতিতে এটা ওটা সেটা লয় হইয়া যায়, সম্মুখে পশ্চাতে উর্দ্ধে ভাসে শুধু সূর্য্য কিরণমালা সেইরূপ আমার দিকে ফিরিলে সর্ব্বত্র দেখিবে আমি—এটা ওটা সেটা আমার গায়ে ভাসিয়াছে বটে কিন্তু আমার দিকে ফিরিলে সব লয় হইয়া থাকি আমি। লইতে ত আসিয়াছি, যাইবে আমার রাজ্যে—ফিরিবে আমার দিকে?

—০—

সন্তবাণী

৭৭৭। সম্পূর্ণ জাগরিত মনের এই নিয়ম যে, ঈশ্বর ভিন্ন সে দ্বিতীয় কোন বস্তুর দিকে যায় না। যে মন হরি প্রেমে ডুবে গেছে তার দ্বিতীয় বস্তুর কি আবশ্যক!

৭৭৮। যাঁর সর্ব্বদা ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি এবং সংসারে যিনি বিরক্ত তিনি ঋষি।

৭৭৯। হে প্রভো, আপনি ভিন্ন আমার কেহ নাই, আপনি আমার হন তা'হলে সবকিছু আমার। আমাকে আপনা থেকে একটুও আলাদা কর্‌বেন না। আমার সামনে আপনি ভিন্ন আর কাউকে আস্‌তে দেবেন না।

৭৮০। বিধি-বিধান সারা জালকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে মন বুদ্ধি চিত্ত এবং প্রাণকে প্রভুতে একনিষ্ঠভাবে অর্পণ কর্‌বে।

৭৮১। সংসারের সমস্ত রাগদ্বেষ মিটিয়ে মানুষ প্রভুপ্রেম এবং হৃদয়ের প্রকৃত প্রার্থনার জন্য সাধনা কর্‌বে।

৭৮২। কোনও লৌকিক অথবা পারলৌকিক পদার্থ প্রভুর কাছে প্রার্থনা ক'রো না। তিনি তোমার আবশ্যকতা তোমার অপেক্ষা অধিক জানেন আর

তোমার যখন যে বস্তুর আবশ্যকতা হবে সেই দয়াল প্রভু পঁহুছে দিবেন। তোমার কেবল একমাত্র কাজ চারদিক থেকে চিত্তকে একত্রিত করে প্রভুর চরণে নিবিষ্ট করা।

১৮৩। জ্ঞানী তপস্বী শূর কবি পণ্ডিত গুণী এই সংসারে এমন কে আছে যাকে মোহ ভ্রান্ত করে না, এবং যে কিছু কামনা করে না।

১৮৪। এই জগৎ তো কাজলের ঘর, কলঙ্ক থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় সতত ভগবৎ স্মরণ।

১৮৫। যে পাপের আরম্ভে ঈশ্বরের ভয় আছে, শেষে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা হয় সেই পাপও সাধককে ঈশ্বরের নিকট লয়ে যায়। কিন্তু যে তপস্যার আরম্ভে 'অহং' ভাব এবং অন্তে অভিমান হয় সেই তপও তপস্বীকে ঈশ্বর হতে দূরে নিয়ে যায়।

১৮৬। অহংকারী সাধককে সাধক বলা যায় না। সে তো মহা অপরাধী পরন্তু প্রভুর কাছে প্রার্থনাকারী পাপীও "সাধক"।

১৮৭। বিনা অনুতাপে প্রকৃত সাধনা আরম্ভ হয় না। এইজন্য ঈশ্বর-সাধনার পূর্ব্ব অঙ্গ পশ্চাত্তাপ।

১৮৮। ঈশ্বর-স্মরণের সময় পশ্চাত্তাপের বিচারও দূর ক'রে দিতে হবে, সমস্ত ইষ্ট বস্তুর স্থানে এক ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে হবে।

১৮৯। সহনশীল ঋষি এবং কৃতজ্ঞ ধনবানের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? সহনশীল ঋষি। ধনবান যতই কেন ভাল হউক না তার মন ঐশ্বর্য্যে লিপ্ত থাকে, কিন্তু ঋষির হৃদয় আপনার প্রভুতেই সংলগ্ন থাকে।

১৯০। যে মানব, জীবন-নির্ব্বাহের জন্য নীতি ধর্ম্মের পূর্ব্বক অনসরণ করেন তিনিই ঈশ্বরের মহিমা বুঝেন। যে মনুষ্য ঈশ্বরের জন্যেই জীবন নির্ব্বাহ করেন তিনি তো ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হ'য়েছেন।

১৯১। তুমি প্রভুকে তো জানো? তা'হলে তুমি আর কিছুই না জানো তো কোন হানি নাই। ঈশ্বর তোমায় জানেন, নয়? তা'হলে অপর কেহ তোমায় না জানে তো ক্ষতি নাই।

১৯২। যে মনুষ্য ঈশ্বরকে ছেড়ে অপরকে স্নেহ করে সে কি কখন সুখী হ'তে পারে?

১৯৩। যে পর্য্যন্ত মমত্ব (আমার আমার) ততদিন পর্য্যন্তই দুঃখ, যেমন মমত্ব দূর হবে তখন সব আনন্দ আসক্তি ছেড়ে ব্যবহার করো। ধন স্ত্রী কুটুম্ব— এরা আপনার, এই ভাব ত্যাগ কর।

৭৯৪। পর পুরুষের সহিত প্রণয়কারিণী স্ত্রী বাইরে ঘরের কাজে ব্যস্ত থেকেও ভিতরে ভিতরে ঐ নূতন পতির রূপ ধ্যান করে থাকে। এই প্রকার বাইরে তুমি কার্য্য সকল ভাল ভাবেই কর্‌তে থাকো, কিন্তু হৃদয়ের দ্বারা সর্ব্বদা সেই হৃদয়রমণের সহিত বিহার করো।

৭৯৫। যিনি স্ত্রীগণের হাবভাব কটাক্ষাদির দ্বারা জিত হন না; যাঁর চিত্তকে ক্রোধরূপী অগ্নি সন্তাপ দিতে পারে না আর যাকে প্রচুর বিষয়রূপী বাণ বিদ্ধ করতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ যাঁর দৃষ্টিতে সংসারের সমস্ত তৃণের সমান, তিনি ধীর মহাপুরুষ। সম্পূর্ণ ত্রিলোককে তিনি কথায় কথায় জয় কর্‌তে পারেন।

৭৯৬। সর্ব্বোত্তম সিদ্ধান্ত তো এই যে, সম্পূর্ণভাবে গৃহ ত্যাগ করা চাই। কিন্তু যদি পূর্ণভাবে সংসার ত্যাগের সামর্থ্য না হয় তো ঘরে থেকে সব কাজ শ্রীকৃষ্ণেরই নিমিত্ত তাঁর প্রীতির জন্য কর্‌বে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকার অনর্থ মোচনকারী।

৭৯৭। কারো সঙ্গ কর্‌বে না। সকল প্রকার সঙ্গই একেবারে পরিত্যাগ করে দিতে হবে, কিন্তু সমস্ত প্রকার সঙ্গত্যাগে সমর্থ না হও তো সজ্জন এবং সন্ত মহাত্মাগণেরই সঙ্গ কর্‌বে শরণ সঙ্গের দ্বারা যে কাম উৎপন্ন হয় তার ঔষধ সন্তই।

৭৯৮। ভগবৎ সেবায় যা অনুকূল তার চিন্তা কর্‌বে এবং যা ভগবত্তত্ত্বের বিঘাতক তাকে সর্ব্বপ্রকারে ত্যাগ কর্‌বে।

৭৯৯। যেমন পতিব্রতা স্ত্রীর এই কথায় পূর্ণ বিশ্বাস হয় যে যিনি একবার অগ্নির সম্মুখে আমার পাণি গ্রহণ করেছেন তিনি অবশ্যই আমাকে রক্ষা কর্‌বেন এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের উপর ভরসা রাখবে যে তিনি অবশ্য আমায় রক্ষা করবেন।

৮০০। ভগবানকে আত্মনিবেদন করার পর তাঁর প্রতি ভারী দীনতা রাখবে।

৮০১। ছায়া ছেড়ে আসল আনন্দের অনুসন্ধান কর তোমার শান্তি মিলিবে।

৮০২। যখন হৃদয়ে কারুর কাছে কিছু নেবার ইচ্ছাই নাই তখন যেমনই ধনী তেমনই গরীব।

৮০৩। কীর্ত্তিতো পতিব্রতা কুলটা নয়, সে তো একমাত্র পুরুষ শ্রীহরিকে বরণ করে নিয়েছে, এইজন্য তুমি তার আশা ছেড়ে দাও।

৮০৪। ভক্তিমার্গের দিকে উন্নতিকামী সাধকের কামিনী কাঞ্চন এবং

কীর্ত্তির স্বরূপ পদ প্রতিষ্ঠা অর্থ পুত্র পরিবার আদি যে সমস্ত প্রেম পদার্থ আছে তা পরিত্যাগ ক'রে তারপর এই পথের দিকে অগ্রসর হওয়া চাই।

৮০৫। যাঁর হৃদয়ে যথার্থ শ্রীকৃষ্ণভক্তি—তা হ'তে অধিক শ্রেষ্ঠ কেহ হতেই সমর্থ হয় না। শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই পরাকাষ্ঠা।

৮০৬। শ্রবণ কীর্ত্তনই প্রভুপ্রেম প্রাপ্তির মুখ্য উপায়, আর সব উপায় এবং আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে শ্রীহরিরই শরণ লওয়া প্রয়োজন।

৮০৭। গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় যদি মনের গতি শ্রীহরির দিকে বইতে থাকে তাহলে শ্রীকৃষ্ণ দূরে থাকেন না, তিনি এসে ভক্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে যান, ইহাই তো তাঁর ভক্তবৎসলতা।

৮০৮। সাধু মহাত্মা সন্ত ও ভগবদ্ভক্তগণের চরণে দৃঢ় অনুরাগ রাখ, কোন রকমেই তাঁদের নিন্দা কখন ক'রোনা, সকলকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে নম্র হয়ে প্রণাম করো, তোমার কল্যাণ হবে।

৮০৯। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ রটনা কর আর বৃন্দাবনে বাস কর—এতে পরম কল্যাণ আছে।

৮১০। বৈরাগ্য হ'লে পর মান-প্রতিষ্ঠা ইন্দ্রিয়স্বাদ এবং লোক লজ্জার চিন্তাই থাকে না।

৮১১। ত্যাগী হয়েও যে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকে সে তো কুকুরের সমান।

৮১২। ত্যাগীর আপনার বৃত্তি সর্ব্বদা স্বতন্ত্র রাখা কর্ত্তব্য। ভিক্ষা করে খাওয়াই তার পরম ভূষণ।

৮১৩। যে ত্যাগী হয়েও আপনার জিহ্বাকে বশে রাখতে পারে না; ঘর ছেড়েও যার ভিক্ষা কর্‌তে সঙ্কোচ হয় সে তো ইন্দ্রিয়ের দাস, পরমার্থের পথ তার কাছ থেকে বহু দূরে।

৮১৪। বিরক্তের নিরন্তর নাম জপ করতে থাকা চাই।

৮১৫। যথা সময়ে যা কিছু ভিক্ষায় পাওয়া যায় তার উপর নির্ব্বাহ করে কেবল কৃষ্ণ কথা কীর্ত্তনের জন্য এই শরীর ধারণ করে রাখা চাই।

—০—

অনুতপ্ত

[কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়]

দিয়াছিলে স্নেহে প্রেমে সরস হৃদয়
তোমার কি দোষ প্রভু, তুমি দয়াময় !
    মান যশ করিবারে ভোগ
আমি মূঢ় করিয়াছি তাহার নিয়োগ।
    ঊর্ধ্বপানে চাই নাই কভু
তুমি হাসিতেছ বসি ভাবি নাই প্রভু।
যারে আমি এতকাল করিয়াছি জীবনের ব্রত
    বুঝিয়াছি তার মূল্য কত।
জীবন-সায়াহ্নে হায় বুঝিলাম আজ
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা, ভ্রান্তি স্মরি পাই বড় লাজ।
    তোমার নিদেশ প্রভু করিয়াছি হেলা
    তোমারে ভুলায়ে দিল "লেখা লেখা খেলা"।
সঁপিতাম তোমা যদি অনুরাগে সরস হৃদয়
হারাতে হত না তবে অন্তিম আশ্রয়।

—০—

আমি কে?

[শ্রীমৎ স্বামী নিত্যকমলানন্দ অবধূত]

মানবজীবন কি উদ্দেশ্যবিহীন নিরাশার উষ্ণনিশ্বাস, না, কয়েক বৎসর ব্যাপী ব্যর্থ কর্ম্মের হাহাকার? মানব জন্ম গ্রহণ করে কেন? কোন্ অজ্ঞান অন্ধকারের যবনিকার অন্তরাল হইতে কোন অজ্ঞাত পথ দিয়া বিনা নিমন্ত্রণে বিনা আহ্বানে আসিয়া কয়েক বৎসর মাত্র অতিবাহিত করে, তারপরে আবার কোন পথ দিয়া কেমন করিয়া কোথায় চলিয়া যায়। তখন শত আকুল আহ্বানে—শত আদর নিমন্ত্রণেও আর ফিরিয়া আসে না। এখানে যাহাদিগকে প্রাণের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিত, যাহাদিগের সুখের জন্য আত্মবলিদান করিত, তাহাদিগকে ছাড়িয়া যায়, আর ফিরিয়া চাহে না। তবে কি জন্য আসিয়াছিল, কি জন্যই বা চলিয়া গেল? আসা যাওয়ার এই কয়েক বৎসরে মানব জীবনের কি কোন উদ্দেশ্য নাই?

উদ্দেশ্য না থাকিলে আসা-যাওয়া কেন? উদ্দেশ্য না থাকিলে জীবনযজ্ঞের এত আয়োজন কেন? উদ্দেশ্য না থাকিলে জীবনে সাফল্য লাভের জন্য শিক্ষক, ঋত্বিক্ বা আচার্য্যের প্রয়োজন কেন? উদ্দেশ্য না থাকিলে, প্রয়োজন না থাকিলে কোন কার্য্য হয় কি?

সে উদ্দেশ্য মুক্তি। কাহার মুক্তি? আমার। আমি কে? 'সোঽহং' তবে মুক্তির প্রয়োজন কি? ঝিনুকের মধ্যে স্বাতী নক্ষত্রের জল পতিত হয়। ঝিনুক তাহার দুইটি আবরণের আকুল বাঁধনে জলটুকু বাঁধিয়া বসিয়া থাকে; জলে মুক্তা ফলে। ঝিনুক সাগরে জন্মিয়াছে, সাগরের মধ্যে ডুবিয়া আছে; তাহার উদরের মধ্যেও এক বিন্দু জল মুক্তা হইয়া রহিয়াছে। সে যখন তাহার বাহুবন্ধন ছাড়িয়া দিবে, জলের মুক্তা জলে গড়াইয়া জলে পরিণত হইবে, তখন জল হইয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া মুক্ত হইবে। আমরা জীব। আমরাও কোন্ এক মুহূর্ত্তে মহামায়ার উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীব সাজিয়া বসিয়া আছি। মহামায়ার সেই করাল কবল হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া অনন্তের কোলে ঢলিয়া পড়িতে পারিলেই মুক্ত হইব। স্বাতী নক্ষত্রের সেই জলটুকু মুক্তা হইয়াছে, কাজেই তাহাকে এখন ব্যক্ত জল বলা যায় না। অনন্তের সেই কণাটুকু জীব হইয়াছে। প্রকৃতির বাহুবন্ধনে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কাজেই এখন তাহা অব্যক্ত; আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তর প্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের উদ্দেশ্য।

সচ্চিদানন্দের স্বরূপ পরমাত্মা। দেবীমাহাত্ম্যে এই পরমাত্মাই মহামায়ারূপে উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মা ও মহামায়া অভিন্ন। শাস্ত্রীয় বিচারে কিংবা সাধারণ আলোচনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলা হয়, কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্, যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা জানেন আত্মা ও মায়া সম্পূর্ণ অভিন্ন। যতক্ষণ সাধনা আছে, ততক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়ারূপেই অভিব্যক্ত। যখন পরমাত্মা, তখন সাধ্য নাই, সাধন নাই, সাধক নাই, শাস্ত্র নাই, চিন্তা নাই, ভাষা নাই। ভাষা, চিন্তা কিম্বা সাধনার মধ্যে আসিলেই আত্মা মায়ারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাই পরমাত্মাই দেবীসুক্তের প্রতিপাদ্য হইলেও চণ্ডীতে ইহা মহামায়ারূপেই বর্ণিত হইয়াছে।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই প্রধান লক্ষ্য পরমাত্মজ্ঞান। আত্মবস্তু—জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় প্রভৃতি অসংখ্য বিভিন্নতার মধ্যেও অভিন্নভাবে সর্ব্বজীবে তুল্যরূপে বিদ্যমান। আমি কে?—ইহা যথার্থরূপে জানার নাম আত্মজ্ঞান। জীব মাত্রেই এই আপনার স্বরূপটী জানিবার জন্য লালায়িত। যতদিন ইহা বুঝিতে না পারে, ততদিন সে সাধারণ জীব মাত্র। যখন জীব এই আত্মানুসন্ধানটী সম্পূর্ণ করিতে পারে, তখন লোকে তাহাকে সাধক, ভক্ত ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকে।

মানুষ যখন এই আত্মাভিমুখী গতি উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহার বাহ্যিক যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়; উহাই নিবৃত্তি মার্গ বা সাধনা নামে কথিত হয়। ঐ লক্ষণগুলিই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধি নিষেধরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্মমাত্রই সাধনা; জীবমাত্রেই সাধক এবং আত্মস্বরূপের অনুভূতিই সাধ্য। আত্মভাবশূন্য সর্ব্ববিধ সাধনাই অসম্যক্‌ফলপ্রদ। যতক্ষণ আমি ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করা হয় ততক্ষণ তত্ত্বতঃ একমাত্র আমিই উপাসিত হইলেও (কারণ আমি ছাড়া কোথাও কিছু নাই) উহা অবিধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত। সুতরাং মুক্তিরূপ মহাফল প্রদানে অসমর্থ। অতএব এক কথায় বলিতে গেলে আত্মভাবশূন্য সকল সাধনাই অজ্ঞান বিজৃম্ভিত। আবার আত্মানুসন্ধানযুক্ত আহার বিহারাদি জাগতিক কর্ম্মগুলিও সাধনাপদবাচ্য হইয়া থাকে। এই আত্মাই আমি। আমাকে চেনা আর আত্মসাক্ষাৎকার করা এক কথা।

জীব যাহা চায়—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবের যাহা যথার্থ অভীষ্ট বস্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে একটা স্থূল জ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে একান্ত আবশ্যক। নতুবা অভীষ্ট লাভের পথ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈ রুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১॥ —দেবীসূক্ত।

—আমি (সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা) রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণ রূপে বিচরণ করি। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমি ধারণ করি।

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি "আমার দেহ"; ইহাতে আমরা কি বুঝি?—দেহ হইতে আমি পৃথক একজন। আমার সত্তায় দেহের সত্তা। আমি দেখিতেছি তাই দেহ আছে। আমি দেহ নই; আমাতে দেহ আছে। এইরূপে আমরা দেহ হইতে "আমি"কে সম্পূর্ণ পৃথক রূপে বুঝিতে পারি। "আমার প্রাণ", "আমার মন", "আমার জ্ঞান", "আমার আনন্দ",—এই যে শব্দগুলি আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি, উহা যে একেবারেই না বুঝিয়া বলি, তাহা নহে। তবে বুঝিয়াও বুঝি না, এমন একটা ভাব। এই যে দেহ হইতে পৃথক, প্রাণ হইতে পৃথক, মন হইতে পৃথক, জ্ঞান হইতে পৃথক, আনন্দ হইতে পৃথক রূপে একটি 'আমি'র সন্ধান পাইতেছি; ঐটীই না দেহাদি আবরণের ভিতর দিয়া অভিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে। যেরূপ আমার গৃহখানিকে "আমি গৃহ" বলিয়া বুঝি না সেইরূপ "আমি দেহ" "আমি মন" এরূপ প্রতীতিও আমাদের কখনও হয় না। তবে গৃহখানি ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ আমি দুঃখিত হই, গৃহখানি সুসজ্জিত হইলে যেরূপ সুখী হই; ঠিক সেইরূপই দেহ, প্রাণ, মন ইত্যাদির সহিত "আমি" সুখ-দুঃখের সম্বন্ধবিশিষ্ট। দেহাদির সুখ দুঃখে "আমি" সুখ দুঃখের বোধ করিয়া থাকে মাত্র। বস্তুতঃ আমি সুখদুঃখশূন্য দেহাদিশূন্য একজন। এইরূপে আমরা যাহাকে যথার্থ অন্বেষণ করি, সেই প্রকৃত বস্তুটির সন্ধান পাইলাম। এইবার আমরা উহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি। এতক্ষণ আমরা নিজ বিচার বুদ্ধির সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম। এইবার শাস্ত্র যুক্তির সাহায্য লইতে হইবে। যথার্থ আত্মস্বরূপজ্ঞান তাঁহার কৃপা ব্যতীত হইবার উপায় নাই।

এই যে দেহাদি হইতে পৃথক একটি "আমি"র সন্ধান পাওয়া গেল, আমরা যদি উহার স্বরূপটী বুঝিতে বা বলিতে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিব বা বুঝিব উহা অচিন্ত্য, অব্যক্ত, সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য কিন্তু সত্য। চিন্তা করিয়া ঐ আমিকে ধরিতে পারি না, বাক্য দ্বারা বলিতে পারি না, চক্ষু দ্বারা, কর্ণ দ্বারা বা অপর কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাও অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু সে জিনিষটী যে সত্যই আছে, তাহা বুঝিতে পারি। এই যে সত্য "আমি", আমরা সর্ব্বদাই উহার উপলব্ধি করিতেছি, অথচ বুঝিতে পারিতেছি না।

শাস্ত্র বলেন, এই আত্মার স্বরূপ হইতেছে 'আনন্দ'। আনন্দ বস্তুটীর

বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, সত্য জ্ঞান আনন্দ অর্থাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ। সৎ একটি সত্তা—একটা কিছু আছে। চিৎ-ঐ সত্তাটি চৈতন্যময়। সেই যে আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, উহা শুধু সত্তা নহে;—উহা চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং ঐ জ্ঞানময় সত্তাটী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। আরও একটু সরলভাবে আলোচনা করা যাক। "আমি" আছে, আমি বুঝিতেছি যে "আমি" আছে এবং ঐ আমিটাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু; সুতরাং আনন্দময়। এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাই "আমি"। এই "আমিই" সত্য। এই সত্য লাভই জীবমাত্রের উদ্দেশ্য। কারণ এই "আমি"তে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না কিছুই নাই, অথচ পূর্ণ আনন্দ আছে। পার্থিব সুখ এবং এই আনন্দ কিন্তু ঠিক এক জিনিষ নয়। এ জগতে অভীষ্ট বস্তু পাইলে আমার সুখ হয়, তদ্বিপরীতে দুঃখ হয়। "আমি" কিন্তু এমনই একটি ক্ষেত্র, যেখানে অভীষ্ট-অনভীষ্ট, পাওয়া বা না পাওয়া কিছুই নাই; অথচ সর্ব্বদা আনন্দ রহিয়াছে। এক কথায় উহাতে অপর কোন ভাব, যথা—দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, জীব, জগৎ ইত্যাদি কোন ভাবই নাই। ঐ যে সর্ব্বভাববিনির্ম্মুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা, উনিই হইতেছেন "আমি"। উহাতে নিত্যযুক্ততা উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মীস্থিতি। স্থূল কথায় এই "আমি" বস্তুটীকে সর্ব্বদা ধরিয়া থাকাই মানুষের মনুষ্যত্ব। যে মানুষ "আমি কে", তাহা জানে না, সে পশু,—ইহা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন। এই আমিই সাধকের ইষ্টদেব। কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, ইত্যাদি ইঁহারই নাম। যে সাধক তাহার ইষ্টদেবের যত অধিক নিকটবর্ত্তী, সেই তত উন্নত, তত সুখী; কারণ সুখ বা আনন্দই তাঁহার স্বরূপ।

—•—

সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য

[শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার, এম্-এ, বি-টি, (এডিনবরা ও ডাবলিন)]

রূপ রস স্পর্শ শব্দ গন্ধাত্মিকা ধরিত্রী প্রণব ধ্বনির অভিব্যক্তি; এই অবিরাম অনাহত ধ্বনিই পরমাণুর তরঙ্গ তুলিয়া জড় আর প্রাণীজগতে জীব বৈচিত্র্যের সৃজন করিতেছে। প্রণবধ্বনিই ভগবানের অভীপ্সিত পন্থায় অনুকূল ও বিশিষ্ট তরঙ্গমালা তুলিয়া এক এক বিশেষ প্রকারের বস্তু বা জীব সৃষ্টি করিতেছে। সারা সৃষ্টিই এইরূপে পরমাণবিক নৃত্যছন্দে লীলায়িত ও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী রূপায়িত। ভগবন্নামগান কীর্ত্তনোত্থিত সমঞ্জসীভূত মধুর সংকর্ষণাত্মক ধ্বনি সৃজনময়ী তরঙ্গমালার সৃষ্টি করে। শ্রেষ্ঠ কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই কীর্ত্তনে পবিত্রীকৃত আত্মার স্নান হয় এবং চৈতন্যময় আধারে আত্মার মুক্তি ও সঞ্চারণের মধ্য দিয়া জগতে মঙ্গলের বীজ উপ্ত হয়; আবার জড় জগতে নূতন আণবিক বিন্যাসে ব্যোমে উত্থিত ছন্দোবদ্ধ সমঞ্জসীভূত তরঙ্গে জলবায়ু প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া বিশ্বমঙ্গল বিহিত হয়। পক্ষান্তরে আণবিক বিস্ফোরণ আণবিক স্তরে সমঞ্জসীভূত অভিব্যক্তির ছন্দোবদ্ধ তরঙ্গচক্রমালা স্তম্ভিত বা বিপর্য্যস্ত করিয়া জগৎ সৃষ্টির গতি স্তম্ভিত করে বা প্রলয়ের পথ পরিষ্কার করে। তাই প্রভু জগদ্বন্ধু ১৯২৭-এর শেষে আমার বিলাতে শিক্ষাসমাপনান্তে ফিরিবার পথে জাহাজে এক 'সিয়ান্স' বা আবেশে অষ্ট্রেলিয়াবাসী ক্যাপ্টেন জন ব্র্যাডফোর্ডের সাহায্যে আমায় জানাইয়াছিলেন—"জাপানে আণবিক প্রলয়, আণবিক তেজস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়া জলবায়ুর বিকার ঘটিবে। বিশ্বব্যাপী রেডিও প্রচলনের ফলও উপেক্ষণীয় নহে; তাহা মরুভূমিতে ধূলা ঝড় ও অন্যত্র বারিবর্ষণেরও কারণ হইতে পারে।" স্তব কীর্ত্তনাদি পরিবেশনে ভগবৎ-শক্তি সঞ্চারণের দ্বারা বিশ্বরক্ষাকার্য্যে সহায়তা হইতে পারে। আণবিক প্রলয়ঙ্করী শক্তি একমাত্র হরিনাম অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম যাহা আণবিক স্তরের প্রকম্পন ও ভঙ্গ— উভয়ই কীর্ত্তনের সংকর্ষণাত্মক সংস্কার ও গঠনশীলতার মধ্য দিয়া আণবিক পুনর্বিন্যাসের প্রলেপে প্রলয় রোধ করিতে পারে। তাই প্রভু জগদ্বন্ধু আণবিক প্রলয় আসন্ন লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ডাকিতেছেন—

ভাব বা আবেশ হও কীর্ত্তন আবরণে রও
ভবভার প্রলয় স্বনে।

গৌর রাখ প্রভুরে মহাপ্রলয় আসে
কাঁপে ভব তরাসে
প্রলয়াম্বু ভয়বা সে !

যুগাবতারী প্রভুর বিরাট আত্মা কীর্ত্তনতরঙ্গে তরঙ্গায়িত, লীলায়িত ও প্রসারিত হইয়া চন্দ্ররশ্মিসন্নিভ অলক্ষ্য রৌপ্যরশ্মি জলেবিস্তারে সৃষ্টিরক্ষা ও নবসৃষ্টির কার্য্যে ব্যাপৃত। মহামায়িক শক্তিও ঐ সৃজনকরী শক্তিতে মিশিয়া আছেন। ঐ চন্দ্ররশ্মি অবলম্বনেই প্রভুর অবতরণ। রাধাকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনের বিধান প্রলয় কালের জন্য তিনি দিয়াছেন। মোটের উপর, কীর্ত্তন একমাত্র সুগম ও বিজ্ঞান-সম্মত, সৃষ্টি রক্ষার পন্থা। এই ইঙ্গিত করিয়াই প্রভু বন্ধু আসন্ন আণবিক যুগে কৃষ্টি ও সৃষ্টি রক্ষার্থ নবপথরেখা আঁকিয়া দেখাইলেন।

প্রভু জগদ্বন্ধু বলিতেছেন—"হরি পুষ্পবন্ত নাম; পুষ্পবন্ত বলিতে চন্দ্র সূর্য্যকেও বুঝায়। সেই রকম গুরু, গৌরাঙ্গ, গোপী, রাধাকৃষ্ণ সব মিলিয়া এক হরিনাম; হরিবোল বলিতে বা বলিলে সবই বুঝিতে হইবে। এই নাম এত উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে হইবে যেন সহস্র হস্ত দূর হইতেও শুনিতে পারা যায়। হরিনাম মহাউদ্ধারণ মন্ত্র—যাহাতে সকল জীবজন্তু, স্থাবর, জঙ্গম ইহা শুনিতে পায় তাহা করিতে হইবে; সকলকেই হরিনাম শুনাইবে, শরীরী ও অশরীরী সমেত চতুর্দ্দশ ভুবনের মঙ্গলবিধানই ইহার লক্ষ্য। দেশে দেশে নাম কেন্দ্র স্থাপনে মহাপ্রভুর বাণী সার্থক হউক !—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম
সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম।

তখনই মহাউদ্ধারণ হরিনামের সার্থকতা দেখা যাইবে। প্রভু বন্ধু "হরিকথায়" বলিয়াছেন—

"মহাবন্যা ধায় মহন্বর ছায়
কল্মষ পলায়ন
ঘন হরিনাম আবেশ বিরাম
হরেকৃষ্ণ উচ্চারণ।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

সত্যে বিষ্ণু ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞার্চ্চনা, দ্বাপরে সেবায় সাধন, কিন্তু কলিতে একমাত্র

হরিকীর্ত্তনেই পূর্ব পূর্ব যুগলব্ধ সাধন পদ্ধতি উপসংহৃত হইয়া জটিলতামুক্ত ও সরল হইয়াছে।

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

মধুর হইতেও মধুরতর এইনাম—মঙ্গলেরও মঙ্গল সকল বেদলতার চৈতন্যস্বরূপ নিত্যফল; হেলা অথবা শ্রদ্ধা করিয়া একবার বা সর্বতোভাবে গীত হইলে হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ, যে কোন মানবকেই কৃষ্ণনাম সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন। শ্রীশ্রীপ্রভু বলিতেছেন—স্বকীয় ও পরকীয় উদ্ধার সাধন, অপিচ শরীরী ও তাহার বহুগুণ অধিক্ বিভিন্ন লোকস্থ অশরীরী সহ চতুর্দ্দশভুবনের মঙ্গল বিধানই সংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য।

প্রভু জগদ্বন্ধু বলিতেছেন—

কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন তুঙ্গ তুমুল নর্ত্তন
প্রদক্ষিণাবলুণ্ঠনে মজ্জ।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন—

শ্রেষ্ঠাচার পরচার হরেকৃষ্ণমালা
বন্ধু বলে এই হলে যাবে সব জ্বালা।

পদ্মপুরাণে আছে—

কৃষ্ণ নাম পরাভক্তিঃ কৃষ্ণ নাম পরাস্মৃতিঃ।
কৃষ্ণ নাম পরা যজ্ঞঃ কৃষ্ণ নাম পরামতিঃ॥

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

ন দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং।
মনাগীক্ষতে মন্ত্রোহয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি॥

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

নিয়ম নিষ্ঠায় গুরুদত্ত নামে রহিলেই কৃষ্ণনাম করা হয়; কারণ হরি পুষ্পবৎ পূর্ণ বিকশিত নাম। গুরুদত্ত যে কোন নামে তাঁহাতেই পৌছান যায়; কারণ হরি সকল নামকেই অঙ্গীভূত করিয়াছেন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

ইহাতে কৃষ্ণ আর শিব নামে তফাৎ রহে না ; তফাৎ করিলে অপরাধ। এইরূপ নানা অপরাধও আবার নিষ্ঠাতেই খণ্ডিত হয়, তবে গৌর অবতারে পূর্ব পূর্ব লীলার সার সংহৃত থাকায় ভূভারহরণ গৌর নামেতেই সেই সেই অপরাধ দূরে চলে যায়। শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঁকারনাথ বলেন অখণ্ড নামের 'পুণ্য প্রেমের বাতাসে' সেই সেই অপরাধ দূরে চলে যায়। পবিত্র আধারে ভগবৎ শক্তি স্মরণে তাঁহার কৃপাযোগে সকল অপরাধ স্খলিত হয়।

এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী স্মরণে আমার নিবন্ধ শেষ করি—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনম্॥

—০—

ভো রাম মাম্ উদ্ধর!

[শ্রীমৃণালিনী দেবী]

চিত্তের পরিশুদ্ধি সর্ব্বদা রক্ষিত হয় না, ইহার জন্য না হয় মনকে ধম্‌কাইলে, কিন্তু মনকে দুর্ব্বল হতাশ হইতে না দিয়া অশুভ চিন্তার গতিরোধে শুভ চিন্তা করাও, মন যে সর্ব্বদা বশে থাকে না তার জন্য কতটুকু প্রযত্ন করা হইয়াছে? অশান্ত কেন হইবে? অত্যন্ত মলিন বস্ত্র ধৌত করিতে হইলে ক্ষার জলে সিদ্ধ করিয়া দাগ তুলিতে হয়। বহুদিনের সংস্কারের দাগ অল্প শ্রমে কি ছাড়িতে চায়? শুদ্ধচিন্তার প্রবাহ আনিতে পারিলে, চিত্তকে ডুবাইতে পারিলে অলস চিন্তার অবসাদ মলিনতা কাটিয়া ধৌত হইয়া যায়। রং ধরাইতে হইলে বস্ত্রকে পরিষ্কার সুচিক্কন করা চাই, ইহাই সাধুজনের উপদেশ। অতএব মনকে পুরাতন ভাবনা ছাড়াইবার জন্য নূতন ভাবনা দাও। ঈশ্বর ভাবনাই প্রকৃষ্ট উপায়। তবেত এই অসার চিন্তা ক্ষণিকের পটপরিবর্ত্তনের দৃশ্যদর্শন যাইবে। মন! কতইতো ভাবনা করিলে, কিন্তু ভাবনার পরপারে আসিতে পারিলে কি? পুরাতন ভাবনার জাওর কাটিয়া অভাব অশান্তি তুলিয়া কি পাইলে বল? মনের বিশ্রান্তি হইল না বলিয়া এ আক্ষেপে হতাশ হইয়াই বা কি লাভ হইল? ঠাকুর অবসাদগ্রস্ত মনকে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখার জন্য কত সুন্দর উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—"যদি মনকে ভাবাইতেই

হয় তবে মন এই ভাবনাই করুক, যেন মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে, আর কিছুই নাই একমাত্র তিনিই আছেন—আর কোন কিছুর স্ফুরণ নাই, আপনি আপনিই নির্গুণ তিনিই, তিনি আবার নির্গুণ স্বরূপে থাকিয়া সগুণ হইলেন। দ্যাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষ লোকে যাহা আছে সব হইলেন, সকলের ভিতর আসিয়া আত্মা হইলেন—আবার এই নয়নাভিরাম সুন্দর মূর্ত্তিতে আসিয়া পৃথিবীর পাপভার মোচন করিয়া গেলেন। আবার আসবেন আবার দূর করিবেন।" এই ভাবনায় অবতারের নাম রূপ গুণ কর্ম্ম লীলা স্বরূপ চিন্তায় কত সুখ। লীলাময়ের লীলা ভাবনায়, তাঁহার স্বরূপ স্মরণে রাখিলে এই ক্ষুদ্র অহং-এর ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জিত হইয়া আত্মভাব আনিয়া দিবে নাকি? শ্রীগুরুতো অপার্থিব কৃপাবারিবর্ষণে সাধনার কত সঙ্কেতই ধরাইয়া দেন। তাঁহার আদেশপালনে শৈথিল্য প্রকাশ না করিয়া ধৈর্য্য সহকারে আচরণ করিলে তাঁহার কৃপা গ্রহণের সামর্থ্য আসিবেই। মন্ত্র গুরু ইষ্ট রূপে এমন আর্ত্তত্রাতা, আশ্রিতজনের এমন কল্যাণদাতা পরম কারুণিক প্রভু আর কই? জীবের নিত্যসহায় বর্ত্তমান থাকিতেও জীব আপনাকে এত নিঃসহায় শক্তিহীন দুর্ব্বল মনে করে কেন? এই যে দেবদুর্যোগ ইহাতো আমার অনন্ত জীবনের কর্ম্মফল। তাইতো বলিয়াছ, সবদেখায় সর্ব্বদা "রামরাম" করিয়া সব কিছু উপেক্ষা করিয়া, সব সহ্য কারয়া, সর্ব্বত্র সেই স্থির নয়নের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া অনন্যচিত্ত হইতে। যে নাম ভুলায় সেও রাম, পারিতেছ না তাও তাঁহাকেই জানাইয়া যাও, সেই একজন ছাড়া অন্য কিছুইতো নাই। আজ যে এই অন্তর্যাতনা ভোগ করিতেছ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছ কি? সমষ্টিতে যে লীলার পরিচয় ব্যষ্টির মধ্যেও সেই একেরই অভিনয় চলিতেছে। জীব! তুমিওতো একদিন রামবাহুর আশ্রয়ে কত সুরক্ষিত ভাবে কত সুখে অবস্থান করিতেছিলে? আজ এমন ত্যক্ত হইলে কেন? কোন্ অসতর্ক অবস্থায় তোমার এমন পদস্খলন ঘটিল! তুমি এখন ইন্দ্রিয়রূপী ঘোর দশানন রাবণ কবলিত হইয়া রাক্ষস-আলয়ে ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী চেড়ীগণের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছ। ইন্দ্রিয়রূপী দশাস্য রাবণ তোমায় সর্ব্বদা বশীভূত করিবার জন্য কত রকমে প্রলোভিত করিয়া ভয় দেখাইতেছে, বলিতেছে—"আমায় ভজ"। কিন্তু তুমি যদি জগন্মাতা জানকীদেবীর আদর্শ পালন করিতে যত্নবান হইয়া "হা রাম! মাম্ উদ্ধর উদ্ধর" বলিয়া সর্ব্বদা রাম রাম করার প্রযত্ন রাখ, অজ্ঞান রাবণের সাধ্য কি তোমাকে ধর্ষণ করে। প্রবল প্রতাপযুক্ত রাবণ যতই দুর্দ্ধর্ষ হউক রামবনিতা সীতাকে আয়ত্তে

আনিতে পারে নাই। রত্নমাণিক্য খচিত প্রাসাদকে তুচ্ছবোধে দূরে ফেলিয়া জানকী অশোক পাদপতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। শোকরহিত অশোক কাননই তাঁহার যোগ্যতর স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, যেখানে বিষয়কে আড়াল করিয়া সর্ব্বদাই রাম-ধ্যানপরায়ণ হইয়া রাম রাম করা চলে। হায়! মহাবিষয়ী রাবণ স্বর্ণমারীচকে কি কুক্ষণে নিয়োগ করিয়াছিল। খলের ছলনায় তুমি আত্মবিস্মৃতির অভিনয়ে জীবকে শিক্ষা দিতে, তোমার প্রাণের প্রভুকে তাহার পশ্চাতে ধাবিত করাইয়াছিলে। ভগবান ভক্তের মনোবাঞ্ছা পুরণে সদাই অগ্রণী, ভক্তের অভীষ্ট পুরণে সর্ব্বদাই তৎপর। তথাপি তিনি বিপত্তি স্মরণে লক্ষ্মণকে সতর্ক প্রহরীরূপে রাখিয়া গেলেন। কিন্তু কালের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া রামের নিযুক্ত সুদক্ষ প্রহরী লক্ষ্মণকে তুমি বাক্‌শরে বিদ্ধ ও তিরস্কৃত করিয়া রাম-অনুসরণের জন্য বিদায় দিলে। ভ্রাতার একান্ত অনুগত লক্ষ্মণ রাম অন্বেষণে ধাবিত হইবার পূর্ব্বে ধনু দ্বারা গণ্ডী অঙ্কিত করিয়া, গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়া গেলেন। কিন্তু তাহাও পালন করা হইল না, এমন দৈব বিড়ম্বনা! রাবণের কৌশল তাহাকে ফলদান করিল। সেতো ছিদ্র পথেই প্রবেশের সুযোগ খুঁজিতে চায়। ছদ্মবেশে প্রতারণা করিয়া, শেষে সে আত্মপ্রকাশ করিয়া আপন বলে ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী প্রজ্ঞাজননীকে অপহরণ করিল। রাবণের আচরণে দেবতাগণ, কাননের পশু-পক্ষী জীব-জন্তু তরুলতা-বৃক্ষ শ্রেণী, নদী পর্ব্বত সব যেন নিস্পন্দ স্তম্ভিত হইয়া গেল। আর রাক্ষস, রামের প্রতাপ স্মরণে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিজকৃত কর্ম্মে আত্মপ্রসাদ লাভে মাতা জানকীকে বল পূর্ব্বক রথে উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। আজ কোন বাধাই, এমন কি বৃদ্ধ জটায়ু কর্তৃক নিরস্ত করার প্রযত্ন সে কিছুই গ্রাহ্য করিল না। পক্ষীরাজ জটায়ুকে নিহত করিয়া, সাগর ব্যবধানে লঙ্কাপুরে নিজের সুরক্ষিত স্থানে সীতা আনয়ন করিয়াও সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে রাম আসার প্রতীক্ষায় রহিল। আহা! মায়ের যে করুণ কণ্ঠের আকুল আর্ত্তনাদ গভীর অরণ্যানী গোদাবরীতট প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল আজও বুঝি সকলের হৃদয়ের অন্তর্দেশে তাহা ধ্বনিত হইতেছে। রামপ্রেরিত হনুমান লঙ্কার অশোক পাদপতলে রামবল্লভা জানকীকে রামের জন্য শোক করিতে দেখিয়া শোকাশ্রুমণ্ডিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমিতো রামের বিরহ-বেদনা দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু মা জানকীর বিরহতাপ অসহ্য! জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প দেখিতেছি। এই নিদারুণ বিরহে প্রভু আমার কি করিয়া

জীবন ধারণ করিতেছেন!" মহাবীর ভাবিলেন—জানকীর জীবন রক্ষার কি উপায় করিব! এ দৃশ্যতো আর দেখা যায় না। একমাত্র রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় যদি মায়ের প্রাণ রক্ষার উপায় হয়। নামের ভিতর যদি নামীর স্পর্শ অনুভূত না হইত তবে কি নাম জীবনধারণের উপায়রূপে গণ্য হইত। জীব! তুমি কি একবার তোমার স্বরূপ ভাবিতে পার! তুমিও কোন্ আনন্দময় স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া কোথায় আসিয়া স্থান পাইয়াছ? অবনতির পথ দ্রুত, কিন্তু উপরে উঠিতে কত প্রযত্ন করিতে হয়। মা যাহা লীলা-আচরণে দেখাইয়া গেছেন, আত্মশুদ্ধির জন্য জীবের তাহা করা কর্ত্তব্য। যাহা আচরণীয় মা তাহা আত্মলীলায় শিক্ষা দিয়া গেছেন। জীব তাহার কর্ত্তব্য পালনে প্রাণপণ করিলে তবেই না রাম প্রেরিত দূত আসিয়া রামবার্ত্তা শুনাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে! ভগবান কি কখনো আপন প্রিয়জনের আকুল আহ্বানে সুস্থির থাকিতে পারেন! সর্ব্বদা রাম রাম করিয়া তাঁহাতে সকল নির্ভরতা ঢালিয়া দিতে পারিলে তবেই এ দুরন্ত জন্ম মৃত্যু প্রবাহ সঙ্কুল সংসারসাগর পার হইতে পারা যাইবে। ভগবান নিজ হস্তে দশানন রাবণের মুণ্ডচ্ছেদ পূর্ব্বক জানকীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু সেইরূপ অবতীর্ণ হইয়া অজ্ঞান নিধনে আত্মরত্নের উদ্ধার সাধন করিয়া দেন। যাহারা রাম চিন্তা ভুলাইয়া দেয় তাহারা সকলেই ঐ অজ্ঞানের প্রেরিত চেড়ী, ঐ চেড়ীদের বাক্যে অনাস্থা পূর্ব্বক, ভোগরাবণের অতুল ঐশ্বর্য্যকে পদদলিত করিয়া রামের সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে। রাবণ যাহাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল তাহা মায়া সীতা। আসল সীতা যিনি তিনিতো রাম আলিঙ্গিতারূপে সর্ব্বদাই রাম বক্ষে অবস্থান করিতেছেন। অপহৃতা সীতাই চিচ্ছায়ারূপে জীবে জীবে সংস্থিতা। চিদাভাসরূপী জীব মহাশক্তির প্রেরণায় আত্মলাভে প্রযত্ন করিলে আত্মরত্নের উদ্ধারে আবার আত্মাতেই সমাহিত হইতে পারিবে। ভগবৎ লীলার আস্বাদন, তাঁহার নাম চিন্তন জীবনকে রসের আস্বাদনে ভরাইয়া দেয়, মনের দুর্ব্বলতায় শক্তি সঞ্চার করে। চাই একান্তপ্রিয়তা, একনিষ্ঠতা। প্রার্থনা থাকুক—

"ভো রাম মাম্ উদ্ধর!"

—০—

ভক্তের বোঝা

[শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ]

দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণ পরমভাগবত শ্রীঅর্জুন মিশ্র শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করে বাস করেন। শাস্ত্র আলোচনা করেন, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যে ভিক্ষা করে কায়ক্লেশে দিন কাটান কুটীর জীর্ণ, সংস্কার করার সময় ও সুযোগ পান না, যা সামান্য ভিক্ষা পান তাতে প্রত্যহ উদরপূর্ত্তিও হয় না। দারিদ্র্যের এই কশাঘাত ভক্তকে তাঁর আনন্দরস উপভোগ থেকে চ্যুত করেনি। সাধ্বী স্ত্রী স্বামীসেবায় নিজিকে বিলিয়ে দিয়েছেন, আত্মতুষ্টির কোনও দাবী তাঁর মনে রেখাপাত করেনি, তিনি ধর্ম্মপত্নীর সৌভাগ্যে ভাগ্যবতী।

ব্রাহ্মণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতার টীকা প্রণয়নে ব্যস্ত, সময়ান্তরে জানতে পারলেন আহারের কিছু নেই, ভিক্ষায় যেতে হবে, গীতামৃত উপলব্ধির মাঝে এ চিন্তা মনকে ক্ষুণ্ণ করে তুললো। নবম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকে এসে এক দ্বিধা দেখা দিল—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

—এই যখন তাঁর শাশ্বত বাণী, আমি কি তাঁর চরণে নিত্য-অভিযুক্ত নই, তাই দারিদ্র্যের এই পীড়ন! চিন্তাকাশে সন্দেহের মেঘ দেখা দিয়ে আলো আঁধারের খেলা খেলে গেল। 'যোগ আর ক্ষেম আমি নিজে বহন করি'— না, এটা ঠিক নয়, তবে পরোক্ষে দিয়ে থাকি এটা বরং হতে পারে। মনে এই সিদ্ধান্ত করে লেখনীর সাহায্যে 'বহাম্যহম্' কেটে দিলেন।

শ্লোকবিচার, টীকা লেখা প্রভৃতি কাজ বন্ধ রেখে ভিক্ষায় যাবেন এমন সময় হঠাৎ ভয়ানক দুর্যোগ দেখা দিল, এমন ঝড় জল আরম্ভ হলো যে ভিক্ষায় যাওয়া বন্ধ রইল। সে দিনের মত দুজনেই উপবাসী থাকলেন। পরের দিন ভিক্ষায় বার হলেন। ব্রাহ্মণী গৃহের কাজ সেরে স্বামীর অপেক্ষায় আছেন, বেলা বয়ে যায়, উন্মনা হয়ে উঠেন, এত বেলা হলো আজও ভাগ্যে কি আছে জানি না! পাতার শব্দে সজাগ হয়ে উঠেন। মৃদু গুঞ্জন কানে এল, তাকিয়ে দেখেন দুটি সুকুমার বালক মহাপ্রসাদের ভার নিয়ে তাঁদেরই কুটীরের দ্বারে। কি অনিন্দ্যসুন্দর রূপমাধুরী দিয়ে বালক দুটির দেহ গঠিত, 'নয়ন ফিরাতে

নাহি চাহে'—একজনের দেহ ঈষৎ নীল, অপরের দেহটি গৌর। কিন্তু হায় হায় একি দৃশ্য! পীঠ ক্ষতবিক্ষত—রুধির ধারায় দেহ সিক্ত হয়ে উঠ্ছে। প্রসাদ নামিয়ে বালক দুটি বল্লে—"মিশ্র ঠাকুর প্রসাদ পাঠিয়েছেন, গ্রহণ করুন। ঠাকুরাণী বল্লেন—'তোমাদের ন্যায় সুকুমার বালকের কাঁধে এই বোঝা ঠাকুর চাপালেন কি করে? আর বাবা, তোমাদের এ দুর্দ্দশাই বা কে করলে; তোমাদের পীঠ দিয়ে রক্তধারা বইছে, তোমরা কাঁদছো, কে সেই নির্দ্দয় তোমাদের এমন ভাবে প্রহার করলে?' বালক দুটি বললে—'মিশ্র ঠাকুরই আমাদের এই ভাবে প্রহার করেছেন।' ব্রাহ্মণী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলেন—'সেকি বাবা! ব্রাহ্মণ, বালক তো দূরের কথা সামান্য কীট পতঙ্গকেও তিনি পীড়া দেন না, একাজ কি ভাবে তাঁর পক্ষে সম্ভব, কেনই বা মারলেন, কি করে এই সোনার অঙ্গে আঘাত দিলেন?" বালক দুটি উত্তর দিলে—"আমরা কিছু দোষ করি নি তাঁর কাছেই ছিলাম—

লোহার কণ্টক তীক্ষ্ণ তাহার আঘাতে।
আঁচড়িলা অঙ্গ এই দেখহ সাক্ষাতে॥

—শ্রীশ্রীভক্তমাল।

বালক দুটি চলে গেল। ঠাকুরাণী দুঃখে ও ক্ষোভে ব্যাকুল হয়ে রইলেন। একটু পরে মিশ্রঠাকুর ফিরে এলেন। পত্নীকে শোকাকুলা ও ক্রোধান্বিতা দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিতা হয়ে ব্রাহ্মণী বললেন—'শাস্ত্রাদি আলোচনা করে জীবন কাটিয়েও তোমার মধ্যে যে এত দূর নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি থাকতে পারে তা ভাবিনি, তুমি কি করে দুটি সুকুমার শিশুকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করে তাদেরই কাঁধে চাপিয়ে প্রসাদের ঝোড়া পাঠালে? ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে বললেন—'সেকি আমি কাকে মারলাম! আজ ভিক্ষাতেও হতাশ হতে হয়েছে, আর তুমি বলছো আমি প্রসাদের ঝোড়া পাঠিয়েছি। আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না, ভাল করে বুঝিয়ে বল।' ব্রাহ্মণী বললেন—"তুমি তোমার দোষ ঢাকতে এত সচেষ্ট কেন। দুটি অতি সুদর্শন শিশু এই মহাপ্রসাদের ঝোড়া দিয়ে গেল, বললে তুমি পাঠিয়েছ আর তুমিই নাকি কাছে পেয়ে লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত করেছ। তোমার কি মায়ামমতার লেশ নেই"—পত্নীর এই তিরস্কার বাণী পরমভক্ত পণ্ডিত অর্জুন মিশ্রকে আজ পাণ্ডিত্যের নাগালের বাইরে কোন্ অজানা লোকে নিয়ে গেল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, মুদ্রিত নয়ন দুটিতে প্রেমাশ্রু! দুঃখ শোক দারিদ্র্যের কশাঘাত—এও তাঁর দান বলে মাথা পেতে নিতে পারিনি, মনকে

পাণ্ডিত্যের অভিমানে মূঢ় করে ভগবানের শ্রীঅঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত গীতার বাণী যোগ ও ক্ষেম বহন করেন এতে অবিশ্বাসী হয়েছিলাম, তাই ভগবান নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে এসে ভ্রম দূর করালেন! 'বহাম্যহম্' কেটে দিয়ে সত্যই এই নরাধম, লৌহ শলাকা দিয়ে তাঁর শ্রীঅঙ্গে আঘাত করেছি। হায়, আমি কি পাষণ্ড"—এই সব খেদোক্তির সঙ্গে মিশ্র ঠাকুর বিলাপ করিতে লাগলেন। 'আমি অতি অধম ব্যক্তি কিন্তু ব্রাহ্মণী, তোমার ভাগ্যের সীমা নেই, জন্ম জন্মান্তরের তপস্যায় যাঁদের দর্শন পাওয়া যায় না সেই ভুবনপালন শ্রীজগন্নাথ শ্রীবলরামকে তুমি স্বচক্ষে দেখেছ, স্নেহ আদরে তুষ্ট করেছ, পাণ্ডিত্যাভিমান তোমার সৌভাগ্যকে আড়াল করেনি, তুমি যথার্থই ভাগ্যবতী।" ব্রাহ্মণ স্ত্রীর ভাগ্যের অশেষ প্রশংসা করে, তাঁর শ্রীমদ্ভাগবত গীতার টীকায় যেখানে 'বহাম্যহম্' কেটে দিয়েছিলেন সেইখানে ভাবাবেশে অনাবিষ্ট হয়ে তিনবার 'বহাম্যহম্' লিখে রাখলেন। শ্রীমিশ্রের এই টীকা আজও দক্ষিণদেশে ভক্তজনের আদরের সামগ্রী। 'ভক্তের বোঝা ভগবান বয়'—এই জ্বলন্ত শিক্ষা ভগবান দিলেন শ্রীঅর্জুন মিশ্রের উপর দিয়ে।

চিত্তাকাশে নিত্য সন্দেহ-মেঘের সঞ্চার—এ খেলা তো ঠাকুর তোমারই! কবে তা কেটে যাবে করুণাময়ের মধুর স্পর্শে! কবে ঠাকুরের এই অভয় বাণী মর্মে সাড়া জাগিয়ে তুলবে—**"নাম কর; অবিরাম নাম কর—আমি সব ভার গ্রহণ করবো, একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবি।"**

মহাজন জাতক

[শ্রীজয়কৃষ্ণ ঘোষ]

বেশ ছিলেন মহাজন কর্ত্তার কাছে, তাঁর দেশের বাড়ীতে। কর্ত্তাটি তাঁর ভারি ভাল মানুষ। সংসারের কারও সাধ-আহ্লাদ মেটাতে তাঁর এতটুকু কার্পণ্য নেই। যা'র যা' ইচ্ছে হবে—তা' সে যত ছোটই হোক্ বা তা'তে যা কিছুই লাগুক—কর্ত্তা তা পূরণ করেন। আবার কর্ত্তার দেশটিও যেমন মনের মত, বাড়ীখানিও তেমনই নজরসই। কি সুন্দর, কি সুন্দর! ব্যবস্থাও সব নিখুঁত। —মহাজন ছিলেন কর্ত্তার বড় আদরের। সুতরাং সেখানে তাঁর সুখেই কাট্‌ছিল। দিন তাঁর কাট্‌ত খুবই মজায়। না, ভুল বলা হল। দিন কাট্‌ত না, সময় কাট্‌ত। দিন যেন সেখানে কাটে না—নিত্য; এমনই সাজানোর

ওস্তাদি। বলিহারি যাই কারিকরের! কর্ত্তার ব্যবস্থায় আলো সেখানে যেন ময়লা হয় না—শুদ্ধ। আনন্দ সেখানে যেন ফুরোয় না—পূর্ণ। তৃপ্তির সেখানে যেন সীমা নেই—মুক্ত, মন্দাকিনীবন্দিত নন্দননন্দিত অমরাবতীর উর্দ্ধে যে বৈকুণ্ঠের কথা আমরা শুনি, কর্ত্তার দেশটি ঠিক যেন সেই শ্রীনন্দনন্দনের নয়নানন্দ বৈকুণ্ঠধাম। লেশমাত্র কুণ্ঠার বালাই নেই কোথাও কারও মধ্যে, এমনই দেশে আর এমনই কর্ত্তার কাছে মহাজন নিশ্চয় খুব ভাল ছিলেন।

এর ভিতর দুটি জিনিষ মাঝে মাঝে মহাজনকে ব্যস্ত করতে লাগ্‌ল। সে দুটি হ'ল—কর্ত্তার বাগানবাড়ী আর সেখানকার মানুষ। জানতেন মহাজন যে কর্ত্তার দেশের বাড়ীর থেকে তাঁর বাগানবাড়ীটিও কিছু কম যায় নি। বড় সখে প'ড়ে, বড় সুন্দর ক'রে রচনা করেছেন কর্ত্তা এই তাঁর বাগানখানি। রূপে, রসে, গন্ধে, গুণে যেন একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ। কিন্তু উপস্থিত বড় গোল লেগেছে। কর্ত্তার অত সাধের সাজানো বাগান বুঝি বা শুকিয়ে যায়, সেখানকার মানুষগুলির বড় বিপদ!

এক এক সময় এই মানুষগুলির এক এক বিপদের ছবি ভেসে উঠ্‌ত মহাজনের মনোদর্পণে, তিনি অনুভব করতেন তাদের জ্বালা—জ্বালার তীব্রতা। আহা! কি বেচারা এই মানুষগুলি! ভাবতে ভাবতে এদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্‌ল তাঁর মনে। আরও ভাবতে ভাবতে এবং দেখতে দেখতে সেই সহানুভূতি হ'ল গভীর। ক্রমে আরও গভীর। মানুষগুলির দুঃখকষ্টের চিন্তায় তিনি হলেন আকুল। জাগ্‌ল দয়া, জাগ্‌ল সঙ্কল্প—"আমি যাব। কর্ত্তার বড় সাধের বাগান। আরও বেশী সাধের সেখানকার অধিবাসী। তারা চরম কষ্টে পড়েছে, নিদারুণ জ্বালায় জ্বল্‌ছে। আমি যাব, আমি যাব, গ্রহণ করব সবার অতৃপ্তি, দূর করব সবার অশান্তি, পান করব সবার তৃষ্ণা, গ্রাস করব সবার জ্বালা। ঝরিয়ে দেবো আনন্দের পাগ্‌লা-ঝোরা। বাগানে রোপণ করব শান্তির বীজ, দেবো তা'তে সহিষ্ণুতার সার, সেচন করব প্রেমের বারি। শান্তির গাছ বাড়্‌তে থাকবে নেচে নেচে শাখার পর শাখা বিস্তার ক'রে। মধুবক্ষ পুষ্পের নিবিড়তায় শাখায় শাখায় আসবে আনন্দের শিহরণ। বাগান আবার উঠ্‌বে হেসে, আবার উঠ্‌বে ভ'রে প্রাণের জোয়ারে।'

মহাজন স্থির করেই ফেলেছেন—"আমি যাব"। তার ওপর এক সময় দেখ্‌লেন—কর্ত্তারও চোখে জল।

"কি হয়েছে, প্রভু? তোমার চোখে জল! তুমি কষ্ট পাচ্ছ! এযে অসহ্য" —বলেন মহাজন।

কর্ত্তা জানালেন তাঁকে তাঁর বাগানবাড়ীর দুরবস্থা। যে-মানুষগুলিকে, পরম ভালবাসার বশে তিনি তাঁর সাধের বাগানে স্থান দিয়ে লালন পালন ক'রে আসছেন, যাদের সাধ মেটাতে তিনি হয়েছেন কল্পতরু, তারাই হয়েছে বিদ্রোহী। তা'রাই তাঁকে ভুলে যেতে চায়, তাঁকে উড়িয়ে দিতে চায়! তাঁর চেয়ে দুঃখী আজ আর কে!

মহাজনের প্রাণবায়ু যেন দীর্ঘশ্বাস হ'য়ে বাইরে আসতে চায়, ব'লে উঠলেন তিনি—"আর নয়, আর দেরি নয়, প্রভু! তোমার মহাজন আগেই স্থির করে ফেলেছে—সে যাবে তোমার বাগানবাড়ীতে বিরাট প্রাণ নিয়ে, সেই প্রাণ—সে অংশে অংশে দান ক'রে নিঃশেষে রেখে আসবে সেখানে। এখন কেবল তোমার বিধানের অপেক্ষা!"

কর্ত্তা স্বভাবসিদ্ধ আনন্দে ফেটে পড়লেন—"কোল্ দাও, মহাজন। আলিঙ্গনে এস। তুমি আমার মরমসুহৃদ পরমাত্মীয়। তাই আমার ব্যথা আমার প্রিয়জনের ব্যথা বেজেছে তোমার বুকে আমারই সঙ্গে সমানে। ঠিকই প্রয়োজন হয়েছে মহাজনের যাওয়ার আর তারই আয়োজন দেখ্‌ছ আমার দুচোখে। আমার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে তোমার মধ্যে তোমার হ'য়ে। তুমি যাবে, মহাজন। আমার সম্পূর্ণ শক্তি সমগ্র ঐশ্বর্য্য নিয়ে, আমার হ'য়ে তুমি যাবে, এরা আমার বড় আদরের। এদের শান্তি দিয়ে তুমি আমায় কিনে নাও।"

তারপর কর্ত্তা মহাজনের কানে কানে কি কয়েকটি কথা ব'লে দিলেন। উল্লসিত মহাজন ছুটে চল্‌লেন নৃত্য করতে করতে। নক্ষত্রের গতিতে নাম্‌তে নাম্‌তে একটি জ্যোতিঃ রেখা মাটির বক্ষচুম্বন ক'রে সেই মা-টির কোলে বন্দী হ'য়ে রইল মুক্তা হ'য়ে।

এলেন মহাজন! অন্তরে তাঁর প্রচ্ছন্ন রইল জননীর করুণা, পিতার স্নেহ, সন্তানের ভক্তি। রইল বসুন্ধরার সহিষ্ণুতা, আকাশের উদারতা, কুলবধূর পবিত্রতা, রইল গৌরাঙ্গের প্রাণ, বিশ্বামিত্রের ধ্যান, ব্যাসদেবের জ্ঞান, আরও রইল ব্রাহ্মণের ক্ষমা, ক্ষত্রিয়ের মহিমা, বৈশ্যের গরিমা। সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্ন রইল অন্তরের মণিকোঠায় ফল্গুধারার মত। বাইরে কে তার সন্ধান পাবে! এলেন একেবারে এখানকার মতোটি হ'য়ে, এখানকার স্বাভাবিক ভালমন্দের ছাপ নিয়ে সারা দেহে মনে; যাতে সাধারণের কেউ তাঁকে পর ভাব্‌বার এতটুকু সুযোগ না পায়, যাতে তাঁর সঙ্গে মেশবার এতটুকু অসুবিধে কারও না হয়।

কাজ সুরু করবেন মহাজন, চিন্তা করেন—কি পথ।

প্রত্যেকটি মানুষের জীবন পাঠ করতে আরম্ভ করলেন তিনি। পড়া শেষ

ক'রে যা' দেখলেন তা' 'আনন্দ'। আনন্দই চায় সকলে, কেবল সেই আনন্দ পেতে গিয়ে রাস্তার রকম ফেরেই যত অশান্তি। আমাকে পড়তে গিয়ে দেখলেন—এ বেচারা আনন্দই চায়, আনন্দ পাবার জন্যে নারীরূপের লোভে নিস্‌পিস্‌ করছে, কামের আগুনে জ্বল্‌ছে। আর এক জনকে দেখলেন—সেও আনন্দই চায়। আনন্দের পিপাসায় ধনমদে মত্ত, প্রাচুর্য্যের লোভে জর্জরিত। আর এক জনকে পড়তে গিয়ে দেখলেন—সেও চায় আনন্দ। আনন্দের জন্য আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মাদ; প্রভুত্বের নেশা তার মধ্যে বিষক্রিয়া করছে। আর এক জনকে দেখলেন—সেও আনন্দই চায়; কিন্তু করছে কি—নিজের স্বাস্থ্যের গর্বে, রূপের অহঙ্কারে অপরের আনন্দ হরণ করছে। ক্রমে দেখলেন—কেউ জ্বলছে পাণ্ডিত্যের অভিমানে, কাকেও হয়ত তারই বংশমর্য্যাদা পীড়া দিচ্ছে, কারও বা নিজের অধিকৃত উচ্চ স্থানই তার দাহের কারণ হয়েছে। দেখলেন আনন্দের লোভে কেউ হয়েছে বঞ্চক, কেউ হয়েছে উৎপীড়ক, কেউ হয়েছে দস্যু, কেউ হয়েছে রাক্ষস, কেউ হয়েছে ভয়ঙ্কর। এই রকমে পথের ভুলেই জেগে উঠে হিংসা, ফুঁসিয়ে উঠে মাৎসর্য্য, জাগে অসহিষ্ণুতা, জ্বলে উঠে ক্রোধ, বাধে দ্বন্দ্ব, প্রবেশ করে অশান্তি, আসে নিরানন্দ। মূলে আনন্দের পিপাসা, আনন্দ চাই, আরও আনন্দ চাই। চাই ডুবে যেতে আনন্দে; অখণ্ড আনন্দে। এইটিই হল এদের স্বভাব। যা' ভুল বক্‌ছে, যা' ভুল করছে তা রোগের ঘোরে, বিকারে, নতুবা এরা স্থানভ্রষ্ট দেবতা অথবা দেবতা হওয়ার পথের এরা যাত্রী। আনন্দই এদের একমাত্র লক্ষ্য।

মহাজনের পড়া শেষ হল। জনজীবনদর্শনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। এখন কেবল চিন্তা—পথ কি? কি এ রোগের ঔষধ? সে চিন্তায় ছেদ পড়ে না। যেন এপারের কোনও এক মহাপ্রাণ ওপার আবিষ্কারের উদ্দীপনায় দুস্তর সমুদ্র সাঁত্‌রে চলেছে অবিরাম। রোগের ঔষধ চাই, শান্তির পথ চাই।

প্রিয়ের সাধনায় প্রিয়তম প্রসন্ন হলেন। নেমে এলেন কর্ত্তা নিজধাম ত্যাগ ক'রে—একটি সর্ব্বসুন্দর কিশোর, সৌরভকে বন্দী ক'রে সৌষ্ঠব যেন মূর্ত্ত হয়ে ফুটেছে। এক হস্তে তাঁর একটি ভাণ্ড আর এক হস্তে গ্রন্থচতুষ্টয়, স্পন্দিত হল—"জাগো সুন্দর, করুণাস্নাত আঁখিপদ্ম খোল"।

দৃষ্টিপাত করলেন মহাজন।

"গ্রহণ কর, মহাজন, রোগের ঔষধ" ব'লে তিনি ভাণ্ডটি সমর্পণ করলেন।

"আর গ্রহণ কর এই শান্তির আকর" ব'লে গ্রন্থ চারটি দান করলেন।

আরও বল্‌লেন—"এতদিন অতি যত্নে, অতি সঙ্গোপনে এগুলি রক্ষা করেছি

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা হ'য়ে। আজ এখানে সব রেখে গেলাম তোমার হাতে। শান্তি ফিরিয়ে আনো, মহাজন, আমার কাননে, এ কানন আমার হৃদয়-বৃন্দাবন"।

কর্ত্তা চলে গেলেন নিজের দেশে খুস্‌মেজাজে, সৌরভে চৌদিক উতরোল ক'রে, আনন্দ যেন ধরছে না তাঁর সারা দেহে, তাঁর সখের বাগান আবার সবুজ হবে, অবসান হবে তাঁর আশ্রিত প্রিয় মানুষগুলির দুঃখকষ্টের।

মহাজন স্থির করলেন—ঘুরে ঘুরে চিকিৎসার কাজ চালাতে হবে, কিন্তু ঐ ভাণ্ড আর গ্রন্থগুলি সঙ্গে নিয়ে ঘোরায় বড় অসুবিধে হয়। করলেন কি—সেই ভাণ্ডরস এবং গ্রন্থসার নিঃশেষে গ্রহণ ক'রে নিলেন, তা'রা রূপায়িত হল তাঁর সত্তায়, তা'রা জীবন্ত হয়ে রইল তাঁর অস্তিত্বের পরমাণুকণায়। প্রশান্ত মহাজন!

শান্তির সন্ধান পাওয়াতে মহাজনের চতুষ্পার্শ্বে বহুজনসমাবেশ হল, তাদের সকলকেই স্বীকার করলেন তিনি সস্নেহে সানন্দে।

এখন, কেমন ক'রে মানুষের মধ্যে ঘট্‌বে তাঁর ধ্যানদৃষ্ট নবজাতির সৃষ্টি—এই তাঁর ভাবনা। তিনি দিকে দিকে ভ্রমণ ক'রে মানুষের কাছে জানান—বাবারা সৎ হও, মায়েরা সতী হও, আর যে কর্ত্তার বাগানে বাস কর, যাঁর ঐশ্বর্য্যে তোমরা ঐশ্বর্য্যবান্‌, সেই কর্ত্তাটিকে ভুলে যেওনা, অকৃতজ্ঞ হ'য়ো না। স্মরণে মননে তাঁকে রাখ, এতে তিনি বড় তৃপ্তি পান। এই সত্যটি মনে রাখবে সব সময়, তাহলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তোমরা শান্তি পাবে।

স্থানে স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র খুল্‌লেন তিনি, সেগুলির নাম দিলেন আশ্রম। সেই সব আশ্রমের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করলেন এক মহাজাতির। এই মহাজাতির জন্ম দান ক'রে মহাজন হলেন মহাজনক।

একদিন এই মহাপিতা তাঁর জন্ম-দেওয়া মহাজাতির সামনে প্রশ্ন রাখলেন—বৎসগণ, এ জীবন দিয়ে যে পাঠ তোমাদের দিয়েছি তা'তে কি সাধ্য এবং কি তা'র সাধনা ব'লে জেনেছ?

উত্তরে বহুজন বহুপ্রকার বল্‌লেন, একজন বল্‌লেন—মুক্তিই সাধ্য, গঙ্গাস্নান, তীর্থভ্রমণ, সৎসঙ্গে বাস ও প্রভুর মহিমা কীর্ত্তন সাধনা। আর একজন বল্‌লেন—মুক্তিই সাধ্য। সব কিছুর নশ্বরতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে নির্লিপ্ত থাকা এবং প্রভুকে স্মরণ করাই সাধনা। অন্যজন বল্‌লেন—মুক্তিই সাধ্য। পবিত্র জীবন যাপন করাই সাধনা। প্রণাম রাখাই সাধনা।

এইভাবে বহুজন বহু প্রকারের উত্তর দিলেন। মহাজন হাসেন, যেন, পুরো নম্বর পাওয়ার মত উত্তর এখনও আসে নি। এই বহুজনের মধ্যে একজন ছিলেন সুজন, বহুর মধ্যে থেকেও বৈশিষ্ট্যে তিনি একক, মহাজন তাঁকে স্থাপন

করেছেন বহুর পুরোভাগে। মহাজনের ইঙ্গিতে সেই সুজন উত্তর দিলেন—তুমিই সাধ্য, হে আনন্দময়, তুমিই সাধনা।

এই উত্তরে সেই মহাজাতি যেন জাগ্রত হয়ে উঠে বস্‌ল। এক চোখে আবিষ্কারের বিস্ময়, আর এক চোখে ভালবাসার আনন্দ নিয়ে চেয়ে রইল সুজনের দিকে। বুক ভ'রে গেল মহাজনের। সার্থক শ্রমের তৃপ্তিতে তিনি হলেন পূর্ণ। আনন্দের আবেগ সংবরণ করতে করতে আবার প্রশ্ন করলেন—এখন বল, বৎসগণ, কেমন সে সাধনা?

স্পন্দন লাগে সর্ব্বজনের অন্তরে, উত্তরে কেউ বল্‌লেন—সর্ব্বক্ষণ তোমায় স্মরণ করা, কেউ বল্‌লেন—সকল সঙ্গ ত্যাগ ক'রে নির্জনে কেবল তোমার চিন্তা করা, কেউ বল্‌লেন—তোমার পূজায় প্রতিটি মুহূর্ত্ত যাপন করা। কেউ বল্‌লেন—তোমার সেবায় তৃপ্তি লাভ করা। কেউ বল্‌লেন—সংযত থেকে শ্বাসে শ্বাসে তোমায় স্মরণ করা। কেউ বল্‌লেন—তোমায় যারা ভালবাসে তাদের ভালবাসা।

মহাজন নিমীলিতনেত্রে উপভোগ করেন উত্তরগুলি। সুজনের একান্ত তদ্গতভাব। তাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লেন তিনি—"নীরব কেন? তুমিও বল, সুজন"।

মহাজনের বরণীয় মানসপুত্র সুজন বল্‌লেন—"আমার মধ্যে তোমায় পূর্ণত্ব দান ক'রে আমি তুমি হওয়া"।

"পরিষ্কার ক'রে বল, সুজন," আদেশ হল মহাজনের, সর্ব্ব অঙ্গে তাঁর প্রসন্নতা।

সুজন বলতে যান্‌, আনন্দে আবেগে কণ্ঠ তাঁর রুদ্ধ হয়ে আসে, তাঁর রক্ত-কণিকাগুলি পর্য্যন্ত উঠে কেঁপে, উঠে দুলে, উঠে নেচে। বহিরঙ্গে স্বেদপ্লাবন, আর শিহরণ।

"বলাও প্রভু, পারছি না যে বলতে" মিনতির সুরে ভেঙ্গে পড়েন সুজন।

"বল বল সুজন, আমার ইচ্ছায় তুমি বল কেমন তোমার সাধনা"।

কত কি বলতে চান সুজন, আর ব'লে উঠতে পারেন না, অন্তরে বাহিরে ভরে গিয়ে তিনি একাকার হয়ে গেছেন। নিখিল বিশ্বকে লাভ করেছেন একটি আলিঙ্গনের বাঁধনে। বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন—মহাজন নিশ্চল, যেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জ্জটি। দুটি চোখ থেকে তাঁর নেমে আসছে গঙ্গার বাৎসল্য আর যমুনার প্রেম।

মহাশান্তিতে তৃপ্ত মহাজন বললেন—"বর প্রার্থনা কর, সুজন"।

সেই আনন্দঘন ভাবমূর্ত্তির পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ক'রে প্রার্থনা জানান্‌ সুজন—"হে পিতঃ, তোমায় তিলেকমাত্রও বিস্মরণের বিভীষিকা থেকে তোমার সন্তানদের রক্ষা কর"।

স্তব্ধ সভাতল, মহাজন যেন কোন্ দূর দেশ থেকে ফিরে এসে আশ্রমের সেই গভীর মৌন ভঙ্গ করলেন, বদনমণ্ডলে পরিপূর্ণ প্রসন্নতা, দুটি চোখে স্নেহধারা। সুদীর্ঘ বাহুদ্বয় প্রসারিত ক'রে বর ও অভয় দান ক'রে বললেন—"পূর্ণমনস্কাম হও, সুজন, পূর্ণমনস্কাম হও, তোমরা সর্ব্বজন"।

তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব কণ্ঠে গীত হল—

"জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়।
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়॥"

লুটিয়ে পড়লেন, লুটিয়ে রইলেন সকলে সমস্ত প্রাণ নিয়ে মহাজনের শ্রীচরণাম্বুজে—যেন মধুলুব্ধ অলিগুলি।

"ধন্য তোরা, তোরা কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস করেছিস্। তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছিস্। তোরা শান্তির অনুভব, তোরা মিলনের মাধুর্য্য। তোরা আমার সর্ব্বস্ব—পদতলে নয়, তোরা আমার বুকে আয়, ওরে তোরা আমার বুকে আয়" ব'লে উচ্ছ্বসিত আনন্দে মহাজন তাঁদের কোল দিলেন।

সেই আনন্দের হাটে আনন্দময় কর্ত্তা মহানন্দে প্রেমের হরিলুট ছড়িয়ে দিলেন। সকলেই পূর্ণানন্দে মগ্ন। কর্ত্তা পূর্ণ, মহাজন পূর্ণ, সুজন পূর্ণ, সর্ব্বজন পূর্ণ।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

—০—

শ্রীনাম

[শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল]

যে জন মধুর শ্রীনামের রসে
রহে সদা নিমগন
সে পায় হেরিতে অনিমিখ চোখে
নামময় এ ভুবন।
মোহের তন্দ্রা ভেঙ্গে যায় তার
আমার বলিতে রহেনাকো আর,
নাম নিতে সে যে আমি-হারা হয়ে
পায় তব শ্রীচরণ।

বরাভয় দানি' কৃপালু শ্রীনাম
কভু 'নামী' হয়ে আসে,
কহে—'আমি আছি তার কাছাকাছি
যে আমারে ভালবাসে।
আমি দয়া করে তারে করি পার,
নিয়ে চলি তারে মায়া-পরপার—
যেথা চিন্ময় পরমপুরুষ
ললিত-হাস্য হাসে।'

—•—

তোমার কর্ম তুমি কর

[শ্রীঅনিলবরণ কাব্যপুরাণতীর্থ, এম্‌-এ]

যে কোন কাজ করলেই মানুষ বলে আমি করলাম। তাই তার অহংকারের শেষ নাই। আমি অমুক করলাম ইত্যাদি বলে নিজের দেমাকে অন্ধ হয়ে পড়ে—ধরাকে সরা জ্ঞান করে। আবার সেই মানুষ যখন আর একটি কাজে বিফল হয় তখন সে ভগবানের নামে দোষ দেয়। কৈ তখন ত তার ক্ষমতা কাজে লাগতে পারে না! কেন এমন হয়?

মানুষ বুঝতে পারে না যে সে বড় দুর্বল। নিজের ইচ্ছায় বা ক্ষমতায় সে কোন কাজ করতে পারে না। সব কাজের কর্ত্তা একজন আছেন। তিনি অজানা। অথচ তিনি সবই জানেন। তিনি আড়ালে থেকে ভানুমতীর খেলা খেলিয়ে নিচ্ছেন—মোহমুগ্ধ মানুষকে দিয়ে। সেই অজানাকে কেউ বলেন ব্রহ্ম, কেউ বলেন পরমাত্মা—আবার কেউ বলেন ভগবান। তিনি শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন, নিত্য অক্ষর। তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না। বাক্য তাঁর কাছে যেতে পারে না। তাঁর রূপ জানি না তাইত তিনি কালো; আবার তাঁরই রূপে জগৎ আলো। তাঁরই ইচ্ছায় সব কাজ হচ্ছে। এ বিষয়ে উপনিষদে একটি গল্প আছে।

এক সময় দেবতারা অসুর দ্বারা পীড়িত হয়েছিলেন। ব্রহ্ম তাদের হত্যা করলেন দেবতাদের দ্বারা। দেবতারা তা বুঝতে না পেরে নিজেদের শক্তির গর্ব্বে তাঁরা গর্ব্বিত হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় ব্রহ্ম তাদের ভুল ভাঙাবার জন্য তাদের সামনে জ্যোতিতে ভরা রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলেন। দেবতারা বললেন এ মহাপূজ্যটি কে? তাঁরা অগ্নিকে পাঠালেন ব্যাপারটা ঠিক ঠিক জানতে। অগ্নি কাছে গেলেন।

—কে তুমি?

আমি অগ্নি।

তোমার শক্তি কি?

জগতের সকল পদার্থকেই আমি ভস্মীভূত করতে পারি।

বেশ, বেশ। আচ্ছা এই তৃণটি ভস্ম কর ত।

অগ্নি কিন্তু তাঁর সব শক্তি দিয়েও পোড়াতে পারলেন না,—লজ্জিত হয়ে চলে গেলেন।

তখন দেবতারা বায়ুকে পাঠালেন।

বায়ু বললেন, আমি সমস্ত গ্রহণ করি।

ওই তৃণটি গ্রহণ কর।

বায়ু পারলেন না।

তখন ইন্দ্র গেলেন। এমন সময় সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ অন্তর্হিত হলেন এবং সেখানে এলেন উমা। উমার কাছে ইন্দ্র জানলেন পুরুষের প্রকৃত কাহিনী। তিনি ব্রহ্ম। সমস্ত জগতের ঈশ্বর।

তিনি অজানা। সাধারণ মানুষ যা জানে সে জানা—জানা নয়। তিনি অখণ্ড—একমেবাদ্বিতীয়ম্। সেই অখণ্ডকে আমরা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি নামেও জানি। সেই নাম আর নামী অভেদ। নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রূপ। আর সেই অজানা সকল জ্যোতির জ্যোতি।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতঃ অয়মগ্নি ?
তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বম্
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

সেখানে সূর্য্য প্রভাহীন, চন্দ্র তারকাও। বিদ্যুৎও সেখানে উজ্জ্বল নয়। অগ্নি কোথায় লাগে। তাঁর জ্যোতিতে সকলই জ্যোতির্ময়। তাঁর প্রকাশে সকল প্রকাশিত। তাঁর রূপ আছে আবার নাই। তিনি প্রকাশ আবার অপ্রকাশ। তিনি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর আবার মহৎ হ'তে মহত্তর। তিনি সমস্ত বিশ্বকে এক অংশে মাত্র ধরে আছেন তাঁকে জানলে সমস্ত সংশয় নষ্ট হয়। তিনি বিরাট আর ক্ষুদ্র আমি—জানবার স্পর্দ্ধা কোথায়। তাই তাঁর উদ্দেশ্যে

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।

—০—

শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী

॥ অষ্টম উচ্ছ্বাস ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

জটাভি লম্বমানাভি নৃত্যন্ত মভয়প্রদম্।

দেবং শুচিস্মিতং ধ্যায়েদ্ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিতম্।

যে সুধী ব্যক্তি গহন সংসার ভয়ে ভীত সে পবিত্র কৈলাশে অথবা পাপহীন কাশীধামে সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করে দিবানিশি মদনারির নাম গান করবে। শিবের নাম উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা কীর্ত্তন সম্যক সিদ্ধির জন্য হয়, যা সহসা শ্রবণে প্রবেশ করে সংসার বন্ধন নাশ করে দেয়।

উৎসৃজ্যাপি তপোব্রতং হৃদিশিবং ধ্যায়ন্ সদা কীর্ত্তয়েদ্।

বিশ্বেশ ত্রিপুরান্তকেশ্বর শিবেত্যাধায় মুর্দ্ধ্যঞ্জলিম্॥

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

ব্রত, তপস্যা ও ত্যাগ করত মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক হৃদয়ে শিবকে ধ্যান করে সর্ব্বদা 'বিশ্বেশ' 'ত্রিপুরান্তক' ঈশ্বর শিব এই নাম সকল কীর্ত্তন করবে।

ব্রত তপস্যা আদি না করে সতত যদি কেউ শিব নাম কীর্ত্তন করে, তাহলে সে কি কৃতার্থ হতে পারে?

তাতে কি আর সন্দেহ আছে? সকলের লক্ষ্য সেই একটীকে লাভ করা।

সেই একটী কি ওঙ্কার?

নচিকেতা যমকে বলেছিলেন—

"ধর্ম্ম হতে অন্য অধর্ম্ম হতে ভিন্ন কার্য্য কারণ হতে পৃথক অতীত ও ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হতে পৃথক, আপনি যা দেখছেন আমায় তা বলুন।"

যম বল্লেন,—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদ মামনন্তি তপাংসি সর্ব্বানিচ যদ্ বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্য করন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওমিত্যেতৎ

—কঠ ১।২।১৫।

বেদ সকল যে প্রাপ্য বস্তুটীকে সুন্দররূপে প্রতিপাদন করেন এবং সমস্ত তপস্যা যাঁহা বলে অর্থাৎ যাঁকে প্রাপ্ত হবার উপায়, যাঁকে ইচ্ছা করে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন তোমায় আমি সেই প্রাপ্তব্য বাঞ্ছিততম বস্তুটী সংক্ষেপে বলছি ইহা 'ওম্'।

শিবনাম মহিমা বল—

শিবেতি বাচং যো নিত্যং চণ্ডালোঽপি বদেদ্ধরিং।
সহ তেন বদেদ্ বাচন্ সহ তেন বসেৎ সদা॥

—বশিষ্ঠ লৈঙ্গে।

'শিব' এই নাম যে অনুক্ষণ কীর্ত্তন করে, সে যদি চণ্ডালও হয় তাহলে তার সঙ্গে কথোপকথন করবে—তার সঙ্গে বাস করবে।

শিবনামকারী চণ্ডালের সঙ্গে বাস করবার বিধান দিলেন?

বিধান দিলেন না, শিব নামের প্রশংসা করলেন। শিব নামের এমন সামর্থ্য যে চণ্ডালকে পবিত্র করে দেয়।

মহা পাতক বিচ্ছিত্তৈ শিব ইত্যক্ষরদ্বয়ং।
অলং নমস্ক্রিয়া যুক্তো মুক্তয়ে কল্পিতো মনুঃ॥

—ব্রহ্মোত্তর খণ্ডে।

মহাপাতক নষ্ট করতে 'শিব' এই অক্ষর দুটী যথেষ্ট। যদি তাতে 'নমঃ' এই ক্রিয়া পদ যুক্ত করা যায় তাহলে একটী মুক্তি মন্ত্ররূপে কল্পিত হয়।

"শিবনাম পবিত্রাবাক নিরগাত কহারিণী।
শিবনাম স্মরণঞ্চ মদীয় মপি পাতকং॥
মন্দীভূতং ততস্তেন প্রবেশং লব্ধবানহং॥

—কাশীখণ্ডে।

'শিব' এই নাম জপের দ্বারা পবিত্রাবাণী পাপ নষ্ট করে দেন। শিবনাম স্মরণ-ও পাপহারক। শিব নামের প্রভাবে আমারও পাপ মন্দীভূত হল। একবারও যে 'শিব' এই নাম উচ্চারণ করে সেও কৃতার্থ হয়।

একং নাম শিবস্য আতু কথয়ন্ শৃণ্বং স্তথাস্ত্যক্ষণে।
রুদ্রত্বং সমুপৈতি নেষ্যতি পুন র্মাতুশ্চ গর্ভেক্ষণম্॥
পাপৈ র্জন্ম শতার্জ্জিতৈ রপি তদা মুক্তো মুখং ভৈরবং।
নাবেক্ষদ্ যমকিঙ্করস্য সহসা রুদ্রগণৈ সংবৃতঃ॥

—ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে।

কেহ কখন যদি শিবের একটী নাম উচ্চারণ করে অথবা শোনে তৎক্ষণাৎ রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় আর তাকে মাতৃগর্ভ দর্শন করতে হয় না, শত জন্মার্জ্জিত পাপ হতে তখনি মুক্ত হয়ে যায়। সহসা রুদ্রগণ তাকে পরিবেষ্টিত করে রক্ষা করেন, যম-দূতের ভীষণ মুখ আর তাকে দেখতে হয় না।

আহা কবে আমার জিহ্বা সর্ব্বদা শিব শিব নাম ঘোষণা কর্‌বে। অপূর্ব্ব

শিব নামের মাহাত্ম্য শুনে আমি ধন্য হলাম, তুমি শিব নামের মহিমা আরও বল।

অনন্ত অনন্তকাল ধরে যদি শিব নামের মহিমা কেহ কীর্ত্তন করেন, তাহলেও তিনি মহিমার পারে যেতে পারবেন না। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কতটুকু জানি।

যন্নাম সঙ্কীর্ত্তনমেকমেব
বিনাশয়ত্যাশু মহাঘ সঙ্ঘম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥

—শিবরহস্যে।

যাঁর একমাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তনই সত্বর মহাপাপসকল বিনাশ করে, যিনি ব্রহ্ম ইন্দ্র বিশ্বাদি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয়, সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম পীযূষমপীয়মানং
ভবন্তি সংসারসমুদ্রমগ্নাঃ।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্॥

যাঁর নামামৃত পান না করে লোকসকল সংসার সমুদ্রে মগ্ন হয় সেই ব্রহ্ম ইন্দ্র বিশ্ব প্রভৃতি সুরগণের একমাত্র বন্দনীয় জ্যোতির্ম্ময় মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

মানুষকে ততক্ষণ ভাবতে হয় যতক্ষণ না তাঁর শরণাগত হয়।

তবাস্মীতিবদন্ বাচা তথৈব মনসা স্মরন্।
তৎস্থানমাশ্রিত তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

—হরি ভক্তি বিলাস

'তবাস্মি' তোমার আমি, বাক্যের দ্বারা তাহা বলে মনের দ্বারা তাহা স্মরণ করে দেহের দ্বারা তাঁর ধাম আশ্রয় করত শরণাগত পরমানন্দ লাভ করে।

আচ্ছা, বৈষ্ণবগণ কি শিবপূজা শিবনাম করেন?

নিশ্চয়ই করেন। শ্রীমম্ মহাপ্রভু বলেছেন—

সকৃৎ যে জন বলে শিব হেন নাম।
সেহো কোনো প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্বতান্॥
সেই ক্ষণে সর্ব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়॥
হেন শিব নাম শুনি যাঁর দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গল সমুদ্রে ভাসয়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

যদ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাম্
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘ মাশুহন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্য শাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ॥

শ্রীভগবতী দেবী পিতা দক্ষের শিবনিন্দায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন—"যাঁহার দুই অক্ষর সমুদ্ভূত সুপ্রসিদ্ধ শিব নাম একবার মাত্র বাক্যের দ্বারাও উচ্চারিত হইয়াও মানব সমূহের সমস্ত পাপ শীঘ্রই ধ্বংস করে, যাঁহার কীর্ত্তিকলাপ পরম পবিত্র এবং যাঁহার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় আপনি সেই শিবের দ্বেষ করিতেছেন, অহো আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গল স্বরূপ।

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন আপনে।
শিব যে না পূজে সেবা মোরে পূজে কেনে?
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥

তথাহি—

কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপ পরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্নহি॥

আমার যে ভক্ত শিবের সম্যক পূজা না করে, সাক্ষাৎ পাপ স্বরূপ সেই পুরুষ কি প্রকারে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে।

অতএব সর্ব্বাগ্র শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব্বদেবে॥

—শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ৪ অধ্যায়।

বৈষ্ণব তাহলে আগে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করে তারপর শিবের পূজা করিবেন?

হাঁ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রাণ শ্রীমন্মহাপ্রভু এই কথা বলেছেন। তুমি বল, অবিরাম বল—

শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব।
শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব॥

—০—

গান

[শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

হে গুরু! তোমারি চরণতলে নত করি শির।
দিও মোরে ভক্তি দিও মোরে শক্তি
দিও মোরে জীবনের মন্ত্র মুক্তির।
মনের আঁধার মোর ক'রে দিও দূর
বেসুরো বীণায় তোল মধুময় সুর,
অহরহ যেন তব রূপটি মধুর
বহায় আমার প্রাণে ধারা গোমুখীর।

চাহি না বড় হ'তে চাচি না অর্থ
চাহি না সম্পদ বৈভব স্বার্থ,
আমি যেন ছোট হয়ে তব মধু নাম লয়ে
করি যেন বড় কাজ শ্যামাধরণীর।
চাহি শুধু এই—নাহি চাই অন্য,
মরণে জীবন মোর হয় যেন ধন্য,
যেন মোর কর্ম যেন মোর ধর্ম
হয় চির সুন্দর মধুর প্রীতির।
বিদায় বেলায় যেন ভুলি না তোমায়—
তুমি এসো ডাকে মোর—হয়ো না বধির।

—০—

ওঙ্কারেশ্বরের পত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

নবম মাস অতিক্রম করে ঠাকুরের মৌন দশম মাসে পড়তে চললো কিন্তু তাঁর মৌনভঙ্গের কোন ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে না। ইঙ্গিত আছে কি না তাও জানি না। শুনি ঠাকুরের গণেশ-লেখনীর আকস্মিক আনিবার্য্য বিরতি নাকি একটা বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু সেদিকেও তো চোখ দিলে দৃষ্টি ফিরে আসে আশাহত হয়ে। শ্রীহস্ত স্পৃষ্ট হওয়া মাত্র বাবার লেখনী চলতে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তিনি নিজেই একদিন তাঁর কলমের প্রসঙ্গ-ক্রমে লিখে জানিয়েছিলেন এ্যমেরিকার (এ্যমেরিকা থেকে গত মৌনে বাণীদি এ কলমটী পাঠিয়েছিলেন) কলম কাগজে ঠেকাতে না ঠেকাতে চলতে থাকে। কোনও সুযোগে মৌনভঙ্গের কথা তুললে—দর্শন না হলে মৌনত্যাগ করবেন না, লিখে দেন। আব্দার করলে জানান—"প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—বিনাদর্শনে 'যদা যদা' 'শিবোঽহং' 'শান্তোঽহং' ইত্যাদিতে মৌনত্যাগ করবো না এবং স্থান ত্যাগও নয়, তাঁর যদি প্রচারের ইচ্ছা থাকে তো দেখা দেবেনই।"

ঠাকুরের শরীর শীর্ণ হয়েছে, আহারো কমে গেছে খুব কিন্তু কর্ম্মশক্তি যেন দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আহার-ত্যাগের গুজব—মিথ্যা। তাঁর চলমান কঙ্কালটীকে নিত্য দেখে-দেখেও সকলকে জানাই, তিনি কুশলে আছেন। বাহ্যিক জীবন-যাত্রার এতটুকু ব্যতিক্রম নেই, অন্তরের সংবাদ তিনিই জানেন।

বই কখানা লিখেছেন জানা নেই। ছোট ছোট কয়েকখানা তো প্রকাশিতই হয়ে গেছে, তা ছাড়া মাতৃগাথা বলে ৪০ অধ্যায়ের একটী শাক্ত-গ্রন্থ লিখে আমাদের পড়তে দিয়েছেন। বাবার বই তো সবই ভাল লাগে—তবু যেন এ বই পড়তে পড়তে মনে হয় এমনটী আর হয়নি। ঠাকুরের বিশেষ ধারা প্রশ্নোত্তর ছলে মা ও মাতৃভক্তের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে এ অভিনব প্রাণস্পর্শী গাথা।

ধীরানন্দদা এবং ভগবানদাসজী এসে আমাদের দলবৃদ্ধি করেছেন। ধ্যানানন্দদা এবং অপর একজন শীঘ্রই আসচেন।

আহ্বানের পর আহ্বান আসচে চারদিক থেকে। নাসিক চার সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা নামপ্রেমী এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন মোহান্ত শ্রী১০৮ শ্রীমদ্ দীনবন্ধুদাসজী মহারাজ, মালসোর (গুজরাট) এর গত কুম্ভের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মুখ্য মোহান্ত শ্রী১০৮ শ্রীমদ্ রাসবিহারী দাসজী মহারাজ, ভারতবিখ্যাত মণ্ডলেশ্বর মহারাজ ১০৮ স্বামী মহেশ্বরানন্দজী মহারাজ প্রভৃতি বহু মহাপুরুষের একান্ত আগ্রহ ও প্রার্থনা আগামী চৈত্রে উজ্জয়িনী কুম্ভে যেন ঠাকুর অবশ্যই পদার্পণ করেন।

বোম্বায়ের খ্যাতনামা নামানুরাগী ও বহুশ্রুত বহুকীর্ত্তি মহাপুরুষ শ্রী১০৮ শ্রীমদ্ স্বামী কৃষ্ণানন্দজী মহারাজ আজ ১০।১২ দিন যাবৎ দয়া করে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করে এখানেই অবস্থান করচেন। তিনি এসেছিলেন বারাবাঙ্কীতে ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অধুনা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের কীর্ত্তন মণ্ডপের প্রারম্ভিক উৎসবে ঠাকুরের উপস্থিতির সম্মতি আদায় করার জন্য। তিনি ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিলেন, তবে সম্মতির বেলায় "মৌনত্যাগ হলে পর ঠাকুরের ইচ্ছা হলে হবে"—এটুকু তিনি লাভ করেন। তিনি এতেই আনন্দিত। তিনি অত্যন্ত আনন্দসহকারে সকলকে বলে বেড়াচ্ছেন "যে আমি কল্পবৃক্ষের সান্নিধ্যে এসে গেছি" ইত্যাদি ইত্যাদি। বারাবঙ্কির কীর্ত্তন মণ্ডপে ঠাকুরের একটী তৈলচিত্র রাখার আবেদনও ঠাকুরকে দিয়ে তিন মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন। ঠাকুরের আরব-প্রচারে তিনি নিজব্যয়ে সাথী হবেন বলে তৈরী হয়ে আছেন।

আরবের এডেন থেকে তথাকার ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ঠাকুরকে সেখানে পদার্পণ করার আহ্বান এসেছে অনেকদিন। মৌনভঙ্গের পর ঠাকুর এ ব্যাপারে অনুকূল দৃষ্টি দেবেন বলে মনে হয়।

বহরমপুর (উড়িষ্যার) কোটিপতি ধনী শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চৌধুরী, যার সঙ্গে আমাদের কারো কোন প্রকার পরিচয় ছিল না সম্প্রতি ঠাকুরের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে একটী অনন্তকালোদ্দিষ্ট অবিরত নাম চালাবার কাতর প্রার্থনা জানালে ঠাকুর সাগ্রহে তাতে সম্মতি দেন। ওটীর নামকরণ

করা হয় 'জয়গুরু অনন্তকালোদ্দিষ্ট অবিরত মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল।' কিঙ্কর শ্রীমৎ প্রণবানন্দজী ও কিঙ্কর শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দজীকে এ মহাযজ্ঞ পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করা হয়েছে। আগামী উত্থান-একাদশী থেকে উৎসব আরম্ভ হবে মহাসমারোহে।

রাজোল (মাদ্রাজ) থেকে সকাতর-আহ্বান এসেছে তাঁদের আগামী ১০৮ দিন স্থায়ী অবিরত শ্রীশ্রীনামযজ্ঞ ও যুগপৎ বহুবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স-শিষ্য ঠাকুরের যোগদানের জন্য। ১০৮ দিন নামরক্ষায় দলে দলে সহযোগ করলে ঠাকুর আনন্দিত হবেন। যোগদানেচ্ছুরা যেন যাতায়াতের ভাড়া প্রভৃতির জন্য এখানে লেখেন।

পুরীধামের অনন্তকালোদ্দিষ্ট অবিরত মহামন্ত্র কীর্ত্তন, নবগ্রামে গোবিন্দ বাড়ীতে অনন্তকালোদ্দিষ্ট অবিরত মহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং নবগ্রামের শ্রীহৃদয় চন্দ্র রায়ের বাড়ীতে কয়েকমাস যাবৎ অবিরত মহামন্ত্র কীর্ত্তন নির্ব্বিঘ্নে চলচে। ঠাকুরের নামপ্রেমী শিষ্যদের এ বিষয়ে অবহিত করা বাহুল্য।

ব্রহ্মাবর্ত্ত বা বিঠুর (কানপুর) আশ্রমের নামকরণ করা হয়েছে "শ্রীলবকুশ আশ্রম, মৈথিলীমঠ"। গত ৩০শে ভাদ্র মঠরক্ষক শ্রীমৎ কিংকর মোহনানন্দজীর তত্ত্বাবধানে পূজা, পাঠ, নরনারায়ণ সেবা, অষ্টপ্রহর অবিরত নাম কীর্ত্তন সহ নামকরণ-উৎসব সাফল্যমণ্ডিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন ঠাকুরগতপ্রাণ অপীতিশর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীস্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ। প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার বিশ্বাস। অধ্যাপক শ্রীসুনীল ঢোল, সপরিবার ঠাকুরের অকৃত্রিম ভক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়, শ্রীঅনিল চক্রবর্ত্তী, শ্রীদুলাল দাস, সুরবালা সেন, সপরিবার অধ্যাপক শ্রীসুশীল কুমার বাজপেয়ী, ও সুরসাগর 'হরিদা' প্রভৃতির সর্ব্বপ্রকার সাগ্রহ প্রযত্নে উৎসবটী প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

সম্প্রতি বোলপুরের গুরুভ্রাতা শ্রীজ্ঞানানন্দ চৌধুরী ২০ বিঘে ধানজমি সহ একটী আশ্রম ক'রে ঠাকুরের চরণে উৎসর্গ করেছেন। ঐ আশ্রমটীর নামকরণ করা হয়েছে "সরোজিনী মঠ"।

চন্দননগর আশ্রমের সমস্ত ভার ডাঃ শ্রীদীনবন্ধু ঘোষের উপর দেওয়া হয়েছে।

ঠাকুরের পত্র লেখা বন্ধ ছিল। নাসিকে কুম্ভমেলায় যাবার আদেশ করার পর পত্রের আদান প্রদান কিছু হয়। এই অবসরে আর্ত্তভক্ত বা গুরুতর প্রয়োজন যাঁরা জানান তাঁরা কেউ কেউ পত্র পান এবং বহরমপুরের অনন্তকালোদ্দিষ্ট অবিরত মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন প্রার্থনা এলে তাদের দিন করে দেন, নামের ব্যবস্থা করেন। তার জন্য যা পত্র দেন সেই সব থেকে কিছু লিখচি। অতঃপর আর পত্র আদান প্রদান করবেন না লিখেছেন।

"ব্যাপার কি জানিস্ সমস্ত এমনভাবে ঠাকুর বেঁধে রেখেছেন—একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই—এটা বোঝবার জন্যই সাধনা। সব বাঁধা আছে—আমরা তাঁর চোখের উপর আছি।"

"সীতারামের কাছে যারা থাকবে তাদের কাজ আপনা আপনি হবে।"

"যথাসাধ্য নামে যোগ দিতে চেষ্টা করবি। পরস্পর পরস্পরকে সীতারামের অন্যমূর্ত্তি বলে দেখবি। কোন রকমে যেন কারুর উপর বিরুদ্ধদৃষ্টি না পড়ে। যদি পড়ে—মনে মনে ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাবি। যাকে বিরুদ্ধভাবে দেখবি সীতারামকে বিরুদ্ধদৃষ্টিতে দেখা হবে যেন মনে থাকে।"

একটা অন্য কাজ নিয়ে আছি—এখন আর খাঁচার চিন্তা করতে পারবো না। ঠাকুরের ইচ্ছায় যদি মৌন ভঙ্গ হয় তা হলে তুই লিখে নেবার চেষ্টা করিস্। দীর্ঘজীবনের কত ঘটনা। কতটুকু উপাদানে দিতে পেরেছি। নিত্য জিজ্ঞাসা করে আদায় করিস যদি মৌন ঠাকুর ত্যাগ করান।"

"হৃদয়ের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হয়।......সম্বন্ধে তোরা যদি প্রেমভাব রাখিস, বক্রদৃষ্টি না থাকে তাহ'লে অবশ্যই সে প্রেমে বাঁধা পড়বে। সেও ভক্তিমান ছেলে। জন্ম জন্মান্তর পিছুনে ঘুরছে—তবে প্রকৃতি ঐ রকম।"

"প্রণবরাজ বা ভগবান ওঙ্কার বললে বড় দূর দূর মনে হয়—তাই বিশ্বমাতাকে 'মা' বলে ডাকি, খুব আনন্দ হয়। অতঃপর মা বল্লে তোরা ওঙ্কারই বুঝবি।"

"এখানে লোক বাড়চে বলে ভাবিস নে—তোরা আর কত খাবি। শ্রীগুরুদেবই এই পরিবেশের মধ্যে কয়েকজনকে গড়তে চাচ্ছেন মনে হচ্ছে……। এখানে এমন একটা স্পন্দন চলছে যাতে যে কেহ অবশভাবে অন্তর্মুখ হয়ে যাবে। যোগাযোগ উত্তম। ব্রাহ্মণ যেন যথাকালে সন্ধ্যা করে।"

"দেবযানকে উপেক্ষা করা আর সীতারামকে উপেক্ষা করা এক কথা। ছেলেরা মাসে মাসে সীতারামের নূতন নূতন উপদেশ নিয়ে, অন্য মহাজনগণের বাণী শুনে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হবে এ উদ্দেশ্যে দেবযানের প্রবর্ত্তন।

অন্য গ্রাহক অপেক্ষা সীতারামের বাবাদের মায়েদের জন্যই বেশী চেষ্টা করতে হবে, কারণ তাদের আনন্দরাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য দেবযান।"

"বিরক্ত হতে ইচ্ছুক ব্রাহ্মণের যথাকালে ত্রিসন্ধ্যা ও একলক্ষ গায়ত্রী জপ প্রবেশ-শুল্ক।"

"আর এক কথা—জগতে মহামায়ার জীবকে বন্ধন করবার দুগাছি সুদৃঢ় রজ্জু—কামিনী ও কাঞ্চন।

ছোট সাপ, মেজ সাপ, বড় সাপ—সব সাপই সাপ। তার জন্য সকলকেই সাবধানে আত্মরক্ষা করতে হয়। তাতে উদাসীন যে হ'বে তাকে **ছোবল খেতে হবেই**। দূরে—দূরে—দূরে।

তারপর অর্থের কথা। অর্থ না হলে চলবার উপায় নাই কিন্তু অর্থের কথা শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলেছিলেন,—অর্থের পঞ্চদশ প্রকার দোষ আছে—চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যাভাষণ, দণ্ড, ক্রোধ, গর্ব্ব, মত্ততা, বৈষম্যদৃষ্টি, বৈরতা, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা, অসূয়া, স্ত্রী, দ্যূতক্রীড়া ও মদ্যপান। অর্থের সম্বন্ধে সাবধান হ'তে হবে।"

৬ই আশ্বিন, পরম গুরুদেবের তিরোভাব তিথিতে ঠাকুর তাঁর শিষ্য-ভক্তদের আশীর্ব্বাদ দিয়েছেন।

আমার ৺বিজয়ার সশ্রদ্ধ-অভিবাদন সকলকে জানাচ্ছি।

শ্রীকিঙ্কর গোবিন্দদাস

সংবাদ

উড়িষ্যার গোসানি-মুয়াগাঁ (পোঃ—বহরমপুর, গঞ্জাম) নামক স্থানে উত্থান একাদশী হইতে অনন্তকালোদ্দিষ্ট নামযজ্ঞ আরম্ভের সঙ্কল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এই যজ্ঞক্ষেত্রের নাম দিয়াছেন—'জয় গুরু অনন্ত কালোদ্দিষ্ট অবিরত মহামন্ত্র সঙ্কীর্ত্তন মহামণ্ডল।" যজ্ঞের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চৌধুরী। কিঙ্কর শ্রীমৎ প্রণবানন্দজীর নেতৃত্বে ইহা আরম্ভ হইবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কিঙ্কর শ্রীমৎ গোবিন্দদাসজীকে একটি নির্দেশ দান করিয়াছেন—নাম যজ্ঞোপলক্ষ্যে 'অখণ্ড' শব্দের পরিবর্ত্তে 'অবিরত' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে।

উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত চৌধুরী ৩।১০।'৫৬ তারিখে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে একখানি প্রার্থনাপত্র পাঠাইয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে—"ভগবন্! আমার বিনীত নিবেদন এই কি, এহি স্থানরে অনন্তকাল তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নামসংকীর্ত্তন নির্বিঘ্নরে চলিব বলি আম্ভমানে ভাবিয়ছু। আপনঙ্কর শুভদৃষ্টি পড়িব বলি আম্ভমানঙ্কর অনুরোধ ও প্রার্থনা করু অছু। কারণ আম্ভমানে বামন হই চন্দ্র

> দেবযানের লেখক লেখিকা, পাঠক পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী—সকলকেই আমরা ৺বিজয়ার যথাযোগ্য সম্ভাষণ—শ্রদ্ধা-প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাইতেছি। সকলের মঙ্গল হউক—এই প্রার্থনা করি।
>
> —সম্পাদক, দেবযান

ধরিবাকু আশা করু অছু। দুরাশা হেলে শুদ্ধা আপনঙ্কর চরণরে প্রার্থনাফলরে আম্ভমানঙ্কর আশা পূর্ণ করিবে বলি শত শত বার প্রার্থনা ও প্রণাম এবং অনুরোধ করু অছু, ক্ষমা করিবে। প্রকাশ থাউ কি এই নাম চলিবা সকাশে আপনঙ্কর শুভদৃষ্টি রহিলে আম্ভমানঙ্কর উদ্‌যোগ সম্পূর্ণ হেব বলি আশা করু। কার্ত্তিক মাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী শুক্রবারে এই শুভকার্য্য আরম্ভ করিবাকু ইচ্ছা করিয়ছু। কারণ ৫।৬টি নূতন ঘর তৈয়ার হেবা জগু ও পুরাণা ঘর মধ্য মেরামতি হবা, জগু দিন দীর্ঘরে নিশ্চয় করিবাকু পড়িলা। এথকু আপনঙ্কর জেউ বিচার অছি দয়া করি আম্ভমানঙ্কু পত্র দ্বারা জনাই দেবা—এই আম্ভ মানঙ্কর প্রার্থনা।"

* * * *

জয়গুরু সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীরাধারমণ-মন্দিরে (কুণ্ডুঘাট লেন, চন্দননগর) জন্মাষ্টমী ও অন্যান্য উৎসবগুলি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। অনুষ্ঠান সমূহে পূজা, নামকীর্ত্তন, নরনারায়ণ সেবাদির ব্যবস্থা করা হয়। সম্প্রদায়ের স্থানীয় ভক্তগণ এই আশ্রমের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলে—মন্দির সেবকগণ উৎসাহিত হইবেন।

* * * *

শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে এই সকল স্থানে নামকীর্ত্তনাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—(১) রামানন্দ মঠ—হুগলি। (২) পঞ্চানন-আশ্রম—বর্ধমান। (৩) দাশরথি মঠ—বর্ধমান। (৪) জয়গুরু সম্প্রদায়—বোলপুর, বীরভূম।

* * * *

কিঙ্কর শ্রীরমানন্দ ভাদ্র মাসে বাঁকুড়া জেলার এই গ্রামগুলিতে শ্রীশ্রীনাম প্রচার করেন—ভেকো, ভগলদীঘী, ডিহা প্রভৃতি।

* * * *

পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীদাশরথি দেবযোগেশ্বর মহারাজের বার্ষিক তিরোভাব-তিথি উপলক্ষ্যে ৭ই আশ্বিন কয়েক স্থানে নামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই কয়টি স্থানের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে—(১) শ্রীকাশীরামাশ্রম—বারাণসী। (২) শ্রীদাশরথি-মঠ—কলাপুকুর, বর্দ্ধমান। (৩) শ্রীরামানন্দ মঠ—চিতারমার পড়া।

* * * *

সিমলাগড় (হুগলি) গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে সঙ্কল্পিত দুর্গাপূজানুষ্ঠান বর্তমান বর্ষেও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। পূজায় নিয়মিত নামকীর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষাল, শ্রীতারক ভট্টাচার্য্য, শ্রীরমানাথ কাব্যতীর্থ প্রভৃতি।

* * * *

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী (কটক, উড়িষ্যা) উৎকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ঠাকুরের কয়েকখানি গ্রন্থের উড়িয়া-অনুবাদ সম্প্রতি প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্তা সরলাদেবী দীর্ঘকাল উৎকল-বিধান সভা, নিখিল ভারত কংগ্রেস, নারী সমিতি প্রভৃতি সংস্থার সদস্যারূপে দেশের সেবা করিয়াছেন।

* * *

শোক সংবাদ

শ্রীশ্রীঠাকুর-রচিত 'ভক্তলীলা' নাটকের গোরাকুমার চরিত্রের অভিনেতা—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ (পাকড়ী, হুগলী)—শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহের 'গোরাকুমার' পরলোক গমন করিয়াছিলেন। নাট্যশিল্পীরূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ঠাকুরের নাটক-প্রচারে তিনি উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সম্প্রদায়ের যে-ক্ষতি হইল—তাহা পূরণ হইবার নহে। আমরা তাঁহার উর্দ্ধগতি কামনা করি—তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাই।

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

দেবযান

অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

—০—

ক্ষেপার ঝুলি

॥ কামিনী কাঞ্চন ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

ক্ষেপা গঙ্গার তীরে ধেই ধেই করে নাচছে, আর হাততালি দিয়ে গাইছে, 'রাম রাম সীতারাম জয় সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম'। হরেকৃষ্ণ এসে বললে, ও ক্ষেপা বাবা, সকালবেলা অত নাচুনি কুঁদুনী হচ্ছে কেন ?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! একদিন বৈকুণ্ঠে সব মুনি ঋষি ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ—সীতারাম, গিয়ে হাজির, আমাদের ক্ষেপা ঠাকুরটীও সস্ত্রীক গিয়ে হাজির—সীতারাম, ব্রহ্মাজী ক্ষেপা বাবাকে গান গাইতে বল্লেন, ক্ষ্যাপাবাবা এ্যাসা গান ধরলেন ব্যস্—একেবারে বৈকুণ্ঠনাথ গোলে জল, জয় সীতারাম, সেই জল আমাদের মা গঙ্গা। যেমন বরফ গোলে জল হয় তেমনি আমার

ঠাকুরটী গলে গঙ্গা হয়ে গেছেন। সেই কথা মনে পড়ে গিয়ে নাচ পাচ্ছে, রাম রাম সীতারাম।

হরেকৃষ্ণ। আচ্ছা, ক্ষেপা বাবা! সাধুদের কামিনী কাঞ্চনের উপর অত রাগ কেন বলতে পারো? ভগবান শঙ্করাচার্য্য জলদ গম্ভীর স্বরে বল্লেন—

কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা
সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কান্তী॥

একেবারে মদের সঙ্গে মাতৃজাতির তুলনা—কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাংহি নারী—প্রাণীগণের শৃঙ্খল নারী, ত্যজ্য সুখং কিং স্ত্রিয়মেব সম্যক্। কিন্তুদ্ বিষন্তাতি সুরোপমস্ত্রী॥ মদ্ বিষ যা কিছু সব স্ত্রী। 'বিশ্বাস পাত্রং ন কিমস্তি নারী' 'দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারী।' এমনি ভাবে মাতৃজাতির পূজা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করেছেন। তাঁকে তো নরকদ্বার দিয়েই আসতে হয়েছিল। কি ব্যাপার ক্ষেপা বাবা? আবার হিন্দীতে 'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক পলক লহু চোষে। দুনিয়া সব বাউরা হোকে ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।" কি ব্যাপার ক্ষেপা বাবা! স্ত্রী-নিন্দা না করলে কি সাধু হওয়া যায় না।

ক্ষেপা। জয় সীতারাম, ভগবান শঙ্কর যারা ত্যাগের পথযাত্রী, তাদের একথা বলেছেন, সকলের অধিকার তো সমান নয়, অধিকারী বিশেষকে আত্মস্থ করবার জন্য শুধু ভগবান শঙ্করাচার্য্য কেন, আমাদের কালো ঠাকুরটী পর্য্যন্ত যাবার আগে প্রিয় বন্ধুটীকেও উপদেশ করেছিলেন—

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গীনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দুরত আত্মবান্।
ক্ষেপে বিবিক্ত আসীন চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিত:॥ —শ্রীমদ্ভাগবত।

স্ত্রীসঙ্গ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ দূর হতে ত্যাগ করে আত্মবান্ যতি নিরাপদ নির্জ্জনে অনলস ভাবে আমাকে চিন্তা করবে।

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশোবন্ধশ্চাস্য প্রসঙ্গত:।
যোষিদ্ সঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎ সঙ্গি সঙ্গত:॥

পুরুষের অন্য প্রসঙ্গে তত ক্লেশ হয় না, যেমন স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গী পুরুষের সঙ্গে হয়।

হরেকৃষ্ণ। ইনি আবার মায় স্ত্রীসঙ্গী পুরুষকে ত্যাগ করতে বললেন। হাঁ ক্ষেপাবাবা, স্ত্রীশূন্য দেশ কোথায় আছে?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম, আরও শোনো—

পদাপি যুবতিং ভিক্ষু র্নস্পৃশেৎ দারবী মপি।
স্পৃশন্ করীব বধ্যেত করিণ্যা অঙ্গ সঙ্গত:॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৮।

সন্ন্যাসী পায়ের দ্বারা কাঠের যুবতীও স্পর্শ করবে না। যদি স্পর্শ করে যেমন করিণীর অঙ্গ সঙ্গে করী বদ্ধ হয় তদ্রূপ তিনি বদ্ধ হবেন। নারদ পরিব্রাজক উপনিষদে কথিত হয়েছে—

সম্ভাষয়েদ্ স্ত্রিয়ং কাঞ্চিৎ পূর্ব্বদৃষ্টাং ন চ স্মরেৎ।
কথাঞ্চ বর্জয়েত্তাসাং ন পশ্যেল্লিখিতামপি॥ ৩
এতচ্চতুষ্টয়ং মোহাৎ স্ত্রীণাং মাচরতো যতেঃ।
চিত্তং বিক্রিয়তেঽবশ্যং তদ্বিকারাৎ প্রণশ্যতি॥ ৪র্থ উপদেশ

যতি কোন স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করবেন না। পূর্ব্বদৃষ্টা স্ত্রীকে স্মরণ করবেন না। তাদের কথা ত্যাগ করবেন। এমন কি স্ত্রীলোকের ছবি পর্য্যন্ত দেখবেন না। মোহ বশে যে সন্ন্যাসী এই চারিটীর আচরণ করেন তাঁর চিত্ত অবশ্যই বিকৃত হয়, সেই বিকার হেতু নাশ প্রাপ্ত হন।

মাদ্যতি প্রমদাং দৃষ্ট্বা সুরাং পীত্বাচ মাদ্যতি।
তস্মাদ্ দৃষ্টিবিষাং নারী দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥২১॥

রমণী দর্শনে মানুষ উন্মত্ত হয়, সুরাপান করে উন্মত্ত হয় সেই হেতু দৃষ্টিবিষ নারীকে দূর হতে পরিত্যাগ করবে।

সম্ভাষণং সহ স্ত্রিভিরালাপং প্রেক্ষণং তথা।
নৃত্যং গানং সহাসঞ্চ পরিবাদাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
—২২, ঐ ষষ্ঠ উপদেশ।

স্ত্রীগণের সহিত সম্ভাষণ আলাপ দর্শন নৃত্যগীত হাস্য পরিহাস পরিবাদ নিন্দা পরিত্যাগ করবে।

সুজীর্ণোঽপি সুজীর্ণাসু বিদ্বান্ স্ত্রীষু ন বিশ্বসেৎ।
সুজীর্ণাস্বপি কন্থাসু মজ্জতে জীর্ণ মম্বরম্॥

বিদ্বান্ স্বয়ং সুজীর্ণ বৃদ্ধ হলেও বৃদ্ধা স্ত্রীকেও বিশ্বাস করবেন্ না। ছেঁড়া কাঁথায় পুরণো কাপড় বসানো যায়।

হরেকৃষ্ণ। এই মাতৃজাতির উপর এ কটাক্ষের কারণ কি, আমায় বুঝিয়ে বলতে পারো?

ক্ষেপা। বেদশাসিত ধর্ম্মভূমি ভারতে মানুষের কাম্য হল পরমানন্দ লাভ। কি ভাবে পরমানন্দ লাভ হবে তার আয়োজন গোড়া থেকে করবার কথা শাস্ত্র বলেছেন। প্রথম ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম, পুত্রকে উপনীত করে পিতা গুরু গৃহে পাঠাতেন।—ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে ব্রহ্মচারী প্রত্যহ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিতে সমিধ দান কর্‌বে, প্রত্যহ ভিক্ষা করে এনে গুরুকে অর্পণ করত তাঁর

অনুমতিক্রমে ভিক্ষালব্ধদ্রব্য আহার করবে। মধু মাংস ভোজন করবে না। গন্ধমাল্য ছত্র ও পাদুকা পরবে না। দিবা নিদ্রা যাবে না। যানে আরোহণ করবে না। বাদ্য বাদন করবে না। দন্তধাবন তৈলাভ্যঙ্গ নৃত্যগীত দ্যূত ক্রীড়া পরনিন্দা স্ত্রীদর্শন স্ত্রীস্পর্শ করবে না। হীন বর্ণ সেবা, আনন্দে অধীরতা এবং ভয় কর্‌বে না। ব্রহ্মচারী কাম ক্রোধ লোভ মোহ ত্যাগ কর্‌বে। সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করবে। গুরুর অধীন হয়ে থাক্‌বে, জটা রাখবে, খাটে শয়ন করবে না। গুরুর শয়নের পর শয়ন করবে, এবং পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করবে। গুরু দণ্ডায়মান হলে ব্রহ্মচারী সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াবে, গমনের সময় অনুবর্ত্তী হবে, তিনি শয়ন করে থাকলে তাঁর শুশ্রূষা করবে, গুরু অধ্যয়নের জন্য অহ্বান কর্‌লেই তাঁর কাছে গিয়ে অধ্যয়ন করবে। ব্রহ্মচারী প্রত্যহ তিনবার স্নান কর্‌বে। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে সন্ধ্যা উপাসনা করবে। সন্ধ্যা উপাসনা নদীতীরে প্রশস্ত। স্নানান্তে দেবতা ঋষি পিতৃতর্পণ, মৃতপিতৃক ব্রহ্মচারী করবে। বিবিধ ব্রতনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সমগ্র বেদ আগেই অধ্যয়ন করতে হয়। অন্য শাস্ত্র প্রথমে অধ্যয়ন করবে না। প্রত্যহ অধ্যয়নের প্রারম্ভে এবং অন্তে গুরুর চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণাম করবে। পুরুষের তিন মহাগুরু, পিতা মাতা ও আচার্য্য, এঁদের অত্যন্ত ভক্তি করবে। তাঁদের প্রিয় এবং হিত কার্য্য করবে। অল্প বা অধিক যাহা হোক্ যে ব্যক্তির নিকট শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ পাবে সে ব্যক্তিকেই গুরু বলে মান্‌তে হবে। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান কর্‌বে। অন্য সময়ে শয়ন করবে না। সীতারাম!

হরেকৃষ্ণ। এখন ওসব পুঁথির কথা পুঁথিতেই থাকবে, কেউ দেখবে না ক্ষেপাবাবা!

ক্ষেপা। কেন স্ত্রী নিন্দা করেছেন সেই পুঁথির কথার উত্তর দিতে হলে পুঁথির কথা বলা ছাড়া উপায় কি, সীতারাম! যাক্, ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে স্ত্রীসঙ্গ একেবারে বর্জ্জন করতে হয়। তারপর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে সদৃশী ভার্য্যা গ্রহণ করত ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্‌তে হয়। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনা"। ঋতুকালে পুত্রের জন্য স্ত্রীগমন করবে। তা ও তিথি নক্ষত্র দেখে। দেবসেবা অতিথি সেবা করবে। বিড়াল কুকুরটী পর্য্যন্ত তাঁর পোষ্যের মধ্যে গণ্য, তিনি অতিথির মত গৃহে বাস করে বাণপ্রস্থ ব্রত অবলম্বনের অপেক্ষা করবেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর স্ত্রীকে সঙ্গে করে অথবা স্ত্রীকে পুত্রাদির কাছে রেখে বনে গমন কর্‌বেন। জয় জয় সীতারাম।

হরেকৃষ্ণ। ক্ষেপাবাবা, ও সব পুঁথির কথা এখন পুঁথিতেই তোলা আছে।

ক্ষেপা। জয় জয় সীতারাম। এসব যে পুঁথিতে তোলা থাকবে তাও পুঁথিতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। যাক্ সংসার আশ্রমে পুত্রের জন্য স্ত্রী দরকার, স্ত্রী গৃহলক্ষ্মী—সহধর্ম্মিণী, তাকে সেইভাবে যে সংযত পুরুষ তৈরী করতে পারেন, তিনি সংসারে শান্তি লাভ করতে সমর্থ হন। অসংযমীর রোগ শোক দুঃখ জ্বালা গলার হার—অঙ্গের ভূষণ, সীতারাম! বাণপ্রস্থ আশ্রমে ২৫ বৎসর কাটিয়ে, পঁচাত্তর বৎসরের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়। সন্ন্যাস আশ্রমে স্ত্রীসঙ্গ একেবারে বর্জ্জন করা উচিত।

হরেকৃষ্ণ। ৭৫ বৎসরের আগে সন্ন্যাস হবে না?

ক্ষেপা। হবে, যদি সংসারের বৈরাগ্য আসে তাহ'লে। যেদিন বৈরাগ্য আসবে—সেই দিনই সংসার ত্যাগ কর্‌বে শাস্ত্র বলেছেন।

হরেকৃষ্ণ। যাক্, ও সব কথা দূর্‌কী বাত্, স্ত্রীনিন্দা কেন করেছেন সহজ ভাষায় বল দেখি।

ক্ষেপা। মানুষের চিত্ত যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তর্মুখ না হয় ততক্ষণ শান্তিলাভ কর্‌তে পারেনা। জগতে যত প্রকার ভোগের উপাদান আছে তার মধ্যে কামিনী কাঞ্চনই প্রধান। কামিনীর আকর্ষণ যতদিন ত্যাগ না হয় ততদিন শান্তি সুদূরপরাহত, জগতের প্রকৃতি পুরুষ দুটীতে মিলে সৃষ্টি হয়েছে, এমন কোন পদার্থ নাই যাতে দুটি নাই। অণু পরমাণু পর্য্যন্ত দুটীতে গড়া। নরনারীর দেহও দুটী দিয়ে তৈরী। পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ বামদিক স্ত্রী, দক্ষিণদিক পুরুষ। যখন পুরুষের বামদিকে নিঃশ্বাস পড়ে তখন স্ত্রী ভাবাপন্ন হয়, স্ত্রীগণেরও ঐরূপ দক্ষিণ দিক পুরুষ। যতদিন পর্য্যন্ত কামিনীর আকর্ষণ পুরুষ, এবং পুরুষের আকর্ষণ হতে কামিনী মুক্তিলাভ না করতে পারে ততদিন ইহলোক পরলোক শান্তি পেতে পারে না। শান্তিপথযাত্রী নারীর পক্ষেও পুরুষ নরকের দ্বার, পুরুষ সুরা, পুরুষ রাক্ষস এইভাবে পুরুষ থেকে চিত্তকে ফিরিয়ে এনে অন্তর্ম্মুখ কর্‌তে হয়।

হরেকৃষ্ণ। তাহলে ভগবৎ পথে যারা চলতে চায় তাদের জন্য ঐ কথা, আচ্ছা, ক্ষেপাবাবা মাওতো কামিনী, ধর্ম্মপত্নীওতো কামিনী, তারা নরকদ্বার?

ক্ষেপা। পুত্রের পক্ষে মা দেবী। শ্রুতি বলেছেন—মাতৃদেবো ভব। সন্ন্যাস গ্রহণ করলে মাকে ত্যাগ করতে হয়। ধর্ম্মপত্নী যতক্ষণ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী শাস্ত্রমত ভোগে তৃপ্তা ততক্ষণ ধর্ম্মপত্নী। কামোন্মত্তা, স্বামীর ব্রহ্মচর্য্যনাশিনী কামিনী ধর্ম্মপত্নী নয়, পিশাচী। হাঁ, কামিনী কাঞ্চনের কথা ভাগবতে আছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, পথে গোমিথুনের উপর অত্যাচারকারী কলির সঙ্গে দেখা হয়।

হরেকৃষ্ণ। গোমিথুন কারা ?

ক্ষেপা। ধর্ম্মবৃষ, এবং পৃথিবী গাভী, বৃষের তিনটী পা ভাঙ্গা, একটী পায়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কলি সেই পায়েই আঘাত্ করছিল।

হরেকৃষ্ণ। ধর্ম্মের চারটী পা কি—?

ক্ষেপা। তপঃ, শৌচ, দয়া, সত্য। তারপর রাজা পরীক্ষিৎ যখন কলিকে বিনাশ করবার জন্য উদ্যোগ কর্‌লেন, তখন কলি তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলে। রাজা তার প্রাণ রক্ষা করে বললেন, তুমি আমার রাজ্যে থাকতে পাবে না। কলি বললে—আপনি সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট, আমি আপনার রাজ্যছেড়ে কোথা যাব বলুন, আমায় থাকার স্থান দেখিয়ে দিন। রাজা তাকে—

অভ্যর্থিত স্তদা তস্মৈ স্থানানি দদয়ে কলৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্বিধঃ॥ ৩৮
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
যত্রানৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্॥ ৩৯।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১।১৭

দ্যূত, জুয়াখেলা, মদ্যপান, স্ত্রী এবং হিংসা এই চারিটীস্থান দিলেন। কলি তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে আরও স্থান চাইলে রাজা তাকে স্বর্ণে থাকতে বললেন। যে স্বর্ণে মিথ্যা অহঙ্কার, কাম, রজগুণ ও শত্রুতা সতত বিদ্যমান।

হরেকৃষ্ণ। ওঃ, তাহলে কামিনী কাঞ্চনে কলির আবাস বলে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের কথা। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, বলতো যারা সংসারী তাদের কামিনী কাঞ্চন ছাড়া চল্‌বার উপায় আছে ?

ক্ষেপা। জয় জয় রাম সীতারাম। তারপর শোন—

অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতঃ ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতি গুরুঃ॥৪১॥

উন্নতিকামী পুরুষ কখন ঐগুলিতে অনুরক্ত হবেনা। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল রাজা লোকপতি গুরু। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী ইহার টীকায় বলেছেন, "স্ত্রী সুবর্ণয়োরসেবনং নাম তয়োরনাসক্তিঃ।"—স্ত্রী সুবর্ণের অসেবনের অর্থ—অনাসক্তি।

হরে। একথা না বললে জগৎ ছেড়ে চলে যেতে হবে, স্ত্রী সুবর্ণ ছাড়া স্থান জগতে নাই। অধিকারী বিশেষের জন্য অর্থাৎ যতিগণের জন্য শাস্ত্র একবারে স্ত্রী সুবর্ণ ত্যাগের কথা বলেছেন!

ক্ষেপা। হাঁ, স্ত্রী সুবর্ণ মাত্র গৃহস্থাশ্রমেই প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্য বাণপ্রস্থ সন্ন্যাস আশ্রমে কোন প্রয়োজন নাই।

হরে। স্ত্রী না হয় দরকার না হ'ল—পেটটা আছে তো, তা চল্‌বে কি করে?

ক্ষেপা। ফলমূল ও ভিক্ষার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ভগবদ্ ভজন করবেন।

হরে। সন্ন্যাস আশ্রমের ব্যাপারটা কি? সন্ন্যাসী কত রকম?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম! সন্ন্যাসী ছয় প্রকার, কুটীচক, বহূদক, হংস, পরমহংস, তুরীয়াতীত, অবধূত। কুটীচক্ গোতম ভরদ্বাজ ইত্যাদি ছিলেন—এঁরা আট গ্রাস ভোজন করে যোগমার্গে মোক্ষ প্রার্থনাকারী। বহূদক ত্রিদণ্ড কমণ্ডলু শিখা যজ্ঞোপবীত কাষায় বস্ত্রধারী। ব্রহ্মর্ষি গৃহে মধুমাংস ত্যাগ করে অষ্টগ্রাস ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা দেহ রক্ষা করে যোগমার্গে মোক্ষ প্রার্থনা করবেন। 'হংস' গ্রামে একরাত্রি, নগরে পঞ্চরাত্রি, ক্ষেত্রে সপ্তরাত্রি বাস করবেন্—গোমূত্র, গোময় আহার করত নিত্য চান্দ্রায়ণ ব্রত পরায়ণ হয়ে যোগমার্গে মোক্ষ প্রার্থনা কর্‌বেন। পরমহংস (সংবর্ত্তক আরুণি প্রভৃতি) পরমহংস অষ্টগ্রাস ভোজন কর্‌বেন। বৃক্ষ মূল, শূন্য গৃহ, শ্মশানে বাস কর্‌বেন। তাঁরা কৌপীন গ্রহণ কর্‌বেন, অথবা দিগম্বর হয়ে অবস্থান করবেন। তাঁদের ধর্ম্মাধর্ম্ম শুদ্ধ-অশুদ্ধ কিছু নাই, দ্বৈত বর্জ্জিত, লোষ্ট্র কাঞ্চনে সমজ্ঞান, সর্ব্বত্র ভৈক্ষাচরণ করত সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করবেন। সন্ন্যাস-উপনিষদে আছে, কুটীচক শিখা যজ্ঞোপবীত দণ্ড কমণ্ডলুধর, কৌপীন শাটী কন্থাধারী, পিতামাতা গুরুর আরাধনাপরায়ণ, পিঠর খনিত্র শিক্যাদি মাত্র সাধনপর, একত্র অন্নভোজন-কারী। শ্বেত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ত্রিদণ্ড। বহূদক কুটীচকের মত শিখাদি কন্থাধর ত্রিপুণ্ড্রধারী; মাধুকরী বৃত্তি, অষ্টগ্রাস ভোজনকারী, হংস জপকারী, ত্রিপুণ্ড্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী সংকল্প না করে মাধুকরী ভোজনকারী। পরমহংস শিখা যজ্ঞোপবীত রহিত। পঞ্চগৃহে করপাত্রে ভিক্ষা গ্রহণকারী এক কৌপীনধারী, একশাটীধারী, একদণ্ডী, ভস্মাবৃত অঙ্গ, সর্ব্বত্যাগী, তুরীয়াতীত গোমুখ বৃত্তির দ্বারা ফলাহারী, যদি অন্নাহার করতে ইচ্ছা হয় তাহলে গৃহত্রয়ে ভিক্ষা করবেন, দেহমাত্র অবশিষ্ট, দিগম্বর, মৃত শরীরের মত শরীরের বৃত্তি, অবধূতের কোন নিয়ম নাই। জয় রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম!

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, সন্ন্যাস নেওয়ার খুব ফল নয়?

ক্ষেপা। হাঁ।

ষষ্টিং কুলান্যতীতানি ষষ্টি মাগামিকানি চ।
কুলান্যুদ্ধরতে প্রাজ্ঞঃ সন্ন্যস্তমিতি যো বদেৎ॥

—সন্ন্যাসোপনিষদ্।

—অতীত ষাট্ কুল; আগামী ষাট্ কুলকে উদ্ধার করেন যে প্রাজ্ঞ "সন্ন্যস্ত" এই কথা বলেন।

হরে। সন্ন্যাস নেওয়ার ফল তো খুব!

ক্ষেপা। হাঁ, কিন্তু যতক্ষণ দৃঢ় বৈরাগ্য না আসবে ততক্ষণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে নাই। করলে পতিত হয়। সন্ন্যাসের আচার পালনে সমর্থ হবে কিনা বিশেষরূপে জেনে সন্ন্যাস নেওয়া উচিত।

হরে। সন্ন্যাসীদের পূজা করতে আছে?

ক্ষেপা। কুটীচক্ বহূদকের দেবার্চ্চনা, হংস পরমহংসের মানস অর্চ্চনা, তুরীয়াতীত ও অবধূতের সোহং ভাবনা করতে হয়। নারদ পরিব্রাজক বলেছেন, সন্ন্যাস উপনিষদে কথিত হয়েছে—'ন যতে দেবপূজনোৎসব দর্শনম্।' যতির দেবপূজা উৎসব দর্শন করতে নাই। 'ন পরিব্রান্নাম সঙ্কীর্ত্তনপরঃ' পরিব্রাজক নাম সঙ্কীর্ত্তন পরায়ণ হবেন না। ন দেবতা প্রসাদ গ্রহণং। ন বাহ্যদেবাভ্যর্চ্চনং কুর্য্যাৎ। দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করবেন না। বাহ্যদেবতার পূজা করবেন না।

হরে। ওঃ বাবা, সন্ন্যাসী হলে সর্ব্বত্যাগ করতে হয়।

ক্ষেপা। হাঁ সীতারাম।

ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
যতেশ্চত্বারি কর্ম্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে॥ —কাশীখণ্ডে।

ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা, নিত্য একান্তে অবস্থান যতিগণের এই চারিটী কর্ম্ম, পাঁচটী নাই।

একভিক্ষু যথোক্তং তু দ্বৌভিক্ষু মিথুনং স্মৃতম্।
ত্রয়গ্রাম সমাখ্যাতা উর্দ্ধন্তু নগরায়তে॥
নগরং হি ন কর্ত্তব্যং গ্রামং বা মিথুনং তথা।
এতত্রয় প্রকুর্ব্বান স্বধর্ম্মাৎ চ্যবতে যতিঃ॥

যতির একাকী অবস্থান শাস্ত্রবিহিত, দুজনে থাকলে মিথুন বলে। তিনজনে থাকলে গ্রাম। এর উর্ধ্ব নগর। মিথুন গ্রাম নগর করলে যতি স্বধর্ম্ম হতে পতিত হন। জয় সীতারাম।

হরে। বাবা! সন্ন্যাসী হলে একলা থাকতে হয়!

ক্ষেপা। অপরাহ্ণে সকলের খাওয়া দাওয়া মিটলে ভিক্ষা করে আটগ্রাস

খেতে হয়। এক জায়গায় থাকতে নেই যতির পক্ষে। একশ্চরেৎ মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়। আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ আত্মবান্ সমদর্শন (নারদ পরি)। "ন শ্রোতব্যমন্য কিঞ্চিৎ প্রণবাদন্যঃ" প্রণব ছাড়া কিছু শুন্‌তে নাই।

ঘৃতং শ্বমূত্র সদৃশং মধু স্যাৎ সুরয়াসমম্।
তৈলং শূকরমূত্রং স্যাৎ সূপং লশুন সম্মিতম্॥
মাষা পূপাদি গোমাংসং ক্ষীরং মূত্রসমং ভবেৎ।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন ঘৃতাদীন্ বর্জ্জয়েদ্ যতিঃ।
ঘৃত সূপাদি সংযুক্ত মন্নং নাদ্যাৎ কদাচন॥

—(পরমহংস পরিব্রাজকোপনিষৎ)।

যতির পক্ষে ঘৃত কুকুরের মূত্র সদৃশ, মধু সুরার মত, তৈল শূকর মূত্র, ছোল, লশুন, মাষা পিষ্টকাদি গোমাংস, ক্ষীর মূত্রসমান, এই হেতু যতি সর্ব্বপ্রযত্নে ঘৃতাদি বর্জ্জন কর্‌বেন। ঘৃত ও ঝোলাদি যতি কখনও খাবেন না। "জ্ঞাতচর দেশ চণ্ডাল বাটিকাদিব, স্ত্রীমহিগিব, সুবর্ণং কালকূটামিব।" জানা জায়গা চণ্ডালের বাড়ীর মত, স্ত্রী সাপের মত, সোনা কালকূটের মত, এইরকম প্রপঞ্চবৃত্তি যা কিছু আছে, সব ত্যাগ করে যতি জীবন্মুক্ত হবেন। 'প্রণবাত্মকত্বেন দেহত্যাগং করোতি যঃ সোঽবধূতঃ'। (তুরীয়াতীতোপনিষৎ)। যিনি কালোন্মত্ত পিশাচের মত সব ত্যাগ করে প্রণবময় হয়ে দেহত্যাগ করেন তিনি অবধূত। এমনটী না হওয়া পর্য্যন্ত প্রেমসে নেচে নেচে যেতে আসতে হবে, সীতারাম! এ হল সন্ন্যাসীর কথা। ভক্তের কথা স্বতন্ত্র, তাঁদের তো 'আসিব যাইব চরণ সেবিব হইব প্রেম অধিকারী' প্রার্থনা, তাঁরা বলেন "থাকনা কেন যাওয়া আসা তাতে কি যায় আসে, যার শিরোপরে শ্রীহরির যুগল চরণ ভাসে"।

জয় সীতারাম! সন্ন্যাস হ'ল চরমের কথা। তারপর আর কোন কাজ নেই। পরমহংস উপনিষদে আছে—একদিন নারদ ভগবানের কাছে গিয়ে বললেন—যোগি পরমহংসগণের কোন পথ, কি স্থিতি। ভগবান বললেন—জগতে পরমহংস মার্গ দুর্লভতর, তিনি বেদপুরুষ, মহাপুরুষ, যার চিত্ত আমাতে সর্ব্বদা অবস্থান করে, আমিও তাতে অবস্থান করি, স্বপুত্র মিত্র কলত্র বন্ধু প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে শিখা যজ্ঞোপবীত যাগসত্র, স্বাধ্যায়, সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করত ব্রহ্মাণ্ড ত্যাগ করে—"কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনং চ স্বশরীরোপভোগার্থায় লোকোপকারার্থায় চ পরিগ্রহেৎ তচ্চন মুখ্যোঽস্তি কোঽয়ং মুখ্য ইতি যদয়ং মুখ্যঃ। ন দণ্ডং ন কমণ্ডলুং ন শিখাং ন যজ্ঞোপবীতং ন চাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসো ন শীতং ন চোষ্ণং ন সুখং ন দুঃখং ন মানাবমান ইতি।"

কৌপীন, দণ্ড, আচ্ছাদন, স্বশরীর রক্ষার জন্য লোকের হিতের জন্য পরিগ্রহ করবে। কিন্তু পরমহংসের তা মুখ্য নয়, মুখ্য হ'ল দণ্ড কমণ্ডলু শিখা যজ্ঞোপবীত আচ্ছাদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংস বিচরণ করবেন। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ মান অপমান বোধ রহিত হবেন। জয় জয় সীতারাম।

হরে। হাঁ ক্ষেপাবাবা, শীত করবে না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম! সর্ব্বদা সুষুম্নায় অবস্থান হেতু দেহবোধই থাকবে না, শীত কার করবে!

হরে। উলঙ্গ হয়ে তো গ্রামে থাকতে পারবেন না!

ক্ষেপা। তাঁদের স্থান বনে। যতিদের সুবর্ণাদি পরিগ্রহ করতে নাই, "ভিক্ষু হিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চেৎ স ব্রহ্মহা ভবেৎ, যস্মাদ্ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টং চেৎ স পৌল্‌কসোভবেদ্, যস্মাদ্ ভিক্ষু হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যং চেৎ স আত্মহা ভবেৎ, তস্মাদ্ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টং চ ন স্পৃষ্টঞ্চ ন গ্রাহ্যং চ।" ভিক্ষু অনুরাগের সহিত হিরণ্য দেখলে ব্রহ্মঘাতী হন্, অনুরাগে সব স্পর্শ করলে চণ্ডাল হন্, রসের সহিত স্বর্ণ গ্রহণ করলে আত্মহত্যাকারী হন্, সেইজন্য ভিক্ষু সন্ন্যাসী সোনা অনুরাগের সহিত দেখবেন না ছোঁবেন না গ্রহণ করবেন না।

হরে। সন্ন্যাসীগণের কামিনী কাঞ্চন থেকে দূরে থাকতে হয়।

ক্ষেপা। হাঁ, অর্থের দোষ আরও শোন—

স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ কামঃ ক্রোধঃ স্ময়োমদঃ।
ভেদো বৈর মবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানি চ॥
এতে পঞ্চদশানার্থা হ্যর্থমূলা মতানৃণাম্।
তস্মাদনর্থ মর্থাখ্যং শ্রেয়োঽর্থী দূরত স্ত্যজেৎ॥ —শ্রীমদ্ভাঃ

চুরি, হিংসা, মিথ্যা দম্ভ, কাম ক্রোধ, গর্ব্ব মদ, (আমি মহাত্মা ধনবান্ আমার মতন জগতে আর কে আছে এইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম মদ) মনোভঙ্গ শত্রুতা অবিশ্বাস সঙ্ঘর্ষ ও ব্যসন্-সকল (মৃগয়া দ্যূত দিবা নিদ্রা) পরনিন্দা, বেশ্যাসক্তি, নৃত্যগীত, ক্রীড়া বৃথা ভ্রমণ, মদ্যপান, এই দশপ্রকার ও দুষ্টতা দৌরাত্ম্য ক্ষতি দ্বেষ, ঈর্ষা প্রতারণা, কটূক্তি, নিষ্ঠুরাচরণ এই আটপ্রকার (মোট আঠারো প্রকার ব্যসন) এই পঞ্চদশ প্রকার অনর্থের মূল 'অর্থ' সাধুগণ বলে থাকেন। সেইহেতু অর্থনামক অনর্থকে মোক্ষকামী মানব দূর হতে ত্যাগ করবে। জয় রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, অর্থের দ্বারা দেবসেবা, দেবমন্দির, অতিথিসেবা এ রকম ভালকাজ তো করা যায়।

ক্ষেপা। যাঁর অর্থ আছে তাঁর সে অর্থ সদ্ব্যয় কর্‌লে সার্থক হয়। দান কর্‌লে আগামি জন্মে সে-অর্থ লাভ করেন। সীতারাম!

হরে। যদি কেউ নিষ্কামভাবে অর্থের দ্বারা পুণ্যকর্ম্ম করেন তা হ'লে কি হয়?

ক্ষেপা। চিত্তশুদ্ধি হয়। ভগবানকে লাভ কর্‌বার বাসনা হয়। নচেৎ সকামভাবে অর্থের দ্বারা পুণ্য কর্ম্ম কর্‌লে স্বর্গে সুখভোগ করে পুণ্যক্ষয়ে আবার এখানে ফিরে আসতে হয়। পাপপুণ্য দুটীকে ত্যাগ করে তবে ভগবানের পথে মানুষ যেতে পারে। সীতারাম সীতারাম।

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, মানুষ ইচ্ছা কর্‌লে কি ভগবান্‌কে পেতে পারে?

ক্ষেপা। সীতারাম, অনন্যভাবে যাঁরা তাঁর শরণ গ্রহণ করেন তাঁরা তাকে লাভ কর্‌তে পারেন।

হরে। সংসার-আশ্রমে থেকে ভগবানকে পাওয়া যায়?

ক্ষেপা। যে কোন আশ্রমে থেকে একান্তভাবে তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি দর্শন দেন, বর দান করেন। সীতারাম সীতারাম।

হরে। আচ্ছা কেউ বিয়ে করে তারপর সাধনার দ্বারা ভগবানকে লাভ কর্‌লেন, পরে আবার স্ত্রী গ্রহণ করে যদি সংসার করেন তাঁর আবার জন্ম হয়?

ক্ষেপা। সীতারাম! যদি আত্মবিস্মৃত হয়ে সংসারে মেতে যান, সংসার ত্যাগ না কর্‌তে পারেন, তাহলে আবার জন্মাতে হয়, সীতারাম।

হরে। আচ্ছা যদি কেউ বিয়ে-করা স্ত্রীকে গ্রহণ না করে ভগবানকে লাভ করেন তারপর যদি স্ত্রী তাঁর কাছে এসে থাকেন, তিনি বিচারের দ্বারা মনকে নিবৃত্ত করে পবিত্রভাবে স্ত্রীর সেবা নেন, আমরণ যদি স্ত্রী কাছে রাখেন তাহলে তাঁর জন্ম হয়?

ক্ষেপা। একেবারে সর্ব্বসঙ্গত্যাগ ব্যতীত মুক্তি হতে পারেনা। তার উপর যদি অভিশাপ থাকে আবার তাঁকে দেহ ধারণ করে প্রেমসে স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়। ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারে যিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ কর্‌তে পারেন তিনি গৃহস্থ হলেও মুক্তিলাভে সমর্থ হন। সীতারাম সীতারাম।

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, যদি কোন ভগবান-পাওয়া সাধু স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ না করে শিষ্যভক্তগণকে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগের উপদেশ করেন তাহলে তাঁর কি হয়?

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম, যদি আবার দেহ ধারণ করেন শত শত স্ত্রী

তাঁর বুকে ঝাপিয়ে পড়ে, সজনে নির্জনে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মা—মা করে মায়েদের বুকে ধারণ করে স্নেহবশে বা প্রার্থনায় তাদের এগিয়ে দিতে বাধ্য হন।

হরে। তাহ'লে তাঁর অধঃপাত হয় ?

ক্ষেপা। অধঃ থাকলে তো পাত হবে। সবটাই তাঁর মায়ের বুক। রাম রাম সীতারাম। কি জান সীতারাম. 'সব ভগবান' এ জ্ঞান যতদিন লাভ না হচ্ছে, যতক্ষণ লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা ভয় ভয়, ছুঁই ছুঁই, নিন্দা সুখ্যাতির খেয়াল আছে—ততক্ষণ জয় জয় সীতারাম। মুম্ম্ করতে করতে প্রাণ, মন নিয়ে ভগবানের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে। ভগবান-কাঁথা চাপা দিয়ে উদম হয়ে যেতে না পারলে—লজ্জা ঢাকবার জন্যে কখন ছেঁড়া নেকড়া বা কলার পেটোর কৌপীনের প্রয়োজন বোধ থাকলে, সীতারাম ! (সুর করে) আসিব যাইব চরণ সেবিব হইব প্রেম অধিকারী' (গাইতে গাইতে ক্ষেপা নাচ্তে আরম্ভ করলে)।

হরে। থামো থামো. এখনও আমার কথা শেষ হয়নি। আচ্ছা, স্ত্রীত্যাগ কর্‌বার উপদেষ্টা সাধু জন্মগ্রহণ করে কি আবার স্ত্রীত্যাগেরই উপদেশ দেন ?

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম, না সীতারাম ! এবার উল্‌টো গান সুরু করেন। দেহ ধারণ করে বিবাহের উপদেশ কর্‌তে থাকেন। দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য কলিযুগে নিষেধ, বিবাহ করে শাস্ত্রমত স্ত্রীসঙ্গ করলে গৃহী ব্রহ্মচারির মধ্যে পরিগণিত হয়, এযুগের এই পথই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বলে চেল্লাতে থাকেন। রাম রাম সীতারাম, সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, কিছু মনে কোরোনা; তোমায় অনেক কথা জিজ্ঞেস করছি। এই তেল নেই, নুন নেই, অভাব, সংসারের কিচিমিচি, তার চেয়ে বিয়ে না করাইতো ভাল !

ক্ষেপা। জয় সীতারাম ! পেটে ক্ষিদে মুখে লাজে কিস্তিমাৎ হবেনা। যেমন মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা স্বাভাবিক, তেমনি যৌবনে জয় জয় সীতারাম স্ত্রী-গ্রহণেচ্ছা স্বাভাবিক। জোর করে—বা লোক দেখিয়ে ব্রহ্মচারী সাজলে সীতারাম সাজার বাকী থাকবেনা। জয় রাম সীতারাম। এই সাজা ব্রহ্মচারীদের পদস্খলনের বিবরণ; করুণ ক্রন্দন বহু শুনতে পাওয়া যায়, সাধু সেজে স্ত্রীর পেছু পেছু ঘোরা অপেক্ষা বিবাহ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ। "মা বলে মা ডাকছি কত বাজে নাকি তোর প্রাণে"—ক্ষেপা গাইতে লাগলো।

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা এই সাধুদের পদস্খলনের কথা যে বলছো একি তোমার নিজে কানে শোনা ? তারা কি তোমার কাছে বলেছে ?

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম ! ক্ষেপা অপরের কাছে শুনে

বলে না। ব্রহ্মচারীরা বলেছে, লিখে আত্মপ্রকাশ করেছে। জয় সীতারাম জয় সীতারাম। পাপীর মুখেই পাপ ব্যক্ত হয় সীতারাম। "মা আমায় ঘুরাবি কত এ চোখঢাকা বলদের মত"। হাঁ সীতারাম, বহু জন্ম জন্মান্তরের সাধনা, গুরুকৃপা না থাকলে সীতারাম, মানুষ কামিনী কাঞ্চনের মোহ ত্যাগ করতে সমর্থ হয়না। সাধু পথ আশ্রয় করে স্ত্রীত্যাগ যাঁরা করেন তাঁদের কর্ত্তব্য লোকালয় ত্যাগ করে নির্জ্জনে থাকা। যদি কোন স্ত্রীত্যাগী সৎপুরুষ লোকহিতকামনায় লোকালয়ে থাকেন সীতারাম, তাঁর কর্ত্তব্য স্ত্রী থেকে দূরে থাকা। মায়েদের মুখ না দেখা, চরণ দেখা আলাপ না করা আর সর্ব্বদা মা মা জপ করা। 'মা বলে মা ডাকছি কত বাজে নাকি মা তোর প্রাণে' জয় সীতারাম। যিনি অবিরাম মা নাম জপ করতে পারেন জগন্মাতা তাঁর মোহ দূর করে দিয়ে সর্ব্বত্র আপনার মাতৃমূর্ত্তিই দর্শন করান। ব্রহ্মচারিণীদেরও পুরুষ থেকে দূরে থাকতে হয়। পুরুষের মুখ দেখতে নাই।

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, ঐই সংযম, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ—এ সব করে লাভ কি—?

ক্ষেপা। সীতারাম, সব সেজে মা খেলা করছেন—মা-ই সব, সেই মাকে ধরবার জন্য, তাঁর ভেতর ঢোকবার জন্য এত আয়োজন।

হরে। তা হ'লে লোকালয়ে থেকেও যদি কেউ অবিরাম মা নাম জপ করেন তা হলে মা তাকে রক্ষা করেন?

ক্ষেপা। নিশ্চয়ই করেন।

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, কেউ যদি শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে অনন্যভাবে ভগবানকে ডাকেন তাহলে ভগবান দেখা দেন?

ক্ষেপা। হাঁ সীতারাম! ভগবৎ দর্শনে চাই শুধু প্রাণের আকুলতা। 'আকুল হয়ে কাঁদলে পরে সে না এসে কি থাকতে পারে' জয় সীতারাম!

হরে। তাঁর আবার জন্ম হয়?

ক্ষেপা। তিনি যদি সর্ব্বসঙ্গত্যাগী না হন্, মুখটী বন্ধ না করেন, কালোন্মত্ত পিশাচ সাজতে না পারেন—তবে 'আসিব যাইব'—আবার দেহ ধারণ করে সারা জীবন শাস্ত্র ঘেঁটে ঘেঁটে দিশপাস করে দেন, শাস্ত্র তাঁর ক্ষুধার অন্ন পিপাসার জল, ছেঁড়া কম্বল মোটা চাদর হয়ে তাকে চাপা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দিনরাত্ ম্যাসা গান জোড়েন একেবারে দফা রফা—সীতারাম।

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, যদি কেউ ভগবানকে দেখার পর লোকালয় ত্যাগ না করেন, শিষ্য ভক্তগণকে উপদেশ করতে থাকেন তাহলে কি আবার জন্মাতে হয়?

ক্ষেপা। শুধু জন্মাতে হয় না সীতারাম বস্তা বস্তা উপদেশ চারদিকে ছড়িয়ে ছিনিমিনি খেলতে হয়। আজীবন হাজার হাজার লোককে উপদেশ করতে করতে দফা শেষ, উপদেশের বাজার একচেটে করে ধেই ধেই করে নেচে বেড়ান। জয় রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, যদি কোন ভগবান-পাওয়া সাধু লোকালয়ে থেকে অর্থের দোষ কীর্ত্তন করেন ও অর্থের দরকার বোধ থাকে, নিষ্কামভাবে যদি সোনা ধারণ করেন বা করান তাঁকে কি আবার আসতে হয়?

ক্ষেপা। জয় জয় সীতারাম! তিনি যদি উদম না হয়ে খাঁচা ছাড়েন, অর্থের প্রয়োজনবোধ থাকে, গায়ে সোনা থাকে, তাহলে আবার এসে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করে দেন, হাঁড়ী হাঁড়ী ভাত চাল ডাল তেল নুন ঘি মশলা একেবারে পর্ব্বত পর্ব্বত সীতারাম! অর্থরূপী ভগবান তাঁর কাঁধে চড়ে এমনিভাবে ধেই ধেই করে নাচতে থাকেন—(ক্ষেপা নাচ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে)।

হরে। আরে থামো থামো, বল তারপর—

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম! হাজার হাজার টাকার সাতনলী তৈরী করে তাঁর ভক্তেরা তাঁকে সাজান—সাজা দেন, বুকে পিঠে মাথায় ঘাড়ে গর্দ্দানে একেবারে টাকার ছড়াছড়ি—হরির লুট, দুয়োরাণীকে যেমন উপরে কাঁটা নীচে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলেছিল তেমনি করে তাঁকে শিষ্য ভক্তরা উপরে টাকা নিচেয় টাকা দিয়ে একদম পুঁতে ফেলেন—সীতারাম, তারপর হাজার হাজার টাকার খাঁটী সোনা জয় সীতারাম নাহু নাহু বলে প্রেমসে দুহাতে করে নিয়ে লুকিয়ে কাপড় চাপা দিয়ে আনন্দে আটখানা—তাড়াতাড়ি বিভাগ করে দিয়ে বগল বাজিয়ে নাচ্‌তে থাকেন এই আর কি? দুটী নেইরে বাবা ইটী উটী যতক্ষণ আছে নোবো—নোবো না—খাবো—খাবোনা, আচার বিচার ত্যজ্য গ্রাহ্যের উপদেশ, কষ্ট সুখ, প্রিয় অপ্রিয়, সুসঙ্গ কুসঙ্গ আদর অনাদর যতক্ষণ আছে সীতারাম ততক্ষণ নেচে বেড়াতে হবেই—জয় জয় সীতারাম! সবটী ভগবান, যেটী ত্যাগ করবে সেইটীই কাঁধে চাপবে রে বাবা—'আমার আচার বিচার সব কেড়ে নাও ওহে জগৎ স্বামী' জয় জয় সীতারাম—

শুন্ন মহলমে নৌবত বাজে
কিংগরী বীন সিতারা।
জ্যোতি লজায় ব্রহ্ম জই দরসৈ
আগে অগম অপারা

কহ কবীর বহ বহনী হমারী
বুঝৈ গুরুমুখ প্যারা।

রাম রাম সীতারাম!

হরে। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, গুরু, মন্ত্র, ইষ্টদেবতা তিনটী একতো?

ক্ষেপা। হাঁ, সীতারাম!

হরে। যদি কেউ গুরুকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ গুরুর সঙ্গ সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে ইষ্টকে আশ্রয় করেন তাহ'লে তিনি ভগবান্‌কে দেখতে পান?

ক্ষেপা। হাঁ সীতারাম!

হরে। তাঁর আবার জন্ম হয়?

ক্ষেপা। জয় সীতারাম, তিনি যদি উদম না হন্ তাহ'লে আবার জন্মগ্রহণ করে গুরু মহিমাই প্রচার করতে বাধ্য হন্। "যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ" গুরু এবং দেবতায় সমান ভক্তি থাকা চাই। গুরু ইষ্টকে মিশিয়ে দুটীতে অনুরক্ত হতে হয় সীতারাম—প্রথমটী দৃষ্টটী ছেড়ে অদৃষ্ট ইষ্টে আসক্ত হওয়ায় ইষ্ট পান, তারপর গুরু এসে য্যাসা কাঁধে চাপেন—ছাড়লে ছাড়েনা সীতারাম, আবার গুরুমহিমা খ্যাপনের জন্য দেহধারণ করেন সীতারাম, তাঁর জীবন গুরুময় হয়, গুরুসেবা তাঁর জীবনের ব্রত হয়। তাঁর জিহ্বা গুরু-নাম ঘোষণা করে, আমরণ তাঁর হৃদয়বীণায় গুরু-নামই ধ্বনিত হয়। জয় রাম সীতারাম রাম রাম রাম।

হরে। ক্ষেপাবাবা, ভগবানকে পেয়েও যদি আবার জন্মাতে হয় তাহ'লে সে পাওয়ায় লাভ কি?

ক্ষেপা। সীতারাম সীতারাম জয় জয় রাম, ঈশ্বরদ্রষ্টা পুরুষের জন্মগ্রহণ লীলামাত্র, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, আসবার স্থান নির্দ্দেশ করে যান্, তাঁর দেহ বাহ্যত: মানুষের মত দৃষ্ট হলেও···জয় রাম সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম, সীতারাম!

হরে। ও ক্ষেপাবাবা—ও ক্ষেপাবাবা!

ক্ষেপা। জয় রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম!

যোগরতো বা ভোগরতো বা
সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং
স নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥

শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা
স্বস্থঃ পরিক্ষীণ বিতর্কজালঃ।
সংসার বীজ ক্ষয়মীক্ষমানঃ
স্যান্নিত্য মুক্তো ঽমৃত ভোগভাগী॥

হরে। ও সব কি বলছো ক্ষেপাবাবা?

ক্ষেপো। আচ্ছা একটা গান শোন সীতারাম।

"মোর মোহন রে!
নীল আকাশ তলে
নীল সাগর জলে
নীল কমল ঐ ফুটেছে রে।
দিবানিশি বাঁশী গানে
ডাকে মোরে প্রাণে প্রাণে
কোথা মোর ধ্যানে জ্ঞানে
ভাসিছে রে॥

সুন্দর নীল তনু
করেতে মোহন বেণু
নয়নেতে ফুলধনু
শোভিছে রে।
ওই মধু মৃদুহাসি
হরিছে তিমির রাশি
ভালবাসি কাছে আসি
পরশেরে।

সব দৃশ্যে সব ধ্যানে
কে ফুটেছে সব খানে
কে আমার মনঃ প্রাণে জাগিছে রে।
সে যে মাতা সে যে পিতা
সে যে বন্ধু পরিত্রাতা
সে আমার প্রাণদাতা
প্রাণরঞ্জন রে।

সে যে প্রিয়তম কত
তবু তাকে চাহিনা ত
কি মোহে পড়িয়া তাকে ভুলিছে রে।
আমি ভুলে যাই তারে
সেতো ভুলে নাক মোরে
বিরহ ব্যাকুল সুরে ডাকিছে রে।
মনে হয় সব ফেলে
ছুটি ও চরণ তলে
মন প্রাণ সঁপে দিই চরণে রে।
প্রিয় তরে মনঃ প্রাণ
কাঁদিতেছে অবিরাম
দরশন দিয়ে রাখ জীবন রে।"

জয় জয় রাম সীতারাম!

—০—

সন্তবাণী

৮১৬। সকল শাস্ত্রের সার এই যে, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন এবং নাম স্মরণই সংসারে সুখের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। প্রেমের উপলব্ধি নাম স্মরণেই হতে পারে।

৮১৭। যার প্রেম প্রাপ্তির প্রয়োজন বোধ হয়েছে তার সকলের আগে সাধুসঙ্গ করা চাই।

৮১৮। ভজন, কীর্ত্তন, সৎসঙ্গ, ভগবৎ লীলার স্মরণ—এইই মুখ্য ধর্ম্ম।

৮১৯। অদোষদর্শী (কারও দোষ না দেখা) হওয়া বৈষ্ণবগণের সকলের চেয়ে মুখ্য কর্ম্ম।

৮২০। গ্রাম্যকথা কখনও শ্রবণ করবেনা। গ্রাম্যকথা শুনলে চিত্তে সেই কথাই স্মরণ হয়ে থাকে, যার দ্বারা ভজনে চিত্ত সংলগ্ন (একাগ্র) হয়না।

৮২১। বিষয়ী লোকদের কথা কইলে চিত্ত বিষময় হয়ে যায়।

৮২২। সুখকর সুস্বাদু ভোজন আর চটকদার চাকচিক্যযুক্ত বস্ত্র থেকে বাঁচা চাই।

৮২৩। হৃদয়ে অভিমান এলে সব সাধনা নষ্ট হয়ে যায়।

৮২৪। সর্বদা সর্বত্র সকল অবস্থাতেই ভগবানের নাম জপ কর্‌তে থাকা চাই। নাম জপের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম উৎপন্ন হয়।

৮২৫। মানসিক পূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা।

৮২৬। যে কোন প্রকারে বিষয়ী ধনীর অন্ন হতে আত্মরক্ষা করা চাই।

৮২৭। আধ্যাত্মিক শাস্ত্র শ্রবণ, ভগবানের নামকীর্ত্তন, মনের সরলতা, সৎপুরুষের সমাগম, দেহাভিমান ত্যাগের অভ্যাস—এই ভাগবত ধর্মের আচরণ দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যায় তিনি অনায়াসেই ভগবানে আসক্ত হয়ে যান।

৮২৮। অনুশোচনা করে কোন লাভ নাই। ভাবনাকারী কেবল দুঃখই ভোগ করে। যে মানুষ সুখ এবং দুঃখ এই দুটীই ত্যাগ করে দেন, যিনি জ্ঞানে তৃপ্ত এবং বুদ্ধিমান্ তিনি সুখপ্রাপ্ত হন।

৮২৯। সদাচার পালনে মানুষ দীর্ঘ আয়ু, মনোমত সন্তান ও অটুট সম্পত্তি পান, এর দ্বারা অপমৃত্যু আদিও নাশ হয়।

৮৩০। সকল প্রকারে আপনার হিতের জন্য কার্য্য করা চাই। যে বেশী বলে তার দ্বারা কিছু হয় না, সংসারে এমন কোন উপায় নাই যার দ্বারা সকল লোক প্রসন্ন হোতে পারে।

৮৩১। অরে! বিষয়ে এত কেন মোহিত হয়ে আছ, কখন তা থেকে মুখ ফেরাচ্ছ না। শ্রীহরির ভজন কর—যমের ফাঁদে পড়তে হবেনা।

৮৩২। যে গৃহস্থে সত্য, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ত্যাগ, নামক চার ধর্মের অনুষ্ঠান হয়, তাঁকে দেহত্যাগ ক'রে ইহলোক থেকে পরলোক প্রাপ্ত হবার পর চিন্তা কর্‌তে হয় না।

৮৩৩। যার চিত্ত থেকে রাগ দ্বেষের নাশ হয়ে গেছে তিনি জ্ঞানী গুণী এবং ধ্যানী।

৮৩৪। মনের অহঙ্কার ত্যাগ করে এইরূপ কথা বলা চাই যার দ্বারা অপর সকলের শান্তি উপস্থিত হয় এবং আপনার শান্তি মিলে।

৮৩৫। রাতে শয়ন দিনে ভোজন ভুলে, অনর্গল কথা কওয়া ছেড়ে দিনরাত শ্রীহরির স্মরণ করা চাই।

৮৩৬। যেমন শত্রু হওয়া বিনা মিত্রের মূল্য জানা যায় না, সেইরূপই প্রেমের শক্তির ব্যবহারের স্থান না হলে—প্রেমের শান্তির-ও ঠিকানা লাগে না।

৮৩৭। লোক অপরের রীতি চর্চা করে, কিন্তু সে আপনার ভিতর এবং বাহিরের পরীক্ষা ও সমালোচনা করে না। আপনার কার্য্য এবং স্বভাবের দিকে সর্বদা সাবধান থাকা চাই। আর সন্মার্গ কখন ছাড়্‌বে না। এই সর্বোত্তম কার্য্য।

৮৩৮। প্রেমের পরিচয় কেবল স্তুতি-সকলের দ্বারা মিলে না, অনেক দুঃখ সহ্য ক'রে, সমস্ত স্বার্থ তিলাঞ্জলি দিয়ে প্রেমকে প্রমাণিত করতে হয়।

৮৩৯। যিনি স্বচ্ছ শুদ্ধ মনে ঈশ্বরের স্মরণ করে থাকেন তাঁর জন্য কোন প্রকার চিন্তার কারণ নাই।

৮৪০। যার সঙ্গে সত্য পবিত্রতা দয়া মৌন বুদ্ধি শ্রী লজ্জা কীর্ত্তি ক্ষমা শম্ দম্ এবং সৌভাগ্যের নাশ হয়; এরূপ অশান্ত, মূর্খ, স্ত্রীর বশীভূত, দেহাভিমানী মানবগণের সঙ্গ কখনও কর্‌বে না।

৮৪১। কুসঙ্গ একেবারে ছেড়ে দিবে, কেন না তাতে কাম ক্রোধ মোহ স্মৃতিভ্রংশ বুদ্ধিনাশ, শেষে সর্ব্বনাশ হয়ে যায়।

৮৪২। মূর্খ লোকই অসন্তোষী হয়, অসন্তোষের কোন সীমা নাই। পরন্তু সন্তোষেই পরম সুখ মেলে।

৮৪৩। জগতে দুরাচারী মানুষের নিন্দা হয়, সে সর্বদা দুঃখ ভোগ করে, রোগী হয়ে থাকে এবং তার আয়ু খুব কম হয়।

৮৪৪। সন্তোষ ব্যতীত কামনার নাশ হয় না এবং কামনা থাকৃতে কখন স্বপ্নেও সুখ হয় না, কামনা শ্রীরামের ভজন ভিন্ন মেটে না।

৮৪৫। যে তোর জন্য কাঁটা বুন্‌বে তুই তার জন্য ফুল বপন কর্।

৮৪৬। ধনের লালসায় মাটী খুঁড়েছি, পাহাড় সকলে সমস্ত ধাতু কুঁদিয়েছি, সমুদ্র যাত্রা করেছি, বড় প্রযত্নে রাজাকে সন্তোষ করেছি, মন্ত্রসিদ্ধির জন্য শ্মশানে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেছি কিন্তু কোথাও একটী ফুটো কড়িও মেলে নাই। হে তৃষ্ণে! তুই আমার দেহ ছেড়ে দে।

৮৪৭। প্রেমই প্রভুর ঐশ্বর্য্য, যার প্রেমলাভ হয় তার সবকিছু মিলে যায়।

৮৪৮। কেবল উপাসনার দ্বারাই আত্মার উন্নতি এবং পূর্ণতা হয় না, তার-জন্য প্রেম চাই। প্রেমের দ্বারাই আত্মার বিকাশ হয়।

৮৪৯। তুমি যে পরিমাণ প্রযত্ন সংসারের বিষয় সমূহ প্রাপ্তির জন্য কর্‌ছো, সে পরিমাণ যদি পরমাত্মার জন্যে করো, তাহলে তোমার সেখানে অবশ্যই স্থান মিল্‌বে।

৮৫০। একথা সর্বদা স্মরণ রাখা চাই যে কোন মনুষ্য তোমার ভালমন্দ কর্‌তে পারে না। যা কিছু হচ্ছে ঈশ্বরেরই করা হচ্ছে।

৮৫১। গোবিন্দের গুণগান না করে জীবন ব্যর্থ যাচ্ছে, রে মন, শ্রীহরিকে এইরূপই ভজনা কর, যেমন মাছ জলকে ভজনা করে থাকে।

৮৫২। দৃঢ়নিশ্চয়ী, কোমলস্বভাব, ইন্দ্রিয়বিজয়ী, ক্রূর কর্মকারীর সঙ্গত্যাগী, অহিংসক পুরুষ, ইন্দ্রিয় দমন এবং দানের দ্বারা স্বর্গকে জয় করে লয়।

৮৫৩। ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, প্রাণিমাত্রেরই সহিত মৈত্রী এবং ভগবানের উপাসনা এ সমস্ত সকলের পালন করা যোগ্যধর্ম।

৮৫৪। কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি ছেড়ে দাও, আত্মজ্ঞানহীন মূর্খকে ঘোর নরকে পতিত হতে হয়।

৮৫৫। ভাল অবস্থাতে সকলে বন্ধু, মন্দ অবস্থার বন্ধু দুর্লভ। যিনি হীন অবস্থাতেও সঙ্গী তিনি প্রকৃত বন্ধু, মিত্র তিনিই যিনি বিপত্তির সময়ও মিত্রের সঙ্গ ত্যাগ করেন না।

৮৫৬। নীতিজ্ঞ, প্রারব্ধ অভিজ্ঞ, বেদের জ্ঞাতা এবং শাস্ত্রবিৎ অনেক আছেন, ব্রহ্মকে জানেন এমন লোকও মিল্‌তে পারে, পরন্তু আপনার অজ্ঞানকে জানেন এমন লোক তো বিরলই হয়ে থাকে।

৮৫৭। মুক্ত পুরুষের কষ্ট অবশ্যই হয় কিন্তু তাঁর সেই কষ্টে রাগ দ্বেষ হয় না, তিনি তাকে সংসারের ধর্ম জেনে সহ্য করেন। সুখ দুঃখ সকলের আসে। মুক্ত তাদের দ্বারা চঞ্চল হন না। এই মুক্তের ভেদ।

৮৫৮। ভগবানের পুজার জন্য সাত পুষ্প উপযোগী—(১) অহিংসা, (২) ইন্দ্রিয় সংযম, (৩) প্রাণিগণের প্রতি দয়া, (৪) ক্ষমা, (৫) মনকে বশ করা, (৬) ধ্যান এবং (৭) সত্য। এই ফুলদলের দ্বারা ভগবান্ প্রসন্ন হন।

৮৫৯। তারা সে পর্য্যন্ত দীপ্তি পায় যতক্ষণ সূর্য্য না উদিত হন, এই প্রকার যে পর্য্যন্ত জ্ঞানের উদয় না হয় ততদিন অবধি মানুষ বিষয়ে লেগে থাকে।

৮৬০। ভগবৎ-প্রাপ্ত পুরুষ ভগবদ্ভজন ছেড়ে অপরের পথ প্রদর্শক হন না, কেননা তিনি আপনার প্রভু ভিন্ন কাউকেও রক্ষক শিক্ষক অথবা মার্গদর্শক দেখেন না।

৮৬১। বিনা বিশ্বাসে ভক্তি হয় না। ভক্তি ভিন্ন ভগবান্ প্রসন্ন হন না, এবং ভগবৎ কৃপা ব্যতীত জীবের স্বপনেও শান্তি মিলে না।

৮৬২। যেমন পক্ষী রাত্রে এসে বৃক্ষের উপর বাস করে এবং দিন হলেই উড়ে যায়, ঐরূপই কুটুম্বের অবস্থা বুঝতে হবে।

৮৬৩। ধন স্ত্রী এবং পুত্র সকলেই চিত্ত লাগিয়ে রেখেছ, বিপত্তি কালের মিত্র ভগবানকে কেন খোঁজ কর্‌ছো না!

৮৬৪। যে অসন্তোষী সে দরিদ্র, যে ইন্দ্রিয়ের বশ সে কৃপণ, যাঁর বুদ্ধি বিষয়-সকলে বন্দী হয়নি (জড়ায়নি) তিনি স্বতন্ত্র।

৮৬৫। দুঃখ পেলেও কর্কশ বাক্য বলবে না। এমন কোন কাজে বুদ্ধি লাগানও উচিত নয় যার দ্বারা অপরের দ্রোহ (অনিষ্ট) হয়। এমন কথা বলা উচিত নয় যার দ্বারা লোক সকলের উদ্বেগ হয়।

৮৬৬। যার ঘর থেকে অতিথি নিরাশ হয়ে ফিরে যান, তার শত কলস ঘৃতের দ্বারা হোমও ব্যর্থ। অতিথির জাত কুল বিদ্যা আদি জিজ্ঞাসা না করত দেবতা জ্ঞানে সৎকার করা চাই, কেননা অতিথিতে সমস্ত দেবতা অবস্থান করেন।

৮৬৭। তোমাতে আমাতে এবং সমস্ত প্রাণীতে সর্বত্র একমাত্র ভগবান বিষ্ণুই ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, ফের অসহিষ্ণু হয়ে কেন বৃথা ক্রোধ কর্‌ছো, সকলের ভিতর একমাত্র আত্মাকে দেখ, আর ভেদ-জ্ঞানকে নষ্ট করে দাও।

৮৬৮। কারও হিংসা ক'রো না, আর কাহাকেও কষ্ট দিও না, মিথ্যা কথা ব'লো না, চুরি ক'রো না, শরীর মন আর বাক্যের দ্বারা ন্যায় করো, কারও কাছে কোন আশা ক'রো না।

—০—

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ]

(পূর্বানুবৃত্তি)

বেদমন্ত্র সিদ্ধ ঈশ্বরে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন—ঈশ্বরের স্বরূপ, গুণ ও কার্য্য প্রতিপাদক বেদমন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। বেদমন্ত্র প্রতিপাদিত ঈশ্বরের স্বরূপের ও তাহার গুণরাশির উপপাদনের জন্য বহুবিধ দার্শনিক যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছি। সম্প্রতি আমরা বেদমন্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিব। ন্যায়বৈশেষিক আচার্য্যগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর প্রতিপাদক বেদমন্ত্র অতিবহুল। ঈশ্বর প্রতিপাদক সমস্ত মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত হইলে মাত্র তাহাতেই একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলিত হইতে পারে। এজন্য আমরা নানা মন্ত্রসংহিতা হইতে স্থালীপুলাক ন্যায়ে কয়েকটি মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্বাদি প্রদর্শন করিয়াছি। তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে—"ন হি আগমানুমানে জগৎকর্তৃত্ব নিত্যসর্ব্ববিষয়কবুদ্ধিমত্ত্বব্যতিরেকেণ কেবলমীশ্বরং সাধয়তঃ।" (ন্যাঃ সূঃ, তাৎপর্য্যটীকা, ৯৫৬ পৃঃ) ইহার অভিপ্রায় এই যে,

বেদ ও অনুমান ঈশ্বরের সাধক হইলেও এই দুইটি প্রমাণ ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব ও তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের স্বরূপ সিদ্ধ করিতে পারে না। বেদ ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে বিশেষভাবে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়াস করিয়াছেন। ইঁহারা অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্বাদির সিদ্ধি প্রদর্শন করিলেও বেদ বিরুদ্ধ কোন ধর্মই ঈশ্বরে সিদ্ধি করিতে প্রয়াস করেন নাই, করিলে উচ্ছৃঙ্খল প্রয়াস ও যুক্তির নামে যুক্ত্যাভাসের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। প্রামাণিক মূর্দ্ধন্য নৈয়ায়িকগণ যুক্ত্যাভাস প্রদর্শনে একান্ত বিমুখ। উদ্ধৃত বেদমন্ত্রভাগে ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের রীতি অনুসারে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্বের সিদ্ধি আমরা এস্থলে প্রদর্শন করিব।

ভগবান্ বাৎস্যায়ন ১।১।১ ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "প্রত্যক্ষা-গমাশ্রিতমনুমানং স অন্বীক্ষা। প্রত্যক্ষাগমাভ্যামীক্ষিতস্য অন্বীক্ষণমন্বীক্ষা তয়া প্রবর্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী। ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্। যৎপুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগম-বিরুদ্ধং ন্যায়াভাসঃ স ইতি। (৩৯ পৃঃ; ন্যাঃ সূঃ, মেট্রোঃ সং) ইহার অভিপ্রায় এই যে, অনুমান প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী হইবে। প্রত্যক্ষ ও আগম প্রমাণ দ্বারা অবধৃত অর্থের অন্বীক্ষণ-অনুসন্ধান অনুমান। প্রত্যক্ষাগমাধিগত অর্থের অনুমান প্রমাণ দ্বারা অবধারণকে অন্বীক্ষা বলে। যে শাস্ত্র এই অন্বীক্ষা ব্যাপার প্রদর্শন করে তাহাকে আন্বীক্ষিকী বলে। এই আন্বীক্ষিকী ন্যায় বিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্র। যে অনুমান প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরুদ্ধ তাহা ন্যায়াভাস। ভাষ্যকারের এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ন্যায়শাস্ত্র বেদানুকূল কিন্তু বেদবিরোধী নহে। বেদপ্রতিপাদ্য যে সমস্ত অর্থ উপপাদন সাপেক্ষ সেই সমস্ত অর্থের উপপত্তি প্রদর্শনই ন্যায়শাস্ত্রের কার্য্য। ন্যায়শাস্ত্র প্রদর্শিত যুক্তিসমূহ বলপূর্ব্বক শ্রৌত অর্থের স্কন্ধে স্থাপিত করা হয় নাই প্রত্যুত উপপত্তিসাপেক্ষ শ্রৌত অর্থের উপপত্তি প্রদর্শন করিবার জন্যই ন্যায়শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রপ্রদর্শিত যুক্তি সমূহ ব্যর্থ বাগাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রকার ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ন্যায়শাস্ত্রকে বেদের উপাঙ্গ বলিয়াছেন। শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ নিরুক্ত-ছন্দ-জ্যোতিষ যেমন বেদের অঙ্গ। এইরূপ পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই চারিটি বেদের উপাঙ্গ। পুরাণন্যায়মীমাংসাধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ

চতুর্দ্দশ ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩) উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যের বচনে ন্যায়শব্দ দ্বারা ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই চারিখানি দর্শনের নিদর্শন করা হইয়াছে। এই চারখানি দর্শনই অনুমান প্রমাণের সাহায্যে শ্রৌত অর্থের উপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছে। এবং মীমাংসাশব্দ দ্বারা পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপের ছয়খানি বৈদিক দর্শনই বেদের উপাঙ্গ। এই কথা পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার "প্রস্থানভেদ" গ্রন্থে বলিয়াছেন। উপকারককেই অঙ্গ বলে। যে যাহার উপকারক নহে সে তাহার অঙ্গ হইতে পারে না। উক্ত ছয়খানি দর্শন বেদের উপকারক বলিয়াই ইহাদিগকে বেদের উপাঙ্গ বলা হইয়াছে। ন্যায়বৈশেষিক রীতি অনুসারে বেদমন্ত্রপ্রদর্শিত ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব অনুমান প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইলে ন্যায়শাস্ত্র যে বেদের উপাঙ্গ তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা এই প্রবন্ধে ন্যায়বৈশেষিক সম্মত যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়া বেদমন্ত্রসিদ্ধ ঈশ্বরের ধর্ম্মের উপপাদন করা হইয়াছে ইহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়াছি। একটি কথাই বারবার বলার অভিপ্রায়ই এই যে, দার্শনিক তত্ত্বসমূহই বেদমন্ত্রে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। বেদমন্ত্রে যাহা উপনিবদ্ধ হইয়াছে দর্শনশাস্ত্রকারগণ মাত্র তাহারই বিবৃতি করিয়াছেন। বেদানপেক্ষিত তত্ত্বের আলোচনা ভারতীয় বৈদিক দার্শনিকগণ করেন নাই। বৈশেষিকদর্শনে দ্রব্যাদি যে ছয়টি ভাব-পদার্থের নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা বেদার্থ বিচারের নিতান্ত অনুকূল বলিয়া। এই ছয়টি ভাব-পদার্থ নিরূপণের অনুপযোগী হইলে ভগবান্ জৈমিনি তাহা কখনও গ্রহণ করিতেন না। জৈমিনি মীমাংসা-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদের তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন—"দ্রব্য গুণসংস্কারেষু বাদরি" (জৈঃ সূঃ ৩।১।৩)। আবার বলিয়াছেন—"কর্ম্মাণ্যপি জৈমিনিঃ ফলার্থত্বাৎ" (৩।১।৪)। আবার বলিয়াছেন—"অর্থৈকত্বে দ্রব্যগুণয়োরৈককর্ম্ম্যাৎ নিয়মঃ স্যাৎ" (৩।১।১২)। এই সমস্ত জৈমিনিসূত্রগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈশেষিকপ্রসিদ্ধ দ্রব্যগুণকর্ম্মাদি পদার্থ বেদার্থবিচারে অপেক্ষিত বলিয়া জৈমিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু জৈমিনি নিজে দ্রব্যগুণাদি পদার্থের নির্ব্বাচন করেন নাই।

বৈশেষিক সূত্রে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের আলোচনা না থাকায় বৈশেষিক সূত্র হইতে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর-সাধক অনুমান প্রমাণ দেখান যায় না। প্রশস্তপাদভাষ্যেও সৃষ্টি সংহার বিধিপ্রকরণে ঈশ্বর কর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি ও সংহারের রীতি প্রদর্শিত হইলেও সাক্ষাৎভাবে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি প্রদর্শিত হয় নাই। প্রশস্তপাদভাষ্যের অতি প্রাচীন ব্যোমবতী বৃত্তিতে

সৃষ্টিসংহারবিধিপ্রকরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যোমশিবাচার্য্য বলিয়াছেন—"ননু সর্ব্বমেতদসম্বদ্ধমীশ্বরসদ্ভাবে প্রামাণাসম্ভবাৎ। তন্ন, অনুমানাগমাভ্যাং তৎসদ্ভাবসিদ্ধেঃ।" ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রশস্তপাদভাষ্যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক জগতের যে সৃষ্টি সংহার বিধি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। ততঃপর বলিয়াছেন—পূর্ব্বপক্ষীর অস্তিত্বের কথা সঙ্গত নহে, অনুমান ও আগমপ্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইয়া থাকে। (ব্যোমবতী বৃত্তি, সৃষ্টিসংহারপ্রকরণ, ৩০১ পৃঃ চৌখাম্বা সং) ব্যোমশিবাচার্য্যের এই উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, প্রশস্তপাদভাষ্যে ঈশ্বরসাধকপ্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকায় কিরণাবলীকে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন যে, "সর্বমেতদ্ ঈশ্বরসদ্ভাবসিদ্ধৌ সম্ভবেৎ, তৎসিদ্ধাবেব কিং প্রমাণামিতি চেৎ, তদ্‌বহুত্বেঽপি কিঞ্চিদুচ্যতে"। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রশস্তপাদভাষ্যে যে সৃষ্টি সংহার বিধি বর্ণিত হইয়াছে তাহা ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধি হইলে সঙ্গত হইতে পারে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে উদয়ন বলিয়াছেন—ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক বহু অনুমান প্রমাণ থাকিলেও এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। উদয়নের এই উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, প্রশস্তপাদভাষ্যে ঈশ্বরসদ্ভাবসাধক প্রমাণ উপন্যস্ত হয় নাই। হইলে, উদয়ন প্রদর্শিত শঙ্কা সঙ্গত হইত না। ব্যোমশিবাচার্য ও উদয় উভয়েই ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের পরবর্ত্তী। এজন্য আমরা প্রথমে এস্থলে বৈশেষিক তন্ত্র হইতে ঈশ্বরের সাধক প্রমাণ উপন্যাস না করিয়া উদ্দ্যোতকরের গ্রন্থ হইতে ঈশ্বরসাধক প্রমাণ প্রদর্শন করিব।

(ক্রমশঃ)

—০—

ভাগবতে সাধনার কথা

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

সাধককে ব্যবহারিক জগতে যেমন কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতে হয় সেইরূপ একান্তেও সাধনার কার্য্য করিতে হয়।

প্রথমে ব্যবহারিক জগতের আচরণের কথা বলা যাউক্। ব্যবহারিক জগতে সুখ দুঃখেই মানুষের মন বিচলিত হয়। উত্তম মধ্যম সমান লোকের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলে মন প্রসন্ন থাকে তাহাও জানা আবশ্যক।

চতুর্থ স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়ে ভাগবত বলিতেছেন—মানুষ যে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে মোহই তার একমাত্র কারণ। লোকের কর্মই তাহার সুখ দুঃখের বীজ। অতএব ঈশ্বরের আনুকুল্য ব্যতীত কোন উদ্যমই ফলপ্রদ হয় না—ইহা বিবেচনা করিয়া, দৈব হইতে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহাতেই পরিতুষ্ট হওয়া উচিত। অদৃষ্ট বশতঃ সুখ উপস্থিত হইলে মনে করা উচিত "আমার পুণ্য ক্ষয় হইতেছে," এবং দুঃখ আসিলে মনে করা উচিত "আমার পাপ ক্ষয় হইতেছে" এইরূপ বিবেচনা করিয়া—আত্মাতে সন্তোষ জন্মাইবে ; এইরূপ অভ্যাস যিনি ব্যবহারিক জগতে সর্বদা অভ্যাস করেন তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

আরও, গুণাধিক পুরুষকে দেখিয়া আনন্দিত হইবে, গুণাধম পুরুষের প্রতি দয়া করিবে ; এবং সমান লোকের সহিত মিত্রতা করিবে ; এইরূপ অভ্যাস করিলে মানুষ সন্তাপে অভিভুত হইবে না।

ব্যবহারিক জগতে এই শান্তি পথ ধরিয়া যিনি সর্বদা চলিতে পারেন, এই শান্তি উপদেশ যিনি সর্বদা স্মরণ করিয়া সুখদুঃখ অগ্রাহ্য করিতে পারেন, এবং মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং পাপকে উপেক্ষা করিতে পারেন তাঁহার চিত্ত রাগ দ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া কালে শুদ্ধ হয়। ইহার পরে উপাসনা করিতে হয়। নির্জন স্থানে যখন উপাসনা করিবে তখন প্রথমেই ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হয়। শ্রীভগবানের স্বভাবটি জানিলেই উপাসনায় তাঁহার নিকট বসিবার ইচ্ছা লাগিবে।

ভগবান ক্ষমাসার—তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন যখন তুমি তোমার অপরাধ স্মরণ করিয়া, অপরাধের জন্য প্রাণকে কাতর করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বাল্যকাল হইতে এই বয়স পর্য্যন্ত কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে, "তোমাকে ভুলিয়া কোন কর্মই করিব না" এই আদি প্রতিজ্ঞা কিসের জন্য কতবার, কতদিন লঙ্ঘন করিয়া, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কামের গোলাম হইয়া কতদিন,

কতবার অপকর্ম করিয়াছ, পাপ করিয়া ফেলিয়াছ, তাঁহার স্মরণে প্রাণকে কাতর করিয়া আর যেন পাপের প্রলোভন আমার উপরে না পড়ে—আর যেন আমি পাপ না করি, এই বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া উপাসনার জন্য তাঁহার নিকটে উপবেশন কর।

ভগবান ভক্তবৎসল। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহারই পাদপদ্ম সর্বদা অন্বেষণ করেন। অন্যভাব পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বভাবজ কর্মদ্বারা—নিজ কর্মদ্বারা শোধিত চিত্তে তাঁহার উপাসনা কর। সেই পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহই তোমার দুঃখ দূর করিতে পারিবেন—এরূপ সম্ভাবনা নাই।

নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্মযা
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমানয়া॥

ব্রহ্মাদি দেবগণও—যাঁহার সম্বন্ধে ইতর—তাঁহারও যে কমলার অনুসন্ধান করেন, সেই কমলবাসিনী লক্ষ্মী আপনার হস্তে দীপবৎ কমল লইয়া সর্বদা তাঁহার অন্বেষণ করেন। তুমি ভক্তিভাবে শুদ্ধমনে তাঁহারই ভজনা কর। যে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তিরূপ আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাঁহার হরি পাদপদ্মের উপাসনাই একমাত্র উপায়।

কিরূপে উপাসনা করিতে হইবে, কিরূপ সাধনা করিতে হইবে জান?

নির্জ্জন পবিত্র দেশে ভগবান্ হরি নিত্য অবস্থান করেন—তুমি এরূপস্থানে গমন কর; তোমার মঙ্গল হইবে।

গঙ্গা বা যমুনার পুণ্যসলিলে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে; সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম করিয়া কুশাসনে, স্বস্তিকাদিসনে—নিয়মক্রমে উপবিষ্ট হইবে। নির্জন স্থানের জন্য নিত্য প্রার্থনা করিবে। যতদিন তাহা না পাইতেছ ততদিন নিজের গৃহেই নির্জন স্থান করিয়া লইবে।

পরে রেচক-পূরক-কুম্ভকরূপ ত্রিবিধ প্রাণায়াম করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চাঞ্চল্য দূর করিয়া স্থির মনে ভগবান্ হরির ধ্যান করিতে থাকিবে।

জীবন্তভাবে ধ্যান ন করিতে পারিলে ভগবদ্দর্শন মিলে না। ভাগবত এখানে ধ্যানের বস্তুটির রূপ এবং গুণ জীবন্তভাবে দিয়াছেন।

ভগবান্ হরি দেবগণমধ্যে পরম সুন্দর। তাঁহার নাসিকা ও ভ্রূযুগল রমণীয়। কপোল মনোহর। বদন ও নয়ন সর্বদাই প্রসন্ন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনি প্রসাদ দানে সর্বদাই অভিমুখ। তাঁহার দেহ নব-যৌবন সম্পন্ন। তিনি

প্রণতজনের আশ্রয়দাতা, সকলের সুখকর, শরণাগতের প্রতিপালক এবং দয়ার সাগর। তিনি শ্রীবৎসলাঞ্ছন; নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ; বনমালাধারী। তাঁহার বাহুচতুষ্টয় শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে সর্বদা শোভমান। তাঁহার মস্তকে কিরীট; কর্ণে কুণ্ডল; বাহুতে কেয়ূর ও বলয়; গলদেশে কৌস্তুভমণি; পরিধানে পীত-বসন; নিতম্বদেশ কাঞ্চীদামে পরিবেষ্টিত, চরণে স্বর্ণনুপূর দেদীপ্যমান।

দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সামগ্রী আছে, হরি সেই সকলের শ্রেষ্ঠ। বৎস! যে ব্যক্তি তাঁহার অর্চনা করে—নখের ন্যায় মণিশ্রেণীতে দেদীপ্যমান চরণদ্বয় দ্বারা তিনি সেই ভক্তের হৃদপদ্মের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া তাহার মনোমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত ধারণাদ্বারা সুস্থির ও একাগ্রচিত্তে বরদশ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্‌কে মৃদুমৃদু হাস্যযুক্ত এবং অনুরাগ সহিত দর্শনকারির ন্যায় ধ্যান করিবে।

ধ্যানের পর মন্ত্র জপ। এই মন্ত্রের মাহাত্ম্য এইরূপ যে সপ্তরাত্র ইহা পাঠ করিলে, ইহার প্রভাবে মানব দেববৃন্দের দর্শন লাভ করিতে পারে। "নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—ইহা সিদ্ধমন্ত্র।

এই মন্ত্রদ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রদান পূর্বক শ্রীভগবানের পূজা করিবে। পবিত্র-জল, মাল্য, বন্য ফলমূল, প্রশস্ত দূর্বাঙ্কুর, বসন এবং হরিপ্রিয়া তুলসী এই সকল দ্রব্য দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবে। শিলাদি নির্মিত প্রতিমা যদি দেখিতে চাও তাহাতেই পূজা করিবে। তদভাবে মৃত্তিকা জলাদিতেও অর্চনা করিবে।

পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্‌ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজমায়াযোগে যাহা যাহা করেন তাহা হৃদয়ের মধ্যে চিন্তা করিবে। ভগবানের যতপ্রকার পরিচর্য্যা পূর্বে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উল্লিখিত দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা তৎসমুদয় মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি নিয়োগ করিবে।

—০—

দৈনন্দিন জীবনে অদ্বৈতবাদ

[অধ্যাপক শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, এম্‌-এ]

ভারতীয় দর্শন বলতে আমরা নয়টি দর্শন-প্রস্থান বুঝে থাকি। তার মধ্যে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিনটি নাস্তিক দর্শন কারণ এগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়নি। আর সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা বা মীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এই ছয়খানিকে আস্তিক দর্শন বলা হয় কারণ এইগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা হয়েছে। এই ছ'খানি আস্তিক দর্শনের মধ্যে আবার বেদান্তের সঙ্গে বেদের সর্বাপেক্ষা নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। এইজন্য বেদান্তকে বৈদিক দর্শনও বলা হয়ে থাকে। আর এই বেদান্ত দর্শনেই হয়েছে ভারতীয় চিন্তারাশির পরিসমাপ্তি।

বেদান্ত দর্শনকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা চলে। শঙ্করাচার্য প্রভৃতি যে-মতের প্রচার করেছেন তাতে একমাত্র ব্রহ্মকেই পরমার্থ সত্য বলা হয়েছে। এইজন্য তার নাম অদ্বৈতবাদ। রামানুজাচার্যের মতে জীব ও জগতের দ্বারা বিশিষ্ট ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য। তাই এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। আর মধ্বাচার্য বলেছেন যে, বাহ্য জীব-জগৎ যেমন সত্য ব্রহ্মও তেমনই সত্য এবং ইহারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। এইজন্য মধ্বাচার্যের মতকে দ্বৈতবাদ বলা হয়।

অদ্বৈতবাদের মূল কথা—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই। জীব ও ব্রহ্মকে যে আমরা পৃথক্ বলে মনে করি তা অজ্ঞান বা মায়ার খেলা মাত্র। বস্তুতঃ জীবও যা ব্রহ্মও তাই, জীবে ও শিবে কোনই পার্থক্য নাই। এক ব্রহ্মই সর্বত্র বিরাজমান। আমরা অজ্ঞানবশতঃই তাঁর যথার্থ স্বরূপ বুঝতে অক্ষম হই এবং মানুষ, পশু, গাছ, পাথর, চেয়ার, টেবিল, বাড়ী, ঘর ইত্যাদি অসংখ্য দ্রব্যের সৃষ্টি করি। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে যখন অজ্ঞানের ঘোর কেটে যায় তখন এই এত ভেদ চিরতরে লুপ্ত হয়, অনন্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ উপলব্ধি করি।

আজ যেদিকে চেয়ে দেখি চোখে পড়ে বিভেদ, সংগ্রাম। বিভেদ মানুষে মানুষে, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে। এর কারণ অভেদ ভাবনার অভাব। যখন আমি ভাবি, আমার ও আমার প্রতিবেশীর স্বার্থ এক তখন আর বিভেদ আসে না। কেবলমাত্র স্বার্থের ঐক্যতেই যদি বিভেদ

চলে যায় তবে সম্পূর্ণ অভেদ বুঝ্‌তে পারা যে মানবতার একটি সুমহান্‌ উচ্চ স্তর তা সহজেই বোঝা যায়। অদ্বৈতবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, ভেদ কল্পিত বস্তু। সকলেই ব্রহ্ম, সর্বত্র সর্বদা ব্রহ্ম বিরাজিত। এই সর্বত্র ঈশ্বরদর্শনই সকল ধর্মের মূল। সকল ধর্ম ও সকল মহাপুরুষই বলে থাকেন—পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন কর, পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা-প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠুক। অহিংসার মাহাত্ম্যও সকলেই প্রচার করেন। কিন্তু কেন? এর উত্তর একমাত্র বেদান্ত-দর্শনই দিতে পেরেছে। তোমার প্রতিবেশী ও তুমি তো একই। সুতরাং কলহ নিরর্থক। নিজের সঙ্গে কি কখনও কেউ ঝগড়া করে? যে-জীবকে তুমি হিংসা কর্‌তে উদ্যত হয়েছ সেও তো তুমিই। নিজের ওপর কি কেউ আঘাত করে? অজ্ঞ মানুষকে বেদান্ত বুঝিয়ে দেয় যে, সকলেই এক কিন্তু আমরা অজ্ঞানের বন্ধনে চোখবাঁধা হয়ে রয়েছি তাই মিথ্যা ক্রোধ, হিংসা কর্‌ছি। ক্রোধে, উন্মত্ততায় যদি কেউ নিজেকে আঘাত করে তবে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। তাই আজ যাকে আঘাত করার জন্য, অন্ধ মানব, ছুটে চলেছ তাকে আঘাত কোরো না, বিরত হও, সম্বিৎ ফিরে পেলে বুঝ্‌বে সেও তুমিই এবং তখন অযথা দুঃখ ভোগ কর্‌বে।

অন্যের উন্নতিতে যে আমরা ঈর্ষ্যান্বিত হই তাও নিরর্থক। প্রতিবেশীর সম্পদে তাকে ঈর্ষ্যা কর্‌লে তো নিজেকে ঈর্ষ্যা করা হবে। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে দেখা যাবে রিপুগুলো অনেক প্রশমিত হয়েছে, মনে অনেক শান্তি আস্‌বে।

সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করা সহজ নয় তা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু এই কথা সর্বদা স্মরণ রাখার আবশ্যকতা আছে। এই কথা বার বার চিন্তা কর্‌লে আমাদের স্বভাবের কর্কশতা অনেক কমে যাবে, ব্যবহারে মাধুর্য আস্‌বে। মনে করুন, আপনি কোন অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। গ্রীষ্মের প্রখর রোদের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা আপনাকে যেতে হবে আপনার অফিসের বাস ধরার জন্য। তাড়াতাড়ি যেতে হবে বলে একটা রিক্সা কর্‌লেন। আপনি উঠেই বলে দিলেন, "তাড়াতাড়ি চলো"। একবার ভাব্‌লেনও না যে, আপনি হাঁটার পরিশ্রম কর্‌তে চান না যে-রোদের ভয়ে সেই রোদেই একজনকে গাড়ী টান্‌তে হচ্ছে। তাও গতি একটু মন্দ হওয়াতে আপনি শাসিয়ে দেন—"তাড়াতাড়ি না গেলে কিন্তু পয়সা কম পাবে।" কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, যে গাড়ী চড়েছে আর যে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে পার্থক্য কিসে? পার্থক্য কিছুই নয়। উভয়েই সমান। কেবলমাত্র পরিস্থিতির ভেদ, দু'জনের কোন ভেদই নেই।

দুঃখকষ্ট উভয়কেই ব্যথিত করে। তখন একবার যদি মনে করেন যে, আরোহী ও চালক উভয়েই ভগবান্ তখন ব্যবহারটা একটু শান্ত হবে, একটু অন্ততঃ মাধুর্য ফুটে উঠ্‌বে সেই আচরণের মধ্যে।

আমাদের আচরণ সময়ে সময়ে কত বিসদৃশ হয়ে থাকে এবং ভদ্রতার আবরণ উন্মোচন কর্‌লে আমাদের যে কি পরিমাণ বর্বরতা প্রকাশ পাবে তারই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ট্রামে, বাসে ভিড়ের মধ্যে আমরা কতই চলাফেরা করি। ভিড় যখন একটু কম থাকে তখন পাশের লোকের গায়ে যদি দৈবাৎ পা ঠেকে যায় তবে আমরা হাত তুলে নমস্কার করি কিন্তু ভেবে দেখুন তো যদি একটি কুলির গায়ে পা ঠেকে তবে আমরা কি করি? আমরা কি হাত তুলে নমস্কার করি? আমরা যদি সত্যই মানুষের মধ্যে বিরাজিত ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে থাকি তবে আচরণের এই বৈসাদৃশ্য কেন? যদি বর্তমান সামাজিক কাঠামো আমাদের মনে সমান ব্যবহার করতে কিছু সঙ্কোচ এনে দিয়ে থাকে তবে অন্তরের মধ্যেও কি একবার এই সর্বশক্তিমান্ ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই? আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তা করি না। একবার ভেবে দেখ্‌বেন, পার্থক্য কিছুই যখন নেই, সকলেই যখন ভগবান্ তখন এই কুলির প্রতি এ রকম আচরণ কেন? কমপক্ষে মনের মধ্যে গোপনেও একটিবার তার অন্তরস্থিত ভগবানের প্রতি যদি প্রণতি জানাতে পারেন তবে মনের মধ্যে অপার সন্তোষ অনুভব কর্‌বেন। আর তখনও হাত তুলে নমস্কার কর্‌লেই বা দোষ কি?

সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন যথেষ্ট আয়াস সাধ্য বলেই ধাপে ধাপে এগিয়ে চল্‌তে হবে। তাই স্বামীজী বলেছেন—"যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে কৃতকার্য না হও, অন্ততঃ যাহাকে তুমি সর্বাপেক্ষা ভালবাস এমন এক ব্যক্তিতে তাঁহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা কর—তারপর তাঁহাকে আর এক ব্যক্তিতে দর্শনের চেষ্টা কর। এইরূপে তুমি অগ্রসর হইতে পার। আত্মার সম্মুখে ত অনন্ত জীবনটা পড়িয়া রহিয়াছে—অধ্যবসায় সম্পন্ন হইয়া চেষ্টা করিলে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।"

সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করার চেষ্টা কর্‌লে কোন কিছুর জন্য অন্যের ওপর দোষারোপ করার প্রবৃত্তিটা কম্‌বে। কোনও অপরাধ ঘট্‌লে আমরা সর্বপ্রথম নিজেদেরকে সেই দোষ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করি এবং অন্যের ওপর দোষারোপ করি। এই রকম অন্যকে দোষী করে কখনই আত্মার উন্নতি সাধিত হয় না। যদি নিজেকে উন্নত কর্‌তে হয় তবে নিজেকে পাপমুক্ত কর্‌তে হবে। সব পাপের আশ্রয় এই নিজের মন। নিজের মন যদি উদার, বিশাল ও নিষ্পাপ

হয় তবে দেখা যাবে আর কোথায়ও পাপ নেই। আমি যে পাপ দেখে থাকি তার কারণ আমার মধ্যেই পাপ আছে। চুরি করা জিনিসটা পাপ এ কথা বুঝ্‌বার মত শক্তি যে-শিশুর হয়নি সে কখনও অন্যকে চোর বল্‌তে পার্‌বে না। আমার মনে যতক্ষণ ভয় বলে কিছু আছে ততক্ষণই ভয়ঙ্কর বস্তু আছে আর যখন আমি ভয়শূন্য তখন আর কোন কিছুই আমার কাছে ভয়ানক নয়। ছোট বেলায় অনেককেই জুজুর ভয় দেখান হয় কিন্তু বড় হলে যখন মন থেকে সেই জুজুর ভয় চলে যায় তখন জুজু দিয়ে আর ভয় দেখান যায় না। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য ও হরিনামতন্ময় ধ্রুবর মন থেকে যখন ভয় চলে গিয়েছে তখন বাঘ বা সিংহ কিছুই আর তাঁদের কাছে ভয়ঙ্কর ছিল না। তাই সর্বপ্রথম চাই নিজের মনকে উন্নত করা। মনকে উদার ও বিশাল কর্‌তে পার্‌লে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। আমাদের পারিবারিক কত কলহের মূলে তো রয়েছে অতি সামান্য কারণ। সামান্য উদারতা থাক্‌লেই এইসব কলহ আমরা এড়িয়ে চল্‌তে পারি।

মনের উদারতা তখনই আসে যখন আমরা জানি যে, কোন ক্ষুদ্র বস্তুর পিছনে আমরা ধাবমান নই। আমরা সত্য, শিব ও সুন্দরের উপলব্ধির জন্য নিয়ত চিন্তাকুল থাক্‌লে এবং পরম সত্য ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেদেরকে অভিন্ন কল্পনা কর্‌তে থাক্‌লে মনের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। নিজের মধ্যেও নিজের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তুতেই যদি ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব কর্‌তে পারা যায় তবে আমাদের জীবনও হবে প্রেম, ভালবাসা ও শান্তির আবাসস্থল। স্বামী স্ত্রীর কাছে অধিক প্রিয়পাত্র হন যখন স্ত্রী জানে যে তার স্বামী স্বয়ং ভগবান্, এই রকম স্ত্রীও স্বামীর কাছে অধিক ভালবাসা পেয়ে থাকে যখন স্বামী জানে যে তার স্ত্রীর মধ্যে ভগবান্ বিরাজমান। এইরকম পুত্রকন্যাও অধিক স্নেহভাজন হয় যখন জনকজননী বুঝ্‌তে পারেন যে, সন্তান সাক্ষাৎ ভগবান্। এইভাবে সর্বত্র পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌লে জীবন হবে শান্তিপূর্ণ, আনন্দময়; এই জগতেই স্বর্গের সন্ধান পাওয়া যাবে।

সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন হলে আর শোক মোহ কিছুই থাক্‌তে পারে না। তাই ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে—

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

এই উদার মহান্ দৃষ্টি যখন আস্‌বে তখন আর দোষীকে শাস্তি দেবার জন্য মন ব্যগ্র হবে না, তখন সকলের প্রতি অপার ভালবাসা উপ্‌লে উঠ্‌বে, যে-ভালবাসা ও প্রেমের সন্ধান পাই ভগবান্ শ্রীচৈতন্য ও ভগবান্ বুদ্ধের মধ্যে।

নাহি পারি জীবন দানিতে

[শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী]

কুসুম চন্দন ল'য়ে অর্ঘ্য তব করি বিরচন,
সাজাই নৈবেদ্য-থালি, পদে তব করি সমর্পণ,
করি তব নিত্য পূজা ; তবু তুমি জাগো না দেবতা,
হৃদয়ে বেদনা জাগে স্মরি মোর পূজার ব্যর্থতা !

বাহিরের সমারোহে লভি বটে চিত্তের সান্ত্বনা,
তবু মোর মনে হয়, এ ত নহে তোমার অর্চ্চনা !
নিজেরে পারিনা দিতে অর্ঘ্য করি' চরণে তোমার,
তাই ত' পূজার পুষ্প ফিরে ফিরে আসে বার বার !

কি যেন বাঁধনে বাঁধা নিত্য আমি সংসারের সাথে,
বাজে না মুক্তির সুর ছিন্নতার জীবন-বীণাতে !
নিজেরে হারাই বুঝি, অহর্নিশ এই মনে হয়,
আমার প্রাণের মাঝে জেগে আছে শুধু সেই ভয় !

তোমার নিকটে গিয়ে তাই মোরে পারিনা স'পিতে,
জীবনের নাথ তুমি, নাহি পারি জীবন দানিতে !

—০—

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

॥ চতুর্থ প্রকরণ, একাদশ উচ্ছ্বাস ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

॥ শ্রীরামঃ শরণং মম ॥

আদৌ রাম তপোবনাদিগমনং হত্বা মৃগং কাঞ্চনং
বৈদেহীহরণং জটায়ুমরণং সুগ্রীব সম্ভাষণং।
বালীনির্দ্দলনং সমুদ্রতরণং লঙ্কাপুরীদাহনম্
পশ্চাদ্ রাবণ কুম্ভকর্ণাদি হননং চৈতদ্ধি রামায়ণম্ ॥

সর্ব্বাধিপত্যং সমরাঙ্গধীরং সত্যং চিদানন্দময়স্বরূপম্।
সত্যং শিবং শান্তিময়ং শরণ্যং সনাতনং রামমহং ভজামি ॥

বেদে নাম-মহিমা আছে?

আছে বৈকি—

তমুস্তোতার পূর্ব্বং যদাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্ত নমস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ॥

—ভগবন্নাম মাহাত্ম্য সংগ্রহধৃত ঋগ্বেদসংহিতা অ ২, অ ২, ব ২৬।

—'হে স্বার্থকুশল জনগণ। সেই পুরাতন সর্ব্বাধিষ্ঠান সর্ব্বকর্ত্তা বেদান্ত সিদ্ধান্ত সিদ্ধ পরমাত্মাকে যথাজ্ঞান স্তব কর, তাহার দ্বারা জন্ম সফল কর। স্তব করিতে অসমর্থ হইলে শ্রীভগবানের চিদানন্দময় নাম সকল সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিতে থাক। হে বিষ্ণো, তোমার সাক্ষাৎকাররূপা স্বরূপ প্রকাশিকা প্রকাশকে ভজনা করি।'

প্রতত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্।
তং ত্বা গৃণামি তবসো মতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে ॥

—ঐ ঋ, সং অ ৫, অ ৬, ব ২৫ ॥

—'হে অন্তর্যামিন্! সেই প্রসিদ্ধ নাম উত্তম রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, এই লোকের পরপারে মহান্ লোকে অবস্থিত তোমার নামের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য অবগত হইয়া ক্ষুদ্র আমি তোমার স্তব করিতেছি।'

ন তে গিরো অপি মৃষ্যে তুরস্য ন সুষ্ঠুতি মসুর্যস্য বিদ্বান্।
সদা তে নাম স্বযশো বিবক্মি ॥ —ঋ সং অ ৫, অ ৩, ব ৫।

'হে পরমাত্মন্! রিপুসূদন, তোমার স্তুতি তোমার বল ও শোভন স্তব *অবগত হইয়া আমি পরিত্যাগ করিব না; কিন্তু অসাধারণ যশঃ তোমার নাম* সদা গান করি।'

বেদমন্ত্রেও 'সদা' বলেছেন।

কোনও কর্ম্ম সতত না করলে তার সংস্কার পড়ে না, অনাদি অবিদ্যা সংস্কারাচ্ছন্ন মনকে নির্ম্মল কর্‌তে হলে 'সর্ব্বদা' নাম করে সে পুরাতন সংস্কার মুছে ফেলতে হয়। পাতঞ্জলেও দেখা যায়—

"নিরন্তর সংকারাসেবিত দৃঢ়ভূমিঃ"

নিরন্তর আদরের সহিত সেবিত হলে তবে সে ভূমি দৃঢ় হয়। আর ভূমি দৃঢ় না হলে কেহ পরমানন্দ লাভ কর্‌তে পারে না।

তুমি নাম মাহাত্ম্য বল।

বেদসারমিদং নিত্যং দ্ব্যক্ষরং সততোত্থতম্।
নির্ম্মলং হ্যমৃতং শান্তং সদ্রূপমমৃতোপম্॥
কলাতীতং নির্ব্বশগং নির্ব্যাপারং মহৎ পরম্।
বিশ্বাধারং জগন্মধ্যং কোটী ব্রহ্মাণ্ড বীজকম্॥
জড়ং শুদ্ধ ক্রিয়ং বাপি নিরঞ্জনং নিয়ামকম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ক্ষিপ্রং ঘোর সংসার বন্ধনাৎ॥

—স্কন্দপুরাণে, নাগরখণ্ডে।

"রাম" এই দুটী অক্ষর নিখিল বেদের সার, শাশ্বত, ক্ষয়োদয় পূণ্য, নির্ম্মল অমৃত শান্ত সৎস্বরূপ, অমৃত ভিন্ন উপমার দ্বিতীয় বস্তু বিহীন, কলাতীত, অসীম হেতু, অবশবর্ত্তী, অভিপ্রায় বিহীন, পরম মহৎ বিশ্বের আধার, নাদরূপে সকলের অভ্যন্তর স্থিত, কোটী ব্রহ্মাণ্ডের বীজ, জড় শুদ্ধক্রিয় নিরঞ্জন নিয়ন্তা, যাঁকে জেনে মানুষ সত্বর সংসার বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়।

কলাতীত মানে?

অকার, উকার, মকার নাদ বিন্দু কলা কলাতীত, রামনাম কলাতীত।

জড় বল্লেন কেন?

তদ্ভিন্ন যখন কোন পদার্থ নাই তখন জড় চেতন সবই তিনি।

রামেতি দ্ব্যক্ষরোজপ সর্ব্বপাপাপনোদকঃ।
গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ শয়ানোবা মনুজো রাম কীর্ত্তনাৎ॥
ইহনির্বর্ত্তিতো যাতি প্রান্তে হরিগণো ভবেৎ।
রামেতি দ্ব্যক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্র কোটিশতাধিকঃ॥

সর্ব্বাসাং প্রকৃতীনাঞ্চ কথিতঃ পাপনাশকঃ।
চাতুর্মাস্যেঽথ সংপ্রাপ্তে সোঽপ্যনন্ত ফলপ্রদঃ ॥

'রাম' এই দুটী অক্ষর জপ সর্ব্বপাপ নষ্ট করে, যেতে যেতে উপবিষ্ট হয়ে কিংবা শয়ন করে মানব রাম নাম কীর্ত্তন কর্‌লে ইহলোকে পরম বৈরাগ্য ও শান্তি লাভ করে, অন্তে হরি পার্ষদ হয়।

'রাম' এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্র শত কোটী মন্ত্রের অধিক, সত্ত্ব রজ তমঃ প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতিগণের পাপনাশক, চাতুর্মাস্যে নিয়ম পূর্ব্বক রাম নাম জপ করলে অনন্ত ফল প্রদান করেন। চাতুর্মাস্যে ভক্তিতৎপরগণ জপ কর্‌লে দেবতাগণের ন্যায়, তাঁদের যমলোকে গমন কর্‌তে হয় না।

নরামাদধিকং কিঞ্চিৎ পঠনং জগতীতলে।
রাম নামাশ্রয়া যে বৈ ন তেষাং যম যাতনা ॥ —ঐ

"রাম" নামের অধিক অন্য কোন পাঠ (জপ) নাই। যাঁরা জগতে রাম নাম আশ্রয় করেন তাঁদের যম-যাতনা নাই।

আচ্ছা, মহাবীর সীতার কাছে রাম নাম পেয়েছিলেন, সীতা রাম নাম কোথা পান ?

সীতা যখন বালিকা তখন একদিন সঙ্গিনীগণের সহিত ক্রীড়া কচ্ছেন, এমন সময়ে শুকমিথুন পর্ব্বতে বসে রামায়ণ গান করে, তা শুনে সীতা সখিগণকে বলেন তোমরা পাখী দুটী ধর, সখীরা সীতাকে পাখী দুটী এনে দেন, সীতা পাখীদের রামায়ণ গান কর্‌তে বল্‌লে তারা বলে অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা হবেন, তাঁর রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে চারিটী পুত্র হবে, জ্যেষ্ঠপুত্র রাম অশেষ গুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়ভাষী ও সকলের কল্যাণকারী, তিনি হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে বিবাহ কর্‌বেন। পাখী এইরূপে রামচরিত গান করে। সীতা পাখীর মুখে "রাম" নাম পান।

পাখীরা কোথায় পায় ?

তারা বাল্মীকি মুনির আশ্রমে নিত্য ভাবি-রামায়ণ পাঠকারী তাঁর শিষ্যগণের মুখে শুনে শিখে।

বাল্মীকি তো সপ্তর্ষির কাছে পান। কেহবা বলেন, নারদের কাছে। এঁরা কোথা পান ?

ভগবান্ ব্রহ্মার কাছে সকলে বেদাদি নিখিল শাস্ত্র ও রাম নাম লাভ করেন।

শিবও ব্রহ্মার কাছে রাম নাম পান ?

ব্রহ্মার কাছে বল্লে ঠিক বলা হয় না। কেননা সমাধিস্থ ব্রহ্মার মুখ থেকে চতুর্ব্বেদ শ্রীভগবানের প্রেরণায় আবির্ভূত হন।

প্রথমে নাদ তারপর ওঙ্কার; পরে মাতৃকাবর্ণ অনন্তর বেদ। এই নাদকে শব্দব্রহ্ম বলে।

সারদা তন্ত্রে বলেছেন—

ভিদ্যমানাৎ পরাদ্‌বিন্দো রব্যক্তাত্মাপরোঽভবৎ।

শব্দ ব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ॥

শক্ত্যবস্থা রূপ প্রথম, বিন্দু ভেদ হলে বর্ণাদি বিশেষ রহিত অখণ্ড নাদ উৎপন্ন হয়। তাঁর নাম শব্দব্রহ্ম।

"সৃষ্ট্যুন্মুখ পরম শিব প্রথমোল্লাস মাত্রমখণ্ডোঽব্যক্তো নাদবিন্দুময় ব্যাপক ব্রহ্মাত্ম শব্দ"।

নাদ ও বেদ দুইটীর নাম তো শব্দব্রহ্ম?

হাঁ, শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে সমাহিত ব্রহ্মার হৃদয়াকাশ হতে নাদ, তাহাতে ওঙ্কার, ওঙ্কার থেকে ক্রমে অকারাদি পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ, তা থেকে বেদ।

নাদ এবং শ্রীভগবান কি স্বতন্ত্র?

না না, শ্রীভাগবতে বলেছেন আমিই নাদরূপে মূলাধারাদি চক্রে আবির্ভূত হই।

তাহ'লে শব্দ ও রূপ অর্থাৎ যা দেখা যায় বা শোনা যায় সব ভগবান্?

শুধু তা নয়; যা দেখা যায় না, শোনা যায় না, মনোবুদ্ধির অগোচর তাও শ্রীভগবান। তিনি ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না, নাই, থাক্‌বে না। একমাত্র তিনিই সব রূপে বিরাজ কচ্ছেন।

আচ্ছা, মানুষ 'সব তিনি' এই জ্ঞানে ঠিক স্থিতি লাভ কর্‌তে পারে?

অবশ্যই পারে, দ্বিতীয় বোধই থাকে না, তাঁকে নিয়ে খেলে হাসে বেড়ায় আনন্দ করে।

কেমন করে এ অবস্থা লাভ হয়?

কেবল রাম রাম কর্‌লে কোথা দিয়ে কি ভাবে যে চোখের পর্‌দা সরে যায় ভক্ত তা টেরও পান না। নাম কর্‌তে কর্‌তে তিনি দেখেন তাঁর চারদিকে আনন্দের প্রাচীর হয়ে গেছে। আকাশ থেকে আনন্দ ঝরছে। ধরণীও আনন্দ-অমৃতময়ী হয়ে তাঁকে ধারণ করে আছেন, শুধু আনন্দ, কেবল আনন্দ! নাম ডুবে যায় আনন্দ সাগরে—রাম রাম রাম।

"কনক মন্দির হের অন্তরে তোমার, নাম তার একমাত্র প্রবেশ দুয়ার।
আনন্দ মহল সেই অন্দর মাঝারে নাম বিনা আর কিছু প্রবেশিতে নারে॥"
বল বল নাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম॥

—•—

উৎকল সাহিত্যে রামকথা

[শ্রীসরলা দেবী]

(দুই)

উৎকলের মহাকাব্য "বৈদেহীশ বিলাস"—অমরকবি উপেন্দ্র ভঞ্জের শ্রেষ্ঠ অবদান। ভাবের গাম্ভীর্য্যে—ভাষার মাধুরীতে—ছন্দের লালিত্যে—অপরূপ শব্দবিন্যাসে এবং আলঙ্কারিক শৈলীর জন্য ইহা উৎকল সাহিত্যে এক অমূল্য রত্ন। কেবল উৎকলের নয়—এই কাব্য ভারতীয় সাহিত্যের—এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যেরও উচ্চতম পর্য্যায়ের। ইহা পণ্ডিতদের অভিমত। সাহিত্যিকেরাও ইহা স্বীকার করেন। কবি উপেন্দ্রের দুর্ভাগ্য—তিনি উড়িষ্যায় জন্ম লাভ না ক'রে যদি য়ুরোপে জন্মাতেন, তবে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হতে পারতেন। তিনি যত গ্রন্থ রচনা করেছেন তার সমস্তভাগ না হলেও—অধিকাংশ আদিরসাশ্রিত কাব্য ও সংগীত, শুধু এই 'বৈদেহীশ-বিলাস'-কাব্যটিতে আদিরসের প্লাবন নাই। ভঞ্জের কাব্য কষ্টবোধ্য হলেও তার ছন্দের সুরের মোহে উড়িষ্যার গ্রামের গোপবালকেরাও গোচারণের কালে তাহা গান করে। কবির কবিতায় যে মধুর সুর আছে, তার আকর্ষণে মূর্খেরাও মুগ্ধ হয়।

বৈদেহীশবিলাসে সমস্ত রামায়ণ কাহিনীকে সুর, ছন্দ ও কাব্যরসমাধুরী দিয়ে কবি লিখেছেন। পুস্তক বিশাল। বৈদেহীশ-বিলাসের প্রথম খণ্ডে তেরোটি ছন্দের ভিতরে যে পয়ারগুলিতে শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর সম্বন্ধে কবি বর্ণনা করেছেন—আমি সেইগুলি উড়িয়াতে উদ্ধৃত করছি। শব্দের টীকা দিলে প্রবন্ধ অনেক দীর্ঘ হবে—দেবযানে স্থান হবে না। তাই পয়ারের ভাবার্থ সংক্ষেপে বাংলাভাষায় লিখছি। বঙ্গভাষায় এই কবির কাব্য-আলোচনা—ইতিপূর্বে বাঙ্গালী বা ওড়িয়া সাহিত্যিকেরা কেউ করেন নাই। আমি যে প্রচেষ্টা করছি—তাতে আমার সাহিত্যাভিমান নাই—কেবল রামকথা শোনানোই লক্ষ্য। পূর্বে বলেছি—বঙ্গভাষায় আমার দখল নাই। কাজেই ভুল-ত্রুটী পাঠক পাঠিকারা যেন ক্ষমা করেন।

প্রথম 'ছান্দে' কবি লিখছেন—

[রাগ—পাহাড়িয়া কেদার]

বন্দই দীনবান্ধব হরি কর প্রতাপ যার সঞ্চরি
নিশাচরঙ্ক উল্লাস হরি পূজে সুমন যে।
বৈনতেয় যাহা অগ্রেতে স্থিত যে
বৈকুণ্ঠ পঞ্চক লোক তোষিত যে,
বিকাশ অখণ্ডিত মণ্ডলে সিংহভাবরে ক্রীড়িত কালে
ভবে তরণী হোই মঞ্জুলে গিরি উদিত যে ॥১॥

* * * *

বহিত যেহু রোহিত মূর্ত্তি শৃতি রঞ্জনকারক অতি
হংস হোই ন যাহা প্রশস্তি অছি প্রবর্ত্তি যে।
বিরাজ রূপ যাহার পুনি দ্বিজচক্র যা দর্শন গুণি
আত্মভূপর সংসারে ভণি কি শুভ্র কীর্ত্তি যে।
বুধজনক শিরভূষণ যেহি যে।
বিনয়র যে আন রাণী ন কহি যে।
বলি যাঁহাকু সর্বদা নাহিঁ দ্বীপ প্রসন্ন করতা সে হি
পুনত ধর্ম স্বরূপগ্রাহী কি স্তুতি তহিঁ যে ॥২॥

* * * *

বিষ্টরশ্রবা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পরমপদ ভজিলা নর
লভে এ যেনি গ্রন্থ আদর ভাবিত তাঙ্কু যে।
বংশ যাহারিঠার উৎপত্তি কবি বিচারে সে দেবস্তুতি
বিধান করি অতি সুমতি আন মনকু যে।
বর্ণ অভঙ্গ সভঙ্গরে এ শ্লেষ যে।
বুধ স্থান স্থানকে করি প্রকাশ যে।
বনাই চিত্ত অনবরত ভাগ্যে গ্রহণ তারকমন্ত্র
সীতা শ্রীরাম চরিত গীত কৃতে লালস যে ॥৩॥

* * * *

বাল্মীকি ব্যাস কবি যহিঁরে মহাকাব্যকে পুরাণ করে
মহানাটক বাত স্মুতরে হেলে রচিতা যে।
বিহিলে কাব্য যে কালিদাসে চম্পু রচনা যে ভেজে রেশে
কৃপাসিদ্ধ এ গীত প্রকাশে ছাড়িলি চিন্তা যে।
বিবেকহিঁ উদয় এমন্ত ধ্যায়ি যে।
ব্যোমে তারকা যেবে কালকু থাই যে।
বিভাবরীরে জ্যোতিরিঙ্গন গন জ্যোতিকি দেখান্তি পুন
স্মুজনে সাবধানরে শুন ছান্দ রচই যে ॥৪॥

এই রকম আরো বাইশ পদে প্রথম 'ছান্দ' সম্পূর্ণ হয়েছে। তাতে রাবণ-বিভীষণ-কুম্ভকর্ণ জন্মের ইতিহাস—আচরণাদির বর্ণনা আছে। উপরে লিখিত পদের বঙ্গার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

॥ প্রথম পদ ॥

যিনি দরিদ্রের বন্ধু বিষ্ণু; রাহুকে যিনি চক্রে ছেদন করেছিলেন, যিনি শোকসমূহকে দূর করেন, যিনি অজ্ঞানতা বিনাশ করেন, যিনি লক্ষ্মীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন, যিনি লক্ষ্মীপতি, যিনি অনন্তনাগের কোলে বিহার করেন, যাঁর বাহু-পরাক্রমে অসুরদের আনন্দ দূর হয়, যাঁহাকে দেবতারা পূজা করেন, যাঁর সম্মুখে গরুড় সর্বদা অবস্থান করেন, যিনি বিষ্ণুভক্তদের তোষণ করেন, যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হয়ে আছেন, যিনি নৃসিংহ-অবতার গ্রহণ করেছিলেন, যিনি সংসার-সমুদ্রের নৌকাস্বরূপ, যিনি নীলগিরি (শ্রীক্ষেত্র—পুরী) তে প্রকাশিত হয়েছেন—সেই বিষ্ণু ভগবানের বন্দনা করি।১।

॥ দ্বিতীয় পদ ॥

যে বিষ্ণু রোহিতমৎস্যের রূপ ধারণ করেছিলেন, বেদে যিনি পরমাত্মা বলে খ্যাত, যিনি বিরাটরূপবান, যাঁর দর্শনের জন্য ব্রাহ্মণেরা সদা আকুল, যিনি কন্দর্পের চেয়ে বেশী রূপবান্ এবং ব্রহ্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট, যাঁর কীর্ত্তিসমূহ শুভ্রবর্ণ ও মহাদেব শিব যাঁর সাথে বিনীতভাবে কথা বলেন, যাঁর চেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বলবান্ কেহই নাই, যিনি গজ মোক্ষণ ক'রে—কুম্ভীর নাশ ক'রে গজের আনন্দ বৃদ্ধি করেছিলেন, যিনি ধার্মিকের রক্ষাকর্ত্তা—এমন যে বিষ্ণু, তাঁকে কি-বাক্যে স্তুতি করব? ।২।

॥ তৃতীয় পদ ॥

জগৎকর্ত্তা বিষ্ণু-ভজনকারী বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়। সূর্য্য-দেবতা হতে সূর্য্যবংশের উৎপত্তি হয়েছে। সেজন্য বিষ্ণু এবং সূর্য্যকে স্তব ক'রে গ্রন্থ আরম্ভ করব। হে বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণ, এই বিষয় ভাব। বর্ণের অভঙ্গ ও সভঙ্গ দুই-অর্থবোধক শ্লেষ-অলঙ্কারে ইহা স্থানে স্থানে প্রকাশ করব। আমি সর্বদা কবিতা লিখতে চিত্ত নিয়োজিত করেছিলাম। ভাগ্যবশতঃ রাম-তারকমন্ত্র গ্রহণ করি। সেই মন্ত্রের প্রসাদে আমার অন্তরে কবিত্বের স্ফূর্ত্তি হ'ল। সেই কারণে সীতারামের চরিতগুলি প্রকাশে অভিলাষী হইলাম।৩।

॥ চতুর্থ পদ ॥

যে-রামসীতার বিষয় নিয়ে বাল্মীকি—রামায়ণ; ব্যাস অধ্যাত্মরামায়ণ; হনুমান মহানাটক; কালিদাস—রঘুবংশ; ভোজরাজ 'চম্পু', সিদ্ধ কবি বলরাম দাস দাণ্ডিরামায়ণ রচনা করেছেন—তাহা রচনার জন্য আমি আর অধিক কি লিখব! সেইজন্য ইহা রচনা করতে আমার বড়ই সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু রাত্রিকালে উজ্জ্বল-তারকাগণের প্রকাশ সত্ত্বেও—জোনাকীরাও তাদের জ্যোতি প্রকাশ করে থাকে। এই কথা ভেবে আমি গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প করেছি। হে সুজনগণ! সাবধানে শ্রবণ করুন।৪।

কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের উল্লিখিত স্তবের দুই প্রকার অর্থ হয়। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে তাহা প্রদত্ত হইল না। তিনি বিষ্ণু ও সূর্য্যকে একই স্তবে বন্দনা করেছেন। 'বৈদেহীশবিলাস' বিশাল ছান্দকাব্য। চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি পদের প্রথম অক্ষর 'ব'—এইভাবে বিশাল কাব্য রচিত হয়েছে। উদ্ধৃত 'ছান্দ'-এর প্রতি পদের প্রথম অক্ষর পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন। কবির অসামান্য পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভা; কেবল বারোবর্ষ অনন্যচিত্তে রামতারক-মন্ত্রসাধনার ফলেই সম্ভব হয়েছে—মনে করি। বারান্তরে অন্যান্য ছান্দের কথা লিখব।

—০—

রূপানুরাগ

[শ্রীঅনিলবরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ এম্-এ]

পূর্ব্বরাগে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে অজানিত পুলক। চক্ষে জাগিয়া উঠে এক নূতন রূপ, হৃদয়ে আকুলতা। হৃদয়ের কাছে, অথচ অধরা। এই যে অবস্থা ইহার নাম পূর্ব্বরাগ। ইহা দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রধানতঃ ঘটে।

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

দূতী-বন্দী-সখী মুখে নাম শুনিয়া পূর্ব্বরাগের উদয় হয়। আবার ইন্দ্রজালে, চিত্রে, সাক্ষাৎ বা স্বপ্নে দর্শনের দ্বারাও পূর্ব্বরাগ উদিত হয়।

যমুনার কূলে ব্রজকুলনন্দনের দেখা অবধি রাধার হৃদয় চঞ্চল। নয়নে সেই রূপের নেশা। নয়ন ত আর কিছু দেখিতে চায় না। সে রূপ ভুবন-ভুলানো রূপ। সে রূপ আঁধারে আলোয়, আকাশে বাতাসে ফুলে ফলে পাতায়। যে দিকে নয়ন ফিরান যায় সেই দিকে দেখিতে পাওয়া যায় সেই কালো রূপের নয়ন-ঝলসানো আলো। সেরূপ যাহার নয়নে লাগিয়াছে তাহার মন উদাস। কোন কিছুতে মন বসে না। সর্ব্বদাই সেই রূপময়কে মনে পড়ে।

কৃষ্ণের রূপ রাধার মনকে হরণ করিয়াছে। কৃষ্ণরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া কষিত-কাঞ্চনবরণা শ্রীমতী কালীর বরণ! সব ভুলাইয়া দেয় সেই রূপ। রাধা সকল ভুলিয়া কেবল সেই রূপের ধ্যান করেন। কুল ধর্ম্ম সে ত তুচ্ছ। রূপের আড়ালে সবই গিয়াছে হারাইয়া। এমন রূপ যে তাহা বাহিরের সবকিছু ভুলাইয়া দেয়। কালো গোরার প্রভেদ থাকে না। সর্ব্বদা সেইরূপ হিয়ার মাঝে জাগে। তা বিনা সকলি শূন্য লাগে॥ রূপ দেখিয়া পাগল হইয়া সকলই ডালি দেয় রূপময়ের রাতুল চরণে।

কালো রূপের সৌন্দর্য্যে কোটি কোটি চন্দ্রের সৌন্দর্য্য হারাইয়া যায়। সেই কালো রূপেই ত ভুবন আলো! সেই রূপেই ত জগৎ ভরা। রবি শশী তারা সেই রূপের প্রভায় উজ্জ্বল। এক অঙ্গে কতরূপ!

"নয়ন না তিরপিত ভেল।"

পরিধানে পীতবসন। সেও পীত বর্ণ নয় যেন 'থির বিজুরী মেঘেরই গায়।' সে রূপে অপরের কথা কি নিজে-নিজেই পাগল। সে যে তুলনাহীন রূপ। বর্ষার নবপ্রকৃতি সেই রূপের আভায় রূপময়ী। তাই ত বর্ষার শ্যামল শোভা এত সুন্দর

শরতের ফুল্লকুসুমিত-রজনীর পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না যেন তাঁহারই হাসির মত ঝরিয়া পড়ে।

সেই মোহন মূরতি রাধার হৃদয়ে সদাই জাগে। এখন উপায় কি? শ্যাম মুখ না দেখিলে বাঁচিব না। সে যে অপরূপ।

অচলা চপলা মেঘেরই গায়।
মৃগাঙ্ক রহিতে শশাঙ্ক উদয়॥
নাচিছে ময়ূর জলদ 'পরি।
অলিকুল আছে চাঁদেরে ঘেরি॥

সেই অবধি কালা জপমালা। সংসারের গঞ্জনা তুচ্ছ। লোকে নানা কথা বলে বলুক। যেন 'বঁধুরে না হারাই।'

কালা মানিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে।
কানু অনুরাগ রাঙা বসন পরিব।

আর যোগিনী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিব। আর কিছুই ত চাহি না—চাহি সেই শ্যামল বরণ।

আকাশে ত একটি চাঁদ। যমুনা পুলিনে কদম তলায় কোটি চাঁদের হাট। চাঁদের গাছে চাঁদের পাতা, চাঁদের ফুল, চাঁদের ফল।

'সেইরূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি
পুলক না ভেজই অঙ্গ।'

শুধু ত রূপই অপরূপ নয়! 'বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলী বিনোদ বিনোদ রায়।' বিনোদ গলাতে বিনোদ মালা। তাহারই বা কত শোভা! সেই কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ছাড়া 'না শুনে আন পর সঙ্গ।' কোন উপদেশই কানে প্রবেশ করে না। নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উন্মত্ত।

'বদনে না লয় আন্ নাম।
নব নব গুণগাণে বাঁধল মঝু মনে
ধরম রহিব কোন ঠাম।'

লোকে বলে কালো! তাহারা ত সে রূপ বোঝে না। রূপের পিপাসা ত মিটিল না। মন কেমন হইল। মেঘে ঢাকা অম্বর। শ্যাম বনানী—সবের মাঝে অপরূপের বিকাশ। সেই রূপ মনে এক অনুভূতি আনিয়া দেয়। কি সেই—বুঝি না। অথচ বুঝি তাহার আবির্ভাব। সে যে রসামৃত মূর্ত্তি!

সেই রূপ-সাগর মন্থন করিয়া উঠিয়াছে অমৃত। রাধার ভাগ্যে অমৃত গরল হইয়া জ্বালা বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

'কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জনা।' পরাধীন জীবনে ধিক। 'কানু নাম লইতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী'। রসনা শত্রু। যতই মনে হয় কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিব না, রাধার রসনা ততই কৃষ্ণনামে উতলা।

এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ।
তবুত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।

সে রূপের ঝলক এ পাপ হৃদয়ে কবে পশিবে! কবে সেই রূপের আভায় কলুষ-অন্তরের সমস্ত পাপ কালি দূর হইয়া যাইবে! এমন দিন কি হবে!

—০—

শ্রীশ্রীঠাকুর

শ্রীনীরদলাল সোম

(জেলা জজ—হুগলি)

আমাদের পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর ধর্ম্মক্ষেত্র—ধর্ম্মই ভারতবাসীর জীবনের মূলসূত্র ছিল। ইতিহাস ও আমাদের ধর্মশাস্ত্র তাহার প্রমাণ দেয়। কিন্তু আমরা এখন সেই মূলসূত্র হারিয়েছি, আমাদের মূলমন্ত্র ভুলেছি। আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ঐতিহ্য হারিয়েছি। পাশ্চাত্য জড়বাদের ও বিষয়াসক্তির মোহে আবিষ্ট হয়ে আছি। আমাদের দেশ তথা জগৎ আজ পাপ-তাপে ভারাক্রান্ত। মানুষ আজ মানুষের প্রতি ধরিয়াছে—"যমের মূরতি"।

আমাদের জীবনের এই সন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঁকারনাথ মহারাজের শুভ আবির্ভাব। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের জন্য—ধার্ম্মিকের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতকারীদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার এই আবির্ভাব।

আমাদের মহাসৌভাগ্য যে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের এই বংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এই জেলাবাসীরও সৌভাগ্য যে শ্রীশ্রীঠাকুর এই জেলায় জন্ম নিয়েছেন।

আমাদের আরও সৌভাগ্য যে শ্রীশ্রীঠাকুর এখন নশ্বর দেহে বর্ত্তমান

আছেন। কিন্তু আমার ন্যায় নিশ্চয়ই আরও হতভাগ্য আছেন যাহাদের এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য হয়নি এবং আমরা যারা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে সামান্য কিছু জেনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ কি আমরা জানতে পেরেছি—তাঁকে কি আমারা সত্যই চিনতে পেরেছি?—আমরা স্বরূপভোলা জীব—আমরা কি সহজে শ্রীশ্রীঠাকুরকে চিনতে পারি?

যদিও শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের ন্যায় মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করেছেন, কিন্তু তিনি মোটেই সাধারণ মানুষ নহেন। যে সে মানুষ গুরু হওয়ার অধিকারী নহেন। কে গুরু হওয়ার অধিকারী এবং গুরুর লক্ষণ কি? আমরা শাস্ত্রে গুরুর লক্ষণ দেখতে পাই—

শান্ত দান্তঃ কুলিনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধ বেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্রমন্ত্রবিশারদ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পাঠ করলে এই সবকয়টি লক্ষণ তাঁহার পুণ্যময় জীবনে প্রতিভাত দেখতে পাওয়া যায়। যথা—

(১) শান্ত = অর্থাৎ পার্থিব সুখে যাঁর অনুরাগ নাই।
(২) দান্ত = জিতেন্দ্রিয় ও তপঃক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ. অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে অপারমার্থিক বিষয় হইতে নিরত করিয়া পরমার্থ বিষয়ে রত করিয়াছেন।
(৩) কুলীন = সদ্‌বংশজাত ও সদাচারপরায়ণ।
(৪) বিনীত = অভিমান গর্ব্বাদিরূপ উদ্ধত গুণশূন্য।
(৫) শুদ্ধবেশবান্ = পবিত্র বস্ত্রধারী।
(৬) শুদ্ধাচার = বিধি অনুসারে সন্ধ্যাদি ক্রিয়াদিতে নিযুক্ত।
(৭) সুপ্রতিষ্ঠ = কীর্ত্তিমান্।
(৮) দক্ষ = ধ্যান ও যোগসাধনাদি ক্রিয়াবিদ্।
(৯) সুবুদ্ধিমান্ = সদ্‌জ্ঞান পূর্ণ অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত ভ্রান্তিদ্বারা অভিভূত নহে।
(১০) আশ্রমী = যিনি গৃহস্থ আশ্রমে অধিষ্ঠিত হইয়াও উদাসীন।
(১১) ধ্যাননিষ্ঠ = ভগবানের চিন্তায় অভিনিবিষ্ট।
(১২) তন্ত্রমন্ত্রবিশারদ = সর্বশাস্ত্রবিদ্।

(১৩) নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত=যিনি শাস্তি প্রদানে এবং আনুকূল্য সাধনে সমর্থ।

"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন:"

অর্থাৎ মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলে গুরুদেব উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে তাহাকে মহাদেবও পরিত্রাণ করিতে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভিতর উপরি লিখিত সব কয়টি গুণ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম:॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নম:॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বর:।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নম:॥

সব দেবতার এবং সকল সদ্‌গুণের আধার এই "দেব" সাধারণ মনুষ্য নহেন।

এই গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সন্ধিক্ষণে সর্ব্বসাধারণের দ্বারে "নাম ও নামী অভিন্ন" এই তত্ত্ব নিয়ে উপাস্থিত। আরও বলছেন—

"ওরে তোরা হেলায় শ্রদ্ধায় ভক্তিতে অবিশ্বাসে দিনে রাতে অবিরাম নাম করে যা—তোদের সব দু:খ দূরে যাবে—আনন্দে মন পূর্ণ হবে"।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই কালোপযোগী সহজ ও সরল পন্থা নির্দ্ধারণ করে পাপী তাপীকে উদ্ধারের জন্য সব শক্তি প্রয়োগ করছেন। দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম কচ্ছেন—শুধু মানব কল্যাণের জন্য। তবু কি মোহগ্রস্ত মানব শুনবে না ও বুঝবে না?

আমি প্রার্থনা করি শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বহুবর্ষ তাঁহার অনুভূতির স্বচ্ছ আলোর দ্বারা এই মূঢ় অজ্ঞান দেশবাসীর প্রাণে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিন—এবং সকলে তাঁহার প্রদত্ত নাম গান করে জীবন ধন্য করুন।

—•—

নাসিক-কুম্ভে নাম প্রচার

[কিঙ্কর শ্রীগোবিন্দদাস]

কুম্ভস্নান বা কুম্ভমেলার সংবাদ রাখেন না এমন কোনও হিন্দু বা ভারতীয় অহিন্দু নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে তার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সকলের জ্ঞান সমান নাও থাকতে পারে। বেদ পুরাণেও কুম্ভের বিস্তৃত বর্ণনা আছে সুতরাং কুম্ভ পর্ব্ব অনাদি। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কুম্ভের উৎপত্তি দেখা যায় সমুদ্র মন্থনের সময়। দেব-দৈত্যের দ্বারা সমুদ্র মথিত হলে চারটী অমৃতপূর্ণ কুম্ভ বা কলস উঠে। পাছে অমৃত পানে দৈত্যেরা অমর হয়ে যায় এই আশঙ্কায় দেবতারা ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে ঐ অমৃতকুম্ভগুলি নিয়ে পলায়ন করার নির্দ্দেশ দেন গোপনে। জয়ন্ত কুম্ভ নিয়ে আকাশমার্গে যেতে থাকেন। তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের আদেশানুসারে দৈত্যেরা জয়ন্তের পশ্চাদ্ধাবন করত কুম্ভ ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। দেবগণও অমৃত রক্ষায় কৃতসংকল্প হয়ে জয়ন্তকে সাহায্য করতে চলে যান। সমুদয় দৈত্যও দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বারো দিন যাবৎ ঘোর যুদ্ধ চলে দেব-দৈত্যে। তখন পরস্পর কাড়াকাড়িতে চারটী অমৃতকুম্ভ পৃথিবীর হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিক এই চার স্থানে পড়ে যায়। অমৃতকুম্ভস্পর্শে ঐ চার স্থানের ভূমিও অমরতা অর্থাৎ মুক্তিদায়িনী শক্তি লাভ করে। দেবলোকের বারো দিন পৃথ্বী লোকের বারো বৎসর। সুতরাং বারো বৎসর পর পর উক্ত চার স্থানে কুম্ভ মেলা হতে থাকে। সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি ঘটস্থ অমৃতের যথাক্রমে পতন নিরোধ, ঘটের ভগ্নরাহিত্য ও দৈত্যাপহরণ হতে রক্ষা করেন। সে সময় যে যে রাশিতে অধিষ্ঠান ক'রে সূর্য্য, চন্দ্র ও বৃহস্পতি ঘট রক্ষা করেছিলেন ঠিক ঐ যোগ এলেই প্রতি বারো বৎসর পর পর্য্যায়ক্রমে ঐ ঐ স্থানে কুম্ভ পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় হরিদ্বারে গঙ্গার নির্দ্দিষ্ট স্থান হরকী পেড়ীতে, প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে, উজ্জয়িনীতে শিপ্রার রামঘাটে, এবং নাসিকে পঞ্চবটীস্থ গোদাবরীর রামঘাটে স্নান করলে সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়। কুম্ভস্নানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার শক্তি কারো নেই।

কুম্ভ মেলা সাধুর মেলা। নিরাহারী, বাতাহারী, কল্পজীবী থেকে সুরু করে সকল স্তরের সাধু মহাপুরুষদের প্রায় সকলে কেউ সূক্ষ্মে কেউ স্থূলে কেউ বা প্রচ্ছন্ন ভাবে এসে যোগদান করেন। শ্রেয়স্কামী নিজেদের কামনা পূরণ করেন, অকামী তীর্থের মর্য্যাদা দান করেন এবং তীর্থের তীর্থশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখেন

নিজেদের পাবন পরমাণু শক্তি জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত ক'রে। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব সমস্ত সম্প্রদায়ের এবং উপসম্প্রদায়ের সাধুরা যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে শিবির নির্ম্মাণ করে সাধন, ভজন যোগযাগ কীর্ত্তন বক্তৃতা জনসেবা সাধুসেবায় দিনাতিপাত করেন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভাবে। গৃহস্থেরা তাঁদের দর্শন, স্পর্শন লাভ করে, তাঁদের উপদেশ শ্রবণ করে এবং তাঁদের পবিত্র জীবন যাত্রা লক্ষ্য করে অব্যর্থ শান্তির পথ অনুসরণে তৎপর হন মূর্ত্তিমতী শান্তির এক একটী জীবন্ত বিগ্রহের এ ভাবে সংস্পর্শে এসে। সাধুসেবার ধুম পড়ে যায়। অযাচিত সেবী অজ্ঞাত ভক্তদের পুণ্যসঞ্চয় প্রেরণাই এই সহস্র সহস্র সাধু সন্তদের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ করে দেয় দিনের পর দিন।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মণ্ডলেশ্বর মহারাজেরা এবং মুখ্য মোহান্ত মহারাজরা এ মেলার সাধুদের দিকটা নিয়ন্ত্রণ করেন। সরকার তাঁদের সিদ্ধান্তই মেনে নেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা প্রকার কূট প্রশ্নের মীমাংসা—শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়ে ধর্ম্মকে কালোপযোগী করণ; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধারার মধ্যেও যে মৌলিক একত্ব রয়েছে তার বিশ্লেষণ; এবং উচ্ছাস্ত্রদের বিচার এবং সর্ব্বোপরি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম সর্ব্ববস্তুতে ভগবদ বা আত্মবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করাই সকলের একমাত্র উদ্দেশ্য, তা এঁরা সম্মিলিতভাবে বুঝিয়ে দেন শাস্ত্রপ্রমাণ, আপ্তবাক্য ও নিজেদেয় অনুভব দিয়ে।

লক্ষলক্ষ নরনারীর বিরাট সমারোহ। কোন কোন কুম্ভে ৩৫ বা ৪০ লক্ষ লোকসমাগমও হতে দেখা গিয়েছে। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ এবং পরিষ্কার রাখা, ভাল আলোক চিকিৎসা ও যানবাহনের ব্যবস্থা সরকার সর্ব্বত্র ত্রুটীহীনভাবে করার সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন করেন। বিনা বিজ্ঞপ্তিতে শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে এত লোক সমাগম পৃথিবীর আর কোথায় হয় বলে জানা নেই। এখানেই ভারতের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। ভারতের আকাশে বাতাসে প্রতি ধূলিকণায়, প্রতি মানব মানবীর রক্তের প্রতিটী বিন্দুতে স্থায়ী বাসা নিয়েছে এই আধ্যাত্মিকতা। কালের ক্লেদস্রোত তার গায়ে একটা সাময়িক প্রলেপ দেবার মাত্র প্রয়াস পাবে।

নাসিক কুম্ভের আবার বেশ একটু বিশেষত্বও আছে। সমস্ত কুম্ভ হয় উত্তরায়ণে, নাসিক কুম্ভ দক্ষিণায়ণে ঘোর বর্ষায়—ফলে হরিদ্বার বা প্রয়াগের তুলনায় লোকসমাগমও কম হয়।

তীর্থাণি নদ্যশ্চ তথা সমুদ্রাঃ
ক্ষেত্রাণি চান্যানি তথাশ্রমাশ্চ।

বসন্তি সর্ব্বাণি চ বর্ষমেকং
গোদাতটে সিংহগতে সুরেজ্যে ॥ —ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

বৃহস্পতি সিংহরাশিতে এলে সমস্ত তীর্থ, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, ক্ষেত্র ও আশ্রম একবৎসর পর্য্যন্ত গোদাবরী তটে নিবাস করেন।

ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যবগাহনাৎ।
সকৃদ্ গোদাবরী স্নানং সিংহগতে চ বৃহস্পতৌ ॥ —স্ক পুঃ

বৃহস্পতি যখন সিংহরাশিতে আসেন তখন একবার মাত্র গোদাবরীতে স্নান করলে ষাট হাজার বৎসর গঙ্গাস্নানের ফল পাওয়া যায়।

এরকম বহুশাস্ত্র প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। তবু সব চাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হলো পঞ্চবটীর করুণতম রামকথা। লক্ষ্মণ সূর্পনখার নাক কেটেছিলেন বলে গোদাবরীর দক্ষিণ তট নাসিক। আর উত্তরতট পঞ্চবটীর কুলিশচূর্ণী মৃত্তিকা— এখনো সীতাহরণের মর্ম্মান্তিক স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে আছে। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান রামচন্দ্র সর্ব্বহারা হয়ে জগন্মাতা সীতাকে নিয়ে দুদিন বাস করার জন্য কুটীর বেঁধেছিলেন তাঁরই প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে দিয়ে। দুদিন যেতে না যেতে এখান থেকেই রাবণ ভগবতী জানকীকে হরণ করে নিয়ে যায় লঙ্কায়। ভগবান রামচন্দ্রকে মানুষের চাইতে বেশী একটা কিছু ভাববার মত শুভবুদ্ধি বা বিশ্বাস যাঁদের নেই তাঁরাও এ করুণ কাহিনীর তুলনা খুঁজে পাবেন না কোথাও। মর্য্যাদাপুরুষোত্তম রামচন্দ্রের দৃঢ়তা ভেঙে যায় এখানেই—তাই চোখের জলে ভাসতে ভাসতে পশুপক্ষী তৃণলতাকে "সীতা কোথায় সীতা কোথায়" জিজ্ঞেস করেও জবাব না পেয়ে "হা সীতে! হা সীতে" করে উচ্চ-ক্রন্দনে বনভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে লক্ষ্মণকেও ধৈর্য্যহারা করে দিয়েছিলেন। দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবটী আজ বোম্বাই প্রদেশের একটী আধুনিক জেলা-শহর। গোদাবরীর গর্ভ পর্য্যন্ত কংক্রীট বাঁধানো। কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম পুকুর করে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। অজ্ঞাত চক্র ভুল দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা কচ্ছে সীতা-বিরহীকে—রাম-বিরহী কি ভুলতে পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর মৌন। তাই কুম্ভপর্ব্ব সুরু হয়ে গেলেও আমরা কুম্ভযাত্রা সম্পর্কে উদাসীনই ছিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ দীর্ঘ নীরবতার পর ঠাকুরের পত্র এলো—এখনও নাসিকের কুম্ভমেলার চারিটী স্নান বাকী আছে। যদি সম্ভব হয় ১০।১৫।২০ হাজার অভয়বাণী ছাপিয়ে তোরা ২।৩ জন, এখানকার যদি কেউ যায় নিয়ে গিয়ে শ্রীগুরুদেবের **অভয় আশ্বাস** শুনিয়ে দিয়ে আসতে চেষ্টা করিস্।

দীর্ঘব্যবধানের পর ঠাকুরের পত্র পেয়েই আমরা আনন্দ রাখার যায়গা পাচ্ছিলাম না। সকলে পরামর্শ করে ঠাকুরকে জানিয়ে দিলাম "আমরা সর্ব্বতো-ভাবে প্রস্তুত"। স্থির হলো মাধবদাকে এখানে রেখে সেবানন্দ, কুমার নাথ, ভগবানদাসজী, ও বাংলা থেকে নবাগত কৃষ্ণদাকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়বো। ঠাকুরও তাই অনুমোদন করলেন। কিন্তু যতই ক্ষণ যেতে লাগলো অর্থচিন্তা এসে আমাদের উৎসাহ ভঙ্গ করার প্রয়াস পেতে লাগলো। কৃপাময় ঠাকুর পাছে আমরা অর্থ পেয়ে আরো অনর্থপরায়ণ হয়ে পড়ি তাই তাঁর কোষটাকে শূন্য ছাড়া—প্রায় ঋণগ্রস্ত করে রাখেন। অথচ এতদূরের যাত্রা, ভাড়া, খাওয়া দাওয়া, মাইকের খরচ, মুদ্রণব্যয় প্রভৃতির কি হবে? ভেবে ভেবে ঘুরিয়ে আর একপত্রে আমাদের অভাবের কথা জানালাম। ঠাকুর লিখলেন—"তোদের অভাব কি? প্রয়োজন হয় ভিক্ষা করবি, **কারো কাছে টাকার জন্য লিখবি না।**" ভিক্ষায় তো শুধু তিন মুঠো বা পাঁচ মুঠো চাল নেবার অধিকার আছে। অর্থ সমস্যার সমাধান কি করে হয়? যাক্ কতকটা বিশ্বাস আর বেশীর ভাগ সংশয় নিয়ে ঠাকুরের কাছ থেকে বেরোবার দিনটা জেনে নিয়ে আমরা তৈরী হয়ে পড়লাম। সঙ্গে সমস্ত হিন্দী, গুজরাটী, উর্দ্দু এবং কিছু বাংলা, উড়িয়া ও ইংরেজী বই নেওয়া হলো। মাইকও নেওয়া হলো। ভাড়ার উপর অভয়বাণী ছাপাবার টাকা ছাড়া সামান্য কিছু টাকা অবশিষ্ট রইলো।

৩রা ভাদ্র। বেরোবার সময় যতই ঘনিয়ে আসতে লাগলো ততই অনিচ্ছা উদ্বেগ প্রাণটাকে ভারাক্রান্ত করে তুললো। মাধবদা যথাসময়ে আমাদের আহারাদি করিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর তাঁর শ্রী-যুক্ত নিশান ও প্রণবটাকে বের করে দিলেন। আমরা প্রণাম করে বেরোব। দীর্ঘদিন সঙ্গে থাকার পর ঠাকুরের সান্নিধ্য ত্যাগ, তাঁর আদেশে হলেও, কি রকম মর্ম্মপীড়াদায়ক তা ভুক্ত-ভোগী ছাড়া বুঝবেনা। প্রাণ ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো—জোর করে নিজেদের শক্ত করে আমরা প্রণাম করতে গেলাম। ঠাকুর বসে আছেন তাঁর কুটীরের বারান্দার নর্ম্মদার উপর দেয়ালের গায়ে মৃৎ-নির্ম্মিত হেলান উপবেসন-স্থানের উপর, নর্ম্মদার দিকে পেছন করে। দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ, ভাব রূঢ় যেন জোর করে তাঁর কঙ্কাল-তুচ্ছ দেহটাকে কে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছে—'পালাতে পারলে বাঁচি ভাব।' তাঁর এ ভাব দেখে সঙ্গীদের কি হয়েছিল জানি না, আমার তো এত দুঃখের মধ্যেও ভেতরে ভেতরে হাসি পাচ্ছিল। অন্তরে যাঁর আসন্ন সঙ্গচ্যুত ছেলে কটীর উপর বাৎসল্যের নির্ঝর করচে অশ্রান্তভাবে—বাইরে তাঁর এই নির্ম্মম প্রকাশ তো তাঁর নিছক অভিনয়। আবার ভাবি, না, অভিনয়ও

নয় অভিনয় হলে কি আর ধরতে পারতাম।' অভিনয় তো তাঁর সবই। কোনটাকে আমরা কবে ধরতে পেরেছি। এ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলার প্রকাশ। যখন যেখানে যেটী যেরকম হবার আপনা থেকে হয়ে যাচ্ছে।

যাক্, প্রণামপর্ব্ব শেষ হলো—ফটোও একটী নেওয়া হলো কম্পিত হস্তে। সেবানন্দ নাম ধরলে—আমরা মোট-ঘাট ঝোলা-কম্বল, নিশান, প্রণব কাঁধে করে নাম করতে করতে যাত্রা করলাম পারঘাটার দিকে। মাধবদা জলভরা চোখ দুটী নিয়ে তাকিয়ে রইলেন হাতজোড় করে।

পারের নৌকো তৈরীই ছিল—আমরা উঠে আরোহণ করে নাম করতে লাগলাম। একটী যাত্রী আবার নৌকোতেই নেচে নেচে বাঁশী বাজাতে লাগলো। বাবা একবার আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন কি না দেখার ব্যর্থ-প্রয়াস সকলেই করলাম। সন্ধান কেউই পেলাম না। অবতরণ করে নর্ম্মদাকে প্রণাম করে এবার বাস-ষ্টেণ্ডে এসে টিকিট করে বাস-এ বসে সকলে নাম করতে লাগলাম। বাঁশীওয়ালাও আমাদের পাশেই যায়গা করে নিলে। বেলা দুটোয় বাস ছাড়লো—পাঁচটায় আমরা খাণ্ডোয়ায় পৌছুলাম। মাল পত্র অনেক—তাই কুলি করা হলো। ষ্টেশনের প্লাটফরমে নাম চলতে লাগলো—ঠাকুরকে অনেকেই জানেন তাই ভিড়ও বেশ জমে গেলো। কেউ কেউ ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রশ্ন করতে লাগলেন। বাঁশীওয়ালাকে এখানেও সঙ্গত্যাগ না করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম "আপ কাঁহা জায়িয়েগা"? তিনি মৌন ছিলেন। ইসারায় বোঝালেন "যতদূর যাওয়া যায় তোমাদের সঙ্গেই যাব"। বল্লাম "হামলোগ কুম্ভ যাত্রা কিয়ে হ্যায়—যহাঁ জাওগে?" ইনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। ভাবলাম ঠাকুর আর একটী সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন।

'পাঠানকোট্-এক্সপ্রেস' ৬-৩৮ মিনিটে। কুম্ভের ভিড়—লোকে লোকারণ্য কুলি কিন্তু খুব ভরসা দিলে। ভাবলাম টাকাও দাবী করবে তদ্রূপ অন্তিম মুহূর্ত্তে। যাক্ ট্রেন এলো। স্থান নেই—স্থান নেই রব। বহু কষ্টে একটা কামরায় যদি বা আমি প্রবেশ করলাম—মালপত্র বা সঙ্গীদের ব্যবস্থা করার সম্ভাবনা রইলো না। অবশেষে সেই কুলির অক্লান্ত চেষ্টায় আর জনৈক অপরিচিত রেলকর্মচারীর সাগ্রহ প্রয়াসে আমাদের মালপত্র সহ বসার স্থান হয়ে গেল একই কামরায়। কুলিকে কত দোব জিজ্ঞেস করায় সে বললো "মহারাজ ক্ষমা কীজিয়ে পইসা ময় নেহী লুগা। আপলোগ মুঝে আশীর্ব্বাদ দিজিয়ে।" অধিকন্তু হাতে কিছু পয়সা নিয়ে গাড়ীর ভিতর হাতটী ঢুকিয়ে দিয়ে বললো "কুছ চা পীজিয়ে"। তার পয়সা ফেরৎ দেবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

নাম চলতে লাগলো—আরোহীদের অভয়বাণী দেওয়া হলো, কেউ কেউ এসে নামে যোগদানও করতে লাগলেন। অথচ এঁরাই আমাদের প্রবেশ পথে মুষ্টিধারণ করে পথ রোধ করে রেখেছিলেন।

বংশীধারী এবার কথা কইলে। সে রবিবারে দিবা মৌন থাকে; নাম প্রহ্লাদ, বাড়ী উজ্জয়িনীর কাছে, জাতিতে ক্ষত্রিয়। আমাদের সঙ্গ তার খুব ভাল লাগচে। এক জায়গায় টিকিট্ পর্য্যবেক্ষণকারী অন্যান্য টিকিটহীনদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রহ্লাদটীকেও নামাবার সময় তাঁর পক্ষ হয়ে আমরা একটু অনুরোধ করায় বাবুটী তাকে রেহাই দেন, তাতে তার আগ্রহ আরো একটু বেড়ে যায় আমাদের উপর, এবং অধিকতর উৎসাহ সহকারে নাম করতে থাকে। তবে যাত্রীরা যখন আমাদের টাকা পয়সা দিতে এসে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যান তখন সেই সব অর্থের সদ্ব্যবহারের দিকে তাঁর ঝোঁকটাকে সামলাতে পারেনি। অবশ্য পরে আমাদের মৃদু তিরস্কারে লোভ সংবরণ করে ফেলে।

রাত ১টায় আমরা মানমাড় জংশনে অবতরণ করি। মানমাড়েরই টিকিট আমাদের নেওয়া হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ঠাকুর তাঁর পত্রে "জানি তোদের কারো সাহায্যের অপেক্ষা করে না" লিখেও "পুরঞ্জয়ের মামাতো ভাই নাসিকে আছে"—এবং তাঁর কর্ণাটীক শিষ্য নাসিক-সন্নিকটস্থ উগাউ-এর ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীএন্, ভি, কুলকার্ণীর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে জানিয়েছিলেন। তাই পত্রের বেলা সকলকে শ্রীসুবোধদার ঠিকানায় পত্র দিতে বলেছিলাম। এবং যাবার পথে গুরুভাই কুলকার্ণীজীর বাসায় নামবো বলে স্থির করে রেখেছিলাম। উগাউ ছোট ষ্টেশন—মেল এক্সপ্রেস সেখানে দাঁড়ায় না।

মানমাড়েও একটি কুলি টাকা পয়সার নামগন্ধ না করে আমাদের সমস্ত মালপত্র সহ একটা প্রায় জনশূন্য কামরায় স্থান করে দিয়ে গেল। এত মালপত্র ছয় আনা মাত্র পয়সা ওকে দিলাম। আনন্দ সহকারে গ্রহণ করে প্রণাম করে সে চলে গেল। যাবার বেলা বলে গেল "সাধুর কাছে থেকে আমি কিছু নিই না—স্বেচ্ছায় কিছু দিলে তাতেই তৃপ্ত থাকি। সাধুর আশীর্ব্বাদে সব হয় এবং তাতেই আমি বড় সুখে আছি। প্রয়োজন হলে বলবেন আমি জল ও অন্যান্য জিনিষ এনে দেবো।"

শূন্য কামরা পেয়ে আমরা আরতি শেষ করে কিছু চিড়াকলার প্রসাদ পেয়ে শুয়ে পড়লাম। ভোরে ট্রেন উগাউ ষ্টেশনে থামলেই দেখা গেল কুলকার্ণীদা লোক সহ এসে কামরার সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের সকলকে মাটীতে মাথা

ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগলেন। তাঁর লোক তাঁর নির্দ্দেশে মালপত্র নামাতে লাগলো।

আমরা কুলকাণীদার বাসায় গিয়ে দেখি আগে থেকেই তিনি সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। উন্নত সাধক—১৫ বৎসর ধরে একাকীই বাস কচ্ছেন। নাম চলতে লাগলো—পালাক্রমে আমরা শৌচাদি সেরে নিতে লাগলাম। কুমার নাথ গেল রান্নায়। এদিকে সারারাত্রি জাগরণের পর ভাবলাম দাদার বাসায় খুব খানিকটা ঘুমিয়ে নোব সকলে। দাদাটী কিন্তু সে পথ আগে থেকেই বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। আশে পাশের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আবাল বৃদ্ধ নরনারী দলে দলে এসে প্রণাম করে যেতে লাগলেন। প্রসাদ দেবার জন্য একটী চিনির বাটী কুলকার্ণিদা আগে থেকেই পাশে রেখে দিয়েছিলেন—তা থেকেই সকলের হাতে হাতে একটু একটু দিতে লাগলাম। ভাষা সকলের মারাঠী। বোঝবার উপায় নেই। যাঁরা হিন্দী জানেন তাঁদের সঙ্গে হিন্দীতে আলাপও চলতে লাগলো। গ্রাম গ্রাম থেকে প্রার্থনা আসতে লাগলো—২।১ দিন করে তাঁদের গ্রামে নামপ্রচার করার জন্য এবং ঠাকুরকে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য। বুঝলাম কুলকাণীদা আশ পাশ মাতিয়েছেন ভাল। যাক্ ভোগারতির সঙ্গে সঙ্গে দাদাকে বলে দিলাম—সকলের বিশ্রামের প্রয়োজন রাত্রি জাগা এবং ক্লান্তি দুই-ই আছে। ভোগান্তে দরজা বন্ধ করে দিতে হবে।

আরো কয়েক জন, কুলকার্ণিদার সহকারী মাষ্টারমশাইসহ, সেদিন একসঙ্গে প্রসাদ পেলেন। আমরা কম্বলে কম্বলে শুয়ে পড়লাম। কথা হলো নাসিক যাবার ট্রেণ বিকেল—৩টায়, যথাসময়ে ডেকে দেওয়া হবে। দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হলো। সকলে নিদ্রিত হয়ে পড়লাম।

একে রাত্রি জাগরণ তার উপর কুমারনাথজীর পাকা হাতের প্রস্তুত কুলকাণীদার চর্ব্ব্য চুষ্য-লেহ্য-পেয়ের সদ্ব্যবহার, তাই শুতে না শুতে গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলাম আমরা সকলে। কাণের গোড়ায় বড় করতালের ঝনঝনানি শুনে যখন ঘুম ভাঙলো চোখ চেয়ে দেখি কুলকার্ণিদার এ কীর্ত্তি। কটা বেজেছে—জানতে চাইলে বললেন "২টা ১৫ মিনিট।" "এত আগে ঘুম ভাঙ্গালেন কেন?"

"বহুলোক বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা কচ্ছে আপনাদের দর্শন প্রণাম করবে বলে—উঠুন।"

আবার উঠ্‌লাম—চোখে জল দিয়ে জোর করে মুখে প্রশান্তভাব আনার চেষ্টা করে ঠাকুরের কীর্ত্তি অবলোকন করতে লাগলাম। ঠাকুরের কীর্ত্তি এইজন্য

বলছি—এক পত্রে ঠাকুরকে এমনিভাবে লিখেছিলাম—যিনি শিষ্য অশিষ্য বহুলোকের কাছে অবতার বা তার চাইতে বড় আরো কিছু বলে পরিচিত—যিনি একজনের আকস্মিক ইষ্টদর্শনাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার কথা শোনামাত্র একজনের জায়গায় কয়েক জনকে দেশ কাল বিচার না করে ইষ্টদর্শন করিয়ে ছিলেন—এবং বহুলোককে ডেকে ডেকে ইষ্টদর্শন করাবার জন্য আহ্বান করে বেড়িয়েছিলেন তাঁর ইষ্টদর্শনের অজুহাতে সহস্র সহস্র লোকের মনে ব্যথা দিয়ে—এ মৌনাবলম্বন কিসের জন্য ? জবাবে তিনি লিখেছিলেন—"এবার ভারতের সর্ব্বত্র সূক্ষ্মে কাজ হচ্ছে"। তাই এ অহেতুক লোকসমাগমকেও তাঁর সূক্ষ্মশক্তি সঞ্চারণের ফল বলেই অনুমান করছিলাম। তবে আমার মত সন্দিগ্ধচেতার সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সময় লাগবে।

যাক্, আবার দলে দলে স্ত্রীপুরুষ আসতে লাগলেন—প্রণাম ও প্রসাদ দানের অভিনয় চলতে লাগলো—ইতোমধ্যে ট্রেণ এসে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে গেলো। মালপত্র আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কুলকাণিদা সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সকলকে পুনরায় একটু একটু দুধ খাইয়ে সহযাত্রী হয়ে চললেন আমাদের সঙ্গে। টীকিট-ও তাঁর পয়সায়ই তিনি কেটে রেখেছিলেন। নাম করে করে একঘণ্টার পথ অতিক্রম করে আমরা নাসিক রোডে অবতরণ করলাম। কুলকাণীদাই কুলি মালপত্র নেওয়ার ও যানবাহনের ব্যবস্থা করতে গেলেন, আমরা নাম করতে লাগলাম। টাঙ্গা ঠিক হলো তিনখানা। আমরা ষ্টেশন থেকে বেরোব এমন সময় একটী মায়ী এসে বললেন "কলেরার 'ইনজেকসন' নিতে হবে, দাঁড়ান।" ইনোকুলেশান সার্টিফিকেট সঙ্গে আছে"—বলতে তিনি আর দেখার আগ্রহ না করেই বিশ্বাস করে আমাদের ছেড়ে দিলেন। টাঙ্গায় উঠবো এময় সময় আর একজন ভদ্রলোক এসে বললেন "আপনারা ক মূর্ত্তি ? আমরা নাসিকে আপনাদের ভোজনের ব্যবস্থা করবো ?" আমরা "প্রয়োজন নেই" বলে টাঙ্গাওয়ালাকে টাঙ্গা ছেড়ে দিতে বললাম। আবার নাম চলতে লাগলো। নাসিক আমাদের পরিচিত যায়গা হলেও যেন একটু নতুন নতুন ঠেকতে লাগলো। টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে চলার পথেই শ্রীসুবোধদার কর্ম্মক্ষেত্র কারেন্সী নোট প্রেসটী চিনে নিলাম।

স্থানমাহাত্ম্যের প্রকৃত পরিচয় তখনই পাওয়া যায় যখন গুরুনির্দ্দিষ্ট সাধন সহকারে গুরুনির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়া যায়। কর্ম্মের সাফল্য বৈফল্যও নির্ভর করে গুরুর নির্দ্দেশ নেয়া না নেয়ার উপর। জয়গুরু নিশান এবং সদণ্ড-প্রণবসহ টাঙ্গায় টাঙ্গায় যখন আমরা আমাদের বেসুরো রাগিণীতে নাম করে যাচ্ছিলাম—

অগণিত পথচারী এবং যানারোহী সাধু সঙ্ঘের সহজপ্রাপ্য পাবনদর্শনে উদাসীন থেকেও দুপাশের ভদ্রাভদ্র-মধ্যম নানা স্তরের নরনারীকে দেখা গেছে—তাঁরা একদৃষ্টে প্রণব-নিশান এবং নামের দিকে তাকিয়ে আছে। পটু যাঁরা তাঁরা আবার এরই মধ্যে প্রণাম এবং ত্বরিৎ প্রশ্নে ত্বরিৎ জবাব আদায় করে নিয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

—•—

পাতিব্রত্য

[শ্রীমতী শৈলবালা দেবী]

"কার্য্যেষু মন্ত্রী করণেষু দাসী ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষময়া ধরিত্রী।
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু বেশ্যা রঙ্গে সখী লক্ষ্মণ সা প্রিয়া মে॥"

রাক্ষস রাবণ শ্রীসীতাকে হরণ করার পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়াছিলেন। স্বামী ও স্ত্রীর এই ভাবের সম্বন্ধ। স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের একমাত্র স্বামী সেবাদ্বারা সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। স্ত্রীলোক স্বামী লাভ করিয়া কিভাবে গ্রহণ করিবে? পিতা কন্যা স্বামীকে দান করিলেন। নয় দশ বৎসরের একটি বালিকা স্বামীকে পাইল। তাহার নিকট শিখিতে লাগিল সবই ভাবের খেলা। ছোটটি অনুরাগের সহিত স্বামীকে ভালবাসিতে লাগিল। 'স্বামী আমার গুরু, প্রিয়তম, তাহার অপেক্ষা আমার আপন জন কেহ নাই'—সনাতন ধর্ম্মের স্ত্রীলোকের জন্য এই শিক্ষা। পিতামাতা প্রথম হইতেই এইভাবে শিক্ষা দিতেন। পাতিব্রত্য ধর্ম্মের বীজ কন্যার মনে বিবাহ সংস্কারের সময় স্বামী বপন করিয়া দিতেন। বিবাহের মন্ত্রেই সব আছে, কিরূপ আচরণে স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বস্বরূপে পাইবে। স্বামীগৃহে শ্বশুর শাশুড়ীর, দেবর ননদের, স্বামীর গৃহপালিত পশ্বাদির সেবার মধ্য দিয়া, স্বামীর সব ব্রত একমনে তাহার সঙ্গে পালন করিয়া, ভালবাসার পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের মনে ঐ স্বামীপরায়ণতার ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ঐ ভাব যত বাড়ে ততই তাহার প্রাণ আনন্দে ভরপুর হয়। এমনকি মনে প্রাণে স্বামীকে সে এতই আপনার সাথে মিশাইয়া ফেলে যে স্বামীর হাবভাব, স্বামীর ভাষা, স্বামীর চাল-চলন স্বামীর অনুরূপ সবই তাহার নিজেরও হইয়া যায়। নিজের বলিতে স্ত্রীর কিছুই থাকে-না।

মা জানকী নিজের জীবনে এইটি পূর্ণমাত্রায় দেখাইয়া গিয়াছেন। বিবাহের কিছুকাল পরেই শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন। অভিষেক না হইতেই

শ্রীরামকে পিতার আদেশে বনবাসে গমন করিতে হইল। ঐ সময় মা সীতা শ্রীরামের সঙ্গে বনে যাইতে চাহিলেন। শ্রীরামচন্দ্র প্রথমে বনবাসের ক্লেশ উল্লেখ করিয়া সীতাকে কত করিয়া বুঝাইলেন। মা সীতা কিছুতেই রামশূন্য রাজ্যে রাজগৃহে সুখে থাকিতে চাহিলেন না। মা সীতা শ্রীরামকে একটু দৃঢ় বাক্যেই বনবাসে তাহাকে সঙ্গে রাখিতে রাজি করাইলেন। কেননা স্বামী ছাড়া কোন পার্থিব সুখই নারীর সুখ হইতে পারে না। রামায়ণে বহুস্থানে বহুভাবের ব্যবহার দ্বারা মা জানকী জগৎকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম কিরূপ এবং কিভাবে উহা পালন করিতে হয় তাহা শিখাইয়া গিয়াছেন। রাক্ষস বধ করিয়া যখনই শ্রীরাম আশ্রমে আসিতেন মা সখীর ন্যায় শ্রীরামকে জড়াইয়া ধরিয়া, রক্ত মুছাইয়া দিতেন, ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়া তাঁহার কষ্টের লাঘব করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূট হইতে দণ্ডকবনে যখন প্রবেশ করেন সীতা অতি বিনীতভাবে—মন্ত্রী যেমন সৎমন্ত্রণা দেয় সেইভাবে—তাঁহাকে বলিলেন, "বনে বহু রাক্ষসবধে বহু হিংসা হইবে, অকারণ প্রাণীবধে অধর্ম্ম হইবে, ইত্যাদি। কথাগুলি রাম শুনিলেন। রাম ক্ষত্রিয় সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম প্রজার রক্ষা, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। এই শাস্ত্রবাক্য দ্বারা মাকে বুঝাইলেন। সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য সকল প্রকারে পতির পূজা করা। তবেই সেই পূজায় সিদ্ধি লাভ হয়। স্বামীর নিকটই সব পাওয়া যায়। নিজের আত্মদানই এই পূজার ফুল।

স্ত্রী জায়া। স্বামীই পুত্ররূপ গ্রহণ করেন। স্নেহরসে পুত্রের লালন পালনে বাৎসল্যভাবের পূজা। বাৎসল্যভাব কত সুন্দর! পুত্র স্বামীমূর্ত্তিরই অপর একটি বিগ্রহ ধরিয়া যেন স্ত্রীর মাতৃভাব ফুটাইবার জন্য এই জীবজগতে লীলা করিতেছেন। অনন্ত সৃষ্টিতে জীবগণ এই মধুরভাব নিয়া খেলা করিতেছেন। যদি জ্ঞানে এইভাব অনুভবে আসে আরও কত মধুর হয়। সতী স্বামীকে জীবন মন প্রাণ ইন্দ্রিয় সব দিয়া সেবা করিয়া তৃপ্তি পাইতেছে। আবার যদি দৈবাৎ স্বামীর দেহ চলিয়া গেল তবুও তাহার বাহিরের পার্থিব দেহ যায় বটে, ভাবধারায় সতী স্বামীরই থাকিয়া যায়, কেন না বিধবা হওয়ার সাথেই,—যাহার জন্য তাহার সব, সে চলিয়া যাইবা মাত্র, এই জগতের কোন ইন্দ্রিয়সুখ তাহার আর ভাল লাগেনা। বহু অভ্যাসে জ্ঞানীমানুষ তপস্যাদ্বারা যাহা লাভ করেন সতী তাহা এক মুহূর্ত্তে অর্জ্জন করেন। ইহা এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালনেরই ফল। প্রকৃত সতী স্ত্রীলোক আজিও জগতে এত পবিত্র। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সতীর সাথে তাঁহার তুল্যতা। গভীর ভাবের দ্বারা আমাদের এই সনাতন ধর্ম্মের ধারা আজিও চলিতেছে। গ্লানি খুব বেশীভাবে আসিতেছে সত্য, তবুও এ ধর্ম্ম

সনাতন। সনাতন যাহা তাহা চিরদিন থাকিবেই। সুধী সমাজের উপরে কালের বিপ্লবের ঢেউ চলিয়া যাইবে। কত শুম্ভ নিশুম্ভ, কত রাবণ কুম্ভকর্ণ, কত কত অসুর গত হইল জগন্মাতা জগৎপিতার—বাবা মায়ের সৃষ্টি প্রবাহ যেমন তেমনই চলার পথে চলিতেছে। লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া দৃঢ়ভাবে ভাবের সহিত যাহার যে ভাবের উপাসনা তাহা ঠিকমত করিলেই ভাবময়ের রাজ্যে পৌঁছান যায়। ইহা কোন কালেই কঠিন নহে। শুধু চাই ঠিক ঠিক ভাবে করা। অত্রিপত্নী পতিপরায়ণা অনসূয়া দেবী মা জানকীকে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন। মা নিজে ঐ ব্রত রক্ষা করিয়া রাক্ষসপুরীতে রাক্ষসবেষ্টিতা মা রাবণকৃত কত অত্যাচার সহ্য করিয়া শ্রীরামকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া পুনরায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিতা হইয়া কৃতার্থা হইয়াছিলেন. জগৎকে লীলা দর্শন করাইয়া কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধান্তে অগ্নিপরীক্ষা কালে, মুনিসমাজে বনবাস সময়ে, ধরণী প্রবেশের পূর্ব্বে রাজসভায়—শ্রীরামচন্দ্রের কঠোর উক্তি কঠোর আদেশ শ্রীরামগতপ্রাণা ধরিত্রীর ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন। বনবাস কালে যিনি শ্রীরামকে যথালব্ধ ফলমূল মৃগমাংসাদি খাদ্যদ্রব্য দ্বারা মাতার ন্যায় যত্নে তুষ্ট রাখিতেন, মধুর কথালাপে বনবাসদুঃখ মনে আসিতে দিতেন না, সেই পতির কঠোর রাজশাসন মাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। সতী পতি-নারায়ণের ধ্যানে এত তন্ময় থাকেন যে বিষয়কামরূপ রাবণের সংসারে আবদ্ধ থাকিয়াও পতিধ্যানের দ্বারা, গোবরে পোকা যেমন কাচপোকার ধ্যান করিয়া করিয়া কাচপোকা হইয়া যায়, সতীও সর্ব্বদা নারায়ণধ্যানে নারায়ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়—ইহাই আমাদের শাস্ত্রের বিধান ও শিক্ষা।

এখনও কত কষ্ট সহ্য করিয়া কত কুলরমণী সতীত্বের মহিমার তেজে কত বিপথগামি স্বামীকে তপস্যার দ্বারা দেবত্বের পথে স্থাপিত করিতেছেন। ঘোর কলিকালেও এই ব্যাপার দৃষ্ট হয়। তবে সংখ্যা ক্রমশঃ বিরল হইতেছে। তবুও দুঃখ করার কিছুই নাই। শ্রীশ্রীঅধ্যাত্মরামায়ণে মা জানকী নিজেই বলিয়াছেন "আমিই সব করিতেছি।" কাজেই যতই মায়ের খেলা কঠোরভাবে আসিবে সেত মায়েরই খেলা! ভয় পাইবার কিছুই নাই। যুগে যুগে ধর্ম্মের গ্লানি হইলেই মা আসেন, ভক্তের কাতর প্রার্থনা মা শুনেন। আজ সতী ধর্ম্মের বিপ্লব। মা আসিবেন ঠিকই, যে দুএকজন এই দুর্দ্দিনেও এই ব্রত ধরিয়া আছেন তাঁহাদের পুণ্যে তাঁহাদের ডাকেই মা আসিবেন। বড়ই কঠিন দিন আসিয়াছে। যেখানে বিবাহসংস্কার ছিল নারীর ঐহিক ও পারমার্থিক কল্যাণের পথ, জীবন সার্থক করার সম্বল; সেই বিবাহ এখন দেহের ভোগের একটা সর্ত্ত মাত্র। সম্প্রতি

এক ভাল ব্রাহ্মণ পরিবারের ঘরে, নারায়ণ সাক্ষী করিয়া বিবাহ হইবার পূর্ব্বে, বিবাহ রেজেষ্টরি করিয়াছে। ইহা যে কত দুঃখের তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। যে দেশে পতিই স্ত্রীর দেবতা ; সতীর মাহাত্ম্য যে দেশের প্রাণ ; সতী-সাবিত্রী জানকীর সেই দেশে আবার 'পতিনারায়ণ ব্রত' সকল রমণী পালন করুন—এই প্রার্থনা করি।

—০—

সংবাদ

গিরিবালা-আশ্রমে (বাতনা, হুগলি) আষাঢ় মাস হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিত নামসংকীর্ত্তন হইতেছে। অন্যান্য উৎসবগুলিও এই আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষ্যে নামকীর্তন, পূজাপাঠ, নরনারায়ণ সেবাদির ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রম প্রতি কার্য্যে ইঁহাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা লাভ করে—শ্রীঋষিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগৌরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, শ্রীতারাপদ মণ্ডল, শ্রীবাসুদেব কুমার। শ্রীমহাবীর কিঙ্কর আশ্রমের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

* * * *

১৮ই আশ্বিন শ্রীসিদ্ধেশ্বর সামন্ত (প্রেসিডেণ্ট—ইউনিয়ন বোর্ড, বিজুর, বর্দ্ধমান) মহাশয়ের বাসভবনে উদয়াস্ত নামযজ্ঞ হয়। পার্শ্ববর্ত্তী জয়গুরু সম্প্রদায় ও অন্যান্য ভক্তগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সহস্রাধিক নরনারায়ণ অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

* * * *

শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায় বহুস্থানে দুর্গাপূজা এবং সেই উপলক্ষ্যে নামযজ্ঞ নর-নারায়ণ সেবাদির ব্যবস্থা করেন। এই সকল স্থানের কার্য্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি—(১) জয়গুরু আশ্রম—বেলুন, হুগলি। (২) শ্রীশ্রীদাশরথি মঠ—কলাপুকুর, বর্দ্ধমান। (৩) শ্রীপঞ্চানন আশ্রম—সোৎখালি, বর্দ্ধমান। (৪) মহানন্দ-ভবন—পাড়াতল, বর্দ্ধমান।

* * * *

২৯শে আশ্বিন পূজ্যপাদ ৺পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়ের বার্ষিক তিরোভাব-তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীপঞ্চানন-আশ্রমে (সোৎখালি, বর্দ্ধমান) নামযজ্ঞ ও নরনারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ই কার্ত্তিক এই আশ্রমে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

স্থানীয় ভক্তগণের সহায়তায় অনুষ্ঠান সমূহ সুসম্পন্ন হয়।

*　　*　　*　　*

শ্রীশান্তনু প্রকাশ গুপ্ত মহাশয়ের ছোট-বালিভাঙ্গাস্থিত (বর্ধমান) ববদাভবে ১৩৬২ সালের ২৯শে আশ্বিন হইতে প্রতি রবিবার রাত্রে এবং শ্রীত্রিবেণীনাথ বা মহাশয়ের শ্রীপল্লীস্থিত বাটীতে ১৩৬২ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে নিয়মিত নামকীর্ত্তন হইতেছে।

*　　*　　*　　*

১৪ই আশ্বিন কলিকাতা—'নূতনবাজার-সাধন সমিতি' মাকড়দহ (হাওড়া গ্রামে শ্রীশ্রীনামপ্রচার করেন। এই পল্লীর শ্রীগোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ে বাসভবনে চতুষ্প্রহর অবিরত নামযজ্ঞ হয়। মধ্যাহ্নে বহু নরনারী অন্নপ্রসা গ্রহণ করেন। নামপ্রচারে ইঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—শ্রীশচী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যা মহাশয়ের পুত্রগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি।

*　　*　　*　　*

২রা কার্ত্তিক শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়ের এই দুই আশ্রমে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও সে উপলক্ষ্যে নামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়—(১) শ্রীগুরু আশ্রম—কাঞ্চনপুর বাঁকুড়া (২) শ্রীশ্রীদাশরথি মঠ—কলাপুকুর, বর্ধমান।

*　　*　　*　　*

শ্রীশৈলেন্দ্র মোহন কর (ববাটিয়া, ময়মনসিং) মহাশয়ের বাটীতে কয়ে বৎসর প্রতিরাত্রে নামকীর্ত্তন হইতেছে। প্রতি বৃহস্পতিবারে গুরুপূজায় শ্রীশ্রী ঠাকুরের গ্রন্থাদি পাঠ করা হয়। সকল অনুষ্ঠানেই বহু নরনারী যোগদান করেন

*　　*　　*　　*

শ্রীভক্তিভূষণ সরকার (বিবিগঞ্জ, মেদিনীপুর) মহাশয়ের বাসভবনে ১ল কার্ত্তিক হইতে ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রত্যহ শেষরাত্রি ৪টা হইতে প্রাতঃ ৬টা পর্য্যন্ত নিয়মিত নামকীর্ত্তন হয়।

—০—

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা

দেবযান

পৌষ ১৩৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

—০—

প্রেমগাথা

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

আমি তোকে ছাড়বো না!

আমি যদি তোমার ডাকে সাড়া না দিই? অন্য মনে অন্য কাজ করি—তা হলেও তুমি ছাড়বে না?

না, আমি তোর কাজ শেষ হবার অপেক্ষা করব।

তুমি অভিমান করে চলে যাবে না?

যাব কোথায়! তোর হৃদয়কমলই যে আমার থাকবার জায়গা।

আমি যে হৃদয় থেকে অনেক দূরে—লেখাপড়ার মধ্যে 'আমি'কে হারিয়ে ফেলেছি।

তুই যেখানে যাবি সেখান থেকে টেনে আনবো।

আমি যদি অন্যায় কাজ করি ?

তোর অন্যায় কাজ করবার শক্তি নাই।

সেকি, আমি মানুষ, আমার অন্যায় কাজ করবার শক্তি নাই, কি বলছো তুমি ?

আমি সে পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করেছি।

আহা, এত কৃপা তোমার আমার উপর !

কৃপা তোর জন্য করিনি, আমার প্রয়োজনে আমি করেছি।

ভাল, আচ্ছা এত লেখাপড়া একি ? তুমি এসে ডাকছো বুঝ্ছি, এখনি যদি এদিক ছেড়ে দিই তোমাতে ডুবে যাই, কৈ তাতো ছাড়্তে পারছিনা, কেবল লিখ্ছি।

লেখা তোর জন্য নয়, আমার প্রয়োজনে তোর দ্বারা লেখাচ্ছি।

তোমার প্রায়োজন ?

হাঁ, আমার প্রায়োজন। তোকে যা দিয়েছি আরও অনেককে দোবো বলে তোর দ্বারা লেখাচ্ছি।

তবে আমি লিখি ?

হাঁ লেখ্।

অভিমানে, উপেক্ষিত হয়ে চলে যাবে না ?

আমি তোর কাগজ, কলম, মন, দৃষ্টি, হাত—সব, কোথায় যাবো !

আহা, এই ডাকছো মনে হচ্ছে, এখনি ডুবে যেতে পারি যদি না পড়ি লিখি।

পড়িপড়ি কর্ছিস আর পড়তে পারছিস্ ?

না, তাতো পার্ছিনা, একে একে গীতা গুরুগীতা রামায়ণ চণ্ডী ভাগবত উপনিষৎ সব পড়া বন্ধ করে দিলে।

এমনি করে যেদিন প্রয়োজন বোধ কর্বো লেখাও কেড়ে নেবো। তুই শুধু এইটুকু মনে রাখ্বি তুই যন্ত্র।

আমি এই থাই-হারানো মনের দ্বারা তাওতো পারবো না।

আচ্ছা, তোকে কিছু কর্তে হবে না তুই শুধু লিখে যা—আমি তোর মন কলম কাগজ।

উত্তম—আমি যা তা লিখে্বো।

সে সাধ্য তোর নাই, এমন কোন কথা তোর লেখনী দিয়ে বের কর্বো না যাতে আমার জীবের কল্যাণ না হবে। লেখ তুই যত পারিস্ লেখ্।

কি লিখ্‌বো?

যা তোর ইচ্ছা হয় লেখ।

তুমি কে?

আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না?

না।

কেন আমি তোর মধ্যে থেকে 'জয়গুরু' 'সোঽহং' আরও কত রকম অরব-রবে তোকে ডাক্‌ছি।

ওটা রোগ যদি বলি?

সাধু বাক্য শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে দেখ, তাহলেই তুই বুঝ্‌তে পার্‌বি।

তাতো দেখ্‌ছি, স্ফোটরূপ, তোমার ঐ স্ফোটই সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্ম, কিন্তু ওতে আমি তৃপ্ত নই।

তুই কিসে তৃপ্ত হবি?

এই চোখে তোমায়, মানুষ যেমন মানুষকে দেখে এমনিভাবে দেখ্‌লেই আমার আশা পূর্ণ হবে। ধ্যানে নয়, দিব্যচক্ষুতে নয়, সমাধিতে নয়, এইচোখে তোমাকে দেখ্‌তে চাই।

যদি সে ভাবে দেখা না দিই?

মৌন ত্যাগ কর্‌বো না।

মৌন ত্যাগ করা না করার শক্তি তোর আছে?

না, তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমার এমন কোন শক্তি নাই যে এটা কর্‌বো এটা কর্‌বো না বলে আমি দৃঢ়ভাবে থাক্‌তে পারি। মৌন ত্যাগ করবো না বল্‌ছি, তুমি ইচ্ছা কর্‌লে এখনই মৌন ত্যাগ করাতে পার। আমার কথা আমি নিবেদন কর্‌লাম, তারপর তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। তবে আমি তোমার শরণাগত এ কথা যতক্ষণ বাক্‌ থাক্‌বে মন থাক্‌বে বল্‌বো।

তুই কিরূপে দেখ্‌বি।

তা আমি জানিনে, আমি মা বল্‌তে ভালবাসি। তোমার তৃপ্তি যে রূপে হয় সেই রূপে দেখা দিও।

আমার তৃপ্তিতো তোর হৃদয় নিয়ে।

হাঁ, তবে এটা ঠিক আমি তোমার নির্গুণ নিরাকার রূপের সেবক নই। আমি তোমার লীলাবিগ্রহধারী রূপই দেখ্‌তে চাই।

একটা রূপের নির্দ্দেশ করে বল্‌, রাম, কৃষ্ণ, শিব, লক্ষ্মী, দুর্গা, সীতা এর মধ্যে কোন রূপ দেখ্‌তে চাস?

সবরূপই দেখ্‌তে চাই যদি বলি।

সব রূপে দেখা পাবি না, একটি নির্দ্দিষ্ট করে বল্‌।

আমি জানিনে, তুমি অন্তর্য্যামী তুমি আমার অন্তরের ভাব বুঝে এসে দেখা দাও।

যেমন ভবে চাচ্ছিস এভাবে যদি দেখা না দিই।

মৌন ত্যাগ তুমি করিও না, করবো না বল্‌বার সাধ্য আমার নাই, তুমি এই মৌন অবস্থাতেই তোমার শ্রীধামে টেনে নিও, অথবা তোমার যেখানে ইচ্ছা সেইখানে নিয়ে যেও। মোট কথা দেখা এবার এই চোখে চাই।

মানুষ এই পার্থিব চোখের দ্বারা আমায় দেখ্‌তে পায় তুই বিশ্বাস করিস্‌?

খুব করি! আমি বালক ছিলাম সত্য, তথাপি আমার বেশ মনে আছে তুমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলে; আমি যেখানে শুয়েছিলাম; কোনটিও ভুলিনি। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, অবিশ্বাস কর্‌বো কি করে!

কোন্‌ সাধনার বলে আমায় দেখেছিলি?

আমার ইহজন্মকৃত কোন সাধনা ছিলনা, তোমায় দেখ্‌বার আগ্রহও ছিল না, তুমি অহৈতুকী কৃপা করে আমায় দেখা দিয়েছিলে।

আমার অহৈতুকী কৃপার ভাণ্ডার কি রিক্ত হয়ে গেছে মনে করিস?

না, না। তা করিনা, তুমি যখনই ইচ্ছা কর্‌বে তখনই দেখা দিবে, আমার সাধন ভজন ভক্তির—কিছুর অপেক্ষা রাখনা তা জানি। তবু খাই-হারাণো মনটা যেন তোমায় শীঘ্র—তাই বা বলি কি ক'রে 'চায়'।

[৩।৩।১৩৫৮]

—০—

৮৬৯। সুমেরু পর্ব্বত স্বস্থান হতে পতিত হয়, সমুদ্রও শুকিয়ে যায়, পৃথিবীও নষ্ট হয়ে যায়, এই ক্ষণভঙ্গুর শরীরের কথা কোন ছার্!

৮৭০। লোকসমূহের কাছে আপনার দোষ স্বীকার কর্তে যাঁর কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না, পরন্তু এতে যিনি আপনার উপকার বুঝেন, তদ্রূপ আপনার ভাল কাজ অপর সকলকে জানাতে যিনি একেবারে ইচ্ছা রাখেন না, আর যিনি দৃঢ়সঙ্কল্পবিশিষ্ট তিনি সত্যনিষ্ট এবং যথার্থ সাধক।

৮৭১। পিতামাতার সম্মান কর। ব্যভিচার ক'রো না। চুরি ক'রো না। মিথ্যা সাক্ষী দিও না, অপরের জিনিষে মন চালিও না।

৮৭২। আপনার ভিতরের অসদ্‌ভাব, অহঙ্কার, ভয় এবং অজ্ঞানকে আগে দূর করা চাই, তবে জীবন প্রভুময় হতে পার্বে।

৮৭৩। আত্মা নিত্য সিদ্ধ, এর প্রতীতির জন্য দেশ কাল অথবা শুদ্ধি আদি কিছুরই অপেক্ষা নাই।

৮৭৪। ভগবানের নামে রুচি, জীবের প্রতি দয়া, ভক্তগণের সেবা—এই তিনটি সাধনের সমান আর কোন সাধন নাই।

৮৭৫। যে গৃহী সত্য, ধর্ম, ধৈর্য্য, ত্যাগ নামক চারিটি ধর্ম পালন করেন তাঁর মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্তির জন্য ভাবতে হয় না বা অনুতাপ করতে হয় না।

৮৭৬। যে অপরের বদ্‌নাম ক'রে আপনার নাম জাহির করতে চায়, তার মুখে এমন কালী কলঙ্ক লাগবে যে মরণের পরও ধোয়া যাবে না।

৮৭৭। যে-ঘরে সাধুর নিন্দা হয় তা সমূলে নষ্ট হয়ে যায়, তার ভিত্তি-বনেদ-নাম এবং স্থানেরও ঠিকানা থাকে না।

৮৭৮। হরিনামরূপী বাড়ির সঙ্গে প্রেম ভক্তি আগ্রহ একাগ্রতা এবং নিষ্টারূপ অনুপম থাক্‌লে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যরূপ রোগ শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়।

৮৭৯। মায়া মোহ ছেড়ে শ্রীরামের ভজন করা চাই। স্পর্শমণি স্পর্শ করা ব্যতীত লোহা দিন দিন মলিন হয়ে যায়।

৮৮০। যতক্ষণ মানুষ প্রথম গ্রামকে ছেড়ে না দেয় ততক্ষণ দ্বিতীয় গ্রামে পঁহুছিতে পারে না। এইরূপ যে পর্য্যন্ত সংসারের সম্বন্ধ ত্যাগ করা না যায় সে পর্য্যন্ত প্রভুর ধ্যানে পৌঁছান যায় না।

৮৮১। মানুষ সে কাজতো করে না যা তার বশে আছে, পরন্তু তাহা করে যা অপরের বশ, অর্থাৎ সে আপনার দোষসকল ত্যাগ করে না, অপরের দোষ সমূহ ছাড়াতে চায়।

৮৮২। আমি যদি স্বীয় আসুরী গুণসমূহের দ্বারাই অপরের সহিত ব্যবহার করি তা'হ'লে তার ভিতর থেকেই সেই আসুরী গুণ বহির্গত হয়ে ব্যবহার করতে থাকবে।

৮৮৩। নম্রতার কবচ পরে নিলে পর কেউ কিছুই বিরোধ বা ঝগড়া কর্‌তে পারে না। কাপাসের তুলা তলবারের দ্বারা কাটা যায় না।

৮৮৪। সেই পুত্র যথার্থ পুত্র যে মনঃসংযোগ করে ভক্তি করে; যাঁর দ্বারা জরা-মরণ হ'তে মুক্ত হ'য়ে অজর অমর হওয়া যায়।

৮৮৫। চরাচর সমস্ত দৃশ্য কেবল মনের কারণ। যখন এই মন অ-মন হয়ে যায় তখন দ্বৈতের কোন অনুভবই থাকে না।

৮৮৬। মমতা এবং অভিমানশূন্য ও চিন্তাবিরহিত পুরুষ ঘরে থাকলেও কোন কর্মে আসক্ত হয় না।

৮৮৭। যে অপরের সহিত শত্রুতা করে, পরের স্ত্রী এবং পর-ধনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি করে ও পরনিন্দা করে সেই পাপী মনুষ্যদেহধারী রাক্ষস।

৮৮৮। সাধুর জাতি জিজ্ঞাসা ক'রো না, তাঁর কাছে জ্ঞানের উপদেশ লও। তলবারের দাম করো, তার খাপে কি কাজ!

৮৮৯। সর্বদা সত্য বলা চাই, কলিযুগে সত্যের আশ্রয় গ্রহণের পর আর কোন প্রকার সাধন ভজনের আবশ্যকতা নাই। সত্যই কলিযুগের তপস্যা।

৮৯০। মিত্রের আদর ক'রো, অন্তরালে প্রশংসা করো এবং প্রয়োজনের সময় বিনা সঙ্কোচে সহায়তা ক'রো।

৮৯১। দুর্জন যদি বিদ্বান্ হয় তবুও তার সঙ্গ করা উচিত নয়, মণির দ্বারা সুশোভিত সাপ কি ভয়ানক নয়?

৮৯২। দেহ মন এবং বচনের একতা রাখা উচিত।

৮৯৩। যে মানুষ লোকসকলের সাম্‌নে ভগবানের কথা কয় আর আপনার মনে সর্বদা মান পাবার ও অন্য সাংসারিক চিন্তারাশিতে লেগে থাকে সে কখন না কখন অপমানিত হয়ে নিশ্চয় বিপদে পড়বে।

৮৯৪। স্বার্থই সমস্ত বিপদের মূল এবং পাপের মূল, আর স্বার্থের জড় মূল অজ্ঞান।

৮৯৫। যিনি কামনাসমূহ নাশ ক'রে মনকে জয় করে নিয়েছেন এবং

শান্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি রাজা কিম্বা দরিদ্র হোন—সংসারে তাঁর সুখই সুখ।

৮৯৬। কুমার্গে গমনশীল অজিত মনই পরম শত্রু। মনকে জয় করে সমত্বকে প্রাপ্ত হওয়াই ভগবানের মুখ্য সাধনা।

৮৯৭। বৈরাগ্যরূপী-সৌভাগ্যের পাত্র, প্রসন্নচিত্ত, বিষয়সমূহের আশা-রহিত এবং যথাপ্রাপ্ত প্রারব্ধ ফলভোগকারী পুরুষ এই জন্মেই কৃতার্থ হয়ে যান।

৮৯৮। বিশ্বাস প্রেম এবং নিয়ম পূর্বক রাম নাম জপ কর—আদি, মধ্য ও অন্ত তিন কালেই কল্যাণ হবে।

৮৯৯। মূর্খগণের সঙ্গ কর্‌বে না, বিদ্বান্‌মণ্ডলীর সঙ্গ কর্‌বে। পূজনীয় পুরুষসকলের সৎকার করা উত্তম ও শুভকারক কর্ম।

৯০০। মন, বচন ও শরীরের দ্বারা সংযমী থাকাই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য।

৯০১। ধনের তিন গতি—দান, ভোগ এবং নাশ। যে মানুষ না করে দান, আর ভোগ করে না, তার ধনের নাশ হয়ে যায়।

৯০২। পাপসকল হ'তে মুক্ত হওয়ার লক্ষণ (১) পাষণ্ডগণ হতে স্বতন্ত্র থাকা, (২) অসত্য ত্যাগ করা, (৩) অহঙ্কারী মনুষ্যসকল হতে দূরে থাকা, (৪) কেবল কল্যাণ পথেই চলা, (৫) ভগবানেরদিকে অগ্রসর হওয়া, (৬) অধর্ম অনীতি এবং পাপকর্ম সকল ত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা, (৭) কৃত পাপসকল নষ্ট করার জন্য যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করা এবং অযোগ্যের সঙ্গে অযোগ্যতা না করা।

৯০৩। রোগ হ'লে ঔষধ সেবন অপেক্ষা উত্তম বৈদ্যের এমন উপায় বলা উচিত যার দ্বারা মানুষের রোগ না হয়।

৯০৪। যে মনুষ্য 'প্রভু আমার সঙ্গে থাকুন' এই চায়, তার সত্যেরই সেবা করা উচিত। ভগবান্ বলেন যে, আমি সত্যপ্রিয় লোকগণেরই সহিত থাকি।

৯০৫। অধিক প্রশ্ন করা মূর্খতার চিহ্ন। মূর্খ একঘণ্টার মধ্যে যত প্রশ্ন করে বুদ্ধিমান্ তার সম্পূর্ণ উত্তর সাত বৎসরেও দিতে সমর্থ হন না।

৯০৬। ইচ্ছাকে রানী অথবা দাসী তৈরী করে নাও, যদি রানী ক'রে তার আজ্ঞাতে চল তাহলে সে দুঃখের কুণ্ডে ডুবিয়ে দেবে, আর দাসী করে আপনার আজ্ঞায় যদি রাখো তো সমস্ত সুখ প্রাপ্ত হবে।

৯০৭। হরির সঙ্গে নয়, হরি-জনের সঙ্গে প্রেম কর। হরিতো ধন সম্পত্তি রাজ্যই দেন, আর হরির জন তো সাক্ষাৎ হরিকেই দিয়ে দেন।

৯০৮। একটু কামনা থাকৃতে ভগবান্ মেলেনা, সুতোয় যদি অল্পমাত্র আবর্জ্জনা থাকে তা সূচের মধ্যে যায় না।

২০৯। সকল প্রাণিগণের মধ্যে ভগবান্ শ্রীহরি আত্মারূপে বিরাজমান, এইহেতু সকল প্রাণিকে ভগবানের নিবাসস্থান মনে ক'রে কারোর সঙ্গেই দ্রোহ করবে না। এরূপ করলে ভগবান্ প্রসন্ন হন।

২১০। শাস্ত্র, ধর্ম্মময়, প্রিয় এবং সত্য বচনই 'সুভাষণ'। এরূপ বাক্য বলা উচিত—যা আত্মার বিরুদ্ধ না হয় আর যার দ্বারা কারো দুঃখ উপস্থিত না হয়।

২১১। সজ্জনের মিথ্যা কথা বিষের মত লাগে। দুর্জ্জনের সত্য বিষের সমান লাগে ; সে এমনি দূরে পলায়ন করে যেমন আগুনের কাছে পারা।

২১২। যে পর্য্যন্ত পারো চুপ করে থাকো, প্রয়োজন পড়্লে মাত্র ততটুকু বল যাতে কাজ হয়।

২১৩। যতক্ষণ মানুষ লৌকিক জীবনে থাকে সে পর্য্যন্ত অলৌকিকী সুখ সম্পত্তির মজা পেতে সমর্থ হয় না।

২১৪। প্রকৃত মাতা তিনি যিনি স্বীয় বালকগণের ক্রোধ দ্বেষ এবং ঈর্ষারূপী রোগসকল প্রেমরূপী ঔষধের দ্বারা নষ্ট করাতে শেখান। আর আসল বৈদ্য তিনি যিনি আনন্দ স্বভাব এবং শুভ ভাবনা রাখার ও উত্তম কর্ম্ম করার শিক্ষা দেন যার দ্বারা শরীর ও হৃদয়ের বল লাভ হয়। আনন্দী-স্বভাবই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধের কাজ দেয়।

২১৫। মনুষ্য দেহ বার বার মিলবে না এইজন্য ইহা লাভ ক'রে ভগবানের ভজন-সেবন দ্বারা সুকৃতি সওদা সংগ্রহ করে নাও।

২১৬। সকলের সঙ্গে দয়ালুতার ব্যবহার করো, সে যে কোন দশায় কেন থাকুক না ক্রোধের অবস্থাতেও দয়াপূর্ণ শব্দসকল প্রয়োগ কর।

২১৭। লোভ মহাপাপের খনি, মিথ্যা লোভের মন্ত্রী, তৃষ্ণা স্ত্রী, যে তার দ্বারা অন্ধ হয় তার না উন্নতি না ধর্ম—কিছুই হয় না।

—•—

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ]

(পূর্বানুবৃত্তি)

উদ্দ্যোতকর ন্যায়দর্শনের ৪।১।২১ সূত্রের বার্তিকে ঈশ্বরসাধক দুইটি অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা এই—(১) বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিতানি স্বাসু স্বাসু ধারণাদিক্রিয়াসু মহাভূতানি বায়ুন্তানি প্রবর্তন্তে, অচেতনত্বাৎ, বাস্যাদিবৎ। (২) • এবং কার্য্যত্বাৎ তৃণাদীনি পক্ষীকৃত্য দর্শন স্পর্শন বিষয়ত্বাদিতি বক্তব্যম্। এবং যত্র যত্র বিপ্রাতিপত্তি: কার্য্যত্বঞ্চ তদনেনৈব ন্যায়েন দৃষ্টান্তেন বাস্যাদিনা পক্ষায়িত্বা সাধয়িতব্যম্। ইহার অভিপ্রায়—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু—এই মহাভূতচতুষ্টয়ে স্বোচিতধারণক্লেদনাদি ক্রিয়াতে বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হইয়া থাকে যেহেতু উক্ত মহাভূতবর্গ অচেতন। যে যে অচেতন বস্তু স্বোচিত ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয় তাহা বুদ্ধিমৎ কারণাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হয়, যেমন বাসী প্রভৃতি। বাসী একটি কাঠ কাটার অস্ত্র। ইহাকে লৌকিক ভাষায় 'বাস' বলে। হিন্দুস্থানীরা বসূলা বলে। এই অচেতন অস্ত্র কাষ্ঠতক্ষণরূপ স্বোচিত ক্রিয়াতে বুদ্ধিমান্ সূত্রধর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এইরূপ পৃথিব্যাদি বায়ু পর্যন্ত অচেতন মহাভূতসমূহ স্বোচিত ধারণাদি ক্রিয়াতে বুদ্ধিমৎ-কারণাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হয় সেই বুদ্ধিমৎকারণই ঈশ্বর। ইহাই অনুমানের অর্থ।

এইরূপ তৃণতরুপর্বতাদি তাহাদের উপাদানাভিজ্ঞ কর্তৃক হইবে। যেহেতু তৃণ প্রভৃতি কার্য অর্থাৎ উৎপত্তিমৎ। যাহা যাহা কার্য্য তাহা উপাদানাভিজ্ঞ-কর্তৃজন্য হইয়া থাকে। যেমন প্রাসাদাদি। তৃণতরুপ্রভৃতি যে তাহাদের উপাদানাভিজ্ঞ কর্তৃজন্য হইয়াছে সেই তৃণতরু প্রভৃতির উপাদানাভিজ্ঞ কর্তাই ঈশ্বর। ইহাই দ্বিতীয়ানুমানের অভিপ্রায়। এইরূপে যে যে কার্য বস্তু সকর্তৃকত্ব ও অকর্তৃকত্বরূপে বিপ্রতিপত্তির বিষয়ীভূত হইবে অর্থাৎ যে যে কার্যবস্তুকে কেহ সকর্তৃক, কেহ অকর্তৃক বলে সেই সমস্ত কার্যবস্তুকে অনুমানের পক্ষরূপে নির্দেশ করিয়া বাস্যাদির দৃষ্টান্তের দ্বারা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিতত্বের অনুমান করিতে হইবে।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরসাধক অনুমান প্রমাণের উপন্যাস করেন নাই। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ন তাবদস্য বুদ্ধিং বিনা কশ্চিদ্ধর্মো

লিঙ্গভূতঃ শক্য উপপাদয়িতুম্।" (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১, ৯৪৪ পৃঃ)। ইহার অর্থ —বুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন লিঙ্গভূত ধর্ম ঈশ্বরের উপপাদন করা যায় না যাহার দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে। ভাষ্যকার যে এস্থলে ঈশ্বরীয় বুদ্ধিকেই ঈশ্বরসাধক লিঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তদনুসারেই বার্তিককার 'বুদ্ধিমৎ-কারণাধিষ্ঠিতানি' এরূপ বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি বার্তিককার কর্তৃক কিঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, বার্তিককারও এস্থলে ষড়্গুণবিশিষ্ট ঈশ্বর এই অভিপ্রায়েই ঈশ্বরসাধক অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। ঈশ্বরীয় ইচ্ছা ও ঈশ্বরীয় কৃতির প্রবেশ ইহাতে করান নাই।

ন্যায়দর্শনে "তৎকারিতত্বাদ্‌হেতুঃ" (ন্যাঃ সূঃ ৪।১।২১) এই সিদ্ধান্ত সূত্র দ্বারা ঈশ্বর ব্যবস্থাপিত হইয়াছেন। এই সূত্রের বার্তিকে বার্তিককার বলিয়াছেন—সূত্রকার যে, তৎকারিতত্বাৎ অর্থাৎ ঈশ্বরকারিতত্ব বলিয়াছেন তাহাতে সূত্রকার ঈশ্বর যে, নিমিত্ত কারণ ইহাই স্বীকার করিয়াছেন। যাহা নিমিত্তকারণ তাহা সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। ন্যায়বৈশেষিকমতে ভাবকার্যমাত্রের ত্রিবিধ কারণ স্বীকার করা হয়—সমবায়ি-কারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। সূত্রকার ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন। নিমিত্তকারণ ইতরকারণদ্বয়ের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। যেমন বস্ত্রের সমবায়িকারণ তন্তু ও অসমবায়িকারণ তন্তুসংযোগ। তুরী প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ এই উভয়ের অনুগ্রাহক হইয়া থাকে। ঈশ্বর যদি জগতের নিমিত্তকারণ হন, তবে জগতের উপাদান বা সমবায়িকারণ কে হইবে? ইহার উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন—পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু উপাদান কারণ হইবে। অতঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু জগতের নিমিত্ত কারণ বিষয়ে বাদিগণের বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা কালকে নিমিত্ত কারণ বলেন, কেহ বা প্রকৃতিকেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলেন। যদিও এস্থলে বার্তিককার জগতের নিমিত্ত কারণের বিপ্রতিপত্তিতেই প্রকৃতির নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতি কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ এরূপ কোন মত প্রসিদ্ধ নহে। প্রকৃতি উপাদান না হইয়া কেবল নিমিত্তকারণ হইবে এরূপ স্বীকার করিলে প্রকৃতি শব্দেরই নিরর্থকতাপত্তি হইবে। প্রকৃত শব্দ সাধারণতঃ উপাদানেরই প্রতিপাদক। যাঁহারা প্রকৃতিকে উপাদান কারণ বলেন তাঁহারা প্রকৃতিকে নিমিত্ত কারণও বলেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র, তাহার আর কেহ প্রবর্তয়িতা নাই। জগতের নিমিত্তকারণের বিপ্রতিপত্তিতে প্রকৃতির উল্লেখ করায়

এরূপও কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রকৃতি জগতের মাত্র নিমিত্তকারণ— এরূপও কোন দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রাচীনকালে ছিল। কিন্তু আমাদের এরূপ বলা সঙ্গত মনে হয় না। ততঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন যে, জগতের নিমিত্তকারণ বিশেষে দার্শনিকগণের বিপ্রতিপত্তি আছে বলিয়া বস্তুতঃ জগতের নিমিত্তকারণ কে হইবে, ন্যায়ানুসারে কোন্ পক্ষটি সঙ্গত হইবে— এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত কারণ ইহাই ন্যায়সঙ্গত। ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতাসর্বক প্রমাণসমূহ প্রমাণান্তের দ্বারা প্রতিহত হয় না। এজন্য ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ ইহাই ন্যায়সঙ্গত। যদি বলা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্বই তো অসিদ্ধ, তাঁহার নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হইবে কিরূপে ? ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে কালাদির নিমিত্তকারণতা নিরসনপূর্বক ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতার অবধারণ হইতে পারে। এতদুত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন—যে অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বও সিদ্ধ হইবে। ঈশ্বরের অস্তিত্বসিদ্ধির জন্য পৃথক্ প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না। যাহার অস্তিত্বই অসিদ্ধ তাহা কখনও নিমিত্তকারণ হইতে পারে না। ঈশ্বরের নিমিত্তকারণত্বে প্রমাণ কি ? ইহার উত্তরে বার্তিককার বলিয়াছেন— যাঁহারা অচেতন প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন অথবা অচেতন পরমাণুসমূহ হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন অথবা যাঁহারা জীবের অচেতন শুভাশুভ কর্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন তাঁহাদের সকলকেই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে প্রধান, পরমাণু অথবা শুভাশুভ কর্ম ইহারা সকলেই অচেতন বলিয়া বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই ইহারা প্রবৃত্ত হইবে। অচেতন বস্তু বুদ্ধিমৎকারণ দ্বারা অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যাহা অচেতন তাহা চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই প্রবৃত্ত হয়, যেমন বাসী প্রভৃতি অস্ত্র বুদ্ধিমান্ সূত্রধর প্রভৃতি অধিষ্ঠিত হইয়াই স্বোচিতকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে যেহেতু বাসী প্রভৃতি অচেতন বস্তু। এই প্রধান অথবা পরমাণু অথবা কর্ম ইহারা সকলেই অচেতন। অথচ ইহারা স্বোচিতকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এজন্য অচেতন প্রধানাদি অবশ্যই বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইবে। ততঃপর বার্তিককার সাংখ্যসম্মত স্বতন্ত্র প্রধানকারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ততঃপর বার্তিককার বলিয়াছেন—যে সমস্ত মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন পুরুষকর্ম দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া অচেতন পরমাণুসমূহ জগতের কারণ হইয়া থাকে তাহাদের নিকট বক্তব্য এই যে, অচেতন পরমাণু যদি জগৎনির্মাণে প্রবৃত্ত হইতে পারিত তবে পরমাণুসমূহের

প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই থাকিত, জগতের প্রলয় কখনও হইত না। যদি বলা যায়, কালবিশেষকে অপেক্ষা করিয়াই পরমাণুসমূহ প্রবৃত্ত হয়, এইজন্য পরমাণুর সর্বদা প্রবৃত্তির আপত্তি হইবে না। সৃষ্টিকালে পরমাণুর প্রবৃত্তি হইলেও প্রলয়কালে পরমাণুর প্রবৃত্তি হইবে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, অচেতন পরমাণু যেমন বুদ্ধিমান্ অধিষ্ঠাতাকে অপেক্ষা করে বুদ্ধিমৎকারণ ব্যতীত অচেতনের প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্যোন্মুখতা হইতে পারে না এরূপ অচেতন কালও বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়া কার্য করিতে পারিবে না। অচেতন বস্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া যেমন অচেতন পরমাণু সমূহ স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, এইরূপ অচেতন কালও স্বতন্ত্রভাবে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। আরও যুক্তি এই যে, পৃথিব্যাদি মহাভূতচতুষ্টয় বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই সুখদঃখাদির জনক হইতে পারে যেহেতু পৃথিব্যাদি মহাভূত রূপরসাদিমান্। যাহা যাহা রূপরসাদিমান্ তাহা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই প্রাণিগণের সুখদুঃখাদির নিমিত্ত হইয়া থাকে যেমন বস্ত্রের কারণ তুরী, বেমা প্রভৃতি।

এইরূপ অচেতন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই পুরুষের উপভোগ সম্পাদন করিবে যেহেতু ধর্মাধর্ম সুখদঃখ উপভোগের কারণ। যাহা যাহা করণ তাহা বুদ্ধিমৎকারণাধিষ্ঠিত হইয়াই ফলের জনক হইয়া থাকে যেমন সূত্রধরাধিষ্ঠিত বাস্যাদি। যদি বলা যায়, জীবাশ্রিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা ধর্মাধর্মের আশ্রয় জীবাত্মাই হইতে পারিবে, ঈশ্বর আর ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা স্বীকার করার অবশ্যকতা কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, চেতনই অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে, অচেতন অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বে জীবাত্মা অচেতন। জীবাত্মার জ্ঞানাদি অনিত্য। জীবের শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তির পূর্বে জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অনুৎপন্নজ্ঞান-জীবাত্মা অচেতন বলিয়া স্বীয় ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। যে বিষয়ে যাহার জ্ঞান নাই সেই বিষয়ের অধিষ্ঠাতা সে হইতে পারে না। অনুৎপন্নজ্ঞান-জীবাত্মার রূপরসাদিবিষয়ক জ্ঞানই সম্ভাবিত নহে, ধর্মাধর্মবিষয়ক জ্ঞান তো দূরের কথা। যদি জীবাত্মাই স্বীয় ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারিত তখন জীবাত্মা কখনও স্বীয় অধর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া নিজের দুঃখ উৎপাদন করিত না। যদি বলা যায়, জীবের ধর্ম ও অধর্মের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া পরমাণুসমূহ প্রবৃত্ত হয় অবং তাহাতেই জগতের সৃষ্টি হয় এরূপ বলাও অসঙ্গত কারণ ধর্মাধর্ম অচেতন। কোন অচেতন বস্তু স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

ধ্যানের একটী শ্লোক

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

অন্তস্থমেকং ঘনচিৎপ্রকাশং
নিরস্ত সর্ব্বাতিশয় স্বরূপং।
বিষ্ণুং সদানন্দময়ং হৃদব্জে
সা ভাবয়ন্তী ন দদর্শ রামম্॥

কবে হইবে? কখনো হইবে কি? সেই যে কৌশল্যা জননীর যাহা হইয়াছিল! রাম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, মা কিন্তু কিছুই দেখিতেছেন না। কিছুই দেখিতেছেন না বলিলে ঠিক বলা হয় না। ভিতরে দেখিতেছেন—আর বাহিরে কিছুই দেখিতেছেন না। সকল ইন্দ্রিয়—বা সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক—সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা স্থির হইয়া এক প্রকাশে ডুবিয়া গিয়াছে।

আহা! এই ভিতরে চিৎঘন প্রকাশ—কি এইটী? আহা! এই জ্ঞানঘন জ্যোতিঃস্বরূপ ভিতরের বস্তুটি কিন্তু সর্ব্বব্যাপী—এই বস্তুটীতে আর কোন কিছু নাই। সমস্ত জড় জগৎ—সমস্ত দৃশ্য দর্শন—নিরস্ত হইয়াছে—শুধু জ্ঞানঘন প্রকাশটি মাত্র দাঁড়াইয়াছেন। জ্ঞানঘন প্রকাশটি কিরূপ? জ্ঞান আবার ঘন কিরূপে? জ্ঞানটিত সর্ব্বব্যাপী পদার্থ। ব্রহ্মত জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী। এই নিরাকার নিরবয়বের ধ্যান হইবে কিরূপে? নিরাকারের ধান হয় না—নিরাকারের উপাসনা হয় না—নিরাকারের কাছে বসা যায় না। নিরাকার যিনি তাঁহাতে বিশ্বাস মাত্র হইতে পারে—বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা মাত্র চলিতে পারে। কিন্তু এই প্রার্থনাতে "আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণচক্ষুঃ শ্রোত্র মথো বলমিন্দ্রিয়ানি চ সর্ব্বাণি"—সমস্ত অঙ্গ—বাক্, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ বল ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়—আপ্যায়িত হয় কি? তৃপ্তি লাভ করে কি? ভরিত হইয়া যায় কি? বুঝি নিরাকারের উপরে আরও কিছুর প্রয়োজন হয়। চক্ষু কতই ত দেখিয়াছে, আপ্যায়িত হইয়াছে কি? যাহাকে দেখিবার জন্য চক্ষু পাইয়াছ তাহাকে না দেখা পর্য্যন্ত চক্ষু কখন ভরিত হইয়া যাইবে না। বাহিরের কোন কিছু দৃশ্য-দর্শনে চক্ষু আপ্যায়িত হইয়া যায় না। চক্ষুর এই পিপাসা মিটাইবে কে? সকল ইন্দ্রিয় যাঁহার জন্য লালায়িত হয়—তিনি যদি নিরাকারই থাকেন তবে ত ইন্দ্রিয় লাভের যথার্থ উদ্দেশ্য কখন সফল হয় না। তবে বুঝি মানুষের কাতর ইন্দ্রিয় কখন জুড়াইয়া যায় না। আহা! মানুষের বুদ্ধি, না হয় ব্রহ্মবিচারে শান্ত হইতে

পারে, কিন্তু হৃদয় শান্ত হইবে কিরূপে? হৃদয়কে ইন্দ্রিয়াদি পরিবারবর্গের সহিত আপ্যায়িত করিতে হইলে জ্ঞানস্বরূপের, আনন্দস্বরূপের ঘনীভূত মূর্ত্তি চাই, জ্ঞানস্বরূপকে আনন্দস্বরূপকে কথা কহিতে হয়, নতুবা কর্ণ আর কোন্ কথা শুনিয়া আপ্যায়িত হইবে, ভরিত হইবে? চিৎস্বরূপ যিনি, অনেজৎ একং যিনি, সত্যং জ্ঞানমনন্তং যিনি তিনি শান্তং শিবং সুন্দরং পরিপূর্ণ যিনি তিনি অখণ্ড স্বরূপে থাকিয়াও উপাধি ধরিয়া নয়নাভিরাম বচোভিরাম শ্রবণাভিরাম মনোভিরাম সদাভিরাম সততাভিরাম রূপ না ধরিলে হৃদয় আপ্যায়িত হইবার আর ত কিছুই নাই। যখন 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে আর গুণে মন ভোর' হইয়া উঠিতে চায়, যখন প্রতি অঙ্গ আপ্যায়নের জন্য প্রতি অঙ্গ কাঁদিতে থাকে, যখন হিয়ার পরশ লাগি হিয়া বড়ই কাঁদিতে থাকে, যখন প্রাণ স্পর্শ বিনা কিছুতেই আর স্থির হয় না—কবি তুমিই বল, মানুষের হৃদয়কে স্থির করিবে কে? এই ব্যাকুল প্রার্থনাতে, এই কাতরতা পূর্ণ করিতে সে নিরন্ত সর্ব্বাতিশয়স্বরূপং সেই অন্তস্থমেকং চিৎস্বরূপং ঘন হইয়া মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাই বলা হয় "ভক্ত চিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ" ভক্তের চিত্তকে আপ্যায়িত করিতে সেই দয়াময় জগৎব্যাপী অখণ্ড সচ্চিদানন্দ চৈতন্য পুরুষই সুন্দর সাজে সাজিয়া হৃদয়ে উদয় হয়েন—আবার বাহিরে আসিয়া শ্রবণ রসায়ন কি যেন অমৃতময় কথা কহিয়া কর্ণ পরিতৃপ্ত করেন, সেই চন্দ্রকোটি ভানুকোটি কোটি মদনহারো মূর্ত্তি না দেখিলে কি কখন সব ইন্দ্রিয় ভিতরে ডুবিয়া যায়? ভিতরে ঐ সুন্দর না দেখিলে কি বাহিরের দৃশ্য দর্শন মুছিয়া যায়? তাইত ভগবান আপনি ভক্ত বাসনা তৃপ্তি জন্য অবতার হয়েন। তুমি অবতার মানিতে পার না, এ তোমার দুর্ভাগ্য। ঋষিরা অদ্বৈতবাদী হইয়াও অবতার পূজা করিবার উপদেশ দিয়াছেন—ফলে অবতারের উপাসনা না করিলে জীবের হৃদয় ও বুদ্ধি কখন শান্ত হইতে পারে না। দ্বৈতভাবে সাধনা করিয়া হৃদয়কে নির্ম্মল করিতে পারিলে তবে অদ্বৈতভাবে স্থিতিলাভ করা যায়।

আজকাল ভালবাসার কথা মানুষ কতই কয়। কিন্তু ভালবাসার লক্ষ্য বাহিরের রঙ্গরস নহে, ভালবাসা যদি এই চিৎঘন প্রকাশে ডুবিতে না পারে তবে ইহা কামবিলাস মাত্র। দেবী কৌশল্যা হৃৎপদ্মে এই সদানন্দময় শ্রীবিষ্ণু শ্রীরামকে ভাবিতেছিলেন তাই রাম বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেও রামকে দেখিতে পাইলেন না। তুমিও দেখিতে দেখিতে যদি সেই ভিতরের ঘন চিৎপ্রকাশে ডুবিয়া গিয়া বাহিরে কিছু না দেখ—যদি বলিতে পার "বাহ্যং বিস্মৃতবানহং" তবে জানিব তুমি সাধক নতুবা তুমি শরীর ভোগের জন্য অহর্নিশ কাহার

পশ্চাতে ছুটিতেছ বেশ করিয়া বিচার কর, করিয়া আত্মপ্রতারণা ছাড়িয়া সত্য সত্য ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিয়া জীবন সফল কর। বেশ করিয়া ধারণা করিও, যে-ভালবাসায় বিরহ নাই সেটা ভালবাসা নহে, সেটা কাম। আর যে বিরহে সংযম নাই সেটাও বিরহ নহে শরীর ভোগের জন্য ছুটাছুটি মাত্র। যদি ভালবাসা বুঝিয়া থাক তবে বাহিরের সব ছাড়িয়া সংযমী হইয়া কৌশল্যার মত 'ন দদর্শ রামম্' হইয়া যাও।

বুঝিলে ধ্যানের বস্তুটা কি? ধ্যানের বস্তুটি যদি না ধারণা করিয়া থাক তবে জপের সময়ে বহু অসম্বন্ধ প্রলাপ উঠিবেই। সেই জন্য ধ্যান করিয়া জপ করিবার বিধি।

সামান্যচৈতন্য যিনি তিনি ধ্যানের বস্তু নহেন। সামান্যচৈতন্য যখন মায়িক উপাধি ধরিয়া বিশেষচৈতন্য হয়েন তখন ইনিই ধ্যানের বস্তু। নির্গুণ ব্রহ্ম, উপাসনার বস্তু নহেন কিন্তু ইঁনিই যখন উপাধি ধরিয়া সগুণ হয়েন, ইনি যখন ঘনচিৎ প্রকাশ হয়েন তখন এই ঘনচিৎ প্রকাশই উপাসনার বস্তু। ইঁহার সুন্দর আকার ইঁহার সুন্দর প্রকার, ইঁহার সুন্দর কথা—ইঁহার সবই সুন্দর। ঘনচিৎ প্রকাশ যিনি তিনি সবকালে সর্ব্বব্যাপী আবার মূর্ত্তিধারী। সকল স্থানে তিনি আছেন আবার সর্ব্বত্র মূর্ত্তি ধরিয়াও প্রকাশমান—ইনিই ধ্যানের বস্তু।

—০—

শ্রীশ্রীএকাদশীমহিমামৃত

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

॥ প্রথম হিল্লোল ॥

বিশাল বিশ্বস্য বিধানবীজং
বয়ং বরেণ্যং বিধিবিষ্ণু সর্ব্বৈঃ।
বসুন্ধরা বারি বিমান বহ্নি
বায়ু স্বরূপং প্রণবং বিবন্দে॥

শিষ্য। দেব, শুনিয়াছি একাদশীর অনন্ত মহিমা, একাদশীমহিমা শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু। সত্যই বৎস, একাদশীর মহিমা অনন্ত, সর্ব্বশাস্ত্রে তাহা কথিত হইয়াছে, একাদশীর দিন মাত্র উপবাস ও রাত্রি জাগরণে শ্রীভগবান্ যেরূপ প্রীত

হন এরূপ প্রীতি অন্ত কোন ব্রতের দ্বারা হয় না। পুরাণ সমূহে একাদশী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ রামানন্দাচার্য্য বলিয়াছেন—

একাদশীত্যাদি মহাব্রতানি
কুর্য্যাদ্ বিবেধানি হরিপ্রিয়ানি।
বিদ্ধ্যা দশম্যা যদিসারুণোদয়ে
স দ্বাদশীন্তূপবসেদ্ বিহায়তাম্॥

—শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর

—'ভগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছায় হরিপ্রিয় ভগবৎপ্রসাদকর অরুণোদয় আদি বেধরহিত একাদশী প্রভৃতি মহাব্রত সকল মুমুক্ষু ভক্ত অনুষ্ঠান করিবে। যদি সেই একাদশী অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা হয় তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করত শ্রীবৈষ্ণব দ্বাদশীর দিন উপবাস করিবে।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়েও একাদশীব্রত সমাদরের সহিত প্রতিপালিত হয়। বারকরী সম্প্রদায়েও একাদশী মহাব্রত বলিয়াছেন।

শিষ্য। 'বারকরী সম্প্রদায়' কাঁহারা?

গুরু। মহারাষ্ট্রদেশের ভগবান বিঠ্ঠল দেবের ভক্তগণ জ্ঞানেশ্বর, নিবৃত্তিনাথ, সোপানদেব, মুক্তাবাই, নামদেব, জনাবাই, গোরাকুমার, চোখামেলা, একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি বারকরী সম্প্রদায় বলিয়া খ্যাত।

"বারকরী সম্প্রদায় মেঁ একাদশী মহাব্রতকী বড়ী মহিমা হৈ। পন্দ্রহ দিনমেঁ একদিন নিরাহার রহকার দিন ঔর বিশেষকর রাত হরিভজনমেঁ বিতানা হী উপবাসকা অভিপ্রায় হৈ।"

বারকরী সম্প্রদায়ে একাদশী মহাব্রতের বড় মহিমা কথিত হইয়াছে, পনর দিনের মধ্যে একদিন নিরাহার থাকিয়া দিন এবং বিশেষ রাত্রি হরিভজনে নিয়োজিত থাকাই উপবাসের অভিপ্রায়। সংসারের সমস্ত ধর্মে মন বাক্য কায় শুদ্ধির দৃষ্টিতে উপবাসের অত্যন্ত মহত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের শ্রুতিমাতা এ সম্বন্ধে প্রথমে বলিয়াছেন, উপবাস পরমাত্মপ্রাপ্তির সাধন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" বেদাভ্যাস স্বাধ্যায় যজ্ঞ তপস্যা দান এবং অনাশক অর্থাৎ অন্নজল ত্যাগ করিয়া অবস্থান ভগবৎপ্রাপ্তির মার্গ। মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে ১০৫,১০৬ অধ্যায়ে একদিন দুইদিন তিনদিন একপক্ষ এবং একবর্ষ পর্য্যন্ত উপবাসের কথা বলা হইয়াছে। অনাশক অনশন নিরশন উপবাস

(উপসমীপে বাস অবস্থান) ইত্যাদি শব্দের দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে ভগবানের চিন্তায় দিন অতিবাহিত করাই উপবাসের মুখ্য কারণ। শ্রীভাগবতেও একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

শিষ্য। তাহা হইলে বারকরী সম্প্রদায় একাদশীতে কিছুই গ্রহণ করেন না?

গুরু। না, তাঁহাদের "সিদ্ধান্ত পঞ্চদশীর" মধ্যে একাদশ হইল মহাব্রত, একাদশী, সোমবার এবং শিবরাত্রি ব্রত।

একাদশী সম্বন্ধে শ্রীতুকারামজী বলিয়াছেন—

"একাদশীকে অন্নপান। জো নর কর্‌তে ভোজন।
শ্বান বিষ্ঠা সমান। অধমজন হৈঁ বে ॥১॥
সুনো ব্রতকা মহিমান। নেম আচরতে জন।
সুনতে গাতে হরিকীর্ত্তন। বে সমান বিষ্ণুকে ॥২॥
সেজ সাজ বিলাস ভোগ। কর্‌তে কামিনীকা সংগ।
হোতা উন্‌কে ক্ষয়রোগ। জন্ম ব্যাধি ভয়ঙ্কর ॥৩॥"

একাদশীর দিন যাহারা অন্নজল গ্রহণ করে তাহার সেই ভোজন কুকুরের বিষ্ঠা ভোজনের তুল্য এবং সেই লোক অধম। শুন এই ব্রতের মহিমা এইরূপ যে লোক এই ব্রত আচরণ করেন হরিকীর্ত্তন করেন এবং শুনেন তিনি বিষ্ণুর সমান। যে মানব খাটের উপর শয়ন করে বিলাসভোগে রত হয় কামিনীর সঙ্গ করে তাহার ক্ষয়রোগ হয় এবং যাবজ্জীবন মহাব্যাধি ভোগ করে।

—শ্রীতুকারামচরিত।

অধুনা আমি তোমায় ষড়্‌বিংশতি একাদশী মাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর।

॥ সূত উবাচ ॥

এবং প্রীত্যা পুরাবিপ্রাঃ শ্রীকৃষ্ণেন পরং ব্রতম্।
মাহাত্ম্য বিধিসংযুক্তমুপদিষ্টং বিশেষতঃ ॥১॥
উৎপত্তিং যঃ শৃণোত্যেব মেকাদশ্যাং দ্বিজোত্তম।
ভুক্ত্বা ভোগাননেকাংস্ত বিষ্ণুলোকং প্রযাতি সঃ ॥২॥

—ষড়্‌বিংশত্যেকাদশী মাহাত্ম্য।

হে বিপ্রগণ, পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি প্রীত হইয়া মাহাত্ম্য এবং বিধি সংযুক্ত এই পরমব্রতের উপদেশ করিয়াছিলেন। হে দ্বিজোত্তম, যিনি এই

একাদশীর উৎপত্তির কথা শ্রবণ করেন তিনি বিবিধ ভোগ সকল ভোগ করত অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

॥ পার্থ উবাচ ॥

উপবাসস্য নক্তস্য একভক্তস্য চ প্রভো।
কিং পুণ্যং কিং বিধানং হি ব্রূহি সর্ব্বং জনার্দ্দন ॥৩॥

হে প্রভো, উপবাস নক্ত এবং একভক্তের কি পুণ্য কি বিধান, হে জনার্দ্দন আমাকে তাহা বলুন।

॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥

হেমন্তে চৈব সম্প্রাপ্তে মাসি মার্গশিরে শুভে।
শুক্লপক্ষে তথা পার্থ একাদশ্যামুপোষয়েৎ ॥৪॥

হে অর্জ্জুন, হেমন্তকালে শুভ মার্গশীর্ষমাসে শুক্লপক্ষে একাদশীর উপবাস করিবে। দশমীতিথিতে দিবসের অষ্টমভাগে দিবাকর মন্দীভূত হইলে দন্তধাবন পূর্ব্বক নক্তব্রত করিবে, সেই সময় ভোজনই 'নক্ত' বলিয়া কথিত হয়, নিশিভোজনের নাম নক্ত নহে। অনন্তর প্রভাতে স্নান ও সঙ্কল্প করিবে, মধ্যাহ্নেও শুচি স্নাত ও সমাহিত হইয়া সংকল্প করিবে। নদী, তড়াগ, বাপীতে স্নান ক্রমে উত্তম মধ্যম অধম বলিয়া জানিবে, তাহার অভাবে কূপেও স্নান করা চলিতে পারে।

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হরণে পাপং যন্ময়া পূর্ব্বসঞ্চিতম্ ॥
ত্বয়া হতেন পাপেন গচ্ছামি পরমাং গতিম্।

এই বলিয়া ব্রতীভক্ত গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিবে। পতিত, চোর, পাষণ্ড,মিথ্যা-বাদী, দেবতা ও বেদনিন্দক অন্য দুরাচার অগম্যগামী পরদ্রব্য অপহারক দেবদ্রব্য অপহারীগণের সহিত আলাপ বা সম্ভাষণ করিবে না, তাহাদের দেখিলে সূর্য্য-দর্শন করিবে। অনন্তর নৈবেদ্য, পুষ্প, মাল্যাদির দ্বারা আদরের সহিত গোবিন্দের অর্চ্চনা পূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত চিত্তে দেবগৃহে দীপদান করিবে। সেইদিন নিদ্রা ও মৈথুন ত্যাগ করিবে। দিবারাত্র কীর্ত্তন এবং শাস্ত্র শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা অতিবাহিত করিবে, ভক্তিযুক্ত চিত্তে রাত্রি জাগরণ করত প্রণিপাত পুরঃসর ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। শুক্লা এবং কৃষ্ণা উভয় একাদশীই ধর্ম্মতৎপরগণ সমানভাবে মান্য করিয়া থাকেন। একাদশী-দুইটির ভেদ করিবে না। এইরূপ যাঁহারা একাদশীর উপবাস করেন তাহার ফল শ্রবণ কর।

মানব শঙ্খোদ্ধারতীর্থে স্নান করিয়া গদাধর দর্শনে যে ফল লাভ করে তাহা একাদশী উপবাসের ষোড়শভাগের একভাগের তুল্য নহে। ব্যতীপাতে দানের লক্ষ ফল, সংক্রান্তিতে দানের চারি লক্ষ ফল হয় চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে যে ফল সেই সমস্ত ফল একাদশী উপবাসকারী লাভ করিয়া থাকেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল হয় একাদশী উপবাসে তাহা হইতে শতগুণ ফল হইয়া থাকে।

তপস্বিনো গৃহে নিত্যং লক্ষং যস্য চ ভুঞ্জতে ॥২১॥
ষষ্টিবর্ষসহস্রানি তস্য পুণ্যঞ্চ যদ্ভবেৎ।
একাদশ্যুপবাসেন ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥২২॥

যাহার গৃহে ষাট্ হাজার বৎসর লক্ষ তপস্বী নিত্য ভোজন করেন তাহাতে যে পুণ্য হয়, একাদশী উপবাসের দ্বারা মানব সেই ফল লাভ করে। বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গোদান করিলে যে পুণ্য হয় তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্য একাদশীতে উপবাসকারিগণ লাভ করেন। গৃহে নিত্য উত্তম ব্রাহ্মণ দশজন ভোজন করিলে যে পুণ্য হয় তাহার দশগুণ পুণ্য ব্রহ্মচারি ভোজনে হয়, তাহা হইতে সহস্র গুণ ভূদান বা কন্যাদান করিলে হয়, তাহা হইতে দশগুণ বিদ্যাদানে হইয়া থাকে।

বিদ্যাদশগুণঞ্চান্নং যো দদাতি বুভুক্ষিতে।
অন্নদানসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥২৫॥

বিদ্যাদান হইতে দশগুণ পুণ্য যিনি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করেন তিনি লাভ করিয়া থাকেন। অন্নদানের সমান দান হয় নাই, হইবে না। হে অর্জ্জুন, অন্নদানকারির স্বর্গস্থ পিতৃগণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শিষ্য। সকল দানের শ্রেষ্ঠদান তাহা হইলে অন্নদান ?

গুরু। তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে, ধন রত্ন যাহা কিছু দাও আর প্রয়োজন নাই কেহ বলিবে না, কিন্তু অন্নদানকারিকে অন্নভোক্তা তাহা বলিয়া থাকে।

শিষ্য। আচ্ছা অন্নদান কালে কি পাত্রাপাত্রের বিচার করিতে হয় না ?

গুরু। যাঁহারা ফলকামী তাঁহাদের পাত্রাপাত্র বিচার করা প্রয়োজন, আর যাঁহারা প্রাণীমাত্রকেই নারায়ণবোধে ভোজন করান তাঁহাদের তো অপাত্রই নাই।

তারপর ভগবান্ বলিলেন একাদশী ব্রতের পুণ্যের সংখ্যাই নাই, এই পুণ্যের প্রভাব দেবগণেরও দুর্লভ, নক্তের অর্দ্ধফল তার অর্দ্ধফল এক ভক্তের—

একভক্তঞ্চ নক্তঞ্চ উপবাস স্তথৈব চ।
এতেষন্যতমং বাপি ব্রতং কুর্য্যাদ্ধরেদিনে ॥ ২৯ ॥

একভক্ত, নক্ত বা উপবাস স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে একাদশীব্রত করিবে।

শিষ্য। নক্ত, একভক্ত কি?

গুরু। নক্ত দিবসের অষ্টমভাগে ভোজন। একভক্ত সমস্ত দিবারাত্রিতে যে কোন সময় একবার ভোজন। ততক্ষণ তীর্থ দান যম নিয়ম প্রভৃতি গর্জ্জন করে যতক্ষণ একাদশী প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ তীর্থ দানাদি একাদশী ব্রতের তুল্য নহে। এইজন্য ভবভয়ে ভীতগণের একাদশীতে উপবাস করা কর্ত্তব্য। শঙ্খেতে জল পান করিবে না, মৎস্য শূকর ভোজন, ও একাদশীতে ভোজন করিবে না। ভগবান বলিলেন—অর্জ্জুন, আমি তোমাকে সমস্ত ব্রতের উত্তম ব্রত বলিলাম। সহস্র যজ্ঞ একাদশীর তুল্য নহে। অর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব, এই একাদশী সমস্ত তিথি অপেক্ষা কেন পবিত্র, আপনি আমাকে তাহা বলুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন, পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বদেবভয়ঙ্কর মুর নামক এক অত্যদ্ভুত মহারৌদ্র অসুর ছিল, সেই অসুর দেবরাজ ইন্দ্র আদিত্যগণ বসুগণ বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণকে জয় করিয়া স্বর্গলোক অধিকার করিলে, ইন্দ্র মহাদেবকে বলিলেন হে দেব, আমরা স্বর্গলোক পরিভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি, আমরা কি করিব বলুন। মহাদেব বলিলেন, হে দেবরাজ, তোমরা পরিত্রাণ-পরায়ণ জগন্নাথ গরুড়ধ্বজ যেখানে অবস্থান করিতেছেন তথায় গমন কর। দেবরাজ শঙ্করের কথা শ্রবণ করত যেস্থানে জগন্নাথ জলমধ্যে অনন্তশয়নে প্রসুপ্ত ছিলেন তথায় গমন করত করজোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন—

ওঁ নমো দেব দেবায় দেবদেবৈ্য সুবন্দিত।
দৈত্যারে পুণ্ডরীকাক্ষ ত্রাহিনো মধুসূদন ॥৪২॥

দৈত্যভীতা ইমে দেবা ময়া সহ সমাগতাঃ।
শরণং ত্বং জগন্নাথ ত্বং কর্ত্তা ত্বঞ্চ কারকঃ ॥৪৩॥

ত্বং মাতা সর্ব্বলোকানাং ত্বমেব জগতঃ পিতা।
ত্বং স্থিতি ত্বং তথোৎপত্তি স্তুঞ্চ সংহারকারকঃ ॥৪৪॥

সহায় স্তুঞ্চ দেবানাং ত্বঞ্চ শান্তিকরঃ প্রভো।
ত্বং ধরা চ ত্বমাকাশঃ সর্ব্ব বিশ্বোপকারকঃ ॥৪৫॥

ভবস্তুঞ্চ স্বয়ং ব্রহ্মা ত্রৈলোক্যপ্রতিপালকঃ ॥
ত্বং রবি ত্বং শশাঙ্কশ্চ ত্বঞ্চ দেবো হুতাশনঃ ॥৪৬॥

হব্যং হোমোহুত স্বঞ্চ মন্ত্রতন্ত্রর্ঋর্ত্বিজোজপঃ।
যজমানশ্চ যজ্ঞ স্বং ফলভোক্তা ত্বমীশ্বরঃ ॥৪৭॥

ন ত্বয়া রহিতং কিঞ্চিৎ ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
ভগবন্ দেব দেবেশ শরণাগতবৎসল ॥৪৮॥

ত্রাহি ত্রাহি মহাযোগিন্ ভীতানাং শরণং ভব।
দানবৈর্বিজিতাদেবাঃ স্বর্গভ্রষ্টাঃ কৃতা বিভো।৪৯॥

স্থানভ্রষ্টা জগন্নাথ বিচরন্তি মহীতলে।
ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা বিষ্ণুর্বচনমব্রবীৎ ॥৫০॥

এইরূপ স্তব করত ইন্দ্র বলিলেন দেব, আমাদের রক্ষা করুন। দানবগণকর্ত্তৃক বিজিত স্বর্গচ্যুত দেবগণ মহীতলে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, মহামায়ী সে দৈত্য কে? যে দেবগণকে পরাজিত করিয়াছে তাঁহার স্থান নাম আশ্রয় কি আমায় বল, ইন্দ্র নির্ভয় হও! ইন্দ্র বলিলেন—হে ভগবন্ দেবদেবেশ ভক্তানুগ্রহকারক, পূর্ব্বে ব্রহ্মবংশসমুদ্ভূত মহোগ্র সুরসূদন নাড়ীজঙ্ঘ নামক এক অসুর ছিল, তাহার পুত্র অতি বিখ্যাত মহাসুর মুর চন্দ্রবতীনাম্নী গরীয়সী নগরীতে বাস করিয়া থাকে। সেই দুষ্টাত্মা বীর্য্যবান বিশ্ব বিজয় করত স্বর্গ হইতে দেবগণকে দূর করিয়া দিয়াছে। ইন্দ্র অগ্নি যম বায়ু ঈশ সোম নির্ঋতি বরুণ-পদে স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়াছে। সে সূর্য্য হইয়া তাপ দান করে সেই পর্জ্জন্য হইয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, আপনি তাহাকে বিনাশ করুন। তাঁহার বাক্য শ্রবণে জনার্দ্দন ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন—হে দেবেন্দ্র, আমি মহাবল সেই শত্রুকে বিনাশ করিব, তোমরা আমার সহিত চন্দ্রাবতীতে চল। এইকথা বলিয়া দেবগণের সহিত বিষ্ণু চন্দ্রাবতীতে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের দেখিয়া দৈত্যেন্দ্র গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং মহাবলবান অসুরগণ দেবগণকে দিব্য অস্ত্রের দ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, দেবগণ যুদ্ধ ত্যাগ করত দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সংগ্রামে হৃষীকেশকে দেখিয়া বিবিধ আয়ুধধারী অসুরগণ তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইল। দেবগণকে পলায়নপর দেখিয়া শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু শত শত শাণিত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরাঘাতে দানবগণ নিধন প্রাপ্ত হইল, একমাত্র মুর অবশিষ্ট রহিল। হৃষীকেশ তাহার উপর যে সমস্ত আয়ুধ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার তাহা পুষ্পের মতন মনে হইল, তাহার তেজে অস্ত্র সকল কুণ্ঠিত হইয়া যাইল, শস্ত্রাস্ত্রের দ্বারা বিধ্যমান হইয়াও

সে স্থির রহিল, বিষ্ণু তাহাকে যখন জয় করিতে পারিলেন না তখন ক্রুদ্ধ হইয়া পরিঘ সদৃশ বাহু সকলের দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার সহিত দিব্য সহস্র বৎসর যুদ্ধ করত ভগবান্ শ্রান্ত হইয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন, সেস্থানে হৈমবতীনাম্নী পরমশোভনা গুহায় শয়ন করিবার জন্য মহাযোগী প্রবেশ করিলেন, সেই গুহাটির দ্বাদশ যোজন আয়তন—এক দ্বার।

অহং তত্র প্রসুপ্তোঽস্মি ভয়ভীতো ন সংশয়: ॥৬৯॥

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন, ভয়ভীত আমি সেখানে নিদ্রিত হইলাম, দানবও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে নিদ্রিত দেখিয়া মনে করিল এই দানববিনাশকারী হরিকে নিহত করিব, ইহা স্থির করিয়া অগ্রসর হইলে আমার শরীর হইতে মহাজ্যোতির্ম্ময়ী দিব্যপ্রহরণধারিণী এক কন্যা সমুদ্ভূতা হইল। মুর তাহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এই রৌদ্রা অশনিপাতিনী কন্যাকে কে নির্ম্মাণ করিয়াছে। অনন্তর কন্যার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল, সেই মহাদেবী সত্বর দানবের অস্ত্র শস্ত্র ছিন্ন ও রথ চূর্ণ করত বিরথ করিলেন, দানব বাহুযুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে দেবী তাহার হৃদয়ে এক চপেটাঘাত করিলে দানব ভূপতিত হইল। পুনরায় সে উত্থিত হইয়া সেই কন্যাকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে কন্যা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। দানবের মস্তক ভূমিতলে পতিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। দানব যমালয়ে গমন করিলে ভয়পীড়িত অন্যান্য অসুরগণ পাতালে প্রবেশ করিল। অনন্তর ভগবান সমুত্থিত হইয়া দেখিলেন দানব নিহত হইয়াছে; একটি কন্যা কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত হইয়া অবস্থান করিতেছে, জগৎপতি বিস্ময় উৎফুল্ল নয়নে বলিলেন—যে দানব, সগন্ধর্ব্ব ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণ নাগগণ লোকপাল সকলকে অবলীলাক্রমে জয় করিয়াছিল তাহাকে কে বধ করিল? যাহার দ্বারা আমি নির্জ্জিত ভীত শ্রান্ত হইয়া এই গুহাতে নিদ্রিত হইয়াছিলাম, কে করুণা করিয়া আমায় রক্ষা করিল?

কন্যা বলিলেন—হে প্রভো, আমি আপনার অংশসম্ভূতা, আমি তাহাকে নিহত করিয়াছি। হে ভগবন, আপনাকে সুপ্ত দেখিয়া সেই দানব বধ করিতে উদ্যত হয়, ত্রৈলোক্যকণ্টক তাহার এই ব্যবসায় দেখিয়া দুরাত্মাকে হনন করত দেবতাগণকে নির্ভয় করিয়াছি। আমি সর্ব্বশত্রুভয়ঙ্করী আপনার শক্তি, ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার জন্য লোকভয়ঙ্কর দানবকে বিনাশ করিয়াছি, হে প্রভো! দানবকে নিহত দেখিয়া আপনি আশ্চর্যের ন্যায় কি বলিতেছেন!

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অনঘে, তোমা কর্ত্তৃক এই দানবেন্দ্র নিহত

হওয়ায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, দেবগণ হৃষ্ট পুষ্ট ও আনন্দিত হইয়াছে। দেবগণের এবং ত্রিলোকবাসিদিগের আনন্দ প্রদান করায় আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর, সেই বর যদি সুরগণেরও দুর্লভ হয় তাহাও তোমায় প্রদান করিব।

কন্যা বলিলেন—হে দেব, আপনি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং আমাকে বরদান করেন তাহা হইলে এই বর দিন উপবাসপরায়ণ নরকে আমি যেন উদ্ধার করিতে পারি। উপবাসের যে পুণ্য নক্ত ভোজনে তাহার অর্দ্ধ এবং যে একভক্ত করিবে তাহার নক্তের অর্দ্ধফল হইবে। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আমার এই একাদশী দিবসে ভক্তি সহকারে ব্রত করিবে সে কোটিকল্পকাল বৈষ্ণবস্থানে গমন করত যেন বিবিধ ভোগ সকল উপভোগ করিতে পারে। হে ভগবন্, আপনার প্রসাদে যেন ইহা হয় এই আমার বর। আমার দিনে উপবাস নক্ত অথবা একভক্ত যে করিবে তাহাকে ধর্ম্ম, অর্থ এবং মোক্ষ দান করিবেন।

শ্রীভগবান বলিলেন—হে কল্যাণি, তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই হইবে। যে লোক আমার ভক্ত এবং যাহারা তোমার ভক্ত তাহারা ত্রিলোকে বিখ্যাত হইবে এবং আমার সান্নিধ্য লাভ করিবে।

একাদশী তিথিতে আমার পরাশক্তি তুমি উৎপন্ন হইয়াছ এই জন্য তোমার নাম একাদশী হইবে। তুমি একাদশী তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। একাদশী তিথিতে উপবাসকারিগণের সমস্ত পাপ নষ্ট করত অব্যয় পদ দান করিবে। তৃতীয়া অষ্টমী নবমী চতুর্দ্দশী বিশেষ একাদশী এই তিথি সকল আমার অত্যন্ত প্রিয়া। সর্ব্বতীর্থের অধিক পুণ্য সর্ব্বদানের অধিক ফল সর্ব্বব্রতের শ্রেষ্ঠ ব্রত একাদশী ব্রত, আমি তোমায় সত্য সত্য বলিতেছি। শ্রীভগবান্ এই বর দান করত অন্তর্হিত হইলেন। আনন্দিত মনে একাদশী যথাস্থানে গমন করিল। হে অর্জ্জুন, যে মানবগণ এই একাদশী তিথিতে উপবাস করিবে তাহাদের শত্রুগণকে বিনাশ এবং পরমগতি প্রদান করিব। যে কেহ এই একাদশী মহাব্রত করিবে তাহার সর্ব্ব বিঘ্ন হরণ ও সর্ব্ব সিদ্ধি দান করিব। তোমায় একাদশীর উৎপত্তির কথা বলিলাম। এই একাদশী নিত্যা সর্ব্ব পাপ ক্ষয়কারী।

এই একাদশী মহাদেবী যজ্ঞ ব্রত দান তপস্যা কাহারও অপেক্ষা রাখেন না একাই সকলের সমস্ত পাপ দূর করিয়া তাহাকে পবিত্র করিয়া দেন।

শুক্লা কৃষ্ণা দুইটি একাদশীই তুল্যফলদায়িনী, শুক্লা কৃষ্ণা একাদশীতে ভেদভাব ব্রতকারিগণের রাখিতে নাই। যাহারা একাদশীতে উপবাস করে,

যে স্থানে সেই গরুড়ধ্বজ ভগবান অবস্থান করেন সেই পরম স্থানে গমন করিয়া থাকে। যে মানবগণ বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ তাহারা ধন্য। এই একাদশী মাহাত্ম্য সর্ব্বকালে যাঁহারা পাঠ করেন অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যলাভে সমর্থ হন, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ মানব ভগবদ্ভক্তের মুখনিঃসৃত সুমঙ্গল তাঁহার লীলাকথা শ্রবণ করেন তিনি কোটীকুলসহ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া পূজিত হন। একাদশীমাহাত্ম্য যিনি একপদও শ্রবণ করেন তাঁহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নষ্ট হয় এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

বিষ্ণুধর্ম্মঃ সমো নাস্তি গীতার্থেন ধনঞ্জয়॥
একাদশী সমং নাস্তি ব্রতং নাম সনাতনম্॥১:২॥

হে অর্জ্জুন, গীতার্থের সমান বিষ্ণুধর্ম্ম আর দ্বিতীয় নাই এবং একাদশী তুল্য অপর সনাতন ব্রত নাই।

শিষ্য। অপূর্ব্ব একাদশীর মহিমা!

গুরু। হাঁ বৎস, পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে একাদশীর মহিমা সমস্বরে ঘোষিত হইয়াছে। যদি কোন ভক্ত অন্য কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র জগজ্জননী মহামায়া একাদশীর আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসে শ্রীভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হন। একাদশী মহাদেবীর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

—•—

আছ জাগি' নিত্য মোর লাগি'!

[শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী]

শুনেছি তোমার বাণী ক্ষণে ক্ষণে দিকে দিগন্তরে—
অসীম অম্বরে!
বিহগের কলস্বনে, মেঘ-মন্দ্রে, সাগর-গর্জ্জনে,
তোমার অনন্ত সুর বাজে এসে আমার শ্রবণে!
স্তব্ধ হ'য়ে শুনি আমি—সে তব বিচিত্রধ্বনি মাঝে—
কণ্ঠ তব বাজে!

দেখেছি তোমার রূপ দৃশ্যে দৃশ্যে এ মহাভুবনে—
নিস্পন্দ-নয়নে!
ভূধর-প্রান্তর-বন-নদ-নদী-সূর্য্য-চন্দ্র-তারা,
বিচিত্র বর্ণের ছটা, অপরূপ রূপ সংখ্যা-হারা,
সকলি তোমার মূর্ত্তি—তুমি ছাড়া আর কিছু নাই,
দেখি আমি তাই!

তব বাণী, তব রূপ—তোমারি ত' নিয়ত প্রকাশ—
ভ'রি চিদাকাশ!
হোক্ তাহা মনোহর, কিংবা হোক্ মহাভয়ঙ্কর,
সবার মাঝারে আছ তুমি সত্য শিব ও সুন্দর,
অনুভব করি আমি, তুমি শুধু রহিয়াছ জাগি'
নিত্য মোর লাগি,'!

—০—

স্মরণমঙ্গল

[শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত]

ভগবৎ লীলা মাধুরী নিত্য নূতন। তাহা যতই স্মরণ করা যায়, ততই চিত্তের নব নব ভাবান্তর ঘটিতে থাকে! ...ক্রমশঃ চিত্তের স্থায়ীভাব লাভ!

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা"—রাখাল বেশে যিনি ব্রজে গোচারণ করিতেন, বংশীধ্বনি করিতেন, দাস-সখা পরিবৃত তাঁর সেই অপরূপ রূপ—অনির্বচনীয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর,—বিশিষ্ট রসগুলির বিশিষ্ট সাধক নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী শ্রীভগবানের ঈপ্সিত লীলারস আস্বাদনে আনুকূল্য সাধন দ্বারা ধন্য হইয়াছেন। মধুর-রস সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বলিয়াছেন—

"পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
দুই তিন গণনে পঞ্চ পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে,
শান্ত দাস্য সখ্য বৎসল্য গুণ মধুরেতে বৈসে ॥"

—মধ্য, ৮ম

দ্বাপরের শেষে—ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। দাস সখা পিতামাতা পরিজন সমাবৃত শ্রীভগবানের নরলীলা! শ্রীভগবান এখানে মানুষের নিজ জন। মাধুর্য্যের কাছে ঐশ্বর্য্য নিষ্প্রভ! ঐশ্বর্য্যলীলায় শ্রীভগবানেরও তৃপ্তি নাই—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।"

—চৈঃ চঃ।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে যে ভজন তাহাতে সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, সালোক্য—এই চতুর্বিধ মুক্তি মিলে। ভক্ত সাযুজ্য চাহেন না, 'যাতে ব্রহ্ম ঐক্য।'

কিন্তু বিশুদ্ধ যে ভক্তিযোগ তাতে মুক্তির কথাই নাই। তাঁর প্রতি শুধু তাঁর জন্যই যে অকৈতব ভক্তি,—তাহার স্রোত জগতে প্রবাহিত করিতে শ্রী-ভগবানকে নিজেই ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে হয়! —

"যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে—
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে।"

—চৈঃ চঃ, আদি, ৩য় অধ্যায়।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে ব্রজের নিগূঢ় রস মানুষ নবভাবে আস্বাদন করিতে পাইয়া ধন্য। গোদাবরীতীরে চৈতন্যদেবের সহিত রায় রামানন্দের মিলনে যে সকল অপূর্ব প্রসঙ্গ হইয়াছিল তাহাতে ভগবৎ প্রেমের চূড়ান্ত কক্ষায় প্রবেশের মিলে অভিনব দিগ্-দর্শন। যতক্ষণ ঐশ্বর্য্যপ্রধান বিধিমার্গের কথা হইতেছিল, মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বলিতেছিলেন—"এহ বাহ্য, আগে কহ আর"। পরিশেষে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধ মাধুর্য্য রসের আলোচনায় মহাপ্রভু তৃপ্ত হইতে থাকেন ও কান্তা প্রেমই যে সাধ্য সার তাহা সুনিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করিলেন—

"পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেম এই প্রেমা হৈতে
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম।

আপনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রেমের সাক্ষাৎ বিগ্রহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যাহা জীবের এতদিন অজ্ঞাত ছিল,—তাহা আপামরে দান করিয়া গেলেন।

কলির জীব সর্ববিষয়ে দুর্বল, শ্রীহরিনামই দুর্বলের মহাবল, মহারসায়ন স্বরূপ! শ্রীনামের সহিত আপনাকে মিলাইয়া দিয়া তিনি কলিহত জীবকে অহরহঃ সর্বপাপহর শ্রীহরিনাম গ্রহণে তৎপর হইতে উপদেশ করিলেন। শ্রীনাম লইতে লইতেই চিত্তশুদ্ধি ও ইষ্টসাক্ষাৎকার! চক্ষের ত ঐখানেই সার্থকতা—

"কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্র ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান ॥"

মহাপ্রভুর কার্য্যাবলী কাশীর বৈদান্তিক প্রকাশানন্দ হীনচক্ষে দেখিতেন। তিনি মহাপ্রভুকে একদা বলিলেন—

"সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সংকীর্ত্তন।
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্নাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম ॥"

ইহার উত্তরে—

"প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার ॥
কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হয় সংসার মোচন।
কৃষ্ণ নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাঞি কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥"

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের প্রভাব এইরূপই। এই প্রেমানন্দের কাছে ব্রহ্মানন্দাদির তুলনাই হয় না! প্রেমার ফলে চিত্ততনুর নব নব ক্ষোভ। কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য জাগে তীব্র লৌল্য। প্রেমার স্ফূর্ত্তিতে ভক্ত হাসে, কান্দে, উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করে। কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভক্ত-চিত্ত হয় ভাসমান! প্রকাশানন্দকে মহাপ্রভু 'হরের্নাম' শ্লোকটি শুনাইয়া বলিলেন—

"এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন করি॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়।
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥

সশিষ্য প্রকাশানন্দের মন ফিরিয়া গেল।

জগৎগুরু নিজে ধর্ম আচরণ করিয়া জগতবাসীকে সত্যপথ দেখাইয়া গিয়াছেন। সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানকে লাভ করাই মানব জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এজন্য সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী শক্তির স্ফূর্তি চাই। জীব অনাদি বহির্মুখ। সাক্ষাৎ স্বরূপ শক্তির কৃপারজে পুষ্ট উত্তম ভক্তসংস্পর্শেই তটস্থা জীবশক্তি কৃষ্ণোন্মুখ হয়, আর 'প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হ'লে ভবনাশ পায়।' সদ্গুরু কৃপাতেই ভগবৎ-সুখ-তাৎপর্য্যময়ী বাসনা-নিষ্ঠ নিষ্কাম উত্তম ভক্তসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে! কান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু লক্ষ্য করিয়াছিলেন—

"কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ।
ভক্তি গন্ধ নাই যাতে যায় ভব রোগ॥"

তাই তিনি নিয়মিত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে জলতুলসী নিবেদন ও সদৈন্যে রোদনে শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতেন—যাহাতে তিনি আবির্ভূত হইয়া স্বীয় প্রেমভক্তি জগতে আবার প্রতিষ্ঠিত করেন! বর্তমান জগতে ভোগের উপকরণ সংগ্রহার্থেই জড়বিজ্ঞান-প্রভাবপরিচালিত জনসমাজ ব্যতিব্যস্ত। চারিদিকে দুঃখ দৈন্যের তাণ্ডবও চলিয়াছে। মানুষের ক্লেশের মাত্রাই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। এর বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে পরাবিদ্যার অভিযানও চলিয়াছে। কিন্তু তাহা আরো ব্যাপকভাবে হওয়া দরকার। এজন্য চাই ভগবৎ কৃপা। তাঁর কৃপা-ঈক্ষণেই মানুষের শুভবুদ্ধির হয় উদয়। —'প্রেয়কে' পারে সে চিনিতে, 'শ্রেয়কে' বরণ করিতেই হয় সে ব্যগ্র!

মানুষের জীবন কর্মব্যস্ত। তাহার মধ্যেই একটু সময় করিয়া লইতে হয়।

ধর্ম-কার্য্য স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অশেষ মঙ্গলদায়ক। সদ্‌গুরু নির্দেশানুযায়ী নবধাভক্তির যাজন প্রত্যেক গৃহীরই অবশ্য করণীয়। নবধার মধ্যে স্মরণাঙ্গ ভক্তির অনুশীলনে মন একাগ্র হইয়া উঠার পায় সমধিক সুযোগ ও ভগবৎলীলা প্রভাবে হইয়া পড়ে প্রভাবান্বিত।

সাধকপ্রবর নরোত্তম ঠাকুর লিখিয়াছেন—"মনের স্মরণ প্রাণ"। তাঁর অতুলনীয় প্রেমভক্তিমূলক পদগুলির মধ্যে স্মরণাঙ্গ ভক্তির বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। চাই ভক্তমুখে নিত্য লীলাকথা শ্রবণ! চাই নিত্য স্বাধ্যায়—তবেই স্মরণাঙ্গ ভক্তির যাজন সার্থকতর হইয়া উঠার পায় সুযোগ!

বাসনা - বিনাশ

[শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়]

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া মানুষ ইচ্ছা না থাকিলেও পাপ কার্য করিয়া থাকে।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্ পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

—গীতা ৩।৩৬

অধিকাংশ লোক জানে, অথবা বিশ্বাস করে, যে পাপ করিলে নরকে যাইতে হয়। পাপ করিয়া আপাততঃ যে সুখ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা নরকের যন্ত্রণা অনেক বেশী কষ্টপ্রদ। তথাপি পাপ কার্য্য করিবার প্রলোভন জয় করিতে পারিয়াছে এরূপ লোকের সংখ্যা কত কম। ইহার কারণ কি? মানুষ জানে পাপের কি ফল এবং প্রকৃত পক্ষে পাপ করিতে চাহে না। তথাপি সে পাপ করে। এজন্য এরূপ মনে হয় কেহ যেন তাহাকে জোর করিয়া পাপ করাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যাহা মানুষকে জোর করিয়া পাপ করায় তাহার নাম 'কাম' অথবা 'ক্রোধ।' একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন অবস্থার নাম কাম এবং ক্রোধ। পূর্ব্বের অবস্থার নাম কাম, পরের অবস্থার নাম ক্রোধ। কাম বাধা প্রাপ্ত হইলে ক্রোধে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন;

'কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে'

—গীতা ২।৬২

"কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়।"

এই যে বস্তু যাহাকে কাম অথবা ক্রোধ বলা হইয়াছে তাহাকি কোনও চেতন পদার্থ? ইহা যখন মানুষকে জোর করিয়া কাজ করায় তখন মনে হইতে পারে যে ইহা চেতন পদার্থ। কিন্তু তাহা নহে। জীবাত্মা এবং পরামাত্মা ছাড়া জগতে কোন চেতন বস্তু নাই। সুতরাং কাম বা ক্রোধ চেতন পদার্থ নহে। আমরা ইহ জন্মে বা পূর্ব্ব জন্মে যে সকল অন্যায় কার্য্য করিয়াছি তাহারই ফল কাম বা ক্রোধরূপে আবির্ভূত হয়। ইহা মেঘের ন্যায় আমাদের জ্ঞান আবৃত করিয়া রাখে। "ধূম যে ভাবে অগ্নিকে আবৃত করিয়া রাখে, ধূলি যেরূপ আয়নাকে আবৃত করিয়া রাখে, গর্ভবেষ্টনকারী চর্ম্ম যেরূপ গর্ভকে আবৃত করিয়া রাখে সেইরূপ কামনা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে।"

'ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নি র্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥

—গীতা ৩।৩৮

যে ব্যক্তি কামকে জয় করিয়াছে, যাহার জ্ঞান আবৃত হয় নাই, তাহার পাপ কার্য্য করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, সে সর্ব্বদা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে; সুতরাং তাহার সিদ্ধিলাভের পথে কোন বাধা থাকে না। এজন্য কামনা-জয়কে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলা যায়। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, আমরা কামনার অধীন না হই এবং আমাদের জ্ঞান আবৃত না হয়। এজন্য তিনি বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন কামনা বস্তুটি কি, সে কোথায় বাস করে এবং কি ভাবে তাহাকে বিনাশ করিতে হয়। ইহা বাস করে ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে, মন এবং বুদ্ধির মধ্যে। ইন্দ্রিয়, মন, এবং বুদ্ধির সাহায্যে ইহা আমাদের জ্ঞান আবৃত করে। যাহার ফলে আমরা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা না করিয়া বাহ্য বস্তুর অনুসন্ধান করি।

'ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি রস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্'॥ —গীতা-৩।৪০

ইহার ভাষ্যে রামানুজ লিখিয়াছেন যে, "বিমোহয়তি" শব্দের অর্থ:—"বিবিধ রূপে মোহগ্রস্ত করাইয়া দেয়, আত্মজ্ঞানবিমুখ করে এবং বাহ্য বিষয় উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি জাগায়।" বাসনাকে বিনাশ করিতে হইলে বাসানার যে সকল বাসস্থান (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি) ইহাদিগকে সংযত করা প্রয়োজন। তাহাদিগকে সংযত করিতে পারিলে কামনা বা বাসনা যাহা তাহাদের উপরে অবস্থান করে তাহাকে বিনাশ করা যায়।

"তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥"

—গীতা ৩।৪১

"অতএব হে অর্জ্জুন তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের বিনাশক এই কামনাকে বধ কর। 'প্রজহি' শব্দের অর্থ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন 'ত্যাগ কর'। রামানুজ 'প্রজহি' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'বিনাশ কর'। উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। বাসনাকে যদি পরিত্যাগ করা যায়, তাহার বাসস্থান ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি হইতে যদি তাহাকে বিদূরিত করা যায় বাসনা যদি অবস্থান করিবার কোন স্থান না পায় তাহা হইলে সে আপনা হইতে ধ্বংস হইয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৩।৪১ শ্লোকে যাহা বলিলেন তাহা পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকে বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ইন্দ্রিয়গুলি স্থূল দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ, মন ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি মন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং বুদ্ধি অপেক্ষা "উহা" শ্রেষ্ঠ। "উহা" বলিয়া কাহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে, শ্লোকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই।

'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥

—গীতা ৩।৪২

"ইন্দ্রিয়গুলিকে স্থূল দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে কারণ ইন্দ্রিয়গুলি স্থূল দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহকে সঞ্চালিত করে। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ কারণ মন ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রেরণা দেয়। মন বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় এজন্য মন অপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে বস্তু তাহাকে ভগবান 'সঃ' এই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে 'সঃ' শব্দের অর্থ আত্মা। আত্মা যে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহা সুবিদিত। কিন্তু পূর্ব্বের শ্লোকে (৩।৪০ শ্লোকে) আত্মার কোনও উল্লেখ নাই। ঐ শ্লোকে কাম বা কামনাকে 'এনম্' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এজন্য এরূপ ব্যাখ্যা করাই সঙ্গত হয় যে 'সঃ' শব্দে কামকেই লক্ষ্য করা করা হইয়াছে এবং আচার্য্য রামানুজ এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কাম, বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ বুদ্ধি কামের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আচার্য্য শঙ্করের মতে কামনাকে বিনাশ করিবার পূর্ব্বে আত্মাকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু রামানুজের মতে তাহার প্রয়োজন নাই। বুদ্ধি কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া মনকে স্থির করিতে পারে, মন স্থির হইলে

কামনা বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীধর স্বামী আচার্য্য শঙ্করের মত অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে 'সঃ' শব্দের দ্বারা আত্মাকেই গ্রহণ করা উচিত। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।৪১ শ্লোকে আত্মার উল্লেখ নাই বটে কিন্তু তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে (৩।৪০) দেহিনম্ বলিয়া আত্মার উল্লেখ আছে, কিন্তু এইভাবে 'সঃ' শব্দের দ্বারা পূর্ব্বের শ্লোককে বাদ দিয়া তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী (৩।৪০) কে লক্ষ্য করা ততদূর সন্তোষজনক হয় নাই। কামানার বিনাশ সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন যে, আমাদের উপলব্ধি করা উচিত, ইন্দ্রিয় এবং বাহ্য বস্তুর প্রভাবে আমাদের বুদ্ধি বিকৃত হয়, কিন্তু আত্মা কখনও বিকৃত হয় না। আত্মা সর্ব্বদা নির্ব্বিকার সাক্ষীরূপে অবস্থান করে। এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করা প্রয়োজন। মন স্থির হইলেই বুদ্ধি বিনষ্ট হয়।

আঁটপুরে একদিন

[স্বামী জগদীশ্বরানন্দ]

গতবর্ষে শুভ সাতই পৌষ শুক্রবার প্রাতঃকালে বেলুড় ধর্ম্মচক্র হইতে বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণকুমার সুকুমারকে সঙ্গী করিয়া বাসে চড়িয়া হাওড়া ময়দানে মার্টিন-রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তথায় শালকিয়ার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র আঢ্য আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁহার জন্মস্থান আঁটপুর বলিয়া আমরা তাঁহাকে পাইয়া সুখী হইলাম। আমরা সকাল ৭।৷০ টার ট্রেনে উঠিয়া আড়াই ঘণ্টায় ২৫ মাইল রেলপথ অতিক্রম করিয়া বেলা দশটায় আঁটপুর ষ্টেশনে পৌছিলাম। আঁটপুর হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন পল্লীগ্রাম। এখানে একটি হাইস্কুল ও ডাকঘর আছে। এই গ্রামে অনেক দ্বিতল অট্টালিকা দেখা যায়। এই গ্রামের অনেক অধিবাসী অর্থশালী হইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেণ। প্যারীমোহন সরকার, ডাঃ রসিকলাল দত্ত ও বেলুড়মঠের স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ অমর পুরুষ আঁটপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা প্রথমে পরিত্যক্ত আঢ্য বাড়ী দেখিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া মিত্র বাটীস্থ রাধাকান্তজীর মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন বকুলগাছ ও চাঁপাফুল গাছ আছে। মন্দিরের বেদীতে রাধাকান্ত ও শ্রীরাধার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির দেওয়ান কৃষ্ণরাম মিত্র কর্ত্তৃক নির্মিত হয়। নিষ্ঠাবান কৃষ্ণরাম বর্দ্ধমান মহারাজার দেওয়ান ও কৃষ্ণভক্ত

ছিলেন। তিনি বৈদ্যবাটী হইতে গঙ্গাজল ও গঙ্গামাটী আনাইয়া এবং তাহাতে ইঁট কাটাইয়া ও পোড়াইয়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা প্রায় একশত ফুট উচ্চ এবং সুক্ষ্ম কারুকার্য্য মণ্ডিত। প্রাচীন বাংলায় মৃৎশিল্প কত সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহার নিদর্শন এই মন্দির। মন্দিরের সম্মুখস্থ রাসমঞ্চ দর্শনকালে আমরা শুনিলাম, রাসপূর্ণিমার সময়ে তথায় বড় মেলা বসে। তখন শত শত নরনারী পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রাম হইতে দেবতা দর্শনে তথায় আসিয়া থাকেন।

মিত্রবাটীর মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দের জন্মস্থানে মর্ম্মর ফলক স্থাপিত হইয়াছে। তথায় সেদিন স্বামী প্রেমানন্দের জন্মোৎসব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। স্বামী প্রেমানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন এবং ১২৬৮ সালে ২৬শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার শুক্লানবমীতে তিনি তথায় ভূমিষ্ট হন। মিত্র বাড়ী তাঁহার মামা-বাড়ী ছিল। পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল বাবুরাম ঘোষ। মিত্র বংশের ন্যায় ঘোষবংশও আঁটপুরে প্রসিদ্ধ। বাবুরাম মাহারাজের ছোটভাই শ্রীশান্তিরাম ঘোষ অদ্যাপি জীবিত আছেন। আমরা মিত্র বাড়ী হইতে ঘোষবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টমাস ইভের সন্ধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের নয় জন শিষ্য তথায় হোমানল জ্বালিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সুদৃঢ় সঙ্কল্প করেন। সেই সুশুভ সঙ্কল্প দিবস স্মরণার্থ তথায় একটি মর্ম্মর ফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত ফলক দুর্গামণ্ডপের সম্মুখে বিদ্যমান এবং তথায় স্মৃতিসভার আয়োজন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের যে নয়জন শিষ্য উক্তদিন শুভ-সঙ্কল্প করেন তাঁহাদের নাম স্বামী বিবেকানন্দ, শিবানন্দ, অভেদানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, ত্রিগুণাতীতানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও প্রেমানন্দ। তখন তাঁহারা পূর্বাশ্রমের নামেই পরিচিত ছিলেন এবং সন্ন্যাসী হন নাই। বাবুরামের গর্ভধারিণী মাতঙ্গিনী দেবীর সস্নেহ আহ্বানে তাঁহারা আঁটপুর গমন করেন। মাতঙ্গিনী দেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমভক্ত ছিলেন। আমরা উক্ত ফলক দর্শনান্তে শ্রীসারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত কক্ষদ্বয় দেখিতে দোতলায় উঠিলাম। একটি কক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ দুইবার আঁটপুরে যাইয়া বাস করেন। প্রথমবার ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বড় দিনের সময়। তাঁহার দ্বিতীয়বার আগমনের বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে উল্লিখিত এবং তখন তিনি মৌন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ-জননী সারাদাদেবীও দুইবার আঁটপুরে পদার্পণ পূর্ব্বক যে ঘরে বাস করেন আমরা তথায় যাইয়া বসিলাম। শ্রীমা প্রথমবার আঁটপুরে যান ১২৯৪ সালে ফাল্গুনের শেষ ভাগে এবং দ্বিতীয় বার ১৩০১ সালে শারদীয়া দুর্গাপূজার সময়। ঘোষবাড়ীতে পূর্ব্বেও দুর্গাপূজা হইত ; কিন্তু কোন

কারণে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। সন ১৩০১ সালে পুনরায় শারদীয়া দুর্গাপূজা শ্রীমার শুভাগমন উপলক্ষ্যে আরম্ভ হইহা অদ্যাবধি চলিতেছে। তখন আঁটপুর পর্য্যন্ত রেলপথ হয় নাই। শ্রীমা হরিপাল পর্য্যন্ত ট্রেনে যাইয়া তথা হইতে পাল্কীতে আঁটপুরে গমন করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং স্বামী প্রেমানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তিনিও একবার কলিকাতা হইতে আঁটপুরে গিয়াছিলেন। তাঁহার মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্ত্তৃক আঁটপুর হাইস্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হয় সম্ভবত: ১৯২০।২১ খৃষ্টাব্দে। এইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদিগের নিকট আঁটপুর পুণ্যতীর্থ। উক্তগ্রামের ঘোষবাড়ীতে যে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে তাহার জলই গ্রামবাসীগণ পান করিতেন। তখন তথায় নলকূপ স্থাপিত হয় নাই। উক্ত পুষ্করিণীর জল সুনির্ম্মল ও সুস্বাদু ছিল। বেলুড়মঠের স্বামী ব্রহ্মানন্দ আঁটপুরে অবস্থানকালে ঐ জল পান করিতেন এবং উহার সুস্বাদ মৃত্যুশয্যায়ও স্মরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীস্থ বলরাম মন্দিরে যখন তিনি অন্তিমশয়নে শায়িত তখন তিনি স্বীয় শিষ্য হরেরাম ঘোষকে উক্ত পুকুরের জল আনিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্র নাথ কাঞ্জিলাল উহাতে প্রথমে আপত্তি করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ পুনঃপুনঃ হরেরাম বাবুকে নির্দ্দেশ দেওয়ায় হরেরামবাবু ডাক্তারের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আঁটপুর হইতে উক্ত পুকুরের জল ও কয়েকটি কচি তাল লইয়া আসেন। ব্রহ্মানন্দজী ঐ পুকুরের জল ও কচি তালের জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

আঁটপুরের আরও একটি দর্শনীয় দেবস্থান বড় কালীতলা। তথায় প্রতিবৎসর সুবৃহৎ কালী প্রতিমায় দেবীর আরাধনা হয়। তথায় কোন মন্দির বা মূর্ত্তি নাই। শুধু একটি তালপাতার চালা ও বাঁধানো চাতাল দেখা গেল। একতলা ঘরের মত অথবা তদপেক্ষা উচ্চ কালীমূর্ত্তি কালী পূজার রাত্রিতে তথায় আনিয়া পূজিত হয়। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উক্ত প্রতিমার বিসর্জ্জন করা হয় পার্শ্ববর্ত্তী ছোট পুকুরে। পূর্ব্বে কালীপূজার সময়—তথায় বহু ছাগ বলি হইত এবং এখনও বলি হইয়া থাকে। পুরুষ পরম্পরাক্রমে কোন বংশের কারিগর ঐ প্রতিমা তৈয়ার করেন। প্রবাদ আছে যে, দেওয়ান কৃষ্ণরামের দীক্ষাগুরু প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ কলেরা মহামারীর সময় তথায় কালীপূজা করিয়া মহামারী নিবারণে সমর্থ হন। তদবধি তথায় প্রতি বৎসর কালীপূজা হইয়া আসিতেছে। আঁটপুরে কৃষ্ণভক্তি ও কালীভক্তির স্রোত সমান বেগে প্রবাহিত ছিল। বঙ্গীয় ধর্ম্মগঙ্গার ইহাই বিশেষত্ব বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীর প্রতিভা বহুপূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মসমন্বয়ে প্রয়াসী। আঁটপুরে বহু প্রাচীন শিবমন্দিরও দেখা গেল।

শোনা যায়, আনোর খাঁ ও আটোর খাঁ নামক দুই বিখ্যাত মুসলমান জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের নামানুসারে আঁটপুর ও আনোরবাটি নাম হইয়াছে। আঁটপুরে আনোরবাটি অংশে প্রাচীন শ্যামসুন্দর মন্দির বিরাজমান। উক্ত মন্দিরের ফটকের সম্মুখে প্রকাণ্ড বকুলগাছ ও চাঁপাগাছ দেখা যায়। শাখাপ্রশাখাসমন্বিত বৃহৎ কাণ্ডযুক্ত বটবৃক্ষবৎ এতবড় বকুলগাছ পূর্ব্বে কোথায়ও দেখি নাই। উক্ত মন্দিরে নিমকাঠের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ বিরাজিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি সুন্দর নাট-মন্দির বিদ্যমান। তথায় স্বধাম-গত নামসিদ্ধ রামদাস বাবাজী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে যে দ্বাদশ বিখ্যাত শ্যামসুন্দর মন্দির বা পাটবাড়ী অবস্থিত তন্মধ্যে উহা অন্যতম। ডাক্তার আঢ্য ও আমি মন্দিরের পূজককে ডাকাইয়া মন্দির খোলাইয়া ভগবান শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলাম এবং ভক্তিভরে হাততালি দিয়া কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণসঙ্গীত গাহিলাম। উক্ত স্থান আমার কাছে খুব ভাল লাগিল ও স্থান-মাহাত্ম্যে ক্লান্ত মনও ভক্তিভাবে পরিপ্লুত হইল। এই প্রাচীন মন্দির নিতাই প্রভুর সহধর্ম্মিণী জাহ্নবী দেবীর নির্দ্দেশে ঠাকুর পরমেশ্বরী দাস কর্ত্তৃক স্থাপিত। পরমেশ্বরী দাস একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বৈষ্ণব সাধক ছিলেন। এবং জলের উপর খড়ম পায়ে দিয়া হাঁটিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার গুরুস্থান ছিল বৈষ্ণবতীর্থ খড়দহে। একবার তিনি গুরুদর্শনে খড়দহে যান। তখন গুরু নিত্যানন্দ প্রভু শিষ্যকে আদেশ দেন, তাঁহার গুরুর জন্য অকালের আম আনাইয়া দিতে। পরমেশ্বরী দাস পরমগুরুর সেবার জন্য স্বীয় গুরুর নির্দ্দেশে দুইবার খড়ম পায়ে দিয়া জলের উপর হাঁটিয়া একটি পুকুর পার হইয়া যান এবং তথায় একটি গাছ হইতে আম পাড়িয়া আনিয়া স্বীয় গুরুকে দেন। সেইগাছে বার মাস আম ফলিত। উক্ত অলৌকিক ঘটনা দর্শনে গুরু বিস্মিত হন এবং শিষ্যকে আঁটপুরে যাইয়া শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপনের আদেশ দেন। গুরুদত্ত দারুময় শ্যামমূর্ত্তি আনিয়া পরমেশ্বরী দাস আঁটপুরে একটি বৃক্ষতলে স্থাপন করেন ও তথায় সেবা পূজা করিতে থাকেন। তিনি বৃক্ষতলে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া একদিন ধ্যানমগ্ন আছেন। স্থানীয় মূঢ় লোকেরা তাঁহাকে ভণ্ড সাধু মনে করিয়া একটি মৃত পচা শৃগাল তাঁহার কোলে নিক্ষেপ করে। নিরভিমান বৈষ্ণব সাধক অজ্ঞজনের উপহাস অম্লানমুখে সহ্য করেন এবং মৃত শৃগালের গায়ে হাত বুলাইয়া বলেন, "তুই বনের জন্তু বনে যা ; এখানে থাকিস্ না।" সিদ্ধ ভক্তের বাক্য তৎক্ষণেই সফল হইল। মৃত শৃগাল পুনর্জ্জীবিত হইয়া দৌড়াইয়া তাঁহার কোল হইতে বনে চলিয়া গেল। এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া স্থানীয় মূঢ়গণ লজ্জিত

হইল এবং আঁটপুরে সাড়া পড়িয়া গেল। দেওয়ান কৃষ্ণরাম এই ঘটনা শুনিয়া পরমেশ্বরী দাসের সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। এই প্রাচীন তীর্থে এখনও অন্নকূটাদি বার্ষিক উৎসবের সময় শতশত নরনারী অনাহুত হইয়া মিলিত হন। আধ্যাত্মিক আকর্ষণ ব্যতীত অন্য কোন আমন্ত্রণ তাঁহারা পান নাই।

বাংলা দেশ তীর্থে পরিণত এই সকল দেবস্থানের অবস্থানে। এই সকল মন্দির কালক্রমে অনাদৃত হইয়াছে। সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান যুগে ধর্ম্মজাগরণ আনিতে হইবে। পুরাতন ধর্মোৎসবসমূহকে নবরূপে সম্পন্ন করাই আধুনিক প্রয়োজন। আমরা আঁটপুর তীর্থস্থানে সারাদিন কাটাইয়া রাত্রিকালে পূর্ববৎ স্বস্থানে ফিরিলাম।

—০—

বাধা

[শ্রীযোগেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ-ই]

স্থির করি মন, তোমাতে যখন সঁপিব এ মন ভাবি
কারা সব আসে ঘিরে আশে-পাশে করে মোর' পরে দাবি।
নানা কথাছলে ভুলায়ে আমারে
মন হতে দেয় সরায়ে তোমারে,
তাদের কথায় মন পড়ে রয় ভুলে যাই আর সবই।
লুকাইতে চাই দূর নিরালায়
তোমার ধ্যানেতে রহিতে সেথায়,
পলাইয়া যাই পাছে তারা ধায়, বলে—ওরে কোথা যাবি।
দিন যায় চলে ডুবিল তপন
তোমাতে-আমাতে হল না মিলন,
হতাশায় মন কেঁদে কয়—আর কবে তার দেখা পাবি!

—০—

নাসিক-কুম্ভে নাম প্রচার

[শ্রীগোবিন্দদাস কিঙ্কর]

(পূর্বানুবৃত্তি)

নির্দ্দেশকেরাও যখন আমাদের বাক্যে মাত্র বিশ্বাস করে আমাদের ছেড়ে দিলে তখন টাঙ্গাওয়ালাও আশ্চর্য্য হয়ে গেল—এবং তার পরেই সঙ্গে সঙ্গে নামও করতে লাগলো।

৪ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে আমরা পঞ্চবটীর নামকরা পণ্ডিত-পাণ্ডা শ্রীযুক্ত মামা শুক্লজীর দরজায় এসে দেখি ভদ্রলোক আমাদের অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। বোম্বায়ের গুরুভাই পাতিলদা তাঁর বন্ধুকে দিয়ে (বন্ধু শুক্লজীর আত্মীয়) শুক্লজীর বিরাট ভবনের গৃহস্থগমনাগমনশূন্য এক বিরাট যায়গা এক-মাসের জন্য বিনাশুল্কে আমাদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কুলকর্ণীদা সংবাদ পেয়ে আগেই বাড়ী দেখে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের অপূর্ব্ব মহিমা, তাই কুম্ভের অবর্ণনীয় ভিড়েও শুক্লভবনে শুল্কহীন ব্যবস্থার এমন সহজ আয়োজন।

শুক্লমহাশয় বড় সজ্জন। স্বল্প-মিষ্টভাষী। আমাদের অভ্যর্থনা করে তাঁর দোতলায় নিয়ে গিয়ে আমাদের জন্য রাখা নির্দ্দিষ্ট একটী বিরাট হলঘর দেখালেন। কল-পায়খানা-আলো মাইক চালাবার জন্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সব অযত্নসুলভ। তবু গৃহস্থগৃহে বাস ঠাকুরের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত হওয়ায় আমাদের মন উঠ্‌লো না বিশেষ করে সেবানন্দ বড় উস্‌খুস্‌ করতে লাগলো। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে প্রসন্নতার পাতলা-আবরণে দুর্ভাবনাকে চাপা দিয়ে সঙ্গীদের বললাম, "তোমরা নাম করতে থাক আমি ঘুরে আসছি—দেখনা ঠাকুর ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছেন"।

ওদিকে শুক্লমহাশয় আমাদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে কুলকার্ণীদা সহ আমাকে ডেকে নিয়ে বলতে লাগলেন—"দেখুন, এই সেদিন গোদাবরীর বন্যায় সমস্ত কুম্ভক্ষেত্র ভাসিয়ে দিয়ে গেছে, কৌপীনৈকসম্বল সাধুরা পর্য্যন্ত শুকনো গাছতলাও না পেয়ে কেউ গৃহীবাড়ী ঢুকেছেন—ব'লে, না-ব'লে, আর বাকী সব দূরে চলে গেছেন। টাকা খরচ করেও বাড়ীভাড়া বা তাঁবু পাবেন না, আর এত মোট ঘাট নিয়ে তরুতলবাস সম্ভবও হবে না এ বাদলার দিনে। দুচারদিন এখানে কষ্ট করুন—আমিও চেষ্টা করে দেখি।"

তাঁকে অবস্থা বুঝিয়ে কুলকার্ণীদাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গীরা

পরমানন্দে নাম করতে লাগলেন। বেরোবার আগে আশীর্ব্বাদান্তে ঠাকুর লিখেছিলেন—'জানি তোদের কারো সাহায্যের অপেক্ষা করে না।' তাঁর কপাক'টীকেই ভাবনা করতে করতে ত্বরিৎ পদসঞ্চারে বোম্বে-আগ্রা রোড্ ধরে চলতে লাগলাম চতুঃসম্প্রদায়ের আখড়ার দিকে। আখড়ার মোহান্ত শ্রীমদ্ দীনবন্ধুদাসজী আমাদের পূর্ব্বপরিচিত এবং ঠাকুরেরও একজন পরম ভক্ত। পথে বোধ হয় কুলকাণীদার সঙ্গে একটীও কথা হয় নি। গোদাবরীর পুল পার হয়ে যখন আখড়ায় ঢুকবো তখন কুলকাণীদা বললেন "৫।৭ দিন আগে আপনাদেরই জন্য আমি স্থানার্থী হয়ে এখানে এসেছিলাম, স্থান এখানে নেই।" তাঁর কথায় বিশেষ ধ্যান না দিয়ে আখড়ায় ঢুকে মন্দিরের উপরের তলায় গিয়ে দেখলাম মোহান্ত মহারাজ কয়েকজন বিশিষ্ট মহাত্মার সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত। শিষ্টাচারের অপেক্ষা না করে প্রণাম ক'রে তাঁদের আলোচনার মাঝখানেই পরিচয় সহ আমাদের উদ্দেশ্য জানালাম।

সদাহাস্যমুখে তিনি প্রথমেই বললেন—ক্যা মহারাজ অবতক মৌনমেঁ হী হ্যায়? বলেই তাঁর সঙ্গীদের বললেন—"ঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ মহারাজীর শিষ্য এঁরা। মহারাজ মৌনে ওঙ্কারেশ্বরে আছেন। এমন উচ্চকোটীর মহাপুরুষ আমি এ পর্য্যন্ত দেখিনি" বলেই উঠে পড়ে ওঁদেরকে বসতে বলে আমাদের নিয়ে নীচে নেমে এসে একটী তালাবন্ধ ঘর খুলে দিয়ে বললেন "এ রকম ভিজে ঘরে আপনাদের থাকতে বলার আমার সাহস নেই; খোলা যায়গায় থাকলে যেখানে বলবেন সেখানেই ঠিক করে দোব। ঘর মাত্র এটীই আছে।" বন্যার জলের দরুণ মেজেতে কাদা থাকলেও আমি যেন হাতে আকাশ পেলাম। মহারাজকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতে দিতে ঐ ঘরই পছন্দ করে সঙ্গীদের আনবার জন্য দুজনেই চলে গেলাম।

ওখানে গিয়ে দেখি মাইকসহ নাম চলচে পূরবী রাগিণীতে। ঘর ভরতি লোক। সেবানন্দ, কুমারনাথ, কৃষ্ণদা সকলে নামে মাতোয়ারা। উপস্থিত সকলের অনুরোধ কোন প্রকারে এড়িয়ে শ্রীযুক্ত শুক্লজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন আমরা পথে নামলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পথে পথে বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলে গেছে। টাঙ্গা করে আশ্রমে এসে পৌছুতে একটু রাত হয়ে গেল।

এবার কিন্তু ভিজে ঘর দেখেও কারো এতটুকু খুঁৎখুঁতানি দেখা গেল না। সকলে আনন্দিত। কাদার উপর ঘাস বিছিয়ে তার উপর কম্বল পেতে বিছানা ক'রে আরত্রিকাদি সেরে আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। কুলকাণীদা রাত্রে একটু জলযোগ করে চলে গেলেন।

শোবার পর সকলে ঘুমিয়ে পড়লে হঠাৎ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখি মনটী পরমার্থের নাম ক'রে অর্থচিন্তায় তন্ময় হয়ে আছে। অজুহাত দেখাচ্ছে খাওয়া দাওয়া মাইক ব্যাটারী ও আর সব অনিবার্য্য প্রয়োজনের। আত্মচেষ্টার চুড়ান্ত বৈকল্যে যা হয়—ঠাকুর ঠাকুর বাবা বাবা গুরু গুরু করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম খেয়াল নেই।

রাত্রি প্রভাত হবার আগে সঙ্গীদের নামকীর্ত্তন শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ওঁরা মন্দিরে নাম করছিলেন।

সত্বর স্নান জপ তিলক আরত্রিকাদি সেরে ঠিক আমরা বেরোব এমন সময় মোহান্ত-মহারাজজী আমাদের দরজার সামনে আগে থেকেই মাথা নুইয়ে প্রণাম করে সস্মিত মুখে বলতে লাগলেন—'খোল কোথায়'?

"ভেঙ্গে গেছে" বলতে তিনি দুঃখ করে বললেন, "এখানে একটীমাত্র ঢোলক আছে—আপনাদের কাজে লাগে তো নিয়ে যান—আমাদের আরত্রিকের কাজ কোন রকম করে চালিয়ে নোব—প্রচার-বিঘ্ন দূর করার সাধ্যমত ব্যবস্থা করতে হবে।"

রান্না কোথায় করবো জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন "রান্না তো আপনারা নিজেরাই করেন জানি—এবার কিন্তু যতদিন থাকবেন ঠাকুরের প্রসাদই পেতে হবে।" বহু ওজর আপত্তিতে অগত্যা আমরা রাজীই হয়ে গেলাম।

আমাদের সঙ্গে মাইক আছে—ব্যাটারী আছে—এর সদ্ব্যবহার কি করে করতে পারি বলায়—তিনি অত্যন্ত আগ্রহ করে তাঁর বিরাট কীর্ত্তন মণ্ডপ দেখিয়ে বললেন, "বিকেলে রামায়ণ পাঠের জন্য ১ ঘণ্টা আর মারাঠী উচ্চকীর্ত্তনের জন্য ১ ঘণ্টা বাদ দিয়ে বাকী সর্ব্বক্ষণের জন্য এ মণ্ডপ আপনাদের দেওয়া হলো। ইলেকট্রীক বা ব্যাটারীর যত খরচ পড়বে সব আমার। গুরু মহারাজের কত কৃপা —তাই নিজে না এলেও আপনাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তাঁর শিষ্য শ্রীযুক্ত রঘুবীর প্রসাদজীকে আমাদের সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে যখন তিনি কার্য্যান্তরে চলে গেলেন তখন আমরা প্রণব-রাজ ঠাকুরের শ্রীনিশান তারকব্রহ্মনামের নিশান এবং ঢোল করতাল নিয়ে প্রথম দিনের মত নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। 'জলন্ত আশ্বাস' যেটা ঠাকুর গত রাজোল প্রচারে লিখে দিয়েছিলেন সেটার হিন্দী অনুবাদ কিছু সঙ্গে ছিল তাও নেওয়া হলো। লোক তো মাত্র কজন কিন্তু বেরোতে না বেরোতে নাম জমে গেল। জলন্ত আশ্বাসের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। "জলন্ত আশ্বাস" এর নকল—

॥ জয় গুরু ॥

জ্বলন্ত আশ্বাস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

তুমি কি শান্তি চাও? রোগ, শোক, অভাব, জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে কি পরিত্রাণ পেতে চাও? পরমানন্দময় ভগবানকে দেখবার কি বাসনা জেগেছে? তা' হলে নাম কর—নাম কর। ভগবান আছেন—তিনি নিরন্তর নাম কীর্ত্তন-কারীকে দেখা দেন এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই—নাই—নাই। এসো এসো, ছুটে এসো—নাম নাও, মানব জনম ধন্য হবে—পরমানন্দসাগরে ডুবে যাবে। নাম কর নাম কর—আর বিলম্ব করো না—দিন দিন আয়ু চলে যাচ্ছে। উঠতে বসতে খেতে শুতে কেবল বল—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীরামাশ্রম
পোঃ ডুমুরদহ
জেলা হুগলী
পশ্চিমবঙ্গ

অখিল ভারত মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়, ওঙ্কারমঠ
পোঃ মান্ধাতা ওঙ্কারজী
জিলা নীমাড়, মধ্যপ্রদেশ

গোদাবরীর উপর তিনটী পুল। মাঝের পুলটী দিয়ে পরপারে নাসিকে গিয়ে সহরের বড় বড় রাস্তার অগণিত জনসমূহের মধ্যে নামপ্রচার করে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চিঠিপত্র সংগ্রহের জন্য শ্রীসুবোধদার কাছে চলে গেলাম।

সুবোধদার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ছিলনা। তিনি ওখানকার কারেন্সী নোট প্রেসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। যাবার সঙ্গে সঙ্গে বড় আদর করে গ্রহণ করলেন। ঠাকুরের সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তাঁর একটা নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠায় কিঙ্কর কৃপানন্দজীর মামাতো ভাই বলে তাঁর পরিচয় দেওয়াটা অবান্তর হয়ে পড়ে। ঠাকুরের নির্দ্দেশমত তাঁর ঠিকানায়ই পত্রাদির যোগাযোগের জন্য নানা যায়গায় পত্র দিয়েছিলাম। তাতে কর্ম্মস্থান এবং পোষ্ট অফিস ভুল ছিল। তথাপি ঠাকুরের কৃপায় কোনরকম করে চিঠি গুলি পৌঁছে যায় তাঁর কাছে। অনেকগুলি চিঠি তাঁর কাছে জমা পাই—একটী মণি-অর্ডারেরও সংবাদ দেন তিনি। ঠাকুর সম্বন্ধেই আগ্রহপূর্ণ খানিকক্ষণ আলোচনা করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই।

বহুপথ তিনি এগিয়ে দিয়ে যান। এ রকম সজ্জন, সুহৃৎ এভাবে পাওয়া আমারও একটা বড় সৌভাগ্যের পরিচায়ক। "জ্বলন্ত আশ্বাস" ছাপার ভার তাঁরই উপর ছিল—প্রেসের কিছু টাকা বাকী ছিল সুবোধদাদা অত্যন্ত আগ্রহ করে ঠাকুরের কাজে নিজেকে লাগাবার একটা অতি সাধারণ সুযোগ হিসেবে সেই টাকাটার ভার গ্রহণ করলেন।

ফেরার পথে বার বার ভাবতে লাগলাম যখন যেখানে যা কিছুর প্রয়োজন ঠাকুর ঠিক তখনি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, এত দেখে শুনেও বিশ্বাস রাখতে পারি না! আমার চাইতে আর কৃপার পাত্র কে আছে?

বেলা ১॥০ টায় ফিরে এসে দেখি সঙ্গীরা আনন্দে বিশ্রাম কচ্ছেন ভিজে কম্বলে শুয়ে বসে। নীচের আর্দ্রতা কম্বলকে রেহাই দেয়নি।

আমার জন্য রাখা ফল প্রসাদটুকু পেয়ে মুখে একটু জল দিচ্ছি এমন সময় শুনি "পঙ্গত্‌ কি সীয়ারোঁ"। গগনবিদারী এ উচ্চধ্বনি হলো বৈষ্ণব সাধুদের প্রসাদ পাবার আমন্ত্রণ-সংকেত। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতলের বিরাট সন্ত্‌নিবাসের সাধুরা কমণ্ডলু নিয়ে সারি বেঁধে বসে গেলেন। অতিথি বৈষ্ণবদেরও সকলকে বসিয়ে দেওয়া হলো। গৃহস্থেরা আর সাধুদের কাছ থেকে ভাগ বসাতে কেউ এলেন না। একজন সাধু মিষ্টি সুর করে "হরিনারায়ণ গোবিন্দে ছিরি রাম কৃষ্ণ গোবিন্দে" গোবিন্দ গোবিন্দ কহোগে প্রেম পদারথ পাওগো" সীয়া ইত্যাদি গাইতে লাগলেন বাকী সকলে দোহার করতে লাগলেন একই রাগিণীতে। মোহান্ত মহারাজ খালি গায়ে কোমরে গামছা বেঁধে হাতে পাতার তাড়া নিয়ে সকলকে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের কামরার সামনে এসে হাসতে হাসতে বললেন—"ক্যা আপলোগ পঙ্গত্‌ মে নঁহী জাইয়েগা? জরুরৎ হো তো কহিয়ে ম্যয় য়হাঁই ভেজ্‌য়া দেতাহুঁ।" বহুদর্শী লোক আমাদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে উত্তর পাবার আগেই বললেন "এক বর্ত্তন হো তো দে দিজিয়ে প্রসাদ ম্যয় লা-আতাহুঁ। তুরন্ত্‌ দিজীয়ে"।

(ক্রমশঃ)

—•—

গান

[শ্রীস্থ-মো-দে]

প্রেমযমুনার উর্ম্মিমালা
তোমার চরণ ছুঁতে চায়,
অর্ঘ্য দিতে ব্যাকুল আতুর
উপ্‌চে পড়ে তোমার পায়।
প্রাণতরণী বানের জলে
যায় যে ডুবে অতলতলে,
আমার সাধের জীবনতরী
তোমার পানে যেতে চায়।
দাঁড়িয়ে তীরে হাতছানিতে
ডাক দিতেছ কি ইঙ্গিতে?
নাবিকবিহীন তরণীরে
যাও গো নিয়ে কিনারায়।

—০—

আল্‌বার লীলামৃত

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

॥ শ্রীপরকাল, তিরুমঙ্গাই আলবার নীলম্‌ ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শুভদিনে শুভক্ষণে পরকালের হস্তে কুমুদবল্লীকে দান করতঃ কবিরাজ মহাশয় পরমানন্দে বরকন্যাকে বিদায় দিলেন। পরকাল স্বগৃহে আগমন করতঃ প্রতিজ্ঞামত প্রত্যহ একসহস্র আটটী বৈষ্ণবকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভোজনান্তে উভয়ে জলগ্রহণ করিতেন। কমলা নগরে প্রতিদিন এইভাবে হাজার আটটী বৈষ্ণব ভোজন করাইয়া, তাঁহাদের প্রার্থনামত বস্ত্র আভরণাদি দান করিতে করিতে পরকালের সঞ্চিত বিত্ত তো যাইলই—তৎসঙ্গে রাজস্ব দিবার জন্য যে অর্থ ছিল তাহাও ব্যয় হইয়া যাইল।

চোলরাজ রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্ম্মচারী পাঠাইলেন। পরকাল তাহাদের সাদরে গ্রহণ করতঃ আজ দিব কাল দিব, পরশু থাকুন্‌—পরে দিব—এইভাবে আদায়কারীদের সঙ্গে ছলনা করায়, তাহারা রুষ্ট হইয়া—আপনার কোনকথা শুনিব না, আপনি এইক্ষণে রাজস্ব দিন—এইরূপ রূঢ়ভাবে কথা বলায় তিনি ধকম দিয়া রাজসেবকগণকে তাড়াইয়া দিলেন। তাহারা রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে, রাজা অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনবার জন্য বহুসৈন্য সহ সেনাপতিকে পাঠাইলেন। নবীন সেনাপতি কমলা নগরে উপস্থিত হইলে, মহাবীর পরকাল একাকী সেই সমস্ত সৈন্যসহ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাজিত করিলেন। ভগ্নদূত রাজপক্ষের পরাজয়ের কথা রাজাকে জানাইলে রাজা অধিকতর রুষ্ট হইয়া স্বয়ং চতুরঙ্গ বল লইয়া কমলা নগর অবরোধ করিলেন।

দৈনিক বৈষ্ণবজনের সেবা যথারীতি চলিতেছিল; পরকাল নিত্য তাঁহাদের পাদোদক পান ও উচ্ছিষ্ট ভোজনে, ত্রিলোকের অপরাজেয় হইয়া উঠিলেন। নগর অবরুদ্ধ হইলে মহাবীর পরকাল পবননন্দনের মত একাকী সেই রাজসৈন্য সাগরে ঝম্পপ্রদান করিলেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান পরকালের প্রবল পরাক্রমে রাজসৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাজা পরকালের এই অসীম বাহুবল দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পরে স্বয়ং চোলরাজ নীলার সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার পূর্ব্বসেনাপতি পরকালের এ

অমানুষিক বল—দৈবলব্ধ। তাহাকে পরাজয় করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি পরাজিত হইয়া বলিলনে—সেনাপতি পরকাল তোমার অপূর্ব্ব রণনৈপুণ্য দর্শনে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণ জানি—আচ্ছা, ধর্ম্মতঃ তুমি বল যে আমি তোমার নিকট রাজস্ব ন্যায্য পাই কি না? আর নিয়মিত রাজস্ব দানের প্রতিশ্রুতিতে এ প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছ কিনা? আমি তোমার এ দুষ্ট ব্যবহার ক্ষমা করিলাম।

পরকাল অস্ত্রত্যাগ করিয়া প্রণাম করত বলিলেন, মহারাজ আপনার রাজকর আমার অবশ্য দেয়, আমি দিবার জন্য রখিয়াছিলাম—বৈষ্ণবসেবায় ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছি।

রাজা বলিলেন—করের জন্য মন্ত্রিদের রাখিয়া চলিলাম, তুমি তাহার ব্যবস্থা কর।

রাজা রাজ্যে চলিয়া যাইলেন। মন্ত্রীগণ ইঁহাকে একটী মন্দিরে নজরবন্দী রাখিলেন। ধর্ম্মপাশে বদ্ধ পরকাল তিনদিন উপবাসী থাকিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন শ্রীভগবান বরদরাজ তাঁহাকে স্বপ্নে বলিলেন,—তুমি কাঞ্চীতে এস তোমায় ধনদান করিব।

চতুর্থ দিনে প্রাতে মন্ত্রীদের তিনি বলিলেন, কাঞ্চীতে আমার ধন আছে। আপনারা আমায় সহিত চলুন সেইখানে দিব। মন্ত্রীগণ রাজার অনুমতিক্রমে সৈন্যগণ সহ তাঁহাকে লইয়া কাঞ্চীতে উপস্থিত হওতঃ, তাঁহার কথিত স্থানে, বেগবতী নদীতীরে খনন করতঃ কিছুই না পাইয়া, তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। পরকাল নীরবে বরদরাজকে ধ্যান করিতে করিতে সাহসা আবল্য আসায় দেখিলেন, বরদরাজ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—পরকাল অমুক স্থান খনন কর; প্রচুর ধন পাইবে।

পরকাল মন্ত্রিদের সাহিত নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করায় প্রভূত ধন পাইলেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত রাজস্ব মিটাইয়া দিয়া তাঁহাদের বিদায় করিলেন। এবং স্বয়ং বহুধন লইয়া কমলা নগরে আসিয়া—পূর্ব্ববৎ নিত্য এক হাজার আটটী করিয়া বৈষ্ণব ভোজন করাইতে লাগিলেন।

রাজস্ব লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী রাজসমীপে উপস্থিত হইলে, রাজা সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, পরকাল সামান্য লোক নহে। শ্রীভগবানের পরম ভক্ত। প্রত্যহ সহস্রাধিক বৈষ্ণব ভোজন করান—বড় সহজ কথা নহে! আমার রাজস্ব লইয়া সে বৈষ্ণব ভোজন করাইয়াছিল। ভগবান বরদরাজ তাহাকে প্রচুর ধনদান করিয়া তাহার মান রক্ষা করিলেন। আমি সেই মহাভাগবতের নিকট

অপরাধী। তাঁহাকে আনাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব। রাজার আদেশে মন্ত্রীগণ তাঁহাকে রাজসমীপে আনয়ন করিলে, রাজা অতি সমাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ বিবিধ বসন ভূষণের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। বিনয়ের অবতার পরকালও রাজার নিকট রাজদ্রোহিতার জন্য ক্ষমা চাহিলেন। চোলরাজ যথোচিত পূজান্তে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন। পরে রাজা ভাবিলেন, আমার জন্য তিন দিন শ্রীবৈষ্ণবসেবা না হওয়ায় পরকাল উপবাসী ছিল। তাহাতে আমার যথেষ্ট অপরাধ হইয়াছে,—ইহার বিহিত করা কর্ত্তব্য—ইহা স্থির করিয়া চোলরাজ সেই অর্থ দেবতা ব্রাহ্মণ ও শ্রীবৈষ্ণবগণের সেবায় ব্যয় করিলেন।

কমলানগরে সেইভাবে নিত্য বৈষ্ণবসেবা চলিতে লাগিল। পার্থিব ধন—ধনপ্রসব করে না, বা শ্রীভগবানের ন্যায় অব্যয় ও নহে। কাজেই তাহা সমস্ত শেষ হইয়া গেল। পরকালের মহা দারিদ্র্যদশা আসিয়া উপস্থিত হইল। বৎসরব্যাপী বৈষ্ণবসেবা মহাব্রত তো ত্যাগ করা যায় না এখন উপায় কি ?—

ভক্তিপরায়ণা দেববালা কুমুদবল্লীর সঙ্গ লাভ করিয়া দুশ্চরিত্র পরকাল আজ পরম বৈষ্ণব। নিত্য তিলকাদি ধারণ করেন। স্বয়ং উপবাসী থাকিয়া ১০০৮টী বৈষ্ণব ভোজন করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরকালের আর কোন মালিন্য বা বাসনা রহিল না। কেবল যে কোন প্রকারে বৈষ্ণবগণের কৈঙ্কর্য্য করিব—এই একটী বাসনাই অবশিষ্ট থাকিল।

স্বর্গভ্রষ্টা অপ্সরা ভগবদ্ ভাগবত্ সেবায় ও বৈষ্ণবকৈঙ্কর্য্য পরায়ণ পরমভক্ত স্বামী পরকালের সাহচর্য্যে, স্বর্গের তুচ্ছ ভোগবিলাসের কথা ভুলিয়া গেলেন। যদি কোনদিন মনে হইত তাহাতে নরক ভোগের ন্যায় জ্বালা অনুভব করিতেন। ভগবদ্ ভজনের মত সুখতো আর ত্রিভুবনে কোন বস্তুতে নাই। এ রস যিনি একবার পাইয়াছেন—বমনান্নের মত সমস্ত ভোগ সুখ ত্যাগ করতঃ ভজন ও সেবা লইয়াই দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন। ঠাকুরটীও সেবায় অত্যাসক্ত একান্ত ভক্তকে লক্ষ্মীর অপেক্ষাও ভালবাসেন। জগতে যদি কিছু করিবার থাকে, তাহা হইলে তাহা সেবা—সেবা—সেবা—।

পরকাল অর্থাভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করতঃ বৈষ্ণব ভোজন করাইব—ইহা স্থির করিয়া পত্নিকে বলিলেন, প্রিয়ে! যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি, উপস্থিত অর্থাভাবে সে ব্রত রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য চুরি ডাকাতি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে কৃতসকল্প হইয়াছি। অবশ্য চুরি করা পাপ তাহা জানি কিন্তু আমি নিজের সুখের

জন্য চুরি করিতেছি না,—হরিভক্তের সেবার জন্য করিতেছি, তজ্জন্য এ পাপ আমায় স্পর্শ করিবে না। আমার কাছ হইতে—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপপুণ্য, স্বর্গ নরক, সব চলিয়া গিয়াছে—আছে কেবল শ্রীবৈষ্ণব কৈঙ্কর্য্য। কুমুদবল্লী গত্যন্তর নাই দেখিয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন।

অতঃপর চুরি করিয়া বৈষ্ণব সেবা করিতে লাগিলেন। যে যাহা চায় সে তাই পায়—একটী চলিত কথা আছে। চারিটী বীর সহচর আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল, সেই চারি জনের অমানুষিক শক্তি ছিল। একজন তালায় হাত দিবামাত্র তালা খুলিয়া যাইত। একজন জলে হাঁটিতে পারিত। তৃতীয় ছায়াগ্রহী কাহারও ছায়ায় দাঁড়াইলে তাহার গতিশক্তি থাকিত না, চতুর্থটীকে তর্কে কেহ পারাস্ত করিতে পারিত না। জলে হাঁটা, তালা ভাঙ্গা, ছায়াগ্রহী, ও তার্কিক মনোমত এই চেলা চারিটী পাইয়া মহাবীর পরকাল অবাধে লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। রাত্রে পথে বসিয়া থাকিতেন, অবৈষ্ণব যে কেহ আসিত তাহার ধন জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেন। তদ্দ্বারা বৈষ্ণব ভোজন হইত। এক কপর্দ্দকও নিজেদের জন্য ব্যয় করিতেন না। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে যাইয়া ধনীর গৃহ হইতে অর্থ অপহরণ করত বৈষ্ণব সেবা করাইতে লাগিলেন।

একদিনরাত্রে পরকাল চুরি করিবার জন্য এক বৈষ্ণব গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান আছেন। এমন সময় গৃহিণী দুগ্ধ লইবার জন্য একটী সোনার বাটী লইয়া যেমন দ্বার খুলিয়াছেন অমনি পরকাল তাহার হাত হইতে বাটিটী কড়িয়া লইলেন। তৎকালে গৃহস্বামিনী "গুরুভ্যো নমঃ" বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। গুরুভ্যো নমঃ ইহা শুনিয়া পরকাল বুঝিতে পারিলেন, ইহা কোন বৈষ্ণবের বাড়ী। তজ্জন্য সেই সোনার বাটী দ্বারের নিকট রাখিয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কর্ত্রী গৃহে যাইয়া সোনার বাটীর কথা স্বামিকে বলিলে, তিনি বলিলেন—প্রিয়ে! এ চোর আর কেহ নহেন সেই পরম ভাগবত নিত্য হাজার আট বৈষ্ণবভোজনকারি পরকাল। আজ আমার পরম ভাগ্য যে তিনি কৃপা করিয়া এ অধমের দ্রব্য তাঁহার আপন দ্রব্যবোধে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সময় একটী বধূ বাহিরে আসিয়া সেই বাটীটী দেখিতে পাইয়া গৃহস্বামিকে দিলে; তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন তিনি বাটী কাড়িয়া লয়েন সে সময় তুমি কি বলিয়াছিলে।

গৃহিণী বলিলেন গুরুভ্যো নমঃ বলিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া গৃহস্বামী দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—আহা হতভাগিনী—কেন তুমি ওকথা বলিলে—

সে কথা শ্রবণ করত: আমাকে বৈষ্ণব বুঝিতে পারিয়া তিনি বাটী ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবান সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন কিন্তু ভাগবত্ অপরাধ তিনি কখনও মার্জ্জনা করেন না। আমার অতি দুরদৃষ্ট তজ্জন্য সেই ভক্তরাজ এ বাটী লইয়াও আবার দিয়া গিয়াছেন। আমি অতি হতভাগ্য তাই আমার অর্থের দ্বারা বৈষ্ণব সেবা হইল না।

অন্তরাল হইতে পরকাল গৃহস্বামীর সেই কথা শুনিয়া, তাঁহার নিকটস্থ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন—হে বৈষ্ণবশিরোমণি! মাতার হস্ত হইতে আমি বাটী কাড়িয়া লইয়াছিলাম। আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। তাঁহার কথা শুনিয়া গৃহস্বামী সত্বর উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে বলিলেন, আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন লাভ করিলাম। তাঁহারা পরকালের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি উভয়ের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে আসিলেন।

নিয়মিত ভাবে বৈষ্ণবসেবা চলিয়াছে—পরকালের উপযুক্ত শিষ্য চতুষ্টয় নিত্যই পথিক গণের ধন লুণ্ঠন করিয়া আনয়ন করে। একদিন পরকাল আপনার শিষ্যগণসহ বিল্বারণ্যের পথে পথিকের আগমন অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়—পথে কেহই আসিতেছে না দেখিয়া পরকাল ব্যাকুল হইয়া শিষ্যদের বলিলেন তোমরা গাছে উঠিয়া দেখদেখি কেহ আসিতেছে কি না? শ্রীবৈষ্ণবগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন—এখন কি করি? পরকালের কথা প্রচার হওয়াতে লোকে আর সে পথ দিয়া প্রায়ই যাতায়াত করিত না। পরকাল—কি হইবে কিরূপে বৈষ্ণব সেবা করিব এই কথা ভাবিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব কৈঙ্কর্য্যতৎপর পরকালের চিন্তা ব্যর্থ হইল না। শ্রীভগবান রঙ্গনাথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কৈঙ্কর্য্য মহাব্রত রক্ষা করিবার জন্য তিনি এক অপূর্ব্ব লীলার অবতারণা করিলেন। ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বয়ং বর হইয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া সেইপথে চলিলেন। শিবিকায় সর্ব্বাভরণ ভূষিতা জগন্মাতা ও ধন বস্ত্র আভরণ লইয়া বহু দাসদাসী লোকজন সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বৃক্ষারূঢ় কোন শিষ্য দূরে এই মহা শিকার দর্শন পূর্ব্বক অট্টহাস্য পূর্ব্বক বলিল—গুরুদেব প্রস্তুত হউন। আপনার সঙ্কল্প কি কখনও ব্যর্থ হয়? এক বর বিবাহ করিয়া অশ্বারোহণে আসিতেছে। শিবিকায় সর্ব্বালঙ্কার পরিহিতা বধু—আরও ধনরত্নাদি লইয়া অন্যান্য লোকজন আসিতেছে —বরটী যেন রঙ্গনাথের মত।

তাহারা প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল। যখন বর লোকজন সহ তথায়

উপস্থিত হইলেন, সেই সময় বিকট চিৎকার করিয়া সদলে পরকাল তাহাদের আক্রমণ করিল। মার মার, ধর্ ধর্—এই ভীষণ রব শুনিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। বাহকগণ শিবিকা নামাইয়া আত্মরক্ষার জন্য ছুটিল। রঙ্গময় রঙ্গনাথটী ঘোড়া ছুটাইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতে পরকালের সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন।

পরকাল শিবিকার দ্বার উন্মোচন করিয়া সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী কন্যাকে দেখিয়া বিমোহিত হইয়া যাইলেন। মরি মরি, এমন রূপতো কখন দেখি নাই। ইনি মানুষী না দেবী! চঞ্চলা মা আমার চঞ্চলা হইয়া উঠিয়াছেন। লোকজন তো দূরের কথা, বরটী পর্য্যন্ত ডাকাতের হাতে দিয়া পলায়ন করিয়াছেন—এমন বরতো কখনও দেখিনাই।

পরকালের কণ্ঠস্বরে রূঢ়তার লেশ নাই। মধুরকণ্ঠে বলিলেন, মা! আমার বৈষ্ণব সেবার জন্য তোমার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দাও—আমি তোমার গায়ে হাত দিব না। মা আমার অনন্যোপায়া হইয়া সমস্ত অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া পরকালকে দিলেন। নাকের নোলকটী পর্য্যন্তও রাখিলেন না।

সঙ্গীরা বরকে ধরিয়া আনিল, পরকাল বরের আভরণ গুলি লইলেন। বরের অঙ্গুলীতে একটী অতি মূল্যবান অঙ্গুরীয়ক ছিল। সেটি বহু চেষ্টা করিয়া খুলিতে না পারিয়া, অগত্যা দন্তের দ্বারা দংশন করিয়া খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বরটী বলিলেন—তুমি আমার সমস্ত ধন কাড়িয়া লইলে মাত্র একটী অঙ্গুরীয়ক আছে, এটীও লইবে?

পরকাল বলিলেন, ওটী রাখিয়া তোমার কি হইবে? আমি উহার দ্বারা বৈষ্ণব ভোজন করাইব। পরকাল দন্তের দ্বারাও যখন অঙ্গুরীয়কটী খুলিতে পারিলেন না তখন ঠাকুরটী বলিলেন—কলিহন্ কিং ভবান্ বৎস তদীয়ারাধনা প্রিয়ঃ॥ তুমি কি কলিহন্—কলিযুগের জীবোদ্ধারক সাধু? তদবধি পরকালের কলিহন্ একটী নাম হইল।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

শাস্ত্র-সংশয়-নিরসন :—শ্রীভবেন্দ্র নাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীভবেন্দ্র নাথ মজুমদার, শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ বাটী, পোঃ- শাঁকারী, (বর্দ্ধমান)। মূল্য—শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবানুকূল্যে ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ একটি পুস্তকের বিশেষ উপযোগিতা আছে—ইহা স্বয়ং ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, শ্রীশ্রীস্বামী কিরণ চাঁদ দরবেশ, প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই গ্রন্থ পড়িয়া বলিয়াছেন এবং ধর্ম্মপ্রেমী ব্যক্তিমাত্রই বলিবেন। যদিও স্বয়ং ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্য নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্রবাক্যই জ্ঞানলাভ করিবার উপায় (গীতা ১৬।২৪) তথাপি বিজাতীয় পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আজকাল অনেকের মনে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি সংশয়ের উদয় হইয়াছে। সাধারণতঃ যেরূপ সংশয় হয় বা হইতে পারে, ভবেন্দ্র বাবু সেই সকল সংশয়ের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রধান শিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর নিকট ভবেন্দ্র বাবু দীক্ষা লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিজের শাস্ত্র বাক্যে দৃঢ় আস্থা থাকাই স্বাভাবিক। তিনি বিস্তৃতভাবে শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন এবং গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় যে তাঁহার গবেষণার ফল তিনি একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থরূপে বঙ্গীয় পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বাঙ্গলাতে যে ধর্ম বিপ্লব হইয়াছিল তাহার একটী মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির মতের মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল, তিনি সে সকল নিপুণ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা যে সকল দিব্য দর্শন হয় তাহার ফলে তাঁহার মতের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ভবেন্দ্র বাবু তাহাও দেখাইয়াছেন। তাহার পর আধুনিক মনে যে সংশয় উৎপন্ন হয় তাহা উল্লেখ করিয়া বিচার করিয়াছেন। তিনি যে সকল সমস্যার বিচার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অহল্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় কেন, শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক শম্বুকের শিরশ্ছেদন করা উচিত হইয়াছিল কি না, বেদব্যাসের জন্ম, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী, বালিবধ, সীতার বনবাস, অজামিল উদ্ধার, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান, পুনর্জন্ম, আহারের সহিত ধর্মের সম্পর্ক, রাসলীলা, এই সকল বিষয়ে এবং আরও অনেক বিষয়ে প্রচলিত সংশয়ের উত্থাপন করিয়া, অতি উত্তম ভাবে তাহার মীমাংসা করা

হইয়াছে। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস থাকে না, হিন্দুধর্মে বিশ্বাস না থাকিলে জাতি ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইবে। এজন্য আমরা সর্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

গ্রন্থকার "জাতিভেদ" সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে গুণ অনুসারে জাতি নির্ণয় করা প্রাচীন ঋষিদের অভিপ্রায় ছিল, সেই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হইয়া এক্ষণে জন্ম অনুসারে জাতি নির্ণয় করা হয়। গ্রন্থকার একথাও বলিয়াছেন যে জন্ম অনুসারে জাতি নির্ণয়ের যে বর্তমান পদ্ধতি চলিতেছে তাহা রক্ষা করা উচিত, নচেৎ সমাজে ঘোর বিশৃঙ্খলা হইবে। গ্রন্থকার যে বলিয়াছেন যে জন্ম অনুসারে জাতি নির্ণয়ের বর্তমান পদ্ধতি রক্ষা করা উচিত ইহা উত্তম কথা। কিন্তু তিনি যে মনে করিয়াছেন যে গুণ অনুসারে জাতি নির্ণয় করাই প্রাচীন ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিল ইহা যথার্থ নহে। সর্বপ্রথম হইতেই জন্মদ্বারা জাতিনির্ণয় হইয়াছে। বেদ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত সর্বত্র ইহা সুস্পষ্ট। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঋষিদের-তপস্যার প্রভাবে জাতি পরিবর্তন হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কোনও ক্ষেত্রে গুণ বা কর্ম দ্বারা জাতি নির্ণয় করা হয় নাই। যে স্থলে বলা হইয়াছে "যাহার এই সকল গুণ থাকিবে সে ব্রাহ্মণ, যাহার এই সকল গুণ নাই, সে শূদ্র," সে স্থলে ঐ সকল গুণের প্রশংসা করাই উদ্দেশ্য। এই ভাবে সকল শাস্ত্র বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত। এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ মহাশয় কর্তৃক লিখিত "বেদ মন্ত্রাদি প্রতিপাদিত জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্যবস্থা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। (ইহা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, ৪এ, ডি এল্ রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ঠিকানায় পাওয়া যায়)।

"বিধবা বিবাহ" প্রবন্ধে গান্ধিজির পত্রটি না ছাপাইলেই ভাল হইত। পত্রে ঋষিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ভাব আছে। তাহা সমাজে প্রচারিত না হওয়াই ভাল।

—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম মহিমা, (প্রথম খণ্ড)ঃ শ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী শিবানন্দ সরস্বতী বিরচিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজের ভূমিকা সংবলিত, শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর) কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০

মহাপুরুষের দিব্য লেখনীনিঃসৃত মহাগ্রন্থের সমালোচনা করিবে এমন স্পর্দ্ধা কাহার আছে? সৌভাগ্যক্রমে গ্রন্থের 'প্রস্তাবনা' রচনা করিয়াছেন ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ। সেই 'প্রস্তাবনা'টিই ইহার অমূল্য সমালোচনা। শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিতেছেন, গ্রন্থকার "এই পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রাম নাম মহিমা গ্রন্থে বহু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যে পূর্ণব্রহ্ম একথা বিবৃত করিয়াছেন। সেই হিমালয় গঙ্গোত্তরী নিবাসী মহাপুরুষ তাপিত জীবকুলের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া সুগম সাধন পন্থা, বেদান্ত-সিদ্ধান্তসূত্রম্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। তাঁহার সাধন যেমন অলৌকিক। শাস্ত্রজ্ঞানও তদ্রূপ অসাধারণ, গঙ্গাস্রোতের মত ভাষার প্রবাহ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ...... এই গ্রন্থপাঠ করিলে নাস্তিক আস্তিক হইবেন, আস্তিক ব্যক্তি দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ করত জীবনকে ভজনময় করিয়া ফেলিবেন। এ অপূর্ব্ব গ্রন্থরত্ন যে জগদ্বাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে ইহা আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছি।"

এ হেন গ্রন্থের বহুল প্রচার সকলেই কামনা করিবেন, কিন্তু এ বিষয়ে ভরসা করিবেন কয় জন? আমরা পাঠকেরা গুব্‌রে পোকার দল। গোবরের পুঁটুলি মুখে লইয়া পদ্মমধুর স্বাদ লইতে বসি, গোবরের আস্বাদই পাই, গোবরের আস্তরণ ভেদ করিয়া মধুর স্বাদ রসনা পর্য্যন্ত পহঁছিবার পথ পায় না। আমরা তাই পদ্মের মধ্যে মধুর সন্ধান আর পাই না। আমাদের এই দুর্দ্দশার জন্যই এই সকল গ্রন্থের অধিক-তর প্রয়োজন। মহাপুরুষের উদাত্ত আহ্বান ছাড়া আমাদের সুষুপ্তি ভঙ্গের আর কোনও উপায় নাই। আত্মরক্ষার জন্যই এই সকল গ্রন্থ পাঠ আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

—অধ্যাপক শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

ওঙ্কারেশ্বরের পত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ঠাকুরের দৈনন্দিন কর্ম্মধারা গত শ্রাবণের দেবযানে যে রকম বর্ণিত হয়েছে তারই অনুবর্ত্তন করচে। সময়ের একটু-আধটু এদিক সেদিক হয়েছে মাত্র। আজকাল গুহায় যাচ্ছেন রাত ৪ টার আগে, ফিরচেন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে। তিলক ভস্ম মাখা ও পাঠের কাজ নূতন বাঁধানো বিল্বতলে বসেই করচেন। আহারের পরিমাণ পূর্ব্ববৎই আছে—হবিষ্যান্ন স্পর্শমাত্র করচেন। বিকেলের ফলের রসটুকু সান্ধ্যকৃত্যের পর নিচ্ছেন। দেহ যতটুকু ক্ষীণ হবার হয়ে গেছে—কর্ম্মশক্তি অটুট আছে। চলাফেরায় বা মুখাবয়বে ভাব বা অভাব কোনটারই লক্ষণ দেখা যায় না। এ অবস্থায় তাঁর দর্শন না হবারই কথা। ফলে মৌনও দীর্ঘতর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যখন নীচে নেমে আসেন তখন তাঁর সহস্র সহস্র পুত্র কন্যার স্মৃতি এসে তাঁকে হয়ত দর্শনের অভিলাষ থেকে দূরে নিয়ে যায়—আবার যতটুকু নীচে নামলে দর্শন হয় হিসেব করে ততটুকু নামাও হয়ত তাঁর আয়ত্বের বাইরে। সেদিনও ভারতের বহুখ্যাত একজন মনীষীর জরুরী শেষপত্রে দেখলাম লিখেছেন—

"ভগবদ্ বিরহ তো সীতারামের নাই। দিবারাত্র জয়গুরু ওঁ গুরু নাদ ভিতরে চলছে—কখন জ্যোতি কখন বিন্দু—কখন আকাশ আসে যায়, তার জন্য প্রয়াস করতে হয় না, কখনো বা অপূর্ব্ব জ্যোতি ভিতরে বাইরে খেলা করে। টানা তৈলধারার ন্যায় অখণ্ড ওঁকার নাদ যখন আবির্ভূত হন—তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না।......"তবাস্মি" বলতে গেলে ভিতর থেকে "ব্রহ্মাস্মি" ঠেলে উঠে। "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য এ ভাবে আত্ম-স্ফূর্ত্তি হয়ে রোমাঞ্চ হতে হতে জমাট বেঁধে যায়।......সীতারামের সব স্বাতন্ত্র্য জয়গুরু ও ওঁ গুরু নাদ গ্রাস করেছেন—কিছু করার উপায় নাই। তাঁর যখন ইচ্ছা হয় তখন লেখান পড়ান। জয় হোক্ তাঁর ইচ্ছার—সীতারাম যন্ত্রমাত্র।"

যে ডোর কৌপীন বহির্ব্বাস নিয়ে তিনি মৌনে বসেন মৌনান্ত পর্য্যন্ত তাই থাকে—পরিবর্ত্তন বা পরিষ্কার করা চলে না। একেই তাঁর ছোট বহির্ব্বাস তাও আবার ছিঁড়ে দুখণ্ড করে নিয়েছেন। শীতও পড়ে গেছে,—দেখে কষ্ট হয়, উপায় কি ?

পরম গুরুদেবের জন্য ব্যবস্থা ভাল। সুদৃশ্য খাট, লেপ, তোষক, নেটের মশারী, বালিশ, রেশমের ওয়াড় দেওয়া বালিশ ও দুটী পাশ বালিশ এবং রেশমের শয্যাবরণ করে দিয়েছেন। অবশ্য তাঁর কুটীরের দেয়ালস্থ সমস্ত দেব-দেবী মূর্ত্তি এবং মহাপুরুষ ও জনৈক শিষ্যের প্রতিকৃতিতেও রঙীন বস্ত্রাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং সপুষ্প পূজাও সকলেরই করচেন ; নিত্য নিয়মিত ভাবে।

নানা দেশীয় নানা স্তরের দর্শনার্থী নরনারীর ভিড় ক্রমে বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন। গত মেলায় স্থানীয় মহারাজার তরফ থেকে মাইকে যাত্রীদের ঠাকুর-দর্শনে উৎসাহিত করা হয়েছে ; ঠাকুরের নিবাস-স্থানটীকে উল্লেখ করে স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয়কে নিমিত্ত করে ঠাকুরের অনন্ত-কালোদ্দিষ্ট অবিরত মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন যজ্ঞ যথানির্দ্দিষ্ট দিনে বহরমপুরে (উড়িষ্যা) সুরু হয়েছে। উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রারম্ভিক উৎসবে যোগদান না করতে পারায় দুঃখ করে জানিয়েছেন—সময় করে একদিন যাবেন। ষ্টেশন সন্নিকটে চমৎকার জায়গা। সামনে একটী বড় পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটী মন্দির। পুকুর পাড়ে কীর্ত্তন মণ্ডপের সংলগ্নই সুদৃশ্য উৎকল শিল্পের চমৎকার নিদর্শন স্বরূপ শ্রীশ্রীউত্তরেশ্বরজী মহাদেবের মন্দির। মন্দিরের পাশেই একটী ছোট মন্দিরে ঠাকুরের প্রতিকৃতি রেখে নিত্য পূজাপাঠের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। কীর্ত্তনমণ্ডপের দক্ষিণ দিকে ভক্তদের থাকার জন্য ছয়টী নূতন পাকা কুটীর করে দেওয়া হয়েছে। রান্না ভাঁড়ার ছাড়া আরও একটী ঘর পূর্ব্বেই ছিল—অধুনা সংস্কৃত করা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে সকলকে মুগ্ধ হতে হবে। অতুল ধন সম্পত্তি ও নানাবিধ প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়েও তিনি নামে আত্মহারা,

বিনয়ে, প্রেমে, ভক্তিতে, অনুরাগে ভরপুর। ঠাকুরের প্রতি তাঁর কী প্রগাঢ় ভক্তি !

উড়িষ্যার আইনসভার প্রথম মহিলা সদস্যা, উৎকল সাহিত্য পরিষদের বহুবৎসরের প্রাক্তন সম্পাদিকা, কংগ্রেস ও বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত আজন্ম সংশ্লিষ্টা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত বাণীমালা এবং অভয়বাণীর অনুবাদ নিজ ব্যয়ে মুদ্রণ করে আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। আরো কয়েকটী বই তিনি শীঘ্রই অনুবাদ ও প্রকাশ করবেন। ঠাকুরকে তিনি এখনো চোখে দেখেন নি অথচ তাঁর জীবন ঠাকুরময় করে ফেলেছেন।

ঠাকুরের প্রিয় সন্তান শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় 'ওঙ্কারমঠে' ঠাকুরের পছন্দমত একটী সাড়ে তিন হাত নিকেলকরা পুরু তাম্রপাতের প্রণব তৈরী করে দিয়েছেন। জয়গুরুসম্প্রদায়ের প্রধানতম তীর্থভূমি কেওটায় ঠাকুরের জন্মস্থানও তিনিই ক্রয় করে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীতারকব্রহ্মনামপ্রচার সহ অষ্টোত্তর রামায়ণ পারায়ণের সংকল্প করে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীমদ্ দাসশেষজী মহারাজ আজ বর্ষাধিক কাল ধরে অন্ধ্রদেশের নগরে নগরে, এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে শত-পারায়ণ পূর্ণ করেছেন সাফল্যমণ্ডিত ভাবে। প্রতি পারায়ণান্তে সহস্রাধিক নরনারায়ণ সেবা ও আনুষঙ্গিক উৎসবাদিও এ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করে আসচেন। সংকল্প শেষে তিনিও ঠাকুরের মৌনান্ত বা মাস কয়েকের জন্য ওঙ্কারমঠে সাধন-নিরত থাকার প্রার্থনা জানিয়েছেন ঠাকুরকে।

বার বার বিজ্ঞাপিত করা সত্বেও অনেকে বাংলায় ঠিকানা লেখবার ফলে এবং কেউ কেউ পোঃ মান্ধাতা ওঙ্কারজী স্থলে "মান্ধাতা" লেখার জন্য চিঠি পত্র ডেড্‌লেটার অফিস এবং মনিঅর্ডার উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়স্থ মান্ধাতা ডাকঘর হয়ে অযথা বিলম্বে পৌছে। এ ব্যাপারে পুনরায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার বিভাগের ভার শ্রীপদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় পোঃ বালি, হাওড়া ও অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদরঞ্জন গুপ্ত—হুগলী মহসীন কলেজ, পোঃ চুঁচুড়া—এ দুজনের উপর দেওয়া হয়েছে।

ঠাকুরকে যাঁরা আনন্দ দিতে চান তাঁদের দেবযান ও ঠাকুরের পুস্তকাদি পাঠ এবং প্রচার, রামনাম লেখন, ও অবিরত নামযজ্ঞগুলি যাতে সুশৃঙ্খলে এবং সুন্দররূপে চলে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

॥ শ্রীশ্রীঠাকুরের মৌন-বাণী ॥

"জপ পূজাদি করিয়া যাহাদের 'আমি অন্য অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এইভাব হৃদয়ে জাগ্রত হয় তাহাদের মত মহামূর্খ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জপাদির উদ্দেশ্য 'সব বাসুদেব' এই জ্ঞান লাভের জন্য। সকলকে তুচ্ছ বোধ করিবার জন্য সাধনা নয়—সকলের দাসানুদাস হইবার জন্য আজীবন সাধনা করিতে হয়। 'সব শ্রীভগবান' এইটি যেন ভুল না হয়।

তবে যাহারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে শূদ্রদেহ লাভ করিয়াছে তাহারা ব্রাহ্মণগণকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সম্মান, ভক্তি, প্রণতি আদি করিয়া স্বীয় সাধনপথ সুপ্রশস্ত করিবে। শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠেই বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ-দেহলাভ জন্মান্তরীণ সুকৃতির পরিচায়ক। ইহা হইল সাধারণ দৃষ্টির কথা। যাঁহারা অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণগণ উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছেন অর্থাৎ "সব ব্রহ্ম" এই বোধে সাধনা করেন তাঁহারা শূদ্র তো দূরের কথা—চণ্ডাল, কুক্কুর, গর্দ্দভকেও দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। শ্রীভগবান এইরূপভাবে সকলকে প্রণাম করা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সমীচীন উপায় বলিয়াছেন—স্বীয় অধিকার অনুসারে প্রণাম, নমস্কার আদি করিতে হয়।"

ঠাকুরের আজ পর্য্যন্ত শেষ নির্দ্দেশ—'কিমপি সংবাদং মা দেহি।'

শ্রীকিঙ্কর গোবিন্দদাস

—০—

সংবাদ

বর্ধমান জেলার গৈতনপুর-গ্রামে (পোঃ—সসঙ্গা) বিগত ১৬ বৎসর যাবৎ অপতিত-নিয়মে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাষ্টারবাবার (শ্রীপাঁচুগোপাল হাজরা, প্রধান শিক্ষক-রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়) শ্রীশ্রীমহাপ্রভু মঠে নামকীর্ত্তন চলিতেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হাজরা মহাশয় লিখিতেছেন—"৮ই পৌষ ১৩৫৭ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ মঠে সদলে উপস্থিত হওয়ার পর হইতে শ্রীনামের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাঁহার কৃপা বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে।"

*　　　　*　　　　*　　　　*

১৭ই কার্ত্তিক শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়ের চন্দননগরস্থ আশ্রমে—বোড়, কুণ্ডুঘাট লেনের, শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউর মন্দিরে অন্নকূট-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। অবিরত নামকীর্ত্তনের দ্বারা অনুষ্ঠানটিকে নামময় করা হয়। নামযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেন—আশ্রমের নবীন কীর্ত্তন সংঘ ও চুঁচুড়া জয়গুরু সম্প্রদায়।

২০শে কার্ত্তিক কিঙ্কর শ্রীমৎ গোবিন্দদাসজী এই আশ্রমে আগমন করেন। তিনি এখানে দুইদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। স্থানীয় ও অন্যস্থানের বহু নরনারীর সমাবেশে এই দুইদিন 'শ্রীমন্দির' আনন্দপূর্ণ থাকে।

মন্দিরসেবকগণ এই আশ্রমের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সম্প্রদায়কে অনুরোধ জানাইতেছেন। আশ্রমের ঠিকানা: শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউর মন্দির, কুণ্ডুঘাট লেন, বোড়, চন্দননগর। পথ-পরিচয়: চন্দননগর ষ্টেশন, তথা হইতে বাসে বা রিক্সায় কুণ্ডুঘাট লেনের সংযোগস্থল, এইস্থান হইতে আশ্রম এক মিনিটের পথ।

*　　　　*　　　　*　　　　*

রাসপূর্ণিমার দিন গলসী রামকমল-স্মৃতি-হরিসভায় (বর্ধমান) গলসী-গ্রামের ভক্তগণ কর্তৃক অহোরাত্র মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে নরনারায়ণ সেবা ও নগরকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ভক্তগণ কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ প্রাতে নাম প্রচার করেন।

*　　　　*　　　　*　　　　*

২৮শে কার্ত্তিক শ্রীরামানন্দ মঠে (চিতারমার-পড়া, হুগলি) উত্থান-একাদশীতে হরিবাসরের আয়োজন করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পূজাপাঠ-কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। ১২ই অগ্রহায়ণ এখানে হরিবাসর—পূজাপাঠ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। নামযজ্ঞে যোগদান করেন—মেথিয়াগোড় ও হলসী-জয়গুরু সম্প্রদায়।

কিঙ্কর শ্রীচিন্তাহরণ এই মঠের সেবকরূপে নিযুক্ত আছেন।

* * * *

রামেশ্বরপুরের (হুগলি) শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি কীর্ত্তন দল রাসপূর্ণিমার দিন দিঘনেশ্বর-গ্রামে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ করেন। এই মণ্ডলী কর্ত্তৃক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে শ্রীশ্রীনাম প্রচারিত হয়।

* * * *

গিরিবালা-আশ্রমে (বাতনা, হুগলি) ২৮শে কার্ত্তিক উত্থান-একাদশী উপলক্ষ্যে উদয়াস্ত নামযজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়।

* * * *

পলতাগড়-শ্রীরামাশ্রম শাখায় শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজায় নরনারায়ণ সেবা, নামযজ্ঞাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

* * * *

শ্রীশ্রীদাশরথি মঠে (কলাপুকুর, বর্দ্ধমান) রাস-উৎসব ও কার্ত্তিকপূজা হয়। এই উপলক্ষে নামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রম সেবকগণ কার্ত্তিক মাসে হুগলি ও বর্দ্ধমান জেলার কয়েকখানি গ্রামে শ্রীশ্রীনাম প্রচার করেন।

* * * *

২১শে কার্ত্তিক স্বর্গীয় সদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অষ্টম বার্ষিক মৃত্যু তিথি উপলক্ষে শ্রীকাশীরামাশ্রমে চতুষ্প্রহরব্যাপী নামযজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় বহু নরনারী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'-বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল—'সদানন্দ-' নাম, নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল। তাঁহার স্মরণতিথি পালন করিয়া শ্রীকাশীরামাশ্রম আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

* * * *

শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়ের একটি কীর্ত্তনসংঘ ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা জেলার শতাধিক গ্রামে ও কয়েকটি সহরে শ্রীনাম প্রচার করিয়াছেন। ঢাকা-সহরকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রচারকগণ সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে কীর্ত্তনসহ পরিভ্রমণ করিতেছেন।

* * * *

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি

আগামী ৭ই ফাল্গুন (১৯শে ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবার কৃষ্ণা পঞ্চমী শ্রীশ্রীঠাকুরের ষট্‌ষষ্ঠিতম শুভ-আবির্ভাব তিথি। সম্প্রদায়ের সকলেই এই পুণ্যতিথি পালন করিবেন—আমরা এই আশা করি।

জন্মক্ষণ—বেলা ৮৷১ মিঃ (১২ টার মধ্যে তিথিপূজা কৃত্য)

জুয়েলার
C.C.D.

প্রবীণ শিক্ষাব্রতী সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত
ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত

॥ ওপারের আলো ॥

ঃ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত ঃ

'লেখকের অপরোক্ষ রসানুভূতি ও নিবিড় ভগবৎ-প্রেম সর্বত্র পরিস্ফুট।' —কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন।

'সংসার জীবনের অন্ধকারে যাঁহারা ওপারের আলো দেখিতে চাহেন তাঁহারা বইটি পড়িয়া উপকৃত হইবেন।' —যুগান্তর।

'ওপারের আলো—তার অপূর্ব দীপ্তি ও মাধুর্য্য লইয়া—এক নূতন পথের সন্ধান দেয়। লেখক সেই জ্যোতির্ময়-পথের কথা তাঁহার অনবদ্য ভাষায় রূপক রচনাগুলির ভিতর দিয়া প্রকট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সেই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে।'

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

(১) কমলা বুক ডিপো—১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(২) গ্রন্থকার—থৈপাড়া, পোঃ পাণ্ডুয়া, হুগলি।

[মূল্য—২৷৷০]

দেবযানের নিয়মাবলী

১। **দেবযান** মাসিক ধর্ম্ম-পত্র—প্রতি মাসে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। ২। দেবযানের বার্ষিক মূল্য সডাক ৫৲ এবং প্রতি সংখ্যা ।৷০। ৩। গ্রাহক মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা—**'দেবযান' কার্য্যাধ্যক্ষ, পোঃ মগরা, হুগলী।** ৪। ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, নাটক ও তথ্যবহুল রচনা সাদরে গৃহীত হয়। ৫। রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—**সম্পাদক, "দেবযান" কার্য্যালয়, পোঃ ডুমুরদহ, হুগলী।** অমনোনীত রচনা উপযুক্ত ডাক টিকিট না থাকিলে ফেরত দেওয়া হয় না। ৬। মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক **"দেবযান" কার্য্যালয়—পোঃ মগরা** ঠিকানায় জানাইবেন।

৭। পত্রলেখকগণ অনুগ্রহপূর্বক পত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন এবং রিপ্লাই-কার্ড লিখিবেন। রিপ্লাই-কার্ড ভিন্ন পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না।

৮। **সমালোচনার জন্য দুইখানি বই** কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের হার

(ক) কভার ও বিশেষ স্থানে বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখিলে জানান হয়।

(খ) অন্য বিজ্ঞাপন—

প্রতিমাসে	পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০৲
"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১৫৲
"	সিকি পৃষ্ঠা	৮৲
বাৎসরিক	পূর্ণ পৃষ্ঠা	২২০৲
"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১১৫৲
"	সিকি পৃষ্ঠা	৬০৲

(গ) অশ্লীল বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না। সাধারণ বিজ্ঞাপন সুবিধামত যে কোন স্থানে দেওয়া হইবে। বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপনের টাকা রীতিমত সময় মধ্যে পরিশোধ না করিলে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিবে। ব্লক নষ্ট হইয়া গেলে অথবা সাবধানতা সত্ত্বেও হারাইয়া গেলে কর্তৃপক্ষকে দায়ী করা চলিবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত পুস্তকাবলী

১। শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত—১॥০; ২। শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী—১৷৵০; ৩। শ্রীশ্রী-নামমহিমামৃত—১॥০; ৪। ক্ষেপার ঝুলি (১ম খণ্ড)—১॥০; ৫। ঐ (২য় খণ্ড)—১॥০; ৬। শ্রীশ্রীতুলসীমহিমামৃত—১॥০; ৭। পাগলের খেয়াল (৩য় সং) — ১।০; ৮। মহারসায়ন (৪র্থ সং)—১৲; ৯। শ্রীশ্রীগুরুগীতা (৩য় সং)—১৲; ১০। শ্রীশ্রীনামরসায়ন (২য় সং)—১৲; ১১। চোখের জলে মায়ের পূজা—১৲; ১২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (গুণ্টুর পত্র)—॥৵০; ১৩। পুষ্প চন্দন—॥০; ১৪। বর্ণাশ্রম বিপ্লব—॥০; ১৫। সুধার ধারা (২য় সং)-॥০; ১৬। কথা রামায়ণ (১ম খণ্ড) ৩৲ ঐ বাঁধাই ৩॥০; ১৭। অভয় বাণী (পুস্তক)—।৵০; ১৮। শ্রীশ্রীরামনাম লিখন মহিমা—।০; ১৯। ত্রৈকালিক স্তবমালা (৪র্থ সং) ।০; ২০। শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—।০; ২১। ভক্তি দর্শন (শাণ্ডিল্য সূত্র)—১।০; ২২। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু—৷৵০; ২৩। শত পঞ্চ চৌপাই ২৪। গণেশের সন্ধ্যা; ২৫। শ্রীশ্রীগোপীগীতা; ২৬। আঁধারে আলো—৵১০; ২৭। শ্রীশ্রীবিষ্ণু সহস্র নাম; ২৮। মহাব্রত; ২৯। দাস্য মধুর—২৲; ৩০। পত্রাবলী (১ম খণ্ড) ৷৵০; ৩১। বাণীমালা (১ম খণ্ড, ২সং)—॥৵০; ৩২। যুগবাণী—৴০; ৩৩। পূজার ফুল; ৩৪। ফুলমালা; ৩৫। কলির পথ—।০; ৩৬। শ্রীশ্রীওঙ্কারসহস্রগীতি—১৲; ৩৭। শিব-বিবাহ—১।০; ৩৮। দুটী কথা—।৵০; ৩৯। শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য—৷৵০; ৪০। শ্রীশ্রীনাদলীলামৃত ৪৲, ৪॥০; ৪১। মুমুক্ষুর প্রাতঃকৃত্য—৴০; ৪২। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর ২।০,২॥০; ৪৩। গুরুরত্নম্—৴০; ৪৪। হরিরত্নম্—৴০; ৪৫। রামসহস্রনাম—৴০ ৪৬। মুমুক্ষু শ্রীরামানন্দীয় শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রাতঃকৃত্য—৴০। ৪৭। শাক্ত ও শৈব মুমুক্ষুর প্রাতঃকৃত্য প্রকরণ—(যন্ত্রস্থ); ৪৮। মাতৃপূজা—১৷৵০; ৪৯। প্রপন্ন পথিক (যন্ত্রস্থ)। ৫০। শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী (যন্ত্রস্থ)। ৫১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (যন্ত্রস্থ)। ৫২। নারদীয় ভক্তি সূত্র (যন্ত্রস্থ)। ৫৩; বিরক্ত পূজা (যন্ত্রস্থ)। ৫৪। বড় অতিথি (যন্ত্রস্থ)

সম্প্রদায়ের অন্যান্য পুস্তক:

১। সুধা-সঙ্গীত—শ্রীমদ্ দাশরথি দেব যোগেশ্বর—॥০; ২। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী (স্বরলিপি)—কিঙ্কর শ্রীপ্রণবানন্দ—১॥০; ৩। শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য (৩য় সং)—কিঙ্কর শ্রীশান্তিনাথ; ৪। নামের জয়—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যারত্ন—৴০। ৫। দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচারলীলা—কিঙ্কর গোবিন্দ দাস—৷৵০; ৬। স্তবকুসুমাঞ্জলি—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত (২য় প্রবাহ)—৪৲; ৭। নামপ্রেমী ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ—শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৲; ৮। পরিচিতি—শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী, এম্-এ, এল্-এল্-বি, (আই-পি)—৴০; ৯। ঐ হিন্দী (পরিচয়)—৴০। ১০। ঐ (উর্দ্দু)—৴০; ১১। ঐ (গুজরাটী)—।০; ১২। অচ্যুতানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী (উড়িয়া)—।৴০। ১৩। A short Biography of Sri Sitaramdas—S. Sil (অনূদিত)

অনুবাদ ঃ

১। Road to Life Divine (মহারসায়ন)—S. Sil ১৲; ২। Pages from a Crazy-man's Life (ক্ষেপার ঝুলি)—S. Sil—১॥•; ৩। মহারসায়ন (হিন্দী) নূতন ২য় সংস্করণ—অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী এম্-এ —॥•; ৪। ঐ (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ—১৲; ৫। ঐ (উড়িয়া) —১৲ ৬। অভয় বাণী (হিন্দী)—।•; ৭। ঐ (মারাঠী)—৵০ ৮। শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর (হিন্দী যন্ত্রস্থ); ৯। Upset in our Social Order (বর্ণাশ্রম বিপ্লব)—॥৵•; ১০। বর্ণাশ্রম বিপ্লব (তেলেগু)—শ্রীমৎ দাসশেষজী মহারাজ; ১১। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র সংকীর্ত্তন (হিন্দী)—শ্রীহরিপ্রসাদ তেয়ারী ; ১২। ঐ (তেলেগু) —দাসশেষজী মহারাজ; ১৩। বাণীমালা (হিন্দী)-॥•; ১৪। ঐ (উড়িয়া)—॥• । ১৫। শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কল্পতরু (হিন্দী)— ৺হরিনন্দন ঝা, —॥৵•; ১৬। ঐ (তেলেগু)—দাসশেষজী মহারাজ ; ১৭। আঁধারে আলো (হিন্দী)—অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী—৵১০। ১৮। ঐ (মারাঠী)—৵০ ।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

১। শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ, হুগলী। ২। দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ মগরা, হুগলী ৩। মহেশ লাইব্রেরী—কলিকাতা-১২। ৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—কলিকাতা-৬

—সম্পাদক—

শঙ্কর বিদ্যাভূষণ শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সার্ভিস্ প্রিণ্টার্স, ৪১নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট কলিকাতা-৫ হইতে মুদ্রিত ও পোঃ মগরা, হুগলী হইতে প্রকাশিত।

॥ শ্রীঃ ॥

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত

সূচীপত্র

দেবযান : মাঘ, ১৩৬৩

বিষয়

—০—

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ,
ষষ্ঠ সংখ্যা

মাঘ
১৩৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

ভক্ত-বন্দনা

[কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়]

এক শুধু নামে ছিল রুচি,
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা এড়াইয়া ছিলে শুদ্ধ শুচি।
ভুক্তিরে চাহনি কোন দিন,
মুক্তিরেও চাহনিক ছিলে উদাসীন।
একমাত্র ভক্তি ছাড়া কাম্য তব ছিল না জীবনে
আদর্শ বৈষ্ণব তুমি বঙ্গবৃন্দাবনে।
কণ্ঠে ছিল সুধাগঙ্গা তাহে করি স্নান
উদীরিত হরিনাম হলো মূর্ত্তিমান।

দ্রবীভূত হ'ল তায় কাষ্ঠ ও পাষাণ,
শুষ্ক তরু মঞ্জরিল তায় ;
কদম্ব ফুটালে তুমি পাষণ্ডেরো গায়।
চন্দনাক্ত হলো তায় অভক্তেরো আঁখি,
উদ্ধারিলে কত পাপী, আমি শুধু রৈনু যে বাকী।
তোমার পরশ পাই নামের উল্লাসে,
আজিকে তোমার ঠাঁই নারদের পাশে।

—০—

শ্রীশ্রীনামামৃতলহরী

।। চতুর্থ প্রকরণ, দ্বাদশ উচ্ছ্বাস ।।

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

।। শ্রীরাম শরণং মম ।।

যন্নামস্মৃতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসার বারাং নিধিং
তীর্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।
তস্যৈবস্থিতিকারিণ স্ত্রিজগতাং রামস্য ভক্তাঃ প্রিয়াঃ
যূয়ং কিং ন সমুদ্র মাত্র তরণে শক্তাঃ কথং বানরাঃ॥
কার্য্য-ক্রিয়াকারণমপ্রমেয়ং কবিং পুরাণং কমলায়তাক্ষম্।
কুমারবেদ্যং করুণাময়ং তং কল্পদ্রুমং রামমহং ভজামি ।।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ

অহোরাত্রঞ্চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ং।
সর্ব্বপুণ্যং সমাপ্নোতি রামনাম প্রসাদতঃ ।।

—দিবানিশি রাম এই অক্ষরদুটী যে জপ করে রাম নাম প্রসাদে সে সমস্ত পুণ্য লাভ করে থাকে।

শ্রীবামদেব—

রামরামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥
রামনাম্নৈব মুক্তিঃ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ ।।

—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

—এই জগতে যে মানবগণ নিত্য, 'রাম রাম' এই জপ করেন তাঁদের কখনও মৃত্যুভয়-আদি হয়না। কলিযুগে রাম নামের দ্বারাই মুক্তি হয়, অন্য কোন উপায় দ্বারা হয় না।

যে চ দোষবিঘ্নকরামৃতকা বিগ্রহাশ্চ যে।
রামনাম্নৈব বিলয়ং যান্তি নাত্র বিচারণা॥

—স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে।

—বিঘ্নকর দোষসকল, বিগ্রহসমূহ রামনামের দ্বারা বিলীন হয়, এতে বিচার কর্‌বার কিছু নাই।

রমতে সর্ব্বভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
অন্তরাত্মা স্বরূপেণ যচ্চ রামেতি কথ্যতে॥ —ঐ॥

—স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতে এই রাম অন্তরাত্মা স্বরূপে রমণ করেন।

ইঁট, কাঁকর বালি এদেরও অন্তরাত্মা—এরা জড় তো!

সৎ-চিৎ-আনন্দ, অস্তি-ভাতি-প্রিয় রামের তিনটী স্বরূপ। সৎরূপে বালী কাঁকরকেও ধরে আছেন। তিনি অন্তরাত্মা স্বরূপে না থকালে এরা থকতো না।

রামেতি মন্ত্ররাজোঽয়ং ভবব্যাধি নিষূদক।
রণে বিজয়দশ্চাপি সর্ব্বকার্য্যার্থ সাধক:
সর্ব্বতীর্থফল: প্রোক্তো বিপ্রাণমপি কামদ:
রামচন্দ্রেতি রামেতি রামেতি সমুদাহৃত:॥

—নাগর খণ্ড॥

—'রাম' এই মন্ত্ররাজ ভবব্যাধি বিনাশক, রণে বিজয় প্রদান করেন ও সমস্ত কার্য্যকারণসাধক সর্ব্বতীর্থের ফলস্বরূপ। ব্রাহ্মণগণেরও কামপ্রদ রামচন্দ্র 'রাম রাম' এই নামে কথিত হন।

দ্ব্যক্ষরো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্ব্বকার্য্যকরো ভুবি।
দেবা অপি প্রগায়ন্তি রামনাম গুণাকরম্॥
তস্মাত্ত্বমপি দেবেশি রামনাম সদা বদ।
রাম নাম জপেদ্ যোবৈ মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈ:॥
সহস্র নামজং পুণ্যং রাম রামনাম্নৈব জায়তে।
চাতুর্মাস্যে বিশেষেণ তৎপুণ্যং দশধোত্তরম্॥
হীন জাতি প্রজাতানাং মহদ্দহ্যাতি পাতকম্॥

—'রাম' এই দুটী অক্ষর মন্ত্ররাজ; সংসারে অখিলকার্য্য কারক। দেবগণও অশেষ কল্যাণগুণের উৎপত্তিস্থান রাম নাম গান করেন। যিনি যে কোন

উদ্দেশ্যে রাম নাম জপ করবেন তাঁর তাহা সফল হয়ে থাকে। অতএব হে দেবেশি! তুমিও রামনাম সতত জপ কর। যে ব্যক্তি রাম নাম জপ করে, সে সর্ব্বপাপ হতে মুক্ত হয়, বিশেষ চাতুর্মাস্যে সেই পুণ্য দশগুণ অধিক হয়। হীন জাতিগণেরও রাম নাম জপে মহাপাপ ভস্ম হ'য়ে যায়।

রামোঽহ্যয়ং বিশ্বমিদং সমগ্রং
স্বতেজসা ব্যাপ্যজনান্তরাত্মনা।
পুণাতি জন্মান্তর পাতকানি
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি ক্ষণাচ্চ দগ্ধা ॥ ৫৩॥

—এই রাম সমগ্র বিশ্বে স্বকীয় তেজের দ্বারা অন্তরাত্মারূপে অবস্থান কর্‌ছেন; স্থূল, সূক্ষ্ম, জন্মান্তর-কৃত পাতক সকল—ক্ষণমাত্রে দগ্ধ করত পবিত্র করেন।

রাম নামের অর্থ কি?

"রমু ক্রীড়াদিষু ইতি রম ধাতোর্রাম সিধ্যতি"—রম ধাতু—ক্রীড়ার্থক, তা'হতে রাম পদ সিদ্ধ হয়।

রমন্তে লোকা অত্র ইতি রামঃ। লোক সকল ইঁহাতে রমণ করেন এইজন্য ইনি রাম।

"রময়তি লোকান্ ইতি রামঃ"—লোক সমূহকে রমণ করান এইজন্য ইনি রাম।

"রমন্তে যোগিনোঽত্র ইতি রামঃ।" যোগিগণ ইঁহাতে রমণ করেন তজ্জন্য ইনি রাম।

"রময়তি মোদয়তি সর্ব্বান্ ইতি রামঃ।" সকলকে আনন্দিত করাইয়া থাকেন বলিয়া ইনি রাম।

"রময়তি জন্মাদি দাতৃত্বেন দেবয়তি ভূতান্।" ভূত সকলকে জন্ম-স্থিতি-নাশ দান পূর্ব্বক ক্রীড়া করান বলিয়া রাম।

রাশব্দো বিশ্বচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ।
বিশ্বানামীশ্বরো যোহি তেন রাম প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

—রা শব্দের অর্থ বিশ্ব, মকার ঈশ্বরবাচক, এইজন্য পণ্ডিতগণ রামকে লক্ষ্মীপতি বলেছেন।

ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন্ মহা বিষ্ণৌ জাতে দশরথে হরৌ।
রঘোকুলেঽখিলং রাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ ॥
স রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রকটীকৃতঃ ॥

—শ্রীরামপূর্ব্বতাপিনী শ্রুতিঃ।

—এই চিন্ময় মহাবিষ্ণু হরি দশরথ হইতে উৎপন্ন হইয়া রঘুকুলে অখিল দান করেন। যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া—শোভা পান, বিদ্বান্‌গণ 'তিনি রাম' ইহা জগতে প্রচার করিয়াছেন।

রাক্ষসা যেন মরণং যান্তি স্বোদ্রেকতোঽথবা।
রাম নাম ভুবি খ্যাতমভিরামেণ বা পুনঃ॥

—শ্রীরামপূর্ব্বতাপিনী।

—রাক্ষসগণ যাঁহার দ্বারা অথবা যাঁহার আবির্ভাবে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছিল তিনি রাম নামে পৃথিবীতে খ্যাত হইয়াছেন, কিংবা রমণীয় হেতু রাম বলিয়া কথিত হন।

যস্মিন্ রমন্তে মুনয়ো বিদ্যয়াজ্ঞান বিপ্লবে।
তং গুরুঃ প্রাহ রামেতি রমণাদ্রাম ইত্যপি॥

—অজ্ঞান বিপ্লবে মুনিগণ যাঁহাতে বিদ্যার দ্বারা রমণ করেন তাঁহাকে বশিষ্ঠদেব রাম বলিয়াছেন।

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রাম পদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥ —ঐ॥

—অনন্ত নিত্যানন্দময় চিদাত্মায় যোগিগণ রমণ করেন এই জন্য 'রাম' পদের দ্বারা তিনি পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হন।

ধর্ম্মমার্গ চারিত্রেণ জ্ঞানমার্গঞ্চ নামতঃ।
তথা ধ্যানেন বৈরাগ্য মৈশ্বর্য্যং স্বস্য পূজনাৎ।
তথারাত্যস্য রামাখ্যা ভুবিস্যাদথতত্ত্বতঃ॥

—শ্রীরামপূর্ব্বতাপিনী।

—চরিত্রের দ্বারা ধর্ম্মমার্গ, নামের দ্বারা জ্ঞানমার্গ, ধ্যানে বৈরাগ্য ও পূজায় ঐশ্বর্য্য দেন বলিয়া পৃথিবীতে তাঁহার যথার্থতঃ রাম এই নাম হইয়াছে।

রকার রামচন্দ্রঃ স্যাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
আকারো জানকী প্রোক্তা মকারো লক্ষ্মণঃ স্বরাট্।

—অগস্ত্য সংহিতা।

রাম বল্‌তে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা তিনজনকেই বুঝাবে—অগস্ত্যমুনি বলেছেন।

র—নারায়ণ অ—নির্গুণ ম—মহাহ্লাদাভিধায়িনী।
র—বিজ্ঞান অ—জ্ঞান ম—পরমাভক্তি।
র—চিৎ অ—সৎ ম—আনন্দ।
র—অগ্নিবীজ অ—ভানুবীজ ম—চন্দ্রবীজ। —মহারামায়ণ।

র—অগ্নিবীজ মনোমল নাশ ও শুভাশুভ কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।

অ—ভানুবীজ সদ্‌বৃত্তি প্রকাশের দ্বারা মানবগণের অবিদ্যা অন্ধকার দূর করে।

সদ্‌বারি পরিপূরিত চন্দ্রবীজ 'ম'-কার আধিদৈবিক, আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক তাপত্রয় দূর করিয়া শীতল করিয়া থাকেন।

রকারস্তৎ পদোজ্ঞেয় স্থং পদোঽকার উচ্যতে।
মকারোঽসি পদজ্ঞেয়ং তত্ত্বমসি সুলোচনে॥

রকারের অর্থ তৎ, অকারের অর্থ ত্বং, মকারের অর্থ অসি। 'তত্ত্বমসি' উপনিষদ্‌-প্রসিদ্ধ মহাবাক্য রামনামের অর্থ।

'রাম' মাত্র এই দুটী অক্ষরের এত অর্থ?

আমি আর অর্থ কি জানি! যা সামান্য জানি বলছি।

"রমতে রময়া সার্দ্ধং তেন রামং বিদুর্বুধাঃ"

—রমার সহিত রমণ করেন বলিয়া রাম।

"রমাণাম্ রমণস্থানং রামং রাম বিদোবিদুঃ"

—রাম-তত্ত্ববিদ্‌গণ রামকে রমার রমণস্থান বলে জানেন।

রকারোঽনলবীজং স্যাদ্ যৎ সর্ব্বেঃ বাড়বাদয়ঃ।
কৃত্বা মনোমলং সর্ব্বং ভস্মকর্ম্ম শুভাশুভম্॥
অকারো ভানুবীজং স্যাদ্ বেদশাস্ত্রপ্রকাশকঃ॥
নাশয়ত্যেব সা দীপ্ত্যা যা বিদ্যাহৃদয়েতমঃ॥
মকারশ্চন্দ্রবীজং স্যাদ্ যদপাং পরিপূরণম্।
ত্রিতাপং হরতে নিত্যং শীতলত্বং করোতি চ॥

—মহারামায়ণ।

এর অর্থ আগে বলেছো।

রকার হেতু বৈরাগ্যং পরমং যজ্ঞ কথ্যতে।
অকার জ্ঞান হেতুশ্চ মকার ভক্তি হেতুকম্।
রকার যোগিনাং ধ্যেয়ো গচ্ছতি পরমং পদং।
অকার জ্ঞানিনাং ধ্যেয়স্তে সর্ব্বে মোক্ষরূপিণঃ।
পূর্ণং নাম মুদাদাসাধ্যায়ন্ত্য চলমানসাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি পরাং ভক্তিং শ্রীরামস্য সমীপকম্॥

রকার ধ্বজবৎ প্রোক্তো মকারশ্ছত্রবত্তথা।
সর্ব্ববর্ণ শিরস্থোহি রাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

—কৌশল্যা-খণ্ডে।

কৌশল্যাখণ্ডে আছে—রকার ধ্বজবৎ এবং মকার ছত্রের ন্যায় সমস্ত বর্ণের শিরে অবস্থান করেন, বুধগণ ইহা বলেন।

কি হ'লো?

রকার বা রেফ্, ও মকার সংস্কৃত অক্ষর ং-বিন্দু—রেফ্ (̍) আর বিন্দু (•) সকল অক্ষরের মাথায় থাকেন।

রকারোচ্চারণেনৈব বহির্নির্যাতি পাতকম্।
পুনঃ প্রবেশকালে চ মকারস্তু কপাটকম্॥

—পুলহসংহিতা।

—রকার উচ্চারণ কর্‌লেই শরীরস্থ পাতক সকল বাইরে যায় আর "ম" কপাট হয়ে যান, পাপ দেহে প্রবেশ কর্‌তে পারে না বাইরেই থেকে যায়।

"রা" বল্‌লে হাঁ হয় ও "ম" বল্‌লে মুখ বুজে যায়, বাঃ, এতো বেশ উপায় দেখ্‌ছি "রা" বলে পাপকে তাড়িয়ে দিয়ে—"ম" বলে দরোজা বন্ধ করে দেওয়া!

রমন্তে যোগিনো নিত্যং যদ্বা রময়তি স্বকান্।
নির্গুণং সচ্চিদানন্দং সগুণঞ্চেতি কীর্ত্ত্যতে॥

জ্যোতি নাদ্-স্বরূপী রামে নিত্য যোগিগণ রমণ করেন অথবা রামরূপে স্বভক্তগণকে রমণ করান সেই হেতু রাম নির্গুণ, সচ্চিদানন্দ ও সগুণ বলে কথিত হন।

রকারার্থো রামঃ সগুণ পরমৈশ্বর্য্য জলধিঃ
মকারার্থো জীবঃ সকলবিধ কৈঙ্কর্য্যনিপুণঃ।
তয়োর্মধ্যাকারো যুগলমথ সম্বন্ধ মনয়ো
রনন্যার্থঃ শ্রুত্যা নিগম সমরূপোহয়মতুলঃ॥

—পুলহসংহিতা।

আদ্যোরাতৎ পদার্থঃ স্যান্মকার স্বং পদার্থবান্।
তয়োঃ সংযোজনমসীত্যাত্মা তত্ত্ববিদো বিদুঃ॥

—প্রথম 'রা' তৎ পদার্থ, 'ম' ত্বং পদার্থ, 'অসি' উভয়ের সংযোজন-আত্মা, ইহা তত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন।

অগ্নিষোমাত্মকং রূপং রামবীজে প্রতিষ্ঠিতম্।

—শ্রীরামরহস্য।

—অগ্নিষোমাত্মক রূপ রামবীজে প্রতিষ্ঠিত।

রামনাম্নি স্থিতোরেফো জানকী তেন কথ্যতে।
রকারেন তু বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ।

অকারেণ তু বিজ্ঞেয় ভরতো বিশ্বপালকঃ
ব্যঞ্জনেন মকারেণ লক্ষ্মণোঽত্র নিগদ্যতে।
হ্রস্বাকারেণ নিগমৈঃ শত্রুঘ্নঃ সমুদাহৃতঃ॥

—সদাশিব সংহিতা।

—রাম নামে রেফ জানকী, রকার পুরুষোত্তম শ্রীরাম, অকার বিশ্বপালক ভরত, হসন্ত মকার লক্ষ্মণ, মকারের পর অকার শত্রুঘ্ন।

রকারঃ সর্ব্বদেবানাং সাক্ষাৎকালানলঃ প্রভুঃ।
মকারঃ সর্ব্বসিদ্ধানাং সর্ব্বসৌখ্য প্রদস্তথা।
রকারঃ সর্ব্বজীবানাং সর্ব্বপাপস্য দাহকঃ
মকারঃ সর্ব্বদেবানাং সিদ্ধিরস্তু সদা প্রিয়ে।
রকারঃ সর্ব্বকামশ্চ পরিপূর্ণ মনোরথঃ।
মকারঃ সর্ব্বজীবানাং পালকো জগদীশ্বরঃ॥
রকারঃ সর্ব্বদুষ্টানাং নাশকো রঘুনায়কঃ।
মকারঃ সর্ব্বসিদ্ধিনাং কারণং নাত্র সংশয়ঃ॥

—ব্রহ্ম যামলে।

—রকার সমস্ত দেবগণের সাক্ষাৎ প্রভু কালানল, মকার সকল সিদ্ধগণের সর্ব্ব সৌখ্য প্রদায়ক। রকার সর্ব্বপ্রাণীর পাপের দাহক, মকার নিখিল সুরসমূহের সিদ্ধি স্বরূপ। রকার সর্ব্বকাম পরিপূর্ণ মনোরথ। মকার সর্ব্বজীবের পালক জগদীশ্বর। রকার সর্ব্ব দুষ্টের নাশক রঘুনাথ। মকার সর্ব্বসিদ্ধির কারণ—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

"রাম" এই দুটী অক্ষরই সব দেখ্‌ছি!

স্থাবর জঙ্গম অখিল ব্রহ্মাণ্ড রামবীজের মধ্যে অবস্থিত। কেবল 'রাম রাম' করা, ব্যস্‌ তা হ'লেই সব হয়ে যাবে।

শুনলিরে ক্ষেপা নামের মহিমা, বল নাম অনিবার।
দুবাহু তুলিয়া রাম রাম বলি নেচে নেরে একবার॥
জয় দাশরথি জয় হে দয়াল জয় জয় প্রাণকান্ত।
আমি হে তোমার তুমি গো আমার শান্ত কর মোর শ্রান্ত॥

জয় জয় রাম। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

—০—

সরস্বতী দেবী

[শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়]

সরস্বতী দেবীর স্তবে বলা হইয়াছে—

"বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্বৈররর্চিতা দেব দানবৈঃ"

দেবতা ও দানবগণ সরস্বতী দেবীর পূজা করেন। কিন্তু দুর্গাদেবী সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। দানবগণ দুর্গাদেবীর পূজা করে নাই, দুর্গাদেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সরস্বতী দেবী এবং দুর্গাদেবীর মধ্যে এই প্রভেদ। সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জ্ঞান সকলেই চায়। দানবগণও চাহে। দানবগণ জ্ঞানের অপব্যবহার করে। দেবতাগণ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেন।

সমস্ত দেবশক্তির সম্মিলিতরূপ হইতেছেন দুর্গা। সুতরাং দুর্গার মধ্যে সরস্বতী দেবীও অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞানশক্তি দুর্গাদেবীর মধ্যে আছে। আরও অনেক শক্তি আছে—কর্মশক্তি, সৃষ্টিশক্তি, সংহারশক্তি। দুর্গাদেবী সকল শক্তির আধার।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সরস্বতীদেবী সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। সরস্বতী-দেবীর প্রণাম মন্ত্র—

"ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।

বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥

কালী কৃষ্ণবর্ণা। সংহার মূর্ত্তি। সরস্বতী শ্বেতবর্ণা।

সূর্য্যরশ্মির সঙ্গে সাত প্রকার বর্ণ আছে—violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red! কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর উপর সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে ঐ বস্তু সূর্য্য কিরণের অন্তর্গত সকলবর্ণের রশ্মি আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। কোনও রশ্মি প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু শ্বেতবর্ণের বস্তুর উপর সূর্য্যকিরণ পড়িলে সকলবর্ণের রশ্মি প্রতিফলিত হয়। কৃষ্ণবর্ণা কালী সকল বস্তু সংহার করেন। শ্বেতবর্ণা সরস্বতী সকল বস্তু প্রকাশ করেন। কারণ জ্ঞান দ্বারাই সকল বস্তু প্রকাশ হয় এবং সরস্বতী জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। সরস্বতী যে সকল বস্তু প্রকাশ করেন তাহার মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার বস্তুই থাকে। এজন্য সরস্বতী দেব ও দানব উভয়ের দ্বারা পূজিত হন। ঈশ্বর কাল বা মহাকাল রূপ জগৎ পরিচালিত করেন। তাঁহার সংহারশক্তি কৃষ্ণবর্ণা কালী। তাঁহার প্রকাশ-শক্তি শ্বেতবর্ণা কালী বা ভদ্রকালী।

কুরুক্ষেত্রের নিকটে সরস্বতী নদী বিদ্যমান। এক্ষণে কালীঘাটের আদি-গঙ্গার ন্যায় শীর্ণ কলেবর। বেদে উল্লেখ আছে সে সময় সরস্বতী নদী হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত। মনু বলিয়াছেন—

সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরা।

তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ২।১৭

সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুইটি দেবনদীর মধ্যবর্ত্তী দেবনির্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলা হয়। বৈদিক যুগে সরস্বতী নদীর তীরে অনেক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সতত বেদ পাঠ হইত। বেদ জ্ঞানের আধার। এজন্য সরস্বতী নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। যিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যে নদীর তীরে জ্ঞানের প্রভূত চর্চ্চা হইত তিনি সেই নদীরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমীর দিন সরস্বতী দেবীর পূজা হয়। এককালে বোধ হয় এই দিন বসন্ত ঋতুর আরম্ভ হইত। শীতের জড়তা কাটিয়া বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব জ্ঞানের দেবতা সরস্বতী দেবীর পূজার সময়। বৃক্ষলতায় তখন নবীন কিসলেয়ের আবির্ভাব হয়, নানাবিধ ফুল ফোটে, ভ্রমর গুঞ্জন করে, প্রকৃতি নববেশ পরিধান করিয়া হৃদয়ের আনন্দে মধুর গান গাহিতে থাকে। কবি বিদ্যাপতি ইহার বর্ণনা করিয়াছেন,—

মাঘ মাস সিরি পঞ্চমী গঞাইলি

নবম মাস পঞ্চমহু রুয়াই

অতিঘন পীড়া দুখ বড় পাওল

বনস্পতি ভেল ধেই রে

"মাঘ মাস শ্রীপঞ্চমীকে প্রসব করিল। নবীন মাস এজন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল। অতিশয় ব্যথাতে অত্যন্ত দঃখ পাইল। বনস্পতি ধাত্রী হইল।" অর্থাৎ বনস্পতি-ক্রোড়ে নবীন কিশলয় রূপ শিশুর আবির্ভাব হইল।

দুর্গাপূজা যেমন বাঙ্গলা দেশের বিশেষত্ব সেইরূপ সরস্বতী পূজাও বাঙ্গলা দেশের বিশেষত্ব। অন্য প্রদেশে এই দিন সরস্বতী দেবীর পূজা করিবার প্রথা নাই। বাঙ্গলার গৃহে গৃহে সরস্বতী পূজা হয়। ইহা বিশেষ করিয়া ছাত্র এবং শিশুদেরই উৎসব। যে গৃহে সরস্বতী দেবীর প্রতিমা আনিয়া পূজা করা হয় না, সেখানে বহিগুলি সাজাইয়া, দোয়াতে দুধ ভরিয়া, শরের লেখনী দিয়া পূজা করা হয়। ছেলেরা উৎসাহের সহিত তাহাদের পাঠ্য পুস্তক-গুলি আনিয়া দেয়। মা সরস্বতীর কৃপায় তাহাদের ভাল লেখাপড়া হইবে। ভুট্টার খৈ, চিনির মিষ্টান্ন ছোলাভাজা এবং নারিকেল কুল মায়ের প্রসাদ বলিয়া

খাইতে আরও মিষ্ট লাগে। শীত এখনও যায় নাই। সকালে স্নান করিতে একটু কষ্ট হয়। তথাপি ছেলেরা মহা আনন্দে স্নান করিয়া, নূতন বস্ত্র পরিয়া, ফুল এবং পূজার অন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পুরোহিত ঠাকুরের প্রতীক্ষা করে। পুরোহিত ঠাকুরকে আজ অনেক বাড়ীতে যাইতে হইবে। সকলেই চাহে যে তাহাদের বাড়ীতেই পুরোহিত ঠাকুর প্রথমে আসিবেন। যথাসময়ে পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়াইলেন। ছেলেরা সমবেত হইয়া অঞ্জলি প্রদান করিল। তাহার পর প্রসাদ খাইয়া বাড়ী বাড়ী প্রতিমা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। জগন্মাতার যে আনন্দময় মূর্ত্তি দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজার সময় বাঙ্গলার গৃহে গৃহে দেখা যায় আর কোথাও তাহা দেখা যায় কি না সন্দেহ।

—০—

একটী ভাবের গান শ্রবণে

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

এই ত চিত্ত জড় ভাবে ছিল—কোনকিছুর স্ফুরণ ছিল না। অকস্মাৎ একটি গানের অংশবিশেষ কর্ণে প্রবেশ করিল—এক মুহূর্ত্তে তমঃ পলাইল। যে বৈষ্ণবের শুদ্ধ হৃদয় হইতে এই গীত বাহির হইয়াছে তাঁহাকে কোটি কোটি নমস্কার করিলাম।

আহা! কি সুন্দর। "আমি সুখ দুঃখ তব, পদধূলি বলে, মাথায় তুলিয়া লব, আমি কি আর কব॥"

যে তোমার দর্শনে চলিয়াছে সে কি সুখ দুঃখ গ্রাহ্য করে? হে পান্থ! হে পথিক, তুমি ত সংসার পথে চলিয়াছ তার দর্শনে। যে আশ্রম লইয়াই থাক, চলিয়াছ কিন্তু তার দর্শনে। তার দর্শনে চলিয়াছি, যদি মনে রাখিতে না পার তবে জীবন বিফল গেল জানিও। জীবনপথে যে অবস্থায় আইস না কেন—সেখানে যত দুঃখ আসুক না কেন, যত সুখ বা আসুক না কেন, তুমি যার দর্শনে বাহির হইয়াছ এই সুখ দুঃখ, এই বিঘ্ন বিপত্তি—এসব তোমারই পদধূলি—ইহা মাথায় তুলিয়া লইবার জন্ম। সত্য কথা—আমি কি আর কব। "আমি সুখ দুঃখ তব, পদধূলি বলে, মাথায় তুলিয়া লব।"

জীবনপথে যাত্রা এক দীর্ঘ অভিসার। এই অভিসার যিনি প্রেমময়ী হইয়া

দেখাইয়াছেন তিনি ত পথভোলা পথিককে জীবনপথ দেখাইবার জন্যই এই আচরণ করিয়াছেন। দ্বাপর যুগে যেমন এই অভিসার আবার ত্রেতাযুগের আচরণ জীবনের প্রবলতম দুঃখ অতিক্রম করিবার জন্যই। আহা! তোমা-ছাড়া হইয়াছি, সেই নয়নাভিরাম মনোভিরাম প্রেমের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কামের প্রাকৃত মূর্ত্তি নিরন্তর ব্যথা দিতেছে, প্রেমের মনঃপ্রাণরসায়ন মধুর বাক্যের পরিবর্ত্তে নিরন্তর কামের কর্ণজ্বালাকর ইন্দ্রিয়ের বিলাসের কথা শুনিতেছি—এই সমস্ত সহ্য করিবার—এই সমস্ত অগ্রাহ্য করিবার একমাত্র উপায় তোমার নাম করা। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া নিরন্তর তোমার নাম করিতেছি আর বলিতেছি উদ্ধার কর, উদ্ধার কর! কবে তোমার দয়া হইবে, কবে তুমি আসিবে উদ্ধার করিতে? জীবনপরিশ্রান্ত পান্থ—এই ভাবে সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া নাম কর, দেখিবে সেও তোমার জন্য বড় ব্যাকুল সেও তোমার উদ্ধারের জন্য দূত পাঠাইতেছে। শ্রদ্ধা কর, বিশ্বাস কর, প্রতিদিনের দুঃখে আকাঙ্ক্ষা তীব্র কর, সে আসিবেই, সে আসিতেছে, সে দূত পাঠাইতেছে। তুমি ততদিন সব অগ্রাহ্য করিয়া নিরন্তর "শোয়ন্ত আঁচাওত" নাম করিতে থাক। ইহা বলিও না জীবন ত শেষ হইয়া গেল, কৈ আসিল? এখনও যে আসিল না—তাতে তারে দোষ দিও না—সে তোমার পাপ ধৌত করিয়া দিয়া তবে আসিবে, নতুবা পাবার মতন করিয়া তুমি তারে পাইবে না। যদি তোমার জীবনের অবসানই হয়, তোমার নাম করা কিন্তু বৃথা হইবে না জানিও। সেই বলিতেছে "মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ" মরণে—প্রাণপ্রয়াণকালে তুমি আমাকে স্মরণ করিতে পারিবে, আমি আসিয়া তোমাকে আমার নাম শুনাইয়া আমার লোকে তোমাকে লইয়া যাইব। হারাইও না এই বিশ্বাস। সে কখন দুই কথা বলে না। সে যাহা বলে তাহাই করে। ধৈর্য্য অবলম্বন কর—করিয়া নাম করিতে করিতে, কাতর হইয়া, উদ্ধার কর বলিয়া, স্মরণ করিতে করিতে নাম করিয়া যাও। হতাশ হও কেন? এইটা যে পাপের চিহ্ন। সে আছে, সে আসে, সে উদ্ধার করে, সে এখনও নিকটে, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া, ছাই রাই মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া উপস্থিতে তার নাম লইয়া আছ কিনা তাই দেখ আর কিছুই ভাবিও না শুধু তারে স্মরিতে স্মরিতে—উদ্ধার কর উদ্ধার কর বলিতে বলিতে কর্ত্তব্য করিয়া যাও—তাহাকে ডাকা কখন বিফল হয় না জানিও। আবার যদি সত্যযুগ দেখ, সেখানকার অভিনয় একেবারে অসি ধরিয়া, রণতাণ্ডবে মগ্ন হইয়া তোমার শত্রু নাশ করা। হাসিতে হাসিতে অভয় দেওয়া—আমি তোমার আছি—যখন বিপদ হইবে

তখনই আমায় স্মরণ করিও, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে নিরাপদ করিয়া দিব।

বলিতেছিলাম সেই গানের কথা। সব শুনিতে পাই নাই। যতটুকু শুনিলাম তাহাতেই প্রাণ অমৃতময় হইয়া উঠিল। শুনিলাম—

আমি কি আর কব॥

আমি সুখ দুঃখ তব পদধূলি বলে

মাথায় তুলিয়া লব॥

আমি তোমার প্রেমমূরতি হৃদয়ে লয়ে

নীরবে যাব॥ ইত্যাদি

সত্যই তোমার প্রেমমূরতি হৃদয়ে লয়ে নীরবে যাইতে হইবে। তোমার প্রেমমূরতি কি দেখিয়াছি? মিথ্যা সংশয়, দেখিয়াছ বৈ কি!

এই যে তোমার সম্মুখে তোমার উপাস্য মূরতি—এ মূর্ত্তি যে তারই। হউক না পটের ছবি, হউক না ট্যাড়া ব্যাঁকা মূর্ত্তি। তার মূর্ত্তি কে আঁকিতে পারে? তেমন করিয়া ভরিত করিয়া আঁকিবার সামর্থ্য কার আছে? সে কৃপা না করিলে তার মূর্ত্তি কি তেমটি হইবে? না হউক—যেমন মূর্ত্তি পাওনা কেন—এযে তারই মূর্ত্তির আভাস। ঋষিগণ তাঁর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন—তিনি দেখা দিয়াছিলেন বলিয়া। তাই তাঁরা ধ্যানে তাঁর মূর্ত্তি ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তোমার উপকারের জন্য—তোমার সুবিধার জন্য। পটে ছবিটিই তোমার প্রয়োজনের বস্তু নহে। এ ছবি যাঁকে স্মরণ করাইয়া দেয় তাহাতেই তোমার প্রয়োজন।

নাম করিবার পূর্ব্বে ত ধ্যান করিতে হয়। প্রতিদিন সম্মুখে এই মূর্ত্তি ধরিয়া ধ্যান কর—এই ধ্যান বাহিরে হইবে। শেষে চক্ষু বুঝিয়া নাম কর—ধ্যান আসিবে ভিতরে। আবার সৎসঙ্গে সৎশাস্ত্রে সে জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইবে হৃদয়ে। মানসে এই শ্যামল মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে এই প্রেমের মূর্ত্তি নিরন্তর দেখিতে দেখিতে দেখিবে ইহাও জীবন্ত হইয়া আসিয়াছে। যাহা কিছু কর এই শ্যামল মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া কর। যখন অভিসারে যাইবে তখন বলিতে পারিবে "আমি তোমার প্রেম মূরতি হৃদয়ে লইয়া নীরবে যাব, আমি কি আর কব, আমি সুখ দুঃখ তব পদধূলি বলে মাথায় তুলিয়া লব।"

—০—

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ]

(পূর্বানুবৃত্তি)

এইরূপে ন্যায়বার্তিককার অতি আড়ম্বরের সহিত অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্তিককার প্রদর্শিত এই অনুমানগুলি সমস্ত বৈশেষিকাচার্য ও ন্যায়াচার্যগণের উপজীব্য। ব্যোমশিবাচার্য উদয়নাচার্য প্রভৃতি বৈশেষিক আচার্যগণ ঈশ্বরে যে নানাবিধ অনুমান প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন এবং ন্যায়াচার্য বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ঈশ্বরসাধক বহুবিধ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সমস্তের উপজীব্য এই বার্তিককারের গ্রন্থ। ন্যায়সূত্রে কেবলমাত্র "তৎকারিতত্বাৎ" বলা হইয়াছিল। ইহার অর্থ ঈশ্বরকারিতত্বাৎ। ইহার দ্বারা ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা সূত্রকার কর্তৃক সূচিত হইয়াছে। আর তাহাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের "ন তাবদস্য বুদ্ধিং বিনা কশ্চিদ্ধর্মো লিঙ্গভূতঃ শক্য উপপাদয়িতুম্" এই উক্তির দ্বারা ঈষৎ বিকশিত হইয়াছে এবং বার্তিককারের প্রদর্শিত উক্তিসমূহ দ্বারা তাহা প্রবর্ধিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র, ব্যোমশিবাচার্য, উদয়নাচার্য প্রভৃতি ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণ এই বার্তিকোক্তি অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব-প্রতিভা অনুসারে ঈশ্বরসাধক অনুমান প্রমাণসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আচার্য উদয়ন 'কুসুমাঞ্জলি'-গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকে আত্মতত্ত্ব বিবেকের অনুপলব্ধিবাদে, প্রশস্তপাদভাষ্যের সৃষ্টিসংহার প্রক্রিয়ার বিবরণে ও ন্যায়সূত্রের ৪।১।২১ সূত্রের তাৎপর্যটীকার পরিশুদ্ধিতে অতিবিস্তৃতভাবে ঈশ্বরানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। উদয়নাচার্যের মত ঈশ্বরানুমানের অতি বিস্তৃতি আর কোন আচার্যই প্রদর্শন করেন নাই। যদিও তত্ত্বচিন্তামণিগ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায় ঈশ্বরানুমানচিন্তামণিতে ঈশ্বরানুমান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উদয়নবিরচিত কুসুমাঞ্জলির পঞ্চমস্তবকের প্রথম কারিকায় প্রদর্শিত প্রথম হেতুটির বিবৃতিমাত্র। আচার্য উদয়ন এই কারিকাতে "কার্য্যায়োজন ধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ। বাক্যাৎ সংখ্যা বিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্ববিদব্যয়ঃ॥" বলিয়াছেন। এই কারিকাতে আচার্য যথাক্রমে (১) কার্য্য (২) আয়োজন (৩) ধৃতি (৪) সংহার (৫) পদ (৬) প্রত্যয় (৭) শ্রুতি (৮) বাক্য ও (৯) সাংখ্যাবিশেষ এই নয়টি হেতু দ্বারা ঈশ্বরের অনুমিতিরূপ সিদ্ধি প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় মন্ত্রে ঈশ্বরের

জগৎস্রষ্টৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব বলা হইয়াছে; ষষ্ঠমন্ত্রের ঈশ্বরের সংহর্তৃত্ব ও জগৎস্রষ্টৃত্ব বলা হইয়াছে। দশমমন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তানুসারে জগৎস্রষ্টৃত্ব ও পরামাণুকারণবাদ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং কুসুমাঞ্জলি উদ্ধৃত কারিকায় "আয়োজন" নামক দ্বিতীয় হেতুটিও প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের বিভুত্ব প্রভৃতি ধর্ম যাহা সমস্ত দার্শনিকগণ স্বীকার করেন তাহা বলা হইয়াছে। এইমন্ত্রে ঈশ্বরের বেদপ্রণেতৃত্ব যাহা বৈশেষিকাচার্যগণ "বুদ্ধিপূর্বা বাক্যাকৃতির্বেদে" এই কণাদসূত্রে ও "মন্ত্রায়ুর্বেদ প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্ত প্রামাণ্যাৎ" এই অক্ষপদসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং জীবাত্মাতে অধিষ্ঠিত ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠান ঈশ্বর যাহা ন্যায়বৈশেষিকগণ স্বীকার করিয়াছেন তাহাও বলা হইয়াছে। একাদশমন্ত্রে ঈশ্বরকে সমস্ত ভুবনের ধারয়িতা বলায় কুসুমাঞ্জলি কারিকার তৃতীয় হেতু ধৃতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। দ্বাদশমন্ত্রে "ব্রহ্মাধ্যাতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্" এই বাক্যদ্বারা ধৃতিনামক হেতুটি সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ যে দৃষ্টি লইয়া ঈশ্বরের অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার প্রায় সমস্তগুলিই আমাদের উদ্ধৃত এই কয়টি ঋক্‌মন্ত্রের মধ্যেই আছে। ঈশ্বরপ্রতিপাদক সমস্ত ঋক্‌মন্ত্রগুলি একত্র সংকলিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমস্ত বৈদিক দার্শনিকগণ ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সমস্তই বেদমন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন—"স দাধার পৃথিবীমুতেমাম্" (ঋক্ সং ৮।৭।৩) আর "ইন্দ্রো দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাম্" (মৈ: সং ৪।১৪।৭)

ঈশ্বরে সুখসত্তা

মহামতি জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরিতে প্রমাণ প্রকরণে ঈশ্বর নিরূপণ প্রসঙ্গে বহু আলোচনা করিয়াছেন, আমরা ন্যায়সূত্র, ভাষ্য, বার্ত্তিকাদিগ্রন্থ হইতে যাহা প্রদর্শন করিয়াছি, জয়ন্তভট্ট প্রায় তাহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বার্ত্তিককার প্রভৃতি ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান এবং নিত্য ইচ্ছা স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের নিত্য সুখ বা আনন্দ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু জয়ন্তভট্ট ঈশ্বরের নিত্য আনন্দ স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন—"কিন্তু ত্রৈলোক্য নির্মাণ নিপুণঃ পরমেশ্বরঃ। স দেবঃ পরমো জ্ঞাতা নিত্যানন্দঃ কৃপান্বিতঃ॥ (ন্যায়মঞ্জরী ১৭৫পৃঃ প্রমাণ প্রকরণ) আবার তিনি বলিয়াছেন "অবাপ্ত সর্ব্বানন্দস্য রাগাদি রহিতাত্মনঃ।" (১৭৬ পৃঃ প্রমাণ প্রকরণ) জয়ন্তভট্টের এই সমস্ত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় তিনি ঈশ্বরের নিত্য আনন্দ স্বীকার করিতেন। জয়ন্তভট্ট

ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো, বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈ র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ। (ন্যা, ম, ১৮৩ পৃঃ) এই ঋক্‌মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই বাক্‌মন্ত্রটি আমাদের উদ্ধৃত মন্ত্রের মধ্যে দশম মন্ত্র। যদিও এই মন্ত্রটি নারায়ণ উপনিষদেও আম্নাত হইয়াছে।* (নারায়ণ উপনিষৎ ৩য় খণ্ড)। তথাপি এই মন্ত্রটি যে ঋক্-সংহিতায় আম্নাত হইয়াছে তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখাইয়াছি। উপনিষদে যে সমস্ত মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বহু মন্ত্রই সংহিতায়ও আম্নাত হইয়াছে। উপনিষদে মন্ত্রটি দেখিয়াই অজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে ইহা সংহিতায় আম্নাত মন্ত্র নহে এবং মাত্র উপনিষদেই আম্নাত হইয়াছে বলিয়া সেই বাক্যটিকে মন্ত্র বলিতেও ভীত হয়। এই ভয় যে অত্যন্ত অমূলক তাহা আমরা এই প্রবন্ধের উপোদ্‌ঘাত প্রকরণে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছি।

—০—

(ক্রমশঃ)

ভক্তির আকর্ষণ

[শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী, এম্-এ, ডি-লিট্]

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে জয়লাভ করিয়া পাণ্ডবেরা অর্দ্ধ রাজ্যের পরিবর্তে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন। কিন্তু ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি নাই। বহু জ্ঞাতি ও আত্মীয়কে বধ করিয়া তবেই জয়লাভ করিতে হইয়াছে। চারিদিকে বীরগণের বিধবা পত্নীদের মর্মভেদী আর্তনাদে তাঁহার মনে আর বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। নিহত বন্ধুবান্ধবের স্মৃতি তুষানলের মত তাঁহার হৃদয়ে ধিকিধিকি করিয়া জ্বলিতেছে। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে কত তত্ত্বকথা শুনাইলেন,—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু তাঁহার মন কিছুতেই আর ধৈর্য্য মানে না। এই সময়ে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের মহিমা বাড়াইবার জন্য যে অপূর্ব্ব একটি লীলা করিলেন, তাহারই সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা বলিব।

মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সমবয়সী ও সখা। তিনি যখন হস্তিনাপুরে অবস্থান করিতেন তখন প্রায়শঃ অর্জুনের গৃহেই থাকিতেন। যুধিষ্ঠিরের নিয়ম

*এই কথা ন্যায়মঞ্জরীর সম্পাদক পণ্ডিত সূর্য্যনারায়ণ শুক্ল বলিয়াছেন। কিন্তু সম্পাদকের ঋক্‌মন্ত্র সম্বন্ধে পরিজ্ঞান না থাকায় এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা ঋক্‌মন্ত্র, তাহা স্থাননির্দেশপূর্ব্বক প্রথমেই বলিয়াছি।

ছিল তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া শৌচাদি সমাপনান্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিতেন ও তাঁহার কুশল প্রশ্নের পর তাঁহার সহিত রাজকার্য-পরিচালনা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন। সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আসিতে দেখিলে স্বয়ং আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতেন। যদিও লৌকিক সম্পর্কে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মাতুলপুত্র ও বয়ঃকনিষ্ঠ, তথাপি পরমজ্ঞানী ধর্মরাজ জানিতেন যে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" তাই তিনি প্রতিদিনই সকালে বাসুদেব-জ্ঞানে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেন এবং ভক্তের আনন্দ বর্ধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণও উহা গ্রহণ করিতেন। বিশুদ্ধ ভক্তির স্বভাবই এই যে উহা লোকাচার বা বিধিনিষেধের অপেক্ষা রাখে না। আর ভগবান্ ত গীতায় স্বমুখেই বলিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্,"—"যে আমারে যৈছে ভজে আমি তাহারে তৈছে ভজি।"

একদিন প্রভাতে যুধিষ্ঠির যথারীতি কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন, কিন্তু সে দিন শ্রীকৃষ্ণ আর অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন না। তিনি স্বীয় পর্যঙ্কোপরি বসিয়া রহিলেন। বিস্মিত যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে তিনি ধ্যানস্থ মুনির ন্যায় নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যুধিষ্ঠির ত শ্রীকৃষ্ণকে নিত্যই দেখেন, নিত্যই নয়ন পুরিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপসুধা পান করেন, কিন্তু আজ যেন শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য যথার্থই অপূর্ব! নীল মেঘ সদৃশ কান্তি-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের আজ নানা অলংকার শোভিত-বক্ষঃস্থলের কৌস্তুভ মণির প্রভায় ও পরিহিত পীত কৌষেয় বসনের ঔজ্জ্বল্যে সমগ্র দেহ এক অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত। মনে হইতেছে যেন উদয়াচলের উপর প্রভাত-তপনের প্রথম কিরণ সম্পাত হইয়াছে। যে রূপে ত্রিভুবন আপ্যায়িত হয়, যাঁহার প্রভায় সকলের প্রভা ("যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি") সকল শোভার আস্পদ সেই কমনীয় রূপ দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠির কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর ধীরপদক্ষেপে আরও নিকটবর্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভাই! রাত্রিতে তোমার সুনিদ্রা হইয়াছে ত? তোমার শরীর ও মন ত বেশ সুস্থ আছে? আমাদের রাজ্যসম্পদ যাহা কিছু, তাহা ত সব তোমারই দয়ায়।" শ্রীকৃষ্ণ কোন উত্তর দিলেন না, তিনি পূর্ববৎ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন।

যুধিষ্ঠিরের বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, বায়ুহীন-স্থলে দীপশিখা যেমন অচঞ্চলভাবে জ্বলিতে থাকে, অথবা পাষাণ যেরূপ নিশ্চল—শ্রীকৃষ্ণ ঠিক্ সেই ভাবেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে স্পন্দন মাত্র নাই, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও অনুভূত হয় না, কিন্তু সদা প্রসন্ন মুখমণ্ডল যেন এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রসের আস্বাদনে অনুপম ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। সুধী ধর্মরাজ বুঝিতে পারিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ যোগিজনবাঞ্ছিত তুরীয় (অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত অবস্থা) ধ্যানপথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। তখন তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সত্যই ত শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু তিনি আবার কাহার ধ্যান করিতেছেন? সকলেত তাঁহারই ধ্যান করে, তাঁহার উপাসনা করে। তাঁহার উপাস্য আবার কে!

পুনরায় কৃতাঞ্জলিপুটে যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দেব! আজ একি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি। সমগ্র প্রাণবায়ুকে নিগৃহীত করিয়া ও সমুদয় ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করতঃ তুমি আজ ধ্যানপথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছ। এই অপূর্ব ভাব পূর্বেত কখনও দেখি নাই। যদি বল লোক শিক্ষার জন্য তোমার এই ধ্যানপথ অবলম্বন, তাহাও ত সঙ্গত হয় না। কারণ তুমি যখন ধ্যানস্থ হও তখন ত এখানে কেহই ছিল না!

"যদি শ্রোতুমিহার্হামি ন রহস্যং চ তে যদি।
ছিন্ধি মে সংশয়ং দেব প্রপন্নায়াভিযাচতে॥"

(মঃ ভাঃ, শান্তি। ৪৬-৭)।

অর্থাৎ হে দেব! যদি ইহা তোমার গোপনীয় না হয়, এবং আমি যদি ইহা শুনিবার উপযুক্ত পাত্র হই, তবে আমার এই প্রার্থনা,—যে আমি তোমার শরণাগত, আমার এই সংশয় ছেদ কর। ভাগবতে বলা হইয়াছে—"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবঃ গুহ্যমপ্যুত" অর্থাৎ শিষ্য যদি ভক্তিমান্ হয় তবে গুরু গুহ্য বা গোপনীয় বিষয়ের উপদেশও তাহাকে করেন।

যুধিষ্ঠিরের এই প্রপত্তি ও পরিপ্রশ্নে তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ! গুহ্য হইলেও এই রহস্য আমি আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি। আপনিই ইহা শুনিবার যোগ্য পাত্র। আমি ধ্যানস্থ হইয়াছিলাম এ কথা সত্য; কিন্তু আমি কোন দেবতার ধ্যান করিতেছিলাম না। কারণ আপনি ত জানেন যে ত্রিভুবনে আমার সমান কেহ নাই, সুতরাং আমা হইতে বড় যে কেহ নাই ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। আমি যে সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিতকর্ম ও গৃহস্থের করণীয় যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করি, তাহা যথার্থই লোক শিক্ষার জন্য। কারণ, আমি যদি উহা না করি, তবে অন্যেরা উহা হয়ত করিবে না এবং তাহা দ্বারা তাহাদের অমঙ্গল ঘটিবে। দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও সাধুগণ আমাকে

'মঙ্গলায়তন' বলেন। সুতরাং আমা দ্বারা অমঙ্গল কোন কিছু হইতে পারে না। যাহা হউক, এই মাত্র আপনি যে আমাকে ধ্যানস্থ অবস্থায় দেখিলেন, প্রকৃতপক্ষে ঐ অবস্থা আমার স্বেচ্ছাকৃত নহে।" শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির একেবারে হতবাক্ হইয়া গেলেন। এ কী গভীর রহস্য! যিনি অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে যুগপৎ ক্ষর ও অক্ষর, কর্তা এবং অকর্তা; অনাদিনিধন আদ্যপুরুষ, তিনিই স্বমুখে বলিতেছেন যে এই ধ্যানস্থ অবস্থা তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নহে, আবার একথাও ত সত্য যে তাঁহার চেয়ে বড় কেহ নাই,—তবে কাহার ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া তিনি ধ্যানপথে আরূঢ় হইলেন? কে সে শক্তিমান্ ব্যক্তি?

যুধিষ্ঠিরের ব্যাকুলতা দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "মহারাজ! আপনি সংশয় ত্যাগ করুন। এখন যাহা বলিতেছি তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করুন। পুরুষ-শার্দূল ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইয়া দেহত্যাগের জন্য উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতেছেন—তিনি আমার একান্ত ভক্ত। তিনি নিয়তই আমার চরণ স্মরণ করেন। আজ প্রত্যূষে তিনি অত্যন্ত আকুলতার সহিত আমার ধ্যান করিতেছিলেন। তাঁহার ভক্তির প্রভাবে আমিও এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে স্বাভাবিকভাবে আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং আমিও তদ্‌গত-চিত্ত হইয়াছিলাম। ধার্মিকপ্রবর! যেখানে আমি সাক্ষাৎভাবে ভক্তকে দেখা দিই না, সেখানে এই ভাবেই প্রাণে প্রাণে ভক্তের সহিত আমার মিলন হইয়া থাকে। এই মিলনের অনুভূতি স্নিগ্ধ আনন্দ-রসের নির্ঝর, চমৎকারিতায় ইহা প্রত্যক্ষ-দর্শন অপেক্ষাও সমধিক। ইহা ভক্তের অতি প্রিয় বস্তু। মহারাজ! আপনি জানিবেন যে আমার আরাম বা বিশ্রামের স্থান শেষ-শয্যাও নহে, বৈকুণ্ঠও নহে, ভক্তের হৃদয়ই আরাম পরমপ্রিয় বিশ্রামের স্থান। আমি সর্বেশ্বর বটি, কিন্তু আমি প্রেমের কাঙাল। অর্জুনকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে আমি ত পূর্বেই বলিয়াছি যে, "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্"। যাঁহারা আমাকে ভক্তির দ্বারা ভজন করে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না। সংসারী লোকে স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে ভালবাসে সত্য। কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে স্বার্থের গন্ধ আছে. তাই তাহাতে ক্লান্তি আসে, তাহার বিকৃতি ঘটে। কিন্তু আমাকে যাহারা ভালবাসে তাঁহারা নিত্য নিত্য নব নব রসের আস্বাদন পায়। পুরাণপুরুষ হইলেও আমি চির নবীন। তাই আমাকে ভালবাসিলে জীবের কখনও অবসাদ আসে না। অমৃতের আস্বাদনে চিত্ত আপ্লুত হইয়া যায়।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত-কার বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—"ভক্তে বাড়াইতে মোর প্রভু ভাল জানে। পাঁচ মুখে করে প্রভু ভক্তের বাখানে॥" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তপ্রবর ভীষ্মের ক্ষাত্রবীর্য, সত্যনিষ্ঠা, প্রতিজ্ঞা-পালন, সর্বশাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে আরও বলিলেন,—

"তস্মিন্ হি পুরুষ-ব্যাঘ্রে কর্মভিঃ স্বৈর্দিবং গতে।
ভবিষ্যতি মহী পার্থ! নষ্টচন্দ্রেব শর্বরী॥"

হে মহারাজ, সেই পুরুষব্যাঘ্র স্বীয় কর্মপ্রভাবে দেহত্যাগ করতঃ স্বর্গে গমন করিলে এই পৃথিবী চন্দ্রহীন রাত্রির ন্যায় প্রতিভাত হইবে। অর্থাৎ সর্ব-জ্ঞানের আধার ভীষ্মের তিরোভাবের পর পৃথিবী অজ্ঞান তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইবে। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ। তিনি বশিষ্ঠদেবের প্রিয় শিষ্য, দেবধুনী গঙ্গার পুত্র, বীরশ্রেষ্ঠ ভৃগুরামের অস্ত্রশিষ্য, স্বয়ং বসুগণের অংশসম্ভূত। জগতের সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাঁহার আয়ত্ত। মহারাজ! এই শুভ অবসরের সুযোগ গ্রহণ করুন। আপনি যান, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া এইবেলা তাঁহাকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ; নিখিল রাজধর্ম, আশ্রমধর্ম, সদাচার, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও অপরাপর যাহা কিছু আপনার জিজ্ঞাস্য,—তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করুন। ভীষ্মের অবদানের দ্বারা জগতের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ জয় অপেক্ষা উহার দ্বারাই আপনার শাশ্বতী কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাইতেছি। আপনার সহিত আমিও ভীষ্মের মুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিব।

অতঃপর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা ও সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণ রথারোহণে শরশয্যায়-শায়িত কুরুপিতামহ ভীষ্মের নিকট গমন করিলেন এবং সেই স্থানে ভীষ্মের দেহত্যাগকাল পর্য্যন্ত দিনের পর দিন ধরিয়া যে সকল প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হইল মহাভারতের শান্তিপর্বের প্রতিপত্রে স্বর্ণাক্ষরে তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শান্তিপর্ব অক্ষয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। একদিকে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত গীতা, বনপর্বের মার্কণ্ডেয়-সমস্যা, বন্দী-অষ্টাবক্র সংবাদ প্রভৃতি কয়েকটি প্রসঙ্গ, উদ্যোগপর্বের সনৎ সুজাত সংবাদ ও অপরদিকে ভীষ্মপ্রোক্ত শান্তিপর্বের নানা বিষয়—ইহা লইয়াই মহাভারতের মহত্ত্ব ও ভারবত্তা—মহাভারতত্ব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে স্বয়ং গুরুরূপে উপদেশ দিয়া অর্জুনের মোহ দূর করিয়াছিলেন। যদিচ শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠিরকেও তিনি বহু উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু চরম উপদেশের পাত্র নির্ব্বাচন করিলেন মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত ভীষ্মকে। ইহা তাঁহার ভক্তবৎসলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি চাহিয়াছিলেন,

ভবিষ্য জগৎ ভীষ্মকে যেন একজন অদ্বিতীয় ধনুর্ধর ও কঠোর সত্যনিষ্ঠ পুরুষমাত্র বলিয়া না জানে, ভীষ্ম যে একজন অসাধারণ জ্ঞানী ও মহাভক্ত এ কথাও তাঁহারা জানুক, তবেই ভীষ্ম চরিত্রের মহত্ত্ব তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে। ভীষ্মের অনন্যসুলভা একান্তভক্তির আকর্ষণই তাঁহাকে এই কার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। ভগবান্ বড়ই দুর্লভ সন্দেহ নাই, কিন্তু ভক্তের নিকট তিনি অতি সুলভ। ভক্ত যদি ভক্তিভরে তাঁহাকে জল-তুলসী মাত্র অর্পণ করে তাহাতেই তিনি পরমপ্রীতিলাভ করেন। ভক্তের নিকট তিনি আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন না। 'বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যঃ ভক্তবৎসলঃ।'

সন্তবাণী

৯১৮। যেমন মাতা যত্ন করে আপনার গর্ভকে রক্ষা করে—যাতে কোন আঘাত না লাগে, ঐ-রূপ ভক্তিকেও যত্ন করে লুকিয়ে রাখা কর্ত্তব্য।

৯১৯। যে মানব পাপের দ্বারা কুটুম্বের ভরণপোষণ করে তাকে মহাঘোর অন্ধতামিস্র নামক নরকে যেতে হয়। সেই নরক ভোগের পর সে আরও নীচ যোনিতে গিয়ে আপনার কর্মের অনুযায়ী কষ্ট ভোগ করে। ফের যখন পাপের ফল ভোগ ক'রে শুদ্ধ হয় তখন তার মনুষ্য যোনি মিলে।

৯২০। শরীরের দ্বারা কৃতদোষ সমূহ হতে মানবের স্থাবর (বৃক্ষআদি) যোনি লাভ হয়। বাক্যের দ্বারা কৃতকর্মের দোষে পশুপক্ষী যোনি মিলে, মনের দ্বারা দোষে চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয়।

৯২১। পিতার ঋণ পরিশোধকারী তো পুত্র আদিও হয়ে থাকে, কিন্তু ভববন্ধন মোচনকারী তো আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই।

৯২২। যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন ক'রে তাহা ভাল কাজে লাগাতে শিখে নাই তার মন্দ দশা হয়ে থাকে। এর চেয়ে ধন না হওয়াই উত্তম, কারণ ব্যর্থ চিন্তা তো হয়না!

৯২৩। ক্রোধ হলেও চুপ করে থাকা বড় উত্তম, ও মহত্ত্বের লক্ষণ। মৌনতে সমস্ত শক্তি ভরা।

৯২৪। যা কিছু মিলে তাতেই সন্তোষ করা আর অপরের সঙ্গে বিদ্বেষ না করা এই শান্তিকোষাগারের চাবী।

৯২৫। দুর্ব্বলমস্তিষ্ক মনুষ্যই সঙ্কট সকলে ব্যাকুল হয়ে তার বশতাপন্ন

হয়ে যায়, মনোবলসম্পন্ন পুরুষ তো সমস্ত সঙ্কটকে পায়ের তলায় চেপে তার উপর আরোহী হয়ে যায়।

৯২৬। সত্যের উপর অবস্থান করলে যে আনন্দলাভ হয় তার তুলনা অন্য কোন প্রকার আনন্দের সহিত করা যায় না।

৯২৭। যে মানুষ সর্বদা চিন্তায় ডুবে থাকে, নিরন্তর ভয়ভীত হয়ে অবস্থান করে, মনকে সদা ক্রোধপূর্ণ রাখে সে সততই অর্দ্ধেক রোগী হয়ে থাকে। চিন্তায় যে ডুবে থাকে তার অন্ন উত্তমরূপে পরিপাক হয় না।

৯২৮। হৃদয়ের সরলতা ও নির্মলতাই ঈশ্বরীয় জ্যোতি, এই জ্যোতিই ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়।

৯২৯। অধিক জনসমূহে থাকার রুচিই বন্ধনকারী রজ্জু, পুণ্যাত্মা ব্যক্তি এই রজ্জুকে ছিন্ন করে একান্তে তপস্যা করেন। পাপী ব্যক্তি এই দড়িতে দিন দিন দৃঢ়তার সহিত বন্দী হয়ে যায়।

৯৩০। ভগবান সংসারের আশ্রয়স্থল, জগতের বন্ধু, তিনি সকলের প্রাণ রক্ষক, সকল প্রকারে প্রেমময়। এই কারণে তিনি সকলে অভেদ ভাব রাখেন আর সকলকে রক্ষা করেন। তাঁর স্নেহ সকলের উপর সমান একথা জ্ঞানী জানেন, এর দ্বারা তিনি তাঁহার সহিত প্রেম রাখেন, মূর্খ এ রহস্য জানে না, এই হেতু তাঁর সঙ্গে দ্বেষ করে।

৯৩১। প্রসন্নতা, আত্মানুভব, পরমশান্তি, তৃপ্তি, আনন্দ আর পরমাত্মায় স্থিতি এসকল বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের ধর্ম, এর দ্বারা মুমুক্ষু পুরুষ নিত্যানন্দ-রস প্রাপ্ত হয়।

৯৩২। চন্দনের বৃক্ষ যখন উৎপন্ন হয় তখনই সে আপনার আশপাশে সুগন্ধ বিস্তৃত করে না, যখন তাকে কাটা হয় তখন সে চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করে। এইরূপ সঙ্কটে মানুষের গুণগণের বিকাশ হয়।

৯৩৩। চিত্তকে পবিত্র করা যেমন কল্যাণকারক সাধন, তার মত আর কিছু নাই, কেননা চিত্তই চিন্তামণির ন্যায় সকল পদার্থকে উৎপন্ন করে।

৯৩৪। যার বিচার আর চিন্তা পবিত্র তার দ্বারা অপবিত্র কর্ম হতেই পারে না। তার দ্বারা তো বিশুদ্ধ কর্মই হয়ে থাকে।

৯৩৫। যে পর্য্যন্ত তোমরা ব্রহ্মচারিগণের সহিত কায়িক বাচিক মানসিক মিত্রতা রাখ্‌বে, ভিক্ষান্ন সমান ভাবে বণ্টন করে ভোজন করবে, সৎধর্মের রক্ষা করবে আর সৎধর্মের উপরই দৃষ্টি রাখ্‌বে ততক্ষণ তোমাদের পুণ্য ক্ষয় হবে না।

৯৩৬। ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখ্‌বে, জিভকে বশে রাখ্‌বে, সৎকার্য্যে দৃঢ়

সংকল্প থাক্‌বে এবং ভগবানের ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট থাক্‌বে—যদি তা তোমার প্রতিকূলই হয় ইহাই প্রকৃত শূরতা।

৯৩৭। দয়া, নম্রতা, দীনতা, ক্ষমাশীলতা, সন্তোষ, এই ছয়টি ধারণ করে যে, ভগবান্‌কে স্মরণ করে সে।

৯৩৮। শরীর জমী, মানুষ কৃষক, পাপপুণ্য দুই বীজ—যেমন বীজ বপন করা যাবে তেমনিই ফল হবে।

৯৩৯। ঈশ্বরের আশ্রিত মনুষ্য সকলের বিচার ধারা সর্বদা ঈশ্বরের দিকেই প্রবাহিত হয়, ঈশ্বরেই তার স্থিতি হয় আর ঈশ্বরের প্রীতির জন্যই তার সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

৯৪০। যেরূপ রাত্রি তারাগণকে প্রকাশ করে তদ্রূপ সঙ্কটই মনুষ্যকে প্রকাশ করে।

৯৪১। আমরা যদি আপনার শত্রুগণের মনের গুপ্ত ইতিহাস্ পড়ি তাহলে আমাদের প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে ঈদৃশ দুঃখ ও শোক মিল্‌বে যে, আমাদের মনে তার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র শত্রুভাব থাকবে না।

৯৪২। ধন, বৈভব, কুটম্ব, বিদ্যাদানরূপ বল এবং কর্ম আদির গর্ব্বে অন্ধ হয়ে দুষ্টগণ ভগবান্ আর ভগবানের ভক্ত মহাত্মাগণকে তিরস্কার করে।

৯৪৩। যেমন পথিক রাস্তা চল্‌বার সময় পথে কোন এক জায়গায় মিলিত হয়, আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর স্ব স্ব পথে চলে যায়, এরূপ আমাদের সাংসারিক সম্বন্ধ, প্রথমে প্রারব্ধ দুজন লোক একত্র মিলিত হয়, পুনঃ প্রারব্ধ বশে দুজনে পৃথক হয়ে যায়। যে মানব সাংসারিক-সম্বন্ধ সকলের এই মিথ্যা-রূপকে উত্তমরূপেও বুঝে লয় তাকে কোন দুঃখ ক্লিষ্ট করতে পারে না।

৯৪৪। সম্পূর্ণ ভূত পরমাত্মা হতে উৎপন্ন হয় অতএব এ সমস্ত ব্রহ্মই এরূপ নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য।

৯৪৫। প্রেম প্রেম করে সকলে চেঁচায় কিন্তু প্রেমকে কেউ চিন্‌তে পারে না, যখন আটপ্রহর তাঁতে লীন হয়ে থাকা যায়, তখন প্রেম বোঝা যায়।

৯৪৬। কবিগণ সন্তমণ্ডলীর হৃদয়কে নবনীতের ন্যায় বলেছেন। কিন্তু তাঁরা ভুল করেছেন, কেননা ননী তাপ পেলে আপনি গলে যায় কিন্তু সন্ততো অপরের দুঃখে দ্রবীভূত হন।

৯৪৭। রাত্রির প্রথম প্রহরে সকলে জাগে, দ্বিতীয় প্রহরে ভোগী জাগে, তৃতীয় প্রহরে চোর জাগে, আর চতুর্থ প্রহরে যোগী জাগেন।

৯৪৮। পণ্ডিত তো তিনিই যাঁর প্রেমচক্ষু খুলে গেছে; যিনি জ্ঞান এবং

প্রেমের আবেশে পশু বনস্পতি এবং পাষাণ পর্য্যন্ত সকল পদার্থে আপনার ঠাকুরকে দেখেন এবং পুজা করেন।

৯৪৯। লোক ভাল অথবা মন্দ বলুক তাদের কথার উপর ধ্যান দিবার প্রয়োজন নাই (ধ্যান দেওয়া উচিত নয়) সংসারের যশ এবং নিন্দাকে কোন মনোযোগ না করে ঈশ্বরের পথে চলা কর্ত্তব্য।

৯৫০। যেমন লবণ আর কর্পূর একই রংএর কিন্তু আস্বাদ স্বতন্ত্র হয়, এ প্রকার মনুষ্যগণের মধ্যেও পাপী এবং পুণ্যাত্মা হয়ে থাকে।

৯৫১। সংসারে এরূপই থাকো যেমন মুখে জিব্ থাকে, জিব যতই ঘি খাক্ পরন্তু চিকন্ হয় না।

৯৫২। যিনি দুঃখীগণের উপর দয়া করেন, ধর্মে মন রাখেন, ঘর থেকে বৈরাগ্যবান্ হন এবং অপর লোকেদের দুঃখ আপনার দুঃখের মত জানেন তাঁর অবিনাশী ভগবান্ মিলে।

৯৫৩। যিনি যুদ্ধে লক্ষ লোককে জয় করেছেন তিনি আসল বিজয়ী নন বাস্তবিক বিজয়ী তো তিনিই যিনি আপনি আপনাকে জয় করেছেন—(বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে জয় করেছেন)।

৯৫৪। মনুষ্যগণের দ্বারা যত ব্যবহার হয় সব ব্রহ্মের সত্তাতে হয় কিন্তু অজ্ঞানবশে সে একথা জানে না, বাস্তবিক ঘড়া আদি মৃন্ময় দ্রব্য মাটীই তো, কিন্তু আমি ঘড়াকে মাটী হতে ভিন্ন বুঝ্ছি। এইতো অজ্ঞান।

৯৫৫। যার জাগবার প্রয়োজন সে এখনি জেগে যাও, এই জাগবার অবসর, যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ন করবে তখন কি জাগবে!

৯৫৬। যে মানুষ আপনার স্থিতির উপর উত্তমরূপে বিচার করে না, পুরুষার্থের দিকে ধ্যান দেয় না, সে মৃত্যুর অনিবার্য্য চক্র থেকে কখনও বাঁচে না।

৯৫৭। যদি আপনার ভিতর এবং বাহিরে প্রকাশ চাও তাহলে জিভ্রূপ দরজার চৌকাঠের নিচের কাঠে রাম নামরূপ মণিময় দীপ রেখে দাও। অর্থাৎ জিভের দ্বারা রাম নাম জপ্তে থাক্লে বাইরে এবং ভিতরে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। (ভিতরে বাইরে জ্যোতিও দেখা যায়)।

৯৫৮। অলসের পক্ষে বন্ধুর ঘর দূর, কিন্তু যে দাস সে তাঁর সুমুখে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে।

৯৫৯। যাঁর আচরণে বৈরাগ্য অবতরণ করেছে তিনি প্রকৃত বৈরাগী। কথার বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য নয়।

৯৬০। ভগবানের সাকাররূপও সত্য নিরাকারও সত্য, তোমার যা ভাল-

লাগে তাতে বিশ্বাস করে তুমি তাঁকে ডাকো, তাহলে তুমি সেই এককেই পাবে। মিছ্রীর ডেলা যে কোন প্রকারে খাও তা মিষ্ট লাগবেই।

৯৬১। সেই বিশ্বাসকে নিয়ে এস যে বিশ্বাস ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং নামদেবে এসেছিল, এই প্রকার বিশ্বাসের দ্বারা সম্পূর্ণ শঙ্কা সন্দেহ ও ঝগড়া দূর হয়ে যায়।

৯৬২। কামাতুর মানুষই কাঙ্গাল, যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট তিনি যথার্থ ধনী। ইন্দ্রিয়গণই মনুষ্যত্বের শত্রু। বিষয়সমূহের অনুরাগই বন্ধন। সংসারই মানুষের চির রোগ। সংসার থেকে নির্লিপ্ত থাকাই এর একমাত্র ঔষধ।

৯৬৩। যেমন স্ত্রী বাপের বাড়ী থাকে কিন্তু তার ধ্যান স্বামীতে লেগে থাকে, এই প্রকার ভক্ত জগতে থাকেন পরন্তু তিনি কখনও তাঁকে ভুলেন না।

প্রেমগাথা

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

তুই লেখ!

লিখ্‌বো, কিন্তু ভেবে ভেবে লিখ্‌তে পারবো না। তুমি ভাব ভাষা, লেখবার শক্তি সব দিয়ে লিখিয়ে নাও।

আর কি কামনা আছে দেখ দেখি!

আমার আর কিছু দেখবার প্রয়োজন নাই, কারণ যখন তোমায় না দেখে মৌন ত্যাগ কর্‌বো না স্থির নিশ্চয় তখন অন্য বাইরের শুভ কামনা থাকা না থাকা সমান কথা।

কি ভাবছিস্?

আমি বেশ স্পষ্ট শুন্‌ছি জয়গুরু জয়গুরু, আমার কল্পনা নয়, আমি ধ্যানস্থ নই, আমি বসে বসে লিখ্‌ছি আর শুন্‌ছি গুয়গুরু জয়গুরু, এবং মেঘের ধ্বনি।

আচ্ছা, ঐ শব্দ কি?

ঐ শব্দ তুমি, তুমিই শব্দব্রহ্মনাদ-রূপে লীলা কর্‌ছো।

ঐ শব্দ শুন্‌ছে কে?

তুমিই শুন্‌ছো, এগানের শ্রোতা ও গায়ক—দুইই তুমি।

তুই কে?

তা আমি জানিনা, আমি তোমার দাস।

শ্রোতা ও সঙ্গীতের কোনখানে তুই আছিস্ ?

ঐ জ্যোতিবিন্দু লাস্যময়ী মাতার নৃত্য !

আমায় ভোলাসনে, সঙ্গীত, গায়ক ও শ্রোতা তিনই যদি আমি তবে তুই কে ?

শুধু সঙ্গীত গায়ক শ্রোতা তুমি নও, ঐ হলুদে জ্যোতি তুমি অকার ঐ কৃষ্ণ-জ্যোতি তুমি, উকার ঐ শ্বেত জ্যোতি তুমি, মকার ঐ উজ্জ্বল বিন্দুও তুমি।

ঐ বিন্দু বা জ্যোতির দ্রষ্টা কে ?

তুমি।

সবই আমি, তুই কে ?

আমি তোমার দাস।

জড় না চেতন ?

চিৎ—তোমার অংশ।

কি ভাবছিস্ ?

ওই স্পষ্ট স্পষ্ট জয়গুরু জয়গুরু শুনছি।

তুই কোথায় আছিস ?

শাস্ত্র দৃষ্টে বলছি আমি হৃদয়ে প্রাণারূঢ় হয়ে আছি।

আমি কোথায় আছি ?

তুমি স্থূল সূক্ষ্ম দেহ আত্মা ব্যেপে আছ।

আমি ভিন্ন তোর স্বাতন্ত্র্য কিছু আছে ?

না।

স্বাতন্ত্র্য যদি না থাকে তাহ'লে কে কাকে দেখ্‌বে।

তোমার ওসব বিচারের কথা আমি শুনতে চাই না, আমি সীতারাম-দাস আমার এই চোখে তোমায় দেখ্‌বো।

দিব্য দেহ কি স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় ? দিব্য দেহ দেখ্‌তে হ'লে দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন।

আমার দিব্য দৃষ্টিতে কোন দরকার নেই। যেমন তোমার এই বিশ্বরূপ বিরাট্‌রূপ দেখ্‌ছি, এমনিভাবে তুমি এসে দেখা দিবে, কথা কবে।

এও কখন সম্ভব হয় !

কত সাধু দেখেছেন।

যদি বলি সাধুরা মিথ্যা কথা বলেছেন ?

সাধুদের মিথ্যা কথা বলে লাভ ?

লোকের কাছে সম্মান।

তাঁরা সম্মানের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। হাজার হাজার সাধু তোমায় দেখে উচ্চকণ্ঠে বলে গেছেন তোমায় এই চোখে দেখা যায়। তা ছাড়া আমি তো তোমায় দেখেছি।

তুই ছেলেমানুষ ছিলি, হয়তো স্বপন দেখেছিলি।

জেগে মানুষ কখনও স্বপ্ন দেখে! আমার সব স্পষ্ট মনে রয়েছে। তারপর তো সূক্ষ্ম রূপ ধরে তুমি বলেছিলে আমি তোকে ছেলেবেলায় দেখা দিয়েছিলাম, তুই তখন চিন্‌তে পারিস্‌নি, আমি আবার এসেছি। বল, এ তোমার কথা নয়?

যদি বলি তোর মাথার গোলমাল হয়েছিল?

আর কোন কিছুতে গোলমাল হ'লোনা, মাত্র দেখাতে গোলমাল হোল! যে পাগল হবে তার সবই পাগলামী-ভরা থাক্‌বে।

তুই তো পাগল! লোকে সংসারে কত সুখভোগ আনন্দ কর্‌ছে, আর তুই আজীবন আলেয়ার পিছু পিছু ছুটছিস্।

আলেয়ার পিছু পিছু ছুটছি! শাস্ত্র-সাধু-অনুভব যে সত্যকে স্থির নিশ্চয় করে দিয়েছেন, তা কখন আলেয়া হতে পারে না। তুমি আলেয়া নও, শ্রীভগবান! তুমি একান্তভক্তকে দেখা দাও। হাঁ "অস্য মহাপুরুষস্য কশ্চিৎ কশ্চিৎ ঈশ্বর সাক্ষাৎকারো ভবতি" শ্রুতিতে একথা তুমি বলোনি?

তুই বিশ্বাস করিস্ মানুষ স্থূল চোখে আমায় দেখতে পায়?

শত বার সহস্রবার কোটীবার বিশ্বাস করি।

[৪।৩।'৫৮]

রঘুনাথের সাধনা

[শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায়]

সর্বচিত্তাকর্ষী শ্রীকৃষ্ণের চৌম্বক আকর্ষণে দুর্জরগেহশৃঙ্খল ছিন্ন করে' নীলাচলে এসেছেন রঘুনাথ। আশ্রয় পেয়েছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চরণকমলছায়ায়।

সস্নেহে চৈতন্যদেব রঘুকে সমর্পণ করেছেন অভিন্নহৃদয় স্বরূপের হাতে। তাঁকে বলেছেন "পুত্ররূপে ভৃত্যরূপে আজ থেকে এ তোমার আপন।"

পরম আদরে রঘুকে বারংবার আলিঙ্গন দিয়েছেন স্বরূপ। সকল মন প্রাণ দিয়ে রঘু অনুভব করেছেন তাঁর পরম গুরু ও ইষ্টের সান্নিধ্য। অগাধ তৃপ্তিতে

একটি কথাই কেবল আবৃত্তি করেছেন রঘুনাথ—সে কথা হ'ল 'মধুরং মধুরং মধুরম্'।

বিপুল সম্পদের সহজ উত্তরাধিকার, মাতাপিতার একমাত্র পুত্রসুলভ অপরিমিত বাৎসল্য, অপুত্রক জ্যেষ্ঠতাতের অবারিত স্নেহ, সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর অচলা প্রীতি, অগণিত পরিচারকের সশ্রদ্ধ সেবার মমতা রঘু নিঃশেষে ত্যাগ করে' এসেছেন। অলক্ষ্যে থেকে যিনি তাঁকে কোটিজনের আকাঙ্ক্ষিত ভোগ সুখ থেকে সবলে বিমুখ ও বিরত করেছেন, রঘু নিঃসংশয়ে তাঁরই কাছে আত্ম-নিবেদনের জন্য আত্মপ্রস্তুতিতে রত হলেন।

নিয়ত নিশ্চিন্ত পর্যাপ্ত ও সুখদ আহার ও ইচ্ছামত নির্জন সুখশয্যায় বিশ্রামের আর কোন সাধ নেই তাঁর। রঘু তাই মন দিয়েছেন যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টি-ব্রত পালনে।

নিষ্কিঞ্চন ভক্তেরা জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ইষ্টনাম জপ করেন। দেবসেবকেরা সেবাশেষে রাত্রে ঘরে ফেরবার সময় দয়া করে' তাঁদের ভিক্ষা দেন। পুরীতে এই প্রথা। সারাদিন জপের শেষে পুষ্পাঞ্জলির পর রঘুও সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়ান—যা জোটে, তাতেই দিনপাত করেন।

সতত স্নিগ্ধ রঘু সকলেরই প্রিয়। তাঁর এই দারুণ কৃচ্ছ্রে ব্যথিত হয়ে চৈতন্য-সেবক স্নেহপ্রবণ গোবিন্দ প্রভুর কাছে আর্তি জানান।

রঘুর আচারে তুষ্ট হয়ে প্রভু বলেন "বৈরাগীর তো এই আচার, গোবিন্দ। পরাপেক্ষা যে করে, কৃষ্ণ তাকে উপেক্ষাই করেন:

বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসংকীর্ত্তন।
শাক পত্র ফল মূলে উদরভরণ॥

মহাপ্রভুর সমর্থনে কৃতার্থ রঘু সুখসাচ্ছন্দ্য বিমুখ হয়ে সর্বদা নামসংকীর্ত্তন করেন। শ্রীচৈতন্যের উপদেশে তাঁর 'দ্বিতীয় কলেবর' স্বরূপের কাছে সাধ্যসাধন তত্ত্বের উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ করেন।

শান্তি ও লাবণ্যের প্রলেপস্নিগ্ধ দিনগুলি সহজেই চলে যায়।

গ্রীষ্ম শেষে নরেন্দ্র সরোবরের দীর্ঘ পথ ব্যেপে একদিন দেখা দেয় বিরাট লোকঘটা। অগণিত মানুষের বিরামহীন চাঞ্চল্য। সকলের দেহমনে জেগেছে যেন জ্যোৎস্নাপুলকিত সাগরের তরঙ্গউদ্বেলতা। কীর্ত্তন-ধ্বনিতে মুখরিত নীলাচলের আকাশ বাতাস। গৌড়ভক্তেরা আজ এসেছেন নীলাচলে।

সারা বৎসর ধরে' সুদূর বাংলার নিজ নিজ গ্রামে থেকে তাঁরা প্রতীক্ষা করেন যাত্রাশেষের এই শুভদিনটির, উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করেন হৃদয়দেবতার চরণকমলস্পর্শের গৌরবঘন এই ক্ষণটির। সমগ্র বর্ষের তাঁদের এই পুঞ্জীভূত

আকাঙ্ক্ষা ও উদ্বেগ, শান্ত হবার পূর্বে, মিলনক্ষণের এই স্পন্দনে ও কীর্ত্তনে ফুলঝুরির স্ফুলিঙ্গবৈচিত্র্যের মত শতধারায় উৎসারিত হয়ে যায়। বিস্ময়কর সে আনন্দোচ্ছ্বাস, হৃদয় মন্থনকারী সে কৃষ্ণমঙ্গল সংকীর্ত্তন।

এই মিলনোৎসব দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে উড়িষ্যারাজের সভাপণ্ডিত সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্যের অন্তরের আনন্দ বিকশিত হয়েছিল তদ্দণ্ডে রচিত যে সুন্দর শ্লোকে, রঘুর বারবার তা স্মরণে আসে:

আনন্দহুঙ্কার গম্ভীরঘোষো হর্ষানিলোচ্ছ্বাসিত তাণ্ডবোর্ম্মিঃ।
লাবণ্যবাহী হরিভক্তিসিন্ধুশ্চলঃ স্থিরং সিন্ধুমধঃ করোতি ॥

রঘুকে নীলাচলে দেখে, প্রবীণ অদ্বৈতের অপার আনন্দ ও অসীম স্নেহ মুখর হ'ল সহস্র আশীষ বচনে।

রঘুর জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্য ও পিতা গোবর্দ্ধন আচার্যের বিশেষ স্নেহপাত্র। তাদের সংগৃহীত বিষয়বৈভবের মণিদীপটিকে আগলে বসে' না থেকে, তাদের বংশধর যে আজ পরম সম্পদের অনির্বাণ জ্যোতির সন্ধানে ছুটে এসেছে নীলাচলে চৈতন্যচরণপ্রান্তে! তাদের অশেষ কল্যাণ সম্ভাবনার অগাধ তৃপ্তিতে বাৎসল্যঘন আলিঙ্গনে বৃদ্ধ আচার্য বারংবার রঘুকে অনুগৃহীত করলেন।

নীলাচলে এখন নিত্য উৎসবের পালা। প্রতিটি ক্ষণ যেন আনন্দের মধুক্ষরণে স্নিগ্ধ মধুর। চৈতন্যগণের ইষ্টগোষ্ঠীতে, ভজনকীর্ত্তনে, সমবেত ভোজনে একটি দিব্য অধিষ্ঠানের পবিত্র প্রভাব সব কিছুকেই শুচিতা ও শান্ত আনন্দের দ্যুতিতে মণ্ডিত করেছে, উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে।

অদ্বৈতের নেতৃত্বে প্রথমবার বিরাট দল গঠন করে গৌড়ভক্তেরা যখন নীলাচলে আসেন, তখন তাঁদের শিক্ষা ও আনন্দের জন্য মহাপ্রভু কতকগুলি সেবা ও নর্ম উৎসবের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। প্রতি বৎসরের মত এবারও সেই সবগুলি একে একে যথারীতি পালিত হ'ল, পরিপূর্ণ উৎসাহে ও উল্লাসে।

রথযাত্রার কয়েকদিন আগে হ'ল মন্দির মার্জন সেবা উৎসব। প্রতি ভক্তের জন্য এল একটি করে মার্জনী ও মাটীর কলসী। সবায়ের অগ্রণী হয়ে চৈতন্যদেব এলেন গুণ্ডিচা মন্দিরে। ঝাঁট দিয়ে ধূলা, বালি, কাঁকর ভক্তেরা নিজেরাই বয়ে ফেলে এলেন পথের ধারে। সরোবর থেকে সারি দিয়ে মন্দিরের ভিতর পর্য্যন্ত ভক্তেরা দাঁড়িয়েছেন। একের হাত থেকে অপরের হাতে চলেছে জলভরা কলস। মন্দিরের ভিতর বাহির, জগমোহন ও অঙ্গন, প্রাচীর ও প্রাঙ্গণ সযত্নে শোধিত হ'ল। এককর্মের উল্লাসে সকলের মন হ'ল জলের মত দ্রব ও কোমল।

পরস্পরের প্রতি, সর্বাধিক গুরুদেবের প্রতি প্রেম যেন উছলে উঠল কৃষ্ণনামের মঙ্গলধ্বনিতে।

চৈতন্যদেব এবার নিজের পরিধেয় বসন দিয়ে শ্রদ্ধায় ও যত্নে মুছলেন দেব-সিংহাসন ও মন্দিরের ভিত্তি – কবিরাজের ভাষায় :

নির্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥

এই মন্দির মার্জনা রঘুর মনে জাগালে একটি বিশেষ তাৎপর্য, গভীর একটি ইঙ্গিত। দণ্ড কয়েকের আনন্দ উৎসব তাঁর কাছে দেখা দিলে একটি সতত কর্ত্তব্যের প্রতীকরূপে। মন্দির তো কেবল বাহিরে নয়—ইঁট, কাঠ, পাথরের একটি সুবলিত, সুগঠিত স্থাপত্য নিদর্শনই তার একমাত্র রূপ নয়? অপ্রচ্যুত স্বরূপে আছেন যিনি সর্বদেহীর মনের মণিকোঠায়, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃদ যিনি সকল প্রাণীর, তাঁর চিন্ময় মন্দির মার্জনের নিত্য দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় কেমন করে? সেই দায়িত্বই কি দিলেন গুরু আজকার এই সেবা লীলায়? এ সেবার তো কালাকাল নেই, না আছে স্থানাস্থান, নাই কোন বহিরঙ্গ আয়োজনের অনাবশ্যক অপেক্ষা। প্রতি মুহূর্তের এই সেবার দায়িত্বে সেই মানুষেরই কেবল অধিকার, যিনি সদাজাগ্রত, নিত্যপ্রস্তুত।

এই অভিনব দীক্ষার মাহেন্দ্রক্ষণটিকে অন্তরের আরতি দিয়ে রঘু বার বার প্রণাম জানালেন চৈতন্যদেবের উদ্দেশে।

স্নান উপলক্ষ্যে জলক্রীড়ায় সপার্ষদ চৈতন্যদেবের কৈশোরসুলভ চঞ্চলতা ও চাপল্যে ও বনভোজনের অশেষ রঙ্গে জীবনের একটি অননুভূত আনন্দময় রূপের আস্বাদ পেলেন রঘু। সকল কর্ম ও নর্ম, সেবা ও বিরামের মধ্যে রঘু দেখলেন অপরূপ ও শোভন সঙ্গতি। জীবনের ছোট, বড় সব কিছুই একটি অনবদ্য সহজ সামঞ্জস্যে বিধৃত। সব চেয়ে বেশী অভিভূত হলেন রঘু অপূর্ব এই গুরুরূপী জীবনশিল্পীর সর্বব্যাপারে—মাধুর্যময় অনুপ্রেরণা, চিরপ্রসন্ন অধিষ্ঠান।

* * * *

বর্ষা-শেষে গৌড়ভক্তেরা নিজ নিজ গ্রামে নগরে ফিরে গেছেন। নীলাচলে চৈতন্যপার্ষদ-দলে নিত্য আচার পালিত হচ্ছে পরম নিষ্ঠায়। সপ্রেম স্মরণে, আনন্দস্নিগ্ধ দর্শনে, প্রণামনম্র সেবায় ও রসোচ্ছল নামগানে দিন চলে, বাধাহীন প্রবাহে ছন্দময়ী কবিতার মত। বড় ভাল লাগে রঘুর এখানকার উপকরণ নিরপেক্ষ শান্ত অথচ অশ্লথ এই জীবনধারা। গতি তার ঋজু, বলিষ্ঠ, স্থির অনুপ্রেরণার তেজে দীপ্ত।

ভাবসমন্বিত সাধনায় এখানকার ভক্তেরা

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥,

যেমন বলেছেন বাসুদেব শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়।

রঘুর আনন্দ নিরন্তর সজ্জন সঙ্গে চিত্তের এই পরম অনুকূল পরিবেশে। প্রতিমার জ্যোতিশ্ছটার মতো এর প্রকাশ-সহায় হয়েছে যেন নীলাচলের নিসর্গ শোভা। নীলাঙ্গ সমুদ্রের দিগন্ত বিস্তার, আলো-ঝরা আকাশের উদার প্রসার, চারিদিকে অসংখ্য বাগানে ও পথপাশে অগণিত তরুলতার তরুণ শ্যাম সমারোহ —মন ভরে যায় রঘুর সকল দেওয়া-নেওয়া চাওয়া-পাওয়ার শেষের বিষাদলেশহীন অগাধ তৃপ্তিতে।

সব চেয়ে বড় বিস্ময় রঘুর এই চৈতন্য-ভক্তমণ্ডলী। এহেন সমাবেশ কোন মহাকবিরও অলোকসামান্য কল্পনার অতীত বলে তাঁর মনে হয়। একটি অলৌকিক প্রভাব যেন অসামান্য পাণ্ডিত্য, অগাধ রসবোধ ও অপার ঈশ্বরপ্রেমের আনন্দঘন প্রকাশলীলায় নানা মূর্ত্তিতে অপরূপ সৌষ্ঠবে বিকশিত হয়েছে এই ভক্তগণের দেহে মনে। এই মহাজনগোষ্ঠীর দেহের রূপ ও লাবণ্য ও মনের মাধুর্য ও সৌন্দর্য তাঁর মনে জাগায় অশেষ শ্রদ্ধা। বিরাটের এই মেলায় নিজের অকিঞ্চনতায় আপনাকে তিনি হারিয়ে ফেলেন, ভুলে যান। অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ, স্বরূপ ও রামানন্দ, সার্বভৌম ও গদাধর, পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বক্রেশ্বর ও হরিদাস—সকলের অকৃত্রিম স্নেহ নবীন লতায় জলদবর্ষণের মতো তাঁরি 'পরে অজস্র ধারায় প্রবাহিত। রঘুর একান্ত আস্পৃহা এই মহৎ-কৃপার মর্যাদা রক্ষণে, এই অহেতুকী স্নেহের পাত্রতা অর্জনে। অবিচল অধ্যবসায়ে রঘু সেজন্য আপন কর্ত্তব্যে নিত্য অবহিত—সংশিতব্রত।

বর্ষান্তরে গ্রীষ্মের শেষে আবার এসেছেন গৌড়ের ভক্তদল। প্রথম মিলন পর্ব সমাধা হ'তে দুজন লোক সঙ্গে নিয়ে শিবানন্দ এলেন রঘুর কাছে; বল্লেন: এই দেখ তোমার বাবার কাণ্ড! আহা, তোমার উপর প্রাণটি পড়ে আছে তাঁর! গত বছর আমি ফিরে যেতেই লোক পাঠিয়েছেন আমার কাছে; নীলাচলে তোমায় আমি দেখেছি কিনা তাই সন্ধান করতে। আমি সব কথা বল্লুম লোকটিকে—তোমার চৈতন্যভক্তি, সুতীব্র বৈরাগ্য, অশনবসনে অনাসক্তি। সে লোকের মুখে তোমার কথা শুনে তোমার বাবা জেঠার কি বেদনা। তুমি সিংহদ্বারে ভিক্ষা কর শুনে নিশ্চয় ভেবেছেন যে অর্থাভাবেই তুমি কষ্ট পাচ্ছ। তাই বহু অর্থ দিয়ে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন এই ব্রাহ্মণটিকে। আর অপর জন

তোমার ভৃত্য—লোকাভাবে তোমার সেবা হয় না, এই তাঁদের ধারণা। বাপের প্রাণ—বাৎসল্যবোধে যা ক'রে তিনি সুখী হন, নিশ্চিন্ত হন সেই ভাল। এই বুঝে আমি এদের দুজনকে সঙ্গে করে এনেছি। এবার তুমি এদের ভার নাও।"

বাপ ও জেঠার উদ্দেশে সভক্তি প্রণাম জানিয়ে রঘু শ্রদ্ধায় স্বীকার করলেন তাঁদের স্নেহের এই দান। কিন্তু বৈরাগী তিনি, অর্থ স্পর্শ করেন কেমন করে? অর্থ নিয়ে ব্রাহ্মণ তাই রয়ে গেলেন। অর্থের সদ্ব্যবহারের জন্য রঘু এক ব্যবস্থা করলেন। চৈতন্যদেবকে প্রতিমাসে দুদিন নিমন্ত্রণের সেবা অধিকার ভিক্ষা করে নিলেন। তিনি সহাস্যে সম্মতি দিলেন। রঘুর নিজের আচারের অবশ্য কোন পরিবর্তন হ'ল না। বারে জগন্নাথ মন্দিরে পুষ্পাঞ্জলি দেখে তিনি সিংহ-দ্বারের পাশে দাঁড়ান।

কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস কভু করেন চর্বণ॥

* * * *

ঋতুপর্যায়ের নিঃশব্দ সঞ্চরণের মধ্য দিয়ে দুটি শরতের উজ্জ্বলতা শীতের হিমে পাণ্ডু হয়ে গিয়েছে। দু'বৎসর পরে রঘুর এই নিমন্ত্রণের নিয়মে ব্যতিক্রম দেখা গেল। চৈতন্যদেব লক্ষ্য করলেন রঘু আর তাঁকে নিমন্ত্রণ করে না। স্বরূপকে একদিন প্রশ্ন করলেন তিনি "রঘুর কি হ'ল বল তো? আর তো সে আমায় নিমন্ত্রণ করে না।"

"অনেক ভেবে এ সেবা ছেড়েছে রঘু," বলেন স্বরূপ; "বিষয়ীর অন্নে আপনার মন আদৌ প্রসন্ন হয় না, অথচ পাছে রঘুর মনে ব্যথা লাগে এই কারণে আপনি তার নিমন্ত্রণ অস্বীকার করেন না। নিমন্ত্রণের অধিকারে অবশ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা হয়, তবে তাতে আত্মাভিমান বাড়ে। রঘু চায় আপনার কৃপা ও প্রসন্নতা, অন্য কোন কামনা তার নেই।"

"ঠিক বুঝেছে রঘু। বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ। তাতে দাতা ভোক্তা দুজনেরই মন মলিন হয়, আর মলিন মনে কৃষ্ণের স্মরণ তো হয় না। আনন্দ পেলাম যে রঘু নিজে এসব বিচার করে' সঙ্কোচ থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছে," বল্লেন চৈতন্যদেব।

রঘুর বিচারণা এইখানেই শেষ হ'ল না। বিষয়ীর অন্নের সংস্পর্শ থেকে মুক্তি পেতে হ'লে সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করাও হয়ত উচিত নয়। রঘু ক্রমে সেখানে দাঁড়ানোও বন্ধ করলেন। দুপুরে ছত্রে গিয়ে যৎসামান্য খেয়ে আসেন। সাধনার জন্য জীবন রক্ষারই তাঁর প্রয়োজন, রসনাতৃপ্তির নয়, এই তাঁর চিন্তা।

নিজেকে ক্রমে ক্রমে সর্বসুখ থেকে যে রঘু বঞ্চিত করছে, চৈতন্যদেবের প্রেমী সেবক গোবিন্দের তা মোটেই মনঃপুত নয়। অদ্ভুত মানুষ এই গোবিন্দ! সারাজীবন সে মহাসন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর আপ্রাণ সেবা করেছে, কোন ক্লেশ স্বীকারে তার সঙ্কোচ নেই, কিন্তু চৈতন্যদেব বা তাঁর অন্তরঙ্গ কারোকে কোন কৃচ্ছ্র করতে দেখলে অন্তরে সে বিষম ব্যথা পায়। তার স্নেহার্দ্র সেবায় এই গোষ্ঠীর সকলে স্বচ্ছন্দে ও আরামে ঈশ্বরভজন করবে, এই তার একমাত্র সাধ। সকলের কষ্ট লাঘবের জন্য গোবিন্দের সতত চেষ্টা, অতন্দ্র লক্ষ্য। প্রথম দর্শন থেকে মৃদু-স্বভাব রঘু তার অত্যন্ত প্রিয়। নানাভাবে সে রঘুকে সাহায্য করবার চেষ্টা করে। রঘুর এই ক্রমিক অনাহার তার উদ্বেগের কারণ; প্রতিকারের আশায় সে শরণ নিলে চৈতন্যদেবের। স্বরূপের সঙ্গে আবার রঘুর কথা নিয়ে আলোচনা হ'ল একদিন। চৈতন্যদেব বল্লেন "সিংহদ্বারে ভিক্ষা করা ছেড়ে ভালই করেছে রঘু—কে দেবে, কে দেবে না, এ দিলে, ও দিলে না, মনের এ টানাটানি থাকতে স্বস্তি কোথায়—আর শান্তি না থাকলে কি সুখে কৃষ্ণ স্মরণ করা যায়?"

চৈতন্যদেব ও স্বরূপের প্রসন্ন প্রশ্রয়ের কনক আভায় বিকশিত হচ্ছে রঘুর হৃদয়কমল। একের পর এক দল মেলছে, আর চিত্তপরিমল বিতরিত হচ্ছে তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে। রঘুর উদ্যমের আর অন্ত নেই। কোন দ্বন্দ্ব নেই এই নিরন্তর প্রয়াসে, নেই বাইরের আকর্ষণের কোন বাধা। তবু নিম্নগ জলধারার মতো সহজ প্রবাহে চলে না তাঁর স্মরণ মনন। কেন? তা বোঝেন না রঘু, পরকে বোঝাতেও পারেন না। কোন দ্বিধা, কোন সংশয় নেই তাঁর, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বস্তির তৃপ্তি থেকে তিনি যেন বঞ্চিত।

সেদিন ভোরবেলা স্নান সেরে রঘু দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় এল গোবিন্দ। বল্লে "চল, প্রভু ডেকেছেন তোমায়।" রঘু এলেন চৈতন্যকুটীরে।

রঘু প্রণাম করে দাঁড়িয়ে দেখেন চৈতন্যদেবের হাতে দুটি বৃন্দাবনের সম্পত্তি—গোবর্দ্ধন শিলা আর গুঞ্জমালা।

এই শিলাকে চৈতন্যদেব বলতেন 'কৃষ্ণ-কলেবর,' আর বারংবার কখনও বুকে কখনও চোখে স্পর্শ করাতেন। মালাটি নিজের গলায় দোলাতেন কৃষ্ণনাম স্মরণ সময়ে।

পরম স্নেহে রঘুর দিকে চেয়ে চৈতন্যদেব বল্লেন "এই নাও রঘু এই দুই অপূর্ব বস্তু আমি তোমার জন্য রেখেছি। এ বৃন্দাবনের সম্পত্তি; সেখান থেকে শঙ্করানন্দ সরস্বতী এনে দিয়েছিলেন আমাকে। এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ। তিন বৎসর ধরে আমি এঁর সেবা করেছি—সে সেবার ভার আজ আমি দিলাম

তোমার হাতে। আর বিচিত্র এই মালা। শ্রদ্ধায়, আগ্রহে তুমি এই দুটির ভার নাও, এই আমার ইচ্ছা।"

অতি প্রিয় এই শিলা ও মালার বিরহ সম্ভাবনায় চৈতন্যদেবের চোখদুটি কি ছলছল করে উঠল? রঘুনাথ যে আজ শুচিতায় ও সাধনায় এ বিগ্রহ সেবার অধিকারী হয়েছে, এ আনন্দ তাঁর বিকশিত হ'ল স্নেহমধুর হাসিতে।

অননুভূত আবেগে রোমাঞ্চিত, শিহরিত হ'ল রঘুর সর্বশরীর!

প্রসারিত অঞ্জলি ভ'রে নিলেন রঘু চৈতন্যের দুই প্রিয় সামগ্রী—তাঁর প্রেমের দান। একটি অনির্বচনীয় আবেশে অভিভূত রঘু কৃপা-গৌরবের এই সুন্দর মুহূর্তে ভাবঘন উজ্জ্বলতায় স্পষ্ট দেখলেন যে গুরু তাঁর অন্তর্যামী। মনের গোপন অভাব তাঁর নিজবোধে পরিস্ফুট হবার আগে, অন্তরের প্রার্থনা অনুচ্চারিত থাকতেই, তা পূর্ণ হ'ল তাঁর অযাচিত প্রসাদে। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সম্মিলিত শ্রী ফুটে উঠল রঘুর সুশ্রী মুখে, শরৎ আকাশের নির্মলতায়।

একটি অবলম্বনেরই যে তাঁর অভাব ছিল, সে কথা বুঝলেন রঘু এই শিলা, মালা হাতে পেয়ে। যা কিছু স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, স্পর্শগোচর তাতেই মন তাঁর অভ্যস্ত—আবাল্য তিনি প্রতীকাশ্রয়ী। অথচ, 'মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা করবে,' এই ছিল তাঁর প্রতি চৈতন্যদেবের উপদেশ। এ সেবার প্রকরণ তো তিনি জানেন না। প্রশ্ন করে স্বরূপকে ব্যস্ত করতে লাজুক রঘুর অশেষ কুণ্ঠা। অবলম্বনের অভাব বোধ তাঁর কাছে স্পষ্ট না হলেও, অনাশ্রিত মনের কোণে জমে উঠেছিল একটা অস্বস্তি। একটি বিগ্রহ আশ্রয় করে এখন থেকে যে নিত্য পূজা ও ধ্যান করতে পারবেন এতেই স্বস্তি পেলেন রঘুনাথ।

সুন্দর ও সরল, মনে হ'ল রঘুর, এ পূজার প্রণালী। আড়ম্বরে বিরক্ত, উপকরণে নিস্পৃহ তিনি। চৈতন্যদেব বলেছেন এ সাত্ত্বিক পূজায় উপচার লাগে মাত্র দুটি—জল আর তুলসী মঞ্জরী। অনাবশ্যক আয়োজনের কোন দায় নেই। সেবার আনুষঙ্গিক উপদেশ দিয়ে স্বরূপ নিজে বিগ্রহ স্থাপনার উপকরণ ও একটি জলের কুঁজো রঘুকে উপহার দিলেন। গুরু ও উপদেষ্টার স্নেহাভিষিক্ত রঘু পূজায় ডুবে গেলেন—ভুলে গেলেন বাহিরের জগৎ।

সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
সবে চারি দণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥

সেবার দিব্য আগ্রহে দিন যে কেমন করে বয়ে যায়, রঘু নিজে তা আর জানতে পারেন না। নিয়মিত মধ্যাহ্নে ছত্রে গিয়ে 'মেগে খাওয়া' হয় না তাঁর। বেশীর ভাগ দিন কাটে প্রায় উপবাসে, কখনও সামান্য আহারে। দেহ

রাখবার একটা উপায় যে তাঁর করা দরকার এ চিন্তা জাগে তাঁর মাঝে মাঝে।

একদিন পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়ে রঘু দেখলেন যে অবিক্রীত প্রসাদান্ন প'চে স'ড়ে গেলে, পসারীরা গরুদের খাবার জন্য সেই সব সিংহদ্বারের একপাশে নালার মধ্যে রেখে দেয়। অতি দুর্গন্ধ সে ভাত, জন্তুরাও তা খায় না। কি ভেবে, রঘু একরাত্রে সেই ভাত কুড়িয়ে নিয়ে এলেন। অনেক জল দিয়ে ভাল করে বার বার ধুয়ে সেই ভাতের মাজ্‌ বার করলেন। নুণ মাখা সেই মাজগুলো তাঁর নিতান্ত অখাদ্য মনে হ'ল না। এত সহজে যে নিত্যকার অন্ন সমস্যার সমাধান হবে তা তিনি ভাবেননি। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রঘু পূজা সেবায় মন দিলেন।

সব সময়ে স্বরূপের দৃষ্টি আছে রঘুর উপর—তার সর্বকালের মঙ্গলের বিরাট দায়িত্ব যে দিয়েছেন তাঁকে চৈতন্যদেব। পূজায় মগ্ন রঘু পূর্বের মতো রাত্রে সিংহদ্বারে ভিক্ষা করে না, দুপুরে ছত্রে যান না, তবে সে খায় কি? রঘুকে প্রশ্ন ক'রে অনাবশ্যক সজাগ করতে তাঁর ইচ্ছা করে না—আপনার ভঙ্গীতে ক্রমে ক্রমে সে প্রসারিত, বিকশিত হয়, এই তাঁর অভিপেত।

রাত্রিবেলা স্বরূপ এলেন রঘুর কুটীরে। বমাল সমেত ধরা পড়লেন রঘু। তখন তিনি একটি একটি করে ভাতের মাজ বার করছেন।

"একি, এ কি করছ তুমি?" প্রশ্ন করেন স্বরূপ বিস্মিত হয়ে। কুণ্ঠিত রঘু ধীরে ধীরে তার অন্ন সংগ্রহ রহস্যের বিবরণ দিলেন।

নিরভিমান রঘুর সব কথা শুনে তাঁর ভয় হ'ল যে এ অন্ন আদৌ খাদ্য কিনা। শরীর রক্ষার পরিবর্তে, দেহে পীড়া আনবে না তো? সংশয় নিরসনের জন্য তিনি রঘুর কাছে ভাগ চাইলেন, "দেখি খেয়ে কেমন লাগে?"

রঘু আর কি করেন, সশ্রদ্ধভাবে অগ্রভাগ তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

"সুন্দর", খেয়ে বলেন স্বরূপ, "লুকিয়ে লুকিয়ে নিত্য তুমি এই অমৃত আস্বাদ কর, আর আমাদের তো কিছু ভাগ দাও না। নাঃ—স্বভাব তো তোমার ভাল নয়, রঘু" হাসিমুখে কথা শেষ করে তিনি চলে গেলেন।

তীব্র রঘুর বৈরাগ্য, বলিষ্ঠ তার নিষ্ঠা। চমৎকৃত হয়েছেন স্বরূপ। আনন্দ পেয়েছেন তিনি রঘুর উদ্ভাবনী বুদ্ধিতে। চৈতন্যদেবকে তো এ সব কথা জানাতে হয়। অনাবশ্যক কৃচ্ছ্র তাঁর অভিপ্রেত নয়। একান্ত অনশ্নতের অথবা অতিজাগ্রতের সমাধি সিদ্ধ হয় না। বাসুদেবের মতো তিনিও বলেন:

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

তবে, স্বেচ্ছায় আত্মিক প্রয়োজনে শুদ্ধ বিচারে যে যেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে, তাতে কোনরূপ বাধা দানেও তাঁর অনুমোদন নেই। ব্যাপারটি যাতে সহজে চৈতন্যদেবের কাছে নিবেদিত হয় সেজন্য তিনি ভার দিলেন গোবিন্দকে।

"দেখতে হয় তো রঘুকে", গোবিন্দের কাছে রঘুর ব্যাপার সব শুনে বলেন চৈতন্যদেব।

নিস্তব্ধ রাত্রে নিঃশব্দে তিনি এসে ঢুকলেন রঘুর ঘরে। পিছনে স্বরূপ। আপন মনে রঘু তখন সবে ভাত ধুয়ে জড়ো করছেন। ঈষৎ শব্দে চম্‌কে পিছনে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে চৈতন্যদেব। সুন্দর দুটি চোখে কৈশোর চাপল্য আর মুখে কৌতুকভরা হাসি, বাতাসে উতলা নদীর জলের মতো উচ্ছলিত।

"লুকিয়ে লুকিয়ে কি খাচ্ছ, রঘু, দাও আমাকে।" কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে একগ্রাস তুলে নিয়ে মুখে পুরেছেন। কুণ্ঠায় লজ্জায় রঘু জড়সড় স্তব্ধ।

"এ যে অমৃত খাওয়ালে রঘু", ধীরে ধীরে আস্বাদ নিয়ে বলেন চৈতন্যদেব। "প্রত্যহ কত প্রসাদই তো খাই, এত সুস্বাদু সামগ্রী তো কখনও পাইনি— দেবভোগ্য এ অন্ন।"

অবাক বিস্ময়ে দেখলেন রঘু চৈতন্যদেব তাঁর কোরককোমল হাতখানি ভাতের থালার দিকে আবার প্রসারিত করছেন—অতি ধীরে—যেন কোন আবেশভরে। ত্বরিতে স্বরূপ সে করপদ্মটি ঢেকে নিলেন আপনার দুই অঞ্জলির মধ্যে। স্মিতমুখে চৈতন্যদেবের দিকে চেয়ে মৃদুগুঞ্জনে তিনি বললেন "আর নয়!"

এ কি হ'ল? এ কোন লীলা? কী এর তাৎপর্য! গভীর একটি রহস্যবোধে মুগ্ধ অভিভূত হলেন রঘু। নীরবে তিনি প্রণাম করলেন চৈতন্যদেব ও স্বরূপকে। স্নেহাশীর্বাদে তাঁকে ধন্য কৃতার্থ ক'রে, তাঁরা চলে গেলেন।

অন্নের ছোট থালিটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন রঘু। ঝর ঝর করে ঝরছে জলধারা তাঁর দুচোখ বেয়ে। অজানা আনন্দের শিহরণ জাগছে সর্বাঙ্গে!

তাঁর অন্নে অংশ নিয়ে চৈতন্যদেব সন্তোষের পরম প্রসাদ দিয়ে রঘুর আহারের প্রয়োজন কি চিরকালের মতো পূরণ করলেন? দেহ রক্ষার জন্য কি তাঁকে কোন কিছুই আহরণ করতে হবে না?

ধর্ম্মাচরণের লক্ষ্য ও সার্থকতা

[শ্রীশান্তনু প্রকাশ গুপ]

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥

ভারতের তপোভূমিতে ধর্ম্মজগৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা গিয়াছে—এ কথা বলা অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাপ্রসূত হইলেও ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে এ বিষয়ে ভারত পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে প্রগতিশীল। কিন্তু মুনিঋষিদের বিচিত্র 'উপলব্ধ অপরোক্ষ জ্ঞানরাশি এবং দার্শনিক ও ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতদিগের বিভিন্ন মতবাদের মহাসাগরে সাধারণ মানুষের পক্ষে আসল রত্নটি উদ্ধার করা একান্তই কঠিন। সাধারণ মানুষ স্ত্রীপুত্র পরিবার ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্ম্ম নিয়াই ব্যস্ত থাকে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিবার বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শাস্ত্রালোচনা করিবার অবসর তাহার নাই—এইজন্যই সে তাহার জন্মগত সংস্কার ও বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান সমূহ পালন করিয়া যায়। যাহারা কিছুটা ধর্ম্মপ্রবণ, তাহারা ধর্ম্মসম্মত জীবনযাপনের অঙ্গীভূত সদাচার সম্পন্ন হইয়া সৎপথে চলিতে চলিতে যখন দেখিতে পায় তাহার মত লোকেরাই জাগতিক সুখভোগ হইতে বঞ্চিত, তখনই তাহার মনে জাগে সংশয়। যুক্তির সাহায্যে না হয় বোঝা গেল, পূর্ব্বজন্ম ও পরলোক আছে, ভগবৎ স্মরণ, মনন, নাম জপ ও কীর্ত্তন করিয়া সৎপথে চলা উচিত। কিন্তু ইহলোকেই যদি আর দশজনের মত সুখভোগ না করা গেল, তাহা হইলে ধর্ম্মাচরণের সার্থকতা কোথায়, চরম লক্ষ্যই বা কি ?

হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, দর্শনাদি শাস্ত্রসমূহ মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে এক পরম বিস্ময়। যতই আলোচনা করা যাক না কেন—মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠে একটি মাত্র কথা—ভারতীয় দর্শন তো ইউরোপীয়দিগের দর্শনালোচনার মত অবসর বিনোদনের অবলম্বন মাত্র নয়, ইহা মূর্ত্তিমতী সাধনা—সাধনাতেই উপলব্ধ হইবে ধর্ম্মাচরণের সার্থকতা ও চরম লক্ষ্য। যাহাকে অন্নবস্ত্রের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও নৈরাশ্যই ভোগ করিতে হয়, তাহার নিকট সাধনার কথা বলা নেহাৎব্যঙ্গ ব্যতীত আর কি হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেহ কেহ বা 'ভগবানকে ডাকিলে দুর্দ্দশার হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে' এই আশায় দুর্বল দুরু দুরু চিত্তে সৎপথে চলিয়া ভগবৎস্মরণ, মনন চালাইয়া যায়—কিন্তু দুর্বল ভিত্তি বিশিষ্ট প্রাসাদোপম অট্টালিকার অচিরে ধূলিসাৎ হওয়ার ন্যায় তাহার সঙ্কল্পও শেষ পর্য্যন্ত শিথিল হইতে হইতে ধর্ম্মভাব বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। যাহাদের ধৈর্য্যশক্তি কিছুটা প্রবল,

তাহাদিগকে সাধারণ মানুষের অন্তরের প্রশ্নাবলি যে সকল মহাপুরুষ সাধারণ মানুষের পক্ষে উপলব্ধির উপযোগী করিয়াই আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদিগের শরণাপন্ন হইতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেব হইতে স্নুরু করিয়া বর্ত্তমান সময়ের মহাপুরুষদিগের জ্ঞানভাণ্ডারে স্ব স্ব প্রশ্নোত্তরটি আবিষ্কার করা যায় কি না তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। এই কার্য্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে জীবনধারণের সমস্যা যতই কঠিন হইয়াছে মহাপুরুষ-দিগের অপরোক্ষানুভূত জ্ঞানরাশিও সাধারণ মানুষের পক্ষে ততই সহজবোধ্য হইয়াছে। হিন্দুর প্রাণস্বরূপ বেদের প্রতিমূর্ত্তি, হিন্দুশাস্ত্রের বর্ত্তমান যুগোপযোগী ব্যাখ্যাতা, ঋষিকবি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদের সামঞ্জস্যবিধানকারী ও সপ্তম-দর্শন প্রণববাদের উদ্গাতা ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ধর্ম্মাচরণের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁহার এক ভক্তের প্রশ্নোত্তরে লিখিয়াছেন, "সকল সাধনার চরম লক্ষ্য হইল, একটি শান্ত অবস্থা লাভ।"

সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির মধ্যে আমরা সাংসারিক কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ইত্যাদির প্রতি উদাসীনতা এবং একটা তন্ময়ভাব দেখিতে পাই। বাহ্যিক বিচার করিলে ইঁহাদিগকে নির্লিপ্ত ও শান্তভাবাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইঁহাদিগের অন্তরের অবস্থা কি! একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় ইঁহাদিগের অন্তরে নূতন কিছু আবিষ্কারের প্রেরণায় ও কামনায় কী ভীষণ জ্বালা! যাহারা বিজ্ঞানশাস্ত্র ইত্যাদি কোন উন্নতস্তরের বিষয়ে মগ্ন নহেন, তথা যাহারা সাধারণ মানুষ, তাহাদের অন্তরের অবস্থা কিরূপ—একমাত্র চির অশান্ত আগ্নেয়গিরির সঙ্গেই কি তুলনীয় নহে? পরিবারের অভ্যন্তরে, সমাজে, কর্ম্মক্ষেত্রে—কোন ক্ষেত্রে শান্ত অবস্থা ভোগ করে সে? প্রতি মুহূর্ত্তেই অশান্তির অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে সে ভীতি ও সন্ত্রস্ত। আজ সমাজের সর্ব্ব-স্তরের মানুষেরই অন্তরের অশান্ত অবস্থার কথা একটু চিন্তা করিলেই নৈরাশ্যে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। স্নুতরাং আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য কি? প্রত্যেক চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদীকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে উহা "শান্ত অবস্থা লাভ।" "শান্ত অবস্থা লাভ" সর্ব্বসাধারণেরই কাম্য এবং সাধনজীবনেরই চরম লক্ষ্য না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই শান্ত অবস্থা সমাজস্থ যাঁহারা উন্নততর বিষয়ে মগ্ন তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতাজনিত অশান্তির পরিপেক্ষিতে এবং যাহারা দৈনন্দিন অভাব, অস্বাচ্ছন্দ্য, রোগ, শোক, অনশন, অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ তাহাদের জীবনে কি করিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে? ইহাই মানবজীবনের চিরন্তন সমস্যা।

আপন স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিয়া পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের যতই সুখ ও আনন্দ বিধানের চেষ্টা করা যাক না কেন, পরিণত বয়সে উপলব্ধি হয় একটি প্রাণীকেও সুখ বা আনন্দ দেওয়া গেল না। সারাটা জীবন যেন এক ব্যর্থতার সমষ্টি। জীবনে কি পাইতে চাহিয়াছিলাম—কিসের অভাবে জীবনটা ব্যর্থ মনে হয়? কি লাভ করিলে জীবনটা সার্থক বোধ হইত? আনন্দ! একটু আনন্দের জন্যই কি দিবারাত্র আমরা পরিশ্রম করি না? বন্ধুবান্ধবদের আড্ডা, খেলার মাঠ, সিনেমা, থিয়েটার, সভা-সমিতি, গ্রন্থাগার ইত্যাদিতে কেন পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াই? আসল উদ্দেশ্য কি আনন্দই নহে? যতই ভাবি না কেন—একটুখানি আনন্দ লাভ করিলেই কি জীবনটা সার্থক মনে হয় না? আনন্দ—আনন্দই সার্থকতাবোধের একমাত্র উপাদান। কিন্তু কেমন আনন্দ—ধরুন, সিনেমায় গেলে আনন্দ হয়। হল হইতে বাহিরে আসুন—যে অশান্তির হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়ার উদ্দেশ্যে সিনেমা হলে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাই কি আবার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া বসে না? তাহা হইলে আমাদের আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রগুলিতে অবিমিশ্র স্থায়ী আনন্দ লাভ হয় না—এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে হইবে।

এমন কি কোন আনন্দের উৎস নাই যাহা ইহলৌকিক সুখদুঃখের প্রতি নির্লিপ্ত করিয়া মানুষকে ইহলোকেই আনন্দতরঙ্গে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে? এই অবিমিশ্র স্থায়ী আনন্দ কিসে পাওয়া যায় তাহা আবিষ্কার করিবার জন্যই আমাদের মুনিঋষিগণ যুগযুগান্ত ধরিয়া অপরিসীম কৃচ্ছ্র স্বীকার করিয়া সাধন ভজন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সাধন জগতের এতই উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন যে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বেই বর্ত্তমান কলিযুগে আমরা কি অবস্থায় জীবনযাপন করিব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমাদের জীবনধারণের সমস্যা এতই জটিল হইবে যে আমরা কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক কোন সাধনভজনই করিতে পারিব না—ইহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্যই সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্রতাবর্জ্জিত সহজতম সাধনোপায় যাহা আমাদের জটিলতম সমস্যাজর্জ্জরিত জীবনেও সহজেই অবলম্বনযোগ্য তাহা তাঁহারা অপরোক্ষানুভূত করিয়াছিলেন। তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—এই স্বতঃসিদ্ধ আকর্ষণই মানুষকে উপলব্ধি করায় যে এই চরাচর বিশ্বের মূলভূত কারণ ঈশ্বরই তাহার সবচেয়ে প্রিয়তম আপন জন। এইজন্যই কলি-পীড়িত জীবের প্রতি অশেষ কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহারা সকলে সমস্বরে কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—অবিমিশ্র স্থায়ী আনন্দ লাভের একমাত্র অবলম্বন

প্রিয়তম ঈশ্বরের নাম স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন ও জপ। আমার এই প্রিয়তম শুধু আমার শরণাগতি চাহেন—ধন নয়, মান নয়, সম্পদ নয়—আর কিছুই নয়। সকল মানব সম্প্রদায়ের প্রিয়তমের সেই নাম—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

যতই স্মরণ, মনন, জপ ও কীর্ত্তন করুন, ততই আনন্দ—উত্তরোত্তর আস্বাদনে স্বাদুতরই হইয়া উঠিবে—যতই প্রাণে প্রাণে মহাপ্রাণের সহিত মিলিত হইবেন, মিলন ততই মধুময় হইয়া উঠিবে—রোমাঞ্চ কম্প, অশ্রু, পুলক ও আনন্দে চির পরিবর্ত্তনীয় সুখদুঃখের এই সংসারের প্রতি নির্লিপ্ত হইয়া আপনি আনন্দময় হইয়া যাইবেন - ধর্ম্মাচরণের সার্থকতা মানবজীবনের একান্ত কাম্য যে আনন্দ তাহা উপলব্ধি করিবেন এবং চরমে সর্ব্বস্তরের মানবজীবনের চরম লক্ষ্য শান্ত অবস্থা অবশ্যই লাভ করিবেন। আর—আমার প্রিয়তম ভগবান শ্রীশ্রীসীতারামের ভাষায়, "এই পরম মহামৃত নাম যিনি পান করেন, তাঁর আর ইহলোক, পরলোকের কোন ভাবনা থাকে না; তিনি প্রতিনিয়ত আনন্দসাগরে ভাসতে থাকেন। পূর্ণ চিৎস্বরূপ প্রেমলাভে তিনি জগতে থেকেও জগতে থাকেন না। বিশ্বসংসার তাঁর চৈতন্যময় শ্রীভগবানে পরিণত হয়ে যায়; ভগবান ভিন্ন তাঁর আর কিছু থাকে না।" জয় নাম। জয় নাম। জয় গুরো। জয় গুরো। জয় গুরো।

যদুবংশ ও শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব

[শ্রীঅনিলবরণ কাব্য-পুরাণতীর্থ, এম্-এ]

মহাভারত ও অন্য পুরাণে দেখা যায় সাত্বত বা ভোজবংশকে যদু বংশের শাখা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সাত্বত বা ভোজবংশের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে—ভরত সাত্বতদের যজ্ঞীয় অশ্ব ধরিয়াছিলেন।

দক্ষিণ দেশের নরপতিগণ ভোজ বা সাত্বত বলিয়া কথিত। মধ্যদেশের দক্ষিণে ইঁহাদের অধিকার ছিল। মনু মধ্যদেশের সীমা দিয়াছেন—

হিমবৎ বিন্ধ্যয়োঃ মধ্যং যৎ প্রাক্ বিনশনাৎ অপি।
প্রত্যক্এব প্রয়াগাৎ চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

—(মনু ২।২১)

মধ্যদেশ উশীনর, কুরু, পাঞ্চালদের দেশ। হরিবংশ ও অন্যান্য পুরাণে যদুদের দেশ ইহার দক্ষিণ দেশ বলিয়া কথিত আছে।

যদুদের দুইটী প্রধান শাখা—অন্ধক ও বৃষ্ণি। যদু বিষয়ক দুইটি কাহিনী হরিবংশে দেখা যায়। প্রথম কাহিনীতে বলা হইয়াছে যাদবগণের আদি পুরুষ যদু সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর পুত্র। দ্বিতীয় কাহিনীতে বলা হইয়াছে—যদু চন্দ্রবংশীয় নরপতি যযাতির পুত্র।

যাহা হউক যদু হইতে যাদবদের উৎপত্তি। ইক্ষ্বাকু পুত্র হর্য্যশ্বের পত্নী মধুমতী ছিলেন মধুদৈত্যের কন্যা। হর্য্যশ্ব ছিলেন অযোধ্যার রাজা। কোন কারণে তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে মধুমতীর উপদেশে তাঁহারা মধুদৈত্যের রাজধানী মধুপুরে আশ্রয় লন। হর্য্যশ্ব পরে আনর্ত্ত ও সৌরাষ্ট্র নামে রাজ্য স্থাপন করেন। সেই রাজ্যদ্বয় গোধন পূর্ণ ছিল। মধুমতীর গর্ভে হর্য্যশ্বের এক পুত্র জন্মে, তাহার নাম যদু। এই যদুর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্বত। সত্বত হইতে সাত্বতবংশের উৎপত্তি। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন মধুপুরের দৈত্যরাজ লবণকে হত্যা করিয়া মথুরাপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। শত্রুঘ্নের পর যদুবংশীয় শাখা অন্ধক মথুরায় রাজত্ব করেন।

অন্ধক বংশের দশম পুরুষ আহুক। আহুকের পুত্র উগ্রসেনে ও দেবক। দেবকের চারি পুত্র এবং সাতটী কন্যা। এই কন্যাদের মধ্যে দেবকী অন্যতমা। উগ্রসেনের পুত্র কংস।

ভজমান অন্ধকবংশের অন্যতম। ইহার বংশে শূর জন্মগ্রহণ করেন। শূরের দশ পুত্রের মধ্যে বসুদেব অন্যতম। বসুদেব দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ বাসুদেব।

শূরের বন্ধু কুন্তিভোজ। কুন্তিভোজ অপুত্রক ছিলেন বলিয়া শূরের কন্যা পৃথাকে কন্যারূপে পালন করেন। পৃথার পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন। পাণ্ডুর অপর স্ত্রী মাদ্রীর পুত্র নকুল ও সহদেব।

যদুবংশের অপর নাম আভীর। প্রথম দিকে আভীরগণ সৌরাষ্ট্রের নিকটবর্ত্তী ভূভাগে বাস করিতেন। পরে সৌরাষ্ট্র অধিকার করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন, এবং মথুরা পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করেন।

"পেরিপ্লাস অব দি ঈরিত্রিয়ান সী" নামক গ্রন্থে আভীরদের উল্লেখ আছে। এই বইটী একজন গ্রীক্-ব্যবসায়ী লিখিত প্রাচীন বই। ইহাতে উল্লিখিত আছে যে শক অধ্যুষিত অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী ভূভাগে আভীরদের বাস ছিল। এই অঞ্চলে বহু গবাদি পশু প্রতিপালিত হইত। অধিবাসীরা কর্ম্মঠ এবং কৃষ্ণকায় ছিল। আভীরদের দেশ ছিল আবেরিয়া। ইহা আরিয়াকী

দেশের অন্তর্গত একটী প্রদেশ; ইহার প্রধান বন্দর ছিল সৌরাষ্ট্র।

আলাউদ্দীন খিলজীর আমলে যাদবরাজ রামচন্দ্র দেবগিরিতে রাজত্ব করিতেন।

কৃষ্ণ বাসুদেব এই যাদববংশে উদ্ভূত হইয়া বর্তমান সময়ের প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতের রাজনীতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন অবতার। আজও সমগ্র ভারত ভক্তি ও শ্রদ্ধায় কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া ধন্য এবং পাপমুক্ত হইতেছে। কলিকালে জীবের ত্রাণের একমাত্র উপায় কৃষ্ণনাম জপ।

একদা বাঙ্গালা দেশ কৃষ্ণনামে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছিল। আজ বাঙ্গালী সেই কাহিনী ভুলিতে বসিয়া নিজ অধঃপতন ডাকিয়া আনিতেছে।

—০—

মণিমন্দির

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ]

প্রচারের অভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কত জায়গা অবলুপ্তির পথে এগিয়ে যায় তারই এক উদাহরণ বাঁকুড়ার মণিমন্দির বা একতেশ্বর শিব। রাঢ় গৌড় দেশকে কেন্দ্র করে কত দেব দেউল;—বিদেশের মঠ-মন্দিরের কীর্ত্তি গাঁথার সূত্রে এদেরও গৌরবময় স্থান থাকুক—এই কামনা বাঙ্গালীর প্রাণে জাগাবার জন্যে এই সামান্য তীর্থ-পরিচয়ের প্রচেষ্টা।

বাঁকুড়া সহরের উল্টোদিকে দ্বারকেশ্বর নদীর পাড়ে এই মণিমন্দির গাম্ভীর্য-পূর্ণ এক শান্ত পরিবেশের মধ্যে বিরাজিত। স্থানটির দূরত্ব ষ্টেশন থেকে প্রায় দু মাইল। গরমের সময় সহরের উষ্ণতা বেশ অনুভূত হলেও এখানকার মনোরম দৃশ্য তথা স্নিগ্ধ আবহাওয়া পথশ্রান্তি দূর করে দেয়।

মন্দিরের পাশেই গড়ে উঠেছে পুরোহিতদের বাড়ী। অনেকগুলি ফুল ফল ও মিষ্টান্ন বিক্রেতাদের দোকান মন্দিরে যাবার পথে রয়েছে, দেখে মনে হয় যাত্রী সমাবেশ নিতান্ত কম হয় না। শুনলাম প্রত্যেক দিনই কিছু কিছু যাত্রী হয় তবে তিথি বিশেষে বেশ ভীড় হয়। এখানকার গাজনমেলা প্রসিদ্ধ, তারকেশ্বরের মত এখানেও চৈত্র সংক্রান্তিতে বড় মেলা হয়।

এক অনাদি লিঙ্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এই তীর্থস্থান। এই শিব

ঠাকুরটি এখানে একতেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। একতেশ্বর শিবের আত্মপ্রকাশ ও নামের তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে যে, মুসলমান রাজত্বের শেষ দিকে বাংলার অনেক ভূস্বামী 'রাজা' উপাধি নিয়ে অনেকটা স্বাধীনভাবে বিশেষ প্রতিপত্তির সঙ্গে রাজত্ব করতেন। আত্মকলহ টেনে আনে এদের ধ্বংশ। সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছেন, মানমর্যাদার আমিত্বে ধ্বংশ করে ফেলেছেন একটা বংশ কেন এক মহান জাতির ভবিষ্যৎকে। ছাতনার রাজা ও বিষ্ণুপুরের রাজার মধ্যে এই রকম এক মনান্তরের ফলে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠে। মদগর্ব্বে এগিয়ে চললেন তাঁরা। দুজনেরই সৈন্য দ্বারকেশ্বরের তীরে জমায়েৎ করা হচ্ছে। এই সমাবেশের কাজ শেষ করতে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল, তাই প্রত্যুষের অপেক্ষা। অন্ধকার রক্ত ক্ষয়ের সময়টা একটু পেছিয়ে দিল।

ঘোরা-যামিনীর বুক চিরে দিকে দিকে মশাল জ্বলছে। আসন্ন সংগ্রামের প্রস্তুতি চলছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন মন কতদূরে নিয়ে যাচ্ছে, কার এই শেষ বিশ্রাম কে জানে! পার্থসারথিটি অর্জ্জুনকে বুঝিয়েছিলেন—নিজেকে কর্ত্তা বলে ভেবোনা, কর্ত্তা ভাবতে গেলেই যত গোলমাল! রঙ্গমঞ্চে সাজ পরিয়ে যা করার জন্যে অধিকারী মশাই পাঠিয়েছেন তাই করে যাও, মনে রেখো কাজ মিটলেই কোথায় থাকবে তোমার পদ ও পোষাক, তুমি যে কে সেই! দুই রাজাই ভাবছেন আমার আমির প্রতিষ্ঠা প্রত্যুষেই দেখিয়ে দেবো। চিন্তাকুল মন নিদ্রাদেবীর স্নেহলাভে বঞ্চিত হয়নি। দুরাজাই স্বপ্ন দেখলেন। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের যুদ্ধক্ষেত্রে মাটির নীচে তিনি অবস্থান করছেন, এখানে রক্তপাত যেন না হয়, এবং যদি মঙ্গল চান তা হোলে তাঁরা যেন শক্রতা ত্যাগ করে একতাবদ্ধ হয়ে অনাদিলিঙ্গের উদ্ধার সাধন করে যথাযথ পূজার ব্যবস্থা করেন। প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শাণিত কৃপাণের পরিবর্ত্তে দেখা দিল ভাবের আদান প্রদান ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলিঙ্গন, আর মৃত্তিকা খননের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করলেন এই অনাদিলিঙ্গ। এই কারণে এই মূর্ত্তি একতেশ্বর শিব নামে বিশেষ খ্যাত হন। দুই রাজাই মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পূজাদির যথাযথ ব্যবস্থায় সহযোগিতা করেন। বিষ্ণুপুরের মহারাজা গোপালসিংহের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নদীর পাড়ের জমীতে এই মন্দির, মাটি থেকে প্রায় ১০ ফুট নীচে এই অনাদিলিঙ্গ। সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে হয়। অনাদিলিঙ্গের পাশেই স্বচ্ছ জল রয়েছে, বদ্ধ জল নয়, কোনও পূতিগন্ধ নেই ও সব সময়েই একরকম। এখানে জনশ্রুতি, গঙ্গাধরের পাশেই মা গঙ্গা আত্মপ্রকাশ করে প্রবাহিতা।

একতেশ্বরের প্রধান মন্দির ছাড়াও আরও অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে। শ্রীচৈতন্যদেব, মৃত্যুঞ্জয় শিব, গণেশ, কাল ভৈরব, অনন্ত, বাসুকী প্রভৃতি বিগ্রহ আছেন। একটি বিকলাঙ্গ কালিমূর্ত্তিও রয়েছে।

মন্দিরের সেবাদি পরিচালনার জন্যে বিষ্ণুপুরের রাজা কয়েকজন কৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনেন। এই পুরোহিত বংশ দুভাগে বিভক্ত—ধামাৎকর্ণী (চট্টোপাধ্যায়) ও দেঘোরিয়া (গঙ্গোপাধ্যায়)। বর্ত্তমানে এই পুরোহিতদের সন্তানসন্ততিরা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে প্রায় ৪০টি পরিবারে পরিণত হয়েছেন। মন্দিরের সংলগ্ন স্থানটিতে গড়ে উঠেছে তাঁদের গ্রাম। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাতবদলও হয়েছে অনেক সম্পত্তি। তার ফলে সেবানির্ব্বাহে দেখা দিয়েছে অনেক ত্রুটি। ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এই সব মঠ ও মন্দির রক্ষায় কতদূর তৎপর হবেন—জানি না। নাস্তিকবাদী ব্যক্তিত্বের পূজক কোন কোন রাষ্ট্রের চিন্তাশীল ব্যক্তিকে দেখছি মনের ক্ষুধায় অন্তরে শান্তি লাভের জন্য ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন। আর আমরা কি স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা ভুলে গিয়ে সাধুসন্ন্যাসী ও সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসীদের প্রতি কটাক্ষ ও কুটুক্তি করবো! মণিমন্দিরের দেবতাকে জানাই—কবে আবার ছাতনা বিষ্ণুপুরের রাজাদের মত এঁদের ও বলতে শুনবো—"মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলির তলে"।

বাঁকুড়ার অপর দুটি ধর্ম্মকেন্দ্র—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বিজয়-যোগাশ্রম ও রামকৃষ্ণ মঠ। বিজয় যোগাশ্রমটি ঢাকার ৺বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪২ সালের ফাল্গুন মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশন এবং তাঁদের পরিচালিত হাসপাতাল, ছাত্রাবাস ও গ্রন্থাগার স্থানীয় জনগণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুচিকিৎসার জন্যে দূর থেকেও অনেক রোগীর সমাবেশ হয়। বাংলার প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী শ্রীমণি পালের তৈরী শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্ত্তিটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক, মনে হয় যেন এক জীবন্ত মূর্ত্তি।

—•—

প্রার্থনা

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ রায়]

সুন্দর ! মোর হৃদয় বীণায়
বাজে যে তোমার সুর,
আমি যে তোমার তুমি যে আমার—
নহ তুমি বহু দূর !

যাহা কিছু মোর সঁপেছি চরণে
শূন্য করিয়া ডালি,
রাখি' অন্তরে তব শ্রীচরণ
পূজি গো অশ্রু ঢালি'।

কত খেলা প্রিয় খেলিছ বসিয়া
মোর হিয়া-তরুমূলে,
কণ্টকে যবে ক্ষত হয় দেহ
কুসুম দাও যে তুলে।

সুপ্ত-চেতনা উঠুক জাগিয়া
তব যাদু-পরশনে,
লভি যেন আমি তব বরাভয়
ভবভয়-বিমোচনে !

—•—

আল্‌বার লীলামৃত

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

॥ শ্রীপরকাল, তিরুমঙ্গাই আলবার নীলম্ ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনন্তর পরকাল একবস্ত্র পাতিয়া সমস্ত অলঙ্কার ও অন্যান্য স্বর্ণরৌপ্য অর্থ প্রভৃতি একত্রিত করিয়া পুঁটুলী বাঁধিয়া মাথায় তুলিবার চেষ্টা করিল, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। একি ব্যাপার, এই সামান্য বোঝা কেন তুলিতে পারিতেছি না! অনেকক্ষণ টানা টানি করিয়া বুঝিল ইহার মধ্যে কোন রহস্য আছে। তখন বরকে বলিলেন, ও বর তুমি নিশ্চয় কোন ভেল্কী জান। মন্ত্রের বলে এ বোঝা আটক করিয়া রাখিয়াছ সত্বর মন্ত্র উপসংহার কর। নচেৎ এই তরবাল দেখিতেছ—এর দ্বারা তোমায় কাটিয়া ফেলিব। এই বলিয়া অসি উত্তোলন পূর্ব্বক ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। ভয়ের ভয় বরটী আমার কনেটীকে কাছে লইয়া রঙ্গ দেখিতে দেখিতে বলিলেন, তুমি যা বলিতেছ তাহা সত্যই, এ মন্ত্রের প্রভাব। তুমি সে মন্ত্র শিখিবে? আমার কাছে এসো। তোমার কানে কানে মন্ত্রটী বলিয়া দিতেছি। এ মন্ত্রের প্রভাবে এরূপ সামান্য বোঝার কথা কি—তুমি জগৎকে পর্য্যন্ত তুলিতে পারিবে। পরকাল গত্যন্তর না দেখিয়া বরের কাছে উপস্থিত হইলে, তিনি অষ্টাক্ষর মন্ত্র দান করিলেন।

ঋচো যজুংষি সামানি তথৈবাথর্বনানি চ।
সর্ব্বমষ্টাক্ষরান্তঃস্থং যচ্চান্যদপি বাঙ্‌ময়ম্ ॥
সর্ব্ব বেদান্তসারার্থঃ সংসারার্ণবতারকঃ।
গতিরষ্টাক্ষরোনৃনা মপুনর্ভবকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥
ঐহলৌকিকমৈশ্বর্য্যং স্বর্গাদ্যং পারলৌকিকম্
কৈবল্যং ভগবন্তঞ্চ মন্ত্রোঽয়ং সাধয়িষ্যতি ॥
মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্রো গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
পবিত্রঞ্চ পবিত্রানাং মূলমন্ত্রং সনাতনম্ ॥ —প্রপন্নামৃত, ৯৯অ,

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ আর অন্য শাস্ত্র সকল যাহার মধ্যে অবস্থিত; সমস্ত বেদান্তের সার সংসারসাগর তারক মোক্ষকামি মানবগণের আশ্রয় অষ্টাক্ষর মন্ত্র। যে অষ্টাক্ষর মন্ত্র ঐহিক ঐশ্বর্য্য ও পরলোকে ভগবৎ প্রসন্নতা-

মূলক কৈবল্য সাধন করে। গোপনীয়ের অতিগুহ্য, পবিত্র হইতেও পবিত্রতম, মন্ত্র সকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-মন্ত্র অষ্টাক্ষর মন্ত্র—শ্রীভগবানের শ্রীমুখ হইতে তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল, বিদ্যুৎবেগে সেই ভগবদুপদিষ্ট পরম মন্ত্র তাহার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার জন্মজন্মান্তরকৃত কলুষরাশি তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া, তাহাকে নবজীবন দান করিলেন। পরকালের লোমে লোমে আনন্দ নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল—একি—একি! আলো! অন্তরে বাহিরে আলোকের মহাপ্লাবনে সে যেন কেমন হইয়া যাইল, কৈ আমি—কোথায় আমি—কে আমি—আনন্দ বিহ্বল পরকাল মন্ত্রদাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন মন্ত্রদাতা তথায় নাই। কাঞ্চন গিরিশৃঙ্গে তড়িদ্‌গর্ভ মেঘের মত গরুড়ের পৃষ্ঠে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্যাম কলেবর রঙ্গনাথ! পরিধানে পীতাম্বর, মস্তকে কিরীট, গলায় বনমালা, বামে জগন্মাতা লক্ষ্মী—একি! একি! আমি কি করি? আমায় কি করিতে হয়? পরকাল ছিন্নমূল তরুর মত তাঁহার পদতলে পড়িয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাইলেন।

শ্রীভগবান বলিলেন—পরকাল বর গ্রহণ কর। পরকাল কহিলেন—দয়াময় আমার মত অধমের প্রতি একি অহৈতুকী কৃপা! আপনি আমায় স্বয়ং মন্ত্রদান করিলেন; কি করি কি বলি—আমার মত কৃপা আর কেহ কখন পায় নাই। ঠাকুরের ইচ্ছায় পরকালের জিহ্বায় কবিতার আবির্ভাব হইল। তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল ভগবৎ স্তবগান বহির্গত হইতে লাগিল। সেই প্রেমসঙ্গীতই তামিল বেদ চতুষ্টয়ের ষড়ঙ্গরূপে আজিও তামিল ভক্তগণের দ্বারা গীত হইতেছে। তাহার তামিল নাম। ১। পেরীয় তিরুমাঝি। ২। তিরুক করানন্দ আগম। ৩। তিরু-নেদানন্দগম। ৪। তিরুভেজু কুটিরুকৈ। ৫। সিরীয় তিরুমদল। ৬। পেরীয় তিরুমদল॥

শ্রীরঙ্গনাথ পরকালের স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, পরকাল তোমার কৈঙ্কর্য্যে এবং স্তবে অতিশয় প্রীত হইয়াছি। প্রিয়তম বর গ্রহণ কর। হে কলিহন্! তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই দান করিব। পরকাল করজোড়ে বলিলেন নাথ! আপনার দর্শনলাভ করিলাম ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আপনার দাসের কি আর অন্য বর বাঞ্ছিত থাকিতে পারে! তথাপি যদি বরদান করেন তাহা হইলে যেন বিল্বারণ্যে এবং পরিরঙ্গপুরে আপনার সর্ব্বদা সান্নিধ্য থাকে।

ঠাকুর বলিলেন—তথাস্তু। প্রিয়তম পরকাল অতঃপর তুমি শ্রীরঙ্গমে

গমন করতঃ আমার প্রাকার গোপুর শোভিত মন্দির নির্ম্মাণ-রূপ কৈঙ্কর্য্য কর।

পরকাল কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। শ্রীভগবান অন্তর্হিত হইলেন। আনন্দ বিষাদে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া সঙ্গীসহ তিনি ধনাদি লইয়া কমলাপুরে কুমুদবল্লীকে সমস্ত কথা বলিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ প্রদত্ত ধন-রত্নাদির দ্বারা বর্ষব্যাপী অষ্টাধিক সহস্র শ্রীবৈষ্ণব ভোজনরূপ মহাব্রত উদ্‌যাপিত হইল। তাঁহার অপর একটী নাম হইল চতুষ্করি। আশু চিত্র মধুর ও বিস্তর গাথা প্রণয়ন করিবার জন্য তিনি এই নামে বিখ্যাত হইলেন।

অনন্তর তিনি বহুতীর্থে ভ্রমণ করিয়া তীর্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের প্রীতির জন্য প্রত্যেক স্থানের দেবতামণ্ডলীর এক একটী স্তব রচনা করিতেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির প্রভাবে ও ভগবদ্-ভজন এবং কৈঙ্কর্য্য-নিষ্ঠায় সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতে লাগিলেন। যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিল। নালুকবি পেরুমল, কলিহন্, আগীনাদার, অরুলমালী, খুজলিয়ার ভেল, মঙ্গই, বেণ্ডার পরকাল, পাপ গজেন্দ্রকেশরী এইরূপ বহু উপাধিভূষণে লোকে তাঁহাকে ভূষিত করিল। তীর্থ ভ্রমণান্তে স্বদেশ ফিরিয়া আসিয়া তত্রত্য দেবতাকে স্তব করায় তিনি দর্শন দান করত তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন।

অনন্তর সশিষ্যে পরকাল শ্রীরঙ্গম গমন করিয়া স্তব রচনা করিয়া রঙ্গনাথকে তুষ্ট করিলে তিনি বলিলেন, তুমি এইখানে থাকিয়া মন্দির ও পরিখাদি নির্ম্মাণ করতঃ উন্নতি বিধান কর।

মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন—সে অর্থ কি ভাবে সংগ্রহ করা হইবে, সঙ্গীগণ সহ তার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কৃপণ ধনবানগণের ধন অপহরণ করতঃ মন্দির নির্ম্মাণ কৈঙ্কর্য্য করা হইবে, ইহাই স্থির হইল।

তাঁহার ভগিনীপতি জ্যোতিঃশরণ বলিলেন যে নাগপত্তনে একটী বৃহৎ স্বর্ণ-বৌদ্ধপ্রতিমা আছে, তাহা আনিতে পারিলে আমাদের অনেক কাজ হইবে। পরকাল তাহা শুনিয়া আনন্দিত মনে শিষ্যগণসহ উপস্থিত হইয়া সুন্দরারণ্য নায়ক সুন্দররাজকে প্রণামান্তে তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া বৌদ্ধালয়ে গমন করিলেন। মহান বৌদ্ধমন্দিরে যাইয়া কোনোদিকে মন্দির প্রবেশের দ্বার দেখিতে পাইলেন না। এরূপ অপূর্বকৌশলে মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, কাহার সাধ্য নাই যে মন্দিরে উঠিয়া বৌদ্ধ প্রতিমা গ্রহণ করিতে পারে। তত্রত্য জনগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ মন্দির কে নির্ম্মাণ করেছে? তাহারা বলিল সেই শিল্পীর নিবাস বেপানদ্বীপ। তাহা শুনিয়া পরকাল সশিষ্যে

তথায় উপস্থিত হইয়া, মন্দির নির্ম্মাণ কারকের সহিত সখ্যতা স্থাপনপূর্বক কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা ও কবিত্ব সেই দ্বীপবাসী অনেককেই আকর্ষণ করিল। শিল্পীর সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠতা স্থাপনপূর্বক ভগবৎ প্রসঙ্গে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। একদিন কথায় কথায় পরকাল বলিলেন সখে! নাগপত্তনে একটী অতি অদ্ভুত মন্দির আছে সে কথা তুমি শুনিয়াছ কি? এমন মন্দির আর ত্রিভুবনে নাই। সেটী নিশ্চয়ই বিশ্ব-কর্ম্মার হাতে গঠিত হইয়াছে। মানুষের সাধ্য নাই যে ঐরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়। তাহার শিল্প নৈপুণ্য বর্ণনা করা যায় না। তাহাতে একটী স্বর্ণ-বৌদ্ধ-প্রতিমা ছিল; কি জানি চোরেরা কিপ্রকারে তাহা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। মন্দিরটীও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

তাহা শ্রবণ করিবামাত্র শিল্পী—কি—কি—কি হইয়াছে? পরকাল দুঃখিত-ভাবে সেই মন্দির হইতে বৌদ্ধপ্রতিমাটী অপহৃত হইয়াছে বলিলেন। তখন শিল্পী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল এমন কৌশল করিয়া আমি মন্দির নির্ম্মাণ করিলাম আমার সব কৃতিত্বই বিফল হইয়া যাইল।

পরকাল বলিলেন, তুমি তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলে নাকি? মানুষে এমন গঠিত করিতে পারে তাহা আমি জানিতাম না। কি অদ্ভুত কৌশল কাহারও সাধ্য নাই যে সে মন্দিরে প্রবেশ করিতে সামর্থ হয়। কিভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে?

শিল্পী তাহার মন্দির নির্ম্মাণকৌশল, কিরূপে তথায় প্রবেশ করিতে হইবে সমস্ত কথা বলিল। হায় হায় সেরূপ মন্দির হইতেও স্বর্ণ-প্রতিমা চুরি হইয়া যাইল। যে দেশে রম্ভাবৃক্ষ অধিক আছে সেই দেশের লোকই ইহা অপহরণ করিয়াছে। আমার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইল। পরকাল সমবেদনার সুরে বলিলেন, তুমি কি করিবে ভাই! বৌদ্ধদের দোষেই প্রতিমা চুরি হইয়াছে। তোমার মত রাজমিস্ত্রী আর জগতে নাই। এইরূপ কথা বার্ত্তার পর তাঁহারা আবাসে ফিরিয়া আসিলেন।

অনন্তর নাগপত্তনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তৎকালে একখানি সুপারী বোঝাই নৌকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন নৌকাখানি নাগ-পত্তনে যাইবে। তখন বণিকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—মহাত্মন্, আমরা দীন বৈষ্ণব। আমাদের কি আপনি নাগাপত্তনে লইয়া যাইবেন? মহাজন বলিলেন—নৌকায় উঠুন, আমার নৌকাতো তথায় যাইবেই, তখন আপনাদের লইয়া যাইবার কোন অসুবিধা হইবে না।

পরকাল শিষ্যগণসহ নৌকায় উঠিলেন। বণিকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। বণিক তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরকাল মহাজনের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাহাকে হস্তায়ত্ব করিলেন। সখা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। পরম কৈঙ্কর্য্যনিষ্ঠ ভক্তের মুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গ বণিকের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। কৈঙ্কর্য্যই যে ভগবৎ-লাভের উপায় তিনি তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। পরকাল ভাবিলেন—এই বণিক শ্রদ্ধাবান্, ইহার অর্থের দ্বারা ভগবৎ কৈঙ্কর্য্য করিতে হইবে। প্রার্থনা করিলে হয়তো দিতে পারিবে না, কৌশলে গ্রহণ করিব,। ইহা স্থির করিয়া বণিককে বলিলেন, সখে আমায় একটী সুপারী দাও তো, বণিক তাঁহাকে একটী সুপারী দান করিলে তিনি সেইটী দ্বিখণ্ড করিয়া সকলকে দেখাইয়া একখণ্ড নৌকার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—ভাই তোমার নৌকায় আমার অর্দ্ধেক সুপারী রহিল। আমি যেন তীরে উঠিয়া এ সুপারী পাই। বণিক বলিলেন—অর্দ্ধেক সুপারী কেন দুই-তিন, সহস্র অথবা অযুত যত সুপারীর প্রয়োজন হয় গ্রহণ করিবেন।

তখন তিনি বলিলেন—দেখ ভাই, এখন কাল ভাল নয়, মানুষ কথা বলিয়া সে কথা রক্ষা করিতে পারে না, তুমি এই কাগজে লিখিয়া দাও, "নৌকার অর্দ্ধেক সুপারী—তোমায় নিশ্চয় দিব"। মহাজন বলিলেন— কেন আপনি চিন্তিত হইতেছেন—আমি দশ বিশ হাজার সুপারী দিব, আধখানার কথা কি?

পরকাল—সে পরের কথা পরে; উপস্থিত তুমি কাগজে লিখিয়া দাও।

তাঁহার অতিশয় আগ্রহ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বণিক সেই কথা কাগজে লিখিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

নাগাপত্তন বন্দরে নৌকা উপস্থিত হইলে সাধু যখন সুপারী তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন পরকাল বলিলেন—ভাই তুমি অর্দ্ধেক সুপারী তুলিয়া লইয়া যাও, অর্দ্ধেক সুপারী আমার।

বণিক সবিস্ময়ে বলিলেন—সেকি কথা, আপনার অর্দ্ধেক সুপারী কিপ্রকারে হইল, আপনি কি আমার সহিত রহস্য করিতেছেন? পরকাল বলিলেন, না ভাই এ রহস্য নয়, এই দেখ তুমি লিখিয়াছ অর্দ্ধেক সুপারী আমার।

বণিক আপনি সাধু আপনি এরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া আমার অর্দ্ধেক সুপারী লইতে চাহিতেছেন—এ কি ব্যাপার? বেশে বা কথাবার্ত্তায় লোক চিনিবার উপায় নাই আপনার অসাধ্য কিছু নাই।

পরকাল বলিলেন, ভাই তোমার সুপারী বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা আমি ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্যই করিব। মহাজন রুষ্ট হইয়া বলিলেন—আপনার মত প্রতারক আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। অনন্তর বণিক রাজদ্বারে যাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলে পরকাল তাহার স্বাক্ষরিত চিঠি দেখাইলেন। রাজপুরুষগণ বণিকের হস্ত-লিখিত চিঠি দেখিয়া অর্দ্ধেক সুপারী পরকালের, ইহা স্থির জানিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। অগত্যা মহাজন অর্দ্ধেক সুপারীর মূল্য পরকালকে দিলেন।

পরকাল সহাস্যে বলিলেন, সখে আজ তুমি আমার প্রবঞ্চনায় আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিতেছ, কিন্তু একদিন বুঝিতে পারিবে আমি তোমায় কিরূপ লাভবান করিলাম। মহাজন নীরবে রহিলেন।

অনন্তর রাত্রিকালে অন্তরঙ্গ শিষ্যগণসহ পরকাল বৌদ্ধমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শিল্পী-কথিত পথে অনায়াসে মন্দিরে উঠিয়া দেখিলেন অখণ্ড-দীপের মধ্যভাগে অপর মন্ত্রমূর্ত্তির ন্যায় হিরণ্ময়ী বৌদ্ধ-প্রতিমা বিরাজ করিতেছেন। তিনি জ্যোতিঃশরণকে আদেশ করিলেন তুমি গৃহ হইতে বৌদ্ধ-প্রতিমা লইয়া আইস, জ্যোতিঃশরণ অতিক্ষুদ্র দ্বার দিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া কৌশলে বৌদ্ধপ্রতিমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক বাহিরে পরকালের হস্তে দিলেন। পরে স্বয়ং গৃহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন। পরকাল ডাকিলেন—বাহিরে এস। জ্যোতিঃশরণ উত্তর দিলেন—বাহিরে যাইব কি, স্বর্ণ-প্রতিমা লাভ করিয়া আনন্দে দেহ স্থূল হওয়ায় মাত্র মস্তক বহির্গত হইতেছে। আমার বহির্দ্দেশে যাইবার কোন উপায় নাই। জ্যোতিঃশরণের অবস্থা দেখিয়া সকলে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, রাত্রিও তৃতীয় প্রহর অতীত—এরূপ অবস্থায় থাকিলে অবশ্যই ধরা পড়িতে হইবে, শ্রীরঙ্গনাথের কৈঙ্কর্য্য করা হইবে না—কেহ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। জ্যোতিঃশরণ বলিলেন, প্রভো, আমাকে রাখিয়া যদি আপনারা চলিয়া যান তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি ধৃত হইবেন। এক কাজ করুন—আমার শিরশ্ছেদন করিয়া মুণ্ড লইয়া চলিয়া যান, এ ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। পরকাল বলিলেন, সেকি জ্যোতিঃশরণ, তোমার মস্তক কি প্রকারে ছেদন করিব—না আমি তা কখনই পারিব না। জ্যোতিঃ-শরণ কহিলেন হে গুরুদেব, আমার মস্তকছেদন ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। আর বিলম্ব করিবেন না। সত্বর আমার শিরশ্ছেদন করত শ্রীরঙ্গনাথের কৈঙ্কর্য্যের জন্য এ স্থান ত্যাগ করুন।

পরকাল দেখিলেন বর্ত্তমানক্ষেত্রে জ্যোতিঃশরণের শিরশ্ছেদন ভিন্ন আর

অন্য উপায় নাই। তখন শাণিত তরবারির দ্বারা জয় রঙ্গনাথ বলিয়া তাহার মস্তক কর্ত্তন করিয়া বৌদ্ধ-প্রতিমা ও ছিন্ন মস্তক লইয়া তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক বিজনবনে সেই মস্তক ফেলিয়া দিয়া একক্ষেত্রে প্রতিমা পুঁতিয়া রাখিলেন। রাত্রি অবসান হওয়ায় শ্রীরঙ্গম যাইতে পারিলেন না।

প্রাতে ক্ষেত্রস্বামী জমী কর্ষণ করিতে আসিলে পরকাল তাহার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন, এ জমী আমার তোমায় কর্ষণ করিতে দিব না। উভয়ের তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। কৌশলে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া রাত্রি আগমনের অপেক্ষায় রহিলেন। নিশাগমে সেই প্রতিমা লইয়া রঙ্গনগরে আসিয়া রঙ্গনাথকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার চরণে সমস্ত নিবেদন করিয়া প্রসাদাদি গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুরটি আমার চোরচক্রবর্ত্তী, চুরি করিতে তিনি বড় ভালবাসেন। দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনী এ তো সামান্য দ্রব্য, গোপীগণের বসন মন প্রাণ জীবন যৌবন—চুরি করিতে কিছু আর বাকী রাখেন নাই। শুধু কি গোপী-গণের—যাঁহারা তাঁহার শরণাগত হয় তাঁহাদের গৃহদ্বার স্ত্রী-পুত্র পরিজন সব চুরি করিয়া পথের ভিখারী করেন, শেষ পর্য্যন্ত ভক্তগণের মন-প্রাণ ইন্দ্রিয় সব হরণ ক'রে তাঁহাদের মহা বিপন্ন করিয়া দেন। তাঁহারা চক্ষু দিয়া দর্শন করিয়া তাঁহাকেই দেখেন, কর্ণের দ্বারা শুনিতে যাইয়া তাঁহাকেই শ্রবণ করেন, এইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাণ-মনের গ্রহীতব্য যাহা কিছু সব চুরি করিয়া অখিল বিশ্ব সাজিয়া স্বয়ং খেলা করেন আর সেই মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় হারান ভক্তগুলি দ্বিতীয় বস্তু আর কিছু দেখিতে না পাইয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যান। এরূপ চোরচূড়ামণির কাছে বৌদ্ধগণের স্বর্ণময়ী প্রতিমা চুরির কথা বলায় তিনি যে যথেষ্টই আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য; সেই শঠ-শিরোমণির বলির বন্ধন, তুলসীর সতীত্ব-হরণ প্রভৃতি শঠতার কথা কে না জানে! তাঁহার শার্ঙ্গধনুর অবতার পরকাল চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, প্রবঞ্চনা শঠতা মিথ্যাকথা যে কোন প্রকারে হউক অর্থ আনয়ন করিয়া কৈঙ্কর্য্য করিতেছে ঠাকুরটী তাহাতে আনন্দিত, কেন না তাঁহার আপনার কথা—'যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ॥' যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি শীঘ্র তাহার ধন হরণ করি। তাঁহার ধনুকের অবতার যে চুরি করিতেছে ইহাতে তাহার কোন কৃতিত্ব নাই। অনুগ্রহ করা ঠাকুরটীর অনুগ্রহের ভিন্ন মূর্ত্তি। পরকালের কথা, ধনী তুমি ধন সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যাইবে, আমি তোমাকে সেরূপে যাইতে দিব না। তোমার অর্থ কাড়িয়া লইয়া শ্রীভগবানের

কৈঙ্কর্য্য করিব, তুমি তদ্দ্বারা পরলোকে পরম সুখ লাভ করিবে। ইহলোকের তুচ্ছ ক্ষতি তোমার পরলোকে পরমা প্রীতি দান করিবে। অতএব যে কোন প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের কৈঙ্কর্য্য করত মায়ামুগ্ধ জীবের কল্যাণ করিব। উদ্দেশ্য সৎ—কিন্তু পথটী অতি-নিন্দিত। ঠাকুর উদ্দেশ্য দেখেন, পথ নয়। তবে তাহার অধিকারী আছে, ভগবান মহেশ্বর বিষপান করত জগতের কল্যাণ করিয়াছিলেন বলিয়া সে আদর্শ গ্রহণের পূর্ব্বে গিরি গোবর্দ্ধনটী উত্তোলন করার প্রয়োজন। মানুষ আপনার অধিকার অনুসারে কার্য্য করিলে ইহলোক পরলোকে শান্তি লাভ করে। আর অধিকারের সীমা উল্লঙ্ঘনে কোনও লোকই সুখ পায় না। অতএব পরকালের এ আদর্শ সাধারণের গ্রহণীয় নহে।

এদিকে বৌদ্ধ অর্চ্চক প্রতিমা পূজা করিতে যাইয়া এক কবন্ধ পড়িয়া আছে, স্বর্ণ-প্রতিমা নাই দেখিয়া বিস্মিত দুঃখিত ও স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করিয়া সে কথা অন্যান্য বৌদ্ধগণকে বলিলে সকলে তাহা দর্শন করত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বৌদ্ধ নায়ক চতুর্দ্দিকে সুচতুর চর প্রেরণ করত চোরের সন্ধান করিতে লাগিলেন। যে ক্ষেত্রে বৌদ্ধ-প্রতিমা প্রোথিত করিয়াছিলেন বৌদ্ধচর তথায় আসিয়া ক্ষেত্রস্বামীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া এবং ক্ষেত্রে গর্ত্ত দেখিয়া দৃঢ়-নিশ্চয় করিল এ কর্ম্ম আর কাহারও নহে সেই পরকালই আমাদের প্রতিমা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। সকলে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, আপনি আমাদের দেবপ্রতিমা হরণ করিয়া আনিয়াছেন, এখনি সে প্রতিমা দিন। পরকাল প্রতিমা না দেওয়ায় উভয়-পক্ষে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল, বৌদ্ধগণ রাজার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করত প্রতিমা প্রার্থনা করিলে, রাজ-সদস্যগণ পরকালকে প্রতিমা প্রত্যর্পণের কথা বলিলেন।

পরকাল একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন বৎসরান্তে আমি প্রতিমা দিব, যদি না দিই তাহা হইলে আমার দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলী কাটিয়া দিব। তাহারা চলিয়া যাইলেন।

পরকালের ভগিনী ও কুমুদবল্লী জ্যোতিঃশরণের কথা শুনিয়া দুঃখিত চিত্তে শ্রীভগবানকে জানাইতে লাগিলেন—জগন্মাতা লক্ষ্মীও রঙ্গনাথকে জ্যোতিঃশরণের পুনর্জীবনের জন্য বলিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছায় জ্যোতিঃশরণ মরণের পরপার হইতে শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধনপূর্ব্বক পরকালের আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরকাল সেই স্বর্ণ-প্রতিমা

গলাইয়া শ্রীরঙ্গনাথের সপ্ত প্রাকার মন্দির নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়া ফেলিলেন।

বৎসরান্তে বৌদ্ধগণ যখন আসিয়া প্রতিমা প্রার্থনা করিলেন তখন তিনি অস্ত্রের দ্বারা আপনার কনিষ্ঠা অঙ্গুলী ছেদন করিয়া তাহাদিগকে দিলেন। তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চলিয়া যাইলেন।

বহুদিন ধরিয়া মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিল, শত শত স্তম্ভশোভিত মণ্ডপ সপ্ত প্রাকার ও অষ্টাবিংশতি গোপুরযুক্ত বিশাল মন্দির নির্ম্মিত হইল, এইরূপ মন্দির পৃথিবীতে আর নাই।

অনন্তর মন্দির নির্ম্মাণ অন্তে রাজ মিস্ত্রীগণ পরকালের নিকটে বেতন প্রার্থনা করিলে, তিনি ভাবিলেন ইহারা অনেকদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিয়াছে, সামান্য পার্থিব অর্থ তাহাদের দিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অপার্থিব পরমপদ ইহাদের দান করিব। ইহা স্থির করিয়া কয়েকজন নাবিককে আহ্বান করিয়া বলিলেন—দেখ কাবেরীতে নিমজ্জিত করিয়া শিল্পীগণকে পরমপদে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমরা আমার সহায় হও। কাবেরীর পরপারে খেতাচলে আমার অর্থ আছে, তদ্বারা তোমাদের বেতন দিব বলিয়া আমি রাজমিস্ত্রীগণকে ওপারে লইয়া গিয়া অর্থাদি দানের পর, আসিবার সময় তাহাদের কাবেরীতে ডুবাইয়া দিতে হইবে, তোমরা তাহাতে সম্মত আছ কি না?

[ক্রমশঃ]

অপরিহার্য কারণে এই সংখ্যায় "নাসিক কুম্ভে নাম প্রচার" প্রবন্ধটির অনুবৃত্তি প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। ইহার জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক, দেবযান

সংবাদ

২৫শে অগ্রহায়ণ নবগ্রামের (বর্ধমান) 'অনন্তকালোদ্দিষ্ট অবিরত রাধা-গোবিন্দ মহামন্ত্র সংকীর্তন মহামণ্ডল'-এর চতুর্থ বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। দিগসুই, ব্যারাকপুর, মেমারী, পাড়াতল, নগরকোণা, রসুলপুর, কেওটারা, শাক্তগড়, পলতাগড়, হরিপাল প্রভৃতি স্থানের শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়ের কীর্তনসংঘ এবং মেমারী-হেমাঙ্গিনীমঠ ও গণপুর-অনেন্দমঠের সেবকগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রায় সাত শত নরনারী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

* * * *

১৬ই অগ্রহায়ণ 'কলিকাতা-নূতন বাজার সাধন সমিতি' সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে উত্তর কলিকাতার গঙ্গাতীরবর্ত্তী অঞ্চলের কয়েকটি স্থানে শ্রীশ্রীনাম প্রচার এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 'অভয় বাণী' বিতরণ করেন।

১লা পৌষ এই সমিতি শালকিয়ায় (হাওড়া) নাম প্রচার করেন। শ্রীযুক্ত বিরলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে চতুষ্প্রহর অবিরত নামযজ্ঞ হয়। মধ্যাহ্নে বহু নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। নাম প্রচারে ইঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন—ব্যারাকপুর জয়গুরু সম্প্রদায়; ভবানীপুর জয়গুরু সম্প্রদায়, শ্রীশচীন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র, অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ।

* * * *

শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র সিংহের (কলিকাতা) বাসভবনে চারি বৎসর যাবৎ প্রতিদিন প্রাতঃকালে নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত সিংহ ভাদ্র মাস হইতে তাঁহার গ্রামের (চারিগ্রাম, বাঁকুড়া) বাটীতেও সন্ধ্যায় নিয়মিত নামকীর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

* * * *

১৬ই অগ্রহায়ণ, সূর্য্যগ্রহণের দিন বোলপুর (বীরভূম) শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায় এই স্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে নাম প্রচার করেন।

বোলপুরের শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমগোপাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নায়েকের বাসভবনে যথাক্রমে সংক্রান্তি, মাসের প্রথম বৃহস্পতি-বার এবং তৃতীয় বৃহস্পতিবারে গুরু-পূজা, নামযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

* * * *

২৭শে ভাদ্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-আশ্রমে (ডিহা, বাঁকুড়া) পঞ্চরাত্রি ব্যাপী নামযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে।

সূর্য্যগ্রহণের দিন ডিহা গ্রামের শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কালী

মন্দিরের সম্মুখে উদয়াস্ত শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম নাম-কীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

স্থানীয় ভক্তগণের সহযোগিতায় এই দুইটি অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

* * * *

৪ঠা অগ্রহায়ণ 'নবগ্রাম—অনন্তকালোদ্দিষ্ট অবিরত রাধাগোবিন্দ মহামন্ত্র সংকীর্তন মহামণ্ডল'-এর সেবক শ্রীআনন্দময় কিঙ্করের নেতৃত্বে কয়েকজন ভক্ত এই গ্রামগুলিতে নাম প্রচার করেন—কেওটারা, শিরোমণি, পাঁচশিমুল, জুতিহাটি, দস্তনপুর।

* * * *

১লা পৌষ পলুতাগড় (হুগলি) শ্রীরামাশ্রম শাখায় এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে উদয়াস্ত নামযজ্ঞ হয়। প্রায় দুইশত বালক অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করে।

* * * *

১৬ই অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীদাশরথি মঠের (কলাপুকুর, বর্ধমান) সেবকগণ কাটোয়া এবং তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে শ্রীশ্রীনাম প্রচার করেন।

* * * *

৩রা পৌষ শ্রীকাশী রামাশ্রমে এই আশ্রমের দশম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে গুরুপূজা, নামযজ্ঞাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

* * * *

১০ই পৌষ শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নূতনবাটী, পূর্ব-নওপাড়া, মাকড়দহ) বাসভবনে এই গ্রামের 'রামকৃষ্ণ-সাধন সমিতি' কর্তৃক প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের 'বাণীমালা' 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'-এর কিয়দংশ এই উৎসবে পঠিত হয়। মধ্যাহ্নে বহু নরনারী অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

* * * *

পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বীরনগর-(নদীয়া) জয়গুরু সম্প্রদায় কয়েকখানি গ্রামে শ্রীশ্রীনাম প্রচার করেন।

* * * *

শোক সংবাদ

২২শে অগ্রহায়ণ শ্রীযুক্ত সীতানাথ বল পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন এবং সংসারাশ্রমে থাকিয়া সাধন-নিষ্ঠ-জীবন যাপন করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

কর্ম্মকুঞ্জ সংবাদ

ওঙ্কার মঠ

১২।১০।৬৩

কিংকর শ্রীমাধবানন্দজীকে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কোষাধীষ নিযুক্ত করেছেন।

শ্রীসুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়—কে.এন্. মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স, ৬৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড্, কলিকাতা—বৃন্দাবনস্থ মাল্যবতী আশ্রমের কোষাধীশ নিযুক্ত হয়েছেন।

ভ্রম সংশোধন

গত পৌষসংখ্যা "দেবযানে" ওঙ্কারেশ্বরের পত্রে পুস্তক প্রকাশন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি ত্রুটিযুক্ত হয়েছে। নিম্নরূপ হবে:—

শ্রীশ্রীঠাকুর পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার বিভাগের সমস্ত ভার শ্রীপদ্ম-লোচন মুখোপাধ্যায়, (পোঃ বালি, হাওড়া), ডক্টর শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ (দেবযান, কার্য্যালয় পোঃ মগরা, হুগলী) এবং শ্রীপ্রমোদরঞ্জন গুপ্ত, অধ্যাপক, হুগলী মহসীন কলেজ (পোঃ চুঁচুড়া, হুগলী)—এই তিন-জনের উপর দিয়েছেন।

কিঙ্কর শ্রীগোবিন্দদাস

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ৭ই ফাল্গুন মঙ্গলবার (১৩৬৩) ঠাকুর শ্রীশ্রী১০৮ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর শুভ জন্মোৎসব হুগলী জেলার কেওটা-গ্রামস্থ জন্মভিটায় সুসম্পন্ন হইবে। সকল শিষ্য ভক্তগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

*
* *
*

আগামী ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবার দেবযান মহাসমারোহে পরমারাধ্য ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজের ষট্‌ষষ্টিতম শুভ আবির্ভাব মহোৎসব রায় বাহাদুর সতীশ মুখার্জী রোডস্থ পুরাতন মোবার্লি টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্-প্রাঙ্গণে (বালি মোড়, হুগলী) উদ্‌যাপিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে বাংলার বহু মনীষী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিবেন। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নিবেদক

অধ্যাপক শ্রীমনোজ কুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, উৎসব কমিটি

শ্রীশ্রীঠাকুরের ষট্‌ষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি (৭ই ফাল্গুন, ১৩৬৩) হইতে একমাস পর্য্যন্ত (৭ই চৈত্র, ১৩৬৩) ঠাকুরের রচিত পুস্তকাবলী ২৫% কমিশনে বিক্রয় করা হইবে। পুস্তক বিক্রয়-কেন্দ্র হইতে লইতে হইবে, ডাকে পাঠান সম্ভব হইবে না।

কর্ম্মসচিব, দেবযান

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ,
সপ্তম সংখ্যা

ফাল্গুন
১৩৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।

নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ডি-লিট্]

(পূর্বানুবৃত্তি)

জয়ন্তভট্টের মতের আলোচনা

জয়ন্তভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে বলিয়াছেন—ঈশ্বর আত্মজাতীয় বলিয়া জীবাত্মার যে নয়টি বিশেষ গুণ আছে ঈশ্বরেরও প্রায় তাহাই আছে। জীবাত্মার বিশেষ গুণ নয়টি—১। জ্ঞান, ২। ইচ্ছা, ৩। কৃতি বা প্রযত্ন, ৪। দ্বেষ, ৫। ধর্ম্ম, ৬। অধর্ম্ম, ৭। সুখ, ৮। দুঃখ, ৯। ভাবনাখ্য সংস্কার। জীবাত্মার এই নয়টি বিশেষ গুণের মধ্যে ঈশ্বরের পাঁচটি বিশেষ গুণ আছে। ১। জ্ঞান, ২। সুখ, ৩। ইচ্ছা, ৪। প্রযত্ন বা কৃতি, ৫। ধর্ম্ম। জীবাত্মার নয়টি বিশেষ গুণের মধ্যে চারিটি বিশেষ গুণ ঈশ্বরের নাই যেমন—১। দুঃখ, ২। দ্বেষ, ৩। অধর্ম্ম, ৪। ভাবনাখ্য সংস্কার। এই চারিটি বিশেষ গুণ কেবল জীবাত্মারই আছে। ঈশ্বর আত্মজাতীয়

হইলেও ঈশ্বরের এই চারিটি বিশেষ গুণ নাই। ঈশ্বরের এই পাঁচটি বিশেষ গুণ ভিন্ন পাঁচটি সামান্য গুণও আছে যেমন—১। সঙ্খ্যা, ২। পরিমাণ, ৩। পৃথক্ত্ব, ৪। সংযোগ ও ৫। বিভাগ। সুতরাং জয়ন্তভট্টের মতে ঈশ্বরের দশটি গুণ আছে। তাৎপর্য্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি ন্যায়বৈশেষিক আচার্য্যগণের মধ্যে কেহই ঈশ্বরের দশটি গুণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা ঈশ্বরের সুখ ও ধর্ম্ম এই দুইটি বিশেষ গুণ স্বীকার করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের বিশেষ গুণ তিনটি ও সামান্য গুণ পাঁচটি আছে বলিয়া ঈশ্বরের আটটি গুণ স্বীকৃত হইয়াছে।

বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ঈশ্বরের প্রথমতঃ ছয়টি গুণ স্বীকার করিয়াছিলেন, মাত্র জ্ঞানই ঈশ্বরের একটি বিশেষ গুণ আছে পরে আবার ইচ্ছাও ঈশ্বরে আছে স্বীকার করায় তাঁহার মতে ঈশ্বরে দুইটি বিশেষ গুণ ও পাঁচটি সামান্য গুণ এই সাতটি গুণ ঈশ্বরে স্বীকার করিয়াছেন। ন্যায়কন্দলীতে শ্রীধরাচার্য্য এই বার্ত্তিককারীয় প্রথম মতটির উল্লেখ করিয়াছেন—"অন্যেতু বুদ্ধিরেবতস্যাব্যাহতা ক্রিয়াশক্তিরিত্যেবং বদন্ত ইচ্ছা প্রযত্নাবপ্যনঙ্গীকুর্ব্বাণাঃ ষড়্ গুণাধিকরণোঽয়মিত্যাহুঃ" (নায়কন্দলী ৫৭ পৃঃ) ইহার অভিপ্রায় অন্যেরা অর্থাৎ বার্ত্তিককার প্রভৃতি ঈশ্বরের বুদ্ধিই তাঁহার অব্যাহত ক্রিয়াশক্তি এইরূপ মনে করিয়া ইচ্ছা ও প্রযত্ন ঈশ্বরের স্বীকার না করিয়া ঈশ্বর ষড়্গুণ এইরূপ বলেন। কন্দলীকার এই উদ্ধৃত বার্ত্তিক মতে কোনও দোষ প্রদর্শন করেন নাই। ততঃপর কন্দলীতে ঈশ্বর বদ্ধ কি মুক্ত এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বার্ত্তিক মতেই ঈশ্বর বদ্ধও নহেন মুক্তও নহেন এইরূপ বলিয়া পরে পাতঞ্জলমতে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত এইরূপ বলিয়াছেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার প্রযত্নরূপ বিশেষ গুণও ঈশ্বরের আছে বলিয়াছেন এবং বার্ত্তিককারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই তাহা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকায় যাহা বলা হইয়াছে আচার্য্য উদয়নও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ণ ঈশ্বরের ধর্মরূপ বিশেষ গুণ ঈশ্বরের আছে বলিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি এবং বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু বার্ত্তিককারের পরবর্ত্তী জয়ন্তভট্ট ঈশ্বরের ধর্মও স্বীকার করিয়াছেন ও ঈশ্বরের সুখও স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট ভাষ্যকারের উক্তির অনুবর্ত্তন করিয়াই বলিয়াছেন "আত্মবিশেষ এব ঈশ্বরোনদ্রব্যান্তরম্" (নায় মঞ্জরী ১৮৫ পৃঃ) ভাষ্যকার বলিয়াছেন "ন চ আত্মকল্পাদন্যঃ কল্পঃ সম্ভবতি" (ন্যায় দর্শন ৯৪৪ পৃঃ) জয়ন্তভট্ট ভাষ্যকারের মতানুসারে ঈশ্বরকে আত্মবিশেষ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ধর্ম্মজ্ঞান সমাধিসম্পদা চ বিশিষ্টং আত্মান্তরং ঈশ্বরঃ"

(ন্যায়দর্শন ৯৪৬ পৃঃ) জয়ন্তভট্ট ভাষ্যকারের উক্তির অনুবর্ত্তন করিয়াও ভাষ্যবিরুদ্ধ ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট কাশ্মীরদেশীয় নৈয়ায়িক। কাশ্মীরে একটি স্বতন্ত্র ন্যায়-প্রস্থান বিদ্যমান ছিল। এই প্রস্থান বাৎস্যায়নীয় প্রস্থান হইতে ভিন্ন। ভাষ্যকার বার্ত্তিককার প্রভৃতি ন্যায়দর্শনের যে প্রস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রাচীন কাশ্মীরীয় নৈয়ায়িকগণ তাহা হইতে ভিন্ন প্রস্থানের সমর্থন করিতেন। কাশ্মীর দেশীয় নৈয়ায়িক ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রণীত ন্যায়সারগ্রন্থ ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই ন্যায়সারের ন্যায়ভূষণ বা ভূষণ নামক একখানি টীকা অতি সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এই টীকার উল্লেখ উদয়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বহুস্থলে করিয়াছেন। যেমন কিরণাবলী গ্রন্থে—"যৎপুনরাহ ভূষণঃ লক্ষণং চিহ্নং লিঙ্গমিতি পর্য্যায় ইতি" (কিরণাবলী ৪৩ পৃঃ) আবার বলিয়াছেন "তস্মাৎ বরং ভূষণঃ কর্ম্মাঽপি গুণঃ তল্লক্ষণযোগাৎ ইতি" (কিরণাবলী ১৬০ পৃঃ) এইরূপ বহুগ্রন্থে ন্যায়ভূষণের বা ভূষণের উল্লেখ দেখা যায়। নব্যনৈয়ায়িকগণও নানাস্থলে ভূষণের মত খণ্ডন করিয়াছেন। এই ন্যায়সারগ্রন্থে শিবকেই পরমেশ্বর বলা হইয়াছে এবং এই শিবই শৈবসিদ্ধান্তে ব্রহ্মপদাভিধেয়। ন্যায়সারে বলা হইয়াছে —"আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং তচ্চ মোক্ষেভিব্যজ্যতে" (ন্যায়সার আগমপরিচ্ছেদ ৪০ পৃঃ সতীশ বিদ্যাভূষণ মুদ্রিত) আবার এই পৃষ্ঠাতেই "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃহ, উ, ৩।৯।২৮) এই শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে। ভাসর্ব্বজ্ঞ পরমশৈব ছিলেন। তিনি মোক্ষ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "শিবসাক্ষাৎকার হইতেই জীবের মোক্ষ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম বা শিবের আনন্দ আছে বলিয়াই ভাসর্ব্বজ্ঞের মতে মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখাভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ণ ও এই নিত্য সুখাভিব্যক্তি পক্ষের বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। (ন্যায় সূঃ—১।১।২২) ইহাতে বুঝিতে পারা যায় ভাসর্ব্বজ্ঞ যে সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছিলেন সেই সিদ্ধান্তই ন্যায়ভাষ্যকার কর্ত্তৃক সমালোচিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় এই সিদ্ধান্ত অতি প্রাচীনকাল হইতেই সুপ্রচলিত ছিল। জয়ন্তভট্ট যদিও সাক্ষাৎভাবে ভাষ্যকারীয় সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন ভাসর্ব্বজ্ঞের মতের সমর্থন করেন নাই তথাপি কাশ্মীরীয় ন্যায় প্রস্থানের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অপবর্গ নিরূপণ প্রসঙ্গে যদিও জয়ন্তভট্ট নিত্য সুখাভিব্যক্তির সমর্থন করেন নাই, ভাষ্যকারীয় প্রস্থানানুসারেই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই অপবর্গ বলিয়াছেন, তথাপি ন্যায়মত সিদ্ধ অপবর্গ উপাদেয় না হইয়া শোচনীয়ই বটে ইহাই বলিয়াছেন। "আত্যন্তোচ্ছেদ পক্ষস্তু নৈয়ায়িক মতাদপি শোচ্যো যত্রাত্মবস্তোঽপি ন কশ্চিদবশিষ্যতে ॥" (ন্যায় মঞ্জরী ২য় খণ্ড প্রমেয়

পরীক্ষা অপবর্গনিরূপণ ৮১ পৃঃ) ইহার অভিপ্রায় এই যে বৌদ্ধগণ বিজ্ঞান সন্ততির উচ্ছেদকেই অপবর্গ বলিয়াছেন। এই বৌদ্ধমত ন্যায়মত হইতেও শোচনীয়। ন্যায়মত যদিও মোক্ষদশাতে আত্মা পাষাণপ্রায় অচেতন অবস্থায় থাকে কিন্তু বিজ্ঞান সন্ততির উচ্ছেদ স্বীকার করিলে আর আত্মার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না এজন্য বৌদ্ধমতে অপবর্গ ন্যায়মত হইতেও শোচনীয়। জয়ন্তভট্টের এই উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ন্যায় সিদ্ধান্ত সম্মত অপবর্গ অন্ততঃ জয়ন্তভট্টের মনে লাগে নাই। বৌদ্ধ সম্মত অপবর্গ ন্যায়মতের অপবর্গ হইতেও অধিকতর শোচ্য বলায় ন্যায়মত সিদ্ধ অপবর্গও শোচ্য ইহাও তিনি সূচিত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় কাশ্মীরীয় ন্যায় প্রস্থানে যে মোক্ষ নিত্যসুখের অভিব্যক্তি ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলিয়াছিলেন জয়ন্তভট্ট তাহাই সমীচীন মনে করিতেন। এই জন্য জয়ন্তভট্ট ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করার অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

পাশুপত সিদ্ধান্তালোচন

উদ্ধৃত ঋঙ্‌মন্ত্রসমূহে ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রার্থের উপপাদনের জন্য ন্যায়বৈশেষিক মতে ঈশ্বরকে ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকারাদির মত কেবল নিমিত্ত কারণ বলা হইয়াছে। কুম্ভকার যেমন ঘটকার্য্যের কেবল নিমিত্ত কারণ কিন্তু উপাদান কারণ নহে, এইরূপ ঈশ্বরও পৃথিব্যাদি কার্য্যের কেবল নিমিত্ত কারণ কিন্তু উপাদান কারণ নহে। যে কার্য্যের যাহা নিমিত্ত কারণ তাহা সেই কার্য্যের উপাদান কারণ হইতে পারে না। একটি কার্য্যের উপাদানত্ব ও নিমিত্ত-কারণত্ব এক ধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ। এজন্য ঈশ্বর কুম্ভকারাদির মত পৃথিব্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত কারণই বটে কিন্তু উপাদান কারণ নহে।

ন্যায়বৈশেষিক মতে যেমন ঈশ্বরের কেবল নিমিত্ত-কারণত্বই বলা হইয়াছে, পাশুপত সিদ্ধান্তে তাহাই বলা হইয়াছে। এজন্য ঈশ্বর নিরূপণ বিষয় পাশুপত সিদ্ধান্তের সহিত ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সাম্য আছে। পাশুপত সিদ্ধান্তেও ঈশ্বর অনুমান প্রমাণসিদ্ধ বলা হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যের টীকা শিবার্কমণি-দীপিকাতে অপ্যয় দীক্ষিত বলিয়াছেন যে "ইহ অধিকরণে পরমেশ্বরস্য অনুমানাৎ সিদ্ধিঃ তস্য অনুমানতঃ সিদ্ধং নিমিত্তত্বমেব কেবলং নোপাদানত্বমপীতিমতং নিরাক্রিয়তে। (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৫) অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন যে পাশুপত সিদ্ধান্তে ঈশ্বর অনুমান প্রমাণসিদ্ধ বলা হয় এবং ঈশ্বরের অনুমানসিদ্ধ নিমিত্ত-

কারণত্বই আছে, কিন্তু উপাদানকারণত্ব নাই সেই পাশুপত সিদ্ধান্তের নিরাস এই অধিকরণে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীকরভাষ্যেও বলা হইয়াছে যে, ভূতপতি শিবের জগদুভয়কারণত্ব প্রতিপাদক শুদ্ধ সাত্ত্বিক শৈবমতই প্রধান? অথবা শৈবমতাভাস? মিশ্ররৌদ্র, পাশুপত, পাশুপতগাণপত্য, সৌর, শাক্ত, কাপালিক, বৈষ্ণবাদি—মতই প্রধান? এইরূপ সংশয়ের নিরাসপূর্ব্বক শুদ্ধ সাত্ত্বিক শৈবমতই প্রধান এজন্য ভূতপতি শিব জগতের উভয়বিধ কারণ। ইহাই এই অধিকরণে প্রদর্শিত হইবে। (শ্রীকরভাষ্য ব্র: সূ: ২।২।৩৭, ২৩২ পৃ:)

শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "পত্যুঃ পরমেশ্বরস্য শ্রুতিসিদ্ধ জগদুভয়কারণত্বাপি তদাগমনিষ্ঠাঃ তন্মতাভিপ্রায়ানভিজ্ঞা একদেশিনস্তান্ত্রিকাঃ কেবলনিমিত্তত্বং বদন্তি, তদ্ যুক্তং নবেতি সন্দেহঃ।" (ব্র: সূ: ২।২।৩৫)। পশুপতি পরমেশ্বরের জগদুভয়কারণত্ব শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও শৈবগমনিষ্ঠ একদেশী আচার্য্যগণ শৈবাগমের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পরমেশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্বই শৈবাগমপ্রতিপাদ্য মনে করেন। তাঁহাদের সেই মত যুক্তিযুক্ত কি না ইহাই সন্দেহ। এই সন্দেহের নিরাস পূর্ব্বক পরমেশ্বরের উভয়কারণত্ব সমর্থন এই অধিকরণে করা হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তের মত পাশুপত সিদ্ধান্তেও ঈশ্বরের অনুমান-সিদ্ধত্ব ও অনুমান দ্বারা ঈশ্বরের মাত্র নিমিত্তকারণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এবিষয়ে পাশুপত মতের সহিত ন্যায়বৈশেষিক মতের সাম্য আছে।

(ক্রমশ:)

—০—

ক্ষেপার ঝুলি

॥ বৈষ্ণবের আশ্রম ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

ক্ষেপা আপনমনে রাম রাম রাম রাম জপ করিতে করিতে নৃত্য করছিল। রাম রাম রাম—নিরন্তর, রামনামের বিরাম ছিলনা, এই সময় হলধর এসে বল্লে, ও ক্ষেপা বাবা!

ক্ষেপা। জয় সীতারাম রাম রাম!

হল। আচ্ছা, ক্ষেপা বাবা, আশ্রম কটা?

ক্ষেপা। রাম রাম! ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস চার আশ্রম। রাম রাম সীতারাম।

হলধর। এখনকার বৈষ্ণবদের কোন আশ্রম? শুনেছি ভগবান্ রামানুজাচার্য্য সন্ন্যাসী ছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুও সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। সাদা কাপড় পরা বৈষ্ণবদের আশ্রমের নাম কি—?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় রাম।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থো যতিস্তথা।

চত্বারোহ্যাশ্রমা এতে পঞ্চমো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ॥

পঞ্চমো বৈষ্ণবাশ্রমঃ ইতি বা।—(নারদ পঞ্চরাত্রে)

—ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, যতি—এই চার আশ্রম, আমাকে যারা বিশেষরূপে আশ্রয় করে তারা পঞ্চম আশ্রম অথবা বৈষ্ণব পঞ্চম আশ্রম। রাম রাম রাম সীতারাম সীতারাম।

বৈষ্ণবঃ পঞ্চমো বর্ণো বৈষ্ণব পঞ্চমাশ্রমঃ।

বর্ণানাং আশ্রমাণাঞ্চ শ্রেষ্ঠ শ্রীবৈষ্ণবাশ্রমঃ॥

—শ্রীঅগ্রদাসকৃত অষ্টযাম।

—বৈষ্ণব পঞ্চম বর্ণ, বৈষ্ণব পঞ্চম আশ্রম, বর্ণ ও আশ্রম সমূহের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণব আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। এই আশ্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রধান আশ্রয় পাঁচ প্রকার বলেন—"নামাশ্রয়, গুরুপদাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয় এবং বেষাশ্রয়"। এই পঞ্চবিধ আশ্রয় করিলে রূপাশ্রয় ক্রমে, "গুণাশ্রয়, ধামাশ্রয়, লীলাশ্রয় অবান্তরভাবে আপনা আপনি হইয়া থাকে"। —(চরিত সুধা ৫ম খণ্ড)

রাম রাম রাম সীতারাম।

হলধর। তাহ'লে বৈষ্ণব আশ্রম পঞ্চম আশ্রম? এঁদের কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কি?

ক্ষেপা। হাঁ রাম রাম সীতারাম, ভেক নিলে বেষাশ্রয় হ'লো! সেই সব বৈষ্ণবগণের নিয়ম—"গ্রাম্যকথা বলিবে না শুনিবে না, বিষয় লিপ্ত হইবে না, অর্থ সঞ্চয় করিবে না, কাম ক্রোধের দাস হইয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থের মানসে কখনই স্ত্রীলোকের পানে তাকাইবে না, বা আলাপ ব্যবহার করিবে না। নিজাভীষ্ট রসছাড়া রসান্তরের প্রতি দ্বেষ বুদ্ধি বা সমালোচনা করিবে না।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

সর্ব্বদা এই শ্লোকের মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। স্ত্রীসঙ্গ বা তৎসঙ্গীর সঙ্গ, বাহ্যাড়ম্বর, অযথাভাষণ, মিথ্যা ব্যবহার, পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, অসূয়া, হিংসাদ্বেষ, দ্রোহ, পরছিদ্রান্বেষণ, অতিরিক্ত ভোজন, আসক্তি, বিলাসিতা, অনিবেদিত ভোজন প্রভৃতি বিশেষ যত্নের সহিত পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নবধা ভক্তি যাজন করিবে। অধিক আর কি বলিব যাজন করিতে থাক, যখন যেটী দরকার মঙ্গলময় নিতাইচাঁদ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইবেন।"—

রাম রাম রাম রাম। (চরিত সুধা)।

হলধর। এই বৈষ্ণব আশ্রমের কথা ভাগবতাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়?

ক্ষেপা। রাম রাম রাম সীতারাম।

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রম জাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহং ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥৫১।

—শ্রীমদ্ভা-১১।২

—যাঁর জন্ম কর্ম্ম বর্ণ আশ্রম জাতির দ্বারা এই দেহে অহংভাব হয় না তিনি হরির প্রিয়।

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমান্ ত্যক্ত্বা চরেদবিধি গোচরঃ॥ ২৮॥ ঐ ১১।১৮॥

"জ্ঞানবান বিরক্ত অথবা আমার নিষ্কাম ভক্ত ত্রিদণ্ডাদি আশ্রম চিহ্ন ত্যাগ করত শাস্ত্র বিধিতে নিরপেক্ষ হইয়া কর্ম্মাচরণ করিবেন।" রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। শাস্ত্র অতিক্রম করার জন্য কোন দোষ হবে না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলেছিলেন—

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেবচ॥ ১৪॥

মামেক মেব শরণ মাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়াস্থা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ১৫॥

—শ্রীমদ্ভা-১১।১২

—অতএব হে উদ্ধব, তুমি শ্রুতি স্মৃতি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রোতব্য শ্রুত সমস্তবিষয় বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদেহীর শরণ্য পরমাত্মা আমার শরণ লও। আমার দ্বারা তোমার সকল ভয় দূরীভূত হইবে। রাম রাম রাম সীতারাম। অনন্যভাবে ভগবৎ আশ্রয় করেন বলিয়া বৈষ্ণবগণ পঞ্চম-আশ্রমী অথবা আশ্রমের অতীত। ভগবান রামানন্দস্বামীর শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্করে সন্ন্যাসের কোন কথাই দেখতে পাওয়া যায় না। শ্রীবৈষ্ণবগণ পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হবেন। শ্বেত বহির্বাস, উত্তরীয় ও কৌপীন ধারণ করে কোন পুণ্যক্ষেত্রে কুটীর নির্ম্মাণ করত ভগবানের নামগান, সেবা পূজাপাঠ ধ্যানাদির দ্বারা জীবন অতিবাহিত করবেন এইরূপ দেখা যায়। চরমে রামানন্দীয় বৈষ্ণবগণ কোমরে মুঞ্জমেখলা ও কলার পেটোর কৌপীন গ্রহণ করে ভগবদ্ভজন করতে থাকেন দেখা যায়।— রাম রাম সীতারাম।

হলধর। রামানন্দ সম্প্রদায়ের ত্যাগী বৈষ্ণবগণের নাম কি—?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। বিরক্ত বৈষ্ণব। রাম রাম রাম। কূর্ম্ম-পুরাণে জ্ঞান সন্ন্যাসী বেদ সন্ন্যাসী ও কর্ম্ম সন্ন্যাসীর কথা আছে। তার মধ্যে—
"ত্রয়াণামপি চৈতেষাং যোগীতেভ্যোঽধিকোমতঃ। ন তস্য বিদ্যতে কার্য্যং ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ"॥ ৯

এই তিন প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে যোগী হলেন শ্রেষ্ঠ—সেই বিদ্বান যোগীর কোন কার্য্য বা আশ্রমের চিহ্ন থাকবে না। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। তাহ'লে "যোগী"র কোন আশ্রমের চিহ্ন থাকে না?

ক্ষেপা। জয় জয় রাম :—না, সীতারাম! কোন কোন যোগী আশ্রমের চিহ্নও ধারণ করেন।

হলধর। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁদের তো গলায় পৈতা দেখা যায়, ওতো ব্রাহ্মণ বর্ণের চিহ্ন।

ক্ষেপা। সীতারাম রাম রাম পূর্ব্বে উপনয়ন হয়েছে, পৈতা ধারণ করেছেন পৈতা ত্যাগেরও প্রয়োজন বোঝেন না। জড় ভরতেরও পৈতা ছিল। সীতারাম রাম রাম।

হলধর। শ্রুতিতে একথা আছে?

ক্ষেপা। রাম রাম রাম রাম সীতারাম রাম রাম।

যঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিভ্যো বিহীনং সর্ব্বসাক্ষিণম্।
পারমার্থিক বিজ্ঞানং সুখাত্মানং স্বয়ং প্রভম্॥ ৯
পরতত্ত্বং বিজানাতি সোঽতি বর্ণাশ্রমী ভবেৎ।
বর্ণাশ্রমাদয়োদেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ॥ ১০
নাত্মনো বোধরূপস্য মম তে সন্তি সর্ব্বদা।
ইতি যো বেদ বেদান্তৈঃ সোঽতি বর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥ ১১

—'নারদ পরিব্রাজকোপনিষদি ষষ্ঠ উপদেশ।

যিনি শরীর ইন্দ্রিয়-আদি বিহীন, সর্ব্বসাক্ষী, পরমার্থিক বিজ্ঞান, স্বয়ংপ্রভ সুখাত্মা পরতত্ত্বকে জানেন তিনি অতি বর্ণাশ্রমী।

যিনি বেদান্তের দ্বারা বর্ণাশ্রমাদি মায়া কর্ত্তৃক কল্পিত বোধরূপ আত্মা আমার, সে সকল সতত নাই ইহা যিনি জানেন তিনি অতি বর্ণাশ্রমী।

যস্য বর্ণাশ্রমাচারো গলিতঃ স্বাত্মনি স্থিতঃ॥ ১২
যোঽতীত্য স্বাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্।
সোঽতি বর্ণাশ্রমী প্রোক্তঃ সর্ব্ব বেদার্থ বেদিভিঃ॥ ১৩
ন বিধি র্ন নিষেধশ্চ ন বর্জ্জ্যা বর্জকল্পনা।
ব্রহ্ম বিজ্ঞানিনামস্তি তথা নান্যচ্চ নারদ॥ ১৪ —ঐ

—যাঁর স্বীয় আত্মদর্শন হেতু বর্ণাশ্রম আচার গলিত হয়ে গেছে তিনি সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম অতিক্রম করে স্বকীয় আত্মায় অবস্থান করেন তিনি অতি বর্ণাশ্রমী।

যে পুরুষ স্বীয় বর্ণ ও আশ্রম উল্লঙ্ঘন করত আত্মাতেই স্থিত সমস্ত বেদবিদ্‌গণ তাঁকে অতি বর্ণাশ্রমী বলেন। ব্রহ্ম বিজ্ঞানীগণের বিধি-নিষেধ ত্যাজ্য-গ্রাহ্যের কোন কল্পনা (আরোপ) নাই কিন্তু অন্যের আছে। রাম রাম সীতারাম সীতারাম।

হলধর। আত্মদর্শন হলে বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম চলে যায়, আত্মদর্শন মানে কি?

ক্ষেপা। রাম রাম. ভগবৎ সাক্ষাৎকার, রাম রাম সীতারাম।

হলধর। এযুগে মানুষ ভগবানকে দেখ্‌তে পায়?

ক্ষেপা। রাম রাম, নিশ্চয়ই পায়। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কেউ লোকশিক্ষার জন্য বর্ণাশ্রমের অভিনয় করেন, কেউ বা করেন না।

হলধর। ব্রহ্ম বিজ্ঞানী মনে কি—?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, "ব্রহ্মাস্মি" ব্রহ্ম আমি এটা মুখে নয় সাধনার

দ্বারা যাঁরা প্রত্যক্ষ অনুভব করতে পারেন, তাঁরা ব্রহ্ম বিজ্ঞানী। রাম রাম রাম, ব্রহ্ম বিজ্ঞানী বা ঈশ্বর দর্শনকারীর কর্ম্ম ত্যাগ করতে হয়না, আপনা আপনি কর্ম্ম গলে যায়। রাম রাম রাম রাম।

হলধর। ভগবান্ স্বপ্নের মত একবার দেখা দিয়ে চলে গেলেন, আর বর্ণাশ্রম চলে গেল, ভগবদ্ দর্শনকারীর আর কোন চিহ্ন থাকে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম! ভগবানকে দেখার পর "রাম কৃষ্ণ" আদি মন্ত্র তিনি নিয়ে যান, ভক্তের অন্তরে সতত জ্যোতির্ম্ময় ওঙ্কার, কত অরবের রবে গান শুনাতে থাকেন, সুষুম্নাদ্বার মুক্ত হয়ে যায়, কোন কর্ম্ম করবার শক্তি থাকেনা। রাম রাম রাম রাম জয় রাম।

হলধর। সব কাজ করতে পারেন, কথা কইতে পারেন, আর সন্ধ্যাহ্নিক চলে যায়—কি ক্ষেপা বাবা! তাঁরা কি সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা পাঠ করতে গেলে অজ্ঞান হয়ে যান?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। না, যেমন "ভূর্ভুব স্ব" বলেন অমনি প্রাণ সুষুম্নায় ডুব্ মারে। স্ব অ......এই নাগাড় ১০ মিনিট ২০ মিনিট একঘণ্টা দুঘণ্টা ......চলতে থাকে, ভক্ত তখন চোখবুজে নীরব হয়ে থাকেন, সাধারণ লোকে বলে সমাধি হয়েছে, কিন্তু তা নয়, প্রাণের সুষুম্না প্রবেশে কখন কখনও মন লয়ে সমাধি হয়। কখনও কখনও ভগবৎ প্রসঙ্গে অশ্রুপুলকময় ভাব সমাধিও হয়। কখনও কখনও অন্তরে বাহিরে জ্যোতি খেলা করে। রাম রাম রাম সীতারাম।

আদ্য জ্ঞানোদয়ে কাম্যকর্ম্মত্যাগ উদীর্য্যতে।
দ্বিতীয়ে সম্যগ্ জ্ঞানেতু নৈমিত্তিক নিরাকৃতিঃ॥
তৃতীয়ে পূর্ণজ্ঞানে তু নিত্যকর্ম্ম নিরাকৃতিঃ।
চতুর্থাদ্বৈত বোধেতু সোঽতি বর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥

—(গু, তত্ত্ব, ধ্, সূর্য্যগীতা)

প্রথমে জ্ঞানের প্রকাশে কাম্যকর্ম্ম চলে যায়, তিনি আর অর্থাদির জন্য পূজা-জপাদি করেন না। দ্বিতীয় সম্যক্‌জ্ঞানে পুত্রের জাত কর্ম্ম উপনয়ন শ্রাদ্ধাদি, কর্ম্ম চলে যায়, তৃতীয়ে পূর্ণজ্ঞান হলে সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতির অবসান হয়। তারপর অদ্বৈতজ্ঞান হলে জ্ঞানী অতি বর্ণাশ্রমী হন। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। জ্ঞানের চারটা অবস্থা কি করে বোঝা যায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম।

প্রণবঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠেৎ সর্ব্বজীবেষু ভোগতঃ।
অভিরামস্তু সর্ব্বাসু হ্যবস্থাসু হ্যধোমুখঃ॥

—(যোগ চূড়ামণি উপনিষদ)।

প্রণব রমণীয় হলেও সর্ব্বজীবে ভোগকালে সকল অবস্থাতেই অধোমুখে (অপ্রকাশিত ভাবে) থাকেন, তারপর অকারে ব্রহ্ম, উকারে হরি, মকারে রুদ্র লীন হলে প্রণবের প্রকাশ হয়, 'প্রণবোহি প্রকাশতে।'

জ্ঞানিনা মূর্দ্ধগো ভূয়াদজ্ঞানে স্যাদধোমুখঃ। ৭৮।
এবং হি প্রণব তিষ্ঠেৎ যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
অনাহত স্বরূপেণ জ্ঞানিনা মূর্দ্ধগো ভবেৎ॥ ৭৯॥

—জ্ঞানিগণের ঊর্দ্ধগত হন অজ্ঞানীর অধোমুখে থাকেন। এরূপ প্রণবের স্থিতি যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ। অনাহত স্বরূপে জ্ঞানিগণের ঊর্দ্ধগত হন। যেমন যেমন তিনি উপরে উঠতে থাকেন তেমন তেমন কর্ম্ম গলতে থাকে। 'প্রাণই' প্রণব, প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করলে, কর্ম্মের নিবৃত্তি হতে থাকে।

তৈলধারা মিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টা নিনাদ বৎ।
প্রণবস্য ধ্বনি স্তদ্বত্তদগ্র ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥ ৮০ ॥

—তৈল ধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন অখণ্ড দীর্ঘ ঘণ্টাধ্বনির মত প্রণবের ধ্বনি তার অগ্রভাগ অর্থাৎ প্রণব যেখানে লয় হয় সেখানে জ্যোতির আবির্ভাব হয়। জ্যোতির্ম্ময় তার অগ্রভাগ, তাহা অনির্ব্বচনীয়—যে মহাত্মাগণ সূক্ষ্মবুদ্ধির দ্বারা তা দর্শন করেন তাঁরাই প্রকৃত বেদজ্ঞ। রাম রাম রাম রাম, ওঙ্কার ঠেলে ওঠেন, যখন প্রণব ধনুতে আত্মাশর যোজনা করে ব্রহ্মলক্ষ্যে জ্ঞানী ত্যাগ করেন তখন আত্মা মন্‌ম্ হসন্ত মকারের সাহায্যে মাথায় ঠেলে উঠে ব্রহ্মে শরের ন্যায় একীভূত হয়ে যান। ব্যস্, সর্ব্ব কর্ম্মের ছুটী, রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। এসব বেশ বুঝতে পারা যায়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। স্বপ্রকাশ সূর্য্যের মত প্রণবের উত্থান নাদরূপ পরিগ্রহ, ব্রহ্মে সম্মিলন সব সাধক প্রত্যক্ষ করেন, সকল কর্ম্মের ছুটী হয়ে যায়। রাম রাম জয় জয় রাম।

হলধর। এসব যোগিদের হয়, ভক্তদেরও কর্ম্মের ছুটী হয়?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম বৈখরী থেকে মধ্যমায় পৌঁছুলে অর্থাৎ অনাহত নাদ আরম্ভ হলেই সবাই যোগী হয়ে যান, যোগী নন কে, শিব নারদ শুক সকলেই যোগী, সীতারাম।

মৎ প্রসাদাদ্ বিশুদ্ধানাং দুঃখমাশ্রম রক্ষণম্।
ন বিধির্ন নিষেধশ্চ তেষাং মম যথা তথা॥

—(শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতা)

শিব বলছেন আমার প্রসাদজ ভক্তিতে যারা বিশুদ্ধ হয়েছে তাদের পক্ষে আশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করা কষ্টকর। আমার মত তাদের বিধি নিষেধ নাই। জয় রাম সীতারাম সীতারাম, কোনরকমে রাম রাম করে মন্ত্র শেষ করতে পারলে প্রণবের আবির্ভাবে কেল্লাফতে সীতারাম, আরও শুনবে সীতারাম?

অধ্যাত্ম বিদ্যাহি নৃণাং সৌখ্যমোক্ষকরী ভবেৎ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম তথা জপ্যম্ এতৎ সর্ব্বং নিবর্ত্ততে॥

—(জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্রে)।

—অধ্যাত্ম বিদ্যা অনন্ত সুখ ও মুক্তি প্রদান করে, তা লাভ হলে ধর্ম্ম কর্ম্ম জপ প্রভৃতি সব খসে পড়ে যায়, রাম রাম সীতারাম।

হলধর। আপনা আপনি খসবার আগে যদি কেউ জোর করে খসায়?

ক্ষেপা। রাম রাম রাম রাম, সেই সাজা জ্ঞানীর সাজার আর বাকী থাকে না, কখন টাকা টাকা করে টাকার পেছুনে, কখন কামিনীর পেছুতে, কখন প্রতিষ্ঠার পেছুনে কুকুরের মত ছুট্‌তে থাকেন, তাঁদের দুঃখে শেয়াল কুকুরও কাঁদতে থাকে।। ত্যাগ—ত্যাগ—ত্যাগের মধ্যে ভোগ্ থাক্‌তে পারে না। রাম রাম সীতারাম। তবে যাঁদের প্রারব্ধে ভোগ আছে ভোগ এসে পড়ে, অব্যাকুলভাবে ভোগ করে যান্, হৃদয়ে কোন তরঙ্গ উঠে না।

হলধর। তাহ'লে কর্ম্মত্যাগ করতে হয় না—?

ক্ষেপা। রাম রাম রাম সীতারাম, শুধু অর্জ্জন করে যাও, বর্জ্জনের চেষ্টা কর্‌তে হবে না, আপনা-আপনি বর্জ্জন হয়ে যাবে। বর্ণ-আশ্রম কোথায় দিয়ে কেমন করে গলে পড়ে যাবে ভক্ত তা টেরও পাবে না।

যস্য বর্ণাশ্রমাচারাঃ সুপ্তহস্তস্থ পুষ্পবৎ।
গলিতঃ স্বয়মেবাত্র বিদেহো মুক্ত এব সঃ॥

—(গু, ধৃ, বশিষ্ঠকৃত তত্ত্বপারায়ণান্তর্গত রামগীতা)

—নিদ্রিত ব্যক্তির হস্তস্থিত পুষ্প যেমন স্বতঃই পড়ে যায়, তদ্রূপ যাঁর বর্ণাশ্রম বিহিত আচার আপনা আপনি ছেড়ে যায় তিনি বিদেহ মুক্ত। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। এখন তাহলে সবাই বিদেহমুক্ত!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম। কালক্রমে এখনকার বহির্মুখ লোকের

বর্ণাশ্রম গলেনি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে সমতা-উদারতা দেখাতে গিয়ে বেচারাদের দুর্গতির সীমা নাই। রোগে শোকে অভাবে জ্বালা যন্ত্রণায় পারিবারিক অশান্তিতে মনের উদ্দণ্ড নৃত্যে বেচারারা ছুটে বেড়াচ্ছে। আরে, যে শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে তাকে শাস্তি দেবে কে—সে শান্তি পেতে পারেনা—পারেনা! রাম রাম রাম সীতারাম।

হলধর। এখন শাস্ত্রবিধি পালন করাও তো কঠিন।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, একথা খুব সত্য রাম রাম। শুদ্ধ আহার সৎসঙ্গ সন্ধ্যা গায়ত্রী ধরে থাকলেও মূলকেন্দ্রে পহুঁছিতে দেরী হবে না। সকল সাধনার সার ব্রহ্মচর্য্য, সেটী প্রাণপণে রক্ষা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে হবে, রাম রাম রাম রাম।

হলধর। ঐখানেই যত গোলমাল, ইচ্ছা কর্‌লেও যে রাখ্‌তে পারা যায় না ক্ষেপা বাবা।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, কেবল রাম রাম কর্‌লে রাম ব্যবস্থা করে দিবেন। রাম রাম।

হলধর। আচ্ছা ক্ষেপাবাবা, যাঁরা অতিবর্ণাশ্রমী, যাঁদের সব কাজ মিটে গেছে তাঁরা গিরিগুহায় থাকেন, বাইরে আসেন না তো?

ক্ষেপা। প্রারব্ধ অনুসারে কেউ গিরিগুহায় থাকেন, কেউ নানারকম বেশধরে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান। ক্বচিৎ দুষ্ট ক্বচিৎ শিষ্ট নানা সাজে খেলা করে বেড়ান কেউবা ধর্ম্ম প্রচার করেন, রাম রাম রাম।

হলধর। তাতে তাঁদের অধঃপাত হয় না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম রাম রাম জয় রাম। না সীতারাম, তাঁদের লীলা বোঝা ভার,

কশ্চিৎ গিরি গুহাগেহঃ কশ্চিৎ পুণ্যাশ্রমাশ্রয়ঃ।
কশ্চিৎ গৃহস্থ আশ্রমবান্ কশ্চিৎ বহু রটনস্থিতঃ॥
কশ্চিৎ মৌন ব্রতধরঃ কশ্চিদ্ ধ্যান পরায়ণঃ।
কশ্চিৎ শিল্পকলাজীবী কশ্চিৎ পামর রূপভৃৎ॥

—(গুরু ধ্রু, যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বাণ উত্তরভাগ ১০২ সর্গে)।

— কেউ গুহায় থাকে, কেউ পুণ্যাশ্রমে থাকে, কেউ গৃহী, কেউ কেবল ঘুরে বেড়ায়, কেউ মৌনী, কেউ ধ্যান পরায়ণ কেউ শিল্পাদির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জনকারী, কেউ বা পামরের মত আচরণকারী, রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হলধর। ও বাবা, তাহ'লে মুক্ত পুরুষদের চেন্‌বার উপায় নেই। আচ্ছা যারা পুণ্য কর্ম্ম করেন তাঁদের বন্ধন হয় না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, না সীতারাম!

সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
ন পুণ্যেন ন পাপেন নেতরেণচ লিপ্যতে॥ ৯৭॥
স্ফটিকঃ প্রতিবিম্বেন যথা নায়াতি রঞ্জনম্
তজ্জ্ঞঃ কর্ম্ম ফলেনান্ত তথা নায়াতি রঞ্জনম্॥ ৯৮॥
বিহরণ্ জনতাবৃন্দে দেবকীর্ত্তন পূজনৈঃ।
খেদাহ্লাদৌ ন জানাতি প্রতিবিম্ব গতৈরিব॥ ৯৯॥

— অন্নপূর্ণোপনিষদি।

সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী নিত্যতৃপ্ত নিরাশ্রয় পুণ্য পাপ বা অন্য কিছুতে লিপ্ত হয় না। স্ফটিকে জবা পুষ্পাদির ছায়া পড়্লেও স্ফটিক যেমন তাতে একবারে রঞ্জিত হয় না, জবা সরিয়ে নিলে আর কোন চিহ্ন থাকে না, তদ্রূপ জ্ঞানী অন্তরে কর্ম্মফলে লিপ্ত হন্ না। বহু জনতার মধ্যে দেবপূজা কীর্ত্তন করে, পরিভ্রমণ করে বেড়ালেও প্রতিবিম্বের মত খেদ-আহ্লাদ তিনি জান্তে পারেন না। রাম রাম রাম সীতারাম। রাম রাম।

হল। তাহলে জ্ঞানী জনতার মধ্যেও থাকতে পারেন?

ক্ষেপা। রাম রাম রাম সীতারাম। দুধ থেকে মাখম তুলে নিলে যেমন, মাখম আর দুধে মেশে না। পরশ পাথর ঠেকে লোহা সোনা হলে তাকে ঠাকুরঘরে, আঁস্তাকুড়ে, ছায়ের গাদায়, অগ্নিকুণ্ডে, জলের ভিতর যেখানেই কেন রাখ না সে যেমন আর লোহা হয় না সোনাই থাকে, যতক্ষণ না ধোয়া হয় ততক্ষণ গায়ে হয়ত একটু কাদা লেগে থাকে, কিন্তু সে আর লোহা হয় না, তেমনি ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হলে আর তার পতনের আশঙ্কা থাকে না। ভগবান্ বলেছেন—

'হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।'

—এই সমস্ত লোককে হত্যা কর্লেও তিনি হত্যা করেন না। বদ্ধ হন না। রাম রাম সীতারাম। জয় জয় রাম সীতারাম।

হল। তাই তো ক্ষেপাবাবা! আমি তো ষাঁড়ের গোবর, কোন কিছুই কর্লাম না। জ্ঞান, ভক্তি কাকে বলে তাও জানিনে, দিনে দিনে দিন ঘুনিয়ে আসছে যেতে হবে—তার উপায় কি হবে ক্ষেপাবাবা?

ক্ষেপা। রাম রাম জয় জয় রাম, আরে সীতারাম, এ যুগে আবার যাওয়ার ভাবনা!

প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যে যুগে প্রচার ॥

কেবল রাম রাম কর। নেচে নেচে কীর্ত্তন কর, কীর্ত্তন করাও, ব্যস্! একেবারে আনন্দরাজ্যে গিয়ে পড়বে। আমার প্রেমের ঠাকুর বলেছেন—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই তো সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।

উঠ্‌তে বস্‌তে খেতে শুতে চালাও নাম—বংশীওয়ালা স্থির থাকতে পারবেন না—ভিতর থেকে বাঁশী বাজাতে সুরু করে দিবেন। রাম রাম। সীতারাম। আমার কবি সম্রাটের একটী মিষ্টি গান শুন—

তোমারি নাম বলব আমি বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে ॥
বলবো বিনা ভাষায় বলবো বিনা আশায়।
বলবো মুখের হাসি দিয়ে বলবো চোখের জলে।
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাক্‌বো তোমার নাম।
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে ডাকে নামের নেশায় ডাকে
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে ॥

—(রবীন্দ্রনাথ)

রাম রাম সীতারাম জয় রাম সীতারাম।

—০—

শ্রীমদ্ভাগবত ও অদ্বৈততত্ত্ব

[শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম, বেদান্তবাচস্পতি
এম্-এ, পি এইচ-ডি, পি-আর-এস]

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের ব্যাখ্যাতাগণ অধিকাংশ সময়ে অদ্বৈয়তত্ত্বের সহিত বিশেষ করিয়া ঐ মহাপুরাণের ব্যাখ্যা করেন। ইহা অতীব অন্যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, অন্ত ও মধ্য অদ্বয়তত্ত্বের কথায় পরিপূর্ণ। ইহার উপক্রম ও উপসংহারে অদ্বয়তত্ত্বই দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং ইহার তাৎপর্য্য যে অদ্বয়তত্ত্বে পরিমিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই মহাপুরাণের প্রথম শ্লোকেই মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে সেই পরম পুরুষ সত্যস্বরূপ অদ্বয় জ্ঞানকে স্মরণ করিয়া। যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর অধিষ্ঠানরূপে মিথ্যা বস্তুর আশ্রয় হওয়ায় মিথ্যা বস্তুও সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়, যাঁহার সহিত বাস্তবিক সম্বন্ধ নাই বলিয়া তদ্ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা, যাঁহার স্বীয় মহিমায় সমস্ত কুহক অর্থাৎ মায়া নিরস্ত হইয়া যায়, যাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি, যাঁহাতে জগতের স্থিতি এবং যাঁহাতে জগতের লয় হয়, যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান পরম সত্যকে ধ্যান করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মস্বরূপই যে এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে মায়া প্রভাবে অবস্তুও বস্তু বলিয়া বোধ হয়, যে মায়া প্রভাবে মিথ্যাও সত্য বলিয়া ভাসমান হয়, যে মায়া ব্রহ্মের স্বীয় মহিমাময় নিত্য অসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অধিষ্ঠানসত্তার সত্যতার জন্য যে মায়ার মিথ্যা সৃষ্টিও সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেই মায়ার অতীত পরম সত্য পরম তত্ত্বকে স্মরণ করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য, মায়াসৃষ্ট ত্রিমার্গ মিথ্যা, 'তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো', এই সব কথার দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে অদ্বৈত বেদান্ত প্রতিপাদিত তত্ত্বের আলোচনাই গ্রন্থকারের ঈপ্সিত। দ্বাদশস্কন্ধে "ব্রহ্মোপদেশ" নামক পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্।
এবং সমীক্ষ্য চাত্মানমাত্মন্যাধায় নিষ্কলে॥
দশন্তং তক্ষকং পাদে লেলিহানং বিষাননৈঃ।
ন দ্রক্ষ্যসি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ॥

"আমি পরম ধাম ব্রহ্মস্বরূপ, পরমপাদ ব্রহ্মও আমি। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিষ্কল নিরংশ ব্রহ্মে আত্মাকে যোজনা কর। তখন বিষমুখ তক্ষক ওষ্ঠপ্রান্ত দ্বারা লেহন করিতে থাকিলেও দেখিবে নিজ শরীর এমন কি সমগ্র বিশ্বও আত্মা হইতে পৃথক্ নহে।"

"অহং ব্রহ্মাসি"—এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভূত হইলে মৃত্যু অসম্ভব। জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত অভিন্নবোধ হইলে আর জীবাত্মার ধ্বংস বা মৃত্যু কিরূপে হইবে? এই ব্রহ্মাত্মৈক্যই শ্রীশুকদেবের মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি চরম ও পরম উপদেশ। ইহাই বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বয়জ্ঞান। মহারাজ পরীক্ষিত বলিতেছেন—

ভগবংস্তক্ষকাদিভ্যো মৃত্যুভ্যো বিভেম্যহম্।
প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণমভয়ং দর্শিতং ত্বয়া॥

"হে ভগবন্, আপনি আমাকে অভয়পদ দর্শন করাইয়াছেন। আমি ব্রহ্মনির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইয়াছি, আমি আর তক্ষকাদি মৃত্যুর কারণ হইতে ভয় করি না।"

বেদান্ত প্রতিপাদ্য অভয়পদ মহারাজ পরীক্ষিত প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাপত্রয়ের উন্মূলন শিবদ পরম বেদ্য যে জ্ঞান, পরম নির্মৎসর পরমহংসদের সেবিত যে পরম জ্ঞান, তাহা মহারাজ পরীক্ষিত লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

অজ্ঞানঞ্চ নিরস্তং মে জ্ঞান বিজ্ঞান নিষ্ঠয়া।
ভবতা দর্শিতং ক্ষেমং পরং ভগবতঃ পদম্॥

"জ্ঞান-বিজ্ঞাননিষ্ঠর দ্বারা আমার অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে। আপনি আমাকে পরম মঙ্গলস্বরূপ ভগবানের পরমপদ দর্শন করাইয়াছেন।"

ইহার পর অনুজ্ঞা লইয়া মহারাজ পরীক্ষিত সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযম করিয়া মনকে পরমাত্মাতে যোজনা করিয়া বৃক্ষের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং নিঃসঙ্গ ও নিঃসন্দেহ হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলেন।

তত্ত্ব কি বলিতে যাইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—

বদন্তিতত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১।২।১১

"তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অদ্বৈতজ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌ও বলা হয়।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত কোনও বিরোধ করেন না। তত্ত্বতঃ তিনি অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহাকে উপনিষদে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, হিরণ্যগর্ভ উপাসকেরা পরমাত্মা বলিয়াছেন, সাত্বতেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের কোথাও জ্ঞান ও ভক্তিতে বিরোধ করেন নাই। বিচারাত্মক জ্ঞানের সহিত ভক্তির বিরোধ থাকিলেও অনুভূতিরূপ যে জ্ঞান তাহার সহিত ভক্তির কোনও বিরোধ নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রণেতা বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে পরম জ্ঞান এবং পরম ভক্তির কোনও বিরোধ আসিতে পারে না। শ্রীমদ্‌ভাগবতে অদ্বৈতজ্ঞানের কথা এবং মাহাত্ম্য অনেক বলা হইয়াছে। কি করিয়া যে ভাগবত পাঠকেরা শ্রীমদ্‌ভাগবতকে আশ্রয় করিয়া অদ্বৈত জ্ঞানবাদের নিন্দা করেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। সাম্প্রদায়িকতাই এ বিষয়ে মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতকে বেদান্তের ভাষ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপসংহারে এই কথা বলা হইয়াছে—

> সর্ব্ব বেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্ব লক্ষণম্।
> বস্তুদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্॥ ১২।১৩।১২
> সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
> তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥ ১২।১৩।১৫

"সর্ব্ববেদান্তসার যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বস্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু তাহাই এই পুরাণের বিষয় এবং কৈবল্যলাভই ইহার একমাত্র প্রয়োজন। এই শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্ব্ব বেদান্তের সার, যে ব্যক্তি ইহার রসামৃতে তৃপ্ত, তাঁহার আর কখনও অন্য কোন শাস্ত্রে প্রীতি হয় না।" এখানে কোনও সন্দেহের অবসর নাই। ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য—"ব্রহ্মাত্মৈকত্ব"—ইহাই অদ্বৈত বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের আদি, মধ্য ও অবসানে জ্ঞানের নিত্য সহচর বৈরাগ্যের কথায় পরিপূর্ণ। ইহাতে যেমন শ্রীহরির লীলাকথামৃতের প্রাচুর্য্য, তেমনই ইহা বৈরাগ্যের আঘ্রাণে পরিপূর্ণ। ইহা যেমন জ্ঞানের পরিপোষক তেমনই ইহা ভক্তির উদ্দীপক। জ্ঞান ও ভক্তির এমন সুন্দর সমন্বয় গ্রন্থ বিরল। ভক্তিবাদী পাঠকদের যদি জ্ঞানমার্গের সহিত বিরোধ করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে একদেশদর্শি গ্রন্থের আশ্রয়ে তাহা করা উচিত, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় উদার সমন্বয় গ্রন্থ আশ্রয়ে বিরোধের সৃষ্টি করতে গেলে ঐ উদ্যম সর্ব্বথা বিফল হইবে।

শ্রীহরির লীলাকথামৃতে আত্মারাম নির্গ্রন্থ মুনিরাও আনন্দ উপভোগ করিয়া নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। ভক্তিতে ও জ্ঞানে বিরোধ থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না। সন্ন্যাসীচূড়ামণি বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতী

"অদ্বৈত সিদ্ধি" ও "ভক্তিরসায়ণ" উভয় গ্রন্থই রচনা করেছেন। "অদ্বৈত সিদ্ধি" জ্ঞানমার্গের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। "ভক্তিরসায়ণ" পরম উপাদেয় ভক্তি সিদ্ধান্ত সমন্বিত গ্রন্থ। মহর্ষি বেদব্যাস ভক্তি ও জ্ঞানের বিরোধ দেখেন নাই। শ্রীল শ্রীশুকদেব ও মহারাজ পরীক্ষিত বিরোধ দেখেন নাই পরম জ্ঞানী মধুসূদন সরস্বতীপাদ বিরোধ দেখেন নাই। আমরা বিরোধ দেখলে তাহা আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির দোষ নয় কি?

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু ও তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে যেমন কাশী, তেমনি পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্-ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আসুন, আমরা শ্রীমদ্ভাগবতাশ্রয়ে গঙ্গাস্নান করিয়া নিষ্পাপ হই, কাশীক্ষেত্রে বাস করিয়া অমল জ্ঞানলাভ করি এবং অচ্যুতের প্রসঙ্গ করিয়া বিষ্ণু প্রসাদ লাভ করি।

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্ বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃন্বন্ বিপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে পরমহংসপ্রাপ্য নির্ম্মল অদ্বিতীয় পরমজ্ঞান গীত হইয়াছে এবং জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির সহিত নৈষ্কর্ম্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আসুন, আমরা সেই "শুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি"। আমরা যে পরম সত্যকে ধ্যান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলাম সেই শুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অমৃত, পরম সত্যকে ধ্যান করিয়া আলোচনা সমাপ্ত করি।

নাম সংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্ব পাপ প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥

যাঁহার নামসঙ্কীর্ত্তনে সর্ব্ব পাপ বিদূরিত হয় এবং যাঁহাকে প্রণাম করিলে সর্ব্বদুঃখ প্রশমিত হয়, সেই পরমতত্ত্ব শ্রীহরিকে প্রণাম করি।

—০—

৯৬৪। মাটীর দিকে দেখে পা রাখ্‌বে, জলকে কাপড়ের দ্বারা ছেঁকে খাবে, বাণীকে সত্যের দ্বারা পবিত্র করে বল্‌বে এবং মনে বিচার করে যা উত্তম প্রতীত হবে তাই কর্‌বে।

৯৬৫। মনকে সৎপথে নিয়ে যাবার প্রথম সাধন "সত্য", দ্বিতীয় সংসার হতে উপরম, তৃতীয় আচরণের উচ্চতা এবং পবিত্রতা, চতুর্থ আপনার অপরাধ-সমূহের জন্য প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৯৬৬। কখন চরিত্র হতে স্খলিত না হওয়া উচিত। পতনে গৌরব নাই। পতিত অবস্থায় বার বার উঠে খাড়া হও এতে পরম গৌরব আছে।

৯৬৭। যেমন ঔষধ ব্যতীত রোগ সহ্য করা কঠিন ঐ প্রকার জ্ঞান বিনা সাংসারিক প্রভুতাকে সামলানো দুঃসাধ্য। মনুষ্য চারদিকে অজ্ঞানের দ্বারা ঘেরা আছে এইজন্য সে ভোগ-লালসায় পড়ে যায়।

৯৬৮। কোন বস্তুর দ্বারা ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হয়ো না। কাজ ঐ প্রকার নির্লিপ্তভাবে করো যেরূপ বৈদ্য আপনার রোগীগণের চিকিৎসা করেন এবং রোগকে আপনার নিকটে আসতে দেন না। সব ঝঞ্ঝাট হতে মুক্ত অথবা—সাক্ষীভাবে কাজ করো। স্বতন্ত্র থাকো।

৯৬৯। যখন দেহ থেকে শ্বাস চলে যাবে তখন অনুতাপ কর্‌তে থাক্‌বে। এজন্য যতক্ষণ পর্যান্ত শরীরে শ্বাস আছে সে পর্য্যন্ত রামকে স্মরণ করে তাঁর গুণ গেয়ে নাও।

৯৭০। ক্ষণিক দেহের অতি সামান্য জিবের স্বাদের জন্য জীবসকলকে হত্যা করা বড় নৃশংসতা। আপনার পেটকে জন্তুগণের কবর করা আর প্রভুকে নিরাদর করা সমান কথা।

৯৭১। একটী পিপীলিকাকেও দুঃখ দিও না কেন না সেও জীবনধারণকারী, আর আপনার জীবন সকলেরই প্রিয়।

৯৭২। যদি ঘটে প্রেম থাকে তাহলে তার ঢ্যাড্‌রা পিটো না। হৃদয়ের ভাব অন্তর্যামী জ্ঞাতই আছেন।

৯৭৩। রে মন, তুই বড়ই কঠোর, আমার ভিতর থেকে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ না! সেই সুন্দর শ্যামল রমণীয় রূপ বিনা তুই রাতদিন কেমন করে বেঁচে আছিস।

৯৭৪। তিন বস্তু আছে; তাদের যত বাড়াবে ততই বাড়্‌তে থাক্‌বে; এদের থেকে সাবধান থাক—ক্ষুধা, নিদ্রা আর ভয়।

৯৭৫। ভগবানের অনন্য ভক্তির দ্বারা মানুষ সর্ব্বলোক মহেশ্বর; সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কারী বেদ চতুষ্টয়ের উৎপন্নকারী পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়।

৯৭৬। আমার সদ্‌গুণ আমার সঙ্গে কখনও রোগগ্রস্ত হয় না। কবরেও আমার সহিত পচিতে পারে না।

৯৭৭। যে মনুষ্য মানবজীবনের মূল্য বোঝে না, সে দুঃখী এবং সাধু-পুরুষগণের সেবার মাধুর্য্যের অনুমান কর্‌তে সমর্থ হয় না।

৯৭৮। ঈশ্বরের উপর আপন ইচ্ছা চালিয়ো না, শারীরিক আবশ্যকতা সমূহের সম্বন্ধে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণ হতে দাও, সাংসারিক আবশ্যকতা বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই আপনার ইচ্ছা করে নাও।

৯৭৯। যে মানুষ আপনার সুখের জন্য কোনও প্রাণীকে মারে সে জীবিতকালে এবং মরণের পর কোনস্থানেই সুখ পায় না।

৯৮০। চার অবস্থা (বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ) বৃথা নষ্ট করেছো, এখন যমরাজের সেখানে যম যাতনা সহ্য কর্‌তেই হবে; অনুতাপ কর্‌লে আর কিছুই হবে না।

৯৮১। যে প্রেমের নিয়ম লয় নাই; কামকে জয় করে নাই, আর যে নয়নদুটী দিয়ে অলক্ষ্য পুরুষকে দেখে নাই তার জীবন ব্যর্থ।

৯৮২। বুদ্ধিমান মিত্র; বিদ্বান পুত্র; পতিব্রতা স্ত্রী; দয়ালু মালিক; ভেবে বিচার করে কথনকারী ব্যক্তি এবং বিচার করে কর্ম্মকারী ভৃত্য এই ছয়টীর দ্বারা কোনও হানি হয় না।

৯৮৩। যিনি শ্রীহরির প্রেমরসে উন্মত্ত হয়ে থাকেন তাঁর বিচার খুব গভীর, এইরূপ সাধু ত্রিভুবনের সম্পত্তিকে তৃণের সমান মনে করেন।

৯৮৪। নিরন্তর ভগবৎতত্ত্বের চিন্তা করো, নশ্বর ধনের চিন্তা ছাড়ো, দেখো সংসার ব্যাধিরূপ সর্পের দ্বারা দষ্ট হয়ে আছে—আর সব লোক শোকে পীড়িত হয়ে আছে।

৯৮৫। দান, পশ্চাত্তাপ, সন্তোষ, সংযম, দীনতা, সত্য এবং দয়া এই সাতটী বৈকুণ্ঠের দ্বার।

৯৮৬। ভগবদ্ভজনে অপরকে নিন্দা করা ও ভক্তগণের প্রতি দ্বেষভাব রাখা মহাপাপ। যে অভক্ত তাকে উপেক্ষা করো, তার সম্বন্ধে কিছু চিন্তাই

ক'রো না, তার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধই রেখো না। যিনি ভগবদ্ভক্ত তাঁর চরণরজকে আপনার মস্তকের ভূষণ মনে ক'রো। তাকে আপনার শরীরের সুন্দর সুগন্ধি অঙ্গরাগ জ্ঞান করে সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক শরীরে মর্দ্দন করো।

৯৮৭। তপস্যার দ্বারা সকল প্রকার সন্তাপ নষ্ট হয়ে থাকে, তপস্যার দ্বারা দুঃখ, ভয়, শোক এবং মনের ক্ষোভ-আদি বিকার দূর হয়ে যায়। তপস্বী ভক্তই যথার্থ ভগবানের নামের অধিকারী।

৯৮৮। ধর্ম্মের নিবাস কোথায়? দূরে নয়! ধর্ম্ম সর্ব্বদা আপনার অন্বেষণকারীর নিকটেই অবস্থান করেন, যে একবারও ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করে তার ধর্ম্ম মিলে যায়। সজ্জন সকলের অপর লোকগণের দোষ সমূহেও ধর্ম্মের দর্শন হয়।

৯৮৯। বিবেক রহিত বৈরাগ্য—হঠকারিতা। কেবল শাব্দিক জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্য নিজেরই ক্ষতি করে। এইজন্য যাতে বিবেক এবং বৈরাগ্য দুইটীই আছে সেই পুরুষ ভাগ্যবান সাধু।

৯৯০। শ্রদ্ধালু মানবের হৃদয় ঈশ্বরের গুণানুবাদ গান শ্রবণের দ্বারা অত্যন্ত পবিত্র হয়ে যান। ভগবচ্চর্চ্চাই তাঁর অন্ন, প্রভুপ্রেম তাঁর শান্তি, হরির স্থানই তাঁর দোকান, ভজন কীর্ত্তন তাঁর ব্যবসায়, ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁর সম্পত্তি, ভূলোক তাঁর খেত জমী, পরলোক তাঁর খামার, প্রভুপ্রাপ্তিই তাঁর পরিশ্রমের ফল।

৯৯১। চলো চলো করে আহ্বান তো সকলে গোলমাল ক'রে কর্‌ছে কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছেছেন এমন লোক বিরল। কেন না এই পথে কনক আর কামিনীর দুই বড় ঘাঁটী আছে।

৯৯২। কারও মনে যদি প্রকৃত প্রেম উৎপন্ন হয় আর তিনি যদি সাধন ভজন কর্‌বার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হন তাহলে সেই পথের নির্দ্দেশক গুরু আপনিই মিলে যায়; তাকে গুরুর খোঁজ কর্‌তে হয় না।

৯৯৩। অত্যন্ত অধিক বল্‌লে ব্যর্থ এবং অসত্য শব্দ বহির্গত হয়, এজন্য কর্ম্মক্ষেত্রে যত কম বল্‌লে কাজ চলে তত কমই বলা উচিত।

৯৯৪। কেবল মুখের দ্বারা জ্ঞান অবধারণকারী পণ্ডিত নন্‌; তিনি তো ঠগ বঞ্চক। পণ্ডিত তো তিনি যিনি জ্ঞানের অনুসারে আচরণ করেন অর্থাৎ যা কিছু বল্‌ছেন তিনি তাহা করেন।

৯৯৫। যা পূর্ব্বে হয়ে গেছে কিম্বা আগে হবে তার চিন্তা ক'রো না, যে সময় তোমার হাতে আছে তাকে উত্তম হতেও উত্তম কাজে লাগাও।

৯৯৬। যে জানে এই মহান্ অজন্মা-আত্মা অজর অমর এবং অভয় তিনি নিশ্চয় ব্রহ্মই হয়ে যান।

৯৯৭। তপ কর্‌লে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়, দান দিলে ঐশ্বর্য্য মিলে, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং তীর্থস্নানে পাপ নষ্ট হয়।

৯৯৮। ভগবানের পবিত্র সুন্দর এবং মনোহর নাম সকলের ও তার অর্থ সমূহের গান আর তাঁর অলৌকিকী লীলাবলী লজ্জা ত্যাগ করে কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে শ্রেষ্ঠ ভক্তের আসক্তি রহিত হয়ে ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করা কর্ত্তব্য।

৯৯৯। ক্রোধ মানুষের ভয়ঙ্কর শত্রু, লোভ অনন্ত রোগ, সকল প্রাণীর হিত করা সাধুতা, আর নির্দ্দয়তাই অসাধুত্ব।

১০০০। যিনি চেতনকে জড় এবং জড়কে চেতন কর্‌তে পারেন এরূপ সমর্থ শ্রীরঘুনাথকে যে জীব ভজনা করে সেই ধন্য।

১০০১। জল উচ্চস্থানে থাকে না সে নিম্নেই দাঁড়ায়, এজন্য যে নীচু হয় সে জল পান করে আর উঁচুর পিপাসাই থেকে যায়।

১০০২। সর্ব্বদা স্মরণের বস্তু তো একই। সদাসর্ব্বদা সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর নাম সকলের স্মরণে প্রাণীমাত্রের কল্যাণ হয়। সতত তাঁর স্মরণ কর্ত্তব্য।

১০০৩। মনে কামনা রেখে ভজন কর্‌লে কেবল তার ফল পাওয়া যায়, পরন্তু নিষ্কাম ভজনের দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। সাংসারিক ফল্‌তো মনুষ্যকে ভগবান থেকে দূরে নিয়ে যায় এজন্য নিষ্কামভাবে ভগবানের ভজন করাই শ্রেষ্ঠ।

—০—

গতি কি হবে ?

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

যিনি অগতির গতি, তিনি ভিন্ন কি মানুষের গতি লাগে ? বিশেষ এই কলিযুগের ? সকল অগতির গতি কি তিনিই ?

নিশ্চয়ই ! তিনি ভিন্ন মানুষের দাঁড়াবার স্থান নাই। এমন করুণা-বরুণালয়, এমন ক্ষমাসার আর কি কেহ আছে ? শত অপরাধ করিয়াও অনুতপ্ত হইয়া যদি কাতর প্রাণে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে অনুভব করিবে একখানি অভয় হস্ত তোমায় আশ্বাস দিতেছেন, ভয় নাই, আমি ক্ষমা করিলাম, তুমি আবার আমার বিধান মত যতদূর পার চলিতে চেষ্টা কর, আমি তোমার

সহায়। তুমি যে আমায় ছাড়িয়া আমার প্রকৃতিতে লুব্ধ হও সেইজন্যইত কষ্ট পাও।

তোমার মধ্যে, শুধু তাই কেন, সকলের মধ্যে আমি আছি এবং আমার প্রকৃতিও আছে। প্রকৃতিতো আপনার কার্য্য করিবেই। প্রকৃতি হইতেছে আমার মায়া। প্রকৃষ্টরূপে কর্ম করেন যিনি তিনিই প্রকৃতি। ইনিই মায়া। ইনি মিথ্যা হইয়াও আমার প্রতিবিম্বপাতে সত্যমত হইয়া সকল জীবের মোহ উৎপাদন করিতেছেন। তুমি আমার দিকে চাহিতে শিক্ষা কর। জ্যোতির্ময় আমি, আমিই তোমাকে ধরা দিবার জন্য মূর্ত্তি ধারণ করি। সর্ব্বব্যাপী শক্তিমান হইয়াও, তোমার ধারণার, তোমার সুবিধার, তোমার ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া আমি তোমার ইষ্ট দেবতা। এই ইষ্ট দেবতাকে চিনাইয়া দেন তোমার গুরু। সকলের ইষ্টদেবতা আমিই—সকলের মধ্যে আমিই আছি। কিন্তু আমাকে দেখাইয়া দেবার জন্য গুরু আবশ্যক। গুরু ভিন্ন কিছু হইবে না। তারপরে আছেন শাস্ত্র। গুরু ও শাস্ত্র তোমার অবলম্বন হউক। যাহারা শাস্ত্র মানে না এবং গুরু মানে না—তাহারা কুপথে চলিয়া অনেক ধাক্কা খাইয়া, অনেক ঠকিয়া যদি পূর্ব্বকৃত সুকৃত থাকে তবে, তবে আমার আশ্রয় পায়, নতুবা যদি খুব শক্ত লোক হয় তবে নানা ফন্দি আঁটিয়া লোক্‌কে হকচকিয়া দিয়া শেষে শেষে আমার কৃপায় বহু দুঃখ পাইয়া পথে ফিরে।

আর যাহারা আমার নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিয়া যায় তাহাদের যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন—আমার আজ্ঞা বলিয়া তাহারা যখন নিত্য কর্ম্ম করিয়া যায়, তখন আমিই অগতির গতি হইয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করি।

তোমার নির্দ্দেশ মত কর্ম্ম ত প্রায়ই হয় না। যথাসময়ে যথাবিধি সকল কর্ম্ম হয় কৈ?

না হউক—তুমি চেষ্টা কর, আমার কাছে প্রার্থনা কর। আমায় ক্ষমা কর, আমি অনেক পাপ করিয়া ফেলিয়াছি, এখনও নিস্তার নাই। আমি কিন্তু আর পাপ করিতে চাই না। সংস্কার যাহা পড়িয়াছে তাহা ত থাকিবেই। আমি কিন্তু উহাতে ব্যাকুল হইয়া যে পুরুষার্থরূপী তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে, সেই পুরুষার্থকে তোমার চরণপ্রান্তে পুনঃ পুনঃ ধরিতে চেষ্টা করিবে—ইহাই আমার একমাত্র কার্য্য। মন যাহা কিছু করিতে চাহিবে তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি তুমি তাহা সৎকার্য্য বল এবং করিতে আজ্ঞা দাও তবে করিব, নতুবা করিব না। যে কার্য্য সম্বন্ধে তুমি আমার মনের ভিতর থাকিয়াই হাঁ না কিছুই বলিবে না তাহাও করিব না। এইভাবে, যে কয়েকটা দিন

আছে, তাহা কাটাইতে চেষ্টা করিব। আমি চেষ্টা করিলে তুমি ত সহায় আছই।

সর্ব্বাপেক্ষা একটা কথা আমার মনে রাখা উচিত। এই কথাটি সহ্য করিবার প্রয়াস। সহ্য আমায় সবই করিতে হইবে। কাহারও সমালোচনায় আমার কোন লাভ নাই। আর সমালোচনা করিলে লোকেই বা তাহা শুনিবে কেন? যে সব লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া নিত্যকর্ম্মগুলি করিতে প্রাণপণ করে, তাহারা যাহা তোমার আজ্ঞার বিরোধী, যাহা তোমার নিষেধ তাহা না করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিবে। দু'চারিবার ঠকিয়াও আবার উঠিতে চেষ্টা করিবে। আহা! কত দয়া তোমার! কত কারুণিক তুমি। শত অপরাধে অপরাধীও যদি আর করিব না বলিয়া ক্ষমা চায় তবে তুমি নিশ্চয়ই তাহার জন্য তোমার ঐ অভয় চরণ বাড়াইয়া দাও। সে আবার আশ্বাস পাইয়া ভাল হইতে চেষ্টা করে।

ভীষণ কাল এই কলিযুগ। কলির ব্রাহ্মণেই যখন অভিশাপগ্রস্ত তখন অন্য লোকের আর কথা কি? অনেক মানুষ অপরাধও বোঝে না—আবার বুঝিয়াও তাহা ছাড়িতে প্রাণপণ করে না। হে করুণবরুণালয়! তোমার শরণাপন্ন যাহাতে সকল মানুষ হইতে পারে তুমি তাহাই করিয়া দাও।

মানুষ যাহা কথা কহিবে, তাহা নিজের মনে মনে হউক বা অন্যের সঙ্গেই হউক তাহা যেন তোমায় জিজ্ঞাসা করিয়া করিবার অভ্যাস করে; সেইরূপ যাহা করিবে তাহা যেন তোমায় জিজ্ঞাসা করিয়া করে। এইরূপ অভ্যাসে চেষ্টা করিলে আর স্মরণ ভুলিয়া মরণ হইবে না। গতি ইহাতেই লাগিবে।

—০—

দোললীলা

[শ্রীঅনিলবরণ কাব্যপুরাণতীর্থ, এম্-এ]

হিন্দুর প্রতিটি উৎসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সহিত সংযুক্ত। বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান তিনটি উৎসব—ঝুলন, রাস ও দোল। প্রত্যেকটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় যে সময় প্রকৃতি আপন সৌন্দর্য্যে শোভাময়ী। প্রকৃতিকে ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া বৈষ্ণবগণ রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। রসের দেবতার ভজনের মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকিবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। সৌন্দর্য্যকে ছাড়িয়া আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না প্রকৃতির অফুরন্ত শোভার মধ্যে ভক্ত দেখিতে পান অখিলরসামৃত মূর্ত্তি।

শীতের রুক্ষতাকে অপসারিত করিয়া বসন্ত আসে প্রকৃতিকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিতে। মৃদুমন্দ মলয় প্রবাহিত—চারিদিকে কুসুমের মেলা। তমাল মৃগমদের ন্যায় গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। "মদন মহীপতি কনকদণ্ডরুচি কেশর কুসুম বিকাশে।" —কেশরকুসুম মদনরাজের সুবর্ণছত্র দণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছে। যুবতীর লজ্জারুণ-রাগ-রঞ্জিত কপোলদেশের ন্যায় পলাশ কুসুম শোভিত কানন বিরহীজনের হৃদয়ে পীড়া দিতেছে। কেতকী কুসুম দিগ্‌বালাদের দশন সদৃশ শোভা পাইতেছে। নবপুষ্পিত বাতাবী তরুগুলি যেন হাস্য করিতেছে। মাধবী পুষ্পের পরিমলে বাতাস আমোদিত। সহকার শিখর মুকুলিত। তন্মধ্যস্থ কোকিলকুল কূজনরত ও ক্রীড়ামত্ত। অলিকুলের গুঞ্জন মুখরিত কুঞ্জ কাননের কি অপূর্ব্ব শোভা! প্রকৃতি যেন নব সাজে সজ্জিতা। নব বসন্তের সবই নূতন।

"নব বৃন্দাবন নবীন লতাগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
নবীন রসাল মুকুলে মধু মাতিয়ে
নব কোকিল কুল গায়।"

"বিহরতি হরি রিহ সরস বসন্তে।"

মধুবনে মাধব বিহার করিতেছেন। হরির অঙ্গ আবীর শোভিত। কুঞ্জবনও

আজ আবীর রঞ্জিত। সেই আবীরের রঙে রাঙা হইয়াই যেন পলাশ প্রস্ফুটিত। শুধু কি তাই? ফুল রাঙা, ভ্রমর রাঙা, আকাশ রাঙা, বাতাস রাঙা।

শীতের শেষে রুক্ষ বেশ ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির নূতন সাজ। সবই নূতন প্রেমের কাছে। তাই প্রেমের রাজ্যে চির-বসন্ত।

নবীন গান, নবীন তান,
নবীন নবীন ধরই মান,
নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি
নবিন নবিন ভাতিয়া॥

দোললীলা হোলি নামে পরিচিত। হোলির প্রধান উপাদান ফাগ। সংস্কৃতে ফল্গু শব্দ আছে। ফাগুয়া, ফাগ হিন্দী শব্দ। রঙের খেলায় মত্ত আজ প্রাণের হরি। এই রঙ কিসের রঙ? শুধু কি বাহিরের রঙ? এই রঙের মধ্যে স্পর্শ পাওয়া যায় না কি প্রাণের ঠাকুরের প্রতি অনুরাগের। আমাদের মনে হয় বাহিরের এই অনুষ্ঠান শুধু অনুষ্ঠান নয়। ইহার মধ্যে আছে এক গূঢ় ঈঙ্গিত। নিছক ফাগ মাখাইয়াই ত প্রাণে তৃপ্তি নাই। নয়নের দেখা রঙ শুধু চোখের সম্মুখে নয় অন্তরে খুঁজিলেও পাইতে পারা যায়।

'প্রেম গোলাল মনহি মন লাগ।' ভক্ত ভগবানের অনুরাগ ভরা দৃষ্টিতে উভয়ে আজ রঞ্জিত। মনের মধ্যে প্রেমের রঙ।

প্রকৃতির এই যে শোভার ঈঙ্গিত ইহা ত ব্যর্থ নয়। এই ঈঙ্গিতের মধ্যে খুঁজিয়া পাইব প্রাণের দেবতা প্রেমের ঠাকুর। এ-জীবনে কি সেদিন আর আসিবে? বিষয়-বাসনা পূর্ণ মনের কোণে দয়াল ঠাকুর এতটুকুও স্থানও কি দিবেন না এই অনুভবের। 'হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু।' চারদিকে এই যে শোভা, এই শোভার মধ্যে শোভাময়ের অনুভবত এই পাষাণ হৃদয়ে ঘটিল না! নব অনুরাগ-আবীরে হৃদয় ত রঞ্জিত হইল না! প্রেম সে ত দূরের কথা। শ্রদ্ধা আসেনা। অথচ তিনি ত দূরে নন। অন্তরের বস্তুকে আঁধারে হারাইয়া অবস্তর মোহে মুগ্ধ হইয়া কি-ই বা উপকার।

বন্ধুয়া আমার হিয়ার মাঝারে
কেহ না দেখিতে পায়?

—০—

যোগ-মার্গ

[অধ্যাপক শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভারতবর্ষের চার্বাক ও বৌদ্ধ দর্শন ব্যতীত সকল দর্শন জীবাত্মার সনাতন সত্তা স্বীকার করে। আত্মবাদী দার্শনিকগণের মতে আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও মুক্ত। কেবল মাত্র অবিদ্যাপ্রসূত কর্মের ফল ভোগের জন্য দেহে আবদ্ধ হইয়া ইহা সংসারে নানা ক্লেশ ভোগ করে। কৃত কর্মের ফল ভোগের জন্য জীব জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে এবং সংসারে বার বার আসিয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। এখন প্রশ্ন হইল মুক্তির উপায় কি ?

আত্মবাদী দার্শনিকগণ নৈরাশ্যবাদী নহেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তিবাদে বিশ্বাসী। তাঁহারা মনে করেন, যেরূপ অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মার বন্ধন হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যা নাশক জ্ঞানের প্রভাবে ইহার মুক্তি। একদিকে যেমন 'বিপর্যয়াৎ বন্ধনম্'। অপরদিকে তেমন 'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ'। জীবগণ ইচ্ছা করিলেই আত্মার স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া শুদ্ধ ও মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন—'আত্মা…শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'। —আত্মার কথা শ্রবণ, মনন ও অনুক্ষণ চিন্তন করিতে হইবে।

'আত্মানং বিদ্ধি' ইহাই সকল আত্মবাদী দর্শনের মূল বাণী। এখন প্রশ্ন হইল এই যে, যদিও আমরা শাস্ত্র প্রমাণ ও অনুমানের সাহায্যে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করিয়া থাকি, তথাপি আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি না। মুক্তির জন্য প্রয়োজন শুধু ধারণা নহে, ইহার জন্য নিদিধ্যাসন বা যোগাভ্যাস একান্ত আবশ্যক। পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে এই যোগাভ্যাসের একটি সুস্পষ্ট কর্মপন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যোগশাস্ত্রকে হিন্দুনীতিশাস্ত্র বলা চলে এবং ইহার প্রভাব সকল আত্মবাদী দর্শনের উপর অতি স্পষ্ট।

পতঞ্জলির মতে যোগ মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। 'যোগশ্চ চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ'। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে জীবের স্বরূপে অবস্থান ঘটিয়া থাকে। 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'। সাংখ্যের বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই তিন তত্ত্ব দ্বারা চিত্ত গঠিত। চিত্তের সহিত আত্মার সংযোগ জীবের বন্ধনের কারণ। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে এই সংযোগ নষ্ট হয় এবং জীব তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মস্থ ও আত্মারাম হইয়া থাকে।

চিত্তের পাঁচটি বৃত্তি রহিয়াছে—'প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ'। এই

বৃত্তিগুলির আবার দুই অবস্থা হইতে পারে—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। —'বৃত্তয়ঃ পঞ্চতব্য ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ'। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পঞ্চ ক্লেশ জীবকে সদা দুঃখ প্রদান করিতেছে। সকল ক্লেশের মূল অবিদ্যা। ইহা নিজেও একটি ক্লেশ এবং অন্যান্য ক্লেশের জনক। এই পঞ্চ ক্লেশের প্রভাবে রজঃ ও তমঃ-প্রধান চিত্তের বৃত্তিগুলি ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে। প্রজ্ঞার প্রভাবে সত্ত্বপ্রধান চিত্তের বৃত্তিগুলি চিত্তকে প্রশান্ত রাখে বলিয়া ইহারা সুখদায়ক। ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, রজস্তমঃলেশহীন সত্ত্ব থাকিতে পারে না বলিয়া চিত্তে অনাবিল সুখ সম্ভব নহে।

চিত্তের পাঁচটি ভূমি বা অবস্থা রহিয়াছে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ—এই পাঁচটি অবস্থা চিত্তের পাঁচটি ভূমি। প্রথম তিনটি ভূমিতে চিত্তে রজঃ বা তমোগুণের প্রাবল্য থাকে বলিয়া এই তিনটি ভূমি যোগ সাধনার উপযোগী নহে। একাগ্রভূমি সত্ত্বপ্রধান চিত্তের প্রশান্ত অবস্থা। কেবল মাত্র এই ভূমিতেই যোগাভ্যাস সম্ভব। নিরুদ্ধ অবস্থা চিত্তবৃত্তির লয়ের অবস্থা। এই অবস্থাতে যোগী পূর্ণ-সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। দেখা যাইতেছে, চিত্ত সত্ত্বপ্রধান না হইলে যোগাভ্যাস নিরর্থক।

যোগ-সাধনার পথ অতি দুর্গম। জগতের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত না হইলে, বিষয়ানুরক্তি না চলিয়া গেলে, এবং একমনে দৃঢ়ভাবে যোগাভ্যাস না করিলে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ সম্ভবপর নহে। 'অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ'—একমাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে। তীব্র-সংবেগানামাসন্নঃ'—যোগ সাধনার জন্য যাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, কেবল-মাত্র তিনি শীঘ্র সমাধিলাভ করিতে পারেন। সমাধি লাভের জন্য যোগশাস্ত্র অষ্টাঙ্গিক-মার্গের উল্লেখ করিয়াছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি লইয়া অষ্টাঙ্গিক যোগপ্রণালী গঠিত। ধারণা ও ধ্যান সমাধির অন্তরঙ্গ এবং অবশিষ্টগুলি ইহার বহিরঙ্গ।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি যম এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ও ঈশ্বর প্রণিধান—এই পাঁচটি নিয়ম। যোগাভ্যাসের জন্য সুস্থদেহ ও প্রশান্ত চিত্তের প্রয়োজন। রুগ্ন ও দুর্বল দেহে যোগ-সাধনার উপযোগী চিত্ত থাকিতে পারে না। ব্যাধি, অকর্মণ্যতা, আলস্য, প্রমাদ প্রভৃতি যোগ-সাধনার অন্তরায়। দেহ সুস্থ ও সবল এবং চিত্ত সত্ত্বপ্রধান ও প্রশান্ত রাখিবার জন্য প্রত্যেক মুমুক্ষু ব্যক্তির সংযমের নিয়ম ও অহিংসা, সত্য প্রভৃতি মহাব্রত পালন অবশ্য কর্তব্য। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও পাপকর্মে

উপেক্ষা চিত্তকে প্রশান্ত রাখে। মুমুক্ষু ব্যক্তির অহিংসা ব্রত অবশ্য পালনীয়। তিনি কাহাকেও হিংসা করিবেন না, সর্বজীবে তাঁহার প্রেম সমভাবে থাকিবে। যিনি প্রকৃত অহিংস, তাঁহার নিকট হিংস্র প্রাণীও হিংসা ত্যাগ করে। তিনি সত্যাশ্রয়ী হইবেন। যিনি সত্যাশ্রয়ী, তিনি বাক্ সিদ্ধি লাভ করেন। অপরের দ্রব্য অপহরণ না করাকে অস্তেয় এবং বিনা প্রয়োজনে কোন দ্রব্য গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ কহে। যাঁহার কোন দ্রব্যের প্রতি লোভ থাকে না, তাঁহার নিকট সর্বরত্নের উপস্থিতি ঘটে। কুপ্রবৃত্তিগুলি দমন করিয়া সংযত জীবন অবশ্য যাপনীয়। কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠায় বীর্য লাভ হইয়া থাকে।

শৌচ ও সন্তোষবিধি পালন করিলে দেহ ও মন পবিত্র থাকে এবং চিত্তে সদা শান্তি বিরাজ করে। সঙ্কল্প সাধনে দৃঢ় থাকা এবং যে কোন কষ্ট স্বীকার করাই তপস্যা। স্বাধ্যায়ের অর্থ ধর্মগ্রন্থ পাঠ। নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পাঠে মুমুক্ষু যোগ-সাধনায় উৎসাহ লাভ করেন। ঈশ্বরে প্রণিধান বা আত্ম সমর্পণ করিলে করুণাময় ঈশ্বর সাধনপথের সকল বিঘ্ন দূরীভূত করিয়া সমাধি আসন্ন করেন। যিনি যোগাভ্যাস করিতে ইচ্ছুক, পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি আসন অভ্যাস করিবেন। এই আসনগুলি শরীরকে দৃঢ় ও নীরোগ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয় প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সাত্ত্বিক বুদ্ধির অধীনে রাখাকে প্রত্যাহার বলে।

যম, নিয়ম প্রভৃতি ব্রত ও নিয়ম নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে চিত্ত প্রশান্ত ও সমাধির উপযোগী হইয়া থাকে। এই ব্রত ও নিয়ম পালন সমাধির ক্ষেত্র চিত্তকে প্রস্তুত করে বলিয়া যম, নিয়ম, আসন প্রভৃতিকে যোগের বহিরঙ্গ বলা হইয়া থাকে। সংযমের দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ত কোন বস্তুকে ধ্যান করিতে পারে। চিত্তকে জগতের অন্যান্য বিষয় হইতে অপসারিত করিয়া একটি বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ রাখার নাম ধারণা—'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা'। যে বিষয়ে চিত্ত আবদ্ধ সেই বিষয়ের অনুক্ষণ চিন্তা, ধ্যান, 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্'। ধ্যানে জগতের অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, ধ্যানের বিষয়ে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে লীন থাকে। ধ্যানের পর সমাধি। চিত্ত-বৃত্তির লয়কে সমাধি বলা হয়। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে এবং ইহাতে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয়। এই সমাধিতে জ্ঞাতা জ্ঞাতের কোন প্রভেদ থাকে না। জ্ঞাতা জ্ঞাতবিষয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে লীন হইয়া থাকে—'তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ'। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া হয় বলিয়া ইহাকে সবীজ-সমাধিও বলে।

যেমন ধানুষ্ক স্থূল লক্ষ্য ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম লক্ষ্য ভেদ করিতে অভ্যাস করে, স্থূল বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয় অবলম্বনপূর্ব্বক যোগীর যোগাভ্যাস করিতে হয়। বিষয় ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চারি প্রকার—বিতর্ক, বিচার আনন্দ ও অস্মিতা। বিতর্ক দুই প্রকার—সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক এবং বিতর্কের ন্যায় বিচারও দুই প্রকার—সবিচার ও নির্বিচার। দেশকাল সম্বন্ধযুক্ত ঘটাদির যে কোন স্থূল বিষয়ের ধারণা ও ধ্যান হইতে যে সমাপত্তি বা তন্ময়তা হয় তাহাকে সবিতর্ক এবং দেশকাল সম্বন্ধ-বিযুক্ত কেবলমাত্র সেই বিষয়ের অনুক্ষণ চিন্তন হইতে যে সমাধি বা চিত্ত লয় তাহাকে নির্বিতর্ক সমাধি বলা হয়। সবিতর্ক সমাধিতে বস্তুর নাম ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা থাকে,' কিন্তু নির্বিতর্কে কেবলমাত্র বস্তুটি ধ্যানের বিষয়। কোনও বিশেষ-স্থান ও কালের সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রার যে কোন একটীর ধ্যান হইতে যে সমাধি; তাহা সবিচার এবং কেবলমাত্র সাধারণ তন্মাত্রা অবলম্বনে যে সমাপত্তি তাহা নির্বিচার সমাধি। ইন্দ্রিয়াদি ও অহংকারকে আশ্রয় করিয়া যে সমাধি তাহা সানন্দ এবং বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মা নিজকেই ধ্যানের বিষয় করিয়া যে সমাধি লাভ করে, তাহা সাস্মিতা সমাধি।

উদ্দেশ্যানুসারে সম্প্রজ্ঞাত যোগ আবার দুই প্রকার—ভব প্রত্যয় ও উপায় প্রত্যয়। ভব-প্রত্যয় যোগের ফলে যোগী বিদেহলয়ী বা প্রকৃতিলয়ী হইয়া থাকেন। যাঁহারা মহাভূত বা ইন্দ্রিয়ে সম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও যদি ধ্যানের বিষয়ের সহিত সংযোগ নষ্ট না হয়, তবে তাহারা বিদেহলয়ী হইয়া থাকেন। যাঁহারা প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার প্রভৃতিতে চিত্ত লয় করিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃতিলয়ী। ভবপ্রত্যয় যোগ বিষয় মূলক বলিয়া কৈবল্য প্রদান করিতে পারে না। উপায় প্রত্যয় যোগী ভবপ্রত্যয় যোগে সন্তুষ্ট থাকেন না। তিনি মোক্ষ লাভের জন্য অসম্প্রজ্ঞাত যোগাভ্যাস করেন। ভব-প্রত্যয় যোগীদের পতন সম্ভব; কিন্তু যাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন, তাঁহাদের কখনও পতন ঘটে না।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগী সিদ্ধিলাভ করিয়া সত্য প্রকাশক প্রজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন এবং 'তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কার-প্রতিবন্ধী'। প্রজ্ঞাজনিত সংস্কার অন্যান্য সংস্কারগুলির নিরোধ ঘটাইয়া থাকে। 'তস্যাপিনিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ'। প্রজ্ঞাজনিত সংস্কারের নিরোধে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া হয় না বলিয়া ইহা নিরালম্ব। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বিষয়কেন্দ্রিক। কিন্তু সাস্মিতা সমাধির বিষয় বুদ্ধি—ইহা সূক্ষ্মতম। এই সমাধিতে কেবলমাত্র প্রজ্ঞাসংস্কার থাকে। এই

সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে আত্মা বিষয়মুক্ত হইয়া স্বরূপস্থ হইয়া থাকে এবং ইহাই জীবের মুক্তাবস্থা।

যোগী যোগপথে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইলে নানারকম অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। সমাধির বিষয় অনুসারে তিনি শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার অপূর্ব শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তিনি অতি দূরের জিনিষ দেখিতে এবং দূরের শব্দ শুনিতে পারেন। তিনি অপূর্ব শারীরিক ও মানসিক শক্তি লাভ করেন। কিন্তু যিনি এই সকল শক্তি লাভ করিয়া গন্তব্য স্থানের কথা ভুলিয়া যান এবং নিজকে সফলকাম মনে করেন, তিনি কখনও পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন না। অচিরেই তাঁহার পতন ঘটিয়া থাকে। যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি এই সকল প্রলোভনে বিচলিত না হইয়া দৃঢ়চিত্তে গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং পরিণামে মুক্তিলাভ করেন।

—০—

কেমন আছি

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

রাজপ্রাসাদে দিন কেটেছে কেটেছে রাত তরুর তলে,
কোথায় বেশী সুখে ছিলাম, তরুই ভাল মন যে বলে।
দেয় না ব্যথা অতি আতপ, অতি প্রবল বর্ষা শীতে,
ভুলায় মোরে—ভোলেনি যে পাখীর গায়ে পালক দিতে
দুঃখ দিলে আমায় প্রচুর যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনা,
শান্তি এবং সান্ত্বনাও দিয়েছে সেই মহামনা।
অভাব বহু, চুপ করে রই—চাইতে আমার লজ্জা করে,
মহামায়ার স্তন্যধারা লেগে আছে এই অধরে।

২

কাটছে দারুণ শীতের রাতি, কষ্টে ছিটে-বেড়ার ঘরে,
'হৃষিকেশের' 'ঝারিতে' সব সাধুর বসত মনে পড়ে।
সাধুর মত মন পেলে তো—এ পর্ণবাস কাম্য বড়,
মনরে আমার হিমের রাতে 'অমরনাথের' দেউল গড়ো।
শীত শুধু তো ভোগায় নাকো—আনে কতই ত্যাগের কথা,
'সুরভি'র আশ্রমের সুধা—'ধরা' 'দ্রোণের' পবিত্রতা।
নিশির শেষে ধোঁয়ায় অজয়—সিঁদূর মেখে ওঠেন রবি
আমি যে এই পল্লীবাসে কল্পবাসের তৃপ্তি লভি।

৩

কাঁপে আমার পর্ণপ্রাসাদ বৃষ্টি পড়ে, ঝড়ও বহে
ডাকি কোথায় হে জগশীশ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হে।
সে ডাক তাঁহার কর্ণে পশে, সন্দেহ মোর নাইকো কোনো,
পাই গরুড়ের পাখীর হাওয়া, ঘোরে যেন সুদর্শনও।
দর্শনীয়ের দর্শনেতে আনন্দে হই আত্মহারা
দেন কুটীরে চরণধূলি যুগের যুগের মহাত্মারা।
পঙ্কজের এ পঙ্কগৃহে রাত্রে মরি, দিনে বাঁচি—
আমার মা আনন্দময়ী দুখেই পরম সুখে আছি।

—০—

মেহেরের সর্ব্বানন্দ ঠাকুর

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ]

বাংলাদেশ সাধকের দেশ। এই বাংলামার বুকে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামপ্রসাদ প্রভৃতি কত আনন্দের দুলাল বাংলার আকাশ বাতাস পবিত্র ক'রে প্রেমভক্তির মূর্চ্ছনা তোলেন। শাক্ত-বৈষ্ণবের মহামিলনক্ষেত্র এই আমাদের বাংলাদেশ।

নবদ্বীপচন্দ্র নিমাইএর জন্মগ্রহণের প্রায় দুশো বছর আগেকার কথা। নবদ্বীপের কয়েক ক্রোশ উত্তরে বর্দ্ধমান জেলার পূর্বস্থলী গ্রামে আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ৺বাসুদেব ন্যায়ালঙ্কারের বাসস্থান। গঙ্গার ধারে ভট্টাচার্য্যের সব সময়ই কাটে কঠোর সাধনায়। একদিন স্বপ্নাদেশ পেলেন—"মেহারগ্রামে মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে পৌত্ররূপে দর্শন লাভ করবে।" মা কোন আদরের দুলালের ভেতর দিয়ে তাঁর বংশে আত্মপ্রকাশ করবেন সেই চিন্তায় বাসুদেব ভট্টাচার্য্য আচ্ছন্ন, কোথায় মেহার তাও সঠিক জানেন না। যা হোক কিছু সন্ধানের পর তিনি পত্নী, পুত্র শম্ভু ও বিশ্বস্ত ভৃত্য পূর্ণানন্দকে সঙ্গে নিয়ে মেহারের মাতঙ্গাশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মেহারে আসবার পর কিছুদিন কুটীরে বাস করেন। ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও সাধনার পরিচয় পেয়ে মেহারের জমীদার রাজা জটাধর দাস সাধকের যথোচিত সম্মান করে বাড়ী তৈরী করে তাঁকে গুরুপদে বরণ করেন। ৺বাসুদেব ন্যায়লঙ্কার পূর্ব্ব-বাসভূমি পূর্ব্বস্থলীতে আর ফিরে আসেননি। পূর্ব্বস্থলীতে সঠিক বাসস্থান কোথায় ছিল তা জানা যায় না। মেহারেও বাসুদেবের আদিবাড়ী কোথায় ছিল তা সঠিক করে বলা যায় না। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

৺বাসুদেবের পুত্র শম্ভুনাথ ও বিশ্বস্ত ভৃত্য পূর্ণানন্দও মেহারের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। শম্ভুনাথের পুত্র "সর্ব্বানন্দ"—আমাদের এই মহাপুরুষ। সর্ব্বানন্দদেবের জন্মের কিছুদিন পরেই পিতা শম্ভুনাথ ও পিতামহ বাসুদেবের মৃত্যু হয়। বাল্যে সর্ব্বানন্দের বিশেষ কিছু শিক্ষা হয়নি তার প্রধান কারণ সে সময়ে মেহারে শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ অভাব ছিল। অশিক্ষিত হলেও সর্ব্বানন্দ রাজগুরু পদ লাভ করেন ও পৌরোহিত্যের কাজ করেন। রাজবাড়ীর এক ক্রিয়ায় অমাবস্যাযুক্ত দিনকে পৌর্ণমাসী বলায় সকলে তাঁকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন। অপমানিত হয়ে সর্ব্বানন্দদেব মনে বিশেষ আঘাত পান ও লেখাপড়া শেখার

জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। পাততাড়ি সংগ্রহের জন্য তিনি এক তালগাছে উঠেন। তালগাছের পাতাঁয় আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই এক বিষধর সাপ তাঁকে ছোবল্ মারতে আসে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হয়ে স্থিরচিত্তে তিনি দা দিয়ে সেই সাপের মুণ্ডচ্ছেদ করেন। এক সন্ন্যাসী বৃক্ষের তলদেশ থেকে ঠাকুরের এই অসাধারণ শক্তি লক্ষ্য করেন ও সর্ব্বানন্দদেবের তালপাতা সংগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মহাপুরুষ তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে বলেন—"তোমাকে আর লেখাপড়া শিখ্তে হবে না, দশমহাবিদ্যা তোমার অধিগত হবেন।" সন্ন্যাসী মহাপুরুষ সর্ব্বানন্দদেবকে আদেশ করেন পুকুরে স্নান করে আস্তে। সন্ন্যাসী তাঁকে মন্ত্র দেন ও সংক্ষেপে জপবিধি বুকে লিখে দিয়ে অন্তর্ধান করেন। সর্ব্বানন্দদেব নবজীবন লাভ ক'রে এক অভাবনীয় ভাবের আবেশে বাড়ীতে পিতামহভৃত্য 'পূর্ণদা' অর্থাৎ পূর্ণানন্দকে সব কথা বলেন। 'পূর্ণদা' বাসুদেব ন্যায়ালঙ্কারের দেওয়া শাস্ত্রসম্পদ ও তাঁর তাম্রফলকে লেখা সাধনবিধি সর্ব্বানন্দদেবকে দেখিয়ে আলোচনা করেন। কৃপাময়ীর কৃপা যখন আসে, যাঁর হাতে জগতের সব ঠিকঠিকানা তিনিই সব ঠিক করে দেন তাই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। সেই দিন ছিল শুক্রবার পৌষ সংক্রান্তি অমাবস্যা তিথি। সাধনের উপযুক্ত সময় নির্ণয় করে শবরূপী উপসাধক হয়ে চল্লেন 'পূর্ণদা'। শবারোহণ করে সর্ব্বানন্দদেব সন্ন্যাসী মন্ত্র জপ করতে থাকেন। মন্ত্রবলে বলীয়ান একনিষ্ঠার তেজে তেজীয়ান সাধকের লক্ষ্যভেদ হ'লো—প্রথমে এক বিদ্যা দর্শন দেন ও পরে প্রার্থনামত দশমহাবিদ্যার দর্শন পান। এত অল্পসময়ের মধ্যে দর্শন সুদুর্লভ, সৎগুরুর কৃপা ও মার অহৈতুকী কৃপাতেই সম্ভব হল। সাত জন্মের তপস্যা না থাক্লে এ কৃপা সম্ভব নয়। মা বর দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু বর কি নোবো, দশমহাবিদ্যা অধিগত করে বললেন—

"মাতঃ কিং বরমপরং যাচে
সর্ব্বং সম্পাদিতমিতি সত্যম্।
যত্ত্বচ্চরণাম্বুজমতি গুহ্যং
দৃষ্টং বিধি হরমুরহর জুষ্টং॥

* * * *

সর্ব্বানন্দদেবের এই সিদ্ধি কাল সম্বন্ধে ঠিক জানা যায় না তবে তিথি নক্ষত্র বার ইত্যাদি হিসাব করে মনে হয় ১৮২৬ খৃঃ অব্দে সিদ্ধিলাভ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ উডরফ সাহেবও তাঁর "শক্তি ও শাক্ত" গ্রন্থে সিদ্ধির এই তারিখ গ্রহণ করেছেন। সর্ব্বানন্দদেব এক জীর্ণ গাছতলায়

সিদ্ধিলাভ করেন। বট অশ্বত্থ জীন বৃক্ষে শোভিত স্থানটি সুন্দর তপোবনের মত হয়ে উঠে, মাতঙ্গ মুনির আশ্রম পূর্ব্ব গৌরবে ফিরে এল। সিদ্ধির বেদী বর্ত্তমান, কিন্তু জীন গাছ নেই তবে পূর্ব্বের বট অশ্বত্থ লোপ পেলেও তাদের শাখা প্রশাখা ঐতিহ্যের নিদর্শনসূত্র বাঁচিয়ে রেখেছে। আধ্যাত্মিকত্ব ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনেকটা হ্রাস পেয়েছে আসামবেঙ্গল রেলপথ খোলার সঙ্গে সঙ্গে। শোনা যায় বেদীর উত্তর দক্ষিণ পাশে প্রবেশ পথের পশ্চিমদিকে দুটি প্রকাণ্ড গড় ছিল, এবং এই গড়ের মধ্যে কয়েকটি বৃহৎকায় 'গুই'সাপ থাকতো। সাপগুলো এত বড় ছিল যে, কাঁচা মোষের মাথা তারা গিলে ফেল্‌তো। গড় এখন নেই, ভরাট করে মেলা ও বাজারের স্থান করা হয়েছে। পূর্ব্বেকার নিবিড় ভীতিকর জঙ্গল এখন ফাঁকা আবাদ জমীতে পরিণত। অশ্বত্থ বটগাছের উপর অনেক শকুনি বাস করে এবং তারা মায়ের চর বলে শ্রদ্ধা পায়; নৈবেদ্যের উপর মলত্যাগ করলেও ঘৃণা করা হয় না। সিদ্ধ বেদীতে বংশধরেরা পূজা চালিয়ে আস্‌ছেন। রোগ আরোগ্য, পুত্রলাভ ইত্যাদি মানত্‌ করার জন্যেও বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়।

মেহারের পুরাণো দাস রাজাদের দীঘি, অট্টালিকা প্রভৃতি অতীত দিনের গৌরবের পরিচয় দেয়। শোনা যায় সর্ব্বানন্দ দেব বলেন যে, রাজবংশ পঞ্চদশ পুরুষ ও নিজবংশ দ্বাবিংশ পুরুষে লোপ পাবে।

শ্রীসর্ব্বানন্দ সর্ব্ববিদ্যা (দশমহাবিদ্যা অধিগত হওয়ার পর থেকে এই ভট্টাচার্য্যবংশ 'সর্ব্ববিদ্যা' বংশ নামে পরিচিত হন) মেহারের বল্লভাদেবীকে বিবাহ করেন ও তাঁর গর্ভজাত সন্তানের নাম শিবনাথ। সিদ্ধিলাভের কিছু পরে সর্ব্বানন্দ দেব ৺কাশীধামে বাস করার ইচ্ছা করেন। ভাগ্নে ষড়ানন্দ ও 'পূর্ণদা'কে সঙ্গে করে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে খুলনার সেনহাটী গ্রামে এক পণ্ডিতের কন্যা গৌরীকে বিবাহ করেন। জনশ্রুতি আছে যশোহর রাজের সভায় এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসেন। রাজার দ্বার পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে সম্মুখীন হতে বিশেষ ভীত হন। ছাত্ররূপে সর্ব্বানন্দ দ্বার পণ্ডিতের কাছে এসে তাঁর চিন্তার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হয়ে তাঁকে পরবর্ত্তী একদিন দিগ্বিজয়ীর কাছে তর্কযুদ্ধে উপস্থিত হতে বলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বরাত্রে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত স্বপ্নাদেশ পেলেন যে, দ্বারপণ্ডিতের বাড়ীতে এক মহাপুরুষ এসেছেন এবং পণ্ডিত মহাশয় সেই মহাপুরুষের বলে বলীয়ান্‌ সুতরাং দিগ্বিজয়ী যেন জয়ের আশা ত্যাগ করে চলে যান। স্বপ্নাদেশ পেয়ে দিগ্বিজয়ী পলায়ন করেন। দ্বারপণ্ডিত এই বিপদ হ'তে উদ্ধার পাওয়ায় কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সর্ব্বানন্দকে

কন্যাদান করেন। সর্ব্বানন্দের ঔরসে গৌরীর গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শিবানন্দের জন্ম হয়। ৫০ বছর বয়সে সেনহাটী ত্যাগ করে সর্ব্বানন্দ ৺কাশীধাম চলে যান। মনে হয় সুবৃদ্ধ 'পূর্ণদা' এখানেই ইহলোক ত্যাগ করেন ও ভাগ্নে মেহেরে ফিরে যান।

সর্ব্বানন্দদেব কাশীতে অবধূত হয়ে পঞ্চতত্ত্বের সাধনা করেন। মদ্য মাংসাদি পঞ্চতত্ত্বের সাধনা করায় কাশীর দণ্ডী সন্ন্যাসীরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। সমস্ত সন্ন্যাসীকে সর্ব্বানন্দদেব নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁর যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে সমস্ত সাত্ত্বিক আহার্য্য তামসিক আহার্য্যে পরিণত হয়। সন্ন্যাসীরা রুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগ করেন কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁরা তাঁদের আহারে তামসের অংশ দেখায় অনাহারে দিন কাটিয়ে তীর্থ ভ্রমণে চলে যান। এইরূপ এক দণ্ডী সন্ন্যাসী হিমালয় প্রদেশ ইত্যাদি ভ্রমণ করে দৈবক্রমে মেহারে উপস্থিত হন। মেহারের রাজার আতিথ্য স্বীকার করেন। ৺কাশীধাম ত্যাগের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হলে দণ্ডী পঞ্চতত্ত্ব-সাধক অবধূতের অত্যাচারের কথা বলেন। রাজা বুঝলেন অবধূত আর কেউ নয়, তাঁরই গুরু দশমহাবিদ্যার মানসপুত্র শ্রীসর্ব্বানন্দ দেব। দণ্ডী ও রাজার কথোপ-কথন সময়ে সাধকের সাধনসিদ্ধি প্রভৃতি বিষয় প্রকাশ পায়। এই কথোপকথনই সাধকের তনয় পণ্ডিত ৺শিবনাথ ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত শ্লোকে "সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী" নামে প্রকাশ করেন।

"নত্বা শ্রীগুরুপাদাব্জং তনোতি গুরুকিঙ্করঃ।
শ্রীসর্ব্বানন্দনাথস্য সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণীম্॥
স্থূলং সূক্ষ্মং তথা তেজস্ত্রিবিধং শিবভাষিতম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুরুং সূক্ষ্মং সর্ব্বকারণকারণম্॥
শ্রীসর্ব্বানন্দ নাথোঽসৌ বঙ্গে মেহার সংজ্ঞকে।
তপ্তাপশ্যৎ পদাম্ভোজং ভবাব্জা পরমেশ্বরম্॥

এই গ্রন্থে ভাগ্নে ষড়ানন্দের উক্তিও দেখা যায় এবং তিনিও একজন উত্তর-সাধক ছিলেন। তাঁর প্রার্থনা—

"সোঽয়ং শম্ভুমহাত্মনস্তমুভবে মেহারে পীঠস্থানে।
দেবীং মানুষচক্ষুষা দশবিধামীক্ষাম্প্রচক্রে কলৌ॥

সর্ব্বানন্দদেবের জন্মসময় কবে বলা যায় না। মেহারে যে "সর্ব্বানন্দ মঠ" আছে সেখানে তাঁর সিদ্ধিদিবস অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে মেলা বসে। সেন-হাটীর শিবানন্দের প্রপৌত্রের জন্ম তারিখ ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে অতএব ৪ পুরুষ আগের কথায় সর্ব্বানন্দদেবের আনুমানিক জন্ম ১৪০০ খৃঃ অব্দ নাগাৎ সম্ভব।

সর্ব্বানন্দ দেব ৺কাশীধামে শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত—সারদামঠের ভদ্রকালীদেবীর মন্দিরে বাস করতেন। কথিত আছে শঙ্কর গদীর প্রভাব অস্তমিত হলে সর্ব্ববিদ্যা বংশের এক ব্রহ্মচারী এই প্রাচীন মঠের 'মহাদেবানন্দ' তীর্থস্থানী হন। এই মঠের প্রকাশানন্দদেবের কৃপায় চৈৎসিং ভ্রাতুষ্পুত্র মহীপনারায়ণ ইংরাজ কবল থেকে মুক্ত হন ও মহীপনারায়ণ কৃতজ্ঞতাবশতঃ প্রকাশানন্দকে রাজগুরুর পদে বরণ করেন এবং এই থেকে সেই মঠ 'রাজগুরু মঠ' নামে পরিচিত হয়।

সর্ব্বানন্দ দেব ৺কাশীধাম ত্যাগ করে বদরিকাশ্রম চলে যান। অনেকের বিশ্বাস কায়ব্যূহক্রিয়া বলে কলেবরের পরিবর্ত্তন করে আজও তিনি বেঁচে আছেন। উড্রফ সাহেবের বইতেও দেখা যায়—

"As is usual in such cases there is a legend that Sharvananda is still living by Kayabyuha in some hiddden resort of Siddha-Purushas. The author of the memoir from which I quote tells of a Sadhu who said to my informant that some years ago he met Sharvanandanath in a place called 'Champakaranya' but only for a few minutes for Siddha was himself miraculously wafted elsewhere."

—*Shakti & Shakta.* P. 239

(অর্থাৎ প্রচলিত বিশ্বাসসূত্রে বলা হয় যে সর্ব্বানন্দ দেব কায়ব্যূহক্রিয়াযোগে আজও কোনও সিদ্ধপুরুষদের সকাশে বাস করছেন। অন্য এক সাধুর জীবন-স্মৃতিতে দেখা যায় যে কিছুদিন আগে তিনি চম্পারণ্যে সর্ব্বানন্দ দেবের দর্শন পান কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই সেই সিদ্ধপুরুষ অন্তর্ধান করেন।)

এই মেহের কালীবাড়ীর 'সর্ব্বানন্দ মঠ' ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত। পূর্ব্ব পাকিস্থানের ই-বি-রেলের চাঁদপুর শাখার উপর লাকসাম জংসন থেকে ১২ মাইল দূরে এই স্থান। ষ্টেশনের নাম আগে ছিল মেহার কালীবাড়ী, পাকিস্থান হবার পর এর নাম "মেহের।" ইস্লাম্ রাষ্ট্রের শুচিতারক্ষায় কিছু অংশ বাদ পড়েছে। সিদ্ধস্থান ষ্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে।

'সর্বোল্লাস' সর্ব্বানন্দদেব লিখিত প্রসিদ্ধ শাক্তগ্রন্থ। কাশ্মীরের রঘুনাথ মঠে 'নবার্ণপূজা পদ্ধতি' (১৬৬৮ বিক্রমাব্দ) নামে এক লিখিত পুঁথী আছে এবং মধ্য ভারতে কোন কোনও স্থানে "ত্রিপুরার্চ্চন দীপিকা" নামে এক গ্রন্থ আছে, অনেকে মনে করেন এ দুটি তান্ত্রিকগ্রন্থ সর্ব্বানন্দদেবের লিখিত।

মেহারে সর্ব্বানন্দ দেবের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত।

অমাবস্যাকে পূর্ণিমা বলায় লোকের উপাহাসাস্পদ হন কিন্তু ভক্তের মান রক্ষা করার জন্যে দেবী কালিকা স্বীয় কঙ্কনশোভিত হাত তুলে তার জ্যোতিতে চন্দ্র-কিরণের ন্যায় জ্যোৎস্নার বিকাশ সাধন করেন—এই কাহিনীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।*

—০—

মহাতাপস নগেন্দ্রনাথের সদুপদেশ

[স্বামী জগদীশ্বরানন্দ]

যে সকল মহাপুরুষের দর্শন লাভে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে তন্মধ্যে মহাতাপস নগেন্দ্রনাথ অন্যতম। তখন কলিকাতায় সিটি কলেজে পড়ি এবং ইডেন-হস্পিটাল রোডস্থ বেদান্ত সমিতিতে পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দের কাছে যাতায়াত করি। উক্ত সমিতিতে নগেন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করি। তখন তিনি উক্ত সমিতির ব্রহ্মচারী ও স্বামী অভেদানন্দের দীক্ষিত শিষ্য। এই সমিতির উদ্যোগে সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা হইলে আমি উহাতে সেবকরূপে যোগ দিতাম। আমি তখন কলেজ স্কোয়ারের কাছে এক মেসে থাকিতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া নগেন্দ্রনাথ আমাদিগকে ধর্মপ্রসঙ্গ শোনাইতেন। রাত্রিতে তিনি আমাকে আমার মেস পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিতে কখন কখন আসিতেন এবং আলোচ্য বিষয় শেষ না হওয়ায় আমি সমিতি পর্য্যন্ত ফিরিয়া যাইতাম। তাঁহার ধর্ম-কথা ফুরাইত না বলিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে কলিকাতার রাস্তায় যাতায়াত করিতাম। তাঁহার মত মহাপণ্ডিত ও মহাতাপস ও মহাপ্রেমিক আমি দেখি নাই। তিনি কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই। তিনি ছিলেন সুগুপ্ত সাধক ও সমাধিবান মহাপুরুষ। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে সারা জীবন কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার বিস্তৃত জীবনী রচিত ও পত্রাবলী সংগৃহীত হইতেছে। ১৩৬০-৬২ সালে তাঁহার পত্রাবলী 'পথ-নির্দ্দেশ' নামে 'প্রবর্তক' মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাতাপস নগেন্দ্রনাথ পাবনা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত ভারাঙ্গা গ্রামে মাতুলালয়ে ১৩০০ সালের আষাঢ়ী শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৫৯ সালের ১লা পৌষ কলিকাতা নগরীর যাদবপুর পল্লীতে এক

*এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সংগ্রহের জন্য কলিকাতা সংস্কৃত পরিষদের সর্ব্বানন্দবংশীয় পণ্ডিত শ্রীবগলাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। —লেখক

বন্ধুর বাসায় মহাসমাধি লাভ করেন। তাঁহার পিতা হৃদয়নাথ চক্রবর্তী একই মহকুমার অন্তর্গত কাবাড়িকোল গ্রামবাসী আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার মাতা সুখদা দেবী অতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পাবনা জেলা স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২০ সালে রংপুর কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করিয়া উক্ত কলেজের গ্রন্থাগারিক ও হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। পর বৎসর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানার্থ তিনি কলেজের কর্ম ত্যাগ করেন। ইহার কিছুকাল পরে আমরা তাঁহাকে বেদান্ত সমিতিতে দেখিতে পাই। ইহার পূর্বেই তপস্বিনী ননী মাতার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহার পূত সঙ্গে ও সেবায় ভুবনেশ্বরে কোন বন্ধুর সাহায্যে আশ্রম স্থাপন পূর্বক তথায় বিশ বৎসর অতিবাহিত করেন। উক্ত আশ্রমের নাম রাখেন 'সারদা-ধাম'। ১৯২৭-২৯ খ্রীষ্টাব্দ তিন বৎসর আমি দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী কর্মী ছিলাম।

তখন আমার নাম ছিল ব্রহ্মচারী শ্রদ্ধাচৈতন্য এবং দিল্লী মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী শর্বানন্দ। পূজনীয় শর্বানন্দজীর নির্দেশে পুরাতন দিল্লীর যমুনাতীরে নিগম গেটের কাছে একটি ছাত্রাবাস আমি খুলিয়াছিলাম। তখন দিল্লী মিশন গার্স্টিন রোডে ভাড়া বাড়িতে অবস্থিত ছিল। মহাতাপস নগেন্দ্রনাথকে আমরা 'নগেনদা' বলিয়া ডাকিতাম। তখন নগেনদা ভুবনেশ্বর হইতে দিল্লীতে যাইয়া উক্ত ছাত্রাবাসে ২।৪ দিন ছিলেন এবং তথা হইতে মাউণ্ট আবু ও চিতোর গড় প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। পরবর্তী বৎসর আমি বারবার জ্বরে পড়ি এবং ডাক্তারের পরামর্শে একবৎসর ছুটি লইয়া বেলুড় মঠ হইয়া ভুবনেশ্বরে সারদাধামে বায়ু পরিবর্তনে যাই। সারদাধামেও আমার খুব জ্বর হয় এবং নগেনদা ও ননীমার সেবায় সুস্থ হই। পর বৎসর বেলুড় মঠে আসিয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করি। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে পুনরায় ভুবনেশ্বরে নগেনদার কাছে গিয়া কিছুদিন থাকি। মোটের উপর ১৯৩০-৩১ সালে প্রায় এক বৎসর নগেনদা ও ননীমার পূত সঙ্গে সারদাধামে আমি কাটাই। সারদাধামে ৺গোপাল প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং ঠাকুরের ছবিও পূজিত হয়। আমার উপর ঠাকুর পূজা ও ভোগারতির ভার পড়িল। সন্ধ্যা আরতির পরে তিনি পাঠ করিতেন এবং আমরা শুনিতাম। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ এত প্রাণস্পর্শী ও প্রেরণাপ্রদ ছিল যে, উহার তুলনা পাওয়া যায় না। কাহাকেও এত মাতোয়ারা হইয়া ধর্ম-প্রসঙ্গ করিতে আমি দেখি নাই। পূজনীয়া ননীমা' বলিতেন, "তোমার দাদা যেন দিন দিন কোন এক

প্রেমের রাজ্যে চলে যাচ্ছেন। যখন পাঠ হয় মনে হয়, শুকদেব উপস্থিত হইয়াছেন। কিসে শান্তি তাহা বলা বা লেখা অসাধ্য।" নগেনদার প্রসঙ্গ আমার এত ভাল লাগিত যে, আমি পরদিন উহার সারাংশ লিখিয়া রাখিতাম। প্রায় ২৫ বৎসর পরে হঠাৎ সেই খাতাখানি আমার হাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। উক্ত খাতা হইতে মহাতাপসের কিছু সদুপদেশ নিম্নে সংকলিত হইল।—

১৯৩০ খ্রী: ১৯শে নভেম্বর বুধবার সন্ধ্যা প্রায় সাতটায় পাঠ আরম্ভ হইল। তিনি পাঠকালে বলিয়াছিলেন, "আত্মসমর্পণ is the highest purity, highest yoga. আদর্শ, উদ্দেশ্য ও উপায় এই তিনটি জিনিষ সব সময়ে মনে রাখবে। উদ্দেশ্য ব্রহ্মলাভ, আদর্শ রামকৃষ্ণ এবং উপায় ধ্যানাদি। Why, how and what দিয়েই সব বুঝতে চেষ্টা কর। Why হচ্ছে literature and art. What হচ্ছে science এবং how হচ্ছে philosophy. সকলেই এক Truth-কে represent করছে নানা দিক দিয়ে। যখন 'লীলা প্রসঙ্গ' গুরুভাব পাঠ হচ্ছিল তখন শরৎ মহারাজ আমার উপর ভর করেছিলেন। তিন সপ্তাহ রোজ ৪।৫ ঘণ্টা ধরে পাঠ হতো। ওসব আমার জিনিষ নয়, তাঁর। আমার মুখ দিয়ে তিনি বলতেন; এমনকি, গলার স্বরও বদলে গিয়েছিল। শরৎ মহারাজ 'লীলা-প্রসঙ্গে' যাহা বলেন নি চেপে গেছেন সে সব সেবার আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্বামীজীর যখন সব বই ও পুরা জীবনী প্রকাশ হয় নি তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা তখন জেনেছিলাম, মনে ভেসে আসতো আর সবাইকে বলতাম। পরে বই পড়ে দেখলাম, সব মিলে গেল। Thoughts are immortal and they never die. চিন্তা করে যাও। একদিন না একদিন উহা কারো brain-এ strike করবে।"

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার তিনি বলিয়াছিলেন, "কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, শরৎ মহারাজ ও তাঁহার ভাই এসেছেন। বলছেন, 'আমি ভুবনেশ্বর বেড়াতে এলাম। তুমি খাবার দিও। আমি ধবলগিরি, খণ্ডগিরি দেখে আসি।' তিনি অনেক কথা বললেন দুই তিন ঘণ্টা ধরে। ফুল বউমার কথা বললেন। এর দুটা ইষ্ট। তাই কোন্‌টা নেবে কিছু স্থির করতে পারছে না। তাঁর মন্ত্রটি আমাকে বলে দিলেন এবং বললেন, 'তুমি ফুলবউমাকে এই মন্ত্র বলে দাও।' আমি বললাম, 'আমি পারবো না। আপনি না হয় স্বপ্নে বলে দিন।' শরৎ মহারাজ বললেন, 'তোমার দীক্ষার পর থেকে আমি তোমার হৃদয়ে আছি।' সেইদিন থেকে দেখছি, আমার হৃদয়টা খোল মাত্র। আর

তিনি (গুরু) সাধন করছেন। এই হলো আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ ঠিক ঠিক হলে গুরু শিষ্যের ভিতর অধিষ্ঠিত হয়ে ধ্যান, ভজন, সাধন করিয়ে নেন। আমি তার পর থেকে তাকে যেন চোখের সামনে সর্বদা দেখছি। সেই দীক্ষার পর থেকে আমার সব খুলে যাচ্ছে আপনা হতে। একবার শরৎ মহারাজ তাঁর জন্মোৎসবের দিনে দুপুরে দিদি ও দাদাকে হাওড়াতে দেখা দেন। দুঃখ না হলে মানুষ বাড়তে পারে না। দুঃখই truest guide to God।" (ঈশ্বরের পথ প্রদর্শক।)

মহাতাপস নগেন্দ্রনাথ শ্রীমা সারদা দেবীর দর্শন লাভ করেন উদ্বোধন মঠে। শ্রীমাকে দর্শনান্তে প্রণাম করিবার সময় তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হন। তখন তাঁহার চক্ষুতে অবিরল প্রেমাশ্রু ঝরিল এবং মুখে অস্পষ্ট মা মা ধ্বনি উচ্চারিত হইল। স্নেহময়ী শ্রীমা প্রণত সন্তানকে কোলে লইয়া হাওয়া করিলেন এবং সন্তানের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে স্বীয় হস্তে তাঁহাকে ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়াইলেন। 'দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন আছে কিনা'— জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'এখন থাক। সে পরে হবে।' শ্রীমার স্থূলশরীরের অদর্শনের পর স্বামী সারদানন্দ তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন এবং বলেন 'মা তোমার জন্য এই মন্ত্র রেখে গেছেন আমার কাছে।' নগেনদা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "বাড়ে একদিন ধ্যান করতে করতে দেখি, সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় উঠেছে। তিনদিন এই অবস্থায় ছিলাম। এই জন্য আমার পায়ে বাত ধরেছিল। পরে চলতে পারতাম না। সতের বৎসর ক্রমাগত স্বপ্ন দেখতাম, একটি বৃদ্ধ বলছেন, 'তোমাকে কিছু দেবার আছে। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। আমার বয়স হয়েছে।' পরে জানলাম, তিনি শরৎ মহারাজ। তাঁর কাছে দীক্ষা নেবার পর আর ঐ স্বপ্ন দেখি না।"

২১শে নভেম্বর শুক্রবার ১৯৩০ খ্রীঃ তিনি বলেছিলেন, "ভাব সমাধি অবধি ধর্ম জীবনে মুখস্থ করা চলে, অন্তঃস্থ কিছুই হয় না। নিজের চেষ্টায় পঞ্চম ভূমি পর্য্যন্ত উঠা যায়। Untiring energy (অফুরন্ত উদ্যম) মানে infinite love (অসীম প্রেম)। সাধুর তিনটা বিপদ আছে—দীক্ষা হলে ভাবে সব হলো, সাধনা বন্ধ করে। তার পূর্বে খুব চেষ্টা করে ও ভাবে, 'না জানি দীক্ষা কি?' তারপর ব্রহ্মচর্য্য ও শেষে সন্ন্যাস। মানুষ যখন বুঝে এতে কিছু হলো না তখনই সাধনা আরম্ভ করে। প্রতি মুহূর্তে আদর্শকে সামনে রাখবে, তবেই হবে। সর্বদা অশান্তি, অসন্তোষ create (সৃষ্টি) করো

ধর্মজীবনের বর্তমান অবস্থায় এবং সমুচ্চ আদর্শের দিকে তাকাও। কেবল অবতার পুরুষই মানুষের কপাল মোচন করতে পারেন এবং এই পাঁচটি জিনিষ করে দেন—কাম নাশ, সঞ্চিত কর্মক্ষয়, সুপ্ত শক্তি জাগরণ, ইষ্ট লাভ, আর মুক্তি প্রাপ্তি। কিন্তু সাধারণ গুরু কেবল দীক্ষাদান ও অন্তরায় দূর করতে পারেন।"

একদিন প্রায় আড়াই ঘণ্টা পাঠ হলো। ঠাকুর সত্যদেব প্রণীত 'সাধন সমর' নামক গ্রন্থ থেকে সুমেধ পড়া হলো। তিনি বললেন, "ইন্দ্রিয়-রাজ্য থেকে মন তুলে নেবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সংস্কৃতি, জ্ঞান ও প্রেমকে ভালবাসা। শাস্ত্র জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক আলোচনা দ্বারা মন উপরে ওঠে। দুই বন্ধুর মধ্যে প্রীতি দেখে আনন্দিত হলে কাম কমে যায়। দুটি অজ্ঞাত আত্মার মধ্যে আকর্ষণই প্রেম। দার্শনিক সোপেনহাওয়ার পড়ে দেখলাম, তিনি বলছেন, Life is a flash between two darknesses. (দুই অন্ধকারের আলোক উৎপত্তিই জীবন)। গত বিশ বৎসর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিবেকানন্দ-বাণীর প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি। দার্শনিক কান্টের Categorical imparative হচ্ছে বুদ্ধের Precepts. এতে Both commanding এবং Natural বুঝায়। Animal in man (মানুষের মধ্যে পশুত্ব)কে প্রথম এবং God in man (মানুষের মধ্যে দেবত্ব)কে Natural বলা যায়। Revelation এবং অপৌরুষেয়—এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। কোরাণ ও বাইবেল Revealed and personal এবং বেদ impersonal and all inclusive. বাংলার সমন্বয় প্রতিভা নিজস্ব—যেমন ইংরাজদের বীরভাব এবং ফরাসীদের স্বাধীনতা-প্রিয়তা। ফরাসী বিদ্রোহে জগৎ যেন পাশ ফিরে শুল। মহাত্মা গান্ধী কালীপূজা নিন্দা করলেন। অথচ তিনি যে দেশকে বলি দিলেন to the goddess of freedom (স্বাধীনতা দেবীর কাছে) তা ভুলে গেলেন।"

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর বুধবার তিনি বলেছিলেন, "কারুর বা ধ্যান হয় পড়তে পড়তে—যেমন কালী মহারাজের। কারুর বা ধ্যান হয় সেবায়—যেমন শশী মহারাজের। কারুর বা ধ্যান হয় ধ্যানে—যেমন হরি মহারাজের এবং কারুর বা ধ্যান হয় জপে যেমন—রাখাল মহারাজের। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাই ভক্তদিগকে একঘেয়ে হতে বারণ করেছেন। তিনি অনন্ত ভাবময় কোন একভাবে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। যখন পড়ছো তখন তাঁরই চিন্তা হচ্ছে। যখন কাজ করছো, তাতেও তাঁর চিন্তা হচ্ছে—যেমন পূজায়

হয়। যখন work and worship (কর্ম ও পূজা) সমান বোধ হবে তখনই ঠিক ধ্যান হয়। উভয়ের মধ্যে কোন রেখা টেনো না।' অত্যুচ্চ আদর্শ মানুষকে দুর্বল করে ফেলে। তাই অধিকারবাদ প্রচলিত হয়েছে। Your end will come to you in parts. একবার end (লক্ষ্য) স্মরণ করে নিয়ে means (উপায়) এর প্রতি খুব মনোযোগ দাও। আর অস্থির হইও না। গোঁড়ামি ভাল নয়। গোঁড়ামিতে stagnation (অশুদ্ধতা) আসে। কোন সিদ্ধা-বৃদ্ধা তাঁর গোপালের হাত ভেঙ্গে যাওয়ায় ডাক্তারের কাছে ছুটে যান ও বলেন, 'আমার গোপালের হাত ভেঙ্গে গেছে; ঔষধ দাও।' সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন এবং ভাবলেন, হয় তো কোন লোকের ছেলের হাত ভেঙ্গেছে। তাই বুড়ি এসেছেন। কারণ বুড়ীর নিজের কোন ছেলেপিলে ছিল না। তাই ডাক্তার ঔষধ দিলেন ও ভাঙ্গা হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিতে বললেন। বৃদ্ধা পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার ভাত ও চিংড়ি মাছের ঝোল ব্যবস্থা দিলেন। সিদ্ধা আর ডাক্তারের কাছে যান না ব'লে ডাক্তার নিজে বুড়ির কাছে এলেন। তিনি এসে দেখলেন বুড়ীর ইষ্টদেব গোপালের মৃন্ময়মূর্তির হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। এবং তাঁর ঔষধে হাত সেরে গেছে। তাই বুড়ি তাঁকে মাছ-ভাত খাওয়াচ্ছেন—যা বৈষ্ণবেরা কখনও করেন না। উক্ত বুড়ীর মৃত্যুর পরে গ্রামের জমিদার গোপালের পূজার ভার নিলেন ও বৈষ্ণব পূজক নিযুক্ত করলেন। সেই বৈষ্ণব গোপালকে মাছের ঝোল দিতেন না। তাই গোপাল জমিদারকে স্বপ্নে কেবল বলতেন, 'আমার খাওয়া হয় না।' শেষে জমিদারের আদেশে গোপালকে মাছ-ভাত দিতে হলো। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গণ্ডীর মধ্যে ফেলো না। স্বামীজী তাঁকে 'সর্বধর্ম স্বরূপ' বলেছেন। ঠাকুরকে যেটুকু বুঝেছ সেটুকু গ্রহণ কর। তার বেশী বলে, মুখস্থ কথা বলে লাভ নাই। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে ভাবতে ভাবতে আমার একবার ভাবাবেশ হয়েছিল। সেই আবেশ ছয় মাস ছিল। ঠাকুর ও স্বামীজীকে ভাবতে ভাবতে তাই হয়ে গিয়েছিলাম। শ্রীমার দিব্যস্পর্শে তাহা কমে যায়।

"ভাব কিছু না, ওকে চাপতে হয়। তখন উহা শিরায় শিরায় রক্ত বিন্দুতে মিশে যায়। ভাবের উচ্ছ্বাস এলেই ভাব বেরিয়ে যায়। যার ভিতর ও বাহিরে গুছান তিনিই সাধু। যার শুধু বাহির গুছান অন্তর অগোছান সে বাবু, যার শুধু অন্তর গোছান, বাহির গোছান নয় সে ভাবুক।"

—০—

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

নাম বিলা'তে আবার এলে !

[শ্রীজ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়]

অনেক দূরে নও তো তুমি—
এই তো আছ আমার কাছেই,
হৃদয় মাঝে বসে আছ
নিত্য লীলা করছ কতই।

২

অঙ্গে তোমার বিভূতি আর
গলায় দোলে তুলসী মালা,
মাথার 'পরে জটার শোভা
নামে তুমি আত্মভোলা।

৩

মহাজ্ঞানের দীপ্তি মুখে—
যোগে আছ অহর্নিশি,
যেথায় তুমি বিরাজ কর
সেই তো আমার বারাণসী !

৪

নিঝুম রাতে স্তব্ধ ধরা
দেউটি যখন জ্বলছে না,
যোগের খেলা খেলছ কতই—
কেউ তো মোরা জানছি না !

৫

তোমার চরণ পরশ পেলে
আমরা সবাই ধন্য হব,
তোমার বাণী তোমার আশিস
মাথায় ক'রে আমরা লব।

৬

যেথায় ঠাকুর থাক তুমি—
কাছেই আছ, নও তো দূরে
হৃদয় মাঝে আসন পাতা
বসে আছ সেথায় জুড়ে।

৭

সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগে
তুমিই প্রভু এসেছিলে,
কলিযুগের পাপ মোছাতে
নাম বিলা'তে আবার এলে!

—০—

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

[চতুর্থ প্রকরণ, ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস]

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

॥ শ্রীরামঃ শরণং মম ॥

প্রাতঃ স্মরামি রঘুনাথমুখারবিন্দং
মন্দস্মিতং মধুরভাষি বিশালনেত্রম্।
কর্ণাবলম্বি চল কুণ্ডলশোভিগণ্ডং
কর্ণান্তদীর্ঘনয়নং নয়নাভিরামম্ ॥১॥

প্রাতর্ভজামি রঘুনাথ করারবিন্দং,
রক্ষোগণায় ভয়দং বরদং নিজেভ্যঃ।
যদ্‌রাজসংসদি বিভজ্যমহেশচাপং
সীতাকরগ্রহণ মঙ্গলমাপসদ্যঃ ॥২॥

প্রাতর্নমামি রঘুনাথপদারবিন্দং,
পদ্মাঙ্কুশাদি শুভরেখি শুভাবহং মে।
যোগীন্দ্রমানস মধুব্রত সেব্যমানং ॥
শাপাপহং সপদি গৌতম ধর্ম্মপত্ন্যাঃ ॥৩॥

প্রাতর্বদামি বচসা রঘুনাথ রাম,
বাগ্‌দোষহারি সকল শমলং করোতি।
যৎ পার্ব্বতী স্বপতিনা সহভোক্তুকামা,
প্রীত্যা সহস্র হরি নাম সমং জজাপ ॥৪॥

প্রাতঃ শ্রয়ে শ্রুতি নুতাং রঘুনাথমূর্ত্তিং,
নীলাম্বুদোৎপলসিতেতর রত্ননীলাম্।
আমুক্ত মৌক্তিক-বিশেষবিভূষণাঢ্যাং
ধ্যেয়াং সমস্ত মুনিভির্জ্জন মুক্তি হেতু ॥৫॥

যঃ শ্লোক পঞ্চকমিদং প্রযতঃ পঠেদ্ধি
নিত্যং প্রভাতসময়ে পুরুষ প্রবুদ্ধঃ।
শ্রীরামকিঙ্করজনেষু স এব মুখ্য ভূত্বা
প্রযাতি হরিলোকমনন্যলভ্যম্॥

এই শ্লোক পাঁচটী প্রভাতে উঠে সংযতভাবে যিনি পাঠ করেন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কিঙ্কর প্রধান হয়ে শেষে অনন্য ভক্তের লভ্য নিত্য-সাকেতধাম প্রাপ্ত হন।

শ্লোক পাঁচটী ভাল লাগলো, বল তুমি নাম মহিমা বল।

যজ্জিহ্বা রঘুনাথস্য নামকীর্ত্তনমাদরাৎ
করোতি বিপরীতি যা ফণিনোরসনা সমা।
রামেতি নাম যচ্ছোত্রে বিশ্রম্ভাজ্জায়তে যদি।
করোতি পাপং সংদাহং তুলং বহ্নিকণোযথা॥

—বিষ্ণুপুরাণ।

—যে জিহ্বা আদর পূর্ব্বক রঘুনাথের নাম কীর্ত্তন করে সেই রসনাই প্রকৃত রসজ্ঞা আর নামকীর্ত্তনহীনা রসনা সর্পের রসনার সমান। 'রাম' এই নাম যাঁর কর্ণে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন যেমন বহ্নিকণা তুলারাশি ভস্মীভূত করে তদ্রূপ তাঁর পাপ সকল সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করে থাকেন।

পুরুষো রামচরিতং শ্রবণৈ রূপধারয়ন্।
আনৃশংস্য পরো রাজন্ কর্ম্মবন্ধৈর্বিমুচ্যতে॥

—অতি পরদ্রোহীপরায়ণ পুরুষও রাম চরিত শ্রবণের দ্বারা উত্তমরূপে ধারণ করে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়।

প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্।
শ্রীমদ্ রামং সমাপ্নোতি স্বচ্ছঃ পাপক্ষয়ং নরঃ॥

—নারদীয়পুরাণ।

—প্রাতঃ কাল, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও মধ্য রাত্রে শ্রীরামকে উত্তমরূপে স্মরণ করত মানব পাপশূন্য ও অতিনির্ম্মল হ'য়ে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হন।

মধ্যরাত্রে স্মরণ করতে গেলে ভোরে উঠতে পারা যায় না। শ্রীধর স্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিশীথে জপাদি নিষেধ করেছেন। তাঁরা বলেন ও সময় তামসিক। শক্তি উপাসকগণের পক্ষেই নিশীথ জপ প্রশস্ত এবং যাঁরা প্রাণায়াম অভ্যাসশীল তাঁদের পক্ষে-ও অনুকূল। তবে শয়নের পূর্ব্বে শয্যায় বসে যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ জপ করা ভাল।

রাম সংস্মরাচ্ছীঘ্রং সমস্ত ক্লেশসঞ্চয়ম্।
মুক্তিং প্রয়াতি বিপ্রেন্দ্র তস্য বিঘ্নো ন বাধতে॥ —ঐ

—সম্যকরূপে রামনাম স্মরণ করলে সত্বর সমস্ত ক্লেশসমূহ নষ্ট হয় এবং স্মরণকারী বিঘ্নের দ্বারা উপদ্রুত হন না।

তুমি চোখামেলার কথা বলবে বলেছিলে, চোখমেলা কে?

মাহারাষ্ট্রদেশে চোখামেলা নামে একজন মাহার (নীচজাতি, মরা জানোয়ার ফেলা তাদের কাজ) ছিল। সে সর্ব্বদা বিঠ্ঠল বিঠ্ঠল জপ করতো।

বিঠ্ঠল কার নাম?

শ্রীভগবান কৃষ্ণের নামান্তর বিঠ্ঠল। পণ্ঢরপুরে বিশাল মন্দিরে তিনি অবস্থান করেন। পণ্ঢরপুর মহারাষ্ট্রগণের মহাতীর্থ, তাঁরা খুব নামপ্রেমী। স্ত্রীপুরুষ সকলেই নামকীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনই তাঁদের সাধন, ভক্তিভাবও যথেষ্ট। নরনারী সাধুদর্শন মাত্রেই নির্ব্বিচারে প্রণাম ক'রে পদধূলি গ্রহণ করেন। অধুনা ওরূপ ভক্তের দেশ দেখা যায় না। চোখামেলা অবিরাম বিঠ্ঠল নাম জপ করতো। ঠাকুরটী নামের কাঙ্গাল। চোখামেলার ডাকে আর স্থির থাকতে পারলেন না। এসে দর্শন দান করলেন। তারপর তার সঙ্গে মরা জানোয়ার ফেলতে লাগলেন। সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতো। ঠাকুরটী আমার—কাদা ইটও যোগাতেন। প্রেমের দায় বড় দায়, চোখা একেবারে তাঁকে বন্দী করে ফেলেছিল। তার স্ত্রী প্রসব হলে ঠাকুরটী আমার, তার ভগ্নী সেজে আঁতুড় তুলে দিয়েছিলেন, এরূপও শুনতে পাওয়া যায়।

এ যুগে এমনও হয়—সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকা?

অনেক ভক্তের চরিত্রে একথা শোনা যায়। নামদেব, জনাবাই প্রভৃতির

সঙ্গে তো তিনি সতত থাকৃতেন। গোরাকুমারের চাকর হয়ে ১০।১১ মাস ছিলেন, ইহাও শোনা যায়। লীলাময়ের লীলায় অবিশ্বাস কর্‌বার কিছু নাই। তাঁতে সবই সম্ভব। চোখামেলা নিয়ত নাম ক'রে ক'রে নামময় হয়ে যায়। তার রক্তে মাংসে মেদে মজ্জায় অস্থিতে নাম অঙ্কিত হয়ে গিছলো। সে বলতো—

ইস্ নামকে প্রতাপসে মেরা সংশয় নষ্ট হো গয়া।

ইস্ দেহ মে হী ভগবান্‌সে ভেট হো গয়া।

অনন্তর কোন সময় একটা উঁচু প্রাচীর চোখামেলা ও অপর কয়েক জন রাজমিস্ত্রি তৈরী কর্‌ছিল, সেই প্রাচীরটা পড়ে যাওয়ায় সবাই ইঁটচাপা পড়ে মারা যায়। নামদেব সে সংবাদ শুনে তথায় গিয়া যখন ইঁট সরালেন তখন কয়েকটা কঙ্কাল মাত্র দেখ্‌লেন। তন্মধ্যে কোন কঙ্কাল চোখামেলার তাহা জান্‌বার জন্য কঙ্কালে কর্ণ দিয়া পরীক্ষা কর্‌তে লাগলেন। একটী কঙ্কাল হতে বিঠ্‌ঠল বিঠ্‌ঠল এই ধ্বনি নির্গত হতে লাগলো। তিনি সেই খানি পণ্ঢরপুরে নিয়ে যান। অনেকে কঙ্কাল হ'তে বিঠ্‌ঠল নাম শুনেছিল। তিনি তথায় সেই কঙ্কাল সমাহিত করেন।

ও বাবা! কঙ্কাল থেকে নামের ধ্বনি বেরোয়, এমন কখনও তো শুনিনি!

নামের প্রভাব আমরা কি জানি, কি বা শুনেছি। আর নাম নামী অভিন্ন। সর্ব্বাশ্চর্য্যময় নামের সম্বন্ধে আশ্চর্য্য কিছু নাই। যিনি জীবিত মনুষ্যের মধ্যে অহরহঃ 'জয়গুরু' 'সোঽহং' ইত্যাদি বহু নাম গান কর্‌তে পারেন তখন কঙ্কালে নাম করাবেন এ আর আশ্চর্য্য কি? ভক্তের প্রভাবে ঘুঁটে পাথর পর্য্যন্ত নাম করেছে একথাও শোনা যায়।

ঠিক বুঝি না!

অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের যিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহারকর্ত্তা আমরা তাঁর স্বরূপ কি জানি, কি বুঝি! জানবার বোঝবার আধারই আমাদের নাই। ক্ষুদ্র বালুকণা সে সূর্য্যের মহিমা কি বুঝবে!

তুমি নামের মাহাত্ম্য আরও বল।

অশনে শয়নে পানে গমনে চোপবেশনে।
সুখে বাপ্যথবা দুঃখে রামচন্দ্রং সমুচ্চরেৎ॥
নতস্য দুঃখ দৌর্ভাগং নাধি ব্যাধি ভয়ং ভবেৎ।
আয়ুঃ শ্রিয়ং বলং তস্য বর্দ্ধয়ন্তি দিনে দিনে॥
রামেতি নাম্না মুচ্যেত পাপাদ্বৈ দারুণাদপি।
নরকং নহি গচ্ছেত গতিং প্রাপ্নোতি শাশ্বতীম্॥

—স্কান্ধে, ব্রহ্ম খণ্ডে, ধর্ম্মারণ্যখণ্ডে ৩,৪ অঃ

—ভোজন শয়ন পান গমন উপবেশন কালে রামচন্দ্রের নাম সম্যক্ উচ্চারণ কর্‌বে। যিনি নাম কীর্ত্তন করেন তাঁর দুঃখ দৌর্ভাগ্য আধি ব্যাধি ভয় থাকে না। আয়ু ঐশ্বর্য্য বল দিন দিন বর্দ্ধিত হতে থাকে। রাম এই নামের দ্বারা ভয়াবহ পাপ হতেও মুক্ত হয়, নরকে গমন করে না—পরম গতি লাভ করে।

অপূর্ব্ব নামের মহিমা, শুনলে প্রাণ পূর্ণ হয়ে যায়। বল বল আরও বল।

আচ্ছা, আমি তো বহুদিন ধরে নামের মহিমা তোমায় শুনাচ্ছি, তোমার বিরক্তি আস্‌ছে না?

না, বরং আগ্রহ বাড়ছে। শাস্ত্রে যে নামের কত মহিমা কীর্ত্তিত হয়েছে তা সব শুন্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে।

অমি আর কি মহিমা জানি!

তুমি যা জান সব আমায় বল।

যদি নাম বল্‌তে দেন তো বলবো। আচ্ছা শুন মা বলেছেন—

"মোরে ঘেরে রাখিয়াছে রাবণের চেড়ী।
রাম বলে ডাকিলেই মারে মোরে ছড়ি॥
আহার অমৃতফল না করি ভক্ষণ।
রাম নামে অভাগীর উদর পূরণ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যবে ব্যাকুলিত প্রাণ।
কেবল আহার করি মিষ্টি রাম নাম॥"

আহা মার মত এমন দুঃখ জগতে আর কেহ পায়নি। মা আমার রাম রাম অবলম্বনেই জীবিতা ছিলেন। বল আরও বল।

"একমাত্র রাম নাম পানীয় আহার।
তাই আছে এই দেহে প্রাণের সঞ্চার॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা যত কিছু ভুলেছি সকল।
একমাত্র রাম নামে যত কিছু বল॥
রাবণের অত্যাচারে মর্ম্মে মরে রই।
একমাত্র রাম নামে সে সকল সই॥

—কৃত্তিবাস।

বল—

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম,
শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

—০—

মহাত্মা রামদয়াল স্মরণে

[অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ]

জগতে কত লোকইত জন্মগ্রহণ করে, কয়জনের জীবন আত্ম-কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে ব্যয়িত হয়? কালের গতিতে এমন সব মহাপুরুষ সময়ে সময়ে আসেন যাঁহাদের কার্য্যকলাপ,—সমস্ত জিনিষটি, পরম কল্যাণময়। তাঁহারা আত্মারামকে অনুভব করিবার সাধনা ও বাহিরে বিশ্বমূর্ত্তির নানারূপে সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই আত্ম-কল্যাণের দ্বারা জগতেরও কল্যাণ হইয়া যায়। এ মর জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান যে সব মহাপুরুষ, মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার তাঁদেরই একজন।

তিনি মেদিনীপুর জেলায় জনার্দ্দনপুরের পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়া স্বীয় অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কলেজে অধ্যাপক পদ পাওয়া স্থির হইলেও সাধন রাজ্যের উহা অন্তরায় মনে করিয়া তিনি উহা গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার অগ্রজও তাঁহাকে সাধনপথেই চলিতে বলিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান রামদয়াল যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যোগক্রিয়া শিক্ষা করিয়া, অদম্য উৎসাহে ও অধ্যবসায়ে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া কত সাধনাকাঙ্ক্ষীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলেন। বিংশতি বৎসরের স্বাধ্যায়ের ফলস্বরূপে শ্রীশ্রীগীতার আলোচনা প্রকাশিত হইল। 'উৎসব' পত্রিকার নানা প্রবন্ধে তাঁহার অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাঠ করিয়া শত শত লোক কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল।। শ্রীগীতা পরিচয়, ভদ্রা, সাবিত্রী, কৈকেয়ী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কলির কবলে পতনোন্মুখ লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারত-সন্তানের প্রাণে আত্মস্মৃতি জাগাইয়া দিতে লাগিলেন। কত লোক তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভের সুযোগ পাইল। যেখানে যেখানে তিনি বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হইতে লাগিলেন তথায় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। আত্মপ্রকাশের চেষ্টা না থাকিলেও পুষ্পের সৌরভের ন্যায়, জ্যোতিষ্কের আলোকরশ্মির ন্যায়, তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞান ও ভক্তির কথা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শাস্ত্রবাক্যকে, ঋষিবাক্যকে তিনি অভ্রান্ত মনে করিতেন। শাস্ত্র পাঠ করিতেন, মনন করিতেন, ধ্যানে অনুভব করিতেন, অনুভূত জ্ঞান লিখিয়া রাখিতেন। উহার কতক কতক অংশ

উৎসবে ও অন্যান্য লেখায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেন নিজেরই জন্য। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দয়াল মহারাজের লিখিত সাবিত্রীর বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন,—"আমাদের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন বিস্তর, প্রকাশ করিয়াছেন অল্প। ...তিনি যবনিকার অন্তরালে থাকিতেই অধিক ভালবাসেন। গৃহকোণে নীরবে অনেক মাধুরী সংগ্রহ করিয়াছেন, বিলাইবার বড় পক্ষপাতী নহেন। যত কিছু লিখিয়াছেন, সকলই নিজের জন্য।"

শ্রীগীতার বিজ্ঞপ্তিতে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,—"ব্যভিচারী চিন্তাকে গুরুবেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধাবান্‌, সাধনসম্পন্ন সাধকের চিন্তাস্রোতের দিকে যদি ফিরাইতে পারা যায়—তবে বুঝি কল্যাণ হইতে পারে। এই কারণে এই প্রয়াস। বুঝিতেই চেষ্টা করা হইয়াছে—বুঝাইতে চেষ্টা করা হয় নাই—কোথাও কোথাও শিক্ষা দিবার ভাব আসিয়া থাকে, তাহা দুর্বলতা ও মূঢ়তা। ভক্ত সাধু-সজ্জন, কৃতবিদ্য মহাজনগণের যে কৃপাপাত্র—শিক্ষা দিবার যোগ্যতা তাহার কোথায়?"

"সেই পূর্ণকে না দেখা পর্য্যন্ত—সেই পূর্ণের শ্রীমুখের কথা সাক্ষাতে না শোনা পর্য্যন্ত বুঝি ইন্দ্রিয়াদি পূর্ণ হইবে না।......পূর্ণ হইয়া গেলে সব করা ফুরাইয়া যায়।...শ্রীগীতা মানুষকে পূর্ণ করিবারই গ্রন্থ। কিরূপে শ্রীগীতা মানুষকে পূর্ণ করিবার পথ দেখাইয়া দিতেছেন তাহা বুঝিবার জন্যই এই আয়োজন।"

তাঁহার পবিত্র সঙ্গ লাভ করিবার সুযোগ যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের অনেকে এখনও জীবিত আছেন। তাঁহাদের মুখে দয়াল মহারাজের কতকথা শুনিবার সুযোগ হয়। তাঁহার লেখায় পাওয়া যায়—সাধনার মুখ্য লক্ষ্য একাগ্রতা। একাগ্রতা ও পবিত্রতা না থাকিলে লাভ করা যায় না। নিজের জীবনে সাধনা কালে এই একাগ্রতা তাঁহার কত গভীর হইত তাহা নানা মুখে শোনা গিয়াছে। ভাবের রাজ্যে তন্ময় হইলে অনেক সময় চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে হইত। বলিতেন, হাড়মাংসের খাচায় মন ফিরিতে চায় না।

আচার্য্যগণ, আপনি আচরণ করিয়া, পরকে শিক্ষা দেন। তিনি সাধনার কঠোরতায় দেহকে গ্রাহ্যই করিতেন না। রুগ্ন দেহে কঠোরতা করিতে নিষেধ করিলেও শুনিতেন না।

মানুষের মনে কত প্রশ্ন জাগে। তিনি শ্রীগীতার স্বাধ্যায় করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কত কঠিন কঠিন প্রশ্নের শাস্ত্রানুকূল মীমাংসা করিয়াছেন। লিখিয়া

লিখিয়া শাস্ত্র পড়িতে বলিতেন। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় 'বিচার-চন্দ্রোদয়' গ্রন্থে সরলভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের পঞ্চোপাসক-দের জন্য নানাবিধ স্তব স্তুতির, শ্রুতির নিত্যপাঠ্য অনেক মন্ত্রের ব্যাখ্যার সহিত ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন। অনুরাগে সতী স্ত্রী কিরূপে স্বামীর ভাবে সম্পূর্ণ-ভাবিত হইয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মের উদ্‌যাপন করিয়া জীবন ধন্য করে "ভদ্রা" গ্রন্থে তাহা অতি মধুর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'ভদ্রা'র সূচনায় লিখিয়াছেন—"সংযমশূন্য বিবাহ, সংযমশূন্য ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নহে। যে বিবাহে সংযম অভ্যাস হয়না, সে বিবাহ সুখের হইতে পারে না। স্বামী ভিন্ন সংযম অভ্যাস করাইতে আর কাহারও সাধ্য নাই, সংযম শিক্ষা যে সে দিতে পারেন, কিন্তু অভ্যাস করাইতে স্বামীই সমর্থ। যৌবনই সংযম অভ্যাসের প্রকৃত সময়। বৃদ্ধকালের শক্তিহীনতা সংযম নহে। ভালবাসাশূন্য বিবাহ অস্বাভাবিক। বিবাহিত জীবনে ভালবাসার বিকৃতি ঘটে তজ্জন্য বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক।" "পতি ও গোবিন্দ এক। পতিই গোবিন্দ দেখাইয়া দিয়া থাকেন।"

সতী স্ত্রী কিরূপে সাধনার দ্বারা স্বামীকে যমকবল হইতে মুক্ত করেন "সাবিত্রী" গ্রন্থে মনোজ্ঞ ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। "সাবিত্রী" গ্রন্থের ৩য় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে ঐ গ্রন্থে লিখিত উপাসনাতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"উপাসনাই ভারতবাসীর সর্ব্বস্ব। প্রত্যহ তিনবেলায় কি স্ত্রী পুরুষ সকলেরই ইহা করণীয়। উপাসনার অবহেলায় ভারতের দুর্গতি আসিবেই। আর ইহার আদরে সৌভাগ্যের উদয় অবশ্যম্ভাবী। ঋষিগণের অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠানের উপদেশ এই উপাসনা ব্যাপারে প্রোথিত। সাধ্যমত আমরা এখানে করণীয় ব্যাপারগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব। বুঝিয়া নিত্য করিলেই সৌভাগ্য আসিবে। শেষফল শ্রীভগবানের হাতে।"

"ভদ্র"ার পরিশিষ্টেও ঐরূপ সাধনার অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশ—করিয়াছেন। সঙ্গদোষে পবিত্র হৃদয়ও কিরূপে কলুষতা প্রাপ্ত হইয়া নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ করে শ্রীশ্রীরামায়ণের চরিত্র কৈকেয়ীর জীবনী অবলম্বনে "কৈকেয়ী" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া স্বার্থপর কুলোকের সহকারী জনগণের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিতে লিখিয়াছেন—"শত অপরাধ করিয়াও যদি কেহ আপনার অপরাধ বুঝিয়া সেই অপরাধের জন্য শ্রীভগবানের কাছে বিশ্বাসেও দাঁড়াইতে পারেন তবে ক্ষমাসার শ্রীভগবান্‌ তাহাকেও ক্ষমা করেন, করিয়া শত-অপরাধীকেও নূতন জীবন প্রদান করেন।—কৈকেয়ী চরিত্রের এই শিক্ষা নিজে নিজে আচরণ করিয়া দেখিবার বিষয়।"

নামে রুচি জন্মাইবার "শ্রীশ্রীনামরামায়ণ" নিত্য পাঠের অপূর্ব্ব ধর্ম্মগ্রন্থ।

ভারতে সমাজের স্রোত যেভাবে অকল্যাণের দিকে চলিতেছে তাহার গতি ফিরাইতে দয়ালমহারাজের লেখনীপ্রসূত গ্রন্থসকল বড়ই সহায়ক। উহাদের পুনর্মুদ্রণ হইলে সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। হিন্দিভাষায় অনূদিত হইলে ভারতে ও ভারতের বাহিরের লোকের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। অনেক স্বনামধন্য অর্থশালী দাতামহাজনগণ সমাজের কল্যাণে বহুঅর্থ ব্যয় করিতেছেন। ঐ সকল ধার্ম্মিক মহাত্মাদের দৃষ্টি এই বিষয়ে পড়িলে পুনর্মুদ্রণ ও অনুবাদকরণ কঠিন হইবে না।

মহাত্মা দয়ালমহারাজের পবিত্র স্মৃতি আমাদিগকে সৎপথে লইয়া যাউক ইহাই প্রার্থনা।*

—০—

সংবাদ

দেবযানে প্রকাশিত 'ওঙ্কারেশ্বরের পত্র'-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন—"তিনি ভাল আছেন—এর বেশী সীতারামের মৌনকালীন সংবাদ দেওয়া ঠিক হইবে না।" 'ওঙ্কারেশ্বরের পত্র'-লেখক জানাইয়াছেন—এইজন্য পত্রের প্রকাশ বন্ধ করা হইতেছে।

*　　*　　*　　*

শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল আছেন—তাঁহার মৌনব্রত চলিতেছে—শ্রীমৎ গোবিন্দ দাসজীর পত্রে ইহা আমরা অবগত হইয়াছি।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন শ্রীঠাকুর সমাগত সকলকেই স্পর্শ-প্রণামের অধিকার দান করেন। ইহার জন্য তিনি প্রত্যেকের নিকট হইতে কমপক্ষে ১০০৮ ইষ্ট-মন্ত্র-জপ—শুল্করূপে গ্রহণ করেন।

*　　*　　*　　*

বহরমপুরের (উড়িষ্যা) অনন্তকালোদ্দিষ্ট নামযজ্ঞের উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় পৌষ-সংক্রান্তির দিন ওঙ্কারমঠে আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার মৌনমিলন—সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর তীর্থসঙ্গী ছিলেন—শ্রীমৎ প্রণবানন্দ কিঙ্কর ও অপর দুইজন ভক্ত।

*　　*　　*　　*

* মহাত্মা দয়াল মহারাজের তিরোভাবতিথি (ফাল্গুন, কৃষ্ণা-একাদশী) উপলক্ষ্যে।

শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়ের বঙ্গদেশীয় এই সেবকগণ রাজোল (অন্ধ্র প্রদেশ) নামযজ্ঞে যোগদান করিয়াছেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া যজ্ঞের সাফল্যের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতেছেন—শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমধুসূদন মণ্ডল, শ্রীপঞ্চানন পেড়ী, শ্রীকাশীনাথ ঘোষ, শ্রীগণেশলাল মাঝি, শ্রীগোপাল ধলে, শ্রীঅশ্বিনী কুণ্ডু, শ্রীহীরালাল দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীমদন সাধুখাঁ, শ্রীশঙ্কর হালদার, কিঙ্কর শ্রীরমানন্দ, কিঙ্কর শ্রীসন্তদাস, শ্রীশম্ভু মোদক, শ্রীদুর্গাপদ বিশ্বাস, শ্রীপঞ্চানন ধারা ও শ্রীপশুপতি ধারা।

*   *   *   *

২রা অগ্রহায়ণ শ্রীকাশী-রামাশ্রমের সেবকগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'নগর-পরিক্রমণ' সমাপ্ত হয়। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমে নামযজ্ঞ ও নরনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

*   *   *   *

১৫ই পৌষ বিজুর (বর্ধমান) গ্রামের শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ হয়। উৎসবের অনুষ্ঠান সূচী এইরূপ ছিল—গুরুপূজা পুষ্পাঞ্জলি দান, নরনারায়ণ সেবা। স্থানীয় ভক্তগণের সহযোগিতায় নামযজ্ঞ সম্পূর্ণতা লাভ করে। নবগ্রাম—অনন্তকালোদ্দিষ্ট নামযজ্ঞের সেবক শ্রীসেবাদাস গোস্বামী এবং শ্রীআনন্দময় কিঙ্কর এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

*   *   *   *

বিজুর (বর্ধমান) জয়গুরু সম্প্রদায় কর্তৃক এই গ্রামের শ্রীযুক্ত ধর্মদাস চক্রবর্তীর বাসভবনে কার্ত্তিক মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে উদয়াস্ত অবিরত নাম-যজ্ঞ হয়।

*   *   *   *

৩০শে পৌষ রাত্রিশেষে ত্রিবেণী-জয়গুরু সম্প্রদায়ের 'মহামন্ত্র-মঠ'-এর সেবকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের দীক্ষাস্থলে এবং অন্যত্র নাম প্রচার করেন।

*   *   *   *

বহরমপুরের (উড়িষ্যা) অনন্তকালোদ্দিষ্ট অবিরত নামযজ্ঞের সংবাদ পূর্বে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই যজ্ঞ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চৌধুরী শ্রীশ্রীঠাকুরকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে নামযজ্ঞের বিস্তৃত সংবাদ আছে। এই জন্য তাঁহার পত্র নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করা হইতেছে।

"বাবা! আপনঙ্কর চরণকমল দর্শন করি আম্ভমানে আনন্দ সাগররে নিমগ্ন হেলু। আপনঙ্কর নামযজ্ঞ আপনঙ্কর আশীর্বাদরে আনন্দরে চলুছি। পুনি

আশীর্বাদ করন্তু, আউরি পরমানন্দরে নাম চলি পৃথিবী শুদ্ধা সবু লোক আনন্দরে মগন হেই যাউ। দ্বিতীয় প্রার্থনা— আপনঙ্কর মৌন ভঙ্গ পরে বহরমপুর শ্রীনাম-যজ্ঞরে আম্ভমানে প্রথম পদধূলি পাইবা পাই আশা করি অছু। আম্ভমানঙ্কর সে আশা পূর্ণ করি আম্ভমানঙ্কু কৃতার্থ করিবে।"

"পরমব্রহ্ম নারায়ণ! আপনঙ্কর আশীর্বাদ পত্র পাই আম্ভমানে কৃতার্থ হেলু। আপনঙ্কর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করি পরমব্রহ্ম নারায়ণঙ্কু দর্শন কলা পরি পরম আনন্দিত হেলু। আম্ভমানঙ্কর প্রার্থনা এতে কি যে, আপনঙ্কর শুভ কল্যাণরে জগত লোকে ভগবানঙ্ক প্রেমরে আনন্দরে সুখরে রহিবে বলি প্রার্থনা করি অছু।

"আপনঙ্কর নিজ ইচ্ছারে বহরমপুর থিবা শুনি বড় আনন্দিত হেলু। আপনঙ্কর আসিবা পাঁই আম্ভমানে পথ চাঁহি রহিলু।

"নামরে যেতেক লোক আছন্তি, যেথিরে অভাব থিবা লোক হারমনিয়ম বাজিইবা ও গাইবা লোক আউ ৪।৫ জন হেলে জগত আনন্দরে পুরি উঠিব। আউ কৌনসি অসুবিধা নাহি। পাঠর জোগাড় হেউছি—দুমাস ভিতরে হব। নাম ভিতরে আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্তঙ্কর শ্রদ্ধা অছি ও সমস্তে যোগদান করুছি। বাহারকু আপনি ভবিষ্যৎ চালিবা পাঁই জোগাড় চালুচি। জোগাড় পূর্ণ হব— আপনঙ্কর শুভ পদার্পণ হেলে।

"পুরীর নামরে লক্ষ্য দেবার চেষ্টা করিবু। সদা বেলে আম্ভমানঙ্কর উপররে আপনঙ্কর আশীর্বাদ থিব বলি বিনীত প্রার্থনা করি অছু।"

* * * *

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী (কটক, উড়িষ্যা) শ্রীশ্রীঠাকুরের 'মহারসায়ন'-গ্রন্থের উড়িয়া-অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে—আশা করা যায়।

—০—

উজ্জয়িনী পূর্ণ কুম্ভ

স্থিতি ১লা বৈশাখ হতে ৩০শে বৈশাখ

এবার পূর্ণকুম্ভ মেলা, উজ্জয়িনী বা সপ্ত-পুরীর অন্যতম অবন্তিকা পুরীতে। উজ্জয়িনীর দূরত্ব ওঙ্কারেশ্বর থেকে ৯৬ মাইল। পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তর-প্রদেশ, বিন্ধ্য-প্রদেশ, বিহার, আসাম, পূর্ব্ব-পাকিস্থান, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মান্দ্রাজ এবং প্রায় সম্পূর্ণ বোম্বাই প্রদেশের কুম্ভ যাত্রীদের উজ্জয়িনী যাবার পথ ওঙ্কারেশ্বর রোড ষ্টেশন (এখান থেকে ৭ মাইল)-এর উপর দিয়ে। কাজেই উল্লিখিত স্থান সমূহ হ'তে আগমনেচ্ছু ঠাকুরের সন্তানদের এক যাত্রায়, এক খরচে কুম্ভমেলা ও ঠাকুরের মৌনজীবন দর্শনের এ এক মহাসুযোগ।

অপরাপর কুম্ভমেলার মত উজ্জয়িনীতেও শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের নাম প্রচার করার আদেশ করেছেন। আগামী ২৫শে চৈত্র সোমবার আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্ব্বাণী নিয়ে এখান থেকে কুম্ভ যাত্রা করবো। নাম প্রচারে যোগদানেচ্ছু সকলকে বিনীত প্রার্থনা জানানো হচ্ছে, তাঁরা যেন বাদ্য-যন্ত্রাদি সহ ২৫শে চৈত্রের পূর্ব্বেই এখানে উপস্থিত হন। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত যাঁরা শ্রীনাম প্রচারে রত থাকবেন তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ঠাকুরের কুম্ভমেলার প্রচার শিবিরেই হবে।

২৫শে চৈত্র থেকে এখানকার যোগাযোগ রক্ষা করবেন কিংকর শ্রীধীরানন্দজী ও কিংকর শ্রীমাধবানন্দজী।

আমাদের ঠিকানা (ইংরেজীতে লিখতে হবে)—

C/o SRI MAUR SINGH
Municipal President,
Jalprabah Yantra Mahal,
Ujjain.

খাণ্ডোয়ায় গাড়ী বদল করে ছোট লাইনে উজ্জয়িনী যেতে হয়। হাওড়া থেকে খাণ্ডোয়ার ভাড়া সাতাশ টাকা—খাণ্ডোয়া থেকে উজ্জয়িনী চার টাকা নয় আনা।

বিনীত
কিংকর শ্রীগোবিন্দ দাস।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পত্র

৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি
৩০।৯।৬৩

ঠাকুরের আশীর্বাদ—

দেখতে দেখতে এক বৎসর চলে গেলো। সীতারামের বাবারা মায়েরা—যারা সীতারামকে চাস—তাদের বলছি—তোরা ঠাকুরকে ভালবাসবি ও নাম করবি। ওরে ওরে—নামের অপূর্ব শক্তি! নাম দুর্দান্ত মনকে শান্ত ক'রে অন্তরে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ। দূরে যেতে হবে না, আপনার অন্তর—অরব-রবে আলোকে পুলকে আনন্দে অশোকে অভয়ে আকাশে আশ্বাসে সগুণে নির্গুণে—চির সমুজ্জ্বল! ওরে আয়, আয়রে বাবারা মায়েরা, নাম ক'রে ক'রে তোদের অন্তরে ফিরে আয়, আনন্দে আলোকে ডুবে যা—আয় আয়!

* * * *

আমার ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন—"শ্রীশ্রী৺মঙ্গলময় সমীপে প্রার্থনা করি—দীর্ঘজীবী হইয়া সত্যধর্ম-প্রচার দ্বারা লোকোপকারে নিরত থাক, এবং শ্রীশ্রী৺মঙ্গলময়ের বিশেষ কৃপাভাজন হও।"

সীতারাম শ্রীগুরুদেবের আদিষ্ট সত্যধর্মপ্রচারে বাবাদের মায়েদের অংশ দিতে চাচ্ছে। প্রতি গৃহস্থ—যিনি প্রধান, তিনি তাঁর সন্ধ্যাপূজা-অন্তে নিত্য একটি ক'রে পয়সা শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করত রাখবেন এবং বৎসরান্তে 'দেবযান'-কার্য্যালয়ে পাঠিয়ে দিবেন—তাঁদের স্বতন্ত্র আর দেবযানের চাঁদা দিতে হবে না এবং সীতারামের সত্যধর্মপ্রচারেও সাহায্য করা হবে।

* * * *

কোটি কোটি জনমের সাধনার ফলে
লভিয়াছ নরকায় দেবতাবাঞ্ছিত।
স্বপনের সুখদুঃখ চরণেতে দলে
নামসুধাসিন্ধু-নীরে হও নিমজ্জিত॥
আলোকে পুলকে ভরা হৃদয় হইতে
বেণুরবে ডাকিছেন মদনমোহন।
হও অগ্রসর—নাম গাহিতে গাহিতে
অবশ্য পাইবে তুমি সাক্ষাৎ-দর্শন॥
ঠাকুরে বাসিবে ভাল, আশিস জানিবে—
উঠিতে বসিতে সদা নাম লয়ে রবে।

তোমাদের—
সীতারাম
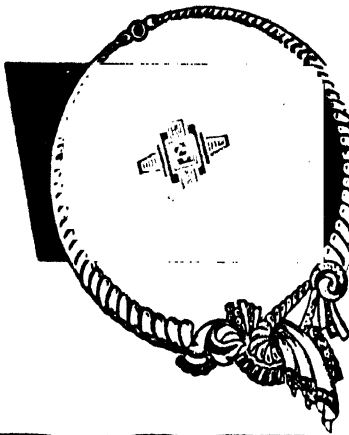
—*—

জুয়েলার্স
G.C.D.
১২৫ বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ,
অষ্টম সংখ্যা

চৈত্র
১৩৬৩

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ॥

সন্তবাণী

১০০৪। যে পর্য্যন্ত এই শরীর সুস্থ, যতক্ষণ বৃদ্ধাবস্থা দূরে আছে, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গণের শক্তি ক্ষীণ না হয় আর যে পর্য্যন্ত আয়ু শেষ না হয় সে পর্য্যন্ত পরমাত্মাকে পাবার জন্য উপায় করে নাও। ঘরে আগুন লাগার পর যে কূপ খননের কথা ভেবে চুপচাপ বসে থাকে তাকে পুড়ে যেতে হয়।

১০০৫। ভগবানের নামই ভব রোগের ঔষধ। ভাল না লাগলেও নাম কীর্ত্তন করতে থাকা কর্ত্তব্য। করতে করতে ক্রমে নামে রুচি হ'য়ে যাবে।

১০০৬। বিষয়ী পুরুষ নিম্নলিখিত তিনটী কথা নিয়ে অনুতাপ করতে করতে মরে—(১) ইন্দ্রিয়গণের ভোগে তৃপ্তি হয় নাই, (২) মনের বহুপ্রকার আশা অপূর্ণই রয়ে গেল, (৩) পরলোকের জন্য কিছু সঙ্গে নিতে পারলাম না।

১০০৭। জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সবকর্ম্মের নাশ হয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ অনায়াসে মুক্ত হয়ে যায়।

১০০৮। উচ্চ জাতির অহঙ্কার কেউ ক'রোনা, কেননা মালিকের দরবারে কেবল ভক্তিই প্রিয়।

১০০৯। যদি কোন দুর্ব্বল মনুষ্য প্রভুর কাজে লেগে যায় তা হ'লে তারও শেষে প্রভুর বল মিলে যায়। এ প্রকার যদি কোন বলবান পুরুষ লৌকিক স্বার্থেই লেগে থাকে তা'হলে পরিণামে বলহীন ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে।

১০১০। যে মূর্খলোক বাইরের কামনা সমূহে লেগে থাকে সেই বিষয়াসক্ত পুরুষ মৃত্যুর আধি ব্যাধিরূপ বিস্তৃত পাশে বন্দী হয়। এজন্য ধীর পুরুষ নিত্য অমৃতত্বকে জেনে অনিত্য বস্তুসকলের ইচ্ছা করে না।

১০১১। শান্ত-স্বভাব থাকো, কারুর দ্বারা আপনার উপর কোনরূপ লাঞ্ছনা হলেও মনকে বিকৃত ক'রোনা।

১০১২। যে লোভী বিষয়ের আশা সমূহের দাস হ'য়েছে সে তো সকলের গোলাম। যে ভগবানকে বিশ্বাস ক'রে আশাকে জয় করেছে সেই তো ভগবানের যথার্থ সেবক।

১০১৩। বাইরের সাজা-সাধুতে আর প্রকৃত সাধুতে এরূপ পার্থক্য যেমন পৃথিবী আর আকাশে। সার মন রামে লেগে থাকে আর সাজা-সাধুর মন জগতে ও বিষয় সকলে।

১০১৪। যে ফলের জন্য ভগবানের সেবা করে, মনের দ্বারা কামনা ত্যাগ করে না সে চতুর্গুণ প্রার্থী, সেবক নয়।

১০১৫। যার মন পরমাত্মাতে থাকে পরমাত্মা তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

১০১৬। মানুষ যখন কোন উত্তম কার্য্যে রত হয় তার নীচ শ্রেণীর কার্য্য অপরে আপনিই সামলে লয়, এ প্রকার মানুষ যেমন যেমন আপনার ধ্যেয়ের দিকে অগ্রসর হয় তেমন তেমন তার সাংসারিক ও শারীরিক কার্য্য ঐশ্বরিক শক্তিতে উল্টে গিয়ে উত্তমরূপে হ'তে থাকে।

১০১৭। যে বিদ্যার দ্বারা লোক জীবন সংগ্রামে শক্তিমান হয় না, যে বিদ্যায় মানুষের চরিত্রের বিকাশ হয় না আর যে বিদ্যার দ্বারা মনুষ্য পরোপকার-প্রেমী এবং পরাক্রমী হয় না তার নাম বিদ্যা নয়।

১০১৮। প্রতিশোধ নেবার খেয়াল ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা করো, অন্ধকার হতে আলোকে আনো এবং বেঁচে থেকেই মনকে নরকের স্থানে স্বর্গসুখ ভোগ করাও।

১০১৯। আসল সত্ত্বগুণী ভক্তলোক রাত্রিতে মশারীর মধ্যে শুয়ে শুয়ে ধ্যান করেন। লোকে বুঝে যে এ ব্যক্তি শুয়ে আছে, পরন্তু যে সময় সব লোক

শয়ন করে সেই সময় তিনি পরলোকের কাজ করতে থাকেন। তিনি বাইরে দেখানো একবারেই পছন্দ করেন না।

১০২০। এই জগতে কোটী পুরুষ প্রভুর উপাসক বলে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃত উপাসক কে এবং প্রভু কার সঙ্গে আছেন?

যিনি ঈশ্বরকে ভয় ক'রে চলেন, আপনার স্বার্থ নাশ ক'রেও অপরের হিত ক'রে থাকেন, তিনিই যথার্থ উপাসক আর ভগবান তাঁর সঙ্গেই আছেন।

১০২১। আন্তরিক রোগের পাঁচটী ঔষধ—(১) সৎসঙ্গ, (২) ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, (৩) অল্প আহার, (৪) রাত্রে এবং প্রাতঃকালে উপাসনা, (৫) প্রত্যেক কার্য্য একাগ্রতার সহিত সম্পূর্ণ শক্তি লাগিয়ে করা।

১০২২। জগতের প্রভুতা কেমন, যেমন স্বপ্নে প্রাপ্ত হওয়া পরের কোষাগার। জাগলে পর যেরূপ ঐ কোষাগারের কিছুই থাকে না সেই রূপই জগতের প্রভুতা কিছুই নয়।

১০২৩। যেমন একই অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠে প্রবেশ ক'রে অনেক প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট হয়, এইপ্রকার একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভূত সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়ে যান।

১০২৪। অহঙ্কারের কারণেই আত্মার 'আমি দেহ' এরূপ বুদ্ধি হয় এবং সেই কারণে তিনি সুখ দুঃখাদিপ্রদ জন্ম মরণরূপ সংসারকে প্রাপ্ত হন।

১০২৫। যদি কারও পিতা বা পুত্র মারা যায় তা হলে মূর্খ লোকই তার জন্য বুক চাপড়ে কাঁদে। জ্ঞানীর জন্য তো এই অসার-সংসারে কারুর বিয়োগ হওয়া বৈরাগ্যের কারণ হয়, আর তাহা সুখ শান্তির বিস্তার করে।

১০২৬। কচ্ছপের পীঠের উপর যদি লোম গজায়; বন্ধ্যার পুত্র কা'কেও মারে; আকাশে ফুল ফুটে; মৃগতৃষ্ণায় পিপাসা উপশম হয়; খরগোশের শিং হয়, অন্ধকার সূর্য্যকে নাশ করে দেয় এবং বরফে অগ্নি প্রকট হয়, তবু রাম হতে বিমুখ মানুষ কখনও সুখী হতে পারে না।

১০২৭। জ্ঞানীর বুদ্ধিতে ফল এবং হেতুর দ্বারা আত্মার পৃথক্‌তা প্রত্যক্ষ, এজন্য তাঁর মনে অনাত্ম পদার্থে 'আমি এই' এরূপ আত্ম ভাব হতে পারে না।

১০২৮। গোবিন্দের বিরহে আমার নিমেষ কালও যুগের সমান গত হচ্ছে। আমার নয়ন দ্বয় বর্ষাঋতুর রূপ ধারণ করেছে এবং সমস্ত জগৎ আমার শূন্যের মত প্রতীত হচ্ছে।

১০২৯। প্রভুকে প্রাপ্ত করবার প্রথম সাধন প্রভুকে লাভ করবার নিশ্চয়তা। এই নিশ্চয় হওয়ার পরই ইন্দ্রিয়গণকে আপনার বশে রাখার আবশ্যকতা প্রতীত হয়, কুবিচার ক্ষীণ হ'য়ে যায় এবং উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১০৩০। ওরে বুদ্ধি চক্রবাকী, তুই ভগবানের চরণ-সরোবরে গিয়ে বোস, সেখানে তো কখন প্রেম বিয়োগ হবে না!

১০৩১। কাল যা করবার তা আজই ক'রে নাও আর যা আজ করবার তা এখনই ক'রে নাও, এক পলের মধ্যে মৃত্যু হয়ে যেতে পারে, ফের কখন করবে। লোক কি রকম পাগল যে মিথ্যা সুখকে সুখ বলে আর মনে আনন্দ লাভ করে। আরে, এই জগৎতো কালের ভাজা ছোলামটর চানাচুর, কেউ কালের মুখের মধ্যে, আর কেউ হাতে।

১০৩২। জগতের জীবন জলের তরঙ্গের ন্যায়, একটী উঠে অপর বিলয় হয়ে যায়।

১০৩৩। লোক সকলের কাছে আপনার দোষ স্বীকার করতে যাঁর কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না উপরন্তু যিনি এতে আপনার কল্যাণ বলে মনে করেন, আর যিনি আপনার উত্তম কার্য্য লোকসমূহকে জানাতে চান না ও যিনি দৃঢ়নিশ্চয়ী তিনি সত্যনিষ্ঠ এবং যথার্থ সাধক।

১০৩৪। পরমাত্মাদেবকে জেনে নিলে পর সমস্ত বন্ধন নাশ হয়ে যায়, ক্লেশসমূহ ক্ষীণ হওয়ায় জন্ম মৃত্যুর অভাব হয়ে যায়। পরমাত্মার ধ্যান করলে তিন দেহের ভেদ হয়ে যায় এবং তখন সেই আপ্তকাম বিশ্বের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন।

১০৩৫। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সমূহে কামনা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত না হওয়া উচিত। এবং মনের দ্বারা তাদের বিরুদ্ধ ভাবনা ক'রে অর্থাৎ বিষয় মিথ্যা এবং পরিণামে নরকে নিয়ে যায় এরূপ বিচার ক'রে তাদের অতিপ্রসঙ্গ ছেড়ে দিতে হবে।

১০৩৬। এই সমস্ত বিশ্ব ভগবানের বিস্তৃত রূপ। অতএব বুদ্ধিমানগণের উচিত এই যে, সকলকে অভেদ দৃষ্টির দ্বারা আপনারই সমান দেখা।

১০৩৭। অনুরাগের সমান সংসারে দুঃখের অন্য কোন কারণ নাই। রাগই সকলের চেয়ে প্রধান দুঃখপ্রদ, এবং ত্যাগের সমান কেউ সুখদাতা নাই।

তুমি-আমি

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

হে আমার তুমি, তুমি চিরসুন্দর, শান্ত, সমুজ্জ্বল, অপরিম্লান, অতি-সুবিমল, পরম প্রেমময়, আনন্দঘন, চিরন্তন, চিরপুরাতন, চিরনবীন।

আর আমি চিরমলিন, নিবিড় আঁধার, অমাবস্যার সান্দ্রঅন্ধকার, প্রেমগন্ধ-হীন, কঠোর, কর্কশ, তীব্র, উগ্র, নিষ্ঠুর, পাষাণ, বজ্র হতেও কঠিনতম। তোমার আলো সহ্য করতে পারি না—তোমাকে আমার কালো দিয়ে মলিন করে কত ব্যথা পাই, ব্যথা দিই।

হে আমার তুমি! তুমি মুখ—এটা অতিমলিন দর্পণ। এতে তোমার নির্ম্মল, সুশোভন, মৃদুহাস্য সুশোভিত রমণীয় মুখখানিও মলিন দেখায়।

আজ একটা কথা তোমায় শুনাই। তুমি ঠিকই চিরনবীন, চিরসুন্দর—আছ, ছিলে, থাকবে—তোমাকে যথার্থরূপে কি করে দেখা যাবে, বুঝা যাবে, ধরা যাবে সেই কথাই মনে করছি। তুমি না কৃপা করলে তোমাকে ধরতে পারবো না; বহুর মাঝে হারিয়ে ফেলে হাহাকার করছি, করবো।

শোন আমার মনের কথা। হে দয়িততম! আমি পুত্র হই আর তুমি পিতা সাজ—আমি যদি তোমার কার্য্যের, তোমার পদ্ধতির, তোমার স্নেহ ভালবাসার সমালোচনা ক'রে তোমাকে দোষ দিই—বিদ্যার্জ্জনে, ধনার্জ্জনে স্বীয় সামর্থ্যের প্রকট করি সে তোমার দোষ নয় সে আমার মলিন চিত্ত দর্পণের। তুমি চির অমল, চির জাজ্জ্বল্যমান, অতি পবিত্র, বিশুদ্ধ, পাবন।

পক্ষান্তরে আমি পিতা তুমি যদি পুত্র সাজ—আর আমি পুত্ররূপী তোমার অশেষ দোষ আবিষ্কার করি—তোমার পিতৃভক্তি নাই, তুমি অবিনীত, অবাধ্য, পিতৃদ্রোহী বলি, তাহ'লে তা' এ মলিন চিত্তদর্পণের দোষ। তুমি চির সুন্দর, মনোরম, অভিরাম, পাবনতম—দোষ আমার।

হে বাঞ্ছিততম! তুমি যদি অগ্রজ সাজ আর আমি অনুজ হ'য়ে তোমার দোষ খুঁজে খুঁজে বের করতে থাকি, অগ্রজ স্নেহহীন, স্বার্থপর, আমার দ্বারা কেবল স্বার্থসিদ্ধি করতে চান বলি—সে দোষ তোমার নয়, আমার। তুমি অগ্রজ চিরনির্ম্মল, চিরসুন্দর, সুললিত, সুশোভন, পরম পাবনতম। তোমার লেশমাত্র দোষ নাই।

আবার তুমি যদি অনুজ সাজ আর আমি অগ্রজ হ'য়ে তোমার ত্রুটী,

তোমার শত শত দোষ প্রকাশ করি, তোমার ভক্তিহীনতা, তোমার কুটিলতা, স্বার্থপরতার কথা প্রচার করতে থাকি—সে দোষ আমার—আমার মলিন দৃষ্টির; সমলচিত্তের। তুমি ঠিকই লক্ষ্মণের ও ভরতের ন্যায় ভ্রাতা। আমি আমার মহামলিন চিত্তের দোষে তোমার দোষ প্রকটিত ক'রে বুকের ব্যথায় সারা হই।

হে সুচির-ঈপ্সিত! হে প্রাণেশ্বর! তুমি যদি পতি সাজ এবং আমি পত্নী হ'য়ে তোমার ভালবাসার, তোমার প্রেমের নিন্দা ক'রে কর্কশ ব্যবহারের কথা লোক সমাজে বলে বেড়াই, অতি হৃদয়হীন, দুঃশীল, দুর্মুখ পতি বলে যন্ত্রণা ভোগ করি—সে দোষ আমার। তুমি চিররমণীয়, মোহনীয়, কমনীয়, বরণীয়—অতি পাবনতম। তোমাকে মলিন করি আমার মহামলিন চিত্তের কালিমা দিয়ে।

আর তুমি যদি পত্নী সাজ আমি স্বামী হই এবং আমি যদি কেবল তোমার দোষ দর্শন ক'রে তোমাকে লাঞ্ছনা করতে থাকি, কষ্ট দিই, জন সমাজে অতি দুষ্টা বলে, মুখরা ভক্তিহীনা বলে প্রচারে রত হই—হে মহা-বিশুদ্ধ! হে প্রিয়তম! সে দোষ তোমার নয়—আমার মলিন, সান্দ্রঅন্ধকার চিত্তদর্পণের।

হে ঈপ্সিততম! তুমি গুরু সাজ এবং আমি শিষ্য হয়ে যদি তোমার দোষ, তোমার ভালবাসার বৈষম্য দেখি—তোমার পক্ষপাতিত্ব এবং আমার প্রতি অকৃপার কথা সকলকে জানাই—সে দোষ তোমার নয়—তা আমার নিবিড়, ঘন অন্ধকারে গড়া চিত্তদর্পণের।

পক্ষান্তরে তুমি শিষ্য সাজ আর আমি গুরু হই এবং কেবল তোমার সেবার ত্রুটী, ব্যবহারের দোষ, তোমায় কায়-বাক্য-মনের দুষ্টতা সতত আবিষ্কার ক'রে, অযোগ্য অধম শিষ্যের যন্ত্রণায় সারা হই—সে দোষ তোমার নয়, আমার এ গাঢ় অন্ধকারে গড়া দুষ্ট চিত্তের।

প্রিয় হে! যা কিছু সব তুমি! অতি সুনির্ম্মল, চির সুন্দর চির সুশীতল তুমি। আমি আমার মলিন মানস দর্পণে তোমার শ্রীহীন ছবি অঙ্কিত করে যন্ত্রণা পাই, কত কথা বলি, নিন্দা করি, হৃদয়ের জ্বালায় অস্থির হই।

হে অতি মহাপাবন! হে আপাপবিদ্ধ নিত্য শুদ্ধ! হে দয়িত! তুমি এ চিত্তকে পরিপূত করে দাও—নচেৎ কেবল আঘাতের পর আঘাত দিয়ে তোমাকে ব্যথিত করে চলেছি কত কাল, আরও চলবো কত জন্ম! শুধু বুঝিয়ে দাও জানিয়ে দাও—দোষ কারও নয়—দোষ আমার। অপরের

দোষ-দর্শন দূর করে দাও প্রিয়—দাও নাথ! আমাকে আমার নিজের দোষ-দর্শনে নিরন্তর নিরত রাখ।

কি আশ্চর্য্য! আমি নিজে ভালবাসিনা আর বলি অমুক আমায় ভালবাসেনা। আমি ভালবাসিনা বলে তার ভালবাসা বুঝতে পারিনা। যে মুহূর্ত্তে আমি তাকে ভালবাসবো দেখবো সে আমায় কত ভালবাসে। সে যে আর কেউ নয়, ছদ্মবেশী তুমি।

হে নটচূড়ামণি প্রিয়তম! একমাত্র তুমিই আছ। আকাশ হ'য়ে, পর্ব্বত হ'য়ে, নদনদী, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, গো গর্দ্দভ, বানর ভল্লুক, ভূত-প্রেত, পিশাচ, দানব, মানব, গন্ধর্ব্ব কিঙ্কর আমার যা কিছু দৃশ্য—তুমিই সব সেজে বিরাজ করছো। আর আমি আমার মলিনতম চিত্ত দিয়ে তোমাকে আলাদা আলাদা দেখে সংসার রচনা করছি। একমাত্র চিরমধুময় শান্তিময় প্রেমময় তোমাকে পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দিয়ে স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করছি। সেই দয়িততম তোমাকে চক্ষু দিয়ে রূপ বলে নিচ্ছি, কর্ণের দ্বারা শব্দ বলে, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ বলে, নাসিকার দ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস বলে গ্রহণ কর্‌ছি—কিন্তু মূলে সেই এক পরম সত্য পরম প্রেমময়, আনন্দময়, আমার মনের মন, প্রাণের প্রাণ প্রিয়তম তুমি।

হে আমার সকল সাধনের সাধ্য, দয়িততম! পড়ি, শুনি, অভ্যাসের চেষ্টা করি—কিন্তু হে প্রাণবল্লভ! তোমার করুণা ভিন্ন তো তোমাকে যথার্থ ভাবে গ্রহণ করতে পারবো না। কৃপা কর প্রিয়তম! সকল সেজে তুমি আছ। তুমি আমাকে পবিত্র করবার জন্য, তোমার ক'রে নেবার নিমিত্ত, তোমাতে মেশাবার জন্য সতত ব্যাকুল। আমায় বুঝিয়ে, জানিয়ে, বিশ্বাস করিয়ে দাও আমি যেন কারো দোষ দর্শন না করি। "সব তুমি" একথা মনে প্রাণে বুঝে তোমার গুণগানে যেন অনুক্ষণ রত থাকি। আমি যেন নিজের দোষ দর্শন করে, একটি একটি দোষ ধরে ধরে তোমার চরণে সমর্পণ কর্‌তে সমর্থ হই। দোষের দ্বারা তোমার পূজা করে তোমার হ'য়ে যাই—

নত কর যত কর করহে তোমার।
কেড়ে নাও প্রিয়তম মোর অহঙ্কার॥
আমার আমিরে নাও তোমার করিয়া।
আমি-হারা হ'য়ে থাকি তোমার হইয়া॥

———

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ডি-লিট্]

(পূর্বানুবৃত্তি)

যদিও বিশুদ্ধ পাশুপতমতে ঈশ্বর শ্রুতিসিদ্ধ এবং জগতের উভয়বিধ কারণ ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে তথাপি শৈবাগমের রহস্যানভিজ্ঞ আচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্তরূপই বলিয়াছেন। "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৭) সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, "মহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে……পশুপতিরীশ্বরো নিমিত্তকারণমিতি।…… বৈশেষিকাদয়োঽপি স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণমীশ্বর ইতি।"

এই সূত্রের "ভামতী" নিবন্ধে বলা হইয়াছে যে—"মাহেশ্বরাশ্চত্বারঃ। শৈবাঃ পাশুপতাঃ কারুণিকসিদ্ধান্তিনঃ, কাপালিকাশ্চ। শঙ্করভাষ্যে ও ভামতীতে বিশুদ্ধ বৈদিক পাশুপত সিদ্ধান্ত ও অবৈদিক পাশুপত সিদ্ধান্ত এইরূপ ভেদ প্রদর্শন করা হয় নাই। সাধারণভাবে মাহেশ্বর সিদ্ধান্তে ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত-কারণ এইরূপই বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকণ্ঠভাষ্যে ও তাহার টীকা শিবার্কমণি দীপিকাতে এবং শ্রীকরভাষ্যে বৈদিক অবৈদিক ভেদে পাশুপত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপতঃ দ্বিবিধ বলা হইয়াছে। এই পত্যধিকরণে "ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ" এই অবৈদিক পাশুপত মতের আপাততঃ খণ্ডন করা হইয়াছে। উদ্ধৃত শঙ্করভাষ্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়—বৈশেষিকাদিমতের সহিত পাশুপতমতের সাম্য আছে! ইঁহারা ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণই বলিয়াছেন।

ন্যায়বৈশেষিকগণের পাশুপতত্বপ্রসিদ্ধিঃ—প্রাচীন প্রসিদ্ধি এইরূপ দেখা যায় যে, পাশুপতসিদ্ধান্তানুসারী আচার্য্যগণ ন্যায়বৈশেষিক সূত্রভাষ্যাদির ব্যাখ্যাতে পাশুপতসিদ্ধান্তের অনুপ্রবেশ করাইয়াছিলেন। 'সাংখ্যকারিকার প্রাচীন টীকা যুক্তিদীপিকাতে ষোড়শ কারিকার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, "এবং কাণাদানামপি ঈশ্বরোঽস্তীতি পাশুপতোপজ্ঞমেতৎ।" (৮৮পৃঃ, মেট্রোঃ সং) ইহার অভিপ্রায় পাশুপত সিদ্ধান্ত হইতেই বৈশেষিকমতে ঈশ্বর গৃহীত হইয়াছে।

একাদশ শতকে রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে দ্বিতীয় অঙ্কে অহঙ্কারের উক্তিতে বলা হইয়াছে যে, "এতে চ শৈবপাশুপতাদয়ো দুরভ্যস্তাপক্ষপাদমতাঃ।" ইহার অভিপ্রায়, মহর্ষি অক্ষপাদের যথার্থ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া শৈব-পাশুপতগণ অযথার্থভাবে অক্ষপাদমতের অভ্যাস করিতেছে। প্রবোধচন্দ্রোদয়

নাটকের অহঙ্কার দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়দেশ পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত।

হরিভদ্রসূরি বিরচিত ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ের টীকাতে গুণরত্ন সূরি বলিয়াছেন যে, "নৈয়ায়িকাঃ সদা শিবভক্তত্বাৎ শৈবা ইত্যুচ্যন্তে। বৈশেষিকাস্তু পাশুপতা ইতি।" গুণরত্ন আবার বলিয়াছেন যে, "তেন নৈয়ায়িকশাসনং শৈবমাখ্যায়তে, বৈশেষিক দর্শনঞ্চ পাশুপতমিতি।" (৫১ পৃঃ, সোসাইটি মুদ্রিত)।

ন্যায়বার্ত্তিকগ্রন্থের অবসানে পুষ্পিকাতেও দেখ যায় যে, "ইতি পরমর্ষিভারদ্বাজ-পাশুপতাচার্য্য—শ্রীমদুদ্দ্যোতকরাচার্য্য কৃতৌ ন্যায়বার্ত্তিকে।" এই পুষ্পিকা হইতেও জানা যায় যে, ন্যায় বার্ত্তিককার পাশুপতাচার্য্য ছিলেন।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র যে শিবভক্ত ছিলেন তাহা তাৎপর্য্যটীকার মঙ্গল শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায়। "বিশ্বব্যাপী বিশ্বশক্তিঃ পিনাকী বিশ্বেশানো বিশ্বকৃদ্বিশ্ব-মূর্ত্তিঃ॥ (তাৎপর্য্যটীকা—মঙ্গলশ্লোক)। ন্যায়াচার্য্য উদয়নও ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থে প্রারম্ভশ্লোক হইতেই স্বীয় শিবভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির দ্বিতীয় স্তবকের শেষে "বিশ্বাসৈকভুবং শিবং প্রতিনমন্" এবং চতুর্থস্তবকের শেষে "তন্মে প্রমাণং শিবঃ" বলিয়াছেন। প্রশস্তপাদভাষ্যেরও মঙ্গল শ্লোকে—"প্রণম্য হেতুমীশ্বরম্" বলায় তাঁহারও শিবভক্তি সূচিত হইয়াছে। "ঈশ্বর" শব্দ শিবেরই বাচক। অমর কোষে "ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ঈশানঃ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরঃ" বলা হইয়াছে। প্রশস্তপাদভাষ্যের প্রাচীন টীকা ব্যোমবতীর প্রণেতা ব্যোমশিবাচার্য্য যে শৈব ছিলেন তাহা তাঁহার নামের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ বৈশেষিকাচার্য্য শিবাদিত্য মিশ্রও শৈব ছিলেন।

পাশুপত মতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ অথবা উভয়বিধ কারণ?

আমরা দেখিতে পাই যে, 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৫) এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—পশুপতি পরমেশ্বরের জগতের উপাদান কারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব এই দ্বিবিধ কারণত্বই শ্রুতি সিদ্ধ ও শৈবাগমসিদ্ধ। পরমেশ্বরের এই দ্বিবিধকারণত্ব শ্রুতিএবং শৈবাগম-সিদ্ধ হইলেও কতকগুলি শৈবাগমনিষ্ঠ একদেশী তান্ত্রিক শৈবাগমের অভিপ্রায় যথার্থভাবে বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বর জগতের কেবমাত্র নিমিত্ত কারণ এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহাদের এই মত যুক্তিযুক্ত কিনা ইহাই সন্দেহ। এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষ এই যে, যেমন ঘটাদি কার্য্যের অনুপাদানভূত কুম্ভকারাদি ঘটের কারণ দণ্ডচক্রাদিকে ব্যাপারিত করিয়া ঘটকার্য্যের কর্ত্তা হইয়া থাকে, ঘটাদি কার্য্যে কুম্ভকারাদির মত জগৎকার্য্যে ঈশ্বরও

নিমিত্তকারণ কিন্তু উপাদানকারণ নহে। এজন্য জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর নিমিত্তকারণ মাত্র. উপাদানকারণ নহেন—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। এতদুত্তরে সূত্রকার বলিয়াছেন— ঈশ্বরের কোন নিমিত্তকারণত্ব স্বীকার করা অসঙ্গত। যেহেতু তাহাদের মত শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া অসমঞ্জস। ভাষ্যকারের এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝিতে যায়—শৈবাগমের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ঈশ্বর কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ এইরূপ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রুতি বিরুদ্ধ বটে শৈবাগম বিরুদ্ধও বটে। শ্রুতিতে ও শৈবাগমে ঈশ্বরকে উপাদান- কারণ ও নিমিত্তকারণ এই উভয়বিধ কারণ বলা হইয়াছে। এই ভাষ্যের টীকাতে অপ্যয়দীক্ষিত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের অনুমান প্রমাণ সিদ্ধত্ব ও কেবল নিমিত্তকারণত্ব কেবল বৈশেষিকাদি শাস্ত্রেই বলা হয় নাই 'কিন্তু সকল বেদরহস্যনিধান শৈবাগম সমূহেও বলা হইয়াছে। যাহা বৈশেষিকাদিমতসিদ্ধ এবং সকল বেদরহস্যভূত শিবাগমপ্রসিদ্ধ তাহার প্রত্যাখ্যান কিভাবে সম্ভাবিত হইবে?

এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধান প্রসঙ্গে শিবার্কমণি দীপিকাতে অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন—শিবাগমসমূহের এইরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, ঈশ্বর বেদনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র অনুমানসিদ্ধ এবং ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ। আগমবাদিগণের মধ্যে এইরূপ প্রসিদ্ধির কারণ এই যে, যাহারা সরলবুদ্ধি, বাক্যের আপাত প্রতীতার্থ-মাত্রগ্রাহী, আগমের তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ অথচ শৈবাগমের ব্যাখ্যাতা তাহারাই এই মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাতৃবৃন্দের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অন্যেরাও মনে করিয়াছে যে, শিবাগম সমূহের বুঝি প্রদর্শিত অর্থই তাৎপর্য্য। শিবাগমের তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত অর্থে তাৎপর্য্যভ্রান্তি নিরাকরণের জন্য এই পত্যধিকরণ প্রবৃত্ত হইয়াছে। (শ্রীকণ্ঠ ভাষ্য, ১০৬ পৃ:)।

আবার অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন—এই পত্যধিকরণ দ্বারাই প্রদর্শিত হইয়াছে ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্ববাদ শৈবাগমমূলক নহে কিন্তু শিবাগমের অভিপ্রায়ানভিজ্ঞ ব্যাখ্যাতৃপরম্পরামূলক (শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ১০৯ পৃ:)। যদি বলা যায়, ঈশ্বরের উপাদনত্বনিরাকরণ শৈবাগমেই তো উপলব্ধ আছে। শৈবাগমেই যদি ঈশ্বরের উপাদানকারণত্ব নিষেধ করা হইয়া থাকে তবে ঈশ্বরের কেবল নিমিত্ত-কারণত্ববাদ ব্যাখ্যাতৃগণের অপরাধপ্রযুক্ত হইবে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বেদে কি ঈশ্বরের নির্বিকারত্ব বলা হয় নাই? বেদে ঈশ্বরের নির্বিকারত্ব যাহা বলা হইয়াছে তাহার সমর্থনের জন্যই শৈবাগমে ঈশ্বরের উপাদানত্ব নিরাকরণ করা হইয়াছে। ঈশ্বরের যাদৃশ উপাদানত্ব স্বীকার করিলে বিকারিত্বাপত্তি হয় তাদৃশ উপাদানত্বেরই নিরাকরণ শৈবাগমে করা হইয়াছে। ঈশ্বরের শ্রুতিসিদ্ধ

নির্ব্বিকারত্ব রক্ষা করিবার জন্যই ঈশ্বরের জগদুপাদানত্ব নিষেধ করা হইয়াছে। ঈশ্বর জগতের উপাদান হইলে জগৎ ঈশ্বরের পরিণামরূপ হইবে এবং ঈশ্বরও জগদ্রূপে পরিণামীই হইবেন। যেহেতু "পরিণামো হি বস্তূনাং পূর্ব্বাবস্থাপরিচ্যুতিঃ। অবস্থান্তর সম্প্রাপ্তিঃ ক্ষীরস্য দধিভাববৎ॥" ক্ষীরের দধিভাবের ন্যায় ঈশ্বরের জগদ্‌ভাব স্বীকার করিলে ঈশ্বরের শ্রুতিসিদ্ধ নির্ব্বিকারত্বের হানি ঘটিবে। এজন্য শৈবসিদ্ধান্তে জীবচিচ্ছক্তির ন্যায় শিবচিচ্ছক্তিরও পরিণাম স্বীকার করা হয়। কিন্তু শিবচিচ্ছক্তির পরিণামে শিবের পরিণামিত্বের আপত্তি হয় না।

বৈদিক ও অবৈদিক ভেদে শৈবাগমের দ্বৈবিধ্য বলা হইয়াছে। এই দ্বৈবিধ্য প্রদর্শনের জন্য অপ্যয়দীক্ষিত শিবার্কমণি দীপিকাতে কূর্ম-পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—"নির্ম্মিতং হি ময়া পূর্ব্বং ব্রতং পাশুপতং শুভম্। গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং সূক্ষ্মং বেদসারং বিমুক্তয়ে॥ এষ পাশুপতো যোগঃ সেবনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ। ভস্মাচ্ছন্নৈ র্হি সততং নিষ্কামৈরিতি হি শ্রুতিঃ॥" এই সমস্ত কূর্মপুরাণীয় বাক্য দ্বারা প্রমাণভূত বৈদিক পাশুপত মত বলা হইয়াছে। অনন্তর কূর্ম-পুরাণে—"বামং পাশুপতং সোমং লাগুড়ঞ্চৈব ভৈরবম্। ন সেব্যমেতৎ কথিতং বেদবাহ্যং তথেতরৎ॥" (১১২ পৃঃ ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৮) কূর্ম-পুরাণে এই সমস্ত বচন দ্বারা অবৈদিক পাশুপত শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। শিবার্কমণি দীপিকায় উদ্ধৃত এই সমস্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিলে বৈদিক ও অবৈদিক ভেদে শৈবাগম দ্বিবিধ বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মসূত্রে যে পাশুপত মতের খণ্ডন করা হইয়াছে তাহা অবৈদিক পাশুপত মতেরই খণ্ডন করা হইয়াছে। বৈদিক পাশুপত মত বেদান্ত সিদ্ধান্তের অবিরোধী। এই কথা শ্রীকণ্ঠভাষ্য প্রভৃতি শৈবগ্রন্থে বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে আপাতদৃষ্টিতে শৈব সিদ্ধান্ত ও বৈশেষিক সিদ্ধান্ত ঈশ্বরের কারণতা বিষয়ে এক হইলেও সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে বৈদিক শৈব সিদ্ধান্ত বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সহিত এক নহে। অবৈদিক শৈব-সিদ্ধান্তেও ঈশ্বরের শ্রৌত নির্বিকারত্ব সমর্থন করিবার জন্যই ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বৈশেষিকাদি সিদ্ধান্তেও পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণুসমূহ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রযত্নাধিষ্ঠেয় বলিয়া সাক্ষাৎ প্রযত্নাধিষ্ঠেয়ত্বরূপ শরীরত্ব পরমাণুসমূহেও আছে একথা উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন। ঈশ্বরশরীর পরমাণুসমূহই দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূলের আরম্ভক হইয়া থাকে এরূপ বলা হইয়াছে। শৈবমতে ঈশ্বরশক্তি জগদ্রূপে পরিণত হয়, অথবা বৈশেষিকমতে ঈশ্বরশরীর পরমাণুসমূহ দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূলের আরম্ভক হয় এরূপ বলায় উভয় মতের বিশেষ পার্থক্য থাকে না। আরম্ভবাদ স্বীকার করায় ঈশ্বরশরীর পরমাণুসমূহের নানাত্ব এবং পরিণামবাদ স্বীকার করায়

বৈদিক শৈবসিদ্ধান্তে ঈশ্বরশক্তি একত্বসিদ্ধ হইয়া থাকে। আরম্ভবাদে আরম্ভকের নানাত্ব ও পরিণামবাদে উপাদানের একত্ব ইহাই বৈলক্ষণ্য। ফলতঃ উভয় সিদ্ধান্তই বেদমন্ত্র-প্রদর্শিত ঈশ্বরতত্ত্বের উপপাদনের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কথা আমার দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

(অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা)।

ব্রহ্মসূত্রের ২।২।৬ সূত্রের শ্রীকণ্ঠভাষ্যের টীকাতে অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন যে—"অনুপ্রবিশ্য নিয়মত্বং, সাক্ষাৎ প্রযত্নাধিষ্ঠেয়ত্বং বা শরীরত্বম্……তচ্চ পরমেশ্বরং প্রতি মায়াদীনাং সর্ব্বেষামবিশিষ্টম্।" ইহার অভিপ্রায় এই যে ঈশ্বর যে বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহার শরীর। অথবা যে বস্তু ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রযত্নাধিষ্ঠেয় হয় তাহাই তাঁহার শরীর। শরীরের এই দ্বিতীয় লক্ষণটি উদয়নাচার্য্যও কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে প্রদর্শন করিয়াছেন (কুসুমাঞ্জলি—৫ম স্তবক ৭৫ পৃঃ সোসাইটি সং) তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পরে অপ্যয়দীক্ষিত বলিয়াছেন "তচ্চ (শরীর লক্ষণঞ্চ) পরমেশ্বরং প্রতি মায়াদীনং সর্ব্বেষামবিশিষ্টম্" ইহার অভিপ্রায় জগতের উপাদানরূপে মায়া, প্রকৃতি, প্রভৃতি যাহা ঈশ্বর প্রযত্নের সাক্ষাদধিষ্ঠেয় হইবে তাহাই ঈশ্বরের শরীর বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিয়ম্য বস্তু ঈশ্বরের শরীর হওয়ায় সেই নিয়ম্য বস্তু দ্বারাই ঈশ্বর শরীরবান্ হইবেন। জীব যেমন স্বশরীরের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরও সেইরূপ সাক্ষাৎ স্বনিয়ম্য বস্তুর অধিষ্ঠাতা হইতে পারিবেন না। এজন্য ঈশ্বরের কর-চরণাদিযুক্ত শরীরান্তর কল্পনার আবশ্যকতা নাই। "তথা চ যন্নিয়ম্যং তেনৈব নিয়ম্যেন শরীরবান্ পরমেশ্বরঃ। তস্য অধিষ্ঠাতৃত্বোপপদ্যতে ইতি ন তস্য করচরণাদিমচ্ছরীরান্তরসিদ্ধিঃ প্রসজ্যতে।" (ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৬, শিবার্কমণি দীপিকা)। এরূপ কোন নিয়ম নাই যে, নিয়ম্যাতিরিক্ত শরীরের দ্বারাই যিনি শরীরবান্ তিনি নিয়ম্য বস্তুর অধিষ্ঠাতা হইতে পারিবেন। এইরূপ নিয়ম স্বীকার করিলে জীবাত্মা নিজেও স্বশরীরের অধিষ্ঠাতা হইতে পারিবেন না। জীব স্বশরীরের অধিষ্ঠাতা। জীবের নিয়ম্য শরীর ভিন্ন অন্য শরীর নাই। যদি নিয়ম্যাতিরিক্ত শরীরের দ্বারা শরীরবান্ হইয়াই নিয়ম্যের অধিষ্ঠাতা হইতে হইত তবে জীবও স্বশরীরের অধিষ্ঠাতা হইতে পারিত না। এই কথা অপ্যয়দীক্ষিত শিবার্কমণি দীপিকাতে বলিয়াছেন।

ন্যায়মঞ্জরীতে জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন—স্বশরীর প্রেরণে চ দৃষ্টম্ অশরীরস্যা-প্যাত্মনঃ কর্তৃত্বম্।" (ন্যায়মঞ্জরী, প্রমাণ প্রকরণ ১৮৫ পৃঃ)। অপ্যয়দীক্ষিত যাহা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন জয়ন্তভট্ট তাহাই সংক্ষেপে বলিয়াছেন। ঈশ্বর

অশরীর হইয়াও নিয়ম্য বস্তুর দ্বারাই সশরীর, ইহাই উভয়ের প্রতিপাদ্য। ভূতবশী ও প্রকৃতিবশী যোগিগণের ভূতবর্গ ও প্রকৃতিবর্গ যেমন ইচ্ছানুবিধায়ী হইয়া থাকে এইরূপ জগতের উপাদানও অপ্রতিহতেচ্ছ ঈশ্বরের ইচ্ছানুবিধায়ী হইয়া থাকে। আর তাহাতেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্বসিদ্ধ হয়। ইহাই ন্যায় বার্তিককার উদ্দ্যোতকরের অভিপ্রায়, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঈশ্বরের প্রযত্ন স্বীকার করিলে ঈশ্বরের শরীর স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে, যেজন্য উদয়ন অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রকারান্তরে ঈশ্বরের শরীর স্বীকার করিয়াছেন।

অপ্যয়দীক্ষিত পাশুপত অধিকরণের শেষভাগে বলিয়াছেন যে বায়ু-সংহিতাতে শ্রৌত ও অশ্রৌতভেদে শিবাগম দ্বিবিধ বলা হইয়াছে। যাহা শ্রুতির অনুসারী শিবাগম তাহা শ্রৌত, আর যাহা শ্রুতির অনুসারী নহে তাহা স্বতন্ত্র বা অশ্রৌত। এই স্বতন্ত্র অশ্রৌত আগমের নির্দেশ করিতে যাইয়া বায়ু-সংহিতাতে বলা হইয়াছে—কামিকাদিবাতুলান্ত ২৮ খানি শৈবাগম, অশ্রৌত স্বতন্ত্র আগম। 'স্বতন্ত্রো দশধা পূর্ব্বং তথাষ্টাদশধা পুনঃ। কামিকাদি-প্রভেদেন বহুধা স ব্যবস্থিতঃ॥ শ্রুতিসারময়োহন্যস্তু শতকোটি প্রবিস্তরঃ। পরং পাশুপতং যত্র ব্রতং জ্ঞানঞ্চ কথ্যতে॥' (শিবার্কমণি-দীপিকায় বায়ু-সংহিতার বচন, ব্রঃ সূঃ ২।২।৩৮)। আমরা এস্থলে কামিকাদি বাতুলান্ত অষ্টা-বিংশতি স্বতন্ত্র শৈবাগমের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি। (১) কামিক, (২) যোগজ, (৩) চিন্ত্য, (৪) কারণ, (৫) অজিত, (৬) দীপ্ত (দীপ), (৭) সূক্ষ্ম, (৮) সহস্র, (৯) অংশুমান্, (১০) সুপ্রভেদক, (১১) বিজয়, (১২) বিশ্বাস, (নিঃশ্বাস) (১৩) স্বায়ম্ভুব, (১৪) অনিল (অনল), (১৫) বীর, (১৬) কারণ (রৌরব, কারব), (১৭) মুকুট, (১৮) বিমল, (১৯) চন্দ্রজ্ঞান, (২০) বিম্ব, (২১) প্রোদ্‌গীত, (২২) ললিত, (২৩) সিদ্ধ, (২৪) সন্তান, (২৫) (শ) সর্বোক্ত, (২৬) পরমেশ্বর, (২৭) কিরণ, (২৮) বাতুল।* এই ২৮ খানি আগম, সিদ্ধান্ত-তন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং সর্বোজ্ঞানোত্তরাদি শৈবাগম শ্রৌত শৈবাগম। এস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মসূত্রের শ্রীকরভাষ্যে ২।২।৩৭ সূত্রে ভাষ্যকার শ্রীপতি পণ্ডিতাচার্য্য বলিয়াছেন যে, সর্ব্ববেদধর্ম্মানুকূলঃ কামিকাদ্যষ্টাবিংশ আগমঃ সিদ্ধসিদ্ধান্তাভিধানঃ বীরশৈবম্ এবং মুমুক্ষুভিরুপাদেয়ম্" (শ্রীকরভাষ্য, ২৩৩ পৃঃ)। অপ্যয়দীক্ষিত পরে বলিয়াছেন, কামিকাদি ২৮ খানি আগমকে বায়ুসংহিতাতে অবৈদিক আগম

* বৃহৎ সংহিতাতে যে বিস্তৃতভাবে স্থাপত্য বিদ্যা মন্দির নির্ম্মাণাদি বলা হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই শ্রীমৎ কিরণাগম হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টোৎপল বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছেন।

বলিলেও তাহারা সর্ব্বথা অবৈদিক আগম নহে। কারণ বরাহ পুরাণে নিঃশ্বাস সংহিতাতে বলা হইয়াছে যে, "এতস্মাদ্বেদমার্গাদ্ধি যদন্যাদিহ জায়তে। তচ্ছূদ্রকর্ম্ম-বিজ্ঞেয়ং রৌদ্রং শৌচবিবর্জ্জিতম্॥" নিঃশ্বাস সংহিতায় এই বচনানুসারে কামিকাদি সিদ্ধান্ততন্ত্র অশ্রৌত হইতে পারে না। কিন্তু সে সমস্ত শৈবাগম বামাচার-যুক্ত, শৌচবিবর্জ্জিত যেমন লাগুড়, পাশুপত, কাপালিক, কালামুখ প্রভৃতি শৈবাগমই অশ্রৌত বা অবৈদিক। এই সমস্ত অবৈদিক লাগুড়, পাশুপতাদি শৈবাগমেরও সর্বথা অপ্রামাণ্য নহে। অধিকারভেদে ইহাদেরও প্রামাণ্য আছে। বেদবাহ্য অধিকারিগণের রক্ষণের জন্যই এই সমস্ত আগম প্রবৃত্ত হইয়াছে।

যে সমস্ত শৈবাগমবাদিগণ মনে করেন শৈবাগমের সহিত বেদের কোন সম্বন্ধ নাই, বেদনিরপেক্ষভাবেই শৈবাগম স্বতঃপ্রমাণ তাঁহারাও শিবার্কমণি-দীপিকাতে উদ্ধৃত বচনসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রৌত ও অশ্রৌতভেদে শৈবাগম দ্বিবিধ। অশ্রৌত শৈবাগম বেদবাহ্যগণের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু বেদাধিকারিগণ কখনও অশ্রৌত শৈবাগমানুসারে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু শ্রৌত শৈবাগমানুসারে প্রবৃত্ত হইবেন। শিবদর্শনস্থাপন ধুরন্ধর অপ্যয়দীক্ষিতের অভিপ্রায় এই যে, বেদের সিদ্ধান্তানুসারেই বৈদিক শৈবাগম প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং উদ্ধৃত বেদমন্ত্রসমূহে যাদৃশ ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে শ্রৌত শৈবাগমসমূহ তাহারই উপপাদনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে। বেদমন্ত্রে ঈশ্বর প্রতিপাদিত হইলেও পরমোপাস্য ঈশ্বরের উপাসনার প্রকার বেদমন্ত্রে বিস্তৃতভাবে কথিত হয় নাই। কিন্তু শ্রৌত শৈবাগমে এই উপাসনার প্রকার অতিবিস্তৃতভাবে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

॥ পাশুপত দর্শনের আলোচনা সমাপ্ত ॥

—০—

কৰ্ত্তা কে ?

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

আমাদের অচেতন স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ আছে। চেতন জীবাত্মা আছে। পরমাত্মাও দেহে অধিষ্ঠান করে থাকেন। আমরা যখন কোন কাজ করি তখন ইঁহাদের মধ্যে কে সেই কাজের কর্ত্তা হন? দেহ বা আত্মা বা পরমাত্মা? স্বভাবতঃ মনে হতে পারে যে আত্মাই কর্ত্তা; কিন্তু গীতা এবং উপনিষদে কয়েকটি শ্লোক আছে যেগুলি পড়লে মনে হয় যে আত্মা কর্ত্তা নয়। যেমন কঠোপনিষদ বলছেন :—

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুম্ হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥

—কঠ উপনিষদ ২।১৯

অর্থাৎ "যে ব[illegible] সে যদি মনে করে যে আমি বধ করছি, যে নিহত হয় সে যদি মনে করে যে আমি নিহত হ'লাম, দুজনেরই ভুল হবে। কেউ বধ করে না এবং নিহত হয় না।" আত্মা যদি কার্য্য না করে তাহলে কে কাজ করে? গীতা বলছেন যে প্রকৃতির গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তম) কাজ করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥

—গীতা ৩।২৭

অর্থাৎ, "প্রকৃতির গুণ সকল দ্বারা সব কাজ করা হয়। অহঙ্কারের দরুণ আত্মা মোহগ্রস্ত হয় এবং মনে করে আমি কাজ করছি।" প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ। তারাই কাজ করে এবং আত্মা নিজেকে ঐ সকল গুণ থেকে অভিন্ন বলে মনে করে। "অহংকার" শব্দ সাধারণতঃ আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি এখানে সে অর্থে ব্যবহার হয়নি। এখানে "আত্মার অহংকার আছে" বাক্যের অর্থ এইরূপ :—"আত্মা অন্য বস্তুকে নিজের সহিত অভিন্ন মনে করে।" সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণকে আত্মা নিজের স্বরূপ মনে করে। এই অহংকার হইতে অজ্ঞান বা মোহ উৎপন্ন হয়। তাহার ফলে যদিও সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ বিবিধ কার্য্য করে তথাপি আত্মা মনে করে যে সে কাজ করছে। শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখায় 'প্রকৃতেঃ গুণৈঃ' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ করেছেন 'ইন্দ্রিয়ৈঃ।' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল কাজ

করে, আত্মা মনে করে সে কাজ করছে। ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাঁহার মতে ইহাদিগকে প্রকৃতির গুণ বলা হইয়াছে। পুনশ্চ গীতা বলিয়াছেন :—

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥

—গীতা ১৪।১৯

অর্থাৎ যে বিজ্ঞ ব্যক্তি দেখিতে পান যে গুণ ছাড়া আর কেউ কর্ত্তা নাই এবং গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ বস্তুকে (পরমাত্মাকে) জানিতে পারেন, তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হন। গীতা ইহাও বলিয়াছেন :—

কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥

—গীতা ১৩।২০

অর্থাৎ "কারণ হইতে কার্য্যের যে উৎপত্তি হয় তাহার হেতু হইতেছে প্রকৃতি। সুখদুঃখের ভোগের হেতু হইতেছে পুরুষ (আত্মা)।" পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যসকল হইতে ইহা প্রতীত হইবে যে আত্মা কোন কার্য্য করে না। প্রকৃতি অথবা প্রকৃতির গুণ অথবা ইন্দ্রিয় সকল কার্য্য করে।

কিন্তু এ বিষয়ে (এবং সকল বিষয়ে) প্রকৃত সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইবে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন হইতে। ইহা সুবিদিত যে ধর্ম-বিষয়ে বেদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বেদের সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন এবং উত্তরমীমাসাদর্শনে প্রচারিত হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে সকল বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত উত্তর মীমাংসা দর্শন অথবা বেদান্ত দর্শনে পাওয়া যাইবে। বেদান্ত দর্শনে বলা হইয়াছে :—

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ —(ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৩৩)

"অর্থাৎ জীবাত্মাই কর্ত্তা। তাহা হইলে শাস্ত্রের বিধান সমূহ তাৎপর্য্য-পূর্ণ হয়।" শাস্ত্রে নানারূপ বিধান আছে যথা :—"যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করে সে যজ্ঞ করিবে।" "স্বর্গকামো যজেত"।

যে ব্যক্তি মোক্ষ কামনা করে সে ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। "মোক্ষকামো ব্রহ্ম উপাসীত। যদি জীবাত্মার কর্ম করিবার কোন ক্ষমতা না থাকিত তাহা হইলে শাস্ত্রের এই সকল বিধান নিরর্থক হইত। শাস্ত্র শব্দের অর্থ যাহা শাসন করে বা আদেশ দেয়। চেতন বস্তুকেই আদেশ দেওয়া যায়। অচেতন বস্তুকে কোনও আদেশ দেওয়া যায় না। আত্মা চেতন। প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি অচেতন। এজন্য ইহা সিদ্ধান্ত করা উচিত যে শাস্ত্রে জীবাত্মাকে

লক্ষ্য করিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং জীবাত্মার কর্ম করিবার ক্ষমতা আছে।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে যদি অচেতন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় শাস্ত্রীয় আদেশ উপলব্ধি করিতে না পারে এবং কর্ম করিতে না পারে তাহা হইলে উপনিষদ এবং গীতা হইতে পূর্ব্বে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে সে সকল বাক্য কি ভুল এবং ঐ সকল বাক্যের সহিত বেদান্তের কি বিরোধ আছে? এই দুইটী প্রশ্নেরই উত্তর, না। কঠোপনিষৎ যে বলিয়াছেন, "হত্যাকারী যদি মনে করে যে সে হত্যা করিতেছে এবং নিহত ব্যক্তি যদি মনে করে যে সে মারা যাইতেছে তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত" ইহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মা অমর। এজন্য কেহ কাহাকেও বধ করিতে পারে না। গীতা যেখানে বলিয়াছেন কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত হয়। অহংকারের জন্য আত্মা মনে করে যে, সে কার্য্য করে, ইহার অর্থ এই যে আত্মা কোন্ কার্য্য করিবে তাহা আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমোগুণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু কর্ত্তা হইতেছে আত্মা। নিম্নলিখিত শ্লোকে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে আত্মা কর্ত্তা।

তত্রৈব সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥

—গীতা ১৮।১৬

অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় কেহ যদি মনে করে যে কেবল আত্মাই কর্ত্তা তাহা হইলে তাহা বুঝিবার ভুল হইবে। গীতা ১৮।১৩,১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কোন্ কার্য্য করা হইবে তাহা পাঁচটি বস্তুর উপর নির্ভর করে। (১) দেহ, (২) আত্মা, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ু এবং (৫) পরমাত্মা।

পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব কর্মণাম্॥—গীতা ১৮।১৩

অর্থাৎ কোন্ কর্ম করা হয় তাহা পাঁচটি বস্তুর উপর নির্ভর করে, জ্ঞান-শাস্ত্রে তাহা বলা হইয়াছে।

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥—গীতা ১৮।১৪

অর্থাৎ দেহ, আত্মা, ইন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ুর চেষ্টা এবং ঈশ্বর (ইহাদের উপর কর্ম নির্ভর করে)।

অতএব আত্মাকে কর্ত্তা মনে করাই ভুল নহে। কেবল আত্মাকে কর্ত্তা মনে করাই ভুল কোন্ কর্ম করা হইবে তাহা আত্মা ছাড়া আরও চারটি বস্তুর উপর নির্ভর করে।

আত্মাই যে কার্য্য করে তাহা ইহা হইতে বোঝা যায় যে ঐ শ্লোকে আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে গীতার মতে আত্মাই কাজ করে। যদিও আরও কয়েকটি বস্তু আত্মাকে কর্ম করিতে প্রেরণা দেয় গীতার শেষ অংশে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তুমি মনে করিতেছ যে তুমি যুদ্ধ করিবে না। কিন্তু তোমার প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ করাইবে।"—গীতা ১৮।৫৯। সুতরাং যদিও আত্মার কর্ম করিবার ক্ষমতা আছে তথাপি আত্মা কোন কর্ম করিবে তাহা নির্ভর করে আরও কতকগুলি বস্তুর উপর। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, তোমাকে গোপনীয় জ্ঞানের কথা বলিলাম। ইহা উত্তমরূপে চিন্তা কর। তাহার পর তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর।" —গীতা ১৮।৬৩। সকলের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সর্ব্বদা আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর, আমার পূজা কর, এইভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।" —গীতা ১৮।৬৫। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গীতার মত এবং বেদান্তের মত উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। উভয়েরই মত এই যে আত্মাই কর্ত্তা। সুতরাং আত্মা যে কর্মের ফল ভোগ করে ইহা অসঙ্গত নহে। প্রশ্ন হইতে পারে যে আত্মার যদি কর্ম করিবার ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে কি ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যায় যে, যে সকল বস্তুর উপর কর্ম নির্ভর করে সে সকলই ঈশ্বরের অংশ। সুতরাং কোন্ কর্ম্ম করা হইবে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বেদান্ত বলিয়াছেন :—

পরাৎ তু তৎ শ্রুতেঃ (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪১)।

এখানে 'পর' শব্দের অর্থ 'পরমাত্মা' বা 'ঈশ্বর'। এই সূত্রের অর্থ এই যে, আত্মা কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত হয় (পরাৎ) কারণ বেদ ইহা বলিয়াছেন (তৎ শ্রুতেঃ)। বেদ বলিয়াছেন :—"এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো লোকেভ্যঃ অধো নিনীষতে" —কৌষীতকি উপনিষৎ ৩।৮

"ঈশ্বরই তাহার দ্বারা ভাল কর্ম করান যাহাকে তিনি উন্নয়ন করিতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বরই তাহার দ্বারা মন্দ কর্ম করান যাহার তিনি অধোগতি ইচ্ছা করেন।" বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিয়াছেন :—"য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি এষ তে আত্মা", যিনি তোমাকে অন্তর হইতে সংযত করেন তিনিই তোমার আত্মা। গীতা বলিয়াছেন :—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥

—গীতা ১৮।৬১

"হে অর্জ্জুন ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্‌দেশে অবস্থান করেন এবং মায়ার দ্বারা যন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সঞ্চালিত করেন।"

এরূপ মনে করা উচিত নয় যে ঈশ্বর তাঁহার খেয়াল অনুসারে কাহাকেও দিয়া ভাল কাজ করান এবং কাহাকেও দিয়া মন্দ কাজ করান। প্রত্যেক ব্যক্তির যেরূপ ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকে তদনুসারে তাহার কর্ম করিবার প্রবৃত্তি ঈশ্বর প্রদান করেন। বেদান্ত বলিয়াছেন, "কৃৎস্ন প্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত প্রতিষিদ্ধ অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ"। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪২

অর্থাৎ "ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে কর্ম করান তাহাদের সমগ্র চেষ্টা অনুসারে। এইভাবে শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধসকল ব্যর্থ হয় না।" যখন কোন ব্যক্তির ভাল কর্ম করিবার ইচ্ছা থাকে এবং চেষ্টা করে ঈশ্বর তাহাকে ভাল কার্য্য করিতে দেন এবং তদনুরূপ ফল দেন। কোন্ ব্যক্তি কিরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে তাহা তাহার স্বভাবের উপর নির্ভর করে। তাহার স্বভাব নির্ভর করে তাহার পূর্ব্বকৃত কর্মের উপর। সৃষ্টি যখন অনাদি, তখন সর্ব্বদাই মনুষ্যের কতকগুলি পূর্ব্বকৃত কর্ম বিদ্যমান থাকে। এইভাবে মনুষ্যের কর্ম করিবার স্বাধীনতার সহিত ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তার সামঞ্জস্যবিধান করা হইয়াছে। কেহ যদি বলেন যে ঈশ্বর যখন আমাদের দ্বারা ভাল মন্দ কর্ম করান তখন তাঁহার উচিত নয় আমাদিগকে তাহার ফল ভোগ করান। তাহার উত্তরে বলা যায়, "ঈশ্বরের কি করা উচিত তাহা ভাবিবার তোমার প্রয়োজন নাই। তোমার কি করা উচিত তাই ভাব। তুমি নিশ্চয় মনে কর যে তুমি ইচ্ছা করিলে ভাল কাজও করিতে পার, মন্দ কাজও করিতে পার। মন্দ কাজ করিলে দুঃখ ভোগ করিবে, এই বুঝিয়া কর্ম করিও।"

—০—

ভক্তের ভক্ত

[কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়]

জানিনা বুঝিনা তোমা,

তোমার ভক্তেরে শুধু চিনি,

তোমার আভাস পাই

তাঁর মাঝে। তাঁর কাছে ঋণী।

হইব তোমার ভক্ত

হেন স্পর্দ্ধা হৃদয়ে না পুষি,

তোমার ভক্তের ভক্ত

হয়ে রই। হবে তায় খুশী?

—০—

চতুষ্পাদ্ ধর্ম্ম

[অধ্যাপক শ্রীযুগলকৃষ্ণ ঘোষাল]

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মকে বৃষরূপে কল্পনা করিয়াছেন। 'বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্ম' :—এই আর্যবাক্য অতিপ্রাচীন আগমাদি গ্রন্থেও পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা ধর্ম্মরূপী বৃষের চারিপাদ্ অর্থাৎ প্রধান অবয়বের কল্পনা করিয়া থাকেন। এ-গুলি যথাক্রমে তপস্যা, জ্ঞান, যাগ-যজ্ঞ এবং দান। ধর্ম্মের এই চারিটি প্রধান অঙ্গ সর্ব্বযুগে স্বীকৃত হইলেও এক একটীর বিশেষ প্রাধান্য দেখা গিয়াছিল এক যুগে। মনুসংহিতায় এ-বিষয়ে উল্লেখ রহিয়াছে—'তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে। দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহু র্দানমেকং কলৌ যুগে॥" ফলোৎকর্ষতা হেতু তপস্যার সমধিক প্রাধান্য ঘটিয়াছিল সত্যযুগে, ত্রেতায় অধ্যাত্ম-জ্ঞানানুশীলনের, দ্বাপরে যাগ-যজ্ঞাদির এবং কলিযুগে দানধর্ম্মের। এখানে বলাবাহুল্য যে উল্লিখিত ধর্ম্মাঙ্গচতুষ্টয় সর্ব্ব যুগেই অনুষ্ঠেয়—তথাপি এক এক যুগে এক একটীর বিশেষ প্রাধান্য ও ফলোৎকর্ষতা। কৃতযুগে ধর্ম্ম ছিল সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন। সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ সত্যের ছিল সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা আর তপস্যা ছিল এযুগের বিশেষ সাধন। দুঃখব্রত তপস্যা অপেক্ষা আত্মজ্ঞানানুশীলনের দিকে বেশি ঝোঁক দেখা গিয়াছিল ত্রেতায়। তত্ত্বদর্শী জ্ঞান-বিজ্ঞানবিদ্ ঋষিগণ এ-যুগে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সংসারমহীরুহের বীজ অবিদ্যা বিনাশ করিয়া অমৃতের সন্ধান দিতেন। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। তত্ত্বজ্ঞান ছাড়া মোক্ষের কল্পনা করা অসম্ভব। তবে এই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ নিয়েই দার্শনিকদের মতভেদ। দ্বাপরে যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান-বহুল ক্রিয়াকলাপের বহুল প্রসার দেখা যায়। বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ হয়—ইহাই কর্ম্মমীমাংসকদের সিদ্ধান্ত। কৃচ্ছ্রসাধন, শ্রবণ-মনন ব্যতিরেকেই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা অভীষ্ট ফললাভ যখন সম্ভব তখন এদিকেই সকলের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হইল। ফলতঃ বেদের ক্রিয়া-কাণ্ডই হইল এ-যুগে আসল বেদ। মহর্ষি জৈমিনি—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যম তদর্থানাম্'—এই সূত্রের দ্বারা বেদের ক্রিয়াকাণ্ডেরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। জ্ঞানকাণ্ডের কোন ধর্ম্মোপযোগ নাই। এই মত অবশ্য বিচার সাপেক্ষ। ফলকথা যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এ যুগে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কলিতে ধর্ম্মের অপরাপর অঙ্গগুলি স্খলিতপ্রায় হইয়া দানরূপ একটীমাত্র

পাদই অবশিষ্ট রহিল। সেই দানরূপ একটীমাত্র পাদও আজ 'স্খলন্নিবোপলভ্যতে'। কারণ, অসাধু উপায়ে আহৃত ধনের পাত্রাপাত্র বিবেচনাহীন দান প্রায়ই নিষ্ফল। আচার্য্য উদয়নের কুসুমাঞ্জলি ভাষ্যে একটী তাৎপর্য্যপূর্ণ উক্তি আছে। উক্তিটি এইরূপ—'প্রাক্ চতুষ্পাদ্ ধর্ম্ম আসীৎ। ততস্তনুয়মানে তপসি ত্রিপাৎ, ততো ম্রিয়তি জ্ঞানে দ্বিপাৎ, ততঃ জীর্য্যতি যজ্ঞে দানৈকপাৎ। সোঽপি পাদো দুরাত্ময়াদি বিপাদিকাশত দুঃস্থঃ অশ্রদ্ধামলকলঙ্কিতো মদমোহমানাদি-কণ্টকশতজর্জ্জরঃ প্রতিদিনমপচীয়মানবীর্য্যতয়া স্খলন্নিবোপলভ্যতে।

অতএব দানই কলিযুগে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত। আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্র দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাভারত, মনুসংহিতা দানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মহাভারতে যক্ষরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিলেন—মর্ত্ত্য জীবনের মিত্র কি? —তদুত্তরে ধর্ম্মরাজ কহিলেন—'দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ—' অর্থাৎ দানই মর্ত্ত্য-মানুষের একমাত্র মিত্র। এই দানের উপরেই বিরাট হিন্দুসমাজ একদিন নির্ভরশীল ছিল। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাও এই এক দানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। গুরুকুলে ছাত্র অধ্যাপক সকলেই এই দান মাহাত্ম্যে জীবিত থাকিয়া নিশ্চিন্তে শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। শ্রাদ্ধ, ব্রত, জলাশয় ও বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে সকলেই যথাসাধ্য দান করিত। কেহ বা তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বসিত। উপযুক্ত পাত্রে বিশুদ্ধান্তঃকরণে স্বল্পমাত্র দানও পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ। মহাভারতের সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসদেবের উপদেশ: 'পাত্রে দানং স্বল্পমপি কালে দত্তং যুধিষ্ঠির। মনসা হি বিশুদ্ধেন প্রেত্যানন্ত ফলং স্মৃতম্॥' মনুসংহিতায় দানের সামান্যবিধি এইরূপ উক্ত হইয়াছে—যৎকিঞ্চিদপি দাতব্যং যাচিতেনানসূয়য়া।' অর্থাৎ অসূয়াপরবশ না হইয়া বিশুদ্ধ চিত্তে যাচ্ঞাকারীকে দান করিবে। এবং 'ন দত্বাপরিকীর্ত্তয়েৎ'—অর্থাৎ দান করিয়া পরের নিকট তাহা কীর্ত্তন করিবে না। দান করিয়া পরিকীর্ত্তন করিলে দানের ফল ক্ষয় হয়। মহর্ষি মনু ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দানের ভিন্ন ভিন্ন ফল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন—

বারিদস্তৃপ্তিমাপ্নোতি সুখমক্ষয্যমন্নদঃ।
তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশ্চক্ষুরুত্তমম্॥
ভূমিদো ভূমিমাপ্নোতি দীর্ঘমায়ুর্হিরণ্যদঃ।
গৃহদোঽগ্র্যাণি বেশ্মানি রৌপ্যদোরূপমুত্তমম্॥
বাসোদশ্চন্দ্র সালোক্যমশ্বিসালোক্যমশ্বদঃ।
অনডুহঃ শ্রিয়ং পুষ্টাং গোদো ব্রধ্নস্য বিষ্টপম্॥

যানশয্যাপ্রদো ভার্য্যামৈশ্বর্য্যমভয়প্রদঃ।
ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাম্॥
সর্ব্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে।
বার্য্যন্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চন সর্পিষাম্॥
যেন যেন তু ভাবেন যদ্ যদ্দানং প্রযচ্ছতি।
তত্তত্তেনৈব ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতিপূজিতঃ॥

—মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়, ২২৯-২৩৪।

বারিদানকারী—তৃপ্তিলাভ করেন, অন্নদাতা—অক্ষয় সুখ, তিলদাতা—মনোমত সন্ততি এবং দীপদাতা—উত্তম চক্ষুলাভ করেন। ভূমিদাতা—ভূমিলাভ করেন, সুবর্ণদাতা—উত্তম পরমায়ু, গৃহদাতা—শ্রেষ্ঠ গৃহ এবং রৌপ্যদাতা—উত্তম রূপ লাভ করেন। বস্ত্রদাতা—চন্দ্রলোকে চন্দ্রতুল্য হন, ঘোটক দাতা—অশ্বিলোকে গমন করেন। বলীবর্দ্দদাতা—অতুলৈশ্বর্য্য লাভ করেন, গাভী দাতা—সূর্য্যলোকে গমন করেন। রথাদি যান বা শয্যাদাতা—মনোমত ভার্য্যা লাভ করেন, ধান্যদাতা—চিরস্থায়ী সুখ এবং ব্রহ্ম বা বেদের শিক্ষাদাতা—ব্রহ্মের সমান গতি প্রাপ্ত হন। জল, অন্ন, ধেনু, ভূমি, বস্ত্র, তিল, স্বর্ণ ও ঘৃত—এ সকল দান অপেক্ষা ব্রহ্মদানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে যে ভাবে যে যে দান করা যায়, প্রতিপূজিত হইয়া সেই সেই ভাবে সেই সেই দান জন্মান্তরে পাওয়া যায়। মহাভারতে অন্নদানকেই শ্রেষ্ঠ দান বলা হইয়াছে। অন্ন হইতে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই—যেহেতু অন্নই প্রজাপতি—

অন্নমেব বিশিষ্টং হি তস্মাৎ পরতরং ন চ।
অন্নং প্রজাপতিশ্চোক্তঃ স চ সম্বৎসরো মতঃ॥

* * * *
* * * *

তস্মাদন্নং বিশিষ্টং হি সর্ব্বেভ্য ইতি বিশ্রুতম্॥

বর্ত্তমানে দেশে পশ্চিমী ভাবধারার খরতর স্রোতে দানের এই মহান আদর্শ অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ব্যষ্টিকে স্বার্থকেন্দ্রিক ও উৎকট ভোগপ্রবণ করিয়া ভারতের চিরন্তন আদর্শের মূলে আঘাত হানিয়াছে। শ্রীভগবানের কথায়—'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপাঃ যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ'—অর্থাৎ নিজের সুখভোগে নিরত ব্যক্তিগণ কেবল পাপই ভোগ করেন।

মহাতাপস নগেন্দ্রনাথের সদুপদেশ

[স্বামী জগদীশ্বরানন্দ]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যেমন সক্রেটিস্, প্লেটো ও এ্যারিস্টটল্ তেমনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা। এখন আমার নিকট চিন্তাগুলিও audible, not only sounds. Formless thought-এর vision হয়, দেখা যায়। এখন গানের wordings ভাল লাগে না, সুরটা ভাল লাগে। খালী ভাবটা আছে, আর কিছু নাই।"

মনকে মনের মধ্যে আনাই ধ্যান; কারণ মন শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংগে যুক্ত আছে। দৈহিক ক্রিয়া মানেই মন দেহের সহিত যুক্ত। আর চিন্তা করা মানেই মনোরাজ্যে বাস করা। তাতে স্বতঃই মন শরীর থেকে বিযুক্ত হয়। তারপর মনকে ভাবাতীত রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে। তারপর সমাধি হবে।"

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে ৮ই তারিখে শনিবার থেকে ১০ই সোমবার পর্য্যন্ত "চৈতন্য-চরিতামৃত" পড়া হয়েছিল। পূজনীয় নগেনদা নিজেই পাঠ করিতেন। দীনেশদার দিদি, ভাগনী, মা, সরস্বতী ও সুরেন শাস্ত্রী প্রভৃতি এসেছিলেন। বৈকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত পাঠ চলতো। পূর্ণদাদা এই প্রসঙ্গে রুশ দেশের ঋষি টলস্টয়ের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, "টলস্টয় খুব বড়লোক ছিলেন। ৫১ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে। একদিন তিনি বনে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে দেখলেন, একটী লোককে এক বাঘ তাড়া করছে। তখন সে দৌড়ে গিয়ে একটা কূপের উপরে দোদুল্যমান ডাল ধরে কূপের মধ্যে ঝুলে পড়ল। নীচে তাকিয়ে সে দেখল, একটা রাক্ষস হা করে আছে। পড়লেই একেবারে রাক্ষসের মুখে পড়ে যাবে। আর সেই গাছের যে ডাল ধরে সে ঝুলছে সেই ডালে দুটা ইঁদুরে ঝগড়া করছে ও ডাল কাটছে। মাঝে মাঝে দুই-একটা মৌমাছি দুই-চার ফোঁটা ফুলের মধু ফেলছে ও সেই মধুবিন্দু তার মুখে পড়ছে। আর সে বলছে, "কি আরাম!" এই হলো মনুষ্যজীবন, পার্থিব জীবন! ব্যাঘ্র হলো এই কর্ম্মময় দুঃখময় সংসার। আর পশ্চাতে রাক্ষস অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাতে মৃত্যু। জীবন ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আর মধ্যে মধ্যে যে অল্প শান্তি মানুষ পাচ্ছে তাতেই সুখী হচ্ছে। আর তাতেই আমরা

সন্তুষ্ট। একবারও ভাবছি না কি হবে ভবিষ্যতে। এই সংসারের দুঃখ-কষ্টের পারে যাবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। কি করে মৃত্যুর হাত হতে এড়ান যায়—তাই ভাবা উচিত। ভালবাসার তিনটা গতি আছে। প্রথম গতি সমভূমিতে, যাকে বলি ভালবাসা, সমানে সমানে প্রীতি। আর দ্বিতীয় গতি নিম্নের দিকে, যাকে স্নেহ বলা যায়—যেমন সন্তানের প্রতি পিতামাতার। স্নেহ সদা নিম্নগামী। আর যেটা উর্দ্ধগামী সেটাই ভক্তি। ভালবাসা এই তিন আকারে উপস্থিত হয়। এই তিনটা একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকার; কেবল বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পাত্রে। আমি যখন কাহাকেও প্রণাম করি তাকে ভক্তি করি। কখনও মনে হয়, তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরি। আবার মনে হয়, তাকেই আশীর্ব্বাদ করি। এই তিন ভাব এক বস্তুর পৃথক্ প্রকাশ। একই আনন্দের, একই প্রেমের রূপ ভিন্ন, এরা অন্য কিছু নয়। এই প্রেম না এলে মানবজীবন ও সাধন-ভজন সব ব্যর্থ জানিবে। প্রেম আসিলেই জীবন মধুময় হয়, সাধন সহজ হয়। অথচ কোথায়ও না কোথায়ও প্রত্যেক লোকের প্রেম বিশ্বাস ও আনন্দ আছেই আছে। নচেৎ মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব। শুধু সেটাকে সব জিনিষে প্রসারিত করে দিতে হবে। তখন শান্তি পাবে। দেখ, বুদ্ধি কত সীমাবদ্ধ! ইহা শুধু নিজের অভিজ্ঞতার গণ্ডির মধ্যে ঘুরছে; এর বাহিরে যেতে পারছে না। তাই প্লেটো বলছেন যে, Supreme conviction দ্বারা জীবন গড়তে পারে না। যখন লোকে খুব মুখস্থ করে তখন বুঝবে কানের ভিতর দিয়া তার মরমে বাণী পশে নাই। তখনও উপরে উপরে সে ভাসছে। যখন একবার অন্তরে যায় এই কথা নূতন রূপ নিয়ে আবার উদিত হয়। অবশ্য চিন্তা ধরে রাখার জন্য conscious effort to memorise দরকার। একটা গল্প শোন। দুটো পাখীর মধ্যে খুব প্রেম ছিল। একস্থানে একফোঁটা জল হলো। এক পাখী বলছে, 'তুমি খাও'। অন্য পাখী বলছে, 'তুমি খাও'। এক পাখী খেলে অন্য পাখী খেতে পারে না। তাই কেউ ঐ জল খেলো না। সেইজন্য দুই পাখীই মারা গেল। তা দেখে তুলসীদাস বলছেন, "আমি তোমাকে এমন এক সরোবর দেখাবো, যেখানে তোমরা যত ইচ্ছা জল খেতে পারবে; অথচ জল শেষ হবে না। আর যত লোককে ইচ্ছা জল খাওয়াতে পারবে।"

"শূদ্রত্ব থেকে জীবন আরম্ভ হয়। প্রথম সেবা। ইহা ধর্মজীবনের আদি স্তর। আর সেবাই জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। গীতাতেও সেবাকে

জ্ঞান লাভের উপায় বলা হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজকে love of service glorify করছে। আর সেবার দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। সেবা না করলে চিত্তশুদ্ধি কিছুতেই হয় না। শূদ্রত্বের পর বৈশ্যত্ব আসে। বৈশ্যত্ব মানে সংগ্রহ বৃত্তি। বৈশ্য সাধক সৎ কথা শুনে আর সংগ্রহ করে রাখে। নানা কথা শুনছে আর মনে রাখছে। বৈশ্যত্বের পরে আসে ক্ষত্রত্ব। ক্ষত্রিয় সাধক যুযুৎসু হয়। প্রাচীন ভাবধারা ও সংস্কারের সহিত সে যুদ্ধ করে। ঐ যুদ্ধ বহুদিন ধরে চলে। শেষে প্রাচীন সংস্কার নষ্ট হয়ে যায়; আর দুই একটা নূতনভাব প্রবল হয়। তখন সেটা নিয়ে সে ধ্যান করে। উহাই ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণত্ব না এলে ঠিক ঠিক সেবাও হয় না। ব্রাহ্মণ চায় শূদ্র হতে; আর শূদ্র চায় ব্রাহ্মণ হতে। ভগবান চান মানুষ হতে, আর মানুষ চায় ভাগবান হতে। অসীম চায় সসীম হতে আর সসীম চায় অসীম হতে। যুগে যুগে এই লীলাই চলছে। যখন ব্রাহ্মণত্ব আসে তখন সাধক ঠাকুরঘর ঝাঁট দেওয়া ফুলতোলা, চন্দন ঘসা, মালাগাঁথা প্রভৃতি কাজ ভালবাসে। ফুলতোলাতে যা হয় পূজা করলেও তাই হয়। পুরীধামে মহাপ্রভু গুণ্ডিচামার্জন করেছিলেন। তিনি কর্ম ও উপাসনার উপর খুব জোর দিলেন। কর্ম ও উপাসনা একই। যেমন পূজা করলে ভগবান ফুল ধরে নেন, তেমনি সৎকর্ম নিঃস্বার্থভাবে ধ্যানস্থ হয়ে করলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যখন ব্রাহ্মণ হিসাবে শ্রাদ্ধ করতে যান গয়ায় তখন স্বপ্নে দেখেন তাঁর বাবা তাঁর কাছে কিছু চাচ্ছেন। তিনি বাবাকে কিছু দিলেন আর তাঁর পিতা তাহা গ্রহণ করলেন। তখন বিজয়ের ভাব পরিবর্তন হলো। অনন্তর তিনি আকাশগঙ্গা পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন। সেখানে এক কুঠিয়ায় আলোক দেখে গিয়ে দেখলেন, এক সাধু বসে আছেন। সাধু বিজয়কে বললেন, তুমি এস। তোমার জন্য বসে আছি। এই তোমার আসন ছিল। এবার বস।" বিজয় তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন; আর তপস্যা করলেন। তিনি যখন ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা করতেন তখন কখনও কখনও সম্মুখে চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে দেখতে পেতেন; আর কেঁদে উঠতেন। কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে কেঁদে ফেলতেন। তখন সবাই ভাবলেন যে গোস্বামী পাগল হয়ে গেছেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে দিলেন। সেই সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে বলেছিলেন, 'বিজয় এবার বাসা পাকড়েছে।' বিজয় গোস্বামী মেথরদিগকে দেখে প্রণাম করতেন; আর বলতেন, 'তোমাদের প্রণাম করি। যে কাজ কেউ করবে না সেই কাজ তোমরা করছ। তোমারা মায়ের মত।

মা না হলে এ কাজ কে করবে। বলো।' এই বলে বিজয় কেঁদে উঠতেন। এই হলো মহত্ব। তথাকথিত হীন কাজেই যখন আনন্দ হবে তখনই বুঝবে প্রেম হয়েছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, 'তৃণগুচ্ছ দেখে যার উদ্দীপনা হয়, জানবে তার জ্ঞান হয়েছে।"

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী শুক্রবার মহাতাপস নগেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "নারিকেল গাছে জল দিলে সে পরে মিষ্টিজল ও মিষ্টিফল আজন্ম দিতে থাকে। সাধুও তেমনি কারুর কোন উপকার ভুলে না। একটি সংস্কৃত শ্লোকে আছে।—

প্রথম-বয়সি তোয়ং পীতমল্পং স্মরন্তঃ।
শিরসি নিহিত ভারা নারিকেলী ফলানাং॥
উদকমমৃতকল্পং দদ্যুঃ আজীবনান্তং।
নহি কৃতমুপকারং সাধবো বিস্মরন্তি॥

পূজ্যপাদ নগেন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী ব্যারিস্টার ও ভক্ত-কবি শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন কর্তৃক রচিত নিম্নোক্ত গানটি শুনিতে খুব ভালবাসিতেন। সর্বদা ঈশ্বর লাভের ব্যাকুলতা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল থাকায় এই গানটি তাঁহার এত ভাল লাগতো। উক্ত গান নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

আর কত কাল থাকবো বসে দুয়ার খুলে বঁধু আমার।
তোমার ঐ বিশ্বমাঝে আমারে কি রইলে ভুলে॥
বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মালা মোর যায় শুকায়ে।
নয়নের জল বুঝি তাও, বঁধু মোর যায় শুকায়ে॥
শুধু ডোরখানি হায়, কোন পরাণে তোমার গলায় দিব ভুলে বঁধু আমার।
হৃদয়ের শব্দ শুনে, চমকি ভাবি মনে।
ঐ বুঝি এল বঁধু, ধীরে মৃদুল চরণে॥
পরাণে লাগলে ব্যথা, ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে বঁধু আমার।
বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল।
কত যে মনের আশা মনমাঝে রহিল॥
আমি কি লয়ে থাকবো বলো, তুমি যদি রইলে ভুলে বঁধু আমার॥

মহাতাপস নগেন্দ্রনাথ উক্ত দিন বলেছিলেন, "ভেবেছিলাম, রাখাল মহারাজের নিকট সন্ন্যাস নেবো। একদিন পাবনায় যাবার পর মুখ ধুচ্ছি, এমন সময় দেখি, রাখাল মহারাজ সম্মুখে। আমার হাত থেকে জলের ঘটি পড়ে গেল। তখন তেজেন-দা প্রভৃতিকে বললাম, বোধ হয় রাখাল

মহারাজের শরীর গেল। ইহার দুই-তিনদিন পরে 'বসুমতী'তে খবর বাহির হলো, রামকৃষ্ণ মিশনের চূড়া ভাঙিল। একবার পূজনীয়া ননীমার অসুখের সময় কলিকাতায় আসি। আমি অন্য বাড়ীতে থাকি। ননীমা আর এক বাড়ীতে আছেন। আমার বুকে খুব ব্যথা হলো। তখন বুঝলাম, ননীমার বুকে ব্যথা হয়েছে। প্রীতি গভীর হলে অন্যের সুখ বা দুঃখ অনুভব করা যায়। ননীমার শরীর ঘুমালেও মন জাগ্রত থাকে। তাই তিনি পাঠের ঘরে না থাকলে আমার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক শক্তি আমার মনে জেগেছিল। শ্রীমাকে বলে সব তাড়িয়েছি। শক্তি হজম করা কঠিন।

'চোখের দেখায় সাধ মিটে না, প্রাণের দেখা চাই।' তাই ভক্ত বলেছেন—

বিনা সাধুসঙ্গ বিবেক না হোই।
রামকৃপা বিনা দুর্লভ সোই॥

অবতারকেও সাধুসঙ্গ করে বিবেক লাভ করতে হয়। তাই আচার্য্য রামানুজ রাজার মেয়ের ভূত ছাড়াতে গিয়ে সাধুসঙ্গ করলেন। তাঁর গুরু যাদব-প্রকাশের মন্ত্রে ভূত গেল না। শেষে রামানুজ ভূতগ্রস্তার মাথায় পা দিতে ভূত চলে গেল। যামুনাচার্য্য মৃত্যুর পূর্বে রামানুজকে ডেকে পাঠালেন সাধুসঙ্গ লাভার্থে। অবতার পুরুষেরা সর্বদা জগতের কল্যাণ চিন্তা করেন। আর মানুষ নিজের কথা ভাবে। ঐখানে অবতার ও মানুষের মধ্যে প্রভেদ।

মহাপুরুষেরা সর্বদা Universal consciousness-এর ভূমিতে থাকেন। তাঁহাদের কোন Individual consciousness নাই। যখন তাঁরা 'আমি' বলেন তখন তাঁদের সেই 'আমি' collective "I" জানবে। ভগবানের কোন অভাব নাই। তাই তাঁর কোন ইচ্ছাও নাই। অভাব থেকে বাসনা জন্মে। ভক্তের ইচ্ছাই ভগবানের ইচ্ছা। যাকে ভালবাসবে, তার মধ্যে ইষ্ট আছেন ভাববে। কাজেই ভালবাসাকে প্রসারিত করাই সাধন। সবাইকে ভালবাস এবং তাদের মধ্যে ইষ্টকে দেখ। ইহাই উৎকৃষ্ট সাধন"

আজ অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের নাটক 'রামানুজ' পড়া হইতেছিল। গিরিশ ঘোষ রচিত নাটক "তপোবল" পূর্বে পড়া হয়েছিল। সেই সম্বন্ধে পূজ্যপাদ্ নগেন্দ্রনাথ বললেন, "'তপোবল' আর 'রামানুজ'—এই দুই নাটকের কত তফাৎ দেখ: ঠাকুর সর্বদা সপ্তম ভূমিতে থাকতেন। তাই প্রায়ই তাঁর সমাধি হতো। অবশ্য তার উপরেও ভূমি আছে। ঠাকুর জোর করে মনকে সপ্তম ভূমি থেকে নামাতেন। ঈশ্বরের শক্তি গুরুতে ও সাধুতে বেশী প্রকাশ পায়। দীনতা না এলে ভক্তি বা প্রেম আসে না। উঁচু জমিতে জল জমে

না। জ্ঞানী যেমন সব সময় 'নেতি' 'নেতি' করছেন ভক্ত তেমনি সর্বদা এই এই বলছেন। একই কথা উভয়েই বলছেন। জ্ঞান যেখানে শেষ করে ভক্তি তাহা প্রথমে আরম্ভ করে। প্রেমই জীবন, প্রেমই সাধন। সিদ্ধ অবস্থা আরোপ ও অভ্যাস করাই সাধন।"

৩রা জানুয়ারী শনিবার ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পূজ্যপাদ নগেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "Message, challenge and acceptance এই তিনটি অবস্থা প্রত্যেক আন্দোলনে আসে। স্বামীজী বিবেকানন্দ Message (বাণী) দিলেন, কালী মহারাজ challenge করলেন এবং স্বামী পরমানন্দজীর প্রচারে acceptance (গ্রহণ) হলো। আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের এই তিন স্তর দেখা যায়। স্বামীজী যখন জগতে বাণী দিলেন তখন ঠাকুরের যন্ত্র হলেন। যখন তিনি ভারত-বাণী প্রচার করলেন তখন তিনি Original (মৌলিক) বাণী দিলেন। স্বামীজী ভারতের প্রফেট (আচার্য্য)। আর ঠাকুর জগতের প্রফেট। স্বামীজী ভারতাত্মা; আর রামকৃষ্ণ বিশ্বাত্মা।

১৯৩১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ভুবনেশ্বর সারদাধাম হইতে আমি বেলুড় মঠে আসি এবং পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করি। ২৬শে জানুয়ারী মঙ্গলবার বেলুড় মঠ হইতে আমি ভুবনেশ্বরে সারদাধামে ফিরিয়া যাই। ২৭শে জানুয়ারী বুধবার পূজ্যপাদ নগেন-দা আমাকে অনেক কথা বললেন। সেদিন তিনি বলেছিলেন, "আমার মন এত অন্তর্মুখীন হয়েছে যে, আর বাহিরের সংগে যোগ রাখতে পারছি না। Reason is very limited. It only explains your own experience and your world of sense. মানুষ প্রথমে decentralised in body and mind. পরে সে centralised হয়। শেষে সিদ্ধ অবস্থায় আবার সে decentralised হয়ে পড়ে। তখন তার মন খুব অন্তর্মুখী হয়। তখন World of form (রূপ-জগৎ) ত দূরের কথা, World of thought (চিন্তা-জগৎ)-এর সঙ্গেও compromise চলে না। তাই মহাপুরুষদের মধ্যে এত contradiction (বিরোধ) দেখা যায়। যে যত বড়লোক তার ভিতর তত contradiction (বিরোধ) দেখবে। But all contradictions meet in God. Don't be a slave to any object or any thought, or any feeling. Freedom of thought and action না হলে ধর্মজীবন গড়ে উঠে না। তবু ধর্মসাধনে প্রণালী দরকার। সন্ন্যাস মানে আগে ত্যাগ, পরে ত্যাগ ও মধ্যে ত্যাগ। ঠাকুরের জীবনে তাই এত ত্যাগ দেখা যায়। সন্ন্যাসীদের নিকট ভাল-

মন্দ সব সমান হবে। ভাল-মন্দ উভয়ের মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হয়। অতীত বা ভবিষ্যতের সব ভাবনা ভুলে সন্ন্যাসী Moment to moment ঈশ্বরকে ধরে থাকবে। Man lives historically though he thinks rationally. Reason is the method of interpretation of what happens. Of course, higher reason, critical reason or pure reason খুব কম লোকের হয়। একদিন ধ্যানে দেখলাম, "সবাই পথে চলছে; কেউ দুই মাইল আগে, কেউ বা কিছু পিছে।" পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ অদ্ভুত সমন্বয় প্রতিভা নিয়ে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন সেই প্রতিভা নিয়ে। সকল মানব চিন্তা ও সংস্কৃতির সমন্বয় হবে। বিবেকানন্দের মত ব্যক্তি ভারতে খুব কম এসেছেন।

একবার পুরীতে ধ্যান করতে করতে একটি অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল। তখন ধ্যান করতে করতে, দেখলাম, যেন এক একটা অঙ্গ ছুটে চলে যাচ্ছে—হাত, পা, মাথা সমস্ত। শেষে যে কি রইল তা মনে নাই। কতক্ষণ সেই সমাহিত অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলাম তাও জানি না। অবশেষে দেখলাম, শুধু মাথাটা আছে; আর শরীর নাই। ইহাই বিরজা হোম, যা করে সন্ন্যাস নিতে হয়। পরে শুনলাম, একেই ঠিক ঠিক সন্ন্যাস বলে। প্রত্যহ বাহিরে imagination ও অন্তরে চিৎকুণ্ডে বিরজা হোম করিবে। শেষে থাকবে জ্যোতিরহম্, আমি জ্যোতিঃস্বরূপ। নিরাকার ধ্যান করার জন্য অনেক সাধনা দরকার। প্রথমে পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিষের ভিতর, গাছের পাতায়, পাথরে, আকাশে বালুকণার মত ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যেও ঠাকুরকে দেখ। খাওয়া, শোয়া, বেড়ান সব কাজে যেন তাঁর স্মৃতি ভুল না হয়। শেষে এই সব Visualise করবে।

১৯৩১ খ্রীঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দাদা বহু কথা বললেন। সেদিন পাঠকালে বলেছিলেন, "কালাচাঁদ ক্ষেপা আমাতে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। তিনি ঘরের এক কোণে আর আমি অন্য কোণে আছি। শক্তি সঞ্চার সময়ে মনে হল, যেন electric battery (বৈদ্যুতিক ব্যাটারী) charge করলেন। পরে বললেন, "তুমি শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা, জাগ।" তিনি ফাঁকা বাতাসে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে ভালবাসতেন। বলতেন, ওতে শক্তি নষ্ট হয় না। অনন্ত আকাশ সামনে আছে কিনা। সুরটা ভেতরে আছে। গান বা শব্দগুলি সেই সুরকে প্রকাশ করছে মাত্র। ভেতরের সুরটা বাহিরে প্রকাশ করে বাদ্যযন্ত্র বা সঙ্গীত। ঠাকুর চক্ষু বন্ধ

করলে বীণার স্বর শুনতে পেতেন। যারা ইচ্ছা করে তারা সে ধ্বনি শুনতে পায়। অবশ্য সাধন চাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার এসে তাঁর এই অবতারের ভাবই আরো প্রকট করবেন। চৈতন্য মহাপ্রভু যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভাবকে প্রচার করলেন তেমনি। ঠাকুর হচ্ছেন world-soul, বিশ্বাত্মা। বিশ্ব-সাহিত্য পড়ে দেখ, সমন্বয়-সঙ্গীত বেজে উঠেছে। প্রত্যেক ধর্ম বা দর্শন, শাস্ত্র বা মহাপুরুষ তাঁর স্ব-স্ব গণ্ডী ছাড়িয়ে, নিজ ভাবের পূর্ণ বিকাশ করলেই অদ্বৈতে গিয়ে পড়বে। তাই ঠাকুর বললেন, "অদ্বৈত শেষ কথা। অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।"

॥ সমাপ্ত ॥

শ্রীশ্রীশিবনামামৃত লহরী

॥ নবম উচ্ছ্বাস ॥

পিনাকপাণি ভূতেশ মুদ্যৎ সূর্য্যাযুত দ্যুতিম্।
ভূষিতং ভুজগে ধ্যায়েৎ কণ্ঠেকাল কপর্দ্দিনম্॥

যন্নাম মন্ত্রোচ্চারণেন সদ্যো
ধন্যা ভবন্ত্যেব হি পাপিনোঽপি।
তং দেবমীশং শরণম্ ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈকবন্দ্যম্।

—শিবরহস্যে।

যাঁর নাম মন্ত্র উচ্চারণ মাত্রই পাপিগণও তৎক্ষণাৎ ধন্য হয়, ব্রহ্ম ইন্দ্র বিশ্বাদি সুরগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম দেহক্ষয় পূর্ব্বকালে
স্মৃতং দদাত্যেব হি মোক্ষমেকম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈকবন্দ্যম্॥ —ঐ

যাঁর নাম মরণের সময় স্মৃত হলে একমাত্র মোক্ষ দান করে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র বিশ্বাদি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময় মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম তত্ত্বং নহি বেদবেদ্যোঽ
প্যনন্তশাখঃ সকল স্বরূপম্।

তৎ দেবমীশং শরণং ব্রজামি

ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈকবন্দ্যাম্‌।

—ঐ

সকল স্বরূপ অনন্ত শাখা বেদও যাঁর নামতত্ত্ব জানেন না সেই ব্রহ্মা ইন্দ্র বিশ্বাদি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময় মহেশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম সংসার মহাসমুদ্র

বিদ্রাবকং সর্ব্বভয়াপহারি।

তৎ দেব মীশং শরণং ব্রজামি

ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈকবন্দ্যাম্‌।

যাঁর নাম সংসার মহাসমুদ্র দূর করে দেয় (শুষ্ক করে দেয়) সকল ভয় অপহরণ করেন সেই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিশ্ব প্রভৃতি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় ঈশের শরণ গ্রহণ করি।

কি বলে শরণ নিতে হয় ?

"আমি অপরাধের আলয়, অকিঞ্চন, আমার কিছু নাই, তুমিই আমার উপায় ভূত হও" এই প্রার্থনার নাম শরণাগতি।

শ্রীগীতায় বলেছেন—

তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী —৪॥১৫অ।

যাঁহা হতে অনাদি পুরাতনী সংসার প্রবাহ নিঃসৃত হয়েছে আমি সেই একমাত্র আদি পুরুষের শরণাপন্ন হই।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে কথিত হয়েছে—

তং হি দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং

মুমুক্ষুর্বৈশরণমহং প্রপদ্যে ॥১৮

আমি মুক্তি মাত্র কামনা করে আত্মবুদ্ধির প্রকাশক সেই জ্যোতির্ম্ময়, পুরুষের শরণ গ্রহণ করি।

আত্মবুদ্ধি প্রকাশক কি ?

আমি দেহ এইটা অজ্ঞান, আমি আত্মা, আমি ব্রহ্ম এই হল সংসার নাশক জ্ঞান, শরণাগতির দ্বারা ভক্ত সেই জ্ঞান লাভ করে। আমি ব্রহ্ম এরূপ মনে করা অপরাধ নয় ?

ভগবান রামানুজ বলেছেন, জড়, চেতন সবই তাঁর দেহ, তিনি যখন

আমার আত্মার আত্মস্বরূপ, তখন অহং ব্রহ্ম এভাবে উপাসনা করে দেহাত্মপাশ হতে মুক্ত হবে।

শ্রীভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

জীবলোকে আমারই অংশ সনাতন জীব।

সমুদ্রে ও তার তরঙ্গে, সূর্য্যে সূর্য্যরশ্মিতে, চন্দ্রে চন্দ্রকিরণে যেমন ভেদ নাই তেমনই ঈশ্বর ও জীবে ভেদ নাই। তথাপি ভগবান শঙ্কর বলেছেন—

"সমুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তরঙ্গঃ।"

তোমায় আমায় যে ভেদ তা দূরীভূত হলেও হে নাথ তোমারই আমি, এই সত্য, কিন্তু আমার তুমি হতে পার না। কেন না সমুদ্রের তরঙ্গ তরঙ্গের সমুদ্র নয়।

শরণাগত ভক্ত একমাত্র ইষ্টের দিকে চেয়ে থাকেন।

সরঃ সমুদ্রো নদ্যাদি সন্ত্যজ্য চাতকো যথা
তৃষিতো ম্রিয়তে বাপি যাচতে বৈপয়োধরম্।
এবমেব প্রযত্নেন সাধনানি পরিত্যজেৎ
স্বেষ্ট দেবৌ সদা যাচ্যৌ গতিস্ত্বোমে ভবেদিতি॥

সরোবর সমুদ্র নদী প্রভৃতি ত্যাগ করে তৃষিত চাতক যেমন তৃষ্ণায় মরে গেলেও মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে সেইরূপ প্রযত্ন সহকারে সকল সাধনা ত্যাগ করত ইষ্টদেব ও গুরুদেবের কাছেই তাঁরা আমার গতি হোন এই-ই সতত প্রার্থনীয়।

ভক্ত আর কোন দিকে চান না ইষ্টের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

বাতৈর্বিধুনয় বিভীষয় ভীম নাদৈঃ
সঞ্চুর্ণয় ত্বমথবা করকাভি ঘাতৈঃ।
ত্বদবারি বিন্দু পরিপালিত চাতকস্য
নান্যগতির্ভবতি বারিদ চাতকস্য।

প্রবল বাতাসে অতিশয় আলোড়িত কর, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন কর, ভয় দেখাও, অথবা (করকা) শিলাখণ্ড আঘাতের দ্বারা সম্যক চূর্ণ-বিচূর্ণ কর, তথাপি হে বারিদ, তোমার বারিবিন্দু পরিপালিত চাতকের তো আর অন্য গতি নাই!

ভক্ত বলেন, হে প্রাণের প্রাণ, হে দয়িত অনুক্ষণ অত্যন্ত কম্পিত কর, সংসারের সাধুবাদ নিন্দাবাদ আদি ভীষণ কোলাহলে আমাকে ভয় দেখাও, অথবা

লয় বিক্ষেপ ইন্দ্রিয়ের পীড়নরূপ করকাঘাতে আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ কর তথাপি হে আমার অন্তরতম, তুমি ভিন্ন যে আমার অন্যগতি নাই।

যন্নাম সঙ্কীর্ত্তন পূত জিহ্বা
ব্রহ্মেন্দ্র রুদ্রাবর আদি পূজ্যাঃ।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈক বন্দ্যম্। —ঐ

যাঁর নাম সঙ্কীর্ত্তনে পূত-রসনা ভক্তগণ ব্রহ্মা, ইন্দ্র রুদ্রসকল, অন্যান্য দেব মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীগণের পূজনীয়, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিশ্বাদি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম গোকোটি সহস্রকোটি
প্রদান পুণ্যাধিক পুণ্যপুণ্যম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈকবন্দ্যম্॥ —ঐ

যাঁর নাম গো কোটি সহস্র কোটি গোদানের যে পুণ্য হয় তার অধিক পুণ্য প্রদান করেন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিশ্ব প্রভৃতি সুরগণের একমাত্র বন্দনীয় সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি।

যন্নাম যাগার্ব্বুদ কোটি কোটি
সহস্র পুণ্যাধিক পুণ্য পুণ্যম্।
তং দেবমীশং শরণং ব্রজামি
ব্রহ্মেন্দ্র বিশ্বাদি সুরৈকবন্দ্যম্॥

যাঁর নাম অর্ব্বুদ কোটি যাগ কোটি সহস্র পুণ্যের অধিক পুণ্যজনক, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিশ্ব প্রভৃতি দেবগণের একমাত্র বন্দনীয়, সেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করি

তাহলে, তাঁর শরণাগত হলেই মানুষ কৃতার্থ হয়, নির্ভয় হয়? হাঁ! এই প্রপত্তিমার্গ অবলম্বনই মানুষের ভগবৎ প্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম উপায়।

প্রপত্তিমার্গ কাকে বলে?

শাস্ত্রে প্রপত্তির (আত্মন্যাসরূপ শ্রেষ্ঠ ভক্তির) এই কয়েকটি অঙ্গ লিখিত হইয়াছে।

প্রপত্তি রানুকূল্যস্য সঙ্কল্পোঽপ্রতিকূলতা।
বিশ্বাসো বরণং ন্যাসঃ কার্পণ্যমিতিষড়বিধা।

আনুকূল্য: (প্রপত্তির অঙ্গীভূত, প্রপত্তির অনুকূল সঙ্কল্পাদি)

অপ্রতিকূলতা : (যাহারা প্রপত্তির প্রতিকূল তাহাদের বর্জ্জন)

বিশ্বাস : তুমি আমায় নিশ্চয় রক্ষা করিবে রক্ষা করা তোমার স্বভাব এইরূপ বিশ্বাস।

বরণ : শ্রীভগবানকে রক্ষয়িতৃরূপে আশ্রয় করা।

ন্যাস : শ্রীভগবানের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মভাবের নিক্ষেপ।

কার্পণ্য : অকিঞ্চনতা।

শরণাগতি মানুষকে একবারে নিশ্চিন্ত করে দেয়।

শরণাগত হওয়াও তো কঠিন দেখছি।

আচ্ছা, তাহলে সরল সুগম সহজ শিব শিব জপ কর।

শিব, শিব, শিব, শিব, শিব, শিব, শিব, শিব।
শিব, শিবঁ, শিব, শিব, শিব, শিব, শিব, শিব॥

—০—

দিগ্বিজয়ী

[শ্রীপাঁচুগোপাল হাজরা বি-এ, বি-টি]

নিমাই পণ্ডিত পাঠনায় রত আছেন নদীয়াপুরে
করিয়া বিনয় করেন বিজয় যত সব পণ্ডিতেরে।
বহু শাস্ত্র ব্যাখ্যা করি সব শিক্ষা চমকিত সর্ব জনা
হাজারে হাজারে শিষ্যগণে করে নদীয়ায় অধ্যাপনা।
হেরি জ্যোৎস্নাবতী নিশি ফুল্লমতী শিষ্যগণে ল'য়ে সঙ্গে
হরিষ অন্তরে সুরধুনী তীরে নিমাই ভ্রমেন রঙ্গে।
দিগ্বিজয়ী হেথা উপনীত তথা শিষ্যগণ ল'য়ে সবে
পণ্ডিত নিমাই গেলা তাঁর ঠাঁই মিলিত হইলা তবে॥

হেরিয়া পণ্ডিতে অবজ্ঞা ভরেতে কহিছেন দিগ্বিজয়ী
কাশ্মীর স্বধাম, কেশবানন্দ নাম, হব বিদ্যায় জয়ী।
শুনি তব গুণ শাস্ত্রেতে নিপুণ দেখাও হে গুণগ্রাম
কর পরাজয় নহে দাও জয়-পত্রেতে তব নাম।
করি জোড় কর কহে প্রভুবর বিদ্যাতে প্রবীণ তুমি
মুই অতি ছার দীন কোথাকার নবীন পড়ুয়া আমি।
তোমার গুরুত্ব তোমার কবিত্ব শুনিতে মোদের মন—
বন্দ সুরধুনী পতিত পাবনী, তব গুণ অগণন॥

শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্বেতে তখন গঙ্গাস্তব আরম্ভিল
দণ্ডেক ভিতরে শতেক শ্লোকেরে লীলায় রচিয়া দিল।
কহেন নিমাই 'পৃথিবীতে নাই এ হেন পণ্ডিত কবি
কিরূপে পাইলে কেমনে রচিলে, অদ্ভুত তব সবি!
'ভবানীভর্ত্তা শিরসি' (১) শ্লোকের গুণ দোষ বল মোরে।'
শুনি সব লোক পায় মনে সুখ, গুণ না বর্ণিতে পারে।
বিপ্র করি রোষ কহে নাহি দোষ, পড় নাই অলঙ্কার—
কবিত্বের সার স্তবটি আমার, তুমি কি বুঝিবে তার?

কহে প্রভু ধীরে রুষ্ট কবিরে দোষ না ধরিহ মোর
পঞ্চ অলঙ্কার শ্লোকেতে তোমার পঞ্চদোষে ছারখার।
'ভবানীভর্ত্তা' শব্দ দিলে হেথা পাইয়া পীরিতি তুমি
'বিরুদ্ধ মতিকৃৎ' (২) দোষটি মহৎ কেমনে খণ্ডিব আমি।
'ভবানী' শব্দেতে কহেন পণ্ডিতে দেবাদিদেবের জায়া—
শিবপত্নীভর্ত্তা এ কেমন বার্ত্তা, না জানি এ কোন্ মায়া!
প্রভু এইরূপে বিচারি সে' শ্লোকে পঞ্চদোষ (৩) ধরি দিলা
দ্বিজ আচম্বিত প্রতিভা স্তম্ভিত বাক্ নাহি উপজিলা।

পড়ুয়া বালক কৈল বুদ্ধি লোপ শিশুদ্বারে অপমান
ব্রাহ্মণ ক্ষোভেতে করিল নিশীথে সরস্বতী আবাহন।
স্বপ্নে আবির্ভূতা দেবী বেদমাতা উপদেশ দিল ভোরে
সাক্ষাৎ ঈশ্বর শচীর কোঙর প্রণিপাত কর তাঁরে।
প্রাতে আসি তবে পড়ি' প্রভুপদে শরণ মাগিলা কবি—
প্রভু কৃপা করি তাঁরে বক্ষে ধরি ক্ষমে অপরাধ সবি।
কেশব কাশ্মীরি লভিলা শ্রীহরি আপন বিদ্যার বলে
মহাপ্রভু তাঁরে টানি কেশে ধ'রে রাখিলা চরণ তলে।

—*—

(১) মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি সুভগা।
দ্বিতীয়া শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥

(২) সাহিত্যদর্পণে—
ভবানীশঃ শব্দো ভবান্যাং পত্যন্তরপ্রতীতিং
কারয়িত্বা বিরুদ্ধমবগময়তি।

(৩) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি লীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ—দ্রষ্টব্য।

—•—

নাসিক কুম্ভে নাম প্রচার

[শ্রীগোবিন্দদাস কিঙ্কর]

[পূর্বানুবৃত্তি]

কুমারজী শশব্যস্তে আমাদের একটি ডেকৃচী নিয়ে মহারাজের অনুগমন করলো। কিন্তু ফিলে এলো শুধু হাতে। পরিবেশক মহাত্মাদের একজন এসে ভাত রুটী ডাল তরকারী রেখে চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করে আমরা প্রসাদ গ্রহণ করলাম পরিপূর্ণ তৃপ্তি সহকারে।

হঠাৎ পরিশ্রমে সকলেই একটু ক্লান্তি বোধ করছিলাম তাই মুখ হাত ধুয়েই কম্বলের নীচে আরো কিছু শুকনো খড় দিয়ে (মোহান্তজীর নির্দ্দেশমত) সকলেই শুয়ে পড়লাম দরজা ভেজিয়ে।

ঘড়ী সঙ্গেই ছিল। ঠিক সাড়ে চারটায় আবার আমরা নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নীচেকার ঘাটের রাস্তা দিয়ে। গোদাবরীর রামকুণ্ডের উপরই এ আখড়া। রামকুণ্ড এবং তার আশপাশ তখন স্নানাবগাহন নিরত নরনারীর কলকোলাহলে মুখরিত। ঘাটের কিঞ্চিদ্দূরের মুক্তস্থানে দাঁড়িয়ে আমরা নাম কচ্ছি আর চারদিক থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা এসে সকলকে ঘিরে দাঁড়ালো। স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে অনেকে শুধুমুখে বা হাততালি দিয়ে নামও করতে লাগলেন। কেউ কেউ আবার খোঁজও নিতে লাগলেন। টাকা পয়সা দিতে এসে যখন অনেকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেলেন তা দেখে যেন আমাদের উপর লোকের একটু বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির ভাব প্রকাশ পেতে লাগলো। অনেকে প্রণাম করতে লাগলেন। ব্যাপার গুরুতর দেখে এবং নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ কর্ম্মচারীদের সপ্রণাম যুক্তকর প্রার্থনায় আমরা স্থানত্যাগ করে বড় রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম। কয়েকজন সাধুও আবার এসে নামে যোগদান করলেন। এ বেলাও আমরা কুম্ভক্ষেত্রের সাধু মহাপুরুষ অধ্যুষিত তপোবনের দিকে না গিয়ে পরপারে সহরের ভিতরই প্রবেশ করে রাস্তায় রাস্তায় অলিতে গলিতে নাম প্রচার করতে লাগলাম এবং "জলন্ত আশ্বাস" ছড়াতে লাগলাম। পথে পথে ঠাকুরের নানাদেশীয় শিষ্য ভক্তদের সঙ্গেও দেখা হতে লাগলো। সকলেরই মুখে এক কথা "বাবা এসেছেন? মৌন ভাঙ্গেনি?" 'না' বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মুখ চোখের আনন্দ নিমিষে মিলিয়ে যায়, চোখ করে ছল ছল। জামা জুতাহীন; অর্দ্ধোলঙ্গ, মলিন বস্ত্রধারী, রুক্ষকেশ নামকারী সাধুদের উপর এসব নানাস্তরের লোকেদের অযুগসুলভ শ্রদ্ধাতিশয্য দর্শনে ভিড় জমে যায় খুব। ফলে আমাদের ঠিকানা জানিয়ে দিয়ে সরে পড়তে হয় বাধ্য হয়ে। তাতে পথচারীদেরও চলা

ব্যাহত হয় না আমাদেরও অগ্রগতি চলতে থাকে এবং 'জলন্ত' আশ্বাসে'রও আশ্রয় হয়। তবে সে আর কতটুকু! কিছুদূর যেতে না যেতে আবার থামতে হয়, আবার ভীড় জমে। এভাবে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত নাসিক সহরের বড় বড় রাস্তায় নাম প্রচার ক'রে বাসস্থানে ফিরে এসে আরত্রিকাদি সেরে চিঁড়ে গুড়ের প্রসাদ পেয়ে সকলে যে যার কম্বলে শুয়ে পড়লাম। চিঠিপত্রও এর মধ্যেই লিখে ফেলা হলো।

৬ই ভাদ্র বুধবার।

আজ সকালে পূর্ব্ববৎ সকলে বেরিয়ে পড়লাম। আগন্তুক সাধুও ২।১ জন সঙ্গ নিলেন। বই কিছু সঙ্গে এনেছিলাম প্রচারের জন্য, সারাদিন ঘুরাফেরার পর বই প্রচারের সুযোগ না দেখে কখানা হিন্দী ইংরেজী গুজরাটী ও উর্দ্দু বই সঙ্গেই নিয়ে চললাম। আজ তপোবনের পথে চলেছি—বোম্বাই আগ্রারোড ধরে। প্রশস্ত বাঁধানো রাজপথ পরিষ্কার ঝর ঝরে। লোক চলাচল অপেক্ষাকৃত কম; যানবাহন চলাচল লেগেই আছে। এ পথের উপর গৃহস্থদের বাড়ীঘর নেই বল্লে অত্যুক্তি হয় না। অধুনা পথের দুপাশেই প্রতিষ্ঠিত সাধু সন্তদের অস্থায়ী ছাউনী দেখা যাচ্ছে। অধিকারীদের রুচিসম্মত, কেউ খড়, কেউ বাঁশের দরমা, কেউ টীন, কেউ ত্রিপল, পাল বা তাঁবু দিয়ে আপন আপন ছাউনী তৈরী করেছেন—কদাচিৎ কেউ কেউ আবার তৈরী বাড়ীও ভাড়া নিয়ে বসে গেছেন। তাঁরা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের। বৈষ্ণবরা আনুষ্ঠানিক ভাবে কারো বাড়ীতে বাস করেন না। ফটকে বা তোরণগায়ে আপন আপন নাম ও নিবাসস্থান লেখা আছে। কেথাও মাইকে কোথাও শুধুমুখে বক্তৃতা হচ্ছে, কোথাও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, কোথাও নামসঙ্কীর্ত্তন, কোথাও ভজন আবার কোথাও যজ্ঞ হচ্ছে—স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে। নাম কানে যাওয়া মাত্র ছাউনী-মধ্য থেকেই অনেকে নামকে প্রণাম জানাতে লাগলেন প্রচারপত্র নেবার জন্য কাউকে পাঠিয়ে দিলেন—আবার কেউ কেউ এসে নেচে নেচে আমাদের সঙ্গে নাম করতে লাগলেন।

পরিবেশের অনস্বীকার্য্য প্রভাব এবার অনুভব করতে লাগলাম। ভীড়তো নাসিক শহরেও দেখে এসেছি, ভক্ত সমাগমও সেখানে বেশ হয়েছে, কিন্তু এই সাধু মহাপুরুষ-বাস-শুদ্ধ স্থানে এসে সাধুকণ্ঠসহ নাম করতে করতে যেন আপনা থেকেই আমাদের সকলের দেহমন ভক্তিরসে উদ্বেল হতে লাগলো। ঠাকুর সঙ্গ ছাড়া নামকীর্ত্তনে এ-রকম ভাব আমরা প্রায় লাভ করি না।

ঠাকুরের ধারা নিজেদের প্রচার করতে গিয়ে অপরের প্রচার বিঘ্ন না করা। তাই আমরা কোন ছাউনীতেই প্রবেশ না করে দূর থেকে প্রণাম করে করে এগুতে লাগলাম। যতই তপোবনের দিকে এগুতে লাগলাম

ততই রাজপথ সাধুসমাকীর্ণ দেখ্‌তে লাগলাম, ততই আনন্দও বর্দ্ধিত হতে লাগলো। এত তাড়াহুড়া করে চলার মধ্যেও আবার পুস্তকও ২।১ খানা আগ্রহীরা কিনে নিতে লাগলেন। ক্রেতাদের প্রায় সকলেই গৃহী। সাধুদের কাছে আমাদের মূল্য চাওয়া বিশেষ করে সাধুবেশী হয়ে, একটু শ্রুতিকটু, আবার এই সাধু-সমুদ্রে সহজ-প্রার্থীদের বিতরণেরও সামর্থ্য নেই—তাই অগত্যা মধ্যপথ অবলম্বন করে তেমন দেখে দেখে কিছু কিছু বিতরণও করতে লাগলাম।

পথে পথে বাবার শিষ্য ভক্তের সাক্ষাৎকার আজও পেতে লাগলাম। এঁদেরও একই কথা, "বাবা কাঁহা হেঁ—ক্যা পধারে নহী?" প্রত্যুত্তরে তাঁদের আগ্রহাকুল ফুল্লমুখে কালিমা লেপন করে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে। এবার সাধুদের তপোবনের ধ্বজপতকাশোভিত বিরাট শিবিরগুলি দেখা যেতে লাগলো। সেবানন্দ, কুমারনাথ, কৃষ্ণদা এবং প্রহ্লাদ নামে মাতোয়ারা। প্রণব এবং পতাকাবাহী ভগবানদাসজীও সচেতন হয়ে উঠলেন। মেঘঢাকা আকাশ অথচ বৃষ্টিপাত নেই—তাই কায়িক ক্লেশও কম হতে লাগলো।

আমাদের গন্তব্যস্থান আজ মারীচ-বধ-স্থলে অর্থাৎ তপোবনের শেষ প্রান্তে। তাই কৌতূহল থাকলেও পাছে সহস্র সহস্র সাধুর মধ্যে কারো ফাঁদে পড়ে বেলা হয়ে যায়, তাই পঞ্চায়তী সাধু-শিবিরে না গিয়ে বাঁ দিকের কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। রাস্তা শিবিরের পাশ দিয়েই গিয়েছে। তাই আপন আপন তাঁবু থেকেই সাধুরা কেউ কেউ উল্লসিত হয়ে আমাদের যাবার জন্য যুক্তকরে আহ্বান করতে লাগলেন এবং অনেকে ছুটে এসে আমাদের সঙ্গে নাম করতে লাগলেন। 'জলন্ত আশ্বাস' আর কত দোব? আমরা যেন পালালে বাঁচি অবস্থা! থালসার সাধুদের "অন্য একদিন নিশ্চয়ই আসবো" বলে প্রণাম জানিয়ে আমরা গতির তীব্রতা বাড়িয়ে দিলাম। এবার পথের বামদিকের মহাত্যাগী বৈষ্ণব সাধুদের দেখে মুণ্ড ঘুরে গেল। মায়াপুরী হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় ও তুহিন-শীতল গঙ্গার বেলাভূমিতে সহস্র সহস্র মহাত্যাগীদের দেখেছি, তীর্থরাজ প্রয়াগের মকর-কুম্ভেও এ-রকম সহস্র সহস্র রামানন্দীয় মহাত্যাগীদের মুক্তাকাশ তলে শীতকে অগ্রাহ্য করে গঙ্গা সৈকতে মনের আনন্দে প্রাতঃস্নান এবং সায়ংস্নান সহ কল্পবাস করতে দেখেছি—কিন্তু এমন করে মনের উপর তাঁরা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। একটা গাছ পর্য্যন্ত সহায় নেই। এই ঘোর বর্ষার দিনে নিজের হাতে মাঠের ঘাসগুলিকে কোদাল দিয়ে চেঁচে, লেপে পরিষ্কার ঝরঝরে করে এক একটি মাত্র ধুনি জেলে পরমানন্দে দিনের পর দিন কাটিয়ে

দিয়েছেন। কোমরে গুঞ্জার (কুশগুচ্ছ) ডোর আর পরণে আতি ছোট্ট কৌপীন। আসবাবপত্র কিছুই নেই একটি কাঠ বা লাউএর কমণ্ডলু ও যৎসামান্ত আহার্য্য—তাও আবার বৃষ্টিতে আচ্ছাদন করার কিছু নেই। রামজি যেদিন যে-রকম জুটান তাই নিবেদন করে, "কে কোথায় অভুক্ত আছে প্রসাদ পাবে এসো" বার দু-তিন ডেকে ডেকে প্রসাদ পেয়ে সারাদিনের মত জঠরচিন্তা থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। পেলে তাঁরা গাঁজা খান। কিন্তু আমরা এমন হতভাগা আমাদের দৃষ্টি তাঁদের এত ত্যাগকেও নিমিষে ডিঙিয়ে গিয়ে স্থিতিলাভ করে তাঁদের গঞ্জিকা সেবনে।

হাত পেতে এঁরা এসে ঠাকুরের 'জ্বলন্ত আশ্বাস' নিতে লাগলেন একজন একজন করে। আবার কপালে ঠেকিয়ে মৃদুস্বরে পড়তে লাগলেন। পড়তে পড়তেই আহা আহা করতে লাগলেন অনেকে।

জোর করে ওঁদের আকর্ষণও কাটিয়ে ওখানকার সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ-জির মন্দির প্রভৃতি পার হয়ে যখন মারীচ-বধ স্থানে উপস্থিত হলাম তখন বেলা হয়ে গেছে। অপরের আশ্রয়ে আছি ফিরে যাবারও তাগিদ অনুভব করতে লাগলাম। এখানে লোকজন কম। দু-একটী আশ্রম আছে কুম্ভ উপলক্ষে একটু ভিড় বেড়েছে। সামনেই গোদাবরী অতি নিকটে পরপারে গোদা-তটের পাহাড়ে সাধুদের খোদাই গুহাগুলি দেখে লোভ হচ্ছিল। গোদাবরীর পুণ্য-পুলিন—তার উপর নির্জ্জনতা। সাধকের বিশেষ করে নাদ নিয়ে যাদের কারবার তাদের তো, ঠাকুরের ভাষায়—'কিছুমাত্র না করলেও হবার কিছু বাকী থাকবে না।'

নামের চাইতে স্থানের উপর তার তথ্যের উপর আমাদের বেশী লক্ষ্য পড়ায়, অধিকন্তু দুপুর বেলায় ভিড়ও কম থাকার ফলে আমাদের নাম আর এখানে তেমন জমাটভাবে চললো না। মারীচ-বধ মন্দিরে প্রবেশ করামাত্র মুষলধারায় বারিপাত হতে থাকায় আমাদের যেন আলাপ আলোচনার আরো সুযোগ হয়ে গেল।

ছোট মন্দির স্থানটীর ধ্বজা ধরে বিরাজ কচ্ছে। পূজারীজীর কাছে জিগ্যেস করে করে যৎসামান্য খোঁজ খবর নেওয়া হলো—তিনিও খুব ওয়াকিবহাল নন্ দেখে এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে আমরাও ঠিক নাম ধরেছি জোরাল করে আর বৃষ্টিও দেখি তখন প্রায় থেমে গেছে আকস্মিকভাবে।

যাক্, আমরা তাই চাচ্ছিলাম। পিচ্ছিল পথ গুড়িগুড়ি বৃষ্টিও পড়চে তাই সেবানন্দর হারমোনিয়ম এবং প্রহ্লাদজীর দোলক নামাবলী বা গাত্রাবরণী

দিয়ে আবৃত করে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে খালি মুখে নাম করতে করতে যখন চতুঃসম্প্রদায়ের আখড়ার মন্দিরে এলাম তখন যুদ্ধজয়ী পুত্রগণকে দেখার মত আনন্দে অধীর হয়ে মোহান্তজী তাড়াতাড়ি দোতলার কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটে এসে নামকে প্রণাম করলেন।

বিগ্রহ এবং মোহান্তজীকে প্রণাম করার পর বার বার তিনি জিজ্ঞেস করলেন সকালের বালভোগ না নিয়ে কেন চলে গেলাম।

—০—

আমাদের দায়িত্ব

[শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-টি]

(ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, বাণীপুর জনতা কলেজ)

ভবিষ্যৎ ভারতের ছাত্র বর্ত্তমান বা প্রাচীন কোনও আদর্শের মাধ্যমে গঠিত হবে কি না—আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, বিদ্যাসাগর, গুরুদাস, আশুতোষের মাতৃভক্তি লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, ক্যাসাবিয়াঙ্কার আজ্ঞাপালনের দৃঢ়তা, নেপোলিয়নের সঙ্কল্পশক্তি যদি আজ প্রহসনের সামগ্রী হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে আজ ছাত্রসমাজ কোন্ অবলম্বনকে আশ্রয় ক'রে দাঁড়াবে? স্বাধীনতা লাভের পর যুব-সমাজের ব্যাধি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে গুরুজনের দোষ ধরা এবং নিজেদের দোষগুলি চাপা দেওয়া সমাজ-গঠনের বড় বড় বুলি সাম্‌নে রাখা অথচ নিজেদের দেহ মন গঠনে উপেক্ষা, বাবা-মাকে, শিক্ষককে সমালোচনার উপজীব্য করা—অথচ এর পরিণাম কি? এইভাবে যুবসমাজের অগ্রগতি বর্দ্ধিত হচ্ছে না ব্যাহত হচ্ছে? দীর্ঘ নয়টি বছর চলে গেল, বাংলার যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ আত্মগঠনের ও জ্ঞানানুশীলনের মূল কথা বাদ দেওয়ার ফলে কোন্‌দিকে কতটুকু লাভবান্ হোল? সকলের বাবা-মা তো মহাপুরুষ হ'তে পারেন না, তাই ব'লে কি তাঁরা পুত্রকন্যার কাছে অশ্রদ্ধেয় হবেন? মুখে সাধারণ লোকের জয়গান ক'রবো, অথচ মাতাপিতা আচার্য্য প্রভৃতি সাধারণ-পদবাচ্য হ'লে তাঁদের অসম্মান ক'রবো, এ কোন্ দেশী যুক্তি? অতি সাধারণ ব্যক্তিই যখন সম্পর্কে গুরুজন হবেন তখন তিনি আমার প্রণম্য, এই স্থূল কথাটীর মর্ম্ম আধুনিক ছাত্রসমাজ গ্রহণ ক'রতে পারে না! জীবন-সংগ্রামে এই সত্যকে সম্বল ক'রেই দাঁড়াতে হবে। পূজ্য পূজার ব্যতিক্রম

ঘোরতর অপরাধ, এ বোধ না থাকলে, এই নীতি অনুসরণ না ক'রলে জীবন-যুদ্ধে টিক্‌বো কি করে? দোষ ধ'রে ধ'রে এমন অবস্থায় ছাত্ররা আজ পৌঁছেচেন যে পরীক্ষা পাশের জন্য ন্যূনতম যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী পরিশ্রম ক'র্‌তে তাঁরা অসম্মত। শরীর গঠনের জন্য দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস তাঁরা ক'র্‌তে চান না। যে বাবা-মা লেখাপড়া জানেন না, যে শিক্ষক নম্বর বাড়িয়ে দেন না, মনোমত প্রশ্ন ক'রে তালে তালে চলেন না, প্রশ্ন ব'লে দেন না, নকল ক'রতে দেন না, তাঁরা সমাজের বোঝা, এই হ'ল ছাত্রদের ধারণা। আজ তাঁদের সেই চির-পুরাতন উপদেশ নতুন ক'রে দিতে হবে—তাঁদের শেখাতে হবে যে—লেখাপড়ায় মন দেওয়া উচিত, শরীর গঠনে তৎপর হওয়া উচিত, ঘরের লোককে ভাল ক'রতে হ'লে নিজের দোষগুলি যথাসাধ্য সংশোধন করা উচিত। শুধু ধূমপানের মাত্রা বৃদ্ধি ক'রে, চলচ্চিত্র ও খেলার মাঠের মুখরোচক গল্প ক'রে বিশেষ বিশেষ সমাজে জনপ্রিয় হওয়া চলে কিন্তু বড় ছোট কোনও কাজই সার্থক ভাবে করা চলেনা। এই মামুলি বচনটি আজ তাদের শোনাতে হয়। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত এ সব কথা তাদের অজানা ছিলনা। নীতি পালনে হয়তো ত্রুটি হ'তো, কিন্তু নীতিবোধ ছিল। আজ নীতিপালনে নাই শৈথিল্য, কারণ নীতির অস্তিত্বই তাদের জীবনে নাই, পালনের প্রশ্ন ওঠে না! কিন্তু শুধু বাবা, মা, গুরুজনদের দোষ ধ'রলেই, রাজনীতির বড় বড় সমস্যা বড় গলায় আলোচনা ক'রলেই আমাদের জ্ঞানের পথ, প্রতিযোগিতায় জয়লাভের পথ, গঠনের পথ প্রস্তুত হবে না। কলেজের প্রবেশমুখী এবং বিদ্যালয়ের বিদায়মুখী ছাত্রেরা যেখানে সেখানে ধোঁয়া টান্‌তে টান্‌তে পূর্ব-পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রলেই স্বাধীনতার প্রাণশক্তি ফিরে পাবে না। ছাত্র-জীবনে সময় থাক্‌তে শরীরটাকে শক্ত ক'রে গড়্‌তে হবে সে কথাও ভুলে গেছি। উচ্চ বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পর জ্ঞানের যে আলম্বন নিয়ে দাঁড়াতে হয় তার অনুশীলনে অবহেলা ক'রছি। প্রাণের ও মনের আনন্দ লাভ ক'রতে হ'লে যে সব অভ্যাস আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন সে কথা বিস্মৃত হ'য়ে গেছি। আমাদের মধ্যে ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধির জন্য দায়ী আমরাই। ভোরের আলোর, বিকালের খোলা হাওয়ার, সদ্‌গ্রন্থের শক্তি-প্রাচুর্য্যের, সদভ্যাসের নিয়ত অনুশীলনের, কর্ম্মপ্রীতির এবং প্রাণদানের মাধুর্য্য আস্বাদে আমাদের এত কুণ্ঠা কেন?

সঙ্কল্পে বিশ্বাসী না হ'য়ে, অধ্যয়নে আগ্রহশীল ও শ্রদ্ধাশীল না হ'য়ে,

শিক্ষণীয় বিষয়ে অধ্যবসায়ী না হ'য়ে, গৃহগুরু পিতামাতাতে ও বিদ্যাগুরু শিক্ষকের প্রতি নির্ভরশীল না হ'য়ে দেহমনের স্থায়ী উন্নতিবিধান সম্ভবপর নয়। যতদিন না নিজেরা উপযুক্ত হ'তে পারছি ততদিন নির্ভর ক'রতে হবে, বিশ্বাস ক'রতে হবে, হিতৈষী গুরুজনদের অভিভাবকত্ব স্বীকার ক'রতে হবে। শুধু অপরিণত অবস্থায়, অধিকারী না হ'য়ে, নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে গ্রহণ ক'রছি ব'লেই আত্মোন্নতির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, সেইজন্যই আমাদের তরুণদের অবস্থা 'ঘুণদগ্ধ বংশখণ্ডে'র মত। সুখের শয্যায় শুয়ে কুতর্কের সাহায্যে সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা মনুষ্যত্বের প্রমাণ নয়। বিনা তর্কে নীরবে আদেশ পালনেই মনুষ্যত্ব। বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিরাট আনুগত্যে। নিঃশেষে আত্মবিলুপ্তি ব্যক্তিত্ববানের পক্ষেই সম্ভব। পিতৃসত্যপালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন, অগ্রজের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে লক্ষ্মণের সীতাকে বনের মধ্যে নির্ব্বাসন, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না ক'রে বিদ্যাসাগরের উদ্বেলিত দামোদরে লাফ দেওয়া—এর-ই মধ্যে বীরত্ব এবং পৌরুষ। আগে কাজ পরে কথা, নিজেকে পদে পদে জাহির না ক'রে পলে পলে নিশ্চিহ্ন ক'রে যন্ত্রীর যন্ত্র স্বরূপে রূপান্তরণ—এই তো মনুষ্যত্ব! দুঃখের বিষয় এই সব আদর্শকে সম্মান করবার সামর্থ্যও আমরা হারিয়েছি। আদর্শ-নিষ্ঠার বদলে গ্রহণ ক'রেছি কূট তর্কের নীতি, ছিদ্রান্বেষণের রীতি। আদর্শ রক্ষাই আত্মরক্ষার উপায়; আদর্শ ভ্রংশ আত্মহত্যার নামান্তর। বিচারের অর্থ যদি হয় আদর্শ বর্জ্জন, তবে সে বিচার শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, সে বিচার ক্ষতিকর। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "He who does not reason is a slave" অর্থাৎ যে বিচার করে না সে ক্রীতদাস। সত্য কথা, কিন্তু আত্মঘাতী বাতুলের চেয়ে ক্রীতদাস হওয়া ভাল, এই সহজ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে। আমি অধম এটি মনে রাখা ভাল, ত'তে অনধিকার চর্চ্চার দৌরাত্ম্য থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। নিজেকে অধম মনে ক'রলে বিশেষ কিছু অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। আমরা যে অধিকাংশই সামান্য জীব এটি স্বীকার করা-ই সুবুদ্ধি। বিচার করবার সামর্থ্য আর ক জনের আছে? বিচারে অসমর্থ ব্যক্তির বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার প্রহসন নিতান্তই করুণ। আমাদের আছে বিচারের অভিমান, যুক্তি তর্কের বিশ্লেষণের অভিমান। আমাদের মত লোকের সম্বন্ধেই ইংরেজীতে রয়েছে সেই মূল্যবান কথাটি—"He who reasons with a view to blaming without working is worse than a slave"—অর্থাৎ যে নিজে কাজ না ক'রে দোষ ধরার জন্য বিচার করে সে ক্রীতদাসের চেয়েও নিকৃষ্ট। ক্রীতদাস হওয়া তো ভাল; ক্রীতদাসের চেয়ে নিকৃষ্ট হওয়া ক্রীতদাস হওয়ার চেয়েও

খারাপ। আমাদের আজ অবস্থা এই শেষোক্ত গোষ্ঠীর মত। ক্রীতদাসের চেয়েও আমরা হীন। তার কারণ নিজের ওজন না বুঝে কাজ করা, সাধ্য কতটুকু স্মরণ না রেখে বিরাটের বাসনা পোষণ করা, সামর্থ্যের অতিরিক্ত দাবী করা। যে তর্ক ক'রতে পারে না কিন্তু তর্ক ক'রতে যায়, কুতর্ক ছাড়া সে কি ক'রবে?

প্রথম দরকার আনুগত্য, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা। তারপর আসে যোগ্যতা বা অধিকার। যোগ্যতা অর্জ্জিত হ'লে তবে তো বিচারের সামর্থ্য জন্মায়। মাতা পিতা শিক্ষক আচার্য্য সকলকে নির্বিচারে ভক্তি করা উচিত। তাঁদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। এই সনাতন নীতির বদলে আমরা আজ গ্রহণ ক'রেছি নূতন নিয়ম; মাতাপিতা শিক্ষককে অবমাননা, তাঁদের দোষ ধরা, এ সব তো আছেই; ভগবান্‌কেই উড়িয়ে দিচ্ছি আমরা! ভগবানের দোষ নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছি। ফলে কল্যাণ থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছি! তাঁদের স্নেহচ্ছায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে জ্বালা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির নটি বছর পর দোষ ধরা, কর্ম্মহারা মন্ত্র রক্ষা ক'রে আমরা কতটুকু লাভবান্ হয়েছি আজ তার হিসাব নিতে হবে। যন্ত্রীকে বাদ দিয়ে যন্ত্রের সাধনা, আচার্য্য-কে বর্জ্জন ক'রে গুরু স্বীকার না ক'রে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা, মন-কে অমার্জ্জিত রেখে দেহসৌষ্ঠব এবং রূপশ্রীর চর্চ্চা—এর পরিণাম লক্ষ্য ক'রতে হবে। সমস্ত ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এবং সংস্কার যে কত প্রয়োজন যদি সে কথা আজ না বুঝ্‌তে শিখি তবে জাতির ভাগ্য চির রাহুগ্রস্থ-ই থেকে যাবে। সবার আগে দরকার দেশের চালক এবং নায়কদের সংস্কার। তার পর সমাজের শক্র সারথিগণের কূটনৈতিক চাল বর্জ্জনের প্রস্তুতি এবং উদ্যম। বড় বড় পূজার মন্দির শিক্ষার মন্দির তৈরি ক'রলেই পূজারী গড়ে না, সেবক পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানের চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের প্রাণ সেবক ও সেব্য উভয়ের যোগ্যতা এবং আন্তরিকতা, উভয়ের আত্মোৎসর্গ। আত্মবিসর্জ্জন সে-ই দিতে পারে যে আত্ম-স্থ। আত্মস্থ হবার উপায় আধ্যাত্মিক সাধনা। অধ্যাত্ম শক্তির স্ফুরণ ছাড়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব নয়। অধ্যাত্ম শক্তির স্ফুরণ অনুশীলন-সাপেক্ষ। অতএব দরকার আধ্যাত্মিক অনুশীলন, তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু-র সন্ধান এবং তাঁর চরণে আত্ম নিবেদন, তাঁর আশ্রয়-লাভ। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শরণ পেয়েই নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দে পরিণত হয়েছিলেন। আমাদের প্রত্যেক-কে হ'তে হবে এক একটি বিবেকানন্দ। তার জন্য চাই শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়। দরকার শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধানে প্রমত্ত হ'য়ে ছোটা। যতদিন না শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ধান ও তাঁর চরণে আশ্রয় না পাওয়া যায়,

ততদিন অবিরত ছুট্‌তে হবে, পাগল হ'য়ে ছুট্‌তে হবে। তাঁকে পেলে তবে আমাদের কর্ত্তব্যের অবসান। তাঁকে পেলে আমাদের ছুটি। তাঁর কাজ তিনি ক'রবেন; তাঁর পায়ে নিজেকে সমর্পণ ক'রে, তাঁর কাছে বকলমা লিখে দিয়ে নিশ্চিন্ত অবসরে বাকী জীবন নির্ভাবনায় আমরা কাটাতে পার্‌বো!

স্বাধীন ভারতের যুবক সম্প্রদায়ের এই একটিমাত্র কর্ত্তব্য।

—০—

গান

[শ্রীসু-মো-দে]

শ্রীশ্রীঠাকুর এলে তুমি প্রভু
এ ধুলার ধরণীতে
করি' পবিত্র মধুফাগুনের
কৃষ্ণা পঞ্চমীকে
গাহি আজি তব বন্দনাগীতি
লহ হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতি,
এ দীন জীবন কর হে পূর্ণ
সে' অভয় সঙ্গীতে।
তব শুভাশিস কর প্রিয় দান
কর উজ্জ্বল কিঙ্কর-প্রাণ,
দাও হে শক্তি পূজিতে চরণ
ভক্তের ভক্তিতে।

—০—

হুগলী-বালীতে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাসজী মহারাজের জন্মোৎসব

গত ২৪শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী পুরাতন মোবার্লি টেক্নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট প্রাঙ্গণে হুগলী ও চুঁচুড়ার নাগরিকবৃন্দ পরমারাধ্য ঠাকুর শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী মহারাজের পুণ্য ষট্‌-ষষ্টিতম আবির্ভাব তিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করেন। এতদুপলক্ষে উদয়াস্ত অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম, নগর-সংকীর্ত্তন, পূজা, সংকীর্ত্তন, পালাকীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। নগর-সংকীর্ত্তন পরিচালনা করেন হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীমনোজকুমার চট্টোপাধ্যায়—সহরের বহু বিশিষ্ট ভক্ত তাঁহার সহিত সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ব্যারাকপুর জয়গুরু সম্প্রদায়ের কর্মী ঠাকুরগত-প্রাণ শ্রীভূপেশ সিংহরায় দুপুরে পূজা কর্মাদি নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করেন এবং অনুষ্ঠানের পূর্বদিন সদলবলে আসিয়া নগর-কীর্ত্তনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। পূজান্তে প্রায় দুই হাজার ভক্ত প্রসাদ পান।

প্রথম দিন বৈকালে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। হুগলীর শ্রদ্ধেয় ও সুপণ্ডিত জেলাশাসক শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, আই, এ, এস্‌, নির্বাচন কার্য্য উপলক্ষে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় সভার প্রথমার্দ্ধে উপস্থিত হইতে না পারায় বাংলার প্রবীণ দেশনেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় কিছুক্ষণের জন্য সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের টোল-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীঅনন্তকুমার ন্যায়-তর্কতীর্থ মহোদয় কলিকাতা হইতে অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী ও শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস ন্যায়াচার্য্য সমভিব্যাহারে সভাস্থলে উপস্থিত হন, এবং সভাপতির আসনে বৃত হন। কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ভাগবতভূষণ শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন। প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ করেন চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীসতীনাথ পঞ্চতীর্থ।

সভার উদ্বোধন করিতে যাইয়া অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের চরম আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। সভার উদ্বোধনান্তে ঠাকুরের অশেষ স্নেহভাজন সুধাকণ্ঠ শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের

প্রিয় গান "জয় জয় জয় গুরুদেব বিধি কৃষ্ণকেশব শঙ্কর" গানটি গাহেন। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় তাঁহার ভাষণ দান করিতে উঠিয়া বলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার পল্লীতে ছাত্রাবস্থায় টোলে পাঠ করিলেও দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাকে জানার সৌভাগ্য পূর্বে তাঁহার হয় নাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে বাংলার বহুস্থানে ঠাকুর আলোচনা শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথের সহিত হুগলীজেলার গোপালপুর গ্রামে একদিন তিনি গমন করেন এবং এই মহাপুরুষের দর্শন লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করেন। বক্তা বলেন যে তিনি নিজে মোটেই অধ্যাত্মমার্গী নন—তিনি একজন "রাজনৈতিক জীব", তাঁহার সমস্ত জীবন রাজনীতির স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে তবুও সনাতন হিন্দুধর্মে তিনি বিশ্বাসী এবং তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাই তিনি এই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের মূর্ত্ত প্রতীক মহাপুরুষ সীতারামকে তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং সুস্থ সমাজ পরিচালনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের প্রয়োজনীয়তা ও অবদান সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে সমাজ চিরকালই মহাপুরুষদের কাছে ঋণী এবং ব্যক্তি হিসাবেও অন্যান্য ঋণের সহিত ঋষি ঋণও আমাদের পরিশোধ করিতে হয়। পরিশেষে বক্তা বলেন যে শুধু পুলিশের দ্বারা সমাজে কোন পরিবর্ত্তন আনা যায় না বা চিরকাল সুষ্ঠুভাবে সরকারী কার্য চালান যায় না। সমাজের দুর্নীতি দূর করিবার প্রধান উপায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবর্তিত পন্থা —ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে ঠাকুর এক বিরাট পরিবর্ত্তন আনিতেছেন— ইহাই তিনি মনে করেন।

অতঃপর ঠাকুরচরণাশ্রিত শ্রীমহাদেব পাল কলিকাতা হইতে আসিয়া পরমগুরুদেব রচিত, "এ শরীরে হরি যাহা কিছু করি, সকলি তোমারি হে সকলি তোমারি" গানটি গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার গান শেষ হওয়ার পর ঠাকুরের লক্ষ্মী-মা তাঁহার দিব্যকণ্ঠে অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব-ন্যায়তীর্থ রচিত "ওঙ্কারনাথ মহিমাবদাতম্" স্তোত্রটি গান করিয়া সকলকে মুগ্ধবৎ করেন। লক্ষ্মীমার স্তবের পর ভাষণ দিতে উঠেন ঠাকুরের একনিষ্ঠ সেবক প্রেসিডেন্সি কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার সুললিত ভাষায় ধর্মজগতে ঠাকুরের অবদান সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন।

অধ্যাপক বাগ্‌চী মহাশয় তাঁহার ভাষণ শেষ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ স্নেহভাজন হুগলীর সর্বজন-সম্মানিত জেলাশাসক শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র-

মোহন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, আই, এ, এস্‌, হুগলীর সুযোগ্য পুলিশ সুপার মাননীয় শ্রীযুক্ত পান্নালাল ধর, এম্‌. এ, আই, পি, এস, ও সদর মহকুমা শাসক মাননীয় শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রচন্দ্র সেন, এম্‌, এ, বি, এল্‌, সমভিব্যাহারে সভাস্থলে উপস্থিত হন, এবং ভাষণ দানের জন্য অনুরুদ্ধ হন। তাঁহার সুচিন্তিত আবেগপূর্ণ ভাষণ অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয় এবং ভক্তবৃন্দের মনে গভীর রেখাপাত করে। শ্রীশ্রীঠাকুরের রচনাবলীর ভিতর জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং পুস্তকসমূহ হইতে বহু উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাত্মক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ ও আশ্রয় "তাপিত, তৃষিত প্রাণকে যে সুশীতল করে", এই সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। "ভগবান্‌ সীতারামের আবির্ভাব অধ্যাত্মজগতে এক নূতন যুগের সূচনা করিতেছে"—এই অভিমত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

ইহার পর ঠাকুরের উমা-মা ঠাকুর রচিত "অতিসুদুস্তরে সংসার পাথারে" গানটি তাঁহার মধুর কণ্ঠে গান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। গান গাওয়া শেষ হইলে পর পর ভাষণ দান করেন সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের কৃতী ছাত্র শ্রীনারায়ণ দাস ন্যায়াচার্য্য ও ঠাকুরের চরিতকার লব্ধপ্রতিষ্ট লেখক শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়। ন্যায়াচার্য্য মহাশয় তাঁহার ভাষণে শাস্ত্রীয় লক্ষণ-সমূহ বর্ণনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত শাস্ত্রসম্মত পথ সকলকে অনুসরণ করিতে অনুরোধ জানান। তাহার পর ঠাকুরের অশেষ কৃপাপ্রাপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে ঠাকুরের প্রকৃত স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দুর্গত জনগণের প্রতি তাঁহার অপার করুণার কথা বার বার উল্লেখ করেন। তাঁহার বাগ্মিতায় সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হন। ভাষণ শেষ হইলে অধ্যাপক শশাঙ্ক বাগ্‌চী মহাশয় ঠাকুরের রচিত "মহারসায়ণ" পুস্তক হইতে "মনের মরণ" প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অতঃপর ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় সংক্ষেপে "আনন্দময় পুরুষ, নামমহিমায় বিভোর এবং শাস্ত্রমর্য্যাদার রক্ষক" সীতারাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঠাকুরের ভক্তিযোগজা সমাধির বৈশিষ্ট্যের প্রতি সমবেত ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং স্বরচিত একটি অপূর্ব স্তোত্র পাঠ করিয়া যুগাবতারকে বন্দনা করেন। বন্দনান্তে সভাপতির ভাষণ প্রদান করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার

ন্যায়-তর্কতীর্থ। উপসংহারে তিনি বলেন যে তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী—ভক্তি বা জপে তাঁহার রুচি মোটেই নাই। অদ্বৈতবাদের গহন ও জটিল তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া যে জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছেন তাহা সার্থক পরিণতি লাভ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশ্রয় নেওয়ার পর। ঠাকুরের অশেষ কৃপায় তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে সাধনার ফল প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, সর্বজন সমক্ষে এই কথা তিনি দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দেন।

সভা উদ্বোধনের অব্যবহিত পূর্বে উৎসব কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীমনোজকুমার চট্টোপাধ্যায় নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত কয়েকটি বাণী পাঠ করেন। যাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া এবং অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করেন তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন (১) মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, ডি, লিট্, (২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য (ইনি "ওঙ্কারনাথ পঞ্চদশী" এবং "ওঙ্কারনাথ প্রণতি ষোড়শী" শীর্ষক দুইটি স্তব অশেষ যত্নের সহিত রচনা করিয়া যুগাবতারকে বন্দনা করেন) (৩) শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল, পশ্চিমবঙ্গ (৪) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, মন্ত্রী, খাদ্য ও ত্রাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ (৫) কবিশেখর কালিদাস রায় (৬) শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়, মন্ত্রী উপজাতি কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ (৭) কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (৮) শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, এম্, এল্, এ, (৯) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ ধর্মচক্র, বেলুড় (১০) ঔপন্যাসিক শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় (১১) শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, এম্, এল্, এ, উড়িষ্যা (১২) অধ্যক্ষ ডাঃ অক্ষয়কুমার ঘোষাল, পি, এইচ্, ডি, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ অফ্ কমার্স (১৩) ডাঃ সনৎকুমার বসু, এম্, এ, পি, এইচ্, ডি, অ্যাসিষ্টেন্ট ডিরেক্টর অফ্ পাবলিক্ ইন্‌স্ট্রাকসান প্রভৃতি সুধী ও ভক্তবৃন্দ।

সভায় দুই দিনই প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের সভার আকর্ষণ ছিল কীর্ত্তন। হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার দরুণ বেলুড় রামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ঐ দিন সভায় সভাপতিত্ব করিতে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ ঐদিন কীর্ত্তনের সভাটিকে অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত করে। শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর আশ্রিত শ্রীউদ্ধবজীর নাম কীর্ত্তন খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল। সুধাকণ্ঠ সুধারাণীর "শবরীর প্রতীক্ষা" নামক অপূর্ব পালাকীর্ত্তন অগণিত ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের মনে ভক্তিভাবের উদ্রেক করে। শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত ঐরূপ কীর্ত্তন সম্ভবপর হয় না।

এই মনোরম অনুষ্ঠানের নিখুঁত সাফল্য ও পরিচালনার জন্য শ্রীবীরেন্দ্র

নারায়ণ শূর, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ নন্দী মহোদয়গণের সাহায্য ও উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয়।

—০—

শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দ্দিষ্ট

॥ শ্রীরামানন্দ মহামন্ত্র পরীক্ষা পরিষদ্ ॥

দুইদিন পরীক্ষা হইবে

আদ্য পরীক্ষা

প্রথম দিন—শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর, শ্রীশ্রীরামনাম মাহাত্ম্য, মহামন্ত্র কল্পতরু, মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন, মহারসায়ন।

দ্বিতীয় দিন—গীতা, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য (শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুবাদ)।

পরীক্ষা বাংলায় হবে।

প্রথম পুরস্কার ১০০৲, ২য় ৫০৲, ৩য় ২৫৲।

যারা সংস্কৃত পরীক্ষা দিবে, তাহাদের প্রথম দিন—গুরু গীতা, বাল্মীকি রামায়ণ (আদি, অযোধ্যা), শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্দ পর্য্যন্ত শ্রীধর স্বামীর টীকা সহ।

প্রথম পুরস্কার ২০০৲, ২য় ১০০৲, ৩য় ৫০৲।

দ্বিতীয় দিন—সংস্কৃত থেকে বাংলা, বাংলা থেকে সংস্কৃত—মহারসায়ন, অধ্যাত্ম-রামায়ণ।

আদ্য পরীক্ষায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, দিবার কথা। তুলসী দাসী রামায়ণ—বাংলা, যারা হিন্দী পার্‌বে পড়্‌বে।

ফি—৷৹, ১৲।

॥ মধ্য পরীক্ষার পাঠ্য, বাংলা ॥

প্রথম দিন—শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর, শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত, শ্রীরামনাম মাহাত্ম্য মহামন্ত্র কল্পতরু, মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন, কথারামায়ণ ১ম খণ্ড, অধ্যাত্মরামায়ণ, বিষ্ণু সহস্রনাম, নারদ ভক্তি সূত্র, যোগ রহস্য।

দ্বিতীয় দিন—গীতা, চণ্ডী, (মূল ও সীতারামের ব্যাখ্যা), শ্রীকৃষ্ণনাম মহিমা, বিষ্ণু পুরাণ, শ্রীতুলসী মহিমামৃত, রচনা, উদ্ধব গীতা, শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী (১ম প্রকরণ)।

॥ উপাধি পরীক্ষা, বাংলা ॥

প্রথম দিন—শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর, শ্রীভগবন্নাম মহিমা, মহামন্ত্রকল্পতরু, মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন, বাল্মীকি রামায়ণ, সমগ্র কথারামায়ণ, শাণ্ডিল্য সূত্র।

দ্বিতীয় দিন—গীতা, চণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবত (সমগ্র), শ্রীশ্রীনামমহিমামৃত, শ্রীশ্রী-নামামৃত লহরী (২য় প্রকরণ), তত্ত্বরসায়ণ।

উত্তীর্ণ হইলে উপাধি "দাসানুদাস"

॥ সংস্কৃত, মধ্য পরীক্ষা ॥

প্রথম দিন—শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জভাস্কর, শ্রীরামনামমাহাত্ম্য, বাল্মীকি রামায়ণ (অরণ্য, কিষ্কিন্ধা ও সুন্দরকাণ্ড), শ্রীমদ্‌ভাগবত (৫ম হইতে নবম পর্য্যন্ত— শ্রীধর স্বামীর টীকার সহিত)। বিষ্ণু সহস্রনাম (শঙ্কর ভাষ্য), নারদ ভক্তিসূত্র, যোগরহস্য।

দ্বিতীয় দিন—গীতা (শ্রীধর স্বামীর টীকা সহ), অধ্যাত্মরামায়ণ সটীক, চণ্ডী (গোপাল চক্রবর্ত্তী টীকা), শ্রীশ্রীগুরুমহিমামৃত, শ্রীকৃষ্ণনাম মহিমা, গীতা পঞ্চরত্ন, নামামৃতলহরী (১ম প্রকরণ), রচনা।

॥ উপাধি পরীক্ষা ॥

প্রথম দিন—শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর, মহামন্ত্র কল্পতরু, বাল্মীকি রামায়ণ (যুদ্ধ ও উত্তরকাণ্ড), শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম-১১শ-১২শ (শ্রীধর স্বামীর টীকা সহ), শ্রীরামনাম মাহাত্ম্য, তুলসী মহিমামৃত, শাণ্ডিল্য সূত্র, তত্ত্বরসায়ন।

দ্বিতীয় দিন—গীতা (রামানুজ ভাষ্য), শ্রীচণ্ডী (দেবীভাষ্য), বিষ্ণুপুরাণ (শ্রীধর স্বামীর টীকা সহ), শ্রীভগবন্নাম মহিমা, শ্রীনামামৃত লহরী (২য় প্রকরণ)। সমগ্র কথা-রামায়ণ, রচনা।

ফি প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ।

আদ্য, মধ্য, উপাধি—তিনটি পরীক্ষাতেই মৌখিক পরীক্ষা থাকবে। আদ্য উত্তীর্ণ হলে মধ্য, মধ্য উত্তীর্ণ হলে উপাধি। একবৎসর একাধিক পরীক্ষা দিতে পারবে না।

প্রতি পরীক্ষায় ৮টি করে পুরস্কার থাকবে। আদ্যে মধ্য পরীক্ষার গ্রন্থ, অর্থ, ৫টী পুস্তক। মধ্য পাশ হলে উপাধি পরীক্ষার গ্রন্থ। উপাধির শাস্ত্র গ্রন্থ উপহার দেওয়া হবে।

॥ পরীক্ষা পরিষদের কার্য্যকরী সমিতি ॥

সর্ব্বাধীশ—শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
সহঃ সর্ব্বাধীশ—শ্রীমনোজকুমার চট্টোপাধ্যায়
কোষাধীশ—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সম্পাদক—শ্রীসনানন্দ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রমোদরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজটিল চন্দ্র সরকার, শ্রীযোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীভুজঙ্গ ভূষণ মিত্র, শ্রীরাইহরণ চক্রবর্ত্তী শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীবঙ্কুবিহারী পণ্ডিত, শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাঁচুগোপাল হাজরা, শ্রীকিঙ্কর কৃষ্ণানন্দ (কাশী রামাশ্রম), শ্রীমহাদেব অধিকারী।

সন্দর্শক—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশশাঙ্ক শেখর বাগচী, শ্রীঅনন্ত তর্কতীর্থ, শ্রীতারাপদ কাব্যতীর্থ, শ্রীঅভয়াপদ কাব্যতীর্থ, শ্রীসুশীলকুমার কাব্য-স্মৃতিতীর্থ, শ্রীখগেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ এবং শ্রীরঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধাকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এ্যাডভোকেটবৃন্দ।

[যাঁহারা এই পরীক্ষার সুযোগ নিতে চান, তাঁহারা সহঃ সর্ব্বাধীশ অধ্যাপক শ্রীমনোজ কুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. শ্যাম নিবাস, শরৎ সরণি, পোঃ—হুগলী, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।]

—০—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

॥ শ্রীসত্যধর্ম প্রচার সঙ্ঘ ॥

["সত্যধর্ম প্রচার-সঙ্ঘে সকলে যোগদান করে নাম প্রচার করতে হবে।

জয়গুরু সম্প্রদায়ের কেউ কোনরূপ আশ্রম বা দল করতে ইচ্ছা করলে—সত্যধর্ম প্রচারসঙ্ঘের সমর্থন নিতে হবে। বিনা সমর্থনে খেয়াল মত দল করা হবে না।"—শ্রীশ্রীঠাকুর।]

সপ্রেম জয়গুরু!

আমরা গুরুভ্রাতাগণ মিলিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়ের শ্রীনাম প্রচারের কেন্দ্র ও আশ্রমগুলির সেবা এবং সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোক-হিতকর কার্য্যসমূহ ও পরমগুরুদেবের অভিলষিত 'সত্যধর্ম প্রচার' উদ্দেশে শ্রীসত্যধর্ম প্রচারসংঘ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

ইতিপূর্বে 'কমিটি' নামে আমরা কার্য্য করিতেছিলাম। কমিটির কার্য্যারম্ভের পূর্বে শ্রীগুরুদেবকে জানান হয়, তিনি ওঙ্কারেশ্বরে মৌন ছিলেন, তিনি লেখেন—'তোরা যা করবি তাতে সীতারামের অমত নাই।'

এই মহান্ কার্য্যে আমরা শ্রীপরমগুরুদেব এবং শ্রীগুরুদেবের আশীর্বাদ নিশ্চয়ই লাভ করিব, ইহার অনুষ্ঠানে আমাদের জীবন ধন্য হইবে—আমরা কৃতার্থ হইব।

সকল কার্য্যেই আর্থিক প্রয়োজনীয়তা অনুপেক্ষণীয় বলিয়া এবং সকলের অর্থ-সামর্থ্য সমান নয় বিবেচনা করিয়া—জয়গুরু সম্প্রদায়ের সেবক-দিগের মাসিক ন্যূনতম চারি আনা উপায়ন ধার্য্য করত—শ্রীগুরুদেবের সেবার অধিকার দান করা হইল। বলা বাহুল্য—আট আনা চারি আনা অতি অসমর্থের পক্ষে।

আমরা শ্রীগুরুদেবের ইঙ্গিত পাইয়াছি—তিনি সম্প্রদায়ের সকলকে এই সঙ্ঘে যোগদান করিতে বলিয়াছেন। সেইজন্য আমরা বিদ্বান্ মূর্খ; ধনী দরিদ্র; বর্ণশ্রেষ্ঠ নিম্নবর্ণ বর্ণবাহ্য—সমস্ত গুরুভ্রাতাগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছি—ভ্রাতৃগণ সকলে আসুন! যিনি যেরূপ উপযুক্ত তদ্রূপ কার্য্যভার গ্রহণ করুন, শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ-সেবার সৌভাগ্য আমাদের নাই; তাঁহার সম্প্রদায়রূপ শরীরের সেবা করিয়া আমাদের মানবজন্ম ধন্য করি।

নিবেদক
শ্রীসত্যধর্ম প্রচারসঙ্ঘের পক্ষে
শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ
দেবযান কার্য্যালয়
পোঃ মগরা, হুগলী

—০—

সংবাদ

৭ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের ষট্-ষষ্টিতম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে ভারতের বহু স্থানে নামযজ্ঞ, তরুপূজা, ধর্ম্মসভা, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থান সমূহের উৎসব বিবরণ দেবযান কার্য্যালয়ে আসিয়াছে। সকল স্থানের বিবরণ স্থানাভাবের জন্য প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। এই অক্ষমতার জন্য আমরা সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

উৎসব-স্থান

(১) শ্রীসাধন সমিতি—দিগসুই, হুগলি। (২) রামানন্দ মঠ—চিতারমার পাড়া, হুগলি। (৩) শ্রীনীলাচল-আশ্রম—পুরী, উড়িষ্যা। (৪) শ্রীকাশীরামাশ্রম—বারাণসী। (৫) মাল্যবতী-আশ্রম—বৃন্দাবনধাম। (৬) হেমাঙ্গিনী-মঠ—মেমারী, বর্দ্ধমান। (৭) শ্রীদাশরথি মঠ—কলাপুকুর, বর্দ্ধমান। (৮) শ্রীপঞ্চানন-আশ্রম—সোৎখানি, বর্দ্ধমান। (৯) শ্রীরামাশ্রম—ডুমুরদহ, হুগলি। (১০) শ্রীরামাশ্রম-শাখা—পলতাগড়, হুগলি। (১১) মহামায়া-আশ্রম—চাঁচাই, বর্দ্ধমান। (১২) অনন্তকালোদ্দিষ্ট অবিরত রাধাগোবিন্দ মহামন্ত্র সংকীর্তন মহামণ্ডল—নবগ্রাম, বর্দ্ধমান। (১৩) গিরিবালা-আশ্রম—বাতনা, হুগলি। (১৪) শ্রীতুলসীদাস-আশ্রম—৩।৩ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০। (১৫) শ্রীরামদয়াল-আশ্রম—দশেড়ে, বাঁকুড়া। (১৬) শ্রীযোগেন্দ্র আশ্রম—তালপুকুর, বারাকপুর। (১৭) মহানন্দ-ভবন—পাড়াতল, বর্দ্ধমান। (১৮) রামকমল স্মৃতি-হরিসভা—গলসী, বর্দ্ধমান। (১৯) ব্যানার্জি পাড়া—বারাকপুর। (২০) শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-মন্দির—কুণ্ডুঘাট লেন, চন্দননগর। (২১) ২:৮।১, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড—সালকিয়া, হাওড়া। (২২) বরদাভবন—ছোট-বাজিডাঙ্গা, বর্দ্ধমান। (২৩) রাণীসাগর-রাসমঞ্চ—বর্দ্ধমান। (২৪) ডি ২২।৬ চৌষট্টিঘাট—বারাণসী। (২৫) বিজুর—বর্দ্ধমান। (২৬) শ্রীওঙ্কারনাথ আশ্রম—কাঁচড়াপাড়া। (২৭) পোড়ামার তলা—শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ। (২৮) দ্বাদশ-শিবালয়-মন্দির-প্রাঙ্গণ—কোতুলপুর, বাঁকুড়া। (২৯) কারকবেড়া—বাঁকুড়া। (৩০) রাম রাজার মন্দির-প্রাঙ্গণ—বেনালী, বর্দ্ধমান। (৩১) বিবিগঞ্জ—মেদিনীপুর। (৩২) নগরকোণা—বর্দ্ধমান। (৩৩) রাধাকান্তপুর—বর্দ্ধমান। (৩৪) কনকশালী—চুঁচুড়া, হুগলি। (৩৫) ৫।১, শ্রীমানীপাড়া লেন, বরানগর, কলিকাতা-৩৬। (৩৬) তোলা ফটক—চুঁচুড়া, হুগলি। (৩৭) শ্রীগুরুমন্দির—বল্লভপুর, মেদিনীপুর।

(৩৮) মাণিকপুর—মেদিনীপুর। (৩৯) উকিলপটী—বোলপুর, বীরভূম। (৪০) সিমলাগড়—হুগলি। (৪১) শ্যামনগর—২৪ পরগণা। (৪২) পায়রাগাছা—হুগলি। (৪৩) শ্যামসুন্দরের বাটী——অকাল পৌষ, বর্দ্ধমান। (৪৪) গীতামঠ—যুগবেড়িয়া; মেদিনীপুর। (৪৫) বেলমুড়ি—হুগলি। (৪৬) বরাটিয়া—ময়মনসিং, পূর্বপাকিস্থান। (৪৭) বীরনগর—নদীয়া। (৪৮) বাণেশ্বরপুর—বর্ধমান। (৪৯) শান্তিভবন—বসন্তপুর, বর্ধমান। (৫০) গোপালমঠ—গোপালপুর, হুগলি। (৫১) বৈকুণ্ঠপুর—ত্রিবেণী, হুগলি। (৫২) অবিরত মহামন্ত্র সংকীর্তন-মহামণ্ডল—RAZOL, E. GODABARI, ANDHRA. (৫৩) লক্ষ্মী নিবাস—ত্রিবেণী, হুগলি। (৫৪) ঘটকপাড়া—রাণাঘাট, নদীয়া। (৫৫) ৺গোপালজীউ মন্দির—পাল্লা রোড, বর্ধমান। (৫৬) মামুদপুর—বর্ধমান (৫৭) সিদ্ধেশ্বরী তলা—রাণাঘাট, নদীয়া। (৫৮) ওঙ্কারমঠ—মধ্যপ্রদেশ। (৫৯) মল্লিকবেড়—হুগলী।

* * * *

৭ই ফাল্গুন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান কেওটা-(হুগলি) গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ও নামযজ্ঞাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীঠাকুরের কতিপয় সন্তান দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের দীক্ষাস্থান ত্রিবেণীর এক ভগ্ন গৃহাবশেষে প্রণাম করিয়া আসেন। বহু শিষ্য ভক্তের আগমনে উৎসবটি প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। নগর কীর্তনে অনেকেই যোগদান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যস্মৃতিবিজড়িত 'ঠাকুরবাটী' 'স্নানের ঘাট' প্রভৃতি স্থানে এবং অন্যত্র কীর্তনদল নাম প্রচার করেন। উৎসবটির প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত ও পৌরোহিত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন—শ্রীসনৎকুমার শিরোমণি মহাশয়।

* * * *

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তুলসীদাস আশ্রম'-এ (৩।৩ বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা-১০) প্রতিদিন মধ্যাহ্নে পূজা ও সন্ধ্যায় মহামন্ত্র-নাম কীর্তন করা হইতেছে।

আশ্রমের দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে নামযজ্ঞাদির ব্যবস্থা করা হয়।

ঠাকুরের সন্তান ৺সীতানাথ বল মহাশয়ের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় ৬ই মাঘ স্থানীয় জয়গুরু সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এই আশ্রমে উদয়াস্ত নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরিত হয়। সায়াহ্নে ঠাকুরের মাল্যভূষিত প্রতিকৃতিসহ নামকীর্তন দল বেলেঘাটা পল্লী পরিক্রমণ করেন।

আশ্রমসেবকগণ নামপ্রচার-কার্যে সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে—এই আশ্রমের সহিত সম্প্রদায়ের সকলের যোগাযোগ কামনা করেন।

*   *   *   *

শ্রীশ্রীরাধা মদনমোহন মন্দিরে (কুণ্ডুঘাট লেন, চন্দননগর) রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে নামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

পলতাগড়—শ্রীরামশ্রম শাখার সেবকগণ এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

মন্দিরে প্রতি সন্ধ্যায় ভাগবত-পাঠ ও কীর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মন্দিরসেবকগণ প্রতি রবিবারে চন্দননগরের বিভিন্ন পল্লীতে নাম প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন।

*   *   *   *

'গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা'য় শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের সপ্ত-ষষ্টিতম আবির্ভাব তারিখ—২৫শে মাঘ, শনিবার, ১৩৬৪ (ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮) গৃহীত হইয়াছে।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

দেবযানের গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ একটি দেবযানের গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

বিনীত

কর্ম্মাধ্যক্ষ

দেবযান—মগরা

(হুগলি)

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ, নবম সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৬৬

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

॥ চতুর্থ প্রকরণ, চতুর্দ্দশ উচ্ছ্বাস ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

॥ শ্রীরাম শরণং মম ॥

ওঁ প্রাতঃ স্মরামি দিননায়ক বংশভূষং
বেদান্ত বেদ্যমভয়ং কৃত রাজবেশম্।
বৈদেহীলক্ষ্মণযুতং ভুবনাভিরামং
সংসারসর্প গরলোপশমায় রামম্ ॥

ওঁ প্রাতঃ স্মরামি চরিতং দুরিতং নিহন্তং
রামস্য তস্য পনভক্ষ কৃতান্তকস্য।
যঃ সিন্ধু বন্ধ কথয়া ভববন্ধ হন্তা
রাজ্যং তনোতি চ বিভীষণঃ রাজ্যদাতা ॥

ওঁ প্রাতঃ করোমি কলিকল্মষনাশ কর্ম্ম
তচ্ছর্ম্মদং ভবতু ভক্তিকরং পরং মে।
অন্তঃস্থিতেন সুখভান চিদাত্মকেন
রামেন রাজগুরু দেহবতা নিযুক্তঃ ॥

শ্লোকত্রয়ং যঃ পঠতি প্রভাতে
শ্রীরামচন্দ্রার্পিত চিত্তবুদ্ধিঃ।
আয়ুঃশ্রিয়ং কীর্ত্তি মনন্ত সৌখ্যং
লব্ধাচিরং রামপদং স এতি ॥

প্রায় সমস্ত স্তবাদিতে ফলশ্রুতি, ইহলোকে আয়ু সম্পৎ কীর্ত্তি ইত্যাদি ও অন্তে ভগবৎ পদলাভ, দেখা যায়।

"প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।" প্রয়োজন ভিন্ন অতি অল্প-বুদ্ধি অজ্ঞানও কোন কাজে প্রবর্ত্তিত হয় না। সুখ, রোগমুক্তি, আয়ু সম্পৎ কীর্ত্তি এটী সকলেরই কাম্য। স্তব পাঠের দ্বারা সুখাদি পাওয়া যায় শাস্ত্র বলছেন, তবে স্তব করি, এই ভাবে ইহলৌকিক ভোগের জন্যই অনেকে স্তবাদি আরম্ভ করেন। তারপর একাগ্রতার সহিত জপাদি কর্‌তে কর্‌তে প্রকৃত রস প্রাপ্ত হন। একটি সত্য ঘটনা বলি শোন—একজন ব্রাহ্মণ যুবক কঠিন রোগগ্রস্ত হয়ে শ্রীভগবানকে ডাক্‌তে আরম্ভ করেন, বহু রোগ এসে আশ্রয় করায় জীবনে হতাশ হয়ে তিনি অনন্য ভাবে প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে ও মধ্যরাত্রে জপাদি করতে থাকেন, তারপর ঠাকুরের কৃপায় তাঁর রোগ সকল কোথা দিয়ে সেরে গেলো তা তিনি বুঝতে পার্‌লেন না, এক আনন্দের রাজ্যে গিয়ে পড়লেন—তখনকার তাঁর প্রার্থনা—"আমায় অভাব অশান্তি দুঃখ দাও, যে রোগ চিকিৎসকে আরোগ্য কর্‌তে পার্‌বে না এমন কঠিন কঠিন রোগ দাও, তা'হলে আমি তোমায় সর্ব্বদা স্মরণ কর্‌তে পার্‌বো।" যে কোন প্রকারে হোক তাঁর দিকে মন দিতে পার্‌লেই লাভ।

নাম মহিমা বল।

রামনাম সমং তত্ত্বং নাস্তি বেদান্ত গোচরে।
যৎ প্রসাদাৎ পরাং সিদ্ধিং সংপ্রাপ্তা মুনয়োঽমলাঃ ॥
অতঃ সর্ব্বাত্মনারামং নামরূপং স্মর প্রিয়ে।
অনায়াসেন ভো দেবি অমরী ত্বং ভবিষ্যসি ॥
রামনাম প্রভাবেন হ্যবিনাশী পদং প্রিয়ে।
প্রাপ্তং ময়া বিশেষেণ সর্ব্বেষাং দুর্লভং পরম্ ॥ —কেদার খণ্ডে

—বেদান্তাদি শাস্ত্রে রামনামের সমান তত্ত্ব নাই। যার প্রসাদে নির্ম্মল মুনিগণ পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। হে মহাদেবি, তুমি অনায়াসে অমরী হবে। আমি রাম নাম প্রভাবে সকলের দুর্লভ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হয়েছি।

শিব সীমন্তিনী মা আমার কি অমরী নন?

অমরী হ'লে দক্ষযজ্ঞে কি করে দেহত্যাগ কর্‌লেন?

একথা সতীকে বলেছিলেন?

হাঁ।

রাজমার্গমিমং বিদ্ধি রামোক্তং জানকীকৃতম্।
যদৃতে চান্য মার্গস্তু চৌরাণাং বীথিকা যথা॥
শ্রীজানকী সম্প্রদায়ং রামরাজ্য সমন্বিতম্।
ঋতে কেঽপি ন যাস্যন্তি বাঞ্ছিতং ফলমেবচ॥

—শিব সংহিতা।

রামকথিত, জানকীকৃত রাম নাম জপরূপ যে পথ তাহা রাজ পথ, ইহা ভিন্ন অন্য মার্গ চৌরগণের পথ সদৃশ। ভক্তেরা বলেন—রাম নামের দুইজন আচার্য্য—শ্রীভগবান শঙ্কর ও শ্রীজানকী। শ্রীশঙ্কর শ্রীরামের সমীপে পৌঁছিবার উপর আচার্য্য। আর শ্রীজানকী রহস্য মণ্ডলপ্রাপ্তিকারিণী ভিতরের আচার্য্য। তজ্জন্য শ্রীজানকী সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যপথে শ্রীরামের রহস্য মণ্ডলে গমন কর্‌তে ইচ্ছা ক'রেতো যেতে পারে না এবং বাঞ্ছিত ফললাভে সমর্থ হয় না।

সম্প্রদায় শব্দের অর্থ কি?

সংসার সার ভূতত্বাৎ প্রকাশানন্দদানতঃ।
যশঃ সৌভাগ্য করণাৎ সম্প্রাদায় ইতীরিতঃ॥

—কুলার্ণবে।

প্রকাশ ও আনন্দ দান যশঃ সৌভাগ্যকরণ নিমিত্ত সংসারের সারভূতত্ব হেতু "সম্প্রদায়" বলে কথিত হয়।

গুরু পরম্পরাগত উপদেশের নাম সম্প্রদায়।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥
রামানুজং শ্রীস্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃ সনঃ॥

—পদ্মপুরাণে।

কলিতে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই ক্ষিতিপাবন চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়

হবে, 'শ্রী' তিনি রামানুজকে স্বীকার করেন তাই রামানুজ সম্প্রদায়ের নাম শ্রী সম্প্রদায়। ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে ও সনকাদি মুনি চতুষ্টয় নিম্বাদিত্যকে গ্রহণ করেন।

তা হলে জানকী সম্প্রদায় বলতে 'শ্রী' সম্প্রদায় ?

হাঁ।

দংষ্ট্রি দংষ্ট্রো হতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

—নৃসিংহ পুরাণে।

বরাহের দন্তাঘাতে আহত হ'য়ে জনৈক ম্লেচ্ছ পুনঃ পুনঃ হা রাম হা রাম বলে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণের কথা আর কি বলা যাবে!

ম্লেচ্ছ কাকে বলে ?

অখাদ্য খাদক ; বহুভাষী ; ধর্ম্মাচারবিহীনকে ম্লেচ্ছ বলে।

দৈবাচ্ছুকর শাবকেন নিহতো ম্লেচ্ছো জরাজর্জ্জরঃ
হা রামেণ হতোহস্মি ভূমিপতিতো জল্পং স্তনুং ত্যক্তবান্।
তীর্ণো গোষ্পদবাত্তবার্ণবমহোনাম্নঃ প্রভাবাদ্ধরেঃ
কিং চিত্রং যদি রাম নাম রসিকাস্তে যান্তি রামাস্পদম্॥

—বরাহ পুরাণে।

দৈবাৎ এক জরাজর্জ্জরিত ম্লেচ্ছ শূকর শাবক কর্ত্তৃক নিহিত হয়ে হারামের দ্বারা হত হলাম বলে ভূমিতে পড়ে দেহ ত্যাগ করে। মরণ কালে হারাম উচ্চারণ করায় শ্রীহরির নামের প্রভাবে সে ভব পারাবার গোষ্পদের ন্যায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। অহো! রামনামরসিকগণ যে রাম পদ লাভ করবেন এর আর আশ্চর্য্য কি ?

কি ঘটনা ?

কোন সময়ে জনৈক যবন ভিন্ন গ্রাম থেকে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী আসছিল, পথে এক বুনো শূয়োরের দ্বারা আহত হয়ে নিহত হবার সময় হারাম হারাম বলে চীৎকার করে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। মরণ কালে হা রাম হা রাম ব্যাকুলতাপূর্ণ রাম নাম শুনে বিষ্ণু পার্ষদগণ বৈকুণ্ঠ বিমান নিয়ে এসে তার সূক্ষ্ম দেহ তাতে আরোহণ করিয়ে বৈকুণ্ঠে লয়ে যাবার সময় সেই মুক্তাত্মা বলেন—আপনারা কে ? আপনাদের শরীর জ্যোতির্ম্ময়, আর রথখানিও অলৌকিক জ্যোতির্ম্ময় দেখছি, এ রকম রথ ও আপনাদের মত এমন চারহাত ওয়ালা মানুষও আমি কখন দেখিনি, কে আপনারা—আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন কৃপা করে

বলুন। তন্মধ্যে একজন বল্‌লেন, আমরা শ্রীভগবান নারায়ণের দূত,—তুমি মুক্তি লাভ করেছো, তোমাকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাচ্ছি। তখন সেই মুক্তাত্মা বল্‌লেন, আমি মহাপাপী যবন, চিরদিন মহাপাপই করেছি, কোনওদিন ভুলেও পুণ্য কর্ম্ম কিছু করিনি, কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন? বিষ্ণুদূত বল্লেন, তুমি মৃত্যুকালে শূকরের দন্তাঘাতে হারাম হারাম বলে চীৎকার করেছিলে, তজ্জন্য আমরা তোমায় নিতে এসেছি।

মুক্তাত্মা বল্‌লেন, আমি তো রামকে ডাকিনি, আমরা শূকরকে 'হারাম' বলি। সেই শূকরে আমায় মেরে ফেলছে, কোন পথিকের সাহায্য পাব ব'লে ব্যাকুল ও ভীত ভাবে হারাম হারাম কর্‌ছিলাম। শূকরের নাম মরণকালে বল্‌লে কি বৈকুণ্ঠে যায় মুক্তি হয়?

বিষ্ণুদূত বল্‌লেন—শূকরের নামে মুক্তি হয় না। তুমি যে শূকরের দ্বারা পীড়িত হ'য়ে প্রাণের ভয়ে ব্যাকুলভাবে হারাম হারাম বলেছিলে তাতে হা শব্দে ব্যাকুলতা ও প্রেমের সঙ্কেত, রাম শব্দে মুক্তিপ্রদ ভগবানের নামের সঙ্কেত করা হ'য়েছিল। এইজন্য তুমি মুক্তিলাভ করেছো।

বিমান বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হ'ল। দিব্য সুরীগণ তাঁকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করে শ্রীভগবানের কাছে নিয়ে গেলেন। ভগবদ্দর্শনে তিনি চিরশান্তি লাভ কর্‌লেন।

"মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম হা রাম।
যবনের ভাগ্য দেখে লয় সেই নাম॥
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেত হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচি 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত॥

একে রাম নাম স্বভাবতঃ মুক্তিপ্রদ, তার উপরে প্রেমবাচি হা শব্দ—ম্লেচ্ছ উদ্ধার হ'য়ে গেল।

এর নাম তো নামাভাস?

"নামাভাস হইতে হয় সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নামাভাস সুনিশ্চয় সংশয় নাশয়॥
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী॥"

বল বল কেবল বল—

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম॥

—•—

সন্তবাণী

১০৩৮। সাধুগণের সঙ্গের দ্বারা শ্রীভগবানের পরাক্রমের যথার্থ জ্ঞান প্রদানকারী; হৃদয় এবং কর্ণের সুখপ্রদ কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়। ঐ কথা সকলের দ্বারা মোক্ষরূপ ভগবানে শ্রদ্ধা হয়, শ্রদ্ধা হতে রতি এবং রতি দ্বারা ভগবানে ভক্তি হয়।

১০৩৯। বুদ্ধিমান বীর পুরুষগণের কর্ত্তব্য—আর সব কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আত্মবিচারে তৎপর থেকে সংসার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য যত্ন করা।

১০৪০। তিনি একই, যিনি নূতন নূতন বায়না (ওজর) ক'রে তোমার মন নিতে চাচ্ছেন। গোপীগণের এ অপেক্ষা অধিক আর কি ভাগ্য হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ তার মাখন চুরি কর্‌বেন। ধন্য তিনি, যার সব কিছু চুরি করে নেন, মন আর চিত্ত পর্য্যন্ত যেন বাকী না থাকে।

১০৪১। অহঙ্কার করা ব্যর্থ, জীবন যৌবন কিছুই এখানে থাক্‌বে না। সব তিন দিনের স্বপ্ন।

১০৪২। হে প্রভু তোমার সুমুখে হাতজোড় করে হৃদয়ের দ্বারা প্রার্থনা কর্‌ছি যে আমি চাই আর না চাই, আমাকে এমন কোন দ্রব্য কখন দেবেন না, যা আমার ভাল লাগলেও আমার মন্দকারী হয় এবং আমার বুদ্ধিকে কুপথে নিয়ে যায়।

১০৪৩। বৈরাগ্যের প্রকার তিন রকম। (১) অপবিত্র বস্তুকে ত্যাগ করা সাধারণ বৈরাগ্য, (২) আবশ্যকতা থেকে অধিক প্রাপ্ত হওয়া পবিত্র বস্তু সকলকে ত্যাগ করা বিশেষ বৈরাগ্য। (৩) আর ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এমন বস্তু মাত্রেরই ত্যাগ করা সন্তের বৈরাগ্য।

১০৪৪। যেমন স্পর্শমণির স্পর্শ হলেই লোহা সোনা হয়ে যায়, সমুদ্রে পতিত বৃষ্টি বিন্দু সমুদ্রে মিলে যায়, আর গঙ্গায় কোন নদী মিলিত হলেই সে গঙ্গা হয়ে যায়, ঐ প্রকার সবাধানী উদ্যোগী এবং দক্ষপুরুষ সন্তগণের সঙ্গ করলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

১০৪৫। জিজ্ঞাসু পুরুষের কর্ত্তব্য এই—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনে লয় ক'রে, মনকে বুদ্ধিতে লয় ক'রে, ব্যষ্টি বুদ্ধিকে মহান্ অর্থাৎ সমষ্টি বুদ্ধিতে লয় ক'রে এবং সমষ্টি বুদ্ধিকে শান্ত আত্মায় লয় করা।

১০৪৬। যে মানুষ অপরের জীবিকা নাশ করে, অপরের ঘর বিধ্বস্ত করে, অপরের স্ত্রীকে তার পতি হতে বিচ্ছিন্ন করে, মিত্রগণের মধ্যে ভেদ উৎপন্ন করে সে অবশ্যই নরকে যায়।

১০৪৭। পুত্র স্ত্রী মিত্র ভাই এবং সম্বন্ধী সমূহের সহমিলনকে পথিকগণের মিলনের সমান বোঝা উচিত।

১০৪৮। যেমন নিদ্রাভঙ্গ সঙ্গেই স্বপ্নেরও নাশ হয়ে যায়, তদ্রূপই এই দেহের নাশ হওয়ার সঙ্গেই সব সম্বন্ধ ত্যাগ (দূর) হয়ে যায়।

১০৪৯। সেই সত্যের উপাসক মহাত্মা মুনি ধন্য যাঁর কিছুতে অনুরাগ আর কিছুতে দ্বেষ নাই, যিনি সমস্ত প্রাণীগণে সমান ভাব রেখে সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন।

১০৫০। যাঁর মন বিষয়সমূহে নাই, যাঁর মন নির্ম্মল, যাঁর ইন্দ্রিয় বিকার প্রাপ্ত হয় না তাঁর নাম বৈষ্ণব।

১০৫১। আপনার পত্নী ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্বন্ধ রাখবে না। কোনও স্ত্রীকে আপনার কাছে সহসা থাক্‌তে দিবে না। আপনার স্ত্রীর সহিত যথাশাস্ত্র সম্বন্ধ রাখবে আর চিত্তকে কখন আসক্ত হতে দিবে না।

১০৫২। ধান যতক্ষণ না সিদ্ধ হয় সে পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হয়ে থাকে, পরন্তু একবারও সিদ্ধ হয়ে গেলে অঙ্কুরিত হয় না। এইরূপই জীব একবার জ্ঞানাগ্নিতে পাক হয়ে গেলে তাকে জন্ম নিতে হয় না। যতক্ষণ অজ্ঞান আছে সে পর্য্যন্ত আসা যাওয়া।

১০৫৩। বিবেকের দ্বারা মনের সমস্ত উপাধি দূর হলে এবং বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়ে গেলে গৃহস্থের সমস্ত ঝঞ্চাট চলে যায়। তখন মানুষ ভিতর এবং বা'র দুই দিক থেকে মুক্ত হইয়া যোগী হয়ে যান।

১০৫৪। যে ক্ষণ ভগবানের নামের স্মরণ না হয় তা সকলের অপেক্ষা বড় দুঃখক্ষণ। আর ভগবন্নামের স্মরণ হতে থাক্‌লে, শরীরের যতই ক্লেশ হোক তাতে পরম সুখই বুঝা কর্ত্তব্য।

১০৫৫। তোমার সব সাংসারিক বন্ধন এবং সম্বন্ধ তোমাকে চিন্তা আর দুর্ভাগ্যের বশে ফেলে দিচ্ছে। তা থেকে উপরে ওঠো। ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার একতার অনুভব কর। তাতে তোমার নিস্তার হবে। তুমি স্বয়ং মোক্ষরূপ।

১০৫৬। যে মানুষের ঈশ্বর স্মরণ করবার শক্তি আছে তাঁকে গরীব অথবা দীন না মনে করে মহান ধনবান বুঝবে। আর যার কাছে এই উচ্চ হতে উচ্চ এবং বড় হতে বড় সম্পত্তি নাই, সে যদি বড় প্রতাপী বাদশাহ্‌ও হয় পরন্তু আসলে সেই গরীব এবং অনাথ।

১০৫৭। পিতা মাতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা। পিতা, মাতায় পরমাত্ম সত্তার বিকাশ দর্শন ক'রে প্রগাঢ় ভক্তিভাবে তাঁদের সেবা করতে থাক্‌লেই মানুষের সিদ্ধিলাভ হয়।

১০৫৮। যার অপরের নিন্দাকরায় রস আসে সে মিত্র তৈরী করবার মিষ্ট কৌশল জানে না। সে শত্রুতার বীজ বপন ক'রে আপনার পুরাতন মিত্রগণকে দূরে সরিয়ে দেয়।

১০৫৯। পরমাত্মা নিশ্চয়ই আমাকে সুখ দিচ্ছেন, যদি আমার পশ্চাতে পাপ না লাগে তা'হলে আমার সামনে সর্ব্বদা কল্যাণই হচ্ছে।

১০৬০। মহর্ষিসকল প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠার সদৃশ-অত্যন্ত হেয় বলেছেন অতএব সদা কীটের মত প্রতিষ্ঠাহীন হয়ে বিচরণ করা কর্ত্তব্য।

১০৬১। যদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি ইন্দ্রিয়ও বিচলিত হয়ে যায় তা'হলে তার দ্বারা মানুষের বুদ্ধি এরূপ চলে যায় যেমন মশকে সামান্য ফুটো হ'লে সমস্ত জল বার হ'য়ে যায়।

১০৬২। চৈতন্যরূপ বস্ত্র যুক্ত মাহাভাগ্যবান পুরুষ; বস্ত্রহীন বস্ত্রযুক্ত অথবা মৃগচর্ম্মাদি ধারণ ক'রে উন্মত্ত বা বালকের মত অথবা পিশাচাদির ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে ভূমণ্ডলে বিচরণ করে থাকেন।

১০৬৩। ভগবানকে ভক্তি করাই মানুষের পরম পুরুষার্থ, তাঁকে ভক্তি ক'রে পরম শান্তিকে প্রাপ্ত হও।

১০৬৪। মেধাবী এবং বহুশ্রুত সৎপুরুষগণের সঙ্গ কর; কেন না, যে মহাপুরুষগণের শরণ লয় সে তাঁকে জেনে সুখ লাভ করে।

১০৬৫। যখন এক রামেরই শরণ নিলে স্বার্থ এবং পরমার্থ সহজেই সিদ্ধ হয়ে যায় তখন অপরের দ্বারে গিয়ে আপনার হীনতা দেখান উচিত নহে।

১০৬৬। সর্বদা সেই দিনের কথা স্মরণ রাখ যেদিন তোমার দেহ চলে যাবে এবং গঙ্গার তটে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে, এখানকার কিছু সঙ্গে যাবে না এবং সেখানে কেউ সহায়ক হবে না।

১০৬৭। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদলে তাঁকে পাওয়া যায়। মানুষ ছেলে পুলের জন্য, টাকা পয়সার নিমিত্ত কত কাঁদে কিন্তু ভগবানের জন্য কি

কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে! তাঁর জন্য কাঁদো, চোখের জল প্রবাহিত কর তবে তাঁকে পাবে।

১০৬৮। মূর্খ বুঝে কি সে ইন্দ্রিয়গণের সুখ লুট্‌ছে, কিন্তু সে এ কথা জানেনা মলিন বিচার জনিত কার্য্যের জন্য তার জীবনীশক্তিই বিকিয়ে যাচ্ছে, অথবা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

১০৬৯। হৃদয়ের সরলতা এবং নির্মলতা ঈশ্বরীয় জ্যোতি, এই জ্যোতিই ঈশ্বরীয় পথ দেখায়। প্রভু হতে ক্ষমা লাভের আশা এই সাধনসমূহের দ্বারা উৎপন্ন হয়। প্রভুর ভয়ই পাপ থেকে নিবৃত্ত করে। আর প্রভুমহিমার স্মরণই সত্যমার্গে অগ্রসর করায়।

১০৭০। ভগবানের দাস হয়ে জগতের আশা রেখোনা। যখন সমর্থ স্বামীকে প্রাপ্ত হয়েছো তখন অপরের সামনে দীন কেন হচ্ছ!

—০—

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ]

॥ ভাগবতমতালোচন ॥

আমরা এই প্রবন্ধে নানা মন্ত্রসংহিতা হইতে মাত্র পনের ষোলটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহার মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদক মন্ত্রের অভিপ্রায় যুক্তি দ্বারা উপপাদনের জন্য ন্যায়, বৈশেষিক ও পাশুপত আচার্য্যগণ যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়াছি। ন্যায় বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সহিত পাশুপত সিদ্ধান্তের যে অংশে সাম্য আছে তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি। শ্রৌত পাশুপত মতে ঈশ্বরকে জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই বলা হইয়াছে। তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি।

বেদমন্ত্র হইতেই যে ভারতীয় দার্শনিক-চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তাহা ভট্টপাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বৈলক্ষণ্যের কারণ এই যে যাঁহারা বেদের একদেশ মাত্র অবলম্বন করিয়া সেই বৈদিক দেশ প্রতিপাদ্য তত্ত্বের উপপাদনের জন্য উপপত্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা একরূপ। আর যাঁহারা সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের

উপপাদনের জন্য উপপত্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অন্যরূপ। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রৌত ও অশ্রৌত পাশুপত মতের আলোচনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আমাদের ঋক্‌মন্ত্রসমূহের মধ্যে ৬, ১২, ১৩ ও ১৪ মন্ত্রে ঈশ্বরের সর্ব্বাত্মকতা বলা হইয়াছে। এজন্য ঈশ্বর জগতের কেবল নিমিত্তকারণ নহেন। ঈশ্বর নিমিত্তকারণও বটেন উপাদানকারণও বটেন। ঈশ্বর জগতের উপাদানকারণ হইলে যে দোষের আপত্তি হয় তাহার সমাধানের শ্রৌত পাশুপত সিদ্ধান্তে একপ্রকার উপপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

সম্প্রতি বিষ্ণুভাগবত মতে বেদমন্ত্র প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের সর্ব্বাত্মকতা উপপাদনের জন্য ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এই উভয়বিধ কারণতা প্রকারান্তরে সমর্থিত হইয়াছে। ঈশ্বর সমস্ত জগতের স্রষ্টা ইহা যেমন বেদ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না। আমাদের উদ্ধৃত মন্ত্রের ৭ম ও ১১শ মন্ত্রেও ইহাই বলা হইয়াছে এবং ৮ম মন্ত্রে একমাত্র ঈশ্বরই ইহার জ্ঞাতা বলা হইয়াছে। জগতের স্রষ্টাই দুর্ব্বিজ্ঞান আবার যিনি জগতের স্রষ্টা তিনিই সর্ব্বজগদাত্মক, স্রষ্টা নিজেই সৃজ্যমানরূপেও ব্যবস্থিত, স্রষ্টাই সৃজ্যমানরূপেও ভাসমান এই তত্ত্ব জীবজগতের কল্পনারও অতীত দুর্ব্বিজ্ঞান হইতেও দুর্ব্বিজ্ঞান।

ঈশ্বর জগতের উপাদান এই শ্রৌত-সিদ্ধান্তের উপপাদনের সূত্রপাত ন্যায়াচার্য্য উদয়নের মতের আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। পাশুপত মতের আলোচনায় আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে—যাঁহারা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যাতা তাঁহারা উত্তর মীমাংসক নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যে ও শ্রীকর ভাষ্যে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত্যধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ১।৪।৬ অধিকরণ) জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরই জগতের উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলা হইয়াছে।

বৈদিক পাশুপত মতে যেমন ঈশ্বরকেই জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদান-কারণ বলা হইয়াছে এইরূপ ভাগবতমতেও ঈশ্বর জগতের উভয়বিধ কারণ। অশ্রৌত পাশুপত মতে ঈশ্বর কেবলমাত্র নিমিত্তকারণ আর তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভাগবত মতে ভগবান নারায়ণই পরমব্রহ্ম। এই পরমব্রহ্ম ভগবান্ নারায়ণ, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহরূপে অবস্থিত। বাসুদেবব্যূহ, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহ। ভগবান্ বাসুদেবই নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ ও পরমার্থতত্ত্ব। তিনি পরিপূর্ণ ষড়্‌গুণ্যশালী। ১। জ্ঞান, ২। শক্তি, ৩। বল, ৪। ঐশ্বর্য্য, ৫। বীর্য্য ও ৬। তেজঃ এই ছয়টি তাঁহার গুণ। সমস্ত চেতনাচেতন প্রপঞ্চকে তিনি অহংভাবে জানেন। সমস্ত চেতনা-চেতন জগৎকেই ভগবান্ 'ইহা আমি' এইরূপে জানেন। সমস্ত জগতের

অন্তঃপাতী প্রত্যেক বস্তুকে যিনি বিশেষভাবে জানেন তিনিই বাসুদেব। তাঁহার এতাদৃশ জ্ঞানই তাঁহার ছয়টি গুণের মধ্যে প্রথম গুণ জ্ঞান। তিনি সমস্ত জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান, বাসুদেবের এই প্রকৃতিভাবই শক্তি। এই শক্তিই তাঁহার দ্বিতীয় গুণ। ভগবান্ যে জগৎসৃষ্টি করেন তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র শ্রান্তি হয় না এবং মানুষ তাহার দেহস্থিত তিলকালকাদি চিহ্ন যেমন অপ্রযত্নে অনায়াসে ধারণ করে এইরূপ মানুষের তিলকালকাদি ধারণের মত তিনি সকল জগৎকে অনায়াসে ধারণ করেন। ইহাই তাঁহার বল নামক তৃতীয় গুণ। তাঁহার ইচ্ছার কখনও প্রতিঘাত হয় না। এজন্য অপ্রতিহতেচ্ছত্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্য নামক চতুর্থ গুণ। ভগবান্ জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান হইলেও তাহাতে তাঁহার কোনও বিকার হয় না। যেমন দুগ্ধ দধিভাবে পরিণত হইলে দুগ্ধের বিকার হয় ভগবানের এইরূপ বিকার হয় না, ইহাই ভগবানের বীর্য্য নামক পঞ্চম গুণ। ভগবান্ যে জগতের সৃষ্টি করেন তাহাতে তাঁহার কোন সহকারীর অপেক্ষা নাই। কোন সহকারীর অপেক্ষা না করিয়াই তিনি জগৎসৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং অন্যকে সর্ব্বদাই অভিভূত করিবার সামর্থ্য তাঁহার আছে। সহকারীর অনপেক্ষা ও পরাভিভব সামর্থ্যই তাঁহার তেজঃ নামক ষষ্ঠগুণ। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও ঈশ্বরের ছয়টি গুণ স্বীকার করিয়াছেন, ভাগবত মতেও ঈশ্বরের ছয়টি গুণ স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ গুণের সংখ্যা সমান হইলেও গুণের সাম্য নাই। যাহা হউক, ভগবানের এই ছয়টি গুণের মধ্যে জ্ঞান ও বল এই দুইটি গুণের উন্মেষপ্রযুক্ত তিনি সঙ্কর্ষণব্যূহরূপে অবস্থিত আছেন। তাঁহার বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এই দুইটি গুণের উন্মেষে তিনি প্রদ্যুম্ন ব্যূহরূপে অবস্থিত থাকেন। তাঁহার শক্তি ও তেজ এই দুইটি গুণের উন্মেষে তিনি অনিরুদ্ধব্যূহরূপে অবস্থিত থাকেন। ষড়্গুণশালী দুইটি দুইটি গুণের উন্মেষে সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহ প্রকাশমান হইয়া থাকে। সমস্ত প্রপঞ্চই এই ভগবদ্-ব্যূহচতুষ্টয়াত্মক। আমরা সংক্ষেপে ভাগবত-সিদ্ধান্তের স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম। ভগবান্ যে সর্ব্বাত্মক ইহা আমাদের উদ্ধৃত বেদমন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। এই ভাগবত মতেও চেতন প্রপঞ্চে ভগবানের অহংভাব আছে বলা হইয়াছে। আর এজন্য ঋক্‌মন্ত্র সমূহে—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি।" "উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষাম্" ইত্যাদি ঈশ্বরেরই সর্ব্বজীবভাব বলা হইয়াছে। ভগবানের যে জ্ঞান, শক্তি, বল প্রভৃতি গুণ বলা হইয়াছে তাহাও উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্র সমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই ভাগবতমতে ভগবানের পঞ্চম গুণ যে বীর্য্য বলা হইয়াছে তাহাই

এস্থলে আলোচ্য বিষয়। ভাগবতমতে ভগবান জগতের উপাদান বা প্রকৃতি, যেমন দুগ্ধ দধির প্রকৃতি। উপাদান কার্য্যরূপ প্রাপ্ত হইলে উপাদানের বিকার অপরিহার্য। কিন্তু ভগবানের বীর্য্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভগবানের বীর্য্যই এতাদৃশ যে তিনি জগতের প্রকৃতি হইয়াও বিকারী হন না। ভগবান্ যে নির্ব্বিকার ইহাও বেদমন্ত্রসিদ্ধ। অথচ ভগবান্ জগতের প্রকৃতি ইহাও বেদমন্ত্রে বলা হইয়াছে। সুতরাং ভগবানের জগৎপ্রকৃতিত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব এই উভয়ের সংরক্ষণ অতি দুর্ভর। আর এই দুর্ঘটতাপ্রযুক্তই দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকে ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণতাই স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃতিভাব স্বীকার করেন নাই। অবৈদিক পাশুপত মতের আলোচনায় আমরা ইহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছি। আর এই পাশুপত খণ্ডন করিবার জন্যই ব্রহ্মসূত্রে, পত্যধিকরণ বলা হইয়াছে। (ব্র: সূ: ২।২।৭ অধিকরণ)। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য, শ্রীকণ্ঠভাষ্য ও শ্রীকরভাষ্যে এই কথাই বলা হইয়াছে। ভাগবত সিদ্ধান্তেও এই দুর্ঘটতা সমাধানের জন্য ভগবানের বীর্য্যনামক পঞ্চম গুণ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রৌত পাশুপত সিদ্ধান্তে তাহা করা হয় নাই। পরমেশ্বরের শক্তিই জগদ্রূপে পরিণামিনী হইয়া থাকে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রসমূহে জগৎস্রষ্টৃত্ব, জগৎসংহর্তৃত্ব, জগৎপ্রকৃতিত্ব, চেতনাচেতনপ্রপঞ্চাত্মক প্রভৃতি যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহারই উপপাদনের জন্য ন্যায়, বৈশেষিক, পাশুপত ও ভাগবত প্রভৃতি দার্শনিকবৃন্দ নানাবিধ উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া বৈদিক সিদ্ধান্তেরই উপপাদন করিয়াছেন।

পাতঞ্জল দর্শনেও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপাদনের জন্য যে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও মন্ত্রপ্রদর্শিত ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব উপপাদনের জন্যই করা হইয়াছে। আমরা ইত:পূর্ব্বে বলিয়াছি—কোন দার্শনিক বেদের একদেশের উপপত্তি প্রদর্শনের জন্য স্বীয় যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহ বা বেদের অধিকতর অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপপাদনের জন্য স্বীয় যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহবা বেদের সর্ব্বাংশের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপপাদনের জন্য স্বীয় যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন, "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখ:" এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য অর্থের উপপাদনের জন্য ন্যায়াচার্য্য উদয়ন পরমাণুপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন ও ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা সমর্থন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতারও সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা বেদের মন্ত্রভাগে প্রতিপাদিত ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক রীতিতে আলোচনায় কিঞ্চিৎ স্বরূপ প্রদর্শন করিলাম। ভারতীয় দার্শনিকবৃন্দ এক

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধেই যে বিভিন্ন প্রস্থানের আলোচনা করিয়াছেন তাহা অতি সুবিপুল। এজন্য শাক্ত, সৌর প্রভৃতি দার্শনিকগণের ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। কারণ সমগ্র আলোচনা প্রদর্শন করা একটি মানুষের জীবনে অসম্ভব, বিশেষতঃ একটি প্রবন্ধে।

—•—

মায়া

[শ্রীমৎ স্বামী নিত্যকমলানন্দ অবধূত]

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া,
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

—শ্রীগীতা।

—'আমার এই দৈবীগুণময়ী মায়া অতি কষ্টে অতিক্রম করা যায়। যাঁহারা আমার শরণাগত হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন।'

মায়া কাহাকে বলে? মায়া কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, ইহার সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ? এই সকল বিষয় আলোচনা করা উচিত।

"আদৌ মায়াং প্রকাশয়ামাস। সা দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা কার্য্য-কারণরূপাচ। সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। তস্য মায়ায়া মহত্তত্ত্বং জাতং, তস্মাদহঙ্কারঃ। তস্মাৎ পঞ্চভূতম্, তস্মাৎ ব্রহ্মাণ্ডম্।"

সৃষ্টিকালে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর মায়ার প্রকাশ করেন। সেই মায়া দ্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থের অনুসন্ধানরূপিণী, কার্য্য-কারণময়ী, সত্ত্বরজস্তমোগুণস্বরূপা। মায়ার শক্তি দ্বিবিধ; আবরণ ও বিক্ষেপণ। মায়া হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত ও পঞ্চভূত হইতে এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই দৃশ্যমান জগতে মায়ার শক্তি অতুলনীয়! মায়াবদ্ধ জীব ঐহিক সুখ-প্রত্যাশায় কি না করিতে পারে? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সমভাবে সাধনাই সাধারণ মানবের লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য। কিন্তু মায়াক্লিষ্ট জীব প্রায়শঃ ধর্ম্ম ও মোক্ষকে বহুযত্নসাধ্য মনে করিয়া ধর্ম্মমোক্ষানুকূল কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হন না। তজ্জন্যই শ্রুতি, মুক্তিপথভ্রষ্ট ভ্রান্ত মানবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা, যত্ত্বেকোহশক্তঃ স জনো জঘন্যঃ॥"

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই তিনটিকে সমভাবে সেবা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে মানব ইহাদের এককে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের পথে ধাবিত হয় সে অতি হেয়।

মোহাচ্ছন্ন জীবমাত্রেই বাসনার দাসানুদাস; মায়ামুগ্ধ জীবের অস্তিত্ব সূর্য্যাস্তের ন্যায় সহসা অনন্ত কালগর্ভে বিলীন হইয়া থাকে। মায়ার শক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যাতে প্রতিফলিত হইয়া দ্বিবিধ ফল প্রসব করে। জীবমাত্রই মায়ারজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া নানাক্লেশ ভোগ করিতেছে।

এই বিচিত্রময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যখনই যেদিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখনই সেইদিকে প্রকৃতির অপূর্ব্ব অচিন্ত্য লীলালহরী আমাদিগের ভাব-সাগর উদ্বেলিত করিয়া বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত গুণ ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতে থাকে।

আমার মায়ামুগ্ধ জীব বলিয়াই জাগতিক দৃশ্য দর্শনে সমধিক স্পৃহান্বিত; আকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়াই আমরা জীবপদবাচ্য। কিন্তু এই জগৎকে (গচ্ছতীতি জগৎ) গমনশীল বুঝিয়া, যিনি বস্তুর উপর কেবল ভগবানের প্রভাব বা সত্ত্বা, হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনি জীব নামে অভিহিত হইলেও ভাগবানের নিত্যানন্দধামপ্রার্থী একজন সাধক। তাঁহার ভাবরাজ্যে নিত্য কত শত শত নব নব ভগবৎ-প্রেম উদিত হইয়া তাঁহাকে তত্ত্বদর্শী করিয়া তুলিতেছে। সাধারণ জীব যাহাকে চন্দনতরু জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতেছে, ভগবৎ-প্রেমিক তাহাকে বিষবৃক্ষজ্ঞানে পরিহার করিতেছেন। তজ্জন্য জীবমাত্রই বলিতে প্রয়াসী যে এরূপ বৈষম্যের প্রকৃত কারণ কি? কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি কখনই সম্ভবে না।

এস্থলে পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যের কারণ সবিশেষ উল্লেখপূর্ব্বক আলোচনা করা হইতেছে। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, মায়ার আধিপত্যে জীব ভগবৎ-প্রেমে অনাসক্ত হইয়া সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছে। মায়া অবিদ্যা পথে প্রধাবিত হইলে কুফল সমুৎপাদন করে। এই অবিদ্যাময়ী মায়া যাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রদর্শনকারিণী, তাহারা জাগতিক বস্তু নিচয়ে ভগবৎসত্তার উপলব্ধির পরিবর্তে রজ্জুতে সর্পভ্রম, কিম্বা বর্ণশূন্য আকাশে নীলিমা, মরীচিকায় বারিভ্রমের ন্যায় স্বকপোলকল্পিত বহুপ্রকার অনর্থজালে আবদ্ধ হন ও পরিণামে চরম অশান্তি ভোগ করেন। মায়াবদ্ধ স্বকীয় অনিষ্টের পথে সর্ব্বদা অগ্রগামী হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

পক্ষান্তরে, মায়াশক্তি জ্ঞান পথে অগ্রগামিনী হইলে জীবমাত্রই তত্ত্বদর্শী

হইয়া থাকেন। কারণ, পরমতত্ত্ব প্রকাশিকাশক্তির বিকাশই জ্ঞানের প্রধানতম ধর্ম্ম। আবার, জ্ঞান আবির্ভাবের কারণ সাধুসঙ্গ, ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি। মায়া বিদ্যাশক্তির প্রভাবে জ্ঞানোৎকর্ষ সম্পাদনে প্রকটিত হয়, তাহা জীবের উন্নতির হেতু। আর অবিদ্যাশক্তির প্রভাবে যে মায়া আবির্ভূত হন তাহা জীবের চরম দুঃখের হেতু হয়।

এই মায়া সম্বন্ধে পুরাণে একটি অতি সুন্দর গল্প আছে। একদিন নারদ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, মায়াটী কি? ইহা বুঝিয়াও যে বুঝিতে পারি না!" শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মায়াকে বুঝিতে পারিলেই মায়া সরিয়া যান, জীব তখন মুক্ত হয়। যাই হোক, চল আমরা মর্ত্তে ভ্রমণ করিয়া আসি, আমার একটা বিশেষ কাজও আছে।"

নারদ ও শ্রীকৃষ্ণ কতদূর চলিয়া গেলেন, অনেক দূর গিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন; নারদ, আমার বড় জল তৃষ্ণা লাগিয়াছে, একটু জল আনিতে পার? নারদ জল অন্বেষণে ছুটিলেন। সম্মুখে একখানি গ্রাম, সেই গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ী গিয়া জল প্রার্থনা করিলেন। এক সুন্দরী যুবতী জল লইয়া আসিল। নারদ সেই সুন্দরী যুবতীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তখন জল ও শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুরের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যুবতীর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব তুলিলেন। নারদের কথায় যুবতীর পিতা খুশী হইয়া নিজ কন্যার সহিত নারদের বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে সেই কন্যার পিতা অর্থাৎ নারদের শ্বশুরের মৃত্যু হইল। শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি নারদ প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে ক্রমে নারদের তিনটি সন্তান হইল। পুত্র, বিষয়াদি লইয়া নারদ কিছুদিন এইভাবে বেশ সুখেই কাটাইলেন। হঠাৎ একদিন নারদের বড়ছেলেটি বন্যার জলে ডুবিয়া মরিল। জল প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল। এই অবস্থায় কি করেন, কোথায় যান ঠিক করিতে না পারিয়া শেষে অপর দুই ছেলে ও স্ত্রীকে লইয়া নারদ গ্রাম পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন।

একদিন স্ত্রী-পুত্র লইয়া সেই প্লাবনের স্রোতেই রওনা দিলেন। যাইতে যাইতে একস্থানে জলের আবর্ত্তে পড়িয়া নারদের স্ত্রী ও পুত্র দুইটি ভাসিয়া গেল, শত চেষ্টাতেও নারদ তাহাদের রক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নিজে অতি কষ্টে সন্তরণ পূর্ব্বক তীরে উঠিয়া স্ত্রী ও পুত্রের শোকে অধীর হইয়া তাহাদের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিলেন এবং বলিলেন, "কয়েক মুহূর্ত্ত হইল জল আনিতে আসিয়াছ, কৈ নারদ, জল কোথায়?" নারদ চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, অ্যাঁ! কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র

কিন্তু আমি যে বহুকাল কাটাইলাম! কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে এত দীর্ঘকাল চলিয়া গেল? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "ইহাই মায়া। কিন্তু আত্মার নিকট কালও নাই, স্ত্রীও নাই, পুত্রও নাই। মায়ার বিভীষিকায় আত্ম বিস্মৃতি হইয়া রহিয়াছ বলিয়াই, সর্পের ভ্রমের ন্যায় অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছ।"

সর্ব্ব সংহারক কাল সবই গ্রাস করিবেন এবং গ্রাস করিতেছেন। কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিনা। বুঝিয়াও বুঝি না। তিনি পাপী পুণ্যাত্মা, রাজা প্রজা, সুন্দর ও কুৎসিত সকলকেই গ্রাস করেন; কাহাকেও ছাড়েন না। সব কিছুই সেই এক চরম গতি বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহই ঐ তরঙ্গ-গতি রোধ করিতে সমর্থ নহে। ঐ বিনাশাভিমুখী গতিকে কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও রোধ করিয়া রাখিতে পারে না। আমরা উহাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর ন্যায় সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় সুখের দ্বারা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সে আমাদিগকে ভুলিবে না।

দুইদিকেই মায়ার গতি। কখন প্রবৃত্তি মার্গে, কখন নিবৃত্তি মার্গে। নিন্দায় দুঃখ, প্রশংসায় আনন্দ প্রভৃতিই মহামায়ার খেলা। আমরাই আমাদিগকে চিনিতে পারি না, বুঝিতে পারি না। তাই মিলন-সুখে হাসির কল্লোল এবং মরণ-দুঃখে ক্রন্দন রোল তুলিয়া থাকি।

উত্তরে হয়তো তুমি বলিবে, "এইরূপ কথাত সকলেই বলে। সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই শুনিয়া থাকি। কিন্তু বুঝার মত বুঝিতে পারি না কেন? যেমন করিয়া বুঝিলে আর না বুঝিবার দাগটুকু মাত্রও থাকে না ঠিক তেমন করিয়া বুঝা যায় না কেন?" তাহার কারণ অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা দূরীভূত করিয়া আত্মার প্রথম বিশেষণ যে "জ্ঞানবান" ইহা যদি অনুভবে আসিত তবে আমি যে আত্মা, আমি পরিপূর্ণ জ্ঞানবান, আমি আত্মস্বরূপ জানিতে পারিতাম। তবে যে আমরা আমাদের স্বরূপ জানিতে পারি না, তাহার কারণ মায়া। সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় পবিত্রতা প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত। তবে, কোথাও তাহার প্রকাশ অধিক কোথাও অল্প। মানুষের সহিত মানুষের অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তুর পার্থক্য তাহা প্রকারগত নয়—পরিণাম গত। প্রত্যেকের পশ্চাতে অবস্থিত সেই একমাত্র সত্য অনন্ত নিত্যানন্দময় নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ ব্রহ্ম, তিনিই সেই আত্মা। তিনিই পূণ্যবানে, পাপীতে, সুখীতে, দুঃখীতে, সুন্দরে, কুৎসিতে, মনুষ্যে, পশুতে সর্ব্বত্র একরূপ। তবে আবরণভেদে তাহার প্রকাশ

অধিক বা অল্প। যার যেমন, তার তেমন। এই মায়া-পোষাক যার যত বেশী পরা, তাহার স্বদেহ তত কম দেখা যায়। যার কম পরা, তার তত বেশী দেহ দেখা যায়। এই মায়া পোষাকের আবরণের জন্য আপনাকে চিনিতে পারি না। কাজেই, আমাদের স্বরূপের যে পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে, তাহা ঐ পোষাকের মধ্যেই চাপা পড়িয়া থাকে। মায়া-পোষাক একটু খুলিয়া দাও, আত্মার স্বরূপ প্রকাশ হইবে। তখন বুঝিবে তুমি পরিপূর্ণ জ্ঞানবান। তুমি যে পরিপূর্ণ অবিনাশী তাহাও উপলব্ধি হইবে।

মায়া আর প্রকৃতি একই কথা। যাহাতে এই মায়ার পোষাক খুলিয়া যায়, বাহ্য ও অন্তঃ প্রকৃতি বশীভূত এবং আত্মার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত হয়, তাহাই করা জীবের কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীমৎ যোগাচার্য্যাবধূত জ্ঞানানন্দদেব এই মায়া সম্বন্ধে বলিতেছেন, "মায়ার সুখ, দুঃখ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বদ্ধ ও মুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে। একই মায়ার এই দুই শ্রেণীর কার্য্যের জন্য বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম। সকল প্রকার অবস্থা, সকল প্রকার ঘটনা সবই মায়িক। এই মায়া বশতঃই একে অপরের প্রতি স্নেহ পরবশ হয়, এবং সেই স্নেহ বশতই অপরের বিরহে কত মনোকষ্ঠ পাইতে থাকে। স্নেহ না থাকিলে মমতাও থাকে না। স্নেহ মায়ার ঐশ্বর্য্য। যাহা আমি নই, তাহা আমি-বোধও মহাভ্রম, তাহাও মোহিনী মায়ার এক অপূর্ব্ব কৌশল। মোহ বশতঃ অসত্যকে সত্য বোধ হয়। মায়া সম্ভূত প্রত্যেক জীব হইলেও সকলেই অসৎ নয়। মায়া ক্ষুধা তৃষ্ণা, আত্মীয় স্বজন, ষড়রিপুর ও নিদ্রার দাস করিয়া রাখিয়াছে। মন যতদিন আছে ততদিন মায়ার হাত ছাড়াইতে পারিতেছ না। মায়ার প্রভুত্ব যথেষ্ট আছে। কি প্রকারে তার প্রভুত্ব অস্বীকার করিবে? মায়া অস্বীকার করিলেও মায়া তোমায় ছাড়িবেন না।"

"ভয় বিহ্বলা হরিণীর ন্যায় যিনি মায়াকে ভয় করিয়া থাকেন, তাঁহারও নিষ্কৃতি নাই। মায়াকে ভয় করিলে মায়া ত্যাগ হয় না। আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে কেহই মায়া ত্যাগ করিতে পারে না।"

—০—

গৌরচন্দ্রিকা

[গোবিন্দদাস এবং পরমানন্দ]

[অধ্যাপক শ্রীনন্দীগোপাল চক্রবর্ত্তী, এম্ এ]

গৌরচন্দ্র শব্দটির অর্থ বুঝাইয়া বলিতে হইবে না—গৌরচন্দ্রকে চেনে না এমন লোক লোকালয়ে নাই। গৌরচন্দ্রিকা শব্দটির অর্থও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না, আমরা নিত্যই ইহা ব্যবহার করিতেছি। ভূমিকা, অবতরণিকা, পাতনিকা বা উপক্রমণিকা এই অর্থে গৌরচন্দ্রিকা শব্দের বহুল প্রয়োগ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু গৌরচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রিকা—এই দুয়ের মধ্যে যে যোগ আছে সেই স্থূল কথাটাই আমরা অনেকে হয় জানি না, নয় মনে রাখি না। অথচ ভূরিদ গৌরচন্দ্রের বহু বিচিত্র দানের মধ্যে গৌরচন্দ্রিকা শব্দটিও অন্যতম। গৌরচন্দ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই গৌরচন্দ্রিকা শব্দটি এবং তাহার অভিধেয় সাহিত্য সামগ্রীটির আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

একটা গোটা যুগের বাংলা সাহিত্যের সকল দিক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন এই দেবমানবের লোকোত্তর ব্যক্তিত্ব! সেই সাহিত্যের সমৃদ্ধি, বিস্তৃতি সকল কিছুর মূলে মহাপ্রভুর মহাপ্রভাব। বাংলার সাহিত্য জগতে তাঁহার অপরিমেয় প্রভাবের বিচার করিলেই স্বীকার করিতে হইবে যে গৌরচন্দ্র অবতার। জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকে স্থায়ী সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার যদি অবতারের লক্ষণ হয়, তবে গৌরচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই অবতার পুরুষ। কোন দেশের কোন যুগের সাহিত্যে একজনের প্রভাব বোধ হয় এত গভীর, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগ্রাসী হয় নাই।

গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ব্বেই বাংলা সাহিত্য তাঁহার দিব্য প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস যখন গাহিলেন—

> "আজু কে গো মুরলী বাজায়।
> এতো কভু নহে শ্যামরায়॥
> ইহার গৌরবরণ করে আলো।
> চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥"

তাহারও শতবর্ষ পরে গৌরচন্দ্রের শুভ আবির্ভাব। যাঁহার গৌরবরণ জন্মের এত আগেই বাংলা সাহিত্যকে আলোকিত করিল, তাঁহার জন্মের পর যে এই সাহিত্যের দিক্ দিগন্ত সেই গৌরবরণের প্রভায় সমুজ্জ্বল ও দীপ্যমান হইবে

তাহাতে বিস্ময় কি! শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব কবিতা ও গৌরচন্দ্র প্রায় সমার্থক হইয়া পড়িল। বৈষ্ণব কবিগণ যে কোন প্রসঙ্গেই অবতারণার পূর্ব্বেই গৌরচন্দ্রের আবাহন করিতেন। তাঁহাদের এই অভ্যাস স্বাভাবিক; এবং সেই স্বাভাবিক অভ্যাস ক্রমশঃ রীতিতে পরিণত হইল; আর সেই রীতির পরিণাম—গৌরচন্দ্রিকা শব্দটির অর্থের এই প্রকার বিবর্ত্তন। গৌরচন্দ্রের প্রধান কীর্ত্তি নগর-কীর্ত্তন, নাম-কীর্ত্তন, লীলা-কীর্ত্তন। এই সকল কীর্ত্তনের পূর্ব্বভাগে তাহাদের প্রাণ-পুরুষের অধিষ্ঠান নিতান্তই স্বাভাবিক, অনিবার্য্য ঘটনা। ভূমিকারূপী এই গৌরপদগুলিকে সাধারণভাবে গৌরচন্দ্রিকা বলা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব কবিতার চারিটি ভাগের মধ্যে একটি মুখ্যতঃ, অপরগুলি গৌণতঃ, গৌরাশ্রয়ী। একটি প্রত্যক্ষভাবে গৌরচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই গৌর-পদগুলি গৌরাঙ্গের লীলা কীর্ত্তন। অপর গুলির নায়ক পরোক্ষভাবে গৌরচন্দ্র। এক অর্থে গৌরাশ্রয়ী পদ মাত্রই গৌরচন্দ্রিকা, যদিচ গৌরচন্দ্রকে লইয়া রচিত গীত মাত্রই যথার্থ গৌরচন্দ্রিকা নহে। সত্যকার গৌরচন্দ্রিকার ক্ষেত্র বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র। পালাবদ্ধ রসকীর্ত্তনের ক্ষেত্রেই ইহার বিশেষ অধিকার। বিভিন্ন পদকর্ত্তার রচিত সমরসের পদাবলী যথাক্রমে সাজাইয়া কীর্ত্তনীয়াগণ বিভিন্ন রাগে ও তালে যে লীলাগান করেন তাহারই নাম পালাবদ্ধ রস-কীর্ত্তন। এই জাতীয় কীর্ত্তনের প্রারম্ভে পালার রসদ্যোতক যে গৌরপদ গীত হয় তাহাই প্রকৃত গৌরচন্দ্রিকা।

আমরা গৌরচন্দ্রিকার যে সকল উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাই তাহাদের মধ্যে গোবিন্দদাসের স্থান সকলের উর্দ্ধে। গোবিন্দদাসের রচনার যে বিশেষত্বটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা হইল ঐশ্বর্য্যের সহিত গাম্ভীর্য্যের, আবেগের সহিত সংযমের অপূর্ব সমন্বয়। তাঁহার কাব্যে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য রহিয়াছে কিন্তু বাহুল্য নাই—আভরণ আবরণ হয় নাই, আভরণ অঙ্গদ্যুতির মতই বিচ্ছুরিত হইয়াছে। অলঙ্কার প্রয়োগের ঔচিত্য ও পরিমিতি বোধ গোবিন্দদাসের অন্যতম প্রধান উৎকর্ষ।

"অভিনব হেম- কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধনী তীরে উজোর।
চঞ্চল চরণ কমল তলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমর গণ ভোর।

—উপমানের সহিত উপমেয়ের এমন পরিপূর্ণ অভিন্নতা গোবিন্দদাসের বাহিরে বোধ হয় দেখা যায় না। এই পরিমিতিবোধ ও সংযমের জন্য গোবিন্দদাসের

কাব্যে ভাবের তীব্রতা যেমন মর্ম্মস্পর্শী, তাহার প্রগাঢ়তাও তেমনি বিস্ময়কর। তপ্ত ভাবাবেগ কোথাও তরল বা দ্রব হয় নাই, মর্মব্যথা অশ্রুর আকারে নির্গলিত হয় নাই; কয়েকটি উষ্ণ মন্থর দীর্ঘশ্বাসরূপে বিনির্গত হইয়াছে। তিনি যখনই গৌরের মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন তখনই তাঁহার ভাব উচ্ছ্বাসমুখর ও ভাষা পুষ্পিত, বর্ণাঢ্য হইয়া উঠিয়াছে, তখনই অলঙ্কারের সমারোহ অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়িয়াছে। গৌরাঙ্গের প্রেমে উদ্বেলিত কবিচিত্ত তখন নানাবর্ণে গন্ধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, নানা বিচিত্র সুরে নৃত্যপর হইয়া উঠিয়াছে। আর যখনই কবি আপনার দীনতা ও রিক্ততার কথা স্মরণ করিতেছেন, তখনই বঞ্চিত হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার ব্যথা নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাসের আকারে স্বল্প কয়েকটি মর্ম্মস্পর্শী কথার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। গৌরাঙ্গের কথা আসিলেই ভাব ও ভাষার উল্লাস এবং বিভব স্বতঃই আসিয়া পড়ে, কবির নিজের কথা আসিলেই সকল উচ্ছ্বাস নিমেষে নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত হেম কদম্ব॥

ইহার সহিত তুলনীয়—

"তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দ দাস রহু দূর।"

একদিকে—

বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে।"

অন্যদিকে— "গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেল।"

"নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরাতনু'র বর্ণনায় কালিন্দী কল-কল্লোল যেমন কবির গৌর প্রেমের পরিচায়ক, আত্মকথা নিবেদনে রোদন-ভরা হাহাকার এবং শীর্ণভাষার করুণ গুঞ্জরণও তেমনই তাঁহার দৈন্যবোধের সূচক।

গোবিন্দদাসের স্বকীয়তা এইখানে—ভাবের প্রগাঢ়তায়, ভাষার সবল সংযমে। অনেক ক্ষেত্রেই গোবিন্দদাসের রচনার বিশিষ্ট সুরটি হইতেছে গুরু গাম্ভীর্য্য—

"স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব।"

"ত্রিভুবন মণ্ডল কলিযুগ কাল
ভুজগ ভয় খণ্ডন রে।"

এই সব পংক্তিতে অলঙ্কার আছে, কিন্তু অলঙ্কারের উদ্দেশ্য অলঙ্করণ নহে, ভাব-সংহতি—গাঢ় সুসংবদ্ধ ভাবের যথাযথ প্রকাশ। গোবিন্দদাসের কাব্যে মকরন্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও উহা অঝোর ধারায় ঝরিয়া পড়ে নাই, 'বিন্দু বিন্দু চুয়ত'—কবি ভাবের গভীরতা ও ভাষার সংযমের কঠিন আবেষ্টনী রচনা করিয়া ভাবকে এমনই সবলে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে তারল্যের পরিবর্ত্তে গাঢ়তার সঞ্চার ঘটিয়াছে, আবেদনও সেই কারণে গভীর এবং স্থায়ী হইয়াছে। সেই জন্যই সমালোচক বলিয়াছেন, 'গোবিন্দদাস সান্দ্র,' গোবিন্দদাস চর্ব্বণীয়,' 'গোবিন্দ-দাসের রস প্রৌঢ়।'

গোবিন্দদাসের সহিত তুলনায় পরমানন্দের গৌরচন্দ্রিকা অনেকখানি স্বকীয়তা বর্জ্জিত, অনেকখানি মামুলি ধরনের। পরমানন্দের ভাব আন্তরিক, ভক্তি অকৃত্রিম।'ভাষা সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাবলীল—কিন্তু তাঁহার রচনা কোন দিক দিয়াই "স্বে মহিম্নি অধিষ্ঠিত" নহে, তাঁহার কাব্যের নিজস্ব গৌরব নাই। ইহার মধ্যে স্বকীয়তার সুনির্দ্দিষ্ট অভিজ্ঞান নাই। গোবিন্দদাস অনন্য—জনতার মধ্য হইতে তাঁহাকে সহজেই চিনিয়া লওয়া সম্ভব, তাঁহার তুলনা তিনি নিজে। পরমানন্দকে ভীড়ের মধ্যে হারাইয়া ফেলিবার আশঙ্কা আছে, তাঁহাকে নির্ভুল ভাবে চিনিয়া লইতে পারিব এ ভরসা করিতে পারি না।

"পরশ মণির সাথে কি দিব তুলনারে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়ারে
রতন হইল কত জনা॥"

এই কাব্য অনবদ্য কিন্তু অনন্য নহে। ইহার ভাব গোবিন্দদাসের তুলনায় অনেকটাই তরল, ভাষারও সে গাঢ় গাম্ভীর্য্য নাই। তরল ভাবের সহিত দ্রুত ভাষার সমন্বয় অবশ্যই এই ক্ষেত্রে উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু এ কবি মনে প্রাণে তরুণ, কোমল। একটা পেলব সৌকুমার্য্য ইহার প্রধান আকর্ষণ। ইনি গোবিন্দ-দাসের মত প্রৌঢ় নন, ইনি 'চর্ব্বনীয়' নন, ইনি 'পানীয়'।

গোবিন্দ দাসের—

'বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেম ভরে।'

অথবা—

'ত্রিভুবন মণ্ডল কলিযুগ কাল—
ভুজঙ্গ ভয় খণ্ডন রে।'—

—ইহা চর্ব্বন করিতে হয়, আস্বাদ করিতে হয়। ইহার জন্য সবল দন্তের প্রয়োজন, শুধু রসনা থাকিলে চলিবে না। কিন্তু পরমানন্দের

'শচীর নন্দন বনমালী
এ তিন ভুবনে যার তুলনা দিবার নাই
গোরা মোর পরাণ পুতলী॥'

—ইহা পান করিতে হয়। ইহার আস্বাদ গ্রহণের জন্য দন্তের প্রয়োজন নাই। মাত্র রসনা থাকিলেই হয়।

সাধারণভাবে বলা যায় পরমানন্দের গৌরচন্দ্রিকা সুরধনী গঙ্গা, কল কল রঙ্গে দ্রুত পদক্ষেপে প্রবহমানা। গোবিন্দদাসের পদ গঙ্গোত্রীর শুভ্র তুষার পুঞ্জ, কচিৎ কখনও বিগলিত, কিন্তু নৃত্যপরা চঞ্চলা দ্রবময়ী নহে, ধীর মন্থর, গম্ভীর গাঢ় সান্দ্র।

—০—

ভক্ত মহিমা

[কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়]

গিরির গরিমা নাহি বুঝে কভু
গিরিচারী বর্বর,
সমতলবাসী জ্ঞানীগণ তায়
হেরে শিবশঙ্কর।
পঙ্কের ভেক নাই বুঝে, বৃথা
পাঁকে পঙ্কজ লোভে,
দূর হ'তে অলি রচি অঞ্জলি
ছুটে আস মধু লোভে।
কবির গরিমা বুঝে না তাহার
বন্ধু স্বজনগণ,
দূর হতে করে রসিকেরা তারে
শ্রদ্ধার নিবেদন।
ভক্তমহিমা বুঝে না কখনো
বিষয়ী মানুষ যত,
স্বর্গ হইতে দেবতারা হয়
শ্রদ্ধায় অবনত।

—০—

নববর্ষে নূতন কিছু

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

(১)

ভার দেওয়াটি অভ্যাস করিতে বলি। তিনিই সব, আর তিনিই সব করিতেছেন ইহা বুঝিলে ভার দেওয়া আপনিই আসিবে। কত কিছুত করিতে ভার দাও নাই বলিয়া রক্ষা ত হইল না বা হইতেছে না। তাই বলি তারে ভা দাও—সে যা করে করুক, তুমি তার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাক। তঁ প্রীতির জন্য তোমার এই জীবন, ইহা মনে রাখিয়া সর্ব্ব কর্ম্মার্পণ কর। ইহা তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া কর।

ভার দেওয়াটিই সর্ব্বপ্রথমে নিত্য অভ্যাস করিতে হইবে।

যতদিন না প্রাণ দিয়া ভার দেওয়া অভ্যস্ত হয় ততদিন প্রথমেই ভার দিয়া দিয়া কর্ম্মে লাগ।

প্রাণ দিয়া ভার দেওয়া কিরূপ? ইহার ভিতরে অনেক কিছু আছে। যাঁকে ভার দিতেছ তিনি তোমার কে? তিনি তোমার ভার লইয়াছেন, ইহা অনুভব করা যায় কিরূপে? যিনি ভার লইবেন তিনিই কিন্তু জগদম্বা—সকল বস্তুর মধ্যে থাকিয়া ইনিই জগতকে ধরিয়া আছেন। সমস্ত দেহই তাঁর দেহ—তাঁর উপাধি। নিজের দেহকে দেবীর দেহ ভাবনা করিয়া কার্য্যে বসিতে হয় আর ভাবিতে হয় "মা—আমিত যেমন করিয়া চাই তেমন করিয়া কিছুই পারিনা। তুমি সবার মধ্যে আছ—আমি তোমাকে ভার দিতেছি। তুমিই আমার ভাল যাতে হয় তাই করিয়া দাও। সবই তুমিই করিতেছ; তুমি যন্ত্রী আমি তোমার যন্ত্র - ইহা আমার অনুভবে নিত্য আনিয়া দাও।"

ভার দিতে হইলে কি বুঝিতে হইবে তাহা বল?

শ্রবণ কর। জগদম্বা শক্তিরূপিণী আরও কত কিছু কে বলিবে! কেই বা বলিতে পারে? সর্ব্বজগতের পরমার্ত্তিহন্ত্রী এই মা। ইনিই আত্মারূপে সকলের মধ্যে। আপদ নাশ করিতে আর কে পারে? তাই শাস্ত্র বলিতেছেন "একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগ কালে। ভোগে ভবানী, পুরুষেষু বিষ্ণুঃ কোপে চ কালী সমরে চ দুর্গা॥" ভাল করিয়া বুঝিয়া রাখ—একমাত্র তিনিই সত্য বস্তু আর সমস্তই মায়ার ইন্দ্রজাল। তিনিই পরমেশ্বরী, তিনিই ইষ্টদেব, তিনিই মন্ত্র, তিনিই গুরু। তিনি সব ধরিয়া আছেন, তিনিই

জগৎসৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই পালন করিতেছেন, আবার তিনিই সব সংহার করেন।

যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বা খিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও দেহ ধারণ করান ইনি, অন্য পরে কা কথা?

একটু ভাবনা কর আপনিই বুঝিবে তিনি তোমার মধ্যে আপন শক্তি দ্বারা ধ করিতেছেন—তুমি আবার কে? মা'ই যে সব—মাকে ভার দেওয়া সেটা ল এই ভুল আমিটা ছাড়িবার জন্য। অহং-অজ্ঞান দূর করিবার জন্য। অভিমান ছাড়িয়া যদি তাঁর হইতে পার তবেই তুমি তাঁর হইবে। নতুবা নিজের ইচ্ছাও রাখিবে আর মুখে বলিবে আমি তোমার, ইহা হয় না। ভার সত্য সত্য দিতে পারিলে আপনিই বুঝিবে "তবাস্মি" তোমার আমি হওয়া কি।

আমি নাই, তুমিই আছ; তুমিই আমার মধ্যে, সবার মধ্যে সব করিতেছ ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর নাই। এই ভার তাঁরে দাও; আর থাক তাঁহার দিকে চাহিয়া—বুঝিবে তুমি তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হও কিরূপে?

কখন কি ভাল করিয়া এই আত্মার কথা ভাবিয়াছ? মুখে ত বল সোঽহং। কিন্তু সে যে সব দেখে তুমি সব দেখ কি? সে যে সব জানে তুমি কি জান তাই বল? সে যে সর্ব্বদা আনন্দময়—সর্ব্বদা আনন্দময়ী—তুমি আনন্দ কতটুকু পাও? সৎ চিৎ আনন্দ তোমারই আত্মা—ইহা কতটুকু বুঝিলে? এমন আনন্দময় জ্ঞানময় নিত্য বস্তুর সঙ্গ কতটুকু কর তাই বল? ইঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা না থাকিয়া কার সঙ্গে থাক বল? থাক বিষয়ের সঙ্গে, থাক দেহের সঙ্গে, থাক সংসারের সঙ্গে। কাজেই তোমার যাতনা ঘুচেনা। এই পুরুষোত্তমের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহাতে সব সমর্পণ করিয়া তাঁর সন্তোষের জন্য যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মে স্পন্দিত হও—তাঁহাকে ভুলিয়া কোন কিছু আর পাপ বাড়াইও না। ভার দেওয়ার ভিতরে এত কিছু আছে। ইহাই সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগ করিতে অভ্যাস কর—নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা অনুভব করিবে। এই সব উপদেশ কাহাকেও দেওয়া হইতেছে না; দেওয়া হইতেছে নিজের মনকে, আর যদি কেহ শোনে তাহাকে।

(২)

ভার দেওয়া কি কতক ধারণা করিলাম। যে কটা দিন অবশিষ্ট আছে ইহার অভ্যাস করিব সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভে—ইহার চেষ্টা করিব। কিন্তু কি ভাবে এখন হইতে চলিব বেশ করিয়া আর একবার বলিবে?

তা বলিব। শ্রবণ কর।

(১) সংসারে যত প্রকার কর্ম্ম আছে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হইতেছে মনকে কাতর করিয়া তাঁহাকে ডাকা।

নিত্য কর্ম্ম ত করিবেই—যথাকালে করিবার চেষ্টা কর। দশধা গায়ত্রী জপ করিয়া প্রত্যহ প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে না করিতে হয় তাহার চেষ্টা করিও।

মনকে কাতর করিয়া বসিতে যে বলিতেছ তাহা কিরূপে করিব? দগ্ধ মন কত দুষ্কর্ম্ম করে তবুত কাতর হয়না। ভয়ে আর্ত্ত হইয়া শরণাগত কৈ হইলাম? সবাই মরে আমিও মরিব তার আবার ভয় কি এইত মন বলে।

ইহাই ত মূঢ়তা, মস্ত অজ্ঞান। একদিন ত এই দেহ হইতে তাড়িত হইবেই। বল দেখি তখন কোথায় যাইবে? কে তোমার সঙ্গে যাইবে? কাতর হইয়া জীবন ধরিয়া যাঁহাকে ডাক তিনি একমাত্র সাথের সাথী। সঙ্গে আর কেহই যাইবে না। সকল আপদ হইতে ইনিই রক্ষা করেন। ইঁহার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন মনের কষ্ট, সংসারের কষ্ট, দেহের কষ্ট কখন যাইবে না। ভয়ার্ত্তাঃ শরণং গতাঃ—হইতে হইবে, মনকে কাতর করিয়া শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িতে হইবে।

ভয় হইল না—শরণ লইব কিরূপে তাই বল? নিজের কথা প্রত্যহ একবার চিন্তা করিও। দেখিবে কত পাপ করিয়া ফেলিয়াছ। কত প্রবল দুষ্কর্ম্মের সংস্কার তোমার মধ্যে সংগৃহীত হইয়া আছে। একটু প্রলোভন আসিলে তুমি ঈশ্বর ভুলিয়া কত কি করিয়া ফেল। নিজের পাপ কত আছে, কত হইয়া গিয়াছে, কত এখনও হইতেছে ভাবিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া বলিও।

মৎ সম পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী তৎ সমা নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি! যথা যোগ্যং তথা কুরু॥

মা আমায় ক্ষমা কর—আমি আর পাপে লিপ্ত হইব না; আর তোমায় ভুলিয়া কোন কিছু করিয়া আর পাপ করিব না। তুমি ক্ষমা কর, তুমি 'তবাস্মি' করিয়া লও।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা কর সমাজ যে পাপে ডুবিতেছে।

(২) ভাবনা কর আজ হইতে নূতন জীবন আরম্ভ হইল। নূতন জীবনের প্রধান কার্য্য হইবে তোমায় ভুলিয়া কোন কিছু না করা। সেই জন্য সর্ব্বদা নাম জপ অভ্যাস করিতে হইবে। নাম জপটিকে সর্ব্বদার কার্য্য নিশ্চয় কর। কে সুখী জান? যে নাম জপকে সর্ব্বদার কার্য্য বলিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছে সেই সুখী। প্রথম প্রথম ত পারিবে না, কিন্তু কিছুতেই ছাড়িও না, তবে হইবে। কতদিনে কাহার হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। করিয়া চল, হইবেই।

রত্নাকর, বাল্মীকি হইলেন এই নাম জপ করিয়া। "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" নাম জপ করিয়া চল। নিত্য কর্ম্ম ত তিন সন্ধ্যায় করিতেই হইবে। তার উপরে থাকিবে সর্ব্বদার কার্য্য নাম জপ। লোকসঙ্গ হইলে নাম জপ হইবে না। তখন—যখন কথা কহিতে যাইতেছ তখন নামীর কাছে অনুমতি লও। একবারেই কথা কহিতে না লাগিয়া একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া তাঁর সঙ্গে কথা কহিয়া তাঁহাকে জানাইয়া কথা আরম্ভ কর। তার পরে যখন তোমাকে কথা কহিতে হইবে না তখন একেবারে জপে আইস। ইহা অভ্যাস করিতে বহুদিন লাগিতে পারে। যতদিন না পাকা অভ্যাস হয়, ততদিন ছাড়িও না। ভুল হইবেই, তথাপি পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে থাক, হইবে। তাঁর সঙ্গে কথা কহিয়া পরে অপরের মধ্যে যে তিনি আছেন ভাবিয়া কথা কও। প্রথমে নিজের মধ্যে তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ার অভ্যাস করা—পরে তিনি যে সকলের মধ্যে মনে রাখিয়া কথা কওয়া—গন্তব্য পথে যাইবার প্রথম সোপান।

(৩) ভাঁরু দেওয়া, সর্ব্বদার কার্য্য নাম জপ—কবিরের 'শোয়ত আঁচায়ত রাম' মনে রাখ, আর মনে রাখ "রাম বল মন বাঁচ যতক্ষণ আন কাজে তোর কাজ কি আছে" সর্ব্বদা মনকে স্মরণ করাইয়া দিয়া নাম জপে লাগিয়া থাকা, কাহারও সঙ্গে কথা কহিবার পূর্ব্বেই তার অনুমতি লওয়া—এই সব প্রথম প্রথম অভ্যাস কর। স্তব স্তুতি যাহা কিছু কর, তিনি তোমার সম্মুখে ভাবিয়া তাঁহাকে শোনাইয়া কর। কোথায় তিনি নাই—ভিতরে আত্মারূপে তিনি, আর বাহিরে সব সাজিয়া তিনি, আবার বিশ্বরূপ ধরিয়া তিনিই দাঁড়াইয়া আছেন এই সমস্ত যেন একবারও ভুল না হয়। তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া কোন কিছুই গলাধঃকরণ করিও না। আহারে শুচি না থাকিলে তাঁর স্মরণে সর্ব্বদা থাকা হইতেই পারে না। জীব হিংসা করিয়া উদর পূরণ করা বড়ই পাপ কর্ম্ম। স্থান বিশেষে জীবহিংসার কথা সেই রুধিরপ্রিয়া বলিতেছেন বলিয়া কেহ কেহ করিয়া থাকেন কিন্তু তিনিই ভক্তমুখে বলিতেছেন "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" ইত্যাদি এরূপ স্থলে রুচিভেদে ব্যবস্থা।

সৎসঙ্গে তাঁহার কথা শ্রবণ করা উচিত—সৎগ্রন্থও পাঠ করা উচিত। সৎ সঙ্গ ও সৎ গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার ভাবনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সর্ব্বদার কর্ম নাম জপ ত বটেই কিন্তু তিনি কিরূপ ভাবে জগতে আছেন তাহার ভাবনা করাও নিতান্ত আবশ্যক।

(৪) ভাবনা কর "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

আমি অদৃশ্য হইনা কার কাছে ? যে আমাকে সর্ব্বভূতে দেখে আবার আমার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দেখে তার কাছে। পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকলের মধ্যে সর্ব্বভূতে তুমি আবার তোমার মধ্যে যা কিছু ইহার ভাবনা করা অতীব প্রয়োজনীয়।

এই সব নিয়ম করিয়া অভ্যাস করিলে চিত্তশুদ্ধি অবশ্যই হইবে; সর্ব্বত্রই যখন তুমি আর তোমার মধ্যে আমি তুমি জীব জন্তু আকাশ পাতাল যখন সমস্তই, তখন রাগ দ্বেষ করিবে কাহার উপর তাই বল ? জীব হিংসা করিবে কেমন করিয়া তাই বল ?

নববর্ষ ধরিয়া এইভাবে চলিতে যিনি অভ্যাস করিবেন তিনি আর স্মরণ ভুলে মরণে পরিবেন না। তাঁহার আজ্ঞা পালনে চেষ্টা করা ভিন্ন নরনারীর শুভ কিছুতেই হইতে পারে না।

তিনি সব সাজিয়া সব করিতেছেন ভাল করিয়া বুঝিয়া সর্ব্বদা ভাবনা করিতে চেষ্টা কর, দেখিবে আপনা হইতে ভাবিতে ইচ্ছা হইবে তবে আমি কে। সত্য —সত্যই আমিটা ভুল। এটা নাই। যত গোলমাল ভুল লইয়া। ভুল ভাঙ্গিলে দেখিবে ভার দিতে পারিতেছ ভুল আমি নাই। তিনিই দ্রষ্টারূপে সর্ব্বদা আছেন।

—০—

প্রথম আজ্ঞা

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

যেমন বাবাকে মানি কিন্তু বাবার কথা শুনিনা বল্লে বাবাকে মানা হয় না, তেমনি ভগবানকে মানি কিন্তু যথাকালে সন্ধ্যা করিনা একথা বল্লে ভগবানকেই মানা হয় না।

তাঁর প্রথম আজ্ঞা "অহরহঃ সন্ধ্যা মুপাসীত" হে দ্বিজাতিগণ তোমরা নিত্য অহরহ সন্ধ্যা করবে। সত্য সত্যই যিনি ভগবানকে চান তাঁর যথাকালে সন্ধ্যা উপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যে দ্বিজাতি সন্ধ্যা করে না বিশেষ ব্রাহ্মণ—

"স জীবন্নেব শূদ্রঃ স্যান্মৃতে শ্বাচাভিজায়তে"

সে জীবিত কালে শূদ্র হয় এবং জীবনান্তে কুকুর হয়ে থাকে। এই জন্য দ্বিজাতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য যথাকালে সন্ধ্যা করা। যিনি সন্ধ্যা না করেন তাঁর সূর্য্য হত্যার পাপ হয়।

'মন্দেহা' নামক সাড়ে তিন কোটি রাক্ষস সকালে সন্ধ্যায় এবং মধ্যাহ্নে সূর্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে, গায়ত্রীর দ্বারা অভিমন্ত্রিত জল ত্রিসন্ধ্যায় ঊর্দ্ধদিকে ক্ষেপণ কর্‌লে তারা শান্ত হয়, যে না করে তার সূর্য্য হত্যার পাপ হয়।

ঐ সূর্য্য প্রাণরূপে চক্ষুরূপে দেহে অবস্থান করেন। যথাকালে সন্ধ্যা না করলে দেহের অস্থির মধ্যে ভূত প্রেত থাকে ; এবং নাড়ীতে পিশাচ ও রাক্ষসেরা থাকে তারা জ্ঞানসূর্য্যকে খেয়ে ফেলে।

যথাকালে সন্ধ্যা না করলে প্রাণ বিকৃত হয়, চোখ খারাপ হয়। দৃষ্টি শক্তি কমে যায়। রক্তের চাপ বৃদ্ধি, 'হার্টের প্যালপিটিসন্', বায়ুবৃদ্ধি বায়ুরোগ উন্মাদ দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগগুলি জন্মায়—যথাকালে সন্ধ্যা না করার ফলে।

যিনি যথা কালে সন্ধ্যা করেন তাঁর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যায়, তিনি সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করে থাকেন।

হৃদাকাশের জীবাত্মা বাইরে সূর্য্যরূপে অবস্থান কর্‌ছেন। যথাকালে সন্ধ্যা না করলে আত্মহত্যা করা হয়।

"দিন রাত্রে অজ্ঞানকৃত পাপ ত্রিকালে সন্ধ্যা করলে নষ্ট হয়ে যায়।"

"সকল অবস্থাতে যে বিপ্র সন্ধ্যা করেন তিনি ব্রাহ্মণত্ব থেকে চ্যুত হন না। আগামী জন্মে ব্রাহ্মণ হন।"

যিনি যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যা করেন তিনি তেজে ও তপস্যায় সূর্য্যের সমান হন।

সন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণ জীবন্মুক্ত, তাঁর পাদপদ্মের ধূলিতে পৃথিবী সদ্য পবিত্রা হন। তাঁর স্পর্শে তীর্থ সকল পবিত্র হয়। গরুড়কে দেখ্‌লে যেমন সাপেরা পালায় তেমনি তাঁর দর্শনে পাপ সকল পলায়ন করে।

যিনি সন্ধ্যা করেন তিনি বিষ্ণুর উপাসনাই করেন। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হন।

ঋষিগণ দীর্ঘ সন্ধ্যা করেন বলে তাঁরা দীর্ঘায়ু হন, যাঁরা সন্ধ্যা করেন তাঁদের পুত্র যশ: কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজ: লাভ হয়।

প্রত্যেক কাজের নির্দ্দিষ্ট সময় আছে। সন্ধ্যা উপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় হল ভোরে সূর্য্য উদয়ের ২৪ মিনিট আগে থেকে ২৪ মিনিট পর পর্য্যন্ত প্রাত: সন্ধ্যার মুখ্যকাল, মধ্যাহ্ন সময়ে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার মুখ্য কাল, এবং সূর্য্যাস্তের ২৪ মিনিট আগে থেকে ২৪ মিনিট পর পর্য্যন্ত সায়ং সন্ধ্যার মুখ্য কাল। মুখ্য কালেই সন্ধ্যা উপাসনা করতে হয়। কাল অতীত হলে পাপ হয়, সেই পাপ ক্ষয়ের জন্য দশবার গায়ত্রী জপ করে সন্ধ্যা করবার কথা শাস্ত্র বলেছেন।

প্রায়শ্চিত্তের অর্থ—"নৈতৎ পাপং পুন: করিষ্যামি" আমি আর এমন পাপ

করবো না। নিত্য কাল অতিক্রম করে সন্ধ্যা করার অর্থ শ্রীভগবানকে উপহাস করা।

যথা কালে আহার করলে যেমন পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে আহার্য্য গুলি পাক ক'রে দেহে রস রক্তাদির বৃদ্ধি করত বলাধান করে, তদ্রূপ যথাকালে সন্ধ্যা করলে অশান্ত মন কালের প্রভাবে শান্ত হয় বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়ে আত্মার স্পর্শ লাভে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়, "অহং" "মম" দেহাত্মা বোধ দূর হতে থাকে।

সেজন্য ব্রাহ্মণ আদি বর্ণত্রয়ের দৈনিক সন্ধ্যা এবং শূদ্রগণের তান্ত্রিক সন্ধ্যা অথবা গুরুদত্ত উপাসনা যথাকালে করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁরা যথাকালে সন্ধ্যা উপাসনা করেন না তাঁদের শ্রীভগবানকে শ্রীগুরুদেবকে উপেক্ষা করা হয়। হৃদয়ের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করে তাঁদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। ভোরে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে শ্রীভগবান হৃদয়ে নিত্য আবির্ভূত হন সেই জন্য নরনারী সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কথিত তিনটি সময়ের পূর্ব্ব হতে দর্শন আশায় প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করা। অপেক্ষা কর্‌তে কর্‌তে তাঁর কৃপায় প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হয় তিনি নিত্য ত্রিকালে আসেন; এসে যদি দেখেন তাঁর সেবক অন্য কর্ম্মে রত হয়ে আছে তখন ফিরে যান। মানুষ পরমানন্দময় শ্রীভগবানের স্পর্শে বঞ্চিত হয়, যিনি ত্রিকালে পরমানন্দময়ের স্পর্শ লাভ করতে পারেন তিনি অতি সত্বর আনন্দরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রিয়তম পথিক তুমি কি সত্যই শান্তি চাও শ্রীভগবানকে চাও তবে যথা-কালে উপাসনা কর শ্রীভগবানের প্রথম আজ্ঞা লঙ্ঘন করে অপরাধী হয়ো না। যথাকালে সন্ধ্যা উপাসনার ফল অসীম। করে দেখ কত আনন্দ পাবে।

মিত ভোজন পূর্ব্বক যিনি ছয়মাস কাল ভোরে এবং সন্ধ্যায় নিয়মিত উপাসনা করেন তিনি জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হন।

সাধারণ মানব ত দূরের কথা—শ্রীভগবান রামচন্দ্র এবং অন্যান্য সমস্ত ঋষিগণ নিত্য যথাকালে উপাসনা কর্‌তেন। শ্রীভগবান রামচন্দ্র যখন শ্রীবিশ্বামিত্র ঋষির সঙ্গে যজ্ঞরক্ষা করতে যান তখন শ্রীবিশ্বামিত্র বলছেন—

কৌশল্যাসুপ্রজা রাম পূর্ব্বা সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে।
উত্তিষ্ঠ নরশার্দ্দূল কর্ত্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্ ॥২॥

—বালকাণ্ড ২৩ সর্গ

হে নরশার্দ্দূল, এ সময় পূর্ব্ব সন্ধ্যা উপস্থিত হয়েছে, অতএব উঠ এবং আহ্নিক কর্ম্ম কর।

বালকাণ্ড ৩৫ অধ্যায়—

"সুপ্রভাতা নিশা রাম পূর্ব্বা সন্ধ্যা প্রবর্ত্ততে।"

হে রাম, রাত্রি অবসান হয়েছে, পূর্ব্বকালীন সন্ধ্যা বিদ্যমান, অতএব উঠো, তোমার কল্যাণ হোক, এখন যাবার জন্য প্রস্তুত হও। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীবিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বাহ্ন-কালিক কর্ম্ম করত যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শ্রীভগবান রামচন্দ্র এইরূপ নিত্য যথাকালে সন্ধ্যা করতেন। বনবাস কালেও তিনি যথাকালে উপাসনায় বিরত হন নাই।

সীতা হরণের পর সীতা শোকে আকুল হয়েও যথা সময়ে সন্ধ্যা ত্যাগ করেন নাই। ঠিক নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যা করেছেন।

উত্তর কাণ্ডে ৮২ সর্গে শ্রীঅগস্ত্যমুনি বলছেন—

সন্ধ্যামুপাসিতুং বীর সময় হ্যতি বর্ত্ততে।
রবিরস্তংগতো রাম গচ্ছোদক মুপস্পৃশ ॥২২

হে বীর, অধুনা সন্ধ্যা বন্দনার সময় হয়েছে, সকলে সূর্য্যের উপাসনা করছেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত উপবিষ্ট হয়ে তুমিও সন্ধ্যা কর, কারণ ভগবান সূর্য্য অস্তাচলে গমন করেছেন, তুমিও জলস্পর্শ কর।

তখন শ্রীরামচন্দ্র অপ্সরাগণ সেবিত সরোবরে সন্ধ্যা উপাসনা করতে গেলেন। সায়ং সন্ধ্যান্তে পুনরায় তিনি শ্রীঅগস্ত্যমুনির নিকট উপস্থিত হলেন।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীযুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই যথাকালে সন্ধ্যা উপাসনা কর্‌তেন।

তাঁরা যখন সন্ধ্যা করে গেছেন তখন অন্যের কথা কি বলা যেতে পারে।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও মাতৃগণ সকলেরই যথাকালে সন্ধ্যা উপাসনা করা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা উপাসনা না করা মহা অপরাধ। যথাকালে সন্ধ্যা না কর্‌লে আত্মহত্যার পাপ হয়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যেমন সন্ধ্যা করা অবশ্য কর্ত্তব্য তেমনি শূদ্রগণেরও কর্ত্তব্য।

যাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ শূদ্রাচার পালন ক'রে ইহলোক পরলোকে পরমানন্দ লাভ করে গেছেন, অধুনা সেই বংশে জাত কেহ কেহ শূদ্র বর্ণকে হেয় জ্ঞান ক'রে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বলে আপনাদের পরিচিত কর্‌ছেন। **কিন্তু শূদ্র হেয় নন।**

শ্রীভগবানের-যে-চরণ ভক্তের একমাত্র সম্বল, যোগিগণ নির্জ্জনে যুগ যুগান্তর যে চরণ ধ্যান করেন, যে পবিত্র চরণ হতে পতিতপাবনী অধমতারিণী সুর তরঙ্গিণী ভাগিরথী উৎপন্না হয়ে ত্রিলোক পবিত্র করেছেন শূদ্রগণ শ্রীভগবানের সেই শিব বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পরম পাবন চরণ কমল হতে উৎপন্ন হয়েছেন। তাঁরা হেয় নন, তাঁরা পরম পবিত্র, তাঁদেরও কর্ত্তব্য নিত্য যথাকালে উপাসনা করা।

শ্রীরামায়ণে দেখা যায় ব্রাহ্মণ পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর শ্রীভগবান নারদ রামচন্দ্রকে বলছেন্—ত্রেতা যুগে বা দ্বাপর যুগে শূদ্রের তপস্যা অধর্ম্ম—

ভবিষ্যচ্ছূদ্র যোন্যাংহি তপশ্চর্য্যা কলৌ যুগে ॥২৬

—উত্তর কাণ্ড ৭৫ সর্গ

শূদ্রানাং তপশ্চর্য্যা কলিযুগ এব ধর্ম্ম ভবিষ্যতি অস্মিন্ যুগে ত্বধর্ম্ম ॥

—(গোবিন্দরাজীর টীকা)

শূদ্রগণের তপস্যা কলিযুগে ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হবে, এ যুগে অধর্ম্ম।

কলিযুগে শূদ্র তপস্যার অধিকারী শ্রীভগবান বাল্মীকি রামায়ণে বলেছেন।

দেব দ্বিজ গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির পূজা, শুচিতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা শারীরিক তপস্যা। অভয়, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং স্বাধ্যায় বাঙ্ময় তপস্যা।

চিত্তশুদ্ধি, অক্রূরতা মৌন আত্মনিগ্রহ (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) ও ভাবশুদ্ধি সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন অভ্যাস মানস তপস্যা এই ত্রিবিধ তপস্যার অধিকারী শূদ্র।

বিষ্ণু পুরাণে শ্রীভগবান ব্যাসদেব বলেছেন ব্রাহ্মণগণকে আজীবন শাস্ত্র পথে ধর্ম্মানুষ্ঠান করতে হয়—পরাধীনের ন্যায় শাস্ত্রের অনুগামী হয়ে চলতে হয়, এতে বহুতর ক্লেশ স্বীকার করে বহুতর ধর্ম্ম অর্জ্জন করতে পারলে তবে তাঁরা পরকালে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু কেবল দ্বিজাতিগণের সেবার দ্বারাই শূদ্র পাঞ্চ যজ্ঞের অধিকারী হয়—

"নিজান্ জয়তি বৈ লোকান্ শূদ্র ধন্যতরস্ততঃ"

—ষষ্ঠাংশে ২য় অধ্যায়

অন্তিমে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, এই জন্য শূদ্র জাতিকে "সাধু সাধু শূদ্র, ধন্য তুমি" বলেছি, যে হেতু শূদ্রের ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য পেয় বা অপেয় বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। তজ্জন্য এরা কোন পাপের ভাগী হয় না। এই জন্য শূদ্রকে সাধু বলে কীর্ত্তন করেছি।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—

মাংহি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।

স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম ॥ ৯।৩২।

হে পার্থ, যারা নিকৃষ্ট কুলজাত বা নিতান্ত পাপাত্মা, যারা কৃষ্যাদি নিরত বৈশ্য, যারা অধ্যয়ন বিরহিত শূদ্র, এবং স্ত্রীলোক তারাও আমাকে আশ্রয় করলে অত্যুৎকৃষ্ট গতি লাভ করে থাকে।

শ্রীভগবানে সকলের অধিকার আছে ভাষার ভেদ থাকতে পারে (বেদ মন্ত্রে

অধিকার না থাকতে পারে) কিন্তু প্রেমের কোনরূপ স্বাতন্ত্র্য নাই। সকলেই প্রেমের দ্বারা শ্রীভগবানকে বন্দী করতে পারেন। শ্রীভগবান সকলেরই আপন জন, অন্তরতম।

তজ্জন্য মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য যথাকালে উপাসনা করা, তার দ্বারা নিরন্তর স্মরণ করবার সামর্থ্য লাভ হয়ে থাকে।

প্রিয়তম পথিক তুমি! সর্ব্বদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম জপ কর, আর যথাকালে উপাসনা কর।

অত্যন্ত দুষ্টস্য কলেরয়মেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥

রসনা রটুক সদা মধু কৃষ্ণ নাম
জীবন হইবে ধন্য পাবে তার ধাম।

॥ জয় গুরু জয় নাম ॥

—•—

ওঙ্কারনাথ পঞ্চদশী

অথবা

ওঙ্কারনাথ প্রশ্নোত্তর মালিকা

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য]

প্রঃ— শ্রৌতে স্মার্ত্তে ধর্ম্মকৃত্যে বিপন্নে
পাপাচারে প্রাপ্তভূরি প্রচারে।
ধর্ম্মং পাতং কোঽস্য লোকে সযত্নঃ?

উঃ— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।১

বাংলা— বিপন্ন হইল যবে,
শ্রুতি স্মৃতি বিহিত আচার,
পাপের বিস্তার,
ঘিরিয়া ফেলিল চারিধার,
কে বা সেই জন,
এমন সময়ে আজি ধর্মরক্ষা তরে,
যেই জন করেন যতন?

মহাত্মা ওঙ্কারনাথ,
এই সীতারামদাস সেই মহাজন।১

*

প্রঃ— ছিত্বা ভোগং যোগমাস্থায় দীর্ঘং
শাস্ত্রাদিষ্টং বর্ত্তয়ন্ কর্মমার্গম্।
দোষাধারে কঃ কলৌ সিদ্ধিমাপ্তঃ ?

উঃ— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।২

বাংলা— ভোগরাগে করি পরিহার,
দীর্ঘ যোগ করি আলম্বন,
শাস্ত্রের বিহিত মার্গ করিয়া বরণ,
দোষপূর্ণ এই কলিযুগে,
সিদ্ধিলাভ করিলেন কোন মহাজন ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ,
এই সীতারামদাস সেই ধন্যজন।২

*

প্রঃ— নামব্রহ্ম ব্যাপদো মুক্তিহেতুং
কৃত্বা লোকে লব্ধ ভূরি প্রচারম্।
চৈতন্যাভঃ কো ভবক্ষেমকারী ?

উঃ— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।৩

বাংলা— বিপত্তির মুক্তির নিদান
নামব্রহ্ম প্রচারি জগতে,
গৌরাঙ্গের মত কোন্ জন,
সংসারের ক্ষেমরাশি করেন সাধন ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই মহাজন।৩

*

প্রঃ— লোকাতীত প্রেমশক্ত্যা সমিদ্ধঃ
সিদ্ধঃ শ্রদ্ধাশুদ্ধবুদ্ধীনসংখ্যান্।
কৃত্বা শিষ্যান্ কোঽভবল্লোপকর্ত্তা ?

উঃ— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।৪

বাংলা— অলৌকিক প্রেমশক্তি বলে
সমুজ্জ্বল সিদ্ধ কোন্ জন,
শ্রদ্ধায় বিশুদ্ধ বুদ্ধি অসংখ্য মানবে
শিষ্যরূপে করিয়া গ্রহণ,
সংসারের উপকার করেন সাধন ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই মহাজন।৪

*

প্রা:— দুঃখাধারে পাপভারোপচারে
সংসারেঽস্মিন্ কঃ ক্রিয়াবানসারে।
দত্তেঽমন্দানন্দ সারোপদেশং ?

উ:— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।৫

বাংলা— পাপভারে পরিপূর্ণ
দুঃখময় এ অসার সংসার আস্পদে,
ক্রিয়াবান্ কোন্ মহাজন
বিপুল আনন্দ খনি,
সার কথা কবেন বর্ণন ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই জ্ঞানীজন।৫

*

প্র:— কঃ সংস্পর্শাদ্ দিব্য সৌদামিনীবৎ
দেহে কঞ্চিদ্ দিব্যভাবং নিধত্তে।
যস্মাৎ পুণ্যাৎ পদ্ধতিং যান্তি জীবাঃ ?

উ:— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।৬

বাংলা— কেবা দিব্য সৌদামিনী সম
স্পর্শমাত্রে শরীর মাঝারে
কি এক অপূর্ব ভাব করে সঞ্চারণ,
যার ফলে সেই জীবগণ
পুণ্যপথে করয়ে গমন ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই দিব্য জন।৬

*

প্রঃ— কো বা কৃত্বা নিত্যমুগ্রাং তপস্যাং
দেহে কার্শ্যং সম্প্রয়াতঃ প্রভূতম্।
অন্তঃ পুষ্টিং কৃষ্ট বানিষ্টহেতুং ?

উঃ— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।৭

বাংলা— কে বা করি নিত্য উগ্র তপ
বিপুল কৃশতা দেহে করিলা অর্জন,
কিন্তু ইষ্টসিদ্ধির নিদান
লভিলেন পুষ্টি অন্তরের ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই সিদ্ধজন।৭

*

প্রঃ— কো বা বিশ্বং মন্যতে স্থৈর্য্যশূন্যং
স্থৈর্য্যাধারং কেবলং নির্বিকারম্।
দিব্যানন্দং চিন্ময়ং সত্যমীশম্

উঃ— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।

বাংলা— কেবা সেই জ্ঞানী মহাধীর
যে জন সমগ্র বিশ্বে ভাবেন অস্থির,
একমাত্র নিত্য নির্বিকার
দিব্যানন্দ চিন্ময় ঈশ্বরে,
স্থির বলি করেন বিচার ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই গুণাধার।৮

*

প্রঃ— বৈধাচারানাচরন্ন প্রমাদং
কঃ সম্প্রাপ্তো দিব্যভূতিং প্রভূতাম্।
ধত্তে চিত্তে নাভিমানস্য লেশং

উঃ— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ।৯

বাংলা— বৈধাচার অপ্রমাদে করি আচরণ
ভূরি অলৌকিক শক্তি করিয়া অর্জন

লেশমাত্র অভিমান
চিত্তে কেবা না করে ধারণ ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই জ্ঞানী জন ।৯

*

প্র:— দীর্ঘং কালং মৌনবৃত্তিং দধানঃ
মুক্ত কো বা বাক্যজন্মাপরাধাৎ ।
নিত্যং স্থৈর্য্যেণেষ্টচিন্তাং বিধত্তে ?

উঃ— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ ।১০

বাংলা— দীর্ঘকাল মৌন বৃত্তি ধরি
বাক্য অপরাধ হ'তে মুক্ত কোন্ জন,
স্থিরচিত্তে নিরন্তর,
ইষ্টদেবে করেন চিন্তন ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই কৃতীজন ।১০

*

প্র:— কঃ প্রত্যক্ষং বীক্ষতে স্বেষ্টদেবং
কস্তদ্ বাচং মঙ্গলার্থাং শৃণোতি
কো বা যোগক্ষেমমস্মাদ্ বৃণীতে ?

উঃ— সীতারামঃ সোঽয়মোঙ্কারনাথঃ ।১১

বাংলা— নিজ ইষ্টদেবতায়,
কোন্ জন দেখেন সাক্ষাতে,
তাঁহার কল্যাণ ময়,
বাক্য কেবা করেন শ্রবণ,
তাঁহা হতে আর—
যোগক্ষেম করেন বরণ ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই সিদ্ধজন ।১১

*

প্র:— সুপ্রাচীন: কস্তপস্বীব দৃশ্য:
শিষ্যোপাস্য: শীর্ণকায়: সতেজা:।
হাস্যোৎফুল্লো ব্যাজ কোপী চ কালে

উ:— সীতারাম: সোঽয়মোঙ্কারনাথ:।১২

বাংলা— আকারে দেখিতে কেবা
পুরাতন তপস্বীর মত,
তেজোদীপ্ত শীর্ণ কলেবর,
ভক্তিমান্ শিষ্যের অর্চিত,
সুপ্রসন্ন সহাস্য বদন,
কালক্রমে ছল করি কুপিত আবার?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই গুণাধার।১২

*

প্র:— ক: পূতাত্মা দিব্যশক্তিং দধান:
সংখ্যাতীতৈ বর্ণ্যতে ভক্তিপূর্বম্।
কো বাতীতো দুষ্টকালপ্রভাবং

উ:— সীতারাম: সোঽয়মোঙ্কারনাথ:।১৩

বাংলা— কেবা সেই পূতচিত্ত দিব্যশক্তিধর,
যার কথা অসংখ্য মানব, ভক্তিভরে করিছে বর্ণন,
কে বা দুষ্ট কালের প্রভাব
করিয়াছে অতিক্রম দিব্যশক্তিবলে?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ, এই সীতারামদাস সেই কৃতীজন।১৩

*

প্র:— কো নির্বৈরো বিশ্বমৈত্রীবিচিত্র:
ক: সংসারে সৎপথস্যোপদেষ্টা।
কো বা বন্দ্য: কো গুরু: ক্ষেমদাতা?

উ:— সীতারাম: সোঽয়মোঙ্কারনাথ:।১৪

বাংলা— বৈরশূন্য বিশ্ববন্ধু কেবা,
কে বা এ সংসারে
সাধুমার্গ করে উপদেশ,

বন্দনীয় কেবা ভবে,
কেবা গুরু মঙ্গল নিদান ?
মহাত্মা ওঙ্কারনাথ
এই সীতারামদাস সেই গুণবান্ ।১৪

—০—

॥ উপসংহার ॥

ভজত মনুজসঙ্ঘা দেবমোঙ্কারনাথং
জনয়ত নিজবীর্য্যং পাবনাধ্যাত্মমার্গে।
ত্যজত চরিতদোষং তৎ পবিত্রোপদেশাৎ
চিনুত কুশলধারাং পূতকৃত্যানুগত্যা।১৫

বাংলা— দেবতা ওঙ্কারনাথে, নরগণ! করহ ভজন,
পবিত্র অধ্যাত্মপথে, নিজবীর্য্য করহ অর্জন,
তাহার পবিত্র উপদেশে শীলদোষ করি পরিহার,
আচরণ করি পুণ্যাচার, ক্রমিক কল্যাণরাশি কর অধিকার।১৫

—0—

মঞ্জুল শ্যাম

[শ্রীশক্তিপদ দত্ত, বি-এ]

মঞ্জুল শ্যাম-অঙ্গলহরী
মঞ্জুল বেণু অধরে
নয়নভঙ্গি মঞ্জুল অতি
খঞ্জনা যেন নাচেরে।
মৃদু মঞ্জুল চলনভঙ্গি
জিতকুঞ্জর মরালনিন্দি
রুনু রুনু ঝুনু নূপুর শিঞ্জি
মোহন কুঞ্জে বিহরে।

বালরাখাল নিত্য সঙ্গী
মঞ্জুল বালগোপাল
অটবীমুগ্ধ চারু বনমালী
লুব্ধ ছায়ালু তমাল।
যমুনাকূল-প্রিয় শ্যামল
মঞ্জুমাধবীপ্রিয় মঞ্জুল
মধুমালতীকুঞ্জ-মধুপ
মুরলী বাজে সুস্বরে।
শ্যামলতমালরুচি শ্রীঅঙ্গ
নয়ন সুচির চাহে রে।

—০—

যোগীশ্বর শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ স্বামী

(শ্রীশ্রীমতিলাল ঠাকুর)

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্-এ]

ওঁ চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পরমারাধ্য পরমপূজ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ স্বামীজী শ্রীশ্রীমতিলাল ঠাকুর পরমগুরুমহারাজের জীবনবেদ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে যাঁহারা এই লেখার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন এবং যাঁহারা ইহার পাঠক হইবেন তাঁহাদের অন্তর-দেবতার চরণপ্রান্তে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি ও আমার হৃদয়দেবতা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমালিঙ্গন জানাই।

উনবিংশ শতাব্দী ভারতের আধ্যাত্মিক জগতে আনিয়াছিল এক মাহেন্দ্রক্ষণ। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়াও এ সময়ে ভারতবর্ষে অসংখ্য ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের আবির্ভাব অবনত ভারতভূমির এক মহাযুগের সূচনা করিয়াছিল। যোগাবতার যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় এই যুগের দিক্‌পাল মহাপুরুষ—যিনি বহুদিনের অনভ্যস্ত যোগসাধনাকে পুনর্ব্বার ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আজ আমরা যে মহাপুরুষের কথা বলিতে বসিয়াছি, তিনি যোগিরাজেরই প্রশিষ্য, তাঁহারই প্রকাশের বিশিষ্ট শক্তি। শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন অমিততেজস্বী মহাযোগী শ্রীরামপুরনিবাসী শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরগিরিজী মহারাজ। এই গিরিজী মহারাজেরই প্রথম জীবনের প্রধানতম শিষ্য শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ স্বামী শ্রীমৎ শ্রীশ্রীমতিলাল ঠাকুর।

প্রেমাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের সংসারাশ্রমের নাম ছিল শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁহার পিতা ছিলেন ৺যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। বাংলা ১২৭৩ সালের ১৫ই পৌষ অগ্রহায়ণী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীরামপুরের চাতরা গ্রামে হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য আবির্ভাব। মানবকল্যাণের জন্য—সমগ্র মানবচেতনাকে ঊর্দ্ধমানসিক জ্যোতির্ম্ময় লোকে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে। তাহারই এক অনির্ব্বচনীয় লীলামাধুর্য্য শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণাঘন ব্যবহারিক জীবনে মূর্ত্ত হইয়াছিল। অহেতুক কৃপার উৎস শ্রীশ্রীঠাকুরের নয়ন দুইটী হইতে নিয়ত ক্ষরিত হইত স্নিগ্ধ সুষমার অনুপম এক শান্তিধারা, তাঁহার দৃষ্টির সুস্মিত জ্যোতি সচকিত

করিত সর্ব্ববিধ আড়ষ্টতা ও জড়তাকে, উজ্জীবিত করিত ক্লান্তির হতশ্রীকে, উল্লাসে উচ্ছ্বসিত করিত চেতনার গহন দিগন্তকে।

বাল্যকালেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উপনয়নসংস্কার হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর করণীয় কর্ত্তব্য তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই সমাধা করিতেন। প্রথম যৌবনেই তাঁহার সাধুসঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মে। এই সময়ে একবার শ্রীরামপুরের কয়েকজন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি এবং তদীয় বন্ধুদের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে আসেন।

যৌবনেই কর্ম্ম উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রহ্মদেশে গমন করেন এবং সেখানে ফুঙ্গী সাধুদের সঙ্গলাভ করেন। এই সময়েই অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার প্রবল আগ্রহ জন্মে। পরবর্ত্তী জীবনে বিশেষ করিয়া শিখ এবং থিয়োসফিষ্ট্ সম্প্রদায়ের সংগে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি খিদিরপুর পোর্ট্ কমিশনারের ডক্ কন্‌ষ্ট্রাক্‌শন এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

বাংলা ১৩০৩ সালে হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুত্রবিয়োগে তাঁহার চিত্ত গভীর বিষাদ ও বৈরাগ্যে আচ্ছন্ন হয়। এই সময়ের কথা তাঁহার নিজের ভাষাতেই বলি :—

"আজ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা (মনে হইতেছে যেন সেদিন)—আমার চিত্ত তখন সংসাররঙ্গমঞ্চে মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হওয়ায় বেশ আমোদপ্রমোদে হেসে খেলে দিন কাটাইতেছিলাম। হঠাৎ কিন্তু ইহার মধ্য হইতে একটা ধাক্কা এমন জোরে মনোমধ্যে আঘাত করিল, যে তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে মরমের অন্তস্তলে দিবানিশি একটা ব্যথা জাগিয়া রহিল। বিষাদের কালিমা চিত্তপটে অঙ্কিত হয়ে সদাই বিষাদিত, শোকার্ত্ত হইয়া কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না, জীবনটা যেন দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার আগারস্বরূপ বোধ হইতেছিল, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সাধুসজ্জন কত সান্ত্বনা দিতেছে, কিন্তু সমস্তই যেন সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে গঞ্জনা হইয়া হৃদয়ের ব্যথা বৃদ্ধি করিতেছে।"

এই সময়ে তাঁহার পরম হিতৈষী বন্ধু ৺দুর্গাচরণ বসু মহাশয় তাঁহার আকুলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরগিরিজী মহারাজের নিকট লইয়া যান। ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসের এক শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় গুরুশিষ্যের প্রথম মিলন সংঘটিত হয়। পরদিন প্রত্যূষে শ্রীশ্রীঠাকুর দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই মিলনই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে রূপায়িত করে তাঁহার ভবিষ্যতের বিরাট্ সম্ভাবনা। এই অপার্থিব মিলনের কাহিনী আমরা তাঁহার লেখা হইতেই উদ্ধৃত করি :—

"যোগাসনে বসি মহর্ষি প্রেমালিঙ্গন করিয়া আমার হৃদয়মন্দিরে যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়া নির্দ্ধূতকল্মষ করিয়া অন্তরের বাহিরের মল পোড়াইয়া খাঁটি করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন আজও সেই জ্ঞানজ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময়রূপে জ্বলিতেছে দিবানিশি। সংসারসাগরের পরপারের নিত্যলীলাধাম দেখাইয়া, হৃদয়রাজ্যের ধ্রুবতারা লক্ষ্য করাইয়া, ভক্তিপ্রেমের নাম ও নামীকে শুনাইয়া ও দেখাইয়া এমন দৃঢ়ভাবে ও তেজের সহিত হাল কর্ষণ করিয়াছিলেন, যে মুহূর্ত্তমধ্যেতে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মবীজ দগ্ধ হইয়া যেন নবজীবনগঠনের সমস্ত বীজ বপন করিয়া দিয়াছিলেন।—সেই দিনটী আমার জীবনের পুণ্যদিন, সেই দিনের প্রভাত সুপ্রভাত; চিরদিনের বহুজন্মের কর্ম্মবন্ধন, অজ্ঞান-তিমিরাঞ্জনপুরী হইতে লৌহসম কঠিন বিষয়শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া শুক্লাম্বরপরিধৃত শশিবর্ণসম শীতল ও সূর্য্যকোটীসমুজ্জ্বল একটী বস্তু প্রকাশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজাপদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন যে আজও সেই মহাপুরুষের দান, সমানভাবে ও রূপে বর্ত্তমান।" দীক্ষাপ্রাপ্তির ঠিক পরমুহূর্ত্তের বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিয়াছেন :—"আমি তৎক্ষণাৎ যেন একটা নূতন জন্ম গ্রহণ করিলাম। বহুক্ষণ ধরে আমি যে জগৎ দর্শন কবিতে লাগিলাম তাহাতে আমার মন একেবারে স্পন্দহীন, নিশ্চল হইয়া যে কতক্ষণ ছিলাম তাহা আমি কিছুই জানিনা।" কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীগি'ৰজী মহারাজেব আহ্বানে তাঁহাব বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে শ্রীগুরুদেব ব[illegible]লে "যে চৈতন্যমণ্ডল দর্শন করিলেন উহাকেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম কহে। সহস্রদল কমল মধ্যে ঐ পাদপদ্ম বিরাজিত।"

সারাটী জীবন শ্রীশ্রীঠাকুর অতিবাহিত করিয়াছেন অসংখ্য সাধার[illegible] লোকের মধ্যে ক্রিয়াযোগ প্রচারে—তাহারা প্রথমে তাঁহাকে বুঝিতে চায় [illegible] আদর করে নাই। তথাপি এই দুর্ব্বল, অক্ষম এবং দরিদ্রদের প্রতি তাঁহাব [illegible] অপরিসীম প্রেম! যাহারা বোদ্ধা, যাহারা আগ্রহশীল, যাহাদের পরিবেশ উন্নত, তাহাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করা তো সহজ। কিন্তু কেহই যেখানে বোঝে না, কেহই যেখানে বাহবা দেয়না, সমাদর করে না, সেখানে তাহাদের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গেই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা।

অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত জনসাধারণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের করুণা অপরিসীম হইলেও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও ক্রিয়াযোগ এবং শ্রীগুরুতত্ত্ব প্রচারের জন্য সৎসঙ্গ ও সাধুসভার তিনিই ছিলেন প্রথম সংগঠনকারী। বাংলা ১৩০৬ সালের ৯ই চৈত্র সৎসঙ্গের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার উদ্দেশ্য হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মহৎ প্রচেষ্টার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে :—এই সভা সম্পদ্

বিপদে পরস্পরে অন্তরের সহিত সাহায্যকরণ, ক্ষুদ্রচিত্ততার মূল সংস্কারাদি বিনাশ দ্বারা চিত্তের মহত্ত্ব সম্পাদনার্থ পাথেয় ও সঙ্গী আদি দিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত তীর্থ-ভ্রমণের সুবন্দোবস্ত করণ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, দর্শন, ও যোগশাস্ত্রাদির প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক সার্ব্বভৌমিক সামাজিক উন্নতি ও বিষ্ণুপ্রীতি সম্বর্দ্ধনা দ্বারা যথার্থ রাজকীয় জাতি প্রস্তুত জন্য সংস্থাপিত।" সাধুসভারও অধিবেশনপুস্তিকায় তাঁহার উদ্দেশ্য এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে :—

"আহার বস্ত্র ঔষধাদির দ্বারা সাধুগণের আধিভৌতিক দুঃখ—ক্ষুৎপিপাসা শীতোষ্ণাদি ও তদ্দ্বেষম্যোদ্ভূত পীড়াসমূহের উপশমকরণ ও প্রিয় হিতকর জ্ঞানোপদেশাদি দ্বারা ঐ সকলের উৎপত্তিস্থল আধিদৈব দুঃখ ঘৃণালজ্জাভয়শোকাদি পাশাষ্টক ও নানাপ্রকার সংশয় প্রভৃতি ছেদকরণ.এবং বিষ্ণুপ্রেমে বিগলিত হইয়া হৃদয়গ্রন্থিভেদপূর্ব্বক আপন অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ উক্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের মূলস্বরূপ আধ্যাত্মিক দুঃখ নিরাকরণ দ্বারা শান্তিপদে অধিষ্ঠান জন্য প্রতিষ্ঠিত।"

১৩০৯ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীরামপুরে "ভক্তাশ্রম" স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বে একদিন তিনি যখন চাতরা হইতে শ্রীরামপুর ষ্টেশনের দিকে কলিকাতার কার্য্যস্থান উদ্দশ্যে যাইতেছিলেন, তখন পথে একজন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তিনি অন্তরে দৈববাণী প্রাপ্ত হন, "জীব সেবাই ঈশ্বর সেবা"। এই লোকটিকে তিনি নিজ আলয়ে লইয়া আসেন এবং বহু যত্নে শুশ্রূষাদি করিয়া তাহাকে পুনর্জ্জীবন দান করেন। এই সেবাবুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি শ্রীরামপুরে "ভক্তাশ্রম" স্থাপন করেন। পরে শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়ের করুণায় ও দিব্যাশ্রয়ে সন ১৩২৫ সালে চাতরায় বর্ত্তমান "শ্রীগুরুধাম" স্থাপিত হয় মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও চব্বিশপরগণা জেলার বিভিন্ন গ্রামে শ্রীগুরুধামের অসংখ্য এবং ক্রমবর্দ্ধমান শাখা শ্রীশ্রীঠাকুরের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীমনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য পুস্তিকার মধ্যে সবগুলি এখনও প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু "শ্রীগুরুতত্ত্ব", "যুগ-পরিবর্ত্তন ও জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব" প্রভৃতি পুস্তিকায় আমরা এই দেবমানবের লোকাতিশায়ী সাধনার পরিচয় পাই। সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে তাঁহার বাণীগুলি আমাদের এক জ্যোতির্ম্ময় লোকের লোকের সন্ধান দেয়। তাঁহার মতে "বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিত, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, মনে-প্রাণে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কৃষি, শিল্পে, বাণিজ্যে প্রত্যেক বিভাগেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন হইলেই প্রকৃত শান্তি স্থাপন হইবে।" তাঁহার সর্ব্বভূতে সমভাব, প্রকৃত

বৈষ্ণবের আচার পালন, শিষ্যমণ্ডলীর প্রতি অপার করুণা, মৈত্রী ও ক্ষমাশীলতা, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য এষণা সৃষ্টি এবং পথপ্রদর্শন, সর্ব্বোপরি তাঁহার অপরিসীম গুরুভক্তি চিরদিন নিখিল মানবের অন্তর্লোকে নবচেতনার জন্মদান করিবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার মহিমা বর্ণনার শক্তি আমার নাই, তাই তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা আমাদের নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার লেখা হইতেই যৎসামান্য উদ্ধৃতির সাহায্যে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবারই চেষ্টা করিতেছি। "শ্রীগুরুতত্ত্ব" পুস্তিকার একেবারে শেষাংশে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছেন :—

"গুরুকৃপা লাভ করিয়া আত্মচৈতন্যযুক্ত হইয়া শান্তভাবে ভবপারে যাইবার (উদ্ধার হইবার) জন্য, নামের ভেলায় চড়িতে শিক্ষা করিতে হইবেক। সর্ব্বান্তর্য্যামী—সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বকারণ-কারণ প্রাণগোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ, শ্রীগুরুর উপদেশ মত নাম-চিন্তামণিকে মণিপুরে সাধন করিয়া, সর্ব্বদা সচৈতন্য থাকিয়া জগৎগুরু শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর রাধানামের আহ্বানে, মন-প্রাণকে বিমোহিত করিয়া পরম-পবিত্র নাম-ব্রহ্মকে জাগাইয়া রাখিতে হইবেক। জীব! তবে তোমার মন-প্রাণ কৃষ্ণনাম অর্থাৎ রাধানাম জপিতে জপিতে, সেই রাধাই আরাধ্য কৃষ্ণরূপ, প্রেমময় প্রেমরূপ দর্শন, স্পর্শনে, পুরুষ প্রকৃতির (অপ্রাকৃত) পবিত্র মিলনে আত্মহারা ও বিমোহিত হইবেক। তবেই তোমার নামৈব কেবলং শান্তং শুদ্ধং নির্ম্মলং (নামনামী-অভেদং) 'কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা, মহাবাক্য সার্থক হইবেক।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহনীয় জীবন দর্শন সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। বারান্তরে সে ইচ্ছা রহিল। নিম্নোদ্ধৃত অংশে করুণাময় জগদীশ্বরের নিকট সারা বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য তাঁহার ব্যাকুল প্রার্থনা এবং নিখিল জগদ্বাসীকে ঈশ্বরপরায়ণতার জন্য তাঁহার সুমধুর উদাত্ত আহ্বান আমাদের দিব্যচেতনা লাভের পথে আশার আলোকবর্ত্তিকা :—

"হে বিশ্বগুরু করুণাবতার দেব মানবের পরিত্রাতা! দিব্যকান্তিবিশিষ্ট পূর্ণ জ্যোতিষ্মান্ মূর্ত্তিতে আর্ত্তক্লিষ্ট শ্রীভ্রষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিদ্বেষতাপে জর্জ্জরিত বসুন্ধরায় আবির্ভূত হও। ধর্ম্মের উজ্জ্বল দিব্য সৌম্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া জাতির বর্ণের ও ধর্ম্মের কুসংস্কারকে প্রশমিত করিয়া বিধির বিধানানুসারে মিলনপন্থা ও শান্তিরাজ্য স্থাপনের সুব্যবস্থা কর। হে জগদ্‌গুরু, স্বামিন্! হে মহিমময়! তোমার চরণাশ্রিত ভক্তগণ তোমার শুভাগমনের আশাপথ

চাহিয়া আছে। হে চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর শ্রীচৈতন্য অবতার! হে চক্রধারী, তোমার চক্রে বিদ্ধ করিয়া জগদ্‌বাসীকে ঈশ্বরপরায়ণ করিয়া মিলনপন্থা দেখাইয়া দাও! এস, প্রভু এস! হে গুরু! তোমাকে নমস্কার, বার বার নমস্কার, সহস্র সহস্র নমস্কার।

হে জগদ্বাসী, এস সকলে এক মনে, এক তানে, এক প্রাণে, সমস্বরে প্রেমময়, শান্তিময় জগদ্‌গুরুকে আহ্বান করি।

আমাদের জীবন ঈশ্বরপরায়ণ হউক।

হৃদয়ে এক ঈশ্বরপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত হউক।

জগৎ ধর্মের মিলনমন্দির হউক ॥

("যুগ-পরিবর্ত্তন ও জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব")

১৩৫১ সালের ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এবং ১৩৫২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পূজনীয় শ্রীশ্রীঠাকুর যখন মেদিনীপুর ও হুগলীর বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরিতেছিলেন, তখন তিনি কয়েকবারই বিভিন্নস্থানে বলিয়াছিলেন—"এ দেহ আর আসিবে না"। মহাসমাধির পনের দিন পূর্ব্বে আদেশ দেন—"আমার দেহান্ত রাত্রিতে হইবে; কিন্তু আমাকে মৃতবৎ জ্ঞান করিবে না। কলিকাতা ও উপকণ্ঠস্থ সমস্ত ভক্তমণ্ডলীকে সংবাদ দিবে। তাহারা যেন পুষ্প ও সুগন্ধদ্রব্যাদি লইয়া আসে।" মহাসমাধির পূর্ব্বে তিনদিন প্রায় সবসময় যোগাসনে আসীন ছিলেন। মহাসমাধির দিন দ্বিপ্রহরে বার্লি পান করিবার সময় তাহা গ্রহণ করিতে অক্ষম হন। বলেন "এইমাত্র গ্রহণশক্তি চলিয়া গেল।" অপরাহ্ণে কিড্‌নির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর পূর্ণজ্ঞানে যোগাসনে আসীন ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয়ের আরতিতে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইতে বলেন এবং ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হন। (২৩শে আশ্বিন, ১৩৫২) রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে যোগাসনে বসিয়া মহাসমাধিতে লীন হন।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!

—০—

নাসিক কুম্ভে নাম প্রচার

[শ্রীগোবিন্দদাস কিঙ্কর]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের বেরিয়ে যাবার পর তিনি খুব দুঃখ কচ্ছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে প্রস্তুত হতে বললেন—মুখাবয়বে অপূর্ব্ব এক মিষ্টি আপন ভাব এনে। "ভোগ তৈরি, বড় কষ্ট আজ আমি আপনাদের দিলাম—শীঘ্র তৈরি হোন প্রসাদ পাবেন"।

আজ প্রসাদ সাধুদের পঙ্গতে বসেই পেলাম। মোহান্তজীকে একটু ব্যস্ত মনে হলো। পাতা দিয়ে, গুরুপরম্পরা উল্লেখ করে জয় দেবার পর সাধুদের প্রসাদ গ্রহণ করা আরম্ভ হলেই চলে গেলেন। বহিরাগত আগ্রহী বৈষ্ণব সাধুদের কেউ কেউ সেবাবোধে ভোগ রান্না করলেন—কেউ কেউ করলেন পরিবেশন—আবার কেউ কেউ বাসন পত্র মেজে দিয়ে যায়গা পরিষ্কার করে দিয়ে যে যাঁর রাস্তা দেখলেন। মোহান্তজীর আবাহনও নেই বিসর্জ্জনও নেই, অথচ নিখুঁত ভাবে কাজ সব চলে যাচ্ছে।

যাক্—গোদাবরীতে হাতমুখ ধুয়ে এসে সবে মাত্র আমরা আমাদের ভিজে কম্বলে বসেছি—অমনি মোহান্তজী এসে একটু অপ্রতিভ হয়ে বলতে লাগলেন "আজ রামানন্দী সম্প্রদায়ের জলুস বেরিয়েছে—আমাদের সকলের যোগদানের নিমন্ত্রণ আগেই ছিল—আপনাদের বলতে ভুলে গেছি—এখন আপনারা কি বেরোতে পারবেন?

"পারবো, তাই করতে তো এসেছি—তবে আমাদের প্রণবধ্বজ নিশান, এবং নাম বজায় যদি থাকে তবেই যেতে পারি।" তিনি—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওসব নিতে কে বারণ করবে! চলুন—আমিও সঙ্গে থাকবো।"

বিশ্রামকে বিশ্রাম দিয়ে আমরা সাজ সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়েই দেখি জলুস (শোভাযাত্রা) কাছেই এসে গেছে। সামনে ব্যাণ্ডবাদ্য তৎপর ছয়টী গগনচুম্বী নিশান তারপর কীর্ত্তনমণ্ডলী, এর পর কয়েকটী হাতি পৃষ্ঠে বিশিষ্ট মহাপুরুষেরা তৎপশ্চাৎ পদাতিক সাধু বাহিনী কেউ কেউ নেচে নেচে নানারকম কসরত দেখিয়ে চলছেন, কেউ কেউ আবার, গোপীভাব নিয়ে হবে বোধ হয়, মাতৃবেশে নৃত্য করতে করতে চলছেন, কেউ কেউ আবার তলোয়ার

খেলা, লাঠি খেলা দেখাচ্ছেন। শোভাযাত্রা পরিচালনকারী পুলিশ অফিসার ও প্রচুর কনেষ্টবল সঙ্গে আছেন। পথের দুদিকে স্ত্রীপুরুষের বিরাট দর্শনার্থী জনতা ভিড় করে আছে।

মোহান্তজীর ইংগিতে দর্শনার্থীরা পথ ছেড়ে দিলে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গিয়ে একবারে শোভাযাত্রার পুরোভাগে স্থান নিলাম।

বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, উদাসী প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কুম্ভমেলায় জলুসে বের করবার জন্য নির্দ্দিষ্ট নিশান আছে। নিশান রাখার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, অধিকারী আছে এবং কোন্ শোভাযাত্রায় কতটী নিশান যাবে তাও পূর্ব্ব থেকে স্থির হয়ে থাকে। তদিতর কোনরকম নিশান বা কোন প্রকার প্রতীক প্রভৃতি নেওয়ার অধিকার কারো নেই।

এদিকে আমার ঠাকুরের সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা অতি ঘনিষ্ট ভাব থাকার ফলে, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কোনদিককার বৈশিষ্ট্য কেহ অবিমিশ্র ভাবে ধরে থাকার উপায় বা ইচ্ছা না থাকায় আমাদের প্রতীক ও নিশান গুলির কারো সঙ্গে কোন মিল নেই; তাই রামানন্দ সম্প্রদায়ের নিশানের সঙ্গে আমাদের ওঙ্কাররাজ আর একপিঠে জয়গুরু এবং অপর পিঠে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" নামাঙ্কিত পতাকা দর্শনে জনৈক অধিকারী মহাত্মা বেশ একটু রোষভরেই পতাকাবাহী ভগবানদাসজী ও প্রণবরাজবাহী কুমারনাথজীকে বের করে দেবার জন্য সকোলাহল বেগে এগিয়ে আসতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে আমি তো মনে মনে 'ঠাকুর ঠাকুর' করতে লাগলাম। সঙ্গীদেরও কারো রোষে কারো লজ্জায় মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক হয়ে এসেছে। এরই মধ্যে শ্রীমদ্ দীনবন্ধুদাসজী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে তাঁর সামনে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচয় দিয়ে অতি অল্পকথায় বুঝিয়ে দিলেন যে তিনিই আগ্রহ এবং গর্ব্ব করে আমাদের এ শোভাযাত্রায় এনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে অধিকারী মোহান্ত মহারাজ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে আমাদের হাতযোড় করে বলতে লাগলেন "মাপ করুন, চিনতে তো পারিনি। ঠিক আমাদের নিশানের সঙ্গে পরম পবিত্র আপনাদের প্রণবরাজ এবং পতাকারাজকে নিয়ে চলুন—নাম ধরুন, আর হাতে যা প্রচার পত্র আছে—তার কিছু আমাকেও দিন আমিও বিলি করে দিচ্ছি"।

তবে আমাদের নাম ধরার আগেই শ্রীমদ্ দীনবন্ধুদাসজী আমাদের বড় ঝালটী হাতে নিয়ে নাম ধরলেন "জয় সীয়ারাম জয় জয় হনুমান"। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠে দোহারকী হতে লাগলো আমরাও দোহারকীদের সুরে সুর মিলিয়ে

গাইতে লাগলাম। তবে হারমোনিয়ামধারী সেবানন্দ হরেকৃষ্ণ নাম না হওয়ায় একটু অপ্রসন্ন হয়ে পরে দেশকাল পাত্র বিবেচনা করে আনন্দ সহকারেই "জয় সীয়া রাম জয় জয় হনুমান" গাইতে লাগলো। সহজ নাম—রাগিণীও অতি সহজ—কিন্তু মাধুর্য্য বর্ণনা করতে পারবো না। চারদিকের আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে নামের উচ্চরোল ঘোষিত হতে লাগলো। দর্শনার্থীরাও যোগদান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুপাশ থেকে দুজন ঠাকুরের "জ্বলন্ত আশ্বাস" বিলি করতে লাগলাম। জ্বলন্ত-আশ্বাস যেন দর্শনার্থীদের আরো নামাকৃষ্ট করে তুললো। হরেকৃষ্ণ নাম না হবার ক্ষোভও আর আমাদের রইলো না। একটি উঁচু যায়গায় যখন এলাম তখন পশ্চাৎ ফিরে জলুশের শেষ প্রান্ত দেখার ব্যর্থ প্রয়াস করে আবার নামে মনোনিবেশ করলাম। মোহান্তজীও অত্যন্ত নামপ্রেমী। তাঁর দেহে ক্ষণে ক্ষণে নানারকম ক্রিয়া হতে লাগলো—ক্ষণে ক্ষণে ভাব সমাধিও হতে লাগলো—কখনো বা তাঁর চোখ দিয়ে অবিরত ধারে অশ্রু নির্গত হতে লাগলো—নাম করা আর তাঁর হলোনা। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় জনৈক সঙ্গীসহ তিনি মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। এবার আমরাই "জয় সীয়া রাম জয় জয় হনুমান" নাম চালাতে লাগলাম। এইভাবে নাসিকের ষ্টেশন রোড ধরে শহরের শেষ প্রান্তে এসে জলুশ প্রত্যাবর্ত্তন করতে লাগলো। আমরা অগণিত নর নারীর বিরাট সমাবেশের মাঝখান দিয়ে পূর্ব্বেকার চাইতে কিঞ্চিদ্ দ্রুতবেগে চলতে চলতে চতুঃসম্প্রদায়ের আখড়াও অতিক্রম করে পঞ্চবটীর যেখানে ভগবান রামচন্দ্র কুটীর বেঁধেছিলেন এবং সীতাবিরহের তপ্ত অশ্রুপাতে ধরণীর বক্ষ বিদীর্ণ করে দিয়েছিলেন সেখানে এলাম। এখানে আসার পর জলুশও যেন আর স্থানত্যাগ করতে চায় না। নর্ত্তক, কসরত ওয়ালা, এবং ক্রীড়া প্রদর্শনকারী সকলে তখন আপন আপন কাজ ফেলে দিয়ে নামে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। প্রচণ্ড কীর্ত্তন রোল চলচে তবু যেন একটা থমথমে ভাব। বহুলোক ভাববিহ্বল—কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে এলো অনেকের। নিজেদের অবস্থায়ই বুঝতে পাচ্ছিলাম অজানিতভাবে যেন ভাব আপনা থেকে প্রকট হয়ে উঠছিলো দেহেমনে।

সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় জলুশ অধিকারী জলুশকে চালু করে দিলেন তপোবনের দিকে। আমরা বলে কয়ে এখানেই বিদায় নিলাম। খানিকক্ষণ নাম বন্ধ করে যে যার ভাবে দাঁড়িয়ে বসে থেকে পঞ্চবটীর রামগুহা, সীতাগুহা, এবং উচ্ছিন্ন পঞ্চবটীর স্থান নির্দ্দেশক নতুন বটবৃক্ষটীকে প্রণাম করে, নাসিকের সর্ব্ববৃহৎ দেবালয় পার্শ্ববর্ত্তী রামমন্দিরে গিয়ে নাম করতে লাগলাম। এবার

সেবানন্দ আমাদের হরেকৃষ্ণ নাম ধরলো—সঙ্গে সঙ্গেই জমে উঠলো—একজন অতিবৃদ্ধ সাধু অনেকক্ষণ ধরে নাকি একভাবে মন্দিরে বসেছিলেন—এবার উঠে নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী সহকারে তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগলেন। দর্শকেরাও সহযোগ করতে লাগলেন এবং কাতারে কাতারে এসে একজন একজন করে আমাদের সকলের পায়ে পড়ে প্রণাম করতে লাগলেন। ঠাকুরের কাছ থেকে প্রায় সর্ব্বদা উপদেশ পেয়ে এসেছি স্থাবর জঙ্গম সকলকে প্রণাম করার—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিচারবিহীন হয়ে। কাজেই প্রণাম নেবার আমাদের অধিকারই বা কোথায় আর যোগ্যতাই কোথায়—তাছাড়া এ দেবমন্দিরে। কিন্তু কার কথা কে শোনে? তখন আমরা ওদিকে আর দৃষ্টি না দিয়ে পা গুটিয়ে বসে বসেই নাম করতে লাগলাম আর জলন্ত আশ্বাস বিতরণ করতে লাগলাম। প্রচারার্থে বইগুলি হাতেই থাকে—তা দেখে অনেকেই আগ্রহ করে কিনে নিতে লাগলেন। টাকা পয়সা ফল মিষ্টি কতজনে নিয়ে এসে হাজির করতে লাগলেন। আমরা টাকা পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে ফলমিষ্টি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলকে বিতরণ করে দিতে লাগলাম। মন্দিরের অধিকারীরও দৃষ্টি অলক্ষণেই আমাদের উপর পড়ে গেল। তিনি বার বার বলতে লাগলেন যাতে আমরা রোজ কিছুক্ষণ অন্ততঃ এসে ভগবানকে নাম শুনাই।

রাত ৮টা পর্য্যন্ত নাম করে আমরা স্বস্থানে ফিরে এসে আরত্রিকাদি সেরে মন্দিরের আরতি ও নামে যোগ দিয়ে জলযোগ করে রাত অনুমান ১১॥ শুয়ে পড়লাম।

ঘুম না আসা পর্য্যন্ত নানাকথা ভাবার পর শরীরের কথাটীও মনে হলো। বেরোবার মাসখানেক আগে থেকে গায়ে কোমরে প্রায় নিত্য ব্যথা অনুভব করতাম। একটু আধটু বাতের কৃপা তো বহুদিনের অথচ এই পথশ্রম আর্দ্র ঘর আর্দ্র বিছানায় শুয়েও তো শরীর একেবারে ঝরঝরে বোধ হচ্ছে। ঠাকুরের কৃপার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে গেছে খেয়াল নেই।

৭ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার:

আজ সকালে সকলে স্থির করে বেরিয়েছি—নাম নিয়ে প্রখ্যাতনামা মহাপুরুষদের দর্শন করবো। তাই নীচে রামকুণ্ডতীরে খানিকক্ষণ নাম করে এবং কয়েকখানি পুস্তক বিক্রয় করে প্রথমেই চলে গেলাম শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের দর্শনে, প্রকাণ্ড আশ্রম নাম কৈলাশ আশ্রম, মাইক সহযোগে স্বামীজী যেন ভাষণ দিচ্ছিলেন, তাই ভাষণে বিঘ্নসৃষ্টি না করে পাশেই বিরাট যজ্ঞস্থলে গিয়ে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক খানিকক্ষণ নাম করে এবং সঙ্গে সঙ্গে বই

কিছু বিক্রী করে মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহেশ্বরানন্দজীর ছাউনীতে গিয়ে দেখি ওখানেও ভাষণ হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য তাই আরও একটু এগিয়ে মণ্ডলেশ্বর স্বামী পূর্ণানন্দজী মহারাজ ও স্বামী গোবিন্দানন্দজী মহারাজের ছাউনীতে গেলাম। কিন্তু দর্শন দূর থেকেই করতে হলো এখানেও। ভাষণ বিঘ্ন করে আর ভিতরে প্রবেশ করলাম না। সকালবেলা সর্ব্বত্রই এরকম নিরাশ হ'তে হ'বে ভেবে এপথে ওপথে বেশ কিছু সময় নাম করে রাম-মন্দিরে গিয়ে বসে বসে নাম করতে লাগলাম।

রাম-মন্দিরে ভিড় অসম্ভব, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছাসেবিকা এবং মন্দিরাধিকারীর আমাদের উপর সুদৃষ্টি থাকায় আমাদের যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক সরিয়ে বসার ব্যবস্থা করে দিলেন। অন্যান্য দর্শনার্থীদের বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে দেওয়া হয় না। আবার আমাদের সঙ্গে যাঁরা নামে সহযোগ করেন তাঁদেরকে তাড়ানোও হয় না। পূজারীদের পরিবারের অনেকে এসে নামে যোগ দিলেন। নাম প্রচণ্ডভাবে জমে উঠলো। মন্দিরের দেওয়ালের গাত্রে গাত্রে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে অপরূপ হয়ে উঠ্‌লো। পূজারীরা স্বেচ্ছাসেবকেরা দর্শনার্থীরা আবার অনেকে এসে ধূপ কাঠি জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে লাগলেন। এবার দূর থেকেই প্রায় শতকরা ৯৩।৯৪ জন দর্শনার্থীরা প্রণাম করে করে যেতে লাগলেন পূজারীজেরই অনেককে বইও বিক্রী করে দিতে লাগলেন আবার অভয়বাণীও বিলি করার কাজ হাতে নিয়ে নিলেন।

রোদে রোদে রাস্তায় না ঘুরে এক যায়গায়ই নাম শোনাবার হাজার হাজার লোক পাওয়া যাচ্ছে আবার সব দিক দিয়ে এমন অপ্রত্যাশিত সহযোগ। বিচার করে দেখচি সব ঠাকুর ঠিক ঠিক করেই রেখেছেন রাখছেন অথচ নিমিত্তমাত্র হবার পর্য্যন্ত আমাদের এতটুকু আগ্রহ নেই।

রাম-মন্দির বা রামগুহা, সীতাগুহা থেকে গোদাবরী এখন প্রায় আধ মাইল দূরে এসে গেছেন। রাম-মন্দিরে রাম লক্ষ্মণ সীতার অপরূপ ছোট বিগ্রহ। নিদৃষ্ট স্থান থেকে দর্শনার্থীরা দর্শন করে। এদেশে মন্দিরে মন্দিরেই দেখচি মায়েরাই প্রায় বিগ্রহ সেবার বা যাত্রীদের দর্শন করাবার কিংবা প্রণামী ও অর্ঘ্যাদি নেবার কাজে নিযুক্তা আছেন। বড় শান্ত-স্বভাবা এই সেবিকা মায়েরা।

মন্দির-প্রাঙ্গণও বিশাল। প্রাঙ্গণ পাকা পরিষ্কার ঝরঝরে। সামনে নাটমন্দির। চারদিকে উঁচু দেয়াল আর দেয়ালগায়ে ছাত দেওয়া উঁচু মেজের খোলা যাত্রী-নিবাস। যাত্রী-নিবাস এবার নাথ-সম্প্রদায়ের মহারাজেরা

দখল করে আছেন। মহারাজেরাও ঠাকুরের বই পড়ে খুব আকৃষ্ট হয়েছেন হচ্ছেন, প্রায়ই এসে ঠাকুর সম্বন্ধেই প্রশ্নাদি কচ্ছেন। খুব কৌতূহলী। মন্দিরের এককোণে ২ দিন ধরেই দেখছি একটা ভীড় লেগেই আছে। আজ বেলা ১১৷৷ টায় যখন আস্তানায় ফিরে যাব তখন ঐ ভীড়ের কারণ কি জানার কৌতূহল না রাখতে পেরে সকলেই নাম করে করেই সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি একটা দড়ি অবলম্বন করে একজন সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা তাজা বিষধর সাপ। খবর নিয়ে জানলাম তিনি ৮ বৎসর ধরে দাঁড়িয়েই আছেন। খাওয়া-দাওয়া, মলত্যাগ, মূত্রত্যাগ, নিদ্রা, সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই করেন। প্রয়োজন হলে মাত্র গাছে ঝোলানো দড়িটার একটু সাহায্য গ্রহণ করেন। একটুখানি এগিয়ে আরও একজনকে দেখলাম অমনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর এটা ১০ না ১১ বছর চলচে। কৃচ্ছ্রতায় শ্রদ্ধা হলো প্রণাম করে আবার নাম করতে করতে স্বস্থানে ফিরে এলাম।

অনেক চিঠি এসেছে। ঠাকুরের বাল্যবন্ধু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক, আমার পিতৃ-প্রতিম শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ মহাশয়, দেবযানের পূজ্যপাদ সম্পাদকদ্বয়, অধ্যাপক ডক্টর তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ডি-লিট্, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সদানন্দ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোজ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমোদ গুপ্ত, ডক্টর দীনবন্ধু ঘোষ, শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় আরো বহু দাদারা উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিয়েছেন দিচ্ছেন। ঠাকুর মৌন থাকায় আমাদের অসহায় বোধ দাদারা বুঝতে পেরেছেন। ওঁদের আশীর্ব্বাণী পেয়ে আমরাও যেন ঠাকুরের নীরবতার ব্যথা অনেকটা হাল্কা অনুভব করলাম।

(ক্রমশঃ)

—০—

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

॥ শ্রীগুরুসেবা মহাব্রতে আহ্বান ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে
ত্রিগুণায় গুণাত্মনে।
কেবলায়া দ্বিতীয়ায় গুরবে
ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে ॥
গুরুগত প্রাণ মন ভ্রাতাভগ্নীগণ
ডাকিতেছি সবাকারে অতীব সাদরে।
গুরুসেবা মহাব্রত করিয়া গ্রহণ
আসুন সকলে ডুবি আনন্দ সাগরে ॥

জয় গুরু!

অনেক জন্মের সাধনার ফলে দেবতাদুর্লভ মানবদেহ লাভ হয়, তদ্দ্বার পরমানন্দপ্রাপ্তি হয়ে থাকে। "বাসুদেব সর্ব্বং"—সমস্তই শ্রীভগবান বাসুদেব—এই জ্ঞান লাভ করলেই মানুষ মুক্ত হয়ে সচ্চিদানন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়।

এই জ্ঞানের বাধক অনাদিকালসঞ্চিত পাপরাশি, শ্রীগুরুদেব সেই পাপরাশি নাশ করবার জন্য আমাদের সতত নাম করবার উপদেশ করেছেন। স্থানে স্থানে অখণ্ড মহামন্ত্রকীর্ত্তন চলছে; নামকারী শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন পায়, শ্রীগুরুদেব আজ বহু বৎসর যাবৎ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন।

আমাদের প্রাক্তন কর্ম্মফলে সর্ব্বদা নাম ধরে থাকতে পারি না। গুরুসেবা একটি অন্যনিরপেক্ষ শ্রেষ্ঠ সাধন। গুরুসেবার দ্বারা মানুষ অতি সহজে শ্রীভগবানকে লাভ করতে পারে। গুরু, শাস্ত্র ও সাধুমুখে একথা আমরা শুনেছি। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ সেবা করার সৌভাগ্য আমাদের নাই।

তাই আমরা অন্যপ্রকারে গুরুসেবায় উদ্‌যোগী হয়েছি। শ্রীগুরুদেব যখন দীক্ষাদান করেন তখন মন্ত্র দেন না, মন্ত্ররূপী শ্রীভগবানকেই দান করে থাকেন, তৎকালে তাঁর চরণে শিষ্য আত্মসমর্পণ করে থাকে।

"শরীরমর্থপ্রাণাংশ্চ সর্ব্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ।" দেহ, মন, প্রাণ, অর্থ সবই গুরুচরণে নিবেদন করতে হয়, নিজের বলতে কিছু থাকে না। দেহ, গেহ, ধন, সম্পদ যা কিছু সব শ্রীগুরুদেবের হয়ে যায় তাঁর প্রসাদি ধনাদির দ্বারা শিষ্য দেহ রক্ষা করে থাকে। শ্রীগুরুদেবের দক্ষিণা—

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে
সর্ব্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া।
মোচেৎ সঞ্চারিণী শক্তি কথমস্য ভবিষ্যতি।

—স্বতন্ত্র তন্ত্র।

সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ গুরুকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবে, কিম্বা তদর্দ্ধ অথবা তদর্দ্ধ দক্ষিণা দিবে, তা না হলে গুরুর শক্তি কি প্রকারে শিষ্যে সঞ্চারিত হবে? আমরা আমাদের শ্রীগুরুদেবকে একটি হরিতকী দক্ষিণা দিয়ে তাঁরই সম্পত্তি ভোগ করে আসছি।

অধুনা আমাদের ইচ্ছা হয়েছে যে আমরা কায়মনোবাক্যে গুরুসেবা করবো এবং তাহাতে কৃতার্থ হয়ে যাবো, এতে কোন সংশয় নাই। আমাদের শ্রীপরম-গুরুদেব শ্রীগুরুদেবকে জগৎকল্যাণকর "সত্যধর্ম্ম প্রচারে" নিয়োজিত করে গেছেন, শ্রীগুরুদেব তাই করে আসছেন।

আমরা শ্রীগুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করত তাঁরই আন্তরপ্রেরণায় "সত্যধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘ" নামে এই সঙ্ঘ গঠিত করে গুরুসেবা মহাব্রতে ব্রতী হয়েছি। সাক্ষাৎসেবার মহাসৌভাগ্য আমাদের না থাকায় জগৎকল্যাণের জন্য তিনি যে সঙ্কল্প করেছেন সেই সঙ্কল্পের লীলা নিম্নে লিখিত হইল।

*

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ
১৯।১১।৬৩

॥ সঙ্কল্পের লীলা ॥

সীতারামের মনে এই সৎসঙ্কল্পগুলি খেলা করে গেছে—

১। তারাগুণের শিব মন্দির ৪টী সারান।

২। তারাগুণের বিশালাক্ষীর ভাঙ্গা ঘর মন্দির করে তাতে বিশালাক্ষী প্রতিষ্ঠা করা।

৩। রামানন্দ মঠে শ্রীগুরুদেবের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা।

৪। দিগসুই শিবতলার ভাঙ্গা শিবমন্দির সারান।

৫। দিগসুইএ একটী মৌননিবাস তৈরী করা। তাতে ৪টী কুটীর থাকবে, গৃহস্থ বাবারাও ৭।১৫।৩০ দিন মৌন থেকে সাধন করতে পারবে।

বিরক্তেরাও মৌন থাকবে। শৈল মৌনীদের সেবার ভার নিতে প্রস্তুত ছিল, নচেৎ দিগসুই রাধাগোবিন্দের সেবক সে ব্যবস্থা করবে।

৬। দিগসুই গুরুদেবের গোপালের ঘরটি দ্বিতল করা। ছোট ঘর ৪ হাত দীর্ঘ ৩ হাত প্রস্থ অনুমান।

৭। দিগসুই সাধন সমিতিতে শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা। মন্দির যেখানে এখন প্রতিমা আছে তথায় হবে। নিত্যসেবা এখন থেকে চলে এই ইচ্ছা।

৮। দিগসুইএ একটি ত্রিতল ধ্যানস্তম্ভ করা।

৯। কেওটার ঠাকুরঘরটি দ্বিতল করা। ছোট ৪-৫ হাত দীর্ঘ প্রস্থ অনুমান।

১০। রামাশ্রমের ঘরটাকে মন্দির করে অথবা স্বতন্ত্র মন্দিরে সীতারামের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা।

১১। ব্রজনাথের দ্বিতল ঘর করা ইত্যাদি।

১২। রামাশ্রমের জন্য কিছু জমি করে দেওয়া।

১৩। গোপালপুরের গোপালমঠের জন্য কিছু জমি করে দেওয়া।

১৪। ডুমুরদহের দেবমন্দিরগুলি সংস্কার—বারোয়ারীতলায় একটী দুর্গামণ্ডপ নির্ম্মাণ। দীনবন্ধুর সঙ্কল্প লণ্ঠন লেকচার ও রামানন্দ মঠে বর্ষব্যাপী মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন এইটিও খেলা করে। ইহার মধ্যে যদি কোনটী না হয় তাহলে সীতারামের কোনরূপ ক্ষোভ উপস্থিত হবে না। এ ঠিক সঙ্কল্প নয়, ভেসেছে লিখে দিলাম, মনে যখন ভেসেছে তখন সঙ্কল্পও বলা যেতে পারে। শ্রীভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে,—এ যদি তাঁর ইচ্ছা হয় প্রত্যেকটী পূর্ণ **হবেই**।

রামনামমন্দির, জয়গুরু রামানন্দ পরীক্ষা পরিষৎ, রামায়ণ মন্দির-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে।

তিরোভাব সংখ্যা "ব্রজনাথ উল্লাস" এইটী করতেই হবে। সত্যধর্ম্ম প্রচারকল্পে দেবযান বহুলপ্রচার করবার জন্য সীতারাম বাবাদের বিশেষভাবে বলছে।

জগৎকল্যাণকল্পে কায়মনোবাক্যে মহামন্ত্র প্রচার সীতারামের বাবারা করবে সীতারাম এইটী বিশেষভাবে চায়।

বাবারা মায়েরা পরমানন্দে ডুবে যাক নাম করে করে, সীতারাম শ্রীগুরুদেবের চরণে একান্তভাবে এইটী প্রার্থনা করছে। জয়গুরু সম্প্রদায়ের আচার্য্য শঙ্কর, বিমল, সহকারী আচার্য্য রঘুনাথ। আচার্য্যদ্বয় যেদিন আসতে না পারবে সেদিন পুরঞ্জয় ভাগবত পাঠ করবে।

সংঘের বাবারা ছুটির দিন পার্কে অথবা অন্য কোনস্থানে নামপ্রচার করে সীতারাম চায়।

সভার দিন আচার্য্যদের দ্বারা ভাগবত পাঠ করিয়ে সভারম্ভ হবে। সভা

আরম্ভের পূর্ব্বে গুরুদেবের জয় ঘোষণা। সমবেত জয়গুরু নাম কীর্ত্তন, সমবেত প্রার্থনা।

আচার্য্য কর্ত্তৃক নামমাহাত্ম্য ও ভাগবত পাঠ। সমবেত মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন, তারপর সভার আলোচ্য বিষয় আলোচনা। শেষে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন। সম্ভব হলে এই ভাবে সভার কাজের দ্বারা ভগবানের সেবা করতে চেষ্টা যেন বাবারা করে।

—সীতারাম।

—মহাপ্রচার—

কাঁধে নিশান এবং ঝোলায় অভয়বাণী দাতব্য ও বিক্রেয় পুস্তক নিয়ে করতাল বাজিয়ে নাম করতে করতে ছুটবে মহাপ্রচারকদল—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে, প্রচণ্ড দাবানলের মত দিবে নিবিড় পাপারণ্যে আগুন লাগিয়ে।

পাপ তাপ দুঃখ দারিদ্র্য ভস্মীভূত হয়ে যাবে।
আনন্দের মহাপ্লাবনে গ্রামের পর গ্রাম ভাসতে থাকবে।
অনন্তকালোদ্দিষ্ট নামগুলিও সুষ্ঠুভাবে চলে—
এ সঙ্কল্প বিশেষভাবে খেলা করে।

* * * *

আমরা গুরুদেবের এই সঙ্কল্পসকল পূরণের জন্য উপস্থিত পাঁচশত সংখ্যক গুরুভ্রাতা ভগ্নী মিলিত হয়ে গুরুদেবের সঙ্কল্প সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি এবং অন্যান্য গুরুভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে আহ্বান করছি, তাঁরা এই গুরুসেবা মহাব্রতে কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করুন। তাঁরই ধন আমাদের কাছে জমা আছে, আমরা তাঁর ধনের দ্বারাই তাঁর সেবা করবো। ধন এবং প্রাণ একপর্য্যায়ভুক্ত, ধনদান এবং প্রাণদান একই কথা। আমরা আমাদের গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নীগণকে জানাচ্ছি, তাঁরা কি এই গুরুসেবার অংশগ্রহণে কৃতার্থ হবেন না? যাঁর যেমন সামর্থ্য অর্থাৎ প্রাণ, তিনি সেরূপভাবে গুরুসেবার আনুকুল্য করে কৃতার্থ হন, এই আমাদের প্রার্থনা।

আহ্বায়ক
সত্যধর্ম প্রচার সংঘের
সংসেবকবৃন্দ।
দেবযান কার্য্যালয়,
পোঃ মগরা, হুগলি।

সংবাদ

শ্রীশ্রীঠাকুর ৬ই বৈশাখ মৌন ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ভাল আছেন।

ঠাকুরের উজ্জয়িনী যাইবার এবং শীঘ্র বাঙ্গালায় আসিবার সম্ভাবনা নাই। পরবর্তী সংবাদ পরে জানান হইবে।

* * * *

২৬শে চৈত্র শ্রীশ্রীদামোদর দাস মহারাজের এবং ৬ই চৈত্র শ্রীশ্রীদাশরথিদেব যোগেশ্বরের আবির্ভাব-উৎসব—শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়ের আশ্রম সমূহে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষ্যে নামযজ্ঞ, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

* * * *

৩রা চৈত্র মাল্যবতী-আশ্রমে (শ্রীবৃন্দাবনধাম) শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা পদার্পণ করেন। তাঁহার শুভাগমনে আশ্রম সেবিকারা ও স্থানীয় নরনারী বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

* * * *

শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকখানি গ্রন্থের উড়িয়া-অনুবাদ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। অনুবাদকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন—উৎকলের জননেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী।

—•—

শোক-সংবাদ

২৩শে চৈত্র বাঙ্গালার বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

তিনি কুমিল্লার এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজে অধ্যয়নের পর দীনেশচন্দ্র কলিকাতায় আসেন এবং সেখানে তাঁহার ছাত্রজীবনের শেষ-অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়। কর্ম্মজীবনে তিনি অধ্যাপকরূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি "বাঙলার সারস্বত অবদান"-নামক গ্রন্থ—তাঁহাকে বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় করিয়াছে। এই গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁহার তিরোধানে বঙ্গের সারস্বত-সমাজের যে ক্ষতি হইল—তাহা অপূরণীয়।

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। "ওঙ্কার-নাথাষ্টকম্"—শীর্ষক স্তোত্রে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে তিনি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন

করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে—রোগ-জীর্ণদেহে তিনি ঠাকুরের একখানি দুরূহ গ্রন্থের প্রুফ্-দেখার কার্য্য সম্পন্ন করেন। আজ আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাকে বার বার স্মরণ করিতেছি।

'দেবযান' দীনেশচন্দ্রের স্নেহ শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছিল—তাঁহার অনেক প্রবন্ধ দেবযানে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রয়াণে আমরা আত্মীয়বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি। জগদীশ্বর তাঁহাকে শাশ্বতী শান্তি দান করুন—এই প্রার্থনা করি।

—•—

বিজ্ঞপ্তি

॥ রামানন্দ মহামন্ত্র পরীক্ষা পরিষদ্ ॥

[বাংলা বা সংস্কৃত **আদ্য** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে **মধ্য** পরীক্ষা, মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে **উপাধি** পরীক্ষার যোগ্যতা অর্জ্জন। প্রত্যেক পরীক্ষায় পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।]

১৩৬৪ সালের পরীক্ষা (কেবল আদ্য) -

স্থান—হুগলী কলেজ

তারিখ—১৯শে জ্যৈষ্ঠ (ইং ২রা জুন) রবিবার

সময়—১ম পত্র·········বেলা ১১টা হইতে ১টা

২য় পত্র·········১॥০টা·········৩॥০টা

মৌখিক·········৪টা·········৪॥০টা

[অধ্যাপক শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ডি-লিট্ মাধবীতলা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)—এই ঠিকানায় ২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) তারিখের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। পরীক্ষার "ফি" ॥০ সঙ্গে আনিলেও চলিবে।]

আদ্য পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা—

বাংলা—১ম পত্র শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত (১) শ্রীশ্রীবৈষ্ণবমতাব্জ ভাস্কর, (২) শ্রীশ্রীরামনাম মাহাত্ম্য, (৩) মহামন্ত্র কল্পতরু, (৪) মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন, (৫) মহারসায়ন।

ঐ—২য় পত্র—(১) গীতা, (২) চণ্ডী, (৩) শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত "শ্রীকৃষ্ণনাম মাহাত্ম্য।"

সংস্কৃত - ১ম পত্র—(১) গুরুগীতা—শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত, (২) বাল্মীকি রামায়ণ (আদি ও অযোধ্যা), (৩) শ্রীমদ্ভাগবত (৪র্থ স্কন্ধ পর্য্যন্ত—শ্রীধর স্বামীর টীকা সহ)।

ঐ—২য় পত্র—"মহারসায়ন" হইতে সংস্কৃতে এবং "অধ্যাত্ম রামায়ণ" হইতে বাংলায় অনুবাদ।

—০—

॥ ব্রজনাথ উল্লাস ॥

দেবযানের দশম বর্ষের প্রথম সংখ্যা (ভাদ্র—১৩৬৪) 'ব্রজনাথ-উল্লাস'-নামে—বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশে এই সংখ্যার বিষয়বস্তু—শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা এবং সমগ্র ব্রজলীলা। এই বিষয়ে প্রবন্ধ কবিতার জন্য লেখক লেখিকাগণের নিকটে আবেদন জানাইতেছি। রচনা সম্পাদকের নামে—শ্রীরামাশ্রমের (ডুমুরদহ) ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

প্রসিদ্ধ শিল্পী ও মনীষিগণের চিত্রে এবং রচনায় এই সংখ্যা সমৃদ্ধ হইবে—আকারও বর্ধিত হইবে। 'ব্রজনাথ উল্লাস' বঙ্গের অধ্যাত্ম সাহিত্যের একটি অনালোচিত দিকের পুষ্টি সাধন করিবে—ধর্ম-পিপাসু নরনারীগণকে আনন্দ দান করিবে।

গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের ও বিজ্ঞাপন দাতাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বিনীত

কর্ম্মাধ্যক্ষ—দেবযান
পোঃ—মগরা
(হুগলি)

—০—

বিজ্ঞপ্তি

দেবযানের গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ একটি দেবযানের গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

বিনীত
কর্ম্মাধ্যক্ষ
দেবযান—মগরা (হুগলি)

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ,
দশম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ
১৩৬৪

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ডি-লিট্]

সাংখ্য মতে ঈশ্বর

ঈশ্বর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের যে সমস্ত প্রতিকূল আলোচনা আছে যেমন সাংখ্যদর্শনে ও পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে তাহারও আলোচনা হইতে বিরত রহিলাম। সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ও পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

ঈশ্বর কৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অতি প্রাচীন টীকা যুক্তি দীপিকাতে বলা হইয়াছে—যদি বেদবাক্যানুসারে মূর্ত্তিমান ঈশ্বর স্বীকার করা যায় তবে তো সাংখ্যমতেও ঈশ্বরের অস্তিত্বই সিদ্ধ হইল। ঈশ্বরই যদি না থাকেন তবে তাঁহার মূর্ত্তি হইল কিরূপে? "ন হি অসতো মূর্ত্তিমত্ত্বমুপপদ্যতে।" (যুক্তি-দীপিকা, ৮৭ পৃঃ) এতদুত্তরে টীকাকার বলিয়াছেন—

পূর্ব্বপক্ষী আমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। আমরা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শক্তিবিশেষের প্রত্যাখ্যান করি না। ঈশ্বরও মাহাত্ম্য-শরীরাদি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন ইহা স্বীকার করি। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষী যেরূপ বলিতেছেন—প্রধান ও পুরুষ হইতে অতিরিক্ত ঈশ্বর, প্রধান ও পুরুষের প্রযোক্তা প্রেরয়িতা ঈশ্বর এরূপ আমরা স্বীকার করি না। প্রধান পুরুষের প্রেরয়িতারূপে ঈশ্বর এরূপ আমরা স্বীকার করি না বলিয়া আমরা যে ঈশ্বরই স্বীকার করি না তাহা নহে। ঈশ্বর শ্রুতিসিদ্ধ এবং তাঁহারও মাহাত্ম্য শরীরাদি আমরা স্বীকার করি। (যুক্তিদীপিকা, ৮৭ পৃঃ)

মীমাংসকাভিপ্রায়

প্রভাকর মতানুসারী ভবনাথ মিশ্র নয়বিবেক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "একদা কৃৎস্নসৃষ্টি প্রলয়ৌ মানশূন্যৌ প্রত্যুত যথাদর্শনং ক্রমেণ তদনুমা ইতি জগতীশ্বরকর্ত্তৃত্বেঽপি ন গুরুনয়বিরোধ ইতি গুরোরবধীরণম্।" (নয়বিবেক, ১৮৭-৮ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায়, নয়বিবেককার বলিয়াছেন যে, ন্যায়বৈশেষিক আচার্য্যগণ যে বলিয়াছেন সমস্ত জগত্বের এককালেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সমস্ত জগতের এককালেই ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংহার হইয়া থাকে—ইহা প্রমাণশূন্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। প্রত্যুত, লোকদৃষ্টি অনুসারে ক্রমশঃ সৃষ্টি বা ক্রমশঃ সংহার ঈশ্বরকর্ত্তৃক হইয়া থাকে এরূপ স্বীকার করিলে জগতের ক্রমিক সৃষ্টি ও ক্রমিক সংহারকর্ত্তা ঈশ্বর অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও তাহাতে গুরুমতের সহিত কোন বিরোধ হয় না। এজন্যই গুরু (প্রভাকর) ঈশ্বরানুমান সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। নয়বিবেককার ভবনাথ মিশ্র প্রভাকরমতানুসারীও একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। নয়বিবেকের টীকা বিবেকতত্ত্বে রবিদেব বলিয়াছেন—"জগতি ঈশ্বরকর্ত্তৃকেঽপি ন গুরুনয়বিরোধঃ ইতি প্রাগুক্তম্।" (নয়বিবেক টীকা, ১৮৮ পৃঃ)। ততঃপর নয়বিবেককার সম্বন্ধাক্ষেপ পরিহার প্রকরণে ঈশ্বর-সাধক ন্যায়বৈশেষিক সম্মত অনুমান প্রমাণের খণ্ডন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—"এবঞ্চ ঈশ্বরে পরোক্তমেবানুমানং নিরস্তম্। ন ঈশ্বরোঽপি নিরস্তঃ।" (নয়বিবেক, ১৯৯ পৃঃ)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রদর্শিতরূপে ন্যায়বৈশেষিকগণের ঈশ্বরানুমানই নিরস্ত হইল। কিন্তু ইহাতে ঈশ্বর নিরস্ত হইলেন না। আমরা ঈশ্বরানুমানেরই খণ্ডন করি, ঈশ্বর খণ্ডন করি না। এরূপ বলিয়া নয়বিবেককার পরে একটি শিবস্তুতি পাঠ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বরতত্ত্ব একান্তভাবে বেদ-

প্রতিপাদ্য। ইহা বেদ-নিরপেক্ষ লোকবুদ্ধির গম্য হইতে পারে না। এজন্য যে সমস্ত দার্শনিক বেদ-নিরপেক্ষভাবে কেবল লৌকিকবুদ্ধির অনুসরণ করিয়া অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে প্রয়াসী মীমাংসকগণ তাহারই প্রতিরোধ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রৌত ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিরোধ করেন নাই।

মীমাংসা শ্লোকবার্ত্তিকে ভট্টপাদ যে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন তাহাতেও মীমাংসকগণের ঈশ্বরবিশ্বাস বুঝিতে পারা যায়। এই মঙ্গলাচরণে ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"বিশুদ্ধ জ্ঞানদেহায় ত্রিবেদী দিব্যচক্ষুষে। শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে।" এই শ্লোকটি দেবীকীলকেও পঠিত হইয়াছে। এই ভাবনাবিবেকের টীকাতেও উম্বেক ঈশ্বরের প্রণাম করিয়াই গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। বিধিবিবেকের টীকাতেও বাচস্পতি মিশ্র ঈশ্বরের প্রণামের দ্বারাই মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

উত্তর মীমাংসাতেও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" (ব্রঃ সূঃ ১।১।২) সূত্রের ভাষ্যটীকা প্রভৃতিতে বৈদিকবেদ্য ঈশ্বর বেদ-নিরপেক্ষভাবে অনুমানপ্রমাণবেদ্য হইতে পারে না বলা হইয়াছে। এজন্য ঈশ্বর-সাধক কেবলানুমানপ্রমাণ ঈশ্বর-বিষয়ক প্রমিতির উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ক কেবল অনুমানপ্রমাণ ঈশ্বরের সম্ভাবনার জনক হইয়া থাকে। ন্যায়বৈশেষিকাদ্যুক্ত ঈশ্বরসাধক প্রমাণ প্রমিতির জনক না হইয়া ঈশ্বরবিষয়ক সম্ভাবনারই জনক হইয়া থাকে। এই কথা এই অধিকরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ঈশ্বরসাধক কেবল অনুমান প্রমাণ ঈশ্বরে এইরূপ দৃঢ় সম্ভাবনার জনক হয় যাহাতে ঈশ্বরসাধক যুক্তির (অনুমানের) সহিত ঈশ্বরসাধক প্রমাণের (শ্রুতির) ভেদ অল্পই থাকে। সুতরাং শ্রৌত ঈশ্বরসিদ্ধির জন্য ন্যায়বৈশেষিকাদি দার্শনিকগণের অনুমান-প্রমাণোপন্যাস সার্থক হইয়াছে।

ব্রহ্ম-পরিণামবাদ

আমরা এই প্রবন্ধে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব-প্রতিপাদক যে সমস্ত ঋগ্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সমস্ত মন্ত্রের সুসমঞ্জস অর্থ নিরূপণের জন্য ভারতীয় নানা দার্শনিক সম্প্রদায় নানাবিধ প্রক্রিয়া রচনা করিয়া বেদ প্রতিপাদ্য ঈশ্বরস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ন্যায়বৈশেষিক প্রস্থানের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পাশুপত সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছি এবং প্রসঙ্গক্রমে ভাগবতসিদ্ধান্তেরও কিঞ্চিৎ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি। ভাগবতসিদ্ধান্ত পাঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্ত ও বৈখানস-সিদ্ধান্ত ভেদে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তের

অনুসরণ করিয়া রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতা ও উপাদানকারণতা সমর্থন করিয়াছেন। যদিও রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণ পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন তথাপি তাঁহারা যথাযথভাবে পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ভগবান্ সর্ব্বাত্মভাবে প্রকাশমান হইয়াও অবিকারী। ইহার উপপাদনের জন্য ভাগবত-সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের বীর্য্য নামক যে পঞ্চম গুণ স্বীকার করা হইয়াছে তাহাকেই ইহারা শরীর-শারীরিকভাবে ব্যাখ্যাত করিয়া ঈশ্বরের শরীর জগদাকার হইলেও ঈশ্বর তাহাতে বিকৃত হন না ইত্যাদি বলিয়াছেন।

ঈশ্বরতত্ত্বপ্রতিপাদক সমস্ত বেদবাক্যের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিকবৃন্দ নানাবিধ প্রক্রিয়া রচনা করিয়া সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস করিয়াছেন। এই সমস্ত দার্শনিকগণের মধ্যে উভয়-মীমাংসার অতিপ্রাচীন বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ (কেহ কেহ ইঁহাকেই বোধায়ন বলেন) ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করিয়া ঈশ্বরতত্ত্বপ্রতিপাদক বেদবাক্য-সমূহের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার শবরস্বামী অতি প্রাচীন। অনেকে মনে করেন, শবরস্বামী দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান ছিলেন। এই শবরস্বামী পূর্ব্ব-মীমাংসাভাষ্যে "অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দ? গকারৌকারবিসর্জনীয়া ইতি ভগবান্ উপবর্ষঃ" (জৈঃ সূঃ ১।১।৫) এইরূপ বলিয়াছেন। ১।৩।২৮ ব্রঃ সূত্রের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"বর্ণা এব তু শব্দা ইতি ভগবান্ উপবর্ষঃ।" উভয় ভাষ্যকারই ভগবান্ উপবর্ষের যে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ পাঠভেদ থাকিলেও অর্থের কোন ভেদ নাই। পদস্ফোট অস্বীকার করিয়া বর্ণাত্মকই পদ ইহাই উপবর্ষ বলিয়াছিলেন। বৈয়াকরণগণই বর্ণাতিরিক্ত স্ফোট স্বীকার করেন নাই। ভগবান্ উপবর্ষের বাক্যানুসারেই উভয় মীমাংসাতেই স্ফোটবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

—০—

নববর্ষের গৃহ-চিকিৎসা

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

হিন্দুর সংসার, অন্ততঃ বঙ্গদেশে যাহা দেখিতেছি তাহা ভাঙ্গিতেছে। অনেকেই ইহা বলেন। কেন এই কথা বলা হইতেছে? কারণ লোকের মতিগতি একটু দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। যখনই কোন ধর্ম্মের সংসারে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে তখনই সংসার ধ্বংসপথে প্রধাবিত হইবেই। যাহারা হিন্দুকুলাঙ্গার তাহারা হিন্দুর ধ্বংস দেখিয়া সুখী, কিন্তু যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছেন তাঁহারা সামাজিক ব্যভিচার দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে যাতনা অনুভব করিবেনই। তথাপি ইহা সহ্য করিয়া কর্ত্তব্য করিতে হইবে।

কিন্তু ভগবান্ যখন সমাজকে ধ্বংসপথে অগ্রসর করেন তখন তাহা রোধ করিবে কে? কাহারও সাধ্য নাই ইহা সত্য। তথাপি যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ অবস্থায় কিরূপে জীবন যাপন করিবেন? ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। তবে কি মানুষ ধ্বংসপথের অনুকূল কার্য্যই করিবে? না তাহা হইতেই পারে না। ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে। কারণ পাপ না ঢুকিলে ধ্বংস হয় না। মানুষ কিছুতেই পাপ আশ্রয় করিবে না। তবে করিবে কি? মানুষ হিন্দুধর্ম্ম ধরিয়াই থাকিবে। বরং মরিবে তথাপি কখনও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে না। ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্ম ভয়াবহ"। স্বধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বরং মরিবে তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। পরধর্ম্ম হইতেছে ভোগ-লালসা-তৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয় সুখের কার্য্য করা। বলা হইতেছে হিন্দু-সমাজ ধ্বংসপথে ছুটিয়াছে। কোন চিহ্ন দ্বারা ইহা নিশ্চয় করা হইতেছে? একমাত্র উত্তর প্রায় মানুষই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছে।

স্বধর্ম্ম কোন্‌টী?

স্বধর্ম্ম হইতেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের শাস্ত্রপ্রদর্শিত ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম করিবে এবং অন্য জাতিও শাস্ত্রপ্রদর্শিত পথে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিবে।

সমাজে কি তাহা হইতেছে না?

কোথায় হইতেছে? বাংলা দেশের সংবাদ আমরা যাহা রাখি, তাহাতে দেখি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া মানুষ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করে না। ব্রাহ্মণের মুখ্য

কর্ম্ম হইতেছে ত্রি-সন্ধ্যায় সন্ধ্যা বন্দনাদি করা, দীক্ষা গ্রহণ করা, সর্বদার কার্য্য যাহা তাহা গুরুমুখে শুনিয়া লইয়া তাহাতেই থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা। আহারে শুচি থাকা অর্থাৎ অমেধ্য আহার না করিয়া মেধ্য আহার করা এবং শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন না করিয়া কোন কিছু গলধঃকরণ না করা। সমাজে কি এই সব চলিতেছে? তবে সকল প্রকারের লোক একসঙ্গে আহার করিবে কিরূপে? প্রবৃত্তি সকল মানুষের একরূপ নহে। তবেইত হইল সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক আহার রুচিভেদে চলিবে। তামসিক রাজসিক ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পালন করিয়া সত্ত্বমুখে চলিতে প্রাণপণ করিবে ইহাত ভগবানের আজ্ঞা। তবেত স্পর্শদোষ প্রথম প্রথম গ্রাহ্য করিতেই হইবে। যদি ইহা কখন সম্ভব হয় যে, সকল মানুষ সাত্ত্বিক হইয়া গেল, সকল নরনারী পরমহংস পরমহংসী হইয়া গেল, তখন আহারের বিচার না থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা কি কোন যুগে হইয়াছে? জাতিভেদ ত ভগবান্‌ই করিয়াছেন। গীতা-শাস্ত্রে ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"।

এই জাতিভেদ তুলিয়া দিতে কোন্ অর্ব্বাচীনের সামর্থ্য আছে? ভগবান্ যাহা করিয়াছেন তাহা ভাঙ্গিতে যে চেষ্টা করে, সে মানুষের মত পাপী কি আর কেহ থাকিতে পারে? 'জাতিভেদ তুলিয়া দাও' এই যে রোল উঠিয়াছে, ইহাই ধ্বংসপথের পরিচায়ক। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই সমস্ত এখন কোথায়? গৈরিক বস্ত্র পড়িয়া মস্তক মুণ্ডন করিলেই যদি সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তবে আর স্বধর্ম্ম কোথায় রহিল? গঙ্গাস্নান হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য। গঙ্গা সদ্যঃ-পাতক সংহন্ত্রী। আজকাল মানুষ বলে গঙ্গাস্নানে কি হয়? অর্দ্ধোদয়যোগে কোটি কোটি মানুষ গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল দেখিয়া যাহারা পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধ্বংসপথে ছুটিয়াছে তাহারা বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতে এই সমস্ত অধার্ম্মিক এত চেষ্টা করিতেছে, তথাপি এত মানুষ হিন্দুধর্ম্ম মত এখনও গঙ্গাস্নানরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া রহিল—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? একটু আধটু ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষিতা নরনারী হিন্দুধর্ম্ম যে কুসংস্কারপূর্ণ তাহাই দেখাইতে লাগিয়া পড়িয়াছে, তথাপি গঙ্গাস্নান কুসংস্কার, জাতিভেদ কুসংস্কার ইহাত দূর হইতেছে না। একসঙ্গে আহার না করা কুসংস্কার, এখনও যাঁহারা স্বধর্ম্মে আছেন, তাহা ইহারা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলিতেছেন না।

তাই বলিতেছি যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে এখনও বিশ্বাস করেন—শুধু মুখের

কথায় নহে কিন্তু যথার্থ প্রাণে প্রাণে ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা আপন আপন সংসারে স্বধর্ম্ম মত পুত্রকন্যা, বধূ ইত্যাদিকে চালাইতে চেষ্টা করিতে প্রাণপণ করিবেন; ইহাই ত এই দুর্দ্দিনে একমাত্র কর্ত্তব্য। গৃহ-চিকিৎসা করা অর্থাৎ সকলকে স্বধর্ম্মে থাকিতে পরামর্শ দেওয়াই ভাল লোকের কর্ত্তব্য। তথাপি সমাজ ধ্বংসপথে চলিবে আর শ্রীভগবান্ স্বয়ং আসিয়া ধর্ম্মের হানি ও অভ্যুত্থান দূর করিবেন। আর যাহারা পরধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া স্বধর্ম্মে থাকিতে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিবেন, তাহাদিগকে ভগবান্ স্বয়ং হাতে ধরিয়া স্বধামে লইয়া যাইবেন। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ", ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাণী।

কদাচার, কু-আহার করিয়া অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশের সহরবাসী এত কলুষিত হইতেছে যে, ইহারা প্রচার করিতেছে যে, "শাস্ত্রের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেল, আর স্বাধীন মনে যাহা উঠে তাহাই কর"। স্বাধীন মন কি বস্তু, তাহা ইহারা বুঝে না। মনে যাহা উঠিবে সেইমত কার্য্য করাকে কি স্বাধীনতা বলে? স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনকে আত্মার অধীনে আনয়ন করিয়া কার্য্য করাকে স্বাধীনতার কার্য্য বলে। 'স্ব' বলে আত্মাকে—মনকে তাঁহার অধীন করাই স্বাধীনতা। আত্মার কোন সংবাদ নাই, স্বাধীনতা আসিবে কিরূপে? কোন কোন পল্লীগ্রামে তরুণীগণের স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়া, তাঁহাদের অভিভাবক অভিভাবিকাগণ প্রাচীনকালের অন্তঃপুরবাসকেই স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম বলেন। আমাদের দেশে স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচার ভীষণ হইয়া উঠিতেছে। হিন্দুর সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

—০—

মুক্তি, জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

জীব মাত্রেরই চরম কাম্য মোক্ষ বা মুক্তি। সকলেই মুক্তির জন্য লালায়িত, কি জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলেই মুক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অবশ্য ভক্ত বলেন :—

আমি মুক্তি চাইনা হরি,
আসিব যাইব চরণ সেবিব,
হইব প্রেম অধিকারী।

ভক্ত মুক্তি চাহেন না, সেবা চাহেন। সেবা চাহিলেই স্বতঃই সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সেবা নিকটে না থাকিলে হইতে পারে না। তাহা হইলে সালোক্য সামীপ্য মুক্তি লাভ হইয়া যাইল। প্রভুর সেবা করিতে করিতে ও নিকটে থাকিতে থাকিতেই সারূপ্য আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে, আর সাযুজ্য মুক্তি সম্মিলিত ভাবে অবস্থান, শ্রীভগবান সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, অজ্ঞানী মানব তাহা বুঝিতে পারেনা—সেবাকারী ভক্ত, তিনি শ্রীভগবানে নিত্য সম্মিলিত ইহা সতত প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন। বাকী কৈবল্য ভক্ত বিরজা নদীতে অবগাহন করতঃ প্রাকৃত সূক্ষ্মদেহ ত্যাগ করিয়া ভগবৎ কল্পিত দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সুতরাং একমাত্র সেবা চাহিলেই সমস্ত মুক্তিগুলি অনায়াসে লাভ হইয়া যায়। হরিভক্তি মুক্তির মধ্যে গণ্য।

অতঃপর শাস্ত্র মুক্তির কথা কি বলিয়াছেন আলোচনা করা যাইতেছে—

মুক্তিস্তু দ্বিবিধা সাধ্বী শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা।
নির্ব্বাণপদদাত্রীচ হরিভক্তিপ্রদা নৃণাম্॥
হরিভক্তি স্বরূপাচ মুক্তিবাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবা।
অন্যে নির্ব্বাণ রূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ॥

'নিত্যানিত্য বস্তু বিচারাদনিত্য সংসার সমস্ত সঙ্কল্পক্ষয়োমোক্ষঃ।'

—নিরালম্বোপনিষৎ।

নিত্য অনিত্য বস্তু-বিচারের দ্বারা অনিত্য সংসারের সমস্ত সঙ্কল্প ক্ষয় হইলে মোক্ষলাভ হয়। জ্ঞানী বিচারের দ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হন।

সমাধি মথকর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়ে নষ্টসর্ব্বেহোমুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ॥ —মুক্তিকোপনিষৎ।

হৃদয়স্থিত সমস্ত কামনা যখন বিগলিত হইয়া যায়, সমাধি অথবা অন্যান্য কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করুন আর না করুন, সেই উত্তম-আশায় মহান্ পুরুষ মুক্ত।

অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে সাদ্ভিঃ স এব বিমল ক্রমঃ॥

—মহোপনিষৎ।

অশেষরূপে বাসনা সমূহের পরিত্যাগের নাম মুক্তি।

জীবে ব্রহ্মণি সংলীনে জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত।
যা মুক্তিঃ কথিতা সদ্ভিস্তন্নির্ব্বাণং প্রচক্ষতে॥

—হেমাদ্রৌ ধর্ম্মশাস্ত্র।

জীব ব্রহ্মে উত্তমরূপে বিলীন হইলে জন্মমৃত্যু বিবর্জ্জিত যে মুক্তি লাভ হয় সাধুগণ তাহাকে নির্ব্বাণমুক্তি বলেন।

ঘৃণাশঙ্কাভয়ং লজ্জা জুগুপ্সাচেতিপঞ্চমী।
কুলং শীলঞ্চমানঞ্চ অষ্টোপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ইত্যষ্টপাশ কেবলং বন্ধনরূপা রজ্জবঃ।
এতৈর্বদ্ধঃ পশুপ্রোক্ত মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ॥

—ভৈরব যামল।

ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, নিন্দা, কুলশীল, মান এই আটটি পাশ বলিয়া কথিত হয়, ইহারা জীবের বন্ধন রজ্জু স্বরূপ, ইহার দ্বারা যে বদ্ধ সে পশু, আর এই অষ্টপাশ মুক্ত পুরুষোত্তমই সদাশিব।

সকামাশ্চৈব নিষ্কামা দ্বিবিধাভুবি মানবাঃ।
অকামানাং পদং মোক্ষো কামিনাং ফলমুচ্যতে॥

—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

জগতে সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দুই প্রকার মানব দৃষ্ট হয়। অকাম ব্যক্তিগণ মোক্ষ এবং সকাম ব্যক্তিগণ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকে।

বিহায় নাম রূপাণি নিত্যব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিত তত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্ম বন্ধনাৎ॥

নাম-রূপ বিশেষরূপে ত্যাগ করতঃ নিশ্চল নিত্য ব্রহ্মে যিনি আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এই দৃঢ় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি নিখিল কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

মুক্তিক-উপনিষদে মারুতি শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রকে মুক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরামচন্দ্র বলেন—

কৈবল্য মুক্তিরেকৈব পারমার্থিকরূপিণী।
দুরাচাররতোবাপি মন্নাম ভজনাৎ কপে।
সালোক্য মুক্তিমাপ্নোতি নতু লোকান্তরাদিকম্॥

হে হনুমন্, পারমার্থিক রূপিণী কৈবল্য মুক্তি, দুরাচাররত ব্যক্তিও কেবল আমার নাম ভজনের দ্বারা সালোক্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়, অন্য লোক লাভ করে না। কাশীতে ব্রহ্মনালে মৃত ব্যক্তি আমার তারক মন্ত্র প্রাপ্ত হওয়ায় পুনরাবৃত্তি রহিত মোক্ষলাভে সমর্থ হয়।

যত্র কুত্রাপি বা কাশ্যাং মরণে সমহেশ্বরঃ।
জন্তোর্দক্ষিণে কর্ণেতু মত্তারং সমুপাদিশেৎ॥

কাশীতে যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলে মহেশ্বর প্রাণীর দক্ষিণ কর্ণে আমার তারক মন্ত্র সম্যক্‌রূপে উপদেশ করেন। তার ফলে সেই জীব সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্ত হইয়া আমার সারূপ্য ভাবিত হয়। নাম ভজনের দ্বারা সালোক্য এবং কাশীতে মরণে সারূপ্য (একরূপতা-রূপ) মুক্তি হইয়া থাকে।

আমার ঠাকুর শঙ্করটীর নাম 'শঙ্কর'। কার্য্যও তাঁর মঙ্গলকর, কিসে লোকের কল্যাণ হইবে সেই চেষ্টা লইয়াই আছেন। নামগ্রহণে মানব মুক্তি পাইয়া থাকে তজ্জন্য স্বয়ং আদর্শ হইয়া পঞ্চমুখে অবিরাম রাম রাম করিতেছেন। এ আদর্শ গ্রহণ করিলে মানব আপনি কৃতার্থ হন এবং অপরকেও নাম শুনাইয়া ভক্তিপথের পথিক করেন। ইহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, মায়া মোহিত জীবগণকে মুক্তিদান করিবার জন্য—

শ্রীরামমন্ত্রমনুং কাশ্যাং জজাপ বৃষভধ্বজঃ॥

—শ্রীরামোত্তর তাপিনী

বৃষধ্বজ শঙ্কর কাশীধামে জপ হোম অর্চ্চনাদির সহিত সহস্র মন্বন্তর কাল শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্র জপ করেন। অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া শঙ্করকে বলিলেন —হে পরমেশ্বর, আপনার অভীষ্টবর প্রার্থনা করুন, আমি তাহা দান করিব। অতঃপর মহেশ্বর সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা শ্রীরামকে বলিলেন—আমার ক্ষেত্রে, মনিকর্ণিকায়, গঙ্গায় অথবা তটে যে কেহ দেহ ত্যাগ করিবে তাহার যেন মুক্তি হয়, ইহাই আমার বর, অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই।

শ্রীরাম বলিলেন—

ক্ষেত্রেহস্মিন্ তব দেবেশ যত্র কুত্রাপি বা মৃতাঃ।
কৃমিকীটাদয়োহপ্যাশু মুক্তাঃ সন্তু ন চান্যথা॥

হে দেবেশ, আপনার এই ক্ষেত্রে যে কোন স্থানে কৃমিকীটাদিও দেহত্যাগ করিলে

শীঘ্র মুক্ত হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। অবিমুক্ত আপনার ক্ষেত্রে সকলের মুক্তির জন্য আমি সেস্থলে পাষাণ প্রতিমাদিতে সন্নিহিত থাকিব। এখানে যে মানব ভক্তিসহকারে এই মন্ত্রে আমার অর্চ্চনা করিবে তাহাকে আমি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও মুক্ত করিব। আমার অথবা আপনার নিকট যে ব্যক্তি ষড়ক্ষর মন্ত্র লাভ করিবে, সে জীবিত কালে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে এবং মরণে আমায় প্রাপ্ত হইবে। হে শিব, যে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তির দক্ষিণ কর্ণে আমার মন্ত্র উপদেশ করিবেন তাহাতে সে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে।

লোককে মুক্তিদান করিবার জন্য স্বয়ং নাম ও সহস্র মন্বন্তর কাল মন্ত্র জপ ভগবান্ শঙ্কর ভিন্ন আর কেহ করেন নাই, এমন দয়াল আর কেহ নাই।

সদাচাররতোভূত্বা দ্বিজনিত্যমনন্যধীঃ।
ময়ি সর্ব্বাত্মকেভাবোমৎসামীপ্যভজত্যয়ম্॥ ২২

—মুক্তিক উপনিষৎ।

যে-সিদ্ধ সদাচারিরত হইয়া নিত্য অনন্যচিত্তে সর্ব্বাত্মক বিশ্বরূপ আমাকে ভক্তি করে সেই ব্যক্তি আমার সামীপ্য প্রাপ্ত হয়।

গুরূপদিষ্টেন মার্গেন ধ্যায়ন্মদ্‌গুণমব্যয়ম্।
মৎসাযুজ্য দ্বিজঃ সম্যগ্‌ভজেদ্ভ্রমর কীটবৎ। ২৪॥
সৈব সাযুজ্যমুক্তি স্যাদ্‌ব্রহ্মানন্দকরী শিবা॥

ভক্ত দ্বিজ গুরুপদিষ্ট মার্গে আমার অব্যয়গুণ ধ্যান করিতে করিতে ভ্রমর কীটবৎ (তেলাপোকা, কাঁচপোকার ন্যায়) উত্তমরূপে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সেই সাযুজ্য মুক্তি ব্রহ্মানন্দকরী, মঙ্গলদায়িনী। চতুর্ব্বিধা মুক্তি আমার উপাসনার দ্বারা লাভ হয়।

ইয়ং কৈবল্যমুক্তিস্তু কেনোপায়েন সিধ্যতি।
মাণ্ডুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষুণাং বিমুক্তয়ে ॥২৬॥

এই কৈবল্য মুক্তি কোন্ উপায়ে সিদ্ধ হয়? মুমুক্ষুগণের বিমুক্তির জন্য একমাত্র মাণ্ডুক্যই যথেষ্ট। তাহাতেও যদি জ্ঞান না হয় দশখানি উপনিষদ্ পাঠ কর, তদ্দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে আমার ধামে গমন করিবে। তথাপি যদি বিজ্ঞানের দৃঢ়তা না হয় তাহা হইলে দ্বাত্রিংশখানি উপনিষদ্ উত্তমরূপে অভ্যাস করতঃ স্থিরভাবে অবস্থান কর। যদি বিদেহ মুক্তি লাভের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে অষ্টোত্তর শত উপনিষদ্ পাঠ কর।

গৃহীত্বাষ্টোত্তরশতং যে পঠন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রারব্ধক্ষয়পর্য্যন্তং জীবন্মুক্তা ভবন্তি তে ॥২৪॥—মুক্তিক উপনিষৎ।

যে দ্বিজোত্তমগণ অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্ আচার্য্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া পাঠ করেন তাঁহারা প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত হন। কালবশে প্রারব্ধের ক্ষয় হইলে মামকী বৈদেহ-মুক্তি লাভ করেন। এই শাস্ত্র, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে পাঠ করিলেও বন্ধন মুক্ত হয়।

'যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স মামেতি ন সংশয়ঃ।'

এই উপনিষৎ-সকল যে ব্যক্তি পাঠ করে সে মানব আমাকে প্রাপ্ত হয় এ সম্বন্ধে সংশয় নাই। কৈবল্য-মুক্তি জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয়।

মারুতি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মুক্তি কি, তাহার সিদ্ধি কি প্রকারে হয় এবং সিদ্ধিরই বা কি প্রয়োজন।

শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—'পুরুষস্য কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখদুঃখাদি লক্ষণশ্চিত্তধর্ম্মঃ ক্লেশরূপত্বাদ্ বন্ধো ভবতি। তন্নিরোধনং জীবন্মুক্তিঃ। উপাধি বিনির্মুক্ত ঘটাকাশবৎ প্রারব্ধক্ষয়াদ্ বিদেহমুক্তিঃ। জীবন্মুক্তি বিদেহমুক্ত্যোরষ্টোত্তরশতোপনিষদঃ প্রমাণম্। কর্ত্তৃত্বাদি দুঃখনিবৃত্তিদ্বারা নিত্যানন্দা বাপ্তিতৎ প্রয়োজনং ভবতি। তৎ পুরুষ প্রযত্নসাধ্যং ভবতি।'

পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখদুঃখাদি লক্ষণ চিত্তধর্ম্ম ক্লেশরূপত্ব হেতু বন্ধ হয় তাহার নিরোধ জীবন্মুক্তি। উপাবিনির্মুক্ত ঘটাকাশের ন্যায় প্রারব্ধক্ষয় হইলে বিদেহ-মুক্তি লাভ হয়। জীবন্মুক্তি বিদেহ মুক্তির অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ প্রমাণ। কর্ত্তৃত্বাদি দুঃখনিবৃত্তি দ্বারা নিত্যানন্দ প্রাপ্তি তাহার প্রয়োজন, তাহা পুরুষ-প্রযত্ন-সাধ্য।

'দয়াল মহারাজ' বিচার-চন্দ্রোদয়ে বলিয়াছেন—

প্রঃ—জীবন্মুক্তি কি?

উঃ—দেহাদি প্রপঞ্চের প্রতীতির সহিত যে ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি তাহারই নাম জীবন্মুক্তি।

প্রঃ—জীবন্মুক্ত হইলেও প্রপঞ্চের প্রতীতি কিরূপ হয়?

উঃ—আবরণ ও বিক্ষেপ এই দুইটি অবিদ্যার শক্তি। তন্মধ্যে আবরণ-শক্তির জ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নাশ হয়। তজ্জন্য জ্ঞানীর অন্যজন্ম হয় না। পরন্তু প্রারব্ধের বলে দগ্ধ ধান্যের ন্যায় বিক্ষেপশক্তি থাকিয়া যায়। এইজন্য অবিদ্যা লেশ থাকে, সেইহেতু জীবন্মুক্তের প্রপঞ্চ প্রতীত হয়।

প্রঃ—জীবন্মুক্ত অবস্থায় প্রপঞ্চ প্রতীতি হয় কেন?

উঃ—যেমন রজ্জুজ্ঞান হইলেও সর্পভ্রান্তির নিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু কম্পাদি

থাকে, অথবা যেমন মরুভূমি জানিলেও মৃগজল দৃষ্ট হয় সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও বাধপ্রপঞ্চের প্রতীতি হয়।

প্রঃ—বাধিত প্রপঞ্চের অন্য দৃষ্টান্ত কি?

উঃ—ভারতযুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর পর অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। সেইদিন সত্যসঙ্কল্প ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে আজ যতক্ষণ গৃহে ফিরিয়া না আসি ততক্ষণ এই রথ এবং এই অশ্ব যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। তারপর অশ্বত্থামা ব্রহ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করেন তখন সেইক্ষণে অর্জ্জুনের রথ এবং অশ্ব ভস্মীভূত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপ সারথির সঙ্কল্প বলে আবার সেই রথ ও অশ্ব যেমন ছিল সেইরূপ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ স্থূল দেহরূপ রথে, পুণ্য পাপরূপ দুই চক্র, সত্ত্বরজস্তম তিনগুণ রূপধ্বজ, পঞ্চপ্রাণরূপ বন্ধন, দশ ইন্দ্রিয় অশ্ব, শুভ অশুভ শব্দাদি পঞ্চ বিষয়রূপ মার্গ, মনরূপ বল্গা, বুদ্ধিরূপ সারথি (শ্রীকৃষ্ণ), প্রারব্ধ কর্ম্ম তাঁহার সঙ্কল্প অহঙ্কার বসিবার স্থান এবং আত্মরূপী রথী অর্জ্জুন, বৈরাগ্য সাধনরূপ শাস্ত্র। সেই রথে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুন সৎসঙ্গরূপ রণভূমিতে গিয়াছেন। সেখানে গুরুরূপে অশ্বত্থামা উপদেশরূপ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। তখন জ্ঞানরূপ অগ্নি উদয় হইয়া সেইক্ষণেই দেহাদি প্রপঞ্চরূপ রথাদি বাধ করিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণরূপ সারথি-স্থানীয় বুদ্ধির প্রারব্ধ কর্ম্মরূপ সঙ্কল্প বলে দেহাদির নাশ হইল না। কিন্তু পরের দেহাদির প্রতীতি হইতে লাগিল। ইহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলে, ইহাই বাধিত প্রপঞ্চের প্রতীতি সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত।

প্রঃ—বিদেহ-মুক্তি কি?

উঃ—প্রপঞ্চ প্রতীতি রহিত ব্রহ্ম স্বরূপে যে স্থিতি, অথবা প্রারব্ধ কর্ম্মনাশের পর স্থূল সূক্ষ্ম শরীর অবয়বরূপ পরিণাম প্রাপ্ত অজ্ঞানের চৈতন্য বিষয়ে যে বিলয় তাহার নাম বিদেহ-মুক্তি।

ইহা হইল জ্ঞানিগণের গতীর কথা। ভক্তের গতির কথা এইরূপ দৃষ্ট হয়—

পরম ঐকান্তিক মহাত্মার সঙ্গের দ্বারা সংসারে নিস্পৃহ হইয়া গুরু উপদেশে শ্রীপতির শরণাগতি করিয়া সমস্ত প্রারব্ধ-কর্ম্ম ভোগ ও সঞ্চিত ও ক্রিয়মান-কর্ম্ম ক্ষীণ হইলে, কেবল পরমাত্মার ভরসায় ভরণপোষণ চিন্তার ত্যাগরূপ ন্যাস করতঃ, তাঁহার দয়ায় সমস্ত মায়াজাল হইতে মুক্ত ও অন্তর্যামী পরমাত্মার কৃপায় ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী হইতে সুষুম্না নাড়ী দ্বারা শরীর হইতে বহির্গত এবং প্রাকৃতিক বন্ধন হইতে মোক্ষপ্রাপ্ত হওত—অর্চ্চিদিন শুক্লপক্ষ উত্তরায়ণ ষণ্মাস সম্বৎসরাভিমানিনী দেবতা, সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুৎ বরুণ ইন্দ্র

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া লীলা বিভূতি এবং ত্রিপাদ বিভূতির সীমা বিরজা নদীতে স্নান করতঃ স্বয়ং প্রকাশ নিত্য বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইবার পর সেই স্থানে পরম ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করতঃ তাহার সহিত ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি গুণের অনুভব দ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত সেই পুরুষই ধন্য।

শ্রীভগবান্ বরদাচার্য্য মুমুক্ষুগণের নিত্য প্রাতঃকালে অনুসন্ধান যোগ্য (ধ্যেয়) দুইটী শ্লোকের দ্বারা সংক্ষিপ্ত সুপ্রকাশিত পরমার্থ বলিয়াছেন। শ্রীবৈষ্ণবগণ দেবযান-মার্গে গমন করতঃ স্বাভীষ্ট কৈঙ্কর্য্য করেন। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়—

স এতং দেবযানং পন্থান মাসাদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি স বায়ুলোকং স বরুণলোকং স আদিত্যলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মলোকস্যারোহ্রদো মুহূর্ত্তা যেষ্টিহা। বিরজা নদী তিল্যোবৃক্ষঃ সাযুজ্য সংস্থানমপরাজিত মায়তনম্॥ ইত্যাদি

ভক্তের গতির সম্বন্ধে এইরূপও দেখা যায়, অনন্য ভক্তকে শ্রীভগবান্ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বধামে লইয়া যান।

যাঁহারা মধুর ভাবের ভক্ত তাঁহাদের প্রার্থনা সুন্দর, দেহান্তে নিত্য-বৃন্দাবনে প্রার্থনা-অনুরূপ ভগবৎ সেবা করেন।

॥ স্বাভীষ্ট লালসা ॥

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার।
দুঁহু অঙ্গ নিরখিব দুঁহু অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব দোঁহাকার॥
মালা গাঁথিয়া দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূর তাম্বুল ভরি
যোগাইব অধর-যুগলে॥
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন এই মোর প্রাণধন
এই মোর জীবন উপায়।
জয় পতিত পাবন দেহ মোরে এই ধন,
তোমা বিনা অন্যে নাহি ভায়॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোর পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ॥

১০৭১। জগতের কোনও বস্তুর বিশ্লেষণ করলে পর তাতে সত্তা, প্রকাশ, আনন্দ, নাম এবং রূপ এই পাঁচ বস্তু মিলে। এর মধ্যে প্রথম বস্তু তিনটী ব্রহ্মের আপনার, আর শেষ দুটী জগতের, অতএব নামরূপ থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে সচ্চিদানন্দে অনুরাগ কর।

১০৭২। যে পর্য্যন্ত পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপের পরিচয় না হয় ততক্ষণ অবধি অবিদ্যারূপ সংসার এবং সংসারী-জীব প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক স্বরূপের পরিচয় হলেই জীবভাব এবং দৃশ্যমাত্র নিবৃত্ত হয়ে এক পরব্রহ্ম রূপই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

১০৭৩। শোক, মোহ, দুঃখ, সুখ এবং দেহের উৎপত্তি এই সব মায়ারই কার্য্য আর এই সংসারও স্বপ্নের মত বুদ্ধির বিকাশ, এর মধ্যে বাস্তবিকতা কিছু নাই।

১০৭৪। বিষয় বাসনার বশ হয়ে সাংসারিকবন্ধনে বন্দী হওয়া মানবধর্ম্ম নয়। স্ত্রী, ধন, পুত্র, পশু, ঘর, ভুমি, হাতী, ভাণ্ডার এ সমস্তই ধ্বংশশীল ক্ষণভঙ্গুর এবং অতি চঞ্চল। এতে মমতা রাখা ভুল। একমাত্র ভগবানের ভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত মোক্ষই অক্ষয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতএব সমস্ত মনুষ্যগণের ভগবদ্ভক্ত জীবের সংলগ্ন হওয়া উচিত।

১০৭৫। জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হয় এতে কোন সন্দেহ নাই; পরন্তু সেই জ্ঞানের সমাদর করবার মত মন তো হওয়া উচিত। বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান কখন স্থির থাকতে পারে না।

১০৭৬। ভোজনে বিষ দেওয়া হয়েছে এই কথা ভোজনকারীর জানা হয়ে যায়তো সে সত্বর থালা ছেড়ে উঠে পড়ে। এ প্রকার সংসারের অনিত্যতা এবং দুঃখস্বরূপতার কথা জানলেই মানুষের বৈরাগ্য হয়ে যায়। সে বৈরাগ্য মন থেকে চলে যায় না।

১০৭৭। আমি সংসারের সুখ-দুঃখ, জীবন-মরণ আর জরা এবং রোগ দেখে লয়েছি, তার থাবা (নখ) থেকে বাঁচবার জন্য আমি সন্ন্যাস লয়েছি, আবারও আমি মূর্খগণের মত সংসারের স্বাদ চাখবার জন্য ফিরে যেতে পারি!

১০৭৮। ভগবানের খোঁজ করা আর রাজ্যপদের ইচ্ছা রাখা একটী একসঙ্গে হতে পারে না। এতে এরূপই বিরোধ যেমন রৌদ্র এবং ছায়াতে, অগ্নি ও জলে। যে মানব রাজ্যপদ পেতে চায় তার শান্তি ইচ্ছা করা ব্যর্থ।

১০৭৯। দেহের চায়তো যত সুখ দুঃখ হোক ভক্ত তার খেয়াল করেন না। তাঁর চিত্তবৃত্তি একমাত্র ভগবদ্ভক্তিতে লেগে থাকে, সে নিত্য ভক্তির ঐশ্বর্যে আপ্লুত থাকে।

১০৮০। ঘরে প্রদীপ জ্বাল্‌লে তা জানালা দিয়েও প্রকাশিত হয়। তদ্রূপই ভগবান মনে প্রকট হলেই অন্য ইন্দ্রিয় সকলেও ভজনানন্দ উৎপন্ন করে দেয়।

১০৮১। যে কোনও প্রকারে হাসিতে দুঃখে অথবা অমনিই ভগবানের নামসকল উচ্চারণ করে নেয় তার সম্পূর্ণ পাপ নষ্ট হয়ে যায়।

১০৮২। সাংসারিক ভোগসমূহ প্রাপ্ত হয়েও যে তাহা নেয়নি সে পূর্ণ মনুষ্য, যে নেয় পরন্তু নিয়ে যথার্থ পাত্রগণকে দিয়ে দেয় সেও যথার্থ, কিন্তু কা'কেও দেয় না সে মাছি নয়, মধুমক্ষিকাও নয়, কেননা এরূপ করাতে সে আপনার অথবা পরের, কল্যাণ করে না।

১০৮৩। যে মানুষ পরলোকের সাধনা না ক'রে কেবল সংসারের সাধনাতেই লেগে থাকে সে ইহলোক এবং পরলোকে দুঃখ আর ক্ষতিই প্রাপ্ত হয়।

১০৮৪। পরমাত্মাকে জানলে সব বন্ধন নাশ হয়ে যায়। ক্লেশ সমূহ ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার জন্য জন্মমৃত্যুর অভাব হয়ে যায়। তাঁর ধ্যান করলে তিন দেহের ভেদ (নাশ) হয়ে যায়। মানুষ অপ্রাপ্তকাম হয়ে যায়। আর কেবল আপ্তকামই বিশ্বের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়।

১০৮৫। রক্ত মাংস ও হাড় সকলে তৈরী যন্ত্ররূপ বহু সংখ্যক মনুষ্য কেবল ভোজন পান করত জগতের পদার্থ সমূহকে খারাপ করে দেয়। তার মধ্যে বুদ্ধিমান মানুষ অত্যন্তই দুর্লভ। যে মোহের বশীভূত হয়ে বার বার জন্ম মৃত্যু আর জরারূপ দুঃখবিশিষ্ট সংসারেই পড়ে থাকে কোনও বিচার করে না তাকে পশু বলেই বোঝা উচিত।

১০৮৬। যে আপনার জন্য অথবা অপরের জন্য পুত্র ধন এবং রাজ্য চাহে না, আর অধর্ম্মের দ্বারা স্বীয় উন্নতি চাহে না সেই পুরুষই সদাচারী প্রজ্ঞাবান এবং ধার্ম্মিক।

১০৮৭। গরু যেমন আপনার গলায় পরানো মালার থাকা অথবা পড়ে যাওয়ার দিকে কোনও ধ্যান দেয় না, এপ্রকার প্রারব্ধের দড়িতে গাঁথা এই শরীর থাকে কিম্বা যায়, যার চিত্তবৃত্তি আনন্দরূপ ব্রহ্মে লীন হয়ে গেছে সেই পুরুষ তার দিকে দেখেই না।

১০৮৮। ভগবানের রূপের ধ্যান করো, ভগবন্নাম সঙ্কীর্ত্তন করো,

ভগবানের গুণানুবাদের গান করো, ভগবানের লীলাবলী পরস্পর কথন এবং শ্রবণ করো।

১০৮৯। হে ভগবন্, আমার জীবনের শেষ দিন কোন পবিত্র বনে শিব শিব শিব জপ করতে করতে যেন সময়গত হয়। সাপ এবং ফুলহার, বলবান শত্রু এবং মিত্র, কোমল পুষ্পশয্যা ও পাথরের শিলা, রত্ন ও প্রস্তর তৃণ এবং সুন্দরী কামিনী এ সকলে আমার যেন দৃষ্টি সমান হয়ে যায়।

১০৯০। ভগবান শ্রীরাম যার দিকে কৃপা নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন তার বিষও অমৃত হয়ে যায়, শত্রু মিত্র হয়ে যায়, সমুদ্র গোষ্পদতুল্য হয়, আগুন শীতল হয়ে যায় এবং বিশাল সুমেরু পর্ব্বত ধুলিকণার সমান হয়ে যায়।

১০৯১। প্রেম প্রেম তো সকলে বলে পরন্তু প্রেমকে কেহ চিনে না। যাতে অষ্টপ্রহর বিগলিত হয়ে থাকে সেই প্রেম।

১০৯২। ইচ্ছা তখন লেগেছে বুঝবে যখন কি তা কখন দূর হবে না। জীবন ভোর ইচ্ছা লেগে থাকে আর মরণের পর প্রিয়ের সঙ্গেই একইভূত হয়।

১০৯৩। প্রাণী যখন থেকে জন্ম লয় তখন থেকে তার বয়স কমতে থাকে। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য যেমন তেল কমে গেলে প্রদীপ দেখতে দেখতে নিভে যায় তদ্রূপ তার জীবন নির্ব্বাপিত হয়।

১০৯৪। ঈর্ষ্যা, লোভ, ক্রোধ আর অপ্রিয় কিম্বা কটুবাক্য এ থেকে সতত স্বতন্ত্র থাকো, ধর্ম্ম প্রাপ্তির এই পথ।

১০৯৫। তৃণের সমান লঘু হলে, বৃক্ষের সমান সহিষ্ণু হলে মান ত্যাগ করে অপরকে মান দিলে ইষ্টের মহিমা বুঝলে ও অভিমান ত্যাগ করলে সাধনা শীঘ্র সফল হয়। এইরূপ যোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য সৎসঙ্গ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এবং ভক্ত-চরিত্রের অভ্যাস, গুরু-আজ্ঞা পালন এবং মাতা পিতা আদি গুরুজন-দিগের আর ভক্তগণের সেবা পূজা করা অত্যন্ত আবশ্যক।

১০৯৬। সত্যযুগে ভগবানের ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরযুগে সেবার দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় তা কলিযুগে শ্রীহরির কীর্ত্তনের দ্বারা লাভ হয়। অতএব যে ব্যক্তি দিনরাত শ্রীহরির নাম প্রেমপূর্ব্বক কীর্ত্তন করতে করতেই সংসারের সকল কাজ করে সে ভক্তগণ ধন্য।

১০৯৭। এক ক্ষণের জন্যও আয়ু নাশ হওয়া বন্ধ হয় না, কেননা শরীর অনিত্য। অতএব বুদ্ধিমান পুরুষগণের বিচার করা উচিত যে নিত্য বস্তু কোনটী? ঐ নিত্য বস্তুকে জেনে লওয়াই সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

১০৯৮। যখন কাল সুমেরু পর্ব্বতকেও নাশ করে দেয়, বড় বড় সাগরকেও

শুকিয়ে দেয়, পৃথিবীকে বিনষ্ট করে দেয় তখন হাতীর কানের কিনারার স্থায় চঞ্চল মানুষ তো গণনার মধ্যেই নয়।

১০৯৯। কাম, ক্রোধ বড়ই ক্রূর, এতে দয়ার নাম নাই, এরা কালই বুঝবে, এরা জ্ঞাননিধির সাপ, হৃদয়-কন্দরের বাঘ, ভজনমার্গের ঘাতক। এরা জলে নয় বিনা জলেই ডুবিয়ে দেয়, বিনা আগুনে পুড়িয়ে দেয় আর বিনা অস্ত্রেই সংহার করে।

১১০০। সেই মাতা পিতা ধন্য আর সে পুত্র ধন্য যে কোন প্রকারে রামের ভজন করে, যার মুখ থেকে ভুলক্রমেও রামের নাম বহির্গত হয় তাঁর পায়ের জুতা আমার চর্ম্মের দ্বারা তৈরী হলেও কম হয়। সেই চণ্ডাল ভক্ত যিনি দিবারাত্র রামের ভজনা করেন; যাতে হরির নাম নাই সেই উচ্চকুল কোন কাজের জন্য?

১১০১। মনরূপী পক্ষী ততদিন পর্য্যন্ত বিষয় বাসনারূপ আকাশে উড়ে যে পর্য্যন্ত জ্ঞানরূপী বাজের আক্রমণে না আসে।

১১০২। চাউলের আবশ্যকতা হয়ে থাকে কিন্তু চাউল বুন্‌লে চাউল হয় না। চাউল পাবার জন্য ধান বুন্‌তে হয়। ধানের তূষ যদিও অনাবশ্যক পরন্তু তূষ ভিন্ন ধান অঙ্কুরিত হয় না। এ প্রকার শাস্ত্র বিহিত আচার সকল পালন করা ব্যতীত কখন ধর্ম্ম লাভ হয় না।

১১০৩। যে বস্তু অনাদি এবং অনন্ত তাতে সুখ আছে। অন্ত বিশিষ্ট বস্তুতে সুখ নাই। অন্তবান বস্তুর একদিন অবশ্য নাশ হবে। এজন্য যে তার উপর আসক্ত হবে তাকে দুঃখী হতেই হবে।

১১০৪। যিনি মূল বিনা অমর লতাকে পালন করেন সে প্রভুকে ছেড়ে দ্বিতীয় কার খোঁজ করা উচিত।

১১০৫। যে একমাত্র প্রভু, আপনার নিয়ামক শক্তির দ্বারা সকলকে নিয়মে রাখেন, যে এক, সমস্ত লোকের উৎপত্তি এবং লয় করতে সমর্থ, সেই দেবতাকে যে লোক চিনে লয় সে অমৃতরূপ হয়ে যায়।

১১০৬। মনুষ্যের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ মন। বিষয়াসক্ত মনের দ্বারা বন্ধন হয় আর বিষয়বৃত্তি রহিত মনের দ্বারা মুক্তি। অতএব মুক্তিপ্রার্থী মনকে সদত বিষয় সমূহ হতে রহিত রাখবে। বিষয়-সঙ্গ হতে মুক্ত মন যখন উন্মনী ভাবকে প্রাপ্ত হয় তখন পরমপদের প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

১১০৭। জীবিত অবস্থাতে লোক শরীরকে দেব (নরদেব, ভূদেব) শব্দের দ্বারা আহ্বান করে কিন্তু মরে যাওয়ার পর সেই শরীরকে যা (পচে

গেলে) পোকা হয়, যা (দাহ করলে) ছাই হয়ে যায়, অথবা (শৃগাল কুকুরাদি ভোজন করলে তাদের) বিষ্ঠা হয়ে যায় এমন শরীরের জন্য যে মানব অপর প্রাণিগণের সঙ্গে অনিষ্টাচরণ করে যার দ্বারা নরক প্রাপ্তি হয়, সে কি আপনার স্বার্থকে জানে?

—০—

শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

অনেকের ধারণা যে শ্রীচৈতন্য বৈদিক ধর্ম হইতে ভিন্ন একটি নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উক্তিগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে তাঁহার ধর্মমত বেদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে ঋষিগণ বেদের অর্থই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য তিনি বেদ, পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতি সকল ধর্ম্মগ্রন্থকেই (যাহাদের সাধারণ নাম শাস্ত্র) প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা বলা যায় যে হিন্দু ধর্মের সকল সম্প্রদায়ই শাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শাস্ত্র-বাক্যের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রবাক্যের ব্যাখ্যা সম্বন্ধেই মতভেদ আছে এবং তাহা হইতেই বিভিন্ন হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ

(গীতা ১৬।২৪)

সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি শিরোধার্য্য করেন।

পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে বাসুদেব সার্বভৌমকে উপদেশ দিবার সময় শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন,—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যেই অর্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

'শ্রুতি' অর্থাৎ বেদ। 'প্রমাণ' শব্দের অর্থ, জ্ঞানলাভের উপায়। (প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণং)। তাহার পর বলিয়াছেন—

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥

(ঐ গ্রন্থ, ঐ পরিচ্ছেদ)

কাশীতে সনাতন গোস্বামীকে ধর্মতত্ত্ব উপদেশ দিবার সময় শ্রীচৈতন্য মুণিবাক্য বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং,
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজ নিবহাস্তে তদনুগা,
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণং॥

"হে মুরারি, শ্রুতিরূপ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমাকে আরাধনা করিতে আদেশ দেন। মাতার যেরূপ বাণী স্মৃতিরূপ ভগিনীও সেইরূপ বলেন। পুরাণ প্রভৃতি ভ্রাতাগণও শ্রুতিরূপ মাতার অনুগামী। অতএব সত্যই জানিলাম যে হে মুরারি তুমি-ই একমাত্র শরণ।" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদ)।

এখানেও প্রসঙ্গক্রমে শ্রীচৈতন্য বলিলেন যে সত্য জ্ঞান লাভের উপায় শ্রুতি (বেদ), স্মৃতি (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র) এবং পুরাণ প্রভৃতি। 'পুরাণ প্রভৃতি' এই বাক্যে রামায়ণ, মহাভারতও অন্তর্গত হইয়াছে।

এ বিষয়ে ব্যাসদেব বলিয়াছেন,

"ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥"

(মহাভারত ১।১।২৬৭)

"ইতিহাস (অর্থাৎ রামায়ণ, মহাভারত) এবং পুরাণের সাহায্যে বেদের অর্থ দৃঢ়ভাবে বুঝিবে। যে ব্যক্তি রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণ পাঠ করে নাই সে বেদের ব্যাখ্যা করিলে বেদ তাহাকে ভয় করেন যে এই ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে (অর্থাৎ বেদের দুর্ব্যাখ্যা করিবে)।"

সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিবার সময় শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন,

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥
শাস্ত্রগুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২০ পরিচ্ছেদ)

পুনশ্চ বলিয়াছেন—

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্যক

(শ্রীচৈঃ চঃ, ঐ)

সনাতন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন—

"কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার"

ইহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বলিলেন—

প্রভু কহে অন্য অবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।
কলি অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি॥
সর্বজ্ঞ মুনির বাক্যে শাস্ত্র প্রমাণ।
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান॥

(শ্রীচৈঃ চঃ, ঐ)

(শ্রীচৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ইহার সমর্থনে বৈষ্ণব আচার্য্যগণ শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ সমর্থন করিতেন কি না এবিষয়ে অনেকের মনে কিছু সন্দেহ আছে। কারণ তাঁহার কোনও কোনও আচরণ জাতিভেদের বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে। হরিদাস মুসলমান হইলেও তিনি তাঁহার মৃতদেহ কোলে করিয়াছিলেন এবং সমাধি দিয়াছিলেন। রূপ সনাতনকে (যাঁহারা নিজদিগকে নীচ জাতি বলিতেন এবং উচ্চবর্ণের ভক্তগণ হইতে দূরে থাকিতেন) শ্রীচৈতন্যদেব আলিঙ্গন করিতেন, তাঁহাদিগকে পরম পবিত্র বলিতেন। কিন্তু তাঁহার এইরূপ কয়েকটি আচরণ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে যে তিনি জাতি ভেদের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার জীবনের অন্য ঘটনাও আলোচনা করা উচিত। গয়া যাইবার সময় তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, অনেক ঔষধ ব্যবহার করিয়াও জ্বর ছাড়ে নাই,

তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
সর্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র পাদোদক পানে॥
বিপ্র পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপন সাক্ষাতে॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড ১২ অধ্যায়)

শ্রীচৈতন্য যখন বনপথে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ সাতজন আসি করেন নিমন্ত্রণ॥

*   *   *

যাঁহা বিপ্র নাহি তথা শূদ্র মহাজন।
আসি তবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য ব্যঞ্জন।
বন্য ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ)

সুতরাং তিনি অব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ করেন নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে তিনি জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দনীয় মনে করেন নাই। হরিদাস, রূপ ও সনাতন সম্বন্ধে তাঁহার আচরণের কারণ এই যে শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে নীচ জাতির ব্যক্তিও ভগবদ্ভক্তির দ্বারা পবিত্র হয়। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবত হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন (শ্রীচৈ চঃ মধ্যলীলা ২৪ পরিচ্ছেদ)

কিরাতহূণান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কশা
আভীর শুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ।
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ২।৪।১৮)

"কিরাত, হূণ, যবন প্রভৃতি জাতির লোক যাঁহার (বিষ্ণুর) ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হন, সেই ভগবানকে প্রণাম করি।"

হরিদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক বলিয়াছিলেন—(শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য লীলা ১১ পরিচ্ছেদ)

অহোবত শ্বপচো হতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তে পুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩৩।৭)

"এজন্য যে সকল চণ্ডালের মুখে তোমার নাম বিদ্যমান থাকে, তাহারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যাহারা তোমার নাম করে তাহারা তপস্যা করিয়াছে, হোম করিয়াছে, স্নান করিয়াছে, বেদ পাঠ করিয়াছে (এরূপ মনে করিতে হইবে)।"

এই সকল শাস্ত্র বাক্য অনুসারে শ্রীচৈতন্য নীচজাতির ভক্তকে পবিত্র বলিয়া

গ্রহণ করিতেন। তিনি যে জাতিভেদকে কুপ্রথা মনে করিতেন, বা শাস্ত্রবাক্য মানিতেন না, ইহা নহে। তিনি যে জাতিভেদের নিয়ম মানিতেন ইহা বৃন্দাবন যাইবার পথে তাঁহার দ্বারা প্রমাণ হয়। হরিদাস, রূপ ও সনাতন পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না। শ্রীচৈতন্য বলিয়াছিলেন যে যদিও ইঁহারা ভক্তির দ্বারা পবিত্র হইয়াছেন তথাপি শাস্ত্রের বিধান মান্য করিয়া ইঁহারা ভাল কাজ করিয়াছেন, কারণ,—

মর্য্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪ পরিচ্ছেদ।)

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড় হইতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ পুরী আসিয়াছেন। মহাপ্রভু ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতেছেন। হরিদাসকে না দেখিয়া বলিলেন, "হরিদাস কোথায়?" হরিদাস দূরে রাজপথপ্রান্তে পড়িয়াছিলেন।

ভক্ত সব ধাইয়া আইলা হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে চলহ ত্বরিতে॥
হরিদাস কহে মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার॥
* * *
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল॥
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য লীলা, ১১ পরিচ্ছেদ)।

তাহার পর যখন মহাপ্রভু হরিদাসের সহিত দেখা করিতে গেলেন, হরিদাস দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন, মহাপ্রভু তাহাকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তখন—

হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

হরিদাস বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন এজন্য মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইল যে মহাপ্রভু বর্ণাশ্রম ধর্মকে সম্মান করিতেন। ভাগবত বলিয়াছেন যে ভগবানের নাম লইলে নীচ জাতির লোকও পবিত্র হয় এজন্য মহাপ্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করিতেন। মহাপ্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এজন্য বলা যায় না যে মহাপ্রভু শাস্ত্রবিরোধী আচরণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র বাক্য দ্বারা তিনি তাঁহার আচরণ সমর্থন করিয়াছিলেন।

সনাতন জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট যাইতেন না। বলিয়াছিলেন—

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাহে সেবক প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হইলে সর্বনাশ হইবে মোর॥
শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হইয়া তারে কিছু কহিতে লাগিলা॥
"যদ্যপি তুমি হও জগৎ পাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব মুনিগণ॥
তথাপি ভক্ত স্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

সুতরাং কেবল সাধারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম নহে, অস্পৃশ্যতার বিধানগুলিও শাস্ত্রীয় বিধান বলিয়া মহাপ্রভু সম্মান করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তগণ সেই সকল নিয়ম মানিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষণ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু ভক্ত নীচ জাতির হইলেও তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন। ইহা যে শাস্ত্র বাক্য লঙ্ঘন করিয়া করিতেন তাহা নহে। শাস্ত্র হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেন যে ভক্ত নীচ জাতির হইলেও তাহার দেহ পবিত্র।

অতএব মহাপ্রভু বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, এবং স্মৃতি শাস্ত্র সকলকেই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন এবং বাস্তব জীবনে তাহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। জাতি বিভাগ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি বিষয়েও তিনি শাস্ত্র বিধান অনুসারে চলিতেন এবং তাঁহার ভক্তগণ চলিলে সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি

কখনও এ কথা বলেন নাই যে হরিদাস পরমভক্ত এজন্য তাহাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত। অপর পক্ষে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই বলিয়া হরিদাসের সিদ্ধিলাভ করিবার পথে কোনও বাধা উপস্থিত হয় নাই।

—০—

একাদশাক্ষর স্তোত্র

[শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়]

সীমিত জগতে তুমি অসীম উদার
তারক ব্রহ্মের নাম করিছ কীর্ত্তন,—
'রাম রাম সীতারাম'—মহানাম তাঁর
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকাতলে মৃত্যুহীন ধন—
দান করি অবিশ্রাম, হে মহাসারথি,
সর্ব্বত্র সবারে তুমি দাও দিব্যগতি!

ওঁকার-নন্দিত তব সাধন-ত্রিদিবে
কারুণ্য-অমৃত-সিন্ধু উত্তাল উচ্ছল;—
রস-স্বরূপের রসে পরিপ্লাবি' জীবে
নাদ-বিন্দু রূপে করে নিত্য টলমল।
থলে জলে মহাকাশে ঝরে শুধু নাম—
জয় নাম—জয় রাম—জয় সীতারাম!'

—০—

শ্রীশ্রীএকাদশী মহিমামৃত

॥ দ্বিতীয় হিল্লোল ॥

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

শিষ্য। একাদশী মহাদেবী শ্রীভগবানের শরীর হইতে মুর নামক অসুরকে বধ করিবার জন্য মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে আবির্ভূতা হন। প্রতি মাসে একাদশীর নাম কি এক? উপবাসের ফল কি একই প্রকার?

গুরু। না বৎস, ষড়বিংশতি একাদশীর পৃথক পৃথক নাম ও ফলাদির কথা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

শিষ্য। মাস তো দ্বাদশটী, একাদশী ষড়বিংশতি কিরূপে হইলেন?

গুরু। অধিক মাস অর্থাৎ মল মাসের দুইটী একাদশী লইয়া একাদশী ষড়বিংশতি, ইহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামের কথা শ্রবণ কর। মার্গশীর্ষে কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে একাদশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগজ্জননী। একাদশীর নাম উৎপত্তি। মার্গশীর্ষে শুক্লা একাদশীর নাম মোক্ষদা। পৌষের কৃষ্ণা শুক্লা একাদশীর নাম সফলা—পুত্রদা। মাঘের কৃষ্ণা শুক্লার নাম ষটতিলা, জয়া। ফাল্গুনের কৃষ্ণা শুক্লা বিজয়া আমলকী। চৈত্রের কৃষ্ণা শুক্লা পাপমোচিনী কামদা। বৈশাখের কৃষ্ণা শুক্লা বরূথিনী মোহিনী। জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা শুক্লা একাদশী দুইটীর নাম অপরা নির্জ্জলা। আষাঢ়ের কৃষ্ণা শুক্লা যোগিনী পদ্মা। ইহার অপর নাম শয়নী। শয়ন একাদশী বলিয়া ইনি বিখ্যাতা। শ্রাবণের কৃষ্ণা শুক্লার নাম কামিকা পুত্রদা। ভাদ্রের কৃষ্ণা শুক্লার নাম অজা পরিবর্ত্তিনী। ইনি পার্শ্ব একাদশী বলিয়া কথিত হন। আশ্বিনের কৃষ্ণা শুক্লার নাম ইন্দিরা পাপাঙ্কুশা, কার্ত্তিকের কৃষ্ণা শুক্লা রমা প্রবোধিনী। এই একাদশী উত্থান একাদশী নামে বিখ্যাতা। অধিক মাসের শুক্লা কৃষ্ণা একাদশীর নাম পদ্মিনী পরমা।

শিষ্য। এই সমস্ত একাদশীর মহিমা পৃথক পৃথক বলুন।

গুরু। শ্রবণ কর। একদিন শ্রীভগবান ও যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, যুধিষ্ঠির বলিলেন—

বন্দে বিষ্ণুং প্রভুং সাক্ষাল্লোকত্রয় সুখপ্রদম্।
বিশ্বেশং বিশ্বকর্ত্তারং পুরাণং পুরুষোত্তমম্ ॥১॥

ত্রিভুবনের সাক্ষাৎ সুখপ্রদ বিশ্বেশ্বর বিশ্বকর্ত্তা পুরাতন পুরুষোত্তম প্রভু বিষ্ণুকে বন্দনা করি।

হে দেব দেবেশ, হে শ্যামসুন্দর, আমার একটী মহান্ সংশয় লোক সকলের হিতের জন্য এবং পাপক্ষয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লপক্ষে একাদশীর কি নাম, বিধি কি এবং কোন দেবতাকে পূজা করিতে হয়, তুমি তাহা আমায় সবিস্তারে বল।

শ্রীভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তাহা শুনিয়া বলিলেন—হে রাজন্, আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন; আপনার মতি অতিশয় বিমলা। আমি উত্তম হরিবাসরের কথা বলিতেছি। সেই আমার প্রিয়া মহাদেবী দ্বাদশী। মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণপক্ষে উৎপন্না হইয়াছে। মুর নামক অসুরকে বধ করিবার জন্য আমার দেহ হইতে মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণপক্ষে প্রথম উৎপন্না একাদশী উৎপত্তি নামে কথিতা হয়।

শিষ্য। তাহা হইলে মার্গশীর্ষ মাসে কৃষ্ণপক্ষে প্রথম উৎপন্না একাদশীর নাম "উৎপত্তি"।

গুরু। হাঁ বৎস!

শিষ্য। দেব, শ্রীভগবান দ্বাদশী বলিলেন কেন?

গুরু। বৈষ্ণবগণের পক্ষে দশমী সংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিতে নাই। যদি পরদিন একাদশী না থাকে তাহা হইলে দ্বাদশীতে উপবাস করা কর্ত্তব্য। একাদশী দ্বাদশী দুইটীই শ্রীভগবানের প্রীতিদায়িনী তিথি। দ্বাদশী তিনি প্রধানা—একাদশী ব্রতটী দ্বাদশী ব্রত বলিয়া বিখ্যাতা। দ্বাদশী তিথিতে অবশ্য পারণ করিতে হয়, তজ্জন্য ইহার নাম দ্বাদশী ব্রত। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে, রাজা অম্বরীষ—

হরিরারাধয়িষুঃ কৃষ্ণং মহিষ্যাতুল্যশীলয়া।
যুক্তঃ সম্বৎসরং বীরো দধার দ্বাদশীব্রতম্ ॥২৯॥

ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রকে আরাধনা করিবার জন্য আপনার তুল্য শীলবতী ভার্য্যার সহিত এক বৎসরকাল দ্বাদশী ব্রত করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন মার্গশীর্ষে শুক্লা একাদশীর নাম মোক্ষদা। সর্ব্বপাপক্ষয়কারিণী পরমা সেই একাদশীতে প্রযত্ন সহকারে গন্ধ পুষ্প ধূপ নৃত্য-গীত আদির দ্বারা দামোদরের অর্চ্চনা করিতে হয়। হে রাজন্, ইহার সম্বন্ধে একটী পৌরাণিকী কথা বলিতেছি যাহা শ্রবণ মাত্রে মানব বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। শ্রোতার পুণ্য প্রভাবে অধোপতিগত পিতামাতা পুত্র প্রভৃতি স্বর্গে গমন করে—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

পুরাকালে রমণীয় গোকুল নগরে বৈখানস নামক এক রাজর্ষি ছিলেন, তিনি প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে চতুর্ব্বেদবিদ্

ব্রাহ্মণগণও নির্বিঘ্নে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ও বেদপাঠ করত পরমসুখে অবস্থান করিতেন। সে রাজ্যে ধন ধান্য সুখ সম্পদ কিছুরই অভাব ছিল না।

একদিন রাজা স্বপ্নে দেখিলেন—তাঁহার পিতা নরকে পতিত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—পুত্র, আমাকে উদ্ধার কর। রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া যাইল, কোনরূপে অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহিত করত প্রভাতে ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিয়া বলিলেন, স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে আমার কিছু ভাল লাগিতেছে না। এই বিশাল রাজ্য অসহ্য অসুখকর বোধ হইতেছে। অশ্ব গজ ধন-সম্পত্তি প্রাণ কিছু চাহিতেছে না। পুত্র কলত্র কেহই আমার সুখকর বোধ হইতেছে না। আমি কি করি, কোথায় যাই। আমার শরীর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—হে বিপ্রেন্দ্রগণ, আমি আপনাদের শরণাপন্ন, আমায় বলুন দান ব্রত তপস্যা যোগ কিসের দ্বারা আমার পিতা মুক্তিলাভ করিবেন। যাহার পিতা নরকে গমন করিয়াছেন, সেই পুত্রের জীবনে কি প্রয়োজন, তাহার জন্ম নিরর্থক। রাজার কথা শ্রবণ করত ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—হে রাজন্, নিকটে ত্রিকালজ্ঞ পর্বত-মুনির আশ্রম আছে, তথায় গমন করুন, তিনি ইহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করত বিষণ্ণ রাজা পর্বত-মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। সেই বিপুল আশ্রমে মুনিগণ অবস্থান করিতেছেন। বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত মহামুনি পর্বতকে দর্শন করত রাজা দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে যাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। মুনিবর তাঁহাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। রাজা উপবিষ্ট হইলে পর্বত-মুনি বলিলেন—হে রাজন্, তোমার স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ ও সৈন্য এই সপ্তাঙ্গের কুশল তো? নিষ্কণ্টক রাজ্য সুখে ভোগ করিতেছ তো?

রাজা বলিলেন হে মুনিবর, আপনার প্রসাদে আমার সপ্ত-রাজ্যাঙ্গের কুশল, সমস্ত বিভব অনুকূল হইলেও এক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তজ্জন্য আমি আপনার চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, অপনি আমার কি কর্ত্তব্য তাহা বলুন।

মুনিবর রাজার কথা শ্রবণ করত মুহূর্ত্তকাল ধ্যান করিয়া নিমীলিত নেত্রে রাজাকে বলিলেন—হে রাজন্, তোমার পিতার পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের কথা আমি অবগত হইলাম। পূর্বজন্মে তোমার পিতার দুইটী পত্নী ছিল। একটী পত্নীতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া অপরা পত্নীর ঋতুভঙ্গ করিয়াছিলেন। ঋতুকালে কাতরভাবে প্রার্থনাকারিণী পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ না করায় তিনি নরকে পতিত হইয়াছেন।

রাজা তাহা শ্রবণ করত বলিলেন হে মুনিবর, কি ব্রত অথবা কি দান করিলে আমার নরকগত পিতা মুক্তি লাভ করিবেন আপনি আমায় তাহা বলুন।

পর্ব্বত মুনি কহিলেন—হে রাজন্, মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে "মোক্ষদা" নাম্নী হরির প্রিয়া তিথিতে সপুরিবারে ব্রতানুষ্ঠান করত সেই পুণ্য তোমার পিতাকে প্রদান কর, তাহার প্রভাবে তাঁহার মোক্ষলাভ হইবে।

অনন্তর রাজা তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বগৃহে আসিয়া জ্ঞাতি বন্ধু স্ত্রী পুত্র দাসদাসী সহ মার্গশীর্ষ শুক্লা একাদশী "মোক্ষদা"য় যথাবিধানে ব্রত করত সেই পুণ্য নরকগত পিতাকে দান করিবামাত্র তিনি নরক হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক দিব্যদেহ লাভ করিলে চারণগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল। দিব্য দেহধারী রাজা পুত্রকে বলিলেন—পুত্র তোমার মঙ্গল হইক, আমি তোমার কৃত কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি লাভ করিলাম। দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। রাজার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজন্, যে ব্যক্তি এই মোক্ষদা একাদশী ব্রত করে তাহার সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায় এবং দেহ ত্যাগান্তে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। এই মাহাত্ম্য পঠন কিম্বা শ্রবণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। এই মোক্ষদা একাদশী চিন্তামনি সদৃশী, স্বর্গ মোক্ষ যে যাহা প্রার্থনা করে সে তাহাই প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। আপনি অন্যান্য একাদশীর কথা বলুন।

গুরু। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কৃষ্ণ, পৌষমাসে কৃষ্ণপক্ষে যে একাদশী তিথি তাহার নাম কি, কোন দেবতাকে পূজা করিতে হয়, তাহার বিধি কি? আমায় বিস্তারিত ভাবে বল।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন—হে রাজন্, আপনার স্নেহ হেতু আপনাকে তাহা বলিতেছি। প্রচুর দক্ষিণাসহ যজ্ঞ করিলে আমার তদ্রূপ তুষ্টি হয় না যেমন একাদশী ব্রতের দ্বারা তুষ্ট হই। সেই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে একাদশী ব্রত করা কর্ত্তব্য। পৌষমাসে কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম সফলা, নারায়ণ অধিদেবতা, তাঁহাকে প্রযত্ন সহকারে পূজা করিতে হয়। পূর্ব্ববিধি অনুসারে একাদশী ব্রত করা কর্ত্তব্য। সর্পগণের মধ্যে যেমন শেষ, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, যেমন যজ্ঞ সকলের মধ্যে অশ্বমেধ, নদী সকলের মধ্যে জাহ্নবী, দেবগণের মধ্যে যেমন বিষ্ণু, দ্বিপদগণের মধ্যে যদ্রূপ ব্রাহ্মণ,—হে রাজন! সেইরূপ সমস্ত ব্রতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত একাদশী। সফলা একাদশী তিথিতে দেশোদ্ভব শুভ ফলের দ্বারা নারায়ণের অর্চ্চনা করিতে হয়। নারিকেল বীজ পুরক জম্বীর দাড়িম ফুল ফল লবঙ্গ অন্যান্য বিবিধ ফল আম্র ফল ও ধূপদীপাদির দ্বারা দেবদেবেশকে পূজা করিতে হয়। সফলা একাদশীতে দীপদান বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে। প্রযত্ন সহকারে রাত্রি জাগরণ করা কর্ত্তব্য. একাগ্রমনে রাত্রি জাগরণের ফল শ্রবণ করুন। ইহলোকে

তাহার সমান যজ্ঞতীর্থ অথবা কোন ব্রত নাই। হে রাজশার্দ্দুল, সফলা একাদশীর কথা শ্রবণ করুন।

মাহিষ্মত রাজার চম্পাবতী নাম্নী একটী বিখ্যাতা পুরী ছিল। সেই রাজর্ষির চারিটী পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র লুম্পক মহাপাপী পরদারগামী, সতত দ্যূতক্রীড়া ও বেশ্যারত, পিতার সমস্ত দ্রব্য অপব্যবহারকারী অসদ্বৃত্তিনিরত হইয়াছিল। নিত্য দেবতা ও দ্বিজনিন্দক বৈষ্ণবনিন্দক এইরূপ অসচ্চরিত্র পুত্রকে রাজর্ষি রাজ্য হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দিলেন।

লুম্পক রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল পিতা এবং বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত আমার কি কর্ত্তব্য! কিছুক্ষণ চিন্তা করত স্থির করিল বনে গমন করি, দিবাভাগে বনে থাকিব রাত্রে নগরে আসিয়া চুরি করিব। এইরূপ স্থির করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক জীবহিংসা ও ফলাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। একটী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বাস করত সেই পাপকর্ম্মা লুম্পক নিত্য নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইল। পৌষ মাসে সফলা একাদশীর পূর্ব্বদিন দশমীর রাত্রিতে বস্ত্রাভাবে অত্যন্ত শীতপীড়িত হইয়া মৃতবৎ রাত্রি যাপন করিল। প্রাতঃকালেও তাহার সংজ্ঞালাভ হইল না। সফলা একাদশীর দিন মধ্যাহ্নে তাহার চৈতন্য হইল ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া কম্পিত কলেবরে টলিতে টলিতে আহার্য্য অন্বেষণে গমন করিল। জীবহিংসা করিবার শক্তি না থাকায় বৃক্ষতলে পতিত ফল কিছু সংগ্রহ করত আবাস বৃক্ষতলে আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইল। শরীরের দুর্ব্বলতা ক্ষুধা পিপাসা ও শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। মানুষের দুঃসময়ে শ্রীভগবানকে মনে পড়ে, লুম্পক সেই ফল সকল বৃক্ষমূলে রাখিয়া বলিল "ফলৈ রেভিঃ প্রীয়তা ভগবান্ হরিঃ"। শীতে সমস্ত রাত্রি উপবিষ্ট হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে বাধ্য হইল। সফলা একাদশীতে ফলের দ্বারা পূজা ও রাত্রি জাগরণে মধুসূদন তুষ্ট হইলেন, তাহার সমস্ত পাপ দূর হইয়া যাইল। প্রাতঃকালে তাহার নিকট একটী দিব্য অশ্ব আসিয়া উপস্থিত হইলে আকাশবাণী হইল—হে নৃপনন্দন, সফলার প্রভাবে বাসুদেবের প্রসাদে নিহত-কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। তুমি পিতার সমীপে গমন করত নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। আকাশবাণী শ্রবণ করত লুম্পক অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল। ভগবদ্ কৃপায় দেখিতে দেখিতে তাহার শরীর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া যাইল। ভগবানকে প্রণাম করত বৈষ্ণববেশ ধারণ পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ পিতা গৃহাগত পুত্রের বেশ দর্শনে এবং তাহার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন লুম্পকের উপর শ্রীভগবানের কৃপা হইয়াছে, তিনি

সাদরে তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলেন। লুম্পক পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রতি একাদশীতে তিনি হরিবাসর করিতেন। বিষ্ণুভক্ত রাজার অনুকরণে প্রজাগণও বিষ্ণুভক্ত হইল; সকলে হরিবাসর ভাগবত্ কথা ও নামকীর্ত্তনে পরম আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। লুম্পকের কয়েকটি পুত্র সন্তান হইল। লুম্পক "রাজ্যের কর্ত্তা শ্রীভগবান, আমরা তাঁহার দাসদাসী" এইভাবে ভগবৎ সেবা করত বহুদিন রাজ্যশাসন পূর্ব্বক পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনে প্রস্থিত হইলেন। তথায় ভগবদ্ধ্যানে তন্ময় হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। যাহারা এই সফলা একাদশী ব্রত করে তাহারা ইহলোকে যশঃলাভ করত অন্তে মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। যে মানবগণ সফলা একাদশী করে তাহারা ধন্য, সেই জন্মেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাহারা সফলা একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, তাহারা রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করত অন্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। সফলা একাদশীর মাত্র মাহাত্ম্য শ্রবণে মানুষ স্বর্গে গমন করে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের কথা মিথ্যা বলিবার সাহস নাই, কিন্তু মন বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না।

গুরু। বৎস, মাহাত্ম্যের এমন প্রভাব আছে যে স্বতঃই মানুষকে আকর্ষণ করিয়া লয় তখন সে অবশ হইয়া ব্রত করিতে বাধ্য হয়। হরির প্রীতিকারক ব্রত করিলে হরি তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আপনার করিয়া লন। কোনরকমে চিত্ত ভগবন্মুখী হইলে ঊর্দ্ধ আকর্ষণে সে আকর্ষিত হইয়া মূল কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। একদশীর উপবাস, নাম কীর্ত্তন, নৃত্যগীত ইহার দ্বারা কি হয়?

গুরু। সংসার ব্যাধির মূল কারণ দেহে আত্মাভিমান। এর নাম অবিদ্যা। ভগবদ্ভক্তি সেবা উপবাস আদির দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হইলে অলৌকিক বিষয় আবির্ভূত হইয়া ভক্তকে পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত করে। ভগবানের নাম লীলা গুণ শুনিতে শুনিতে যখন কর্ণ শুদ্ধ হয় তখন ভক্ত অনাহত ধ্বনি শুনিতে পায়। সেই ধ্বনিই তাহাকে মূল কেন্দ্রে লইয়া যায়।

শিষ্য। সেই ধ্বনিকেই কি কৃষ্ণের বংশীধ্বনি বলে?

গুরু। হাঁ, কোটি সহস্র প্রকার নাদ আছে, ভক্ত যে কোন ধ্বনি শুনিতে পান সেই ধ্বনি অবলম্বনে তাহার ধ্যানে পরমানন্দ লাভ করেন। শুদ্ধ আহার, সৎগ্রন্থ পাঠ, জনসঙ্গ ত্যাগ, যথাকালে উপাসনায় দৃঢ় নিষ্ঠা হইলেই মানুষ কৃতার্থ হয়। কলিযুগের সহজ সরল সুগম পথ সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই মহামন্ত্র কীর্ত্তনে জপে সকল প্রকার পাপ নষ্ট হইয়া যায় ভগবানে অনন্যা ভক্তি লাভ হয়।

শিষ্য। আপনি পৌষ মাসের একাদশীর মহিমা বলুন।

গুরু। রাজা যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন---পৌষ মাসের শুক্লা একাদশীর কি নাম, কোন দেবতার পুজা করিতে হয়, হে হৃষীকেশ, তুমি আমায় তাহা বল?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন---হে রাজন্, আমি আপনাকে পৌষী শুক্লা একাদশীর মহিমার কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্ববিধি অনুসারে উপবাসাদি করিতে হয়, ইহার নাম পুত্রদা, সর্ব্বপাপহরণকারিণী, কামদ সিদ্ধিদায়ক, নারায়ণ ইহার অধিদেবতা। সচরাচর-ত্রৈলোক্যে ইহার মতন আর ব্রত নাই। এই একাদশী মানুষকে লক্ষীবান্ বিদ্যাবান্ ও যশস্বী করে। ইহার পাপহরা কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ভদ্রাবতী নাম্নী নগরীতে সুকেতুমান নামে একরাজা ছিলেন তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্না পতিব্রতা পত্নীর নাম শৈব্যা। ধন রত্নের কোন অভাব না থাকিলেও পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়া রাজা মনোকষ্টে দিন যাপন করিতেন। কি করিব কোথায় যাইব, কেমন করিয়া পুত্র লাভ হইবে, পতি পত্নী উভয়েই এই চিন্তায় মুহ্যমান হইয়া থাকিতেন। রাজার পিতৃগণ তাঁহার দত্ত কবোষ্ণ জল উপভোগ করিতে করিতে ভাবিতেন---রাজার দেহান্তে আমাদের বংশ লোপ হইবে, কেহ আমাদের তর্পণ করিবে না। তজ্জন্য তাঁহারাও দুঃখিত ছিলেন। সেই রাজার বান্ধব মিত্র অমাত্য সুহৃদ গজ অশ্ব পদাতিক প্রভৃতি কিছুতেই রুচি ছিল না। মন নৈরাশ্যপূর্ণ হইয়াছিল। পুত্রহীন মানবের জন্ম বৃথা, অপুত্রক ব্যক্তির গৃহ শূন্য, হৃদয় সর্ব্বদা দুঃখভরিত। পুত্র ব্যতীত পিতৃসেবা ও মনুষ্যগণের ঋণ শোধ হয় না, সেইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে পুত্র উৎপাদন করা মানুষের কর্ত্তব্য। যে পুণ্যকারিগণের গৃহে পুত্র জন্মগ্রহণ করে তাঁহাদের ইহলোকে যশ ও পরলোকে শুভাগতি লাভ হয়, আয়ু আরোগ্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, পুণ্যকর্ম্মাগণের পুত্র পৌত্র ও আত্মীয় স্বজন প্রাপ্তি হয়। পুণ্য ও বিষ্ণুভক্তি ভিন্ন আয়ু আরোগ্য বিদ্যা সম্পত্তি পুত্র পৌত্রাদি লাভ হয় না। রাজা এইরূপ দিবারাত্রি চিন্তা করত সুখলাভ করিতে পারিলেন না। কখন কখন আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হইত। আত্মহত্যা করা মহাপাপ বলিয়া তাহা না করিয়া একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক নানাবৃক্ষ

ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদসঙ্কুল এক ভীষণ অরণ্যে গমন করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন আমার ঈদৃশ দুঃখ কেন উপস্থিত হইল, আমি যজ্ঞ ও পূজাদির দ্বারা দেবতাগণকেও দান এবং মিষ্ট ভোজনাদির দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে প্রীত করিয়াছি, পুত্রের ন্যায় প্রজা-পালনে নিরত আছি, তবে কি হেতু এরূপ মহৎ দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর চিন্তিত অন্তঃকরণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর গমনের পর পুণ্য-প্রভাবে মানস সরোবরের ন্যায় একটী কারণ্ডব চক্রবাক্ রাজহংস আদি পরিশোভিত মনোহর সরোবর দেখিতে পাইলেন, তাহার তীরে মুনিগণের বহু আশ্রম শোভা পাইতেছে, তৎকালে তাঁহার শুভসূচক দক্ষিণ চক্ষু ও দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন মুনিগণ তথায় জপ করিতেছেন। সত্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করত পৃথক পৃথকভাবে সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, পরম আনন্দে তাঁহার প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইল। মুনিগণ বলিলেন—হে রাজন্, আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি বল?

রাজা বলিলেন—আপনারা কে? এখানে কেন একত্রিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

মুনিগণ বলিলেন—হে রাজন্, আমরা বিশ্বদেব, স্নানের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি, আর পাঁচদিন পর স্নান আরম্ভ হইবে। আজ পুত্রদা নাম্নী শুক্লা একাদশী তিথি। পুত্রকামীগণকে পুত্রদা একাদশী পুত্র দান করেন।

রাজা বলিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, আমার পুত্র নাই, আমি পুত্র কামনা করিতেছি, যদি আপনারা আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন আমাকে ধার্ম্মিক বংশকর পুত্র প্রদান করুন।

মুনিগণ বলিলেন—আজ পুত্রদা নাম্নী একাদশী, তুমি একাদশী ব্রত কর আমাদের আশীর্ব্বাদে এবং কেশবের প্রসাদে অবশ্যই তোমার পুত্র লাভ হইবে। রাজা তথায় একাদশী ব্রত করিলেন রাত্রিকালে শ্রীভগবানের গুণগানে জাগরিত থাকিয়া প্রাতে মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক দ্বাদশীতে পারণ করিয়া রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার অন্তর্দ্ধানে রাজ্যস্থ সকলেই বিষাদমগ্ন ছিলেন তাঁহাকে দেখিয়া প্রজামণ্ডলীর ও পুরজনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

অতঃপর কিয়দ্দিন গত হইলে রাণী গর্ভবতী হইলেন। মুনিগণের বচনে এবং পুত্রদার প্রভাবে যথাকালে রাজার তেজস্বী পুণ্যকর্ম্মকারী একটি পুত্র

জন্মগ্রহণ করিল। ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনগমন করিলেন।

পুত্রার্থিগণের এই পুত্রদা একাদশীর অনুষ্ঠানে সৎপুত্র লাভ হয়। হে রাজন্, লোকসকলের হিতের জন্য আপনাকে এই ব্রতের কথা বলিলাম। যাহারা পুত্রদা একাদশী ব্রত করে তাহারা পুত্রলাভ করত অন্তে স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। ইহার পঠনে শ্রবণে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

শিষ্য। পুত্রকামী ব্যতীত কি এই ব্রত করিবে না?

গুরু। একাদশী ব্রত নিত্য ভগবৎ-প্রীতির জন্য সকলেরই করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ পুত্র কামনা করে তাহা হইলে অন্য ব্রতাদি না করিয়া এই ব্রত করিলে সে পুত্রলাভ করিবে এইমাত্র বিশেষ। সকাম কর্ম্ম করিলে কাম্য ফল প্রাপ্তি আর নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবৎ-প্রীতি।

—০—

জগৎপুর তীর্থে

[শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

ভারতমাতার মুখোজ্জলকারী যে দুইটি ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ—পূজ্যপাদ মহাত্মা ৺রামদয়াল মজুমদার (১২৬৬-১৩৪৫) এবং পরমারাধ্য শ্রী১০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য দণ্ডি স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজ (১২৯৪-১৩৫৮) মেদিনীপুর জেলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই প্রবন্ধে দণ্ডি স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী মহারাজের বাল্যস্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমির বিবরণ ও বংশ পরিচয় প্রভৃতি যাহা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। মহাত্মা ৺রামদয়াল মজুমদার সম্পাদিত 'উৎসবে' পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ লিখিত প্রবন্ধ 'ঈশ্বরাস্তিত্ব' প্রকাশিত হইত ও তাঁহার প্রণীত 'সুগম সাধন-পন্থা', 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত সূত্রম্', 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ' এবং 'পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম মহিমা' প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ সাধু ও পণ্ডিত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

গত ২৪শে চৈত্র রবিবার প্রাতঃকালে মেদিনীপুর শ্রীগুরু-মন্দিরের ভ্রাতৃবৃন্দ সহ আমরা একটি ট্যাক্সিতে জগৎপুর অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাম কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। প্রায় ৯ ঘটিকার সময়

তমলুকে প্রসিদ্ধ বর্গভীমা দেবীর মন্দির সম্মুখে আমাদের গাড়ি থামান হইল। অতি প্রাচীন কালের মন্দির। মায়ের মূর্ত্তি একাধারে অতি ভীষণা অথচ সৌম্য ও মাধুর্য্যমণ্ডিতা। মা ভীমা—দুর্গা। মায়ের ভীষণা মূর্ত্তির নিকট বর্গীরাও মাথা নত করিয়া পূজা দিয়া গিয়াছে—মন্দিরের ধনরত্ন লুণ্ঠনে সাহসী হয় নাই। মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা মহিষাদল অভিমুখে রওনা হইলাম। এখানে ডাব, দুধ ও ছানার মিষ্টান্ন দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাঁশকুড়া ষ্টেশন হইতে সুতাহাটা বা কুঁকড়াহাটী যাইবার মোটরে চড়িলে মহিষাদলের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে লক্ষ্যা গ্রাম পাওয়া যাইবে। তথায় রাস্তার ধারে একটি শিব মন্দির ও সুন্দর পুষ্করিণী রহিয়াছে। সেখানে নামিয়া পূর্ব্বদিকে প্রায় এক পোয়া কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করিলেই জগৎপুর গ্রাম পাওয়া যায়। আমরা শিব-মন্দিরের নিকট গাড়ী রাখিয়া উৎফুল্ল চিত্তে নাম করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে তখন কোথা হইতে একখণ্ড মেঘ আসিয়া প্রখর সূর্য্য-কিরণকে আবৃত করিয়াছে।

দূর হইতে জগৎপুরের শ্রীবিষ্ণু-মন্দির দৃষ্ট হয়। তারপরে গ্রামের ৺শীতলা ঠাকুরাণীর প্রসিদ্ধ মন্দির ও আটচালা। বহু দূর দেশ হইতে লোকজন এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। মন্দিরের বর্ত্তমান পুরোহিত শ্রীশ্রীপতি চরণ সান্যকী মহাশয় অতি সজ্জন ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। তাল, নারিকেল, আম, নিম, অশথ, বট প্রভৃতি গাছপালায় গ্রামটি ঘেরা। ছোট ছোট পুষ্করিণীর জল স্বচ্ছ ও সুপেয়। সহরের চাকচিক্য ও বিলাস দ্রব্যাদি বর্জ্জিত অতি মনোরম এই গ্রামখানি। চৈত্র মাসের শুষ্ক দ্বিপ্রহর। ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ বাতাসে পথিকের শ্রান্তি দূর হইয়া যাইতেছে। দূর হইতে ঘুঘুর ডাক মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে। আমরা পূজ্যপাদের অগ্রজ মধ্যম ভ্রাতা পরম পূজনীয় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিশ্রের কুটীরদ্বারে আসিয়া যথাযোগ্য স্থানে প্রণামান্তর আসন পরিগ্রহ করিলাম।

আমাদের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া স্বামিজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম মিশ্র, মধ্যম ভ্রাতার পুত্র শ্রীগুণধর মিশ্র ও ইঁহাদের আত্মীয় ৯২ বৎসর বয়স্ক পরম পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীবিপিনবিহারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ-বেদশাস্ত্রী মহাশয় সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গমন করায় তাঁহার দর্শন লাভ হয় নাই। পূজ্যপাদের পিতা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন এবং বসন্তরোগ চিকিৎসা সম্বন্ধে একখানি

পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীবিপিনবিহারী মিশ্র মহাশয় কবিরাজ ৺লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের কুল পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। ইনি সামবেদের কতকাংশ বঙ্গানুবাদ করতঃ মুদ্রিত করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় পূজ্যপাদ স্বামিজী মহারাজ প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থগুলি দেখিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হওয়ার সংবাদ শ্রবণে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন,—"আজ আমি নিজেকে অতি গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি; কারণ, পুত্রের বা শিষ্যের উন্নতিই 'ত পিতা বা গুরুর একান্ত কাম্য এবং তাঁহারা নিজেদের অপেক্ষাও তাহাদের সর্ব্ব-বিষয়ে বড় দেখিতে পাইলে বিশেষ আনন্দিত হন। এগার বৎসর বয়সে উপনয়নকালে ৺লক্ষ্মীনারায়ণের চতুর্থ পুত্র উপেন্দ্রনাথ আমার নিকট গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে এবং পরবর্ত্তীকালে সে যে ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিয়াছে তাহাতে আমি নিজেকে বিশেষ সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেছি।" একটু থামিয়া পণ্ডিত মহাশয় আবেগমধুর কণ্ঠে বলিলেন,—"আজ আপনারা উপেন্দ্রনাথের সংবাদ আনিয়াছেন; কিন্তু, আমারই এক পুত্র—উপেন্দ্রর সমবয়সী সেও সাধু হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। গত দশ বৎসর যাবৎ তাহার আর কোনও সংবাদ পাই নাই। আর এই গ্রামের অপর একজন ব্রাহ্মণ উপেন্দ্রর পিতৃবন্ধু শ্রীজীবানন্দ মিশ্রও সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন;—তাঁহারও কোনও সংবাদ বহুকাল প্রাপ্ত হই নাই।" একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে তিনটি ভগবদ্‌প্রেমে বিভোর হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 'যে অম্লান কুসুমের মধু পান তরে'—তাঁহাদের মন আকর্ষিত হইয়াছে; আমরা বহির্মুখী জীব, সে মধুর আস্বাদন কি বুঝিব! এই পুণ্যতীর্থ জগৎপুরের ধূলিকণা, পুষ্করিণী, বৃক্ষাদি, ঘর-বাড়ী, মন্দির প্রভৃতি অতি পবিত্র বোধ হইতে লাগিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র—পূজ্যপাদ স্বামীজীর বাল্যবন্ধু শ্রীষড়ানন মিশ্র মহাশয়ের সহিত আমরা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের আদি বাস্তুভিটা ও উপেন্দ্রনাথের জন্মস্থান দর্শন করিতে গেলাম। ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে মহিষাদল থানার অন্তর্গত জগৎপুর গ্রামে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীবরাহ কুলদেবতার উপাসক গৌড়াদ্য বৈদিক গোত্রসম্ভূত সদাচারী ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্রের চতুর্থ পুত্ররূপে পূজ্যপাদ জন্মপরিগ্রহ করেন। এই চতুর্থ সন্তান উপেন্দ্রনাথের সুন্দর দেহাবয়ব, সরলতা এবং বুদ্ধিপ্রতিভাদীপ্ত মুখখানি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিত। উপেন্দ্রনাথ বাল্যকালে পল্লীস্থ শিশুগণের সহিত ঘুড়ি উড়ান ও নানা খেলাধুলায় যোগদান করিলেও নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া সকলে মিলিয়া পূজার অনুষ্ঠান করিতে ভালবাসিতেন।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের পাঠ শেষ হওয়ার পর উপেন্দ্রনাথ ডুবড়া গ্রামে এক পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হন। তাঁহার সঙ্গে সমবয়সী বালক হেমন্ত কুমার মিশ্রও যাইতেন। একদিন পাঠান্তে উভয়ে যখন গৃহাভিমুখে ফিরিতেছেন এমন সময় ধান জমির আইল রাস্তায় হঠাৎ একটি কেউটে সাপ উপেন্দ্রনাথকে দংশন করে। তিনি শান্তকণ্ঠে সঙ্গী হেমন্ত-কুমারকে বলেন,—"দেখ, আমায় সাপে কামড়েছে। কেউটে সাপ।" জনমানবহীন উন্মুক্ত প্রান্তর। উভয়ে একটি বৃক্ষতলে আসিয়া বসিলেন। উপেন্দ্র-নাথের সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইতেছে,—তথাপি সৌরতাপ যেমন প্রস্ফুটিত পঙ্কজের সৌন্দর্য্য ম্লান করিতে অক্ষম তেমনি মৃত্যুর করাল ছায়া বালকের অধরের কমনীয়তা হ্রাস করিতে পারে নাই। নিরুপায় বালকদ্বয় কাতর প্রাণে কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীবরাহ জীউকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ হেমন্তকুমার দেখিতে পাইলেন একটি সাঁওতালের ন্যায় ব্যক্তি দ্রুতপদে সেইদিকে আসিতেছেন। হেমন্তকুমার তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়া সংজ্ঞাহীন উপেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া জানাইলেন যে ইহাকে কেউটে সাপে কামড়াইয়াছে। তাহা শুনিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে তিনবার বলিয়া উঠিলেন—'না—না—না, কেউটে নয় কেঁচো, কেঁচো,—কেঁচো'—তারপর তিনি উপেন্দ্রনাথের সম্মুখে বসিয়া খানিকক্ষণ কি অনুষ্ঠান করিলেন ও হেমন্তকুমারকে আশ্বাস দিয়া পুনরায় দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। এদিকে উপেন্দ্রনাথ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া হেমন্তকুমার তাঁহাকে লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

ছাত্র উপেন্দ্রনাথকে নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্গত অশথতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়। স্কুলের বাঁধাধরা শিক্ষায় কিশোরের অনুরাগ পরিলক্ষিত না হওয়ায় পণ্ডিত শ্রীগোপাল চন্দ্র বেদতীর্থ প্রতিষ্ঠিত 'আশদতলা বৈদিক আশ্রমে' সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় হইতেই উপেন্দ্রনাথের মনে পারমার্থিক চিন্তার বিশেষ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। তিনি প্রত্যহ শিবপূজা ও গীতা পাঠ করিতেন এবং অধিকাংশ সময় একটি ক্ষুদ্র কক্ষে ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিতেন। তিনি একবেলা নিরামিষ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন ও রাত্রিতে নারায়ণের ফলমূলাদি প্রসাদ যাহা পাইতেন তাহাই আহার করিতেন। কোথাও সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছে জানিতে পারিলে তিনি তাঁহাদের সঙ্গলাভ ও সেবা করিয়া আনন্দিত হইতেন।

শিক্ষাগুরু পণ্ডিত গোপালচন্দ্র স্বীয় প্রাণাধিক ছাত্র উপেন্দ্রনাথের মানসিক

বৈরাগ্যভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার ভ্রাতা গৌড়াদ্য বৈদিক শাণ্ডিল্য গোত্রসম্ভূত কৃত্তিবাস চক্রবর্ত্তীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবীর সহিত বিবাহ দিয়া উপেন্দ্রনাথকে সংসারী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রনাথ বিবাহ করিবেন না বলিয়াছিলেন; কিন্তু, পরিশেষে শিক্ষাগুরুর প্রবল আগ্রহাতিশয্যে ও আত্মীয়বর্গের বিশেষ অনুরোধে তিনি এই বিবাহে সম্মতি দিলেন এবং এক শুভদিনে শান্তপ্রকৃতি, সুলক্ষণা, একাদশবর্ষীয়া শ্রীমতী প্রিয়বালার সহিত পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

বিবাহের পর উপেন্দ্রনাথ স্বীয় গ্রাম জগৎপুরে চলিয়া আসেন এবং ইড়খা গ্রামে বৈদিক চতুষ্পাঠিতে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। দাম্পত্য জীবন যাপনের যোগ তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না,—তাই আশদতলা হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধী শ্রীশশীভূষণ চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভগিনী প্রিয়বালাকে যখন স্বামীর গৃহে প্রথম রাখিয়া গেলেন তার পরদিনই আকস্মিকভাবে শ্রীমতী প্রিয়বালা স্বামীর চরণে মস্তক রাখিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। এই সময়ে উপেন্দ্রনাথের হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হওয়ায় তিনি স্বীয় ছাত্রবর্গের মধ্যে নিজস্ব সমুদয় দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়া দেশত্যাগী হন। তাঁহার প্রশান্ত স্বভাব, সহৃদয় ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ প্রীতি হইতে কেহই বঞ্চিত হইত না।

সাধু উপেন্দ্রনাথ মৌনী অবস্থায় একবার যখন জগৎপুরের ৺শীতলা মন্দিরের আটচালায় শুভাগমন করেন তখন পণ্ডিত শ্রীবিপিনবিহারী বেদশাস্ত্রী এবং শ্রীষড়ানন মিশ্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়ে উপেন্দ্রনাথ জানাইয়া দেন যে তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। সাবিত্রীমন্ত্রদাতা পণ্ডিত শ্রীবিপিনবিহারীকে তিনি একখানি উপনিষদ্ গ্রন্থাবলি প্রদান করেন। পূজ্যপাদ এই গ্রামে আর কখনও পদার্পণ করেন নাই। পুণ্যতীর্থ জগৎপুরের দেবস্থান সমূহে ও গুরুজনদের প্রণামপূর্ব্বক এই পবিত্র স্থানের ধূলি শিরে ধারণ করিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমরা সন্ধ্যার সময় তমলুকে মা বর্গভীমার মন্দিরে আসিয়া মাতৃচরণ বন্দনান্তে মেদিনীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

—o—

শ্রীওঙ্কারনাথ প্রণতি ষোড়শী

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য]

কালে যঃ পাপজাল প্রশমিত সুকৃতে ধর্ম্মরক্ষার্থমর্থী
স প্রজ্ঞং নামযজ্ঞং রচয়তি পরিতঃ শশ্বদোঙ্কারনাথঃ।
ভোগত্যাগী বিরাগী ভববিষয়চয়ে ধর্ম্মমার্গানুরাগী
শ্রীসীতারামদাসং মতিনতশিরা ভব্যলাভায় বন্দে ॥১

তস্মৈ নম স্তাপসকুঞ্জরায়
কৌপীনমাত্রাবৃতবিগ্রহায়।
শিরঃ সমুন্নদ্ধ জটান্বিতায়
শিবানুভাবায় শিবপ্রভায় ॥২

দাসীকৃতানন্তবিভূতিশালিনে
তপোঽনুষঙ্গেণ কৃশাঙ্গধারিণে।
ওঙ্কারনাথায় দয়ানুবর্ত্তিনে
নমোঽস্তু তস্মৈ ভবশান্তিদায়িনে ॥৩

কালপ্রভাব প্রবিমুক্তচেতসে
ক্রিয়া সমাসাদিত দিব্যতেজসে।
শ্রীনামযজ্ঞস্য সতে পুরোধসে
তস্মৈ নমঃ শাশ্বতশান্তিবেধসে ॥৪

কালে করালে সুকৃতং বিতন্বতে
প্রগাঢ় সংসারতমো বিবস্বতে।
ওঙ্কারনাথায় শিবং বিবৃণ্বতে
নমোঽস্তু তস্মৈ কৃপয়া প্রসীদতে ॥৫

অসংখ্য শিষ্যার্চিত পাবনাঙ্ঘ্রয়ে
জগদ্ধিতায় প্রগৃহীত মূর্ত্তয়ে।
ত্যাগপ্রতীকায় সমিদ্ধভূতয়ে
তস্মৈ নমো রক্ষিতধর্ম্মনীতয়ে ॥৬

একং পরেশং দয়িতং প্রপশ্যতে
তমেব সত্যং সততং প্রজানতে।
ওঙ্কারনাথায় শমং সমশ্নুতে
নমোঽস্তু তস্মৈ সহসা প্রদীব্যতে ॥৭

স্মিতং প্রসাদেন মুখে প্রবৃণ্বতে
কদাচন ব্যাজরুষং প্রকুর্বতে।
কলিপ্রভাবং পরিভূয় তিষ্ঠতে
নমোঽস্তু তস্মৈ কুশলং প্রযচ্ছতে ॥৮

নমঃ সুধাম্নে গুরবে দয়ালবে
পরঃ সহস্রাদৃতপাদপাংশবে।
সংসারকল্যাণকলাপহেতবে
প্রতাপিতাপত্রয় ধূমকেতবে ॥৯

নিরস্তবিঘ্নং ব্রতধর্মসম্পদে
স্থিরায় নিত্যং ভগবৎপদাস্পদে।
হিতোপদেশেন বিতীর্ণসংবিদে
নমোঽস্তু তস্মৈ মহতে ভয়চ্ছিদে ॥১০

নমো নমঃ কামমুখারিবৈরিণে
প্রশান্তচিত্তায় শিবানুকারিণে।
ওঙ্কারনাথায় হিতপ্রচারিণে
সন্দর্শনেনামলবৃত্তিদায়িনে ॥১১

সমন্ততো ব্যক্তবিচিত্রশক্তয়ে
পরাজিতপ্রাচ্যমহর্ষিমূর্ত্তয়ে।
ওঙ্কারনাথায় নমঃ সুকীর্ত্তয়ে
নমো নমঃ সাধিতদিব্যদৃষ্টয়ে ॥১২

তেজস্বিনে কোমলশীলশালিনে
বহিঃ কৃশায়ান্তর কার্শ্যনাশিনে।
ওঙ্কারনাথায় বিষাদশাতিনে
নমো নমঃ শিষ্টগণেষ্টরূপিণে ॥১৩

সাক্ষাদিবেশং নয়নেন পশ্যতে
তদীয়বাচং শ্রবণেন শৃণ্বতে।
স্পর্শং ত্বচা তস্য সমেত্য হৃষ্যতে
নমোঽস্তু তস্মৈ মহতে তপস্যতে ॥১৪

নমোঽস্তু তস্যাঙ্‌ঘ্রি সরোরুহায়
নমস্তদুৎস্পৃষ্ট রজোলবায়।
নমস্তদীয়াঙ্গ কদম্বকায়
নম স্তদঙ্গস্য বিভূষণায় ॥১৫

নম স্তদীয়ানন সুস্মিতায়
নমো নমস্তদ্ বচসে হিতায়।
তদীয় সম্বন্ধ সমন্বিতায়
নমঃ সমগ্রায় সদা শিবায় ॥১৬

—০—

রাঘব ভবনে

[শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ]

গত ১৩ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার শ্রীশ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শুভাগমন স্মরণোৎসব হয়ে গেল।

পাণিহাটী কলকাতা থেকে মাত্র ৯।১০ মাইল উত্তরে গঙ্গার তীরে অবস্থিত এক গণ্ডগ্রাম, অধুনা সহরে রূপান্তরিত। তীর্থ দর্শনের জন্যে দূরে দূরে কত আমাদের যাতায়াত কিন্তু এমন এক তীর্থের আহ্বান কানে আসে কম, অথচ দেখি মহাত্মা গান্ধীও ইহলোক ত্যাগ করার কিছু আগে সোদপুর ভ্রমণে এসে এই পুণ্যতীর্থ দর্শন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন নি।

নীলাচল থেকে বৃন্দাবন গমন মানসে ১৪৩৮ শকে (১৫১৬ খৃঃ অঃ) বিজয়া দশমীতে মহাপ্রভু পুরী থেকে বার হন। মাতৃদর্শনাদির জন্যে বাংলা দেশ দিয়ে যাবার ইচ্ছা করেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র মহাপ্রভুর আগমন পথে নিজের এলাকায় কোনও বাধা না দেখা দেয় তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন। এই সুসজ্জিত পথ ধরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব উড়িষ্যারাজের শেষ সীমায় আসেন, এর পরেই দেখা দেয় বাংলার মুসলমান রাজার সীমানা। সে সময় দস্যু তস্করের ভয়ে পথচারী থাক্‌তো সন্ত্রস্ত। ভবভয়ভঞ্জনকারীকেও কি অভয় দিতে হবে? সমস্ত শক্তির আধারভূতা মা জানকীর ক্রন্দনও কি শুনতে হবে না বনানীকে? এ-যে লীলাময়ের মানবলীলা তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবেকে রক্ষা করার জন্যে বিধর্মী মুসলমান রাজকর্ম্মচারী সসৈন্যে চল্‌লেন পিছলদা পর্য্যন্ত। পিছলদা থেকে নৌকায় মহাপ্রভু এসে উঠ্‌লেন রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট পাণিহাটীতে। মাঝির কি সৌভাগ্য ভবপারের কাণ্ডারীর আজ কাণ্ডারী সে। মহাপ্রভু মাঝিকে নিজের বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বিদায় কর্‌লেন, এই বস্ত্রখণ্ডেরই এক টুকরা মাথায় দিয়ে গজপতি প্রতাপরুদ্র প্রেমোন্মত্ত হয়ে মান মর্যাদা সব ভুলে সচল জগন্নাথস্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়েন।

ভাগিরথীর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু সেই প্রাচীন রাঘবপণ্ডিতের গঙ্গার ঘাট ও বটগাছ আজও বর্ত্তমান। প্রভুর আগমনবার্ত্তা কোন বেতার বার্ত্তায় আগে থেকেই প্রচার হয়ে গেছে! তাই হাজার হাজার নরনারী মহাপ্রভুর দর্শনের জন্যে হাজির। রাঘব পণ্ডিতের আজ বড় সুদিন, ছুটে এলেন গঙ্গার ধারে, কত কেঁদেছেন—"জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে"

ভক্তের এই কান্না, গোপীদের সেই প্রেম, প্রেমময়কে বেঁধে রেখেছে, তাই ভক্তাধীনের শুভাগমন। মহাপ্রভু বললেন—

"প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাশরিনু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাঙ রাঘব আলয় ॥

(চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড ৫ম পঃ)

রাঘব পণ্ডিতের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না, তিনি ছিলেন বিগ্রহসেবানিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। পাণিহাটীই ছিল তাঁর জন্মস্থান।

"কৃষ্ণকান্তে আছেন রাঘব পণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইল বিদিত ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র রাঘবের আতিথ্য স্বীকার করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

'প্রভু বোলে রাঘবের কি সুন্দর পাক।'

মহাপ্রভু একদিন রাঘব পণ্ডিতের বাড়ীতে থেকে পরদিন সকালে কুমার-হট্টে (বর্ত্তমান হালিসহর) শ্রীনিবাস আচার্য্যের কাছে চলে যান। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে জানা যায়—মহাপ্রভু নীলাচলে ফেরায় পথে নিত্যানন্দাদি পার্ষদসহ পাণিহাটী আসেন। সম্ভব আসবার পথে ও ফেরার পথে ভক্তের আকিঞ্চন রক্ষা করতে দুবারেই শ্রীপাট পাণিহাটী তাঁর পুণ্যপাদস্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়। এছাড়া রাঘব ভবনে তো তাঁর নিত্য আবির্ভাব—

"শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দের নর্ত্তনে
শ্রীবাস কীর্ত্তনে আর রাঘব ভবনে
এই চারি ঠাঁঞি প্রভুর সদা আবির্ভাব।—(চৈঃ চঃ অন্তঃ ২য় পঃ)

শচীর মন্দির নিত্যানন্দের নর্ত্তন শ্রীবাসের কীর্ত্তন আজ আমাদের চোখের আড়ালে কিন্তু সেই শ্রীপাট পাণিহাটী রাঘবভবন গঙ্গার ঘাট, বটবৃক্ষ বর্ত্তমান, তাই এ তীর্থ আমাদের কাছে মহামূল্যবান, তার আকাশে বাতাসে পবিত্র ধূলিকণা হয়তো এখনও কোনও ভক্তকে অঙ্গসঙ্গলাভের দ্বারা ধন্য করায়।

শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীবিগ্রহসেবানিষ্ঠায় মহাপ্রভু বাঁধা পড়েন। শ্রীরাঘব-পণ্ডিত তাঁর আরাধ্যদেবতা শ্রীমদনমোহনের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুরও ভোগ দিতেন এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের আহ্বানে প্রতিভাত হয়ে উঠ্‌তেন চোখের সামনে।

এই 'রাঘবের ঝালি' ভক্তসমাজে ছিল সর্ব্বজনবিদিত। রাঘবের আর কে ছিলেন জানা নাই তবে তাঁর বিধবা ভগ্নী দময়ন্তী ও সেবক মকরধ্বজের নাম শোনা যায়। দময়ন্তীদেবী ছিলেন বড়ই ভক্তিমতী। সারাবছর ধরে নানাবিধ আচার ও বহু সুমিষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করে রাখতেন দময়ন্তীদেবী। রথের আগে রাঘবপণ্ডিত এই ঝালি নিয়ে মহাপ্রভুকে উপহার দিলে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করতেন—

"রাঘব পণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥
নানা অপূর্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভু যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক মহাপ্রভু করিবেন উপভোগ ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত খঃ ১০ম পঃ)

হরিতকী সঞ্চয়ের জন্যে মাধব ঘোষকে ত্যাগ করলেও এই প্রেমভক্তির কাছে প্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক পরাজয় স্বীকার করলেন, সঞ্চয়ের আদেশ দিয়ে রাঘব পণ্ডিত ও দময়ন্তীদেবীর প্রতি অশেষ কৃপা দেখালেন। রাঘবের নিষ্ঠা ও শ্রীমদনমোহনের সেবার সুখ্যাতি মহাপ্রভু পুরীতে ভক্তদের কাছে মাঝে মাঝে করতেন, সেই সেবকের সেবার উপকরণ কি প্রত্যাখ্যান সম্ভব!

এই পাণিহাটীর পুণ্যতীর্থে নিত্যানন্দতত্ত্ব উদঘাটিত হয়। মহপ্রভু রাঘবকে বললেন—

"রাঘব! তোমাকে আমি নিজ গোপ্য কই।
আমার দ্বিতীয় নাই নিত্যানন্দ বই ॥
এই নিত্যানন্দ যেই করায়েন আমারে।
সেই আমি করি এই বলিল তোমারে ॥

*   *   *

নিত্যানন্দ সেবিহ যে হেন ভগবান ॥

(চৈঃ ভাগবত, অন্তঃ খ ৫ম পঃ)

এই নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু আদেশ করলেন মুনিধর্ম ত্যাগ করে সংসারী হয়ে—

"মূর্খ নীচ পতিত দুঃখি যতজন।
ভক্তি দিয়া করা গিয়া সবার মোচন ॥"

মহাপ্রভুর আদিষ্ট প্রেম প্রচারের জন্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ শ্রীপাট পাণিহাটীতে আসেন। এই পাণিহাটীই তাঁর আদি প্রচারক্ষেত্র। শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীবাস

অঙ্গনে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করেন ও ভক্তজনকে অভিষেকের আদেশ দেন। রাঘবভবনেও শ্রীনিত্যানন্দ অনুরূপ লীলা করেন ও তাঁর অলৌকিক প্রভাবে জম্বীরের গাছে সর্ব কদম্বের ফুল (চৈঃ ভাঃ) দেখা দেয় অভিষেকের জন্যে। অভিষেক কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত শক্তিপ্রভাবে যোগদান ভক্তজন অনুভব করেন।

'এই মত পাণিহাটী গ্রামে তিনমাস।
করে নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির বিকাশ ॥

শ্রীপাট পাণিহাটীর আর এক বৈশিষ্ট্য দাসগোস্বামীর দণ্ডমহোৎসব। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পার্ষদ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভূত বিষয়বৈভব, অতুলনীয়া সুন্দরী স্ত্রী ছেড়ে কাঙ্গাল সাজেন শ্রীপাট পাণিহাটীর শ্রীবটবৃক্ষের তলে। শ্রীরঘুনাথ দেখলেন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বটবৃক্ষের বেদীর উপর বসে আছেন, চারিদিকে বহু ভক্ত নরনারীর সমাবেশ। শ্রীদাস গোস্বামী দৈববশতঃ দূরে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এই পরমভক্তকে দেখে বড়ই আনন্দিত কিন্তু আনন্দের বাহ্য প্রকাশ না করে শ্রীরঘুনাথকে কাছে আনিয়ে বললেন—'তোমাকে দণ্ড দেবো।' দণ্ডও প্রভুর কৃপা, তাই প্রস্তুত আছেন সাদরে তাকে গ্রহণ করবেন অশেষ আশিস বলে। নিতাইচাঁদ বললেন—'তুমি সমবেত ভক্তমণ্ডলী অতিথি অভ্যাগতকে চিড়া দই ইত্যাদি দিয়ে ভোজন করাও, এই তোমার দণ্ড।" রাজ-সম্পদের অধিকারী শ্রীরঘুনাথ সম্পদের আপদ ত্যাগ করতে সতত প্রস্তুত—তাই এ আদেশ সত্যই প্রভুর অপার কৃপা। বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করা হয় এবং বৈষ্ণব সমাজে এই ভোজন 'দণ্ডমহোৎসব' নামে খ্যাত ও বোধ হয় এই থেকেই 'মালসাভোগের' প্রবর্ত্তন হয়। ১৪৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ শুক্লাপক্ষীয় ত্রয়োদশীতে এই মহোৎসব হয় এবং আজও শ্রীপাট পাণিহাটীতে এই উৎসব প্রতিপালিত হয়ে আসছে। শ্রীরঘুনাথের প্রভুর কাছে শ্রীচৈতন্যচরণের জন্যে আকুল প্রার্থনা করেন —

"কৃষ্ণপাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি পায় ॥—(চৈঃ চঃ অন্ত্যখণ্ড)

এই পাদপদ্মের গন্ধে শ্রীরঘুনাথ আজ পাগল, পৃথিবীর আর যা কিছু সম্পদই তাঁর কাছে তুচ্ছ। এই পরমভক্তের লীলা সুপ্রকট হয়ে উঠে শ্রীপাট পাণিহাটীর বটবৃক্ষতলে।

শ্রীপাট পাণিহাটী মহাতীর্থ কিন্তু উপযুক্ত মর্যাদায় আর তার প্রতিষ্ঠা কোথায় তাই যে—

"রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আসে বারে বার।"

—সেই বিগ্রহসেবার মধ্যে পরিপাটীর অভাব ফুটে উঠেছে, রাঘবের কুঞ্জ আজ মালতীলতার মধ্যে আত্মগোপন করার পথে এগিয়ে চলেছে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের ভাগাভাগি হলেও আজ স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতার ধূয়া তুলে ধর্মহীনতার পরিচয় দিচ্ছি তাই মঠমন্দির অবহেলিত ও লুপ্ত হতে চলেছে, আজ রাষ্ট্রের কোনও দায়িত্ব নেই বরং তীর্থযাত্রীর উপর করধার্যরূপ জনসেবায় (?) রাষ্ট্রনায়কেরা ব্যস্ত। সাধু সন্ন্যাসীরা 'উচ্চস্তরের বেকার' ও পরগাছার আখ্যা পেয়েছেন বর্ত্তমান রাষ্ট্রের কর্ণধারের কাছ থেকে ("...These parasite class was as much a drag on society as the real unemployed...This was bad for any country as they were all consuming without producing anything...") রাজনীতির কূটচক্রে দলাদলি রেষারেষির পাপপঙ্কে নিপতিত স্বজাধ্বজী জননায়করা কোন রামরাজত্বের উৎপাদক তা সুধীব্যক্তিরা যাচাই করে নেবেন। আজ আর রাজার মুকুট সন্ন্যাসীর পদতলে নেমে আসে না, স্বর্ণগর্দ্দভের পুচ্ছ তাড়নায় তাড়িত ও চালিত হয়। ঠাকুর এ খেলা কত দিন চলবে! 'এ অমানিশা ঘোর হবে নাকি ভোর'! ডাকার মত ডাকতে শক্তি দাও যাতে আমাদের আসন টলানো ডাক তোমার কাছে পৌঁছায়!

—•—

শ্রীশ্রীঠাকুর

[শ্রীপান্নালাল ধর, এম্-এ, আই-পি-এস]

কে বলে গো মৌন আছ--
তোমার ডাক যে নিতুই শুনি,
নামের ডাকে ভুবন দোলে
সে ডাক মধুর বেণুর ধ্বনি !

ডাকার মত যেদিন ডাকি
তোমার ডাক যে শুনতে পাই,
তোমার ডাক যে শুনতে পেল
অকূল-কূলে পেল ঠাঁই।

মৌন তোমায় সবাই বলে
বুঝতে নারি আমি তাই,
তোমার ডাক যে নিতুই শুনি
তোমার আশিস্ নিতুই পাই !

—০—

গান

[শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য বি-এ]

আমায় প্রভু তোমার ক'রে লও !
অন্তবিহীন অন্ধকারে
ঘুরে মরি বারে বারে,
দূর প্রবাসের যাত্রী আমি—পথ দেখায়ে দাও।
অপমান আর লাঞ্ছনাতে
ভরছি ঝুলি দিবস-রাতে,
জয় করিতে সকল ব্যথা—পরশ দিয়ে যাও !

—০—

নাসিক কুম্ভে নাম প্রচার

[শ্রীগোবিন্দদাস কিঙ্কর]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেবানন্দ তার নিত্যপাঠ সারতে মন্দিরে গেল আর প্রহ্লাদ, কুমারনাথ আর কৃষ্ণদা গেলেন বাজারে—ভগবানদাসজীকে ঘরে রেখে আমি কখানা বই নিয়ে মোহান্তজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম তাঁর পাশেই বসে আছেন অযোধ্যার প্রসিদ্ধ রামায়ণী শ্রী ১০৮ শ্রীমৎ প্রেমদাসজী মহারাজ মানস মার্ত্তণ্ড এবং আরো অনেক গণ্যমান্য সাধুসন্ত। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা পরিচিতের মত আগ্রহ করে বলতে লাগলেন। "মহারাজকা মৌন কব খুলেগা, হমলোগোঁকো কব দর্শন দেঙ্গে, ঐসে পহুঁচে হুয়ে মহাত্মাকা কুম্ভপর জরুর পধারনা চাহিয়ে, মহারসায়ন (ঠাকুরের বাংলা মহারসায়নের হিন্দী অনুবাদ) তো মহারসায়নই হ্যায়, বড়ী অচ্ছী কিতাব হ্যাঁ, অগর হো তো মুঝে এক প্রতিয়াঁ দেনে কা কষ্ট করে, ম্যয় পয়সাছে লুঙ্গা" ইত্যাদি কথা যেন এক নিশ্বাসে বলে ফেলতে লাগলেন। বুঝলাম মোহান্তজী সকলের কাছেই বাবার পরিচয় এবং আমাদের পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে কেন্দ্র করে বহু কথা হলো এঁদের সঙ্গে—ওঁদের বিনয়নম্র ব্যবহারে প্রাণ ভরে গেল।

প্রসাদ পাবার পর কয়েকখানা চিঠি লিখে একটু বিশ্রাম করবো এমন সময় উপরেরই যাত্রী নিবাসের কয়েকজন সাধু এলেন আলাপ করতে। রামানন্দীয় সাধুদের স্বভাব বিনা বিচারে অপর সাধুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা। ওদের মতো ঠাকুরের আদেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা পারিনা বলে বড় ক্ষোভ হ'তে লাগলো। আলাপে বুঝলাম লেখাপড়া এঁরা প্রায় জানেন না। সাধন ভজনের গূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞেস করায় একজন কতকগুলি আসনের সংকেত বলে বললেন নিরালায় একদিন দেখানো যাবে। শান্তমূর্ত্তি, বেশভূষায় বুঝতেই পারিনি এঁরা এত সন্ধান রাখেন, তুলসীদাসী রামায়ণ ছাড়া অন্যশাস্ত্র শুনেচেন বলেও মনে হলো না। পড়েন নি কিছুই, আয়ত্ত করে ফেলেছেন অনেক।

বেলা পৌনে পাঁচটায় আজ নাম নিয়ে বেরিয়ে তপোবনে সাধুদর্শন মানসে যাত্রা করলাম। অন্য কোথাও দাঁড়াবো না স্থির করেই ক্ষিপ্রগতিতে চলতে লাগলাম—তবু বই কয়েকখানা বিক্রী হয়ে গেল। তপোবনে খালসায় প্রথমই

পেলাম নিম্বার্ক নগর। শ্রীজীব মহারাজের মাসিক পত্রিকা সর্ব্বেশ্বরে তাঁর কথা অনেক পড়েছিলাম। কিন্তু তিনিও দেখলাম ভাষণরত। তাই খানিকটা এগিয়ে সহস্র সহস্র রামানন্দী এবং চার সম্প্রদয়ের অন্যান্য সাধুদের অসংখ্য ছাউনীতে উপস্থিত হলাম। চারদিক থেকে সাধুরা ছুটে এসে অভয়বাণী নিতে লাগলেন, বই দেখতে লাগলেন—পরিচিত মহাত্মা বা গুরুভাইদেরও পেলাম বটে, কিন্তু কথা কইবার অবকাশ নেই। অবশেষে যখন 'জ্বলন্ত আশ্বাসের' ভাণ্ডার খালি হলো তখন পথ পেয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। কিন্তু কাছে গিয়ে দর্শন করবার উপায় নেই—প্রায় প্রত্যেক ছাউনীতে পাঠ, কীর্তন বা ভাষণ হচ্ছে। যাঁরা একটি একটি তাঁবু নিয়ে আছেন তাঁরাও ব্যস্ত আবার যাঁরা নীরবে বসে আছেন তাঁদের ইচ্ছা তাঁদের ওখানেই বসে আমরা কীর্ত্তন করি। প্রসাদ পাবার অনুরোধ অনেকের। কারো দিকেই সায় দেবার উপায় নেই দেখে ধীরে ধীরে খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুরে অপরের বিঘ্ন না হয় এমন ভাবে নাম করতে লাগলাম। সাধুরা যুক্তকরে প্রণাম করতে লাগলেন—অখণ্ড নামে যোগদানের জন্য বলতে লাগলেন—আমাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করতে লাগলেন পঞ্চমুখে। সাধুদের আদর পেয়ে প্রাণ যেন ভরে গেল। ঠিক ফিরে আসবো এমন সময় বিরাট বপু দুজন ভস্মাচ্ছাদিত সাধু এসে এমনিভাবে তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগলেন যে তা প্রকাশ করার ভাষাও নেই ভাবও নেই। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।

পরে খবর নিয়ে জানলাম পাশ্বের তাঁবুতেই ওঁরা দুজন ধুনী জ্বালিয়ে চুপ করে বসেছিলেন এতদিন। আশপাশের পরিচিতেরাও জানতেন না—এদের এত প্রেম আর এত কীর্ত্তনোন্মত্ততা আছে ভিতরে ভিতরে।

বয়োবৃদ্ধ—অথচ বার বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে চতুষ্পার্শ্বের সকলকে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট করে নিজেদের তাঁবুতে গিয়ে বসে পড়লেন।

সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে আমরা পূরবীতে নাম করতে করতে রাম মন্দিরাভিমুখে রওনা হলাম। প্রহ্লাদজী ঢোলক নিয়ে নাচতে লাগলেন। আবার পথে পথে ভিড় করতে লাগলো আগ্রহী নামপ্রেমীর দল।

রামমন্দিরে তখন প্রবেশ করে কার সাধ্য। মন্দিরের চারদিকে ৪টী দরজা —সবটীতে সমান ভিড়। আগ্রহী জনৈক পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক আমাদের পথ করে দিয়ে মন্দিরাভ্যন্তরের যাত্রীদের একপাশে সরিয়ে আমাদের বসার যায়গা করে দিলে আমরা উৎসাহাতিশয্যে নাম করতে লাগলাম। আজ শ্রোতা গায়ক কারো অভাব নেই—পাশে থেকে মায়েরাও হাততালি দিয়ে উচ্চকণ্ঠে নাম করতে লাগলেন—একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মায়ীতো এসে উন্মাদের মত

নৃত্যাই করতে লাগলেন। মন্দিরের সবগুলি বৈদ্যুতিক আলো তখন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে—সমবেত জনতার দৃষ্টি তখন নামী ছেড়ে নামেতে নিবদ্ধ। আনন্দ যেন তখন উদ্বেল উচ্ছল হয়ে নৃত্য কচ্ছে সাকার মূর্ত্তি ধারণ করে। বহুক্ষণ এভাবে চলার পর বাইরের দর্শনার্থীদের অবস্থা বিবেচনা করে স্বেচ্ছা-সেবক এবং সেবিকারা দুটো দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাকী ২ দরজায় সকলকে বের করে দিয়ে তবে বাইরের মিশ্রিত হাওয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়ে পরিবেশটীকে হালকা করতে সমর্থ হয়।

খুব নাম হলো—বইও অনেক বিক্রী হলো। আজ আবার যাত্রীদেরও অনেকে এই ভিড় অগ্রাহ্য করেও ঠাকুরের খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। তাঁর মৌনাবস্থার সংবাদে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। টাকা, পয়সা, কাপড়, ফল মিষ্টি কিছুই নিই না দেখে—আজ আবার শ্রীশ্রীরামজীকে উৎসর্গ করা প্রসাদ একজন একজন করে এনে আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে দিয়ে যেতে লাগলেন। অগ্রাহ্যও করতে পারিনা—নাম বিঘ্নও হচ্ছে—কাজেই যথাসাধ্য দুটোকেই বজায় করে মন্দিরে প্রণাম করে পথে আরো ২।৩টী মন্দির দর্শন করে বাসস্থানে ফিরে এসে দেখি কুলকার্ণিদা লোকদিয়ে বিরাট একটী কুমড়ো, একঝুড়ি টমেটো এবং একটী থলে করে আটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রাত্রে জলযোগের ব্যাপারে কারো কারো একটু অসন্তুষ্টি ছিল। ঠাকুর সে ব্যবস্থাও করে দিলেন।

আরত্রিকাদি সেরে আমাদের দলের প্রায় সকলে মন্দিরে নাম করে ফিরে এসে প্রসাদ পেয়ে অনুমান রাত এগারটায় শুয়ে পড়লাম।

ঠাকুরের সংবাদ পাওয়া যায়নি—তাই সঙ্গীদের মধ্যেও বলাবলি হচ্ছিল। রাত্রে যেন অবসর পেয়ে ঠাকুর চিন্তায় মনটী একটু ভারাক্রান্তই হয়ে উঠলো।

৮ই ভাদ্র শুক্রবার:

আজ সকালে আবার পুল পার হয়ে নাসিক শহরে প্রবেশ করে বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে গলিতে গলিতে নাম করতে লাগলাম।

শোনা যায় তীর্থস্থানের স্থায়ী বাসিন্দারা নিত্য নতুন সাধু দেখে দেখে নাকি সাধুদের প্রতি একটু উপেক্ষার ভাবই পোষণ করেন। কিন্তু নাসিকেতো এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখচি। কীর্ত্তনশব্দ কানে যাওয়ামাত্র মায়েরা আগে থেকেই সপরিজন আপন আপন দ্বারে দ্বারে পয়সা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন—পয়সা নিইনা জেনে মুখ মলিন করে ফেলেন—অবোধ্য মারাঠী ভাষায় আরো কি সব বলতে থাকেন। কদাচিৎ দেখা যায় দোতলা থেকে পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন।

অভয়বাণী বা 'জ্বলন্ত আশ্বাস' আগ্রহ করে পথে নেমে এসে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে তবে পাঠ। আমাদের বই দেখে, মারাঠী বই একখানাও নেই জেনে বেশীর ভাগ লোক ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আহার করাতে চান—এবং কীর্ত্তন করাতে চান—অগত্যা সিধে দিতে চান।

যাক্—পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে নাম করে করে আমরা নাসিক শহরের শেষ প্রান্তে গোদাবরীর তীরে মহারাষ্ট্রের সর্ব্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ গাড্‌গে মহারাজের আশ্রমের দিকে যেতে লাগলাম। শ্রীমদ্ গাড্‌গে মহারাজের সঙ্গে একটু পরিচয় ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সহ তাঁর অবর্ত্তমানে আমরা তাঁর পন্ধরপুর আশ্রমে গেছি। তাঁর শিষ্যা শ্রীমতী মীরা বাঈ এবং শ্রীমতী গয়াবাঈ যাঁরা পদব্রজে বহু সঙ্গী সঙ্গিনী সহ চারধাম করেছেন তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত। শ্রীমদ্ গাড্‌গে মহারাজের অতিসংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত এখানে আশা করি অশোভন হবে না।

ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থ পন্ধরপুরের নিকটবর্ত্তী এক অখ্যাত পল্লীতে রজককুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যাশিক্ষার বালাই নেই তার গরীব পরিবারে। পরের বাড়ীতে খেটে খেতে হয়—প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে। বিবাহ হয়—সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি পেতে থাকে—অভাব চরমে যায়। এরই মধ্যে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মকুশলতা থাকা সত্ত্বেও মনিব—যার অবিশ্বাস অত্যাচার করাই ছিল চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম একদিন অমানুষিক নির্য্যাতন করেন তাঁকে। ডেবু (তাঁর ডাক নাম) বেরিয়ে পড়েন সকলকে ত্যাগ করে। ভগবানের উপর তাঁর চরম অবিশ্বাস আসে সেদিন। পথে জনৈক সাধুর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি আশ্বাস দিয়ে আর ২ দিনের মত ভগবানের নাম করে শেষ পরীক্ষা করে নিতে বলেন। সেস্থানেই তিনি বিট্ঠল ভগবানকে ডাকতে থাকেন আকুলভাবে। ঐ রাত্রেই পাণ্ডুরং ভগবান বিট্ঠলদেব তাঁকে দর্শন দান করে—তার সমস্ত চাওয়ার পাওয়ার অবসান করে দেন।

আজ তাঁর লক্ষ লক্ষ শিষ্য—গরীব, মধ্যবিত্ত, রাজা, মহারাজা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, মন্ত্রী প্রভৃতি তাঁর পিছু পিছু ছুটচেন—এতটুকু তাঁর কৃপালাভের আশায়। তিনি নিষ্কিঞ্চন—কীর্ত্তন ছাড়া লোক সঙ্গ করেন না। সভাসমিতিতে কোনরকম করে নিতে গেলে ছুটে পালিয়ে যান। চারদিকে লোকের অত্যন্ত ভীড় হ'য়ে গেলে পায়খানার নীচে গিয়ে বসে থাকেন এমন কথাও বিশিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শোনা গেছে। তিনি যদিচ্ছাচারী—কখন, কি ভাবে কোথায়

যাতায়াত করেন শিষ্য ভক্তেরাও জানেন না। সহস্র তালি দেওয়া লুঙ্গি—জামা এবং মস্তকাচ্ছাদন ব্যবহার করেন। হাতে সর্ব্বদা একটা লাঠি থাকে। লোকজন কাছে গেলেই তাড়া করেন লাঠি দিয়ে। সংকীর্ত্তন আর নরনারায়ণ সেবায় খুব ঝোঁক। নিজে করপাত্রী। অতি সাধারণ নোংরা কুঁড়েঘরে বাস। ভাঙ্গা মাটীর এবং এ্যালুমিনিয়মের কয়েকটা পাত্র মাত্র থাকে তাঁর কুঁড়ে ঘরে, পালঙ্ক, খাটিয়া মাদুরের বা কম্বলের বালাই নেই। খড়কুটো, ভাঙ্গা কাঠ-বাঁশ নিজেই যোগাড় করে রেখে দিয়েছেন। শোওয়া বসার প্রয়োজন তাতেই মিটে।

টাকা পয়সা স্পর্শ করেন না—অথচ তাঁর পিছু পিছু লক্ষ লক্ষ টাকা ছুটতে থাকে। তাঁর শিষ্যভক্তেরা পন্দরপুর, নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর, পুনা, মূর্ত্তিজাপুর প্রভৃতি ২০।২২ যায়গায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ধর্ম্মশালা, আতুর খঞ্জ অন্ধনিবাস স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি করেছেন। মহারাজ ঐ সব সমস্ত সংস্থা জনসাধারণকে দান করে দিয়েছেন। তাঁর পুত্র পরিবার এবং শিষ্যদের নামমাত্র অধিকারও তিনি দিয়ে যান নি এসব সংস্থার উপর। প্রত্যেক ধর্ম্মশালার পাশে তাঁর নিজের যেমন একটি অতি সাধারণ কুঁড়ে থাকে, তাঁর স্ত্রী, সন্তান সন্ততিদের জন্যও তেমনি অতি সাধারণ কুঁড়ে তৈরী করা আছে। দোতলা তেতলার সুদৃশ্য আবাসে বিশেষ সুখ সুবিধা ভোগ করার অধিকার থেকে তাঁদেরও বঞ্চিত করে দিয়েছেন। তাঁর সহধর্ম্মিণীও প্রায় ঐ সব কুঁড়েতেই নাম জপে মগ্ন থেকে নিষ্কিঞ্চন জীবন যাপন করছেন।

মহারাজের খাবার ব্যাপার আবার আরো অদ্ভুত। জাতিবিচার তিনি করেন না। যখন খুসী যার তার হাতে চেয়ে খেয়ে ফেলেন আবার সহস্র সহস্র লোকের কাতর আহ্বানও অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেন। কোথাও যাবার প্রয়োজন হলে রেলগাড়ীর বেঞ্চির নীচে গিয়ে শুয়ে পড়েন—উদ্দেশ্য আত্ম-গোপন। তাঁর সংস্থায় মোটর বাস্ লরী ট্যাক্সীর অভাব নেই। তাঁর সেবায় সেগুলি কদাচিৎ লাগে।

তাঁর একমাত্র উপদেশ—"নাম করো আর সাধু এবং জনতাজনার্দ্দনের সেবা করো। ব্যস্—দুঃখ জ্বালা কিছু থাকবে না—সংসার বৈকুণ্ঠ হয়ে যাবে।" *

—০—

* পূজ্যপাদ গাড্‌গে মহারাজ সম্প্রতি মহানির্বাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে ভারতের অধ্যাত্ম-জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। —লেখক।

পুস্তক পরিচয়

পূর্ণব্রহ্ম রাম ও রামনাম মহিমা :—২য় খণ্ড, শ্রীমৎ দণ্ডী স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত, পাহাড়ীপুর, মেদিনীপুর। ১২৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১।০ আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আলোচ্য পুস্তকের লেখক স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী সমাধিবান্ পরমহংস ও শংকরাচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দশনামী সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী সন্ন্যাসী ছিলেন।

তৎপ্রণীত 'সুগম সাধন পন্থা', 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত সূত্র' প্রভৃতি ৭।৮খানি ধর্মগ্রন্থ আছে। আলোচ্য পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রস্তাবনা লিখিয়াছেন ডুমুরদহের ঠাকুর শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথজী। দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন লেখকের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত। ইহার তৃতীয় খণ্ড অদূর ভবিষ্যতে পকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ড দুই উচ্ছ্বাসে এবং দ্বিতীয় খণ্ড চারি উচ্ছ্বাসে সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ডের চারি উচ্ছ্বাসে রামতত্ত্ব, রামোপাসনা, এবং রামচন্দ্রের সগুণ ব্রহ্মত্ব অদ্বিয়ত্ব আলোচিত। একনিষ্ঠ রামভক্তের অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু তথ্য ও তত্ত্ব এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রধানতঃ 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' অবলম্বনে রচিত এবং উক্ত সংস্কৃত পুস্তকের প্রায় বিশটী উদ্ধৃতিতে ইহা সমৃদ্ধ। অবশ্য শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রী উপনিষৎ, বেদান্তসার, বেদান্তসূত্র, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শাণ্ডিল্যসূত্র, গরুড়পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, শিবপুরাণ, উত্তর গীতা, পদ্মপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি পনেরখানি শাস্ত্রের বাক্য ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

'অধ্যাত্ম রামায়ণ' অদ্বৈত বেদান্তমূলক তত্ত্বগ্রন্থ। ইহার বঙ্গানুবাদ কলিকাতা হইতে বহুপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রবণে অনুরক্ত ছিলেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে পূর্ণব্রহ্মই ভগবান রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ। অদ্বৈতবাদের সহিত নাম-মাহাত্ম্য নিঃসন্দেহে সমঞ্জস। বেদান্ত দর্শনে অবতারবাদ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত-বহুল ও শব্দ-মণ্ডিত। ধর্মাপিপাসুগণ ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন।

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

ওপারের আলো : শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান :—থৈপাড়া, পোঃ পাণ্ডুয়া, হুগলি। মূল্য ২॥০ টাকা।

"ওপারের আলো" বইখানি এমন একখানা বই নয় যে এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া একটা সমালোচনা লিখিতে পারা যায়। কদাচিৎ দুই একখানা এমন বই প্রকাশিত হয় যাহার মধ্যে লোকের সারাজীবনের উপলব্ধি ফুটিয়া উঠে—সচেতন ও অবচেতন মনে যে সমস্ত ভাবনা ও স্বপ্নগুলি দানা বাঁধিবার জন্য আকুলি-বিকুলি করিতেছে সেগুলি প্রকাশ লাভ করে। হৃদয়ের অব্যক্ত অন্ধ আনন্দ ও আবেগ যখন ভাষামুখে প্রকাশিত হয়, তখন আমাদের ব্যবহৃত ভাষা অনুভূতির কতখানি প্রকাশ করিতে পারে? এই অবস্থায় সহানুভূতিহীন পাঠক বলে 'দুর্বোধ্য', কেহবা কৃপা করিয়া বলে 'মিস্‌টিক।' যাহা

ভাষায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য তাহাকে এমন সরল ও প্রাঞ্জল করিয়া শিবকৃষ্ণবাবু প্রকাশ করিয়াছেন যে সর্বাগ্রে তাঁহার লিপিকুশলতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে এমন সুন্দর একটা 'টেকনিকের' সাহায্যে তিনি রূপ দিয়াছেন যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

"ওপারের আলো" যুক্তিবিচার কণ্টকিত কোন তত্ত্বগ্রন্থ নয়। সুতরাং সাধারণ পাঠকের ভয় করিবার কারণ নাই! তবু আশঙ্কা আছে, কিন্তু পরিমাণে ভক্তি ও ভাবুকতা না থাকিলে এ গ্রন্থ পাঠে অগ্রসর হইতে পারিবেন না, রসাস্বাদ করা তো দূরের কথা। লেখক 'রূপসাগরে ডুব' দিয়াছেন 'অরূপ' লাভ করিবার জন্য এবং ভগবৎকৃপায় তাহা পাইয়াছেন। পাঠক যদি ধৈর্য ধরিয়া বইখানি সহানুভূতি লইয়া পাঠ করেন তবে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি তিনি কবিত্ব, দার্শনিকতা ও ভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করিয়া ধন্য হইবেন।

কিশোর জীবন হইতেই শিবকৃষ্ণবাবু আমার সুপরিচিত। রবীন্দ্রসাহিত্যে আমার অনুরাগ সঞ্চারের মূলে তাঁহার অনেকখানি হাত ছিল। আমাদের কলেজ জীবনের সাহিত্য সভার তিনি ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। আজ 'ওপারের আলো' পড়িয়া ভাবিতেছি, আমরা বহির্মুখী দৃষ্টি লইয়া এখনও মাতিয়া আছি আর শিববাবু মনন ও অনুভূতির কোন উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছেন। বাস্তবিকই লেখকের লেখনী দৈবী প্রেরণাবশেই চালিত।

—অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী

—০—

বিজ্ঞপ্তি

বিগত ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪ সাল দিগসুই সাধন সমিতিতে শ্রীশ্রীরামনাম খাতা পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

এ-বৎসর মোট ১২,৫৬,৬৬,০৬৩ রামনাম সংগৃহীত হইয়াছে। এই লইয়া আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত মোট নাম সংখ্যা দাঁড়াইল ৫০,৯২,৮০,৭২১।

আলোচ্য বৎসরে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক নাম লিখিয়া প্রথম স্থানাধিকারীর গৌরব অর্জন করিয়াছেন—

কর্ণেল রানা কৈসারী সিং, রাজাবাগ, দিওয়াস রোড, ইন্দোর (মধ্য প্রদেশ) সংখ্যা—১৫,৯১,৮৯০।

দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন—শ্রীসুধাকর মল্লিক,
সাগড়া জোন, চুঁচুড়া, হুগলী।

সংখ্যা—১৪,৮২,০০০।

নিবেদক—

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, সাধন সমিতি,
দিগসুই, হুগলী।

সংবাদ

গত ১লা ফাল্গুন হইতে ২৪শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত শ্রীমৎ দণ্ডীস্বামী বিশুদ্ধানন্দ তীর্থ মহারাজের শুভ-প্রচেষ্টায় জৌগ্রাম—(বর্ধমান) বেদান্ত আশ্রমে 'মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ' সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান-সূচী এইরূপ—মহামৃত্যুঞ্জয় জপ সংখ্যা—৪৪৩২০০৮, আহুতি—১১২০০৮; (হোমের জন্য বিল্ববৃক্ষ ৯টি এবং আড়াই মণ গব্যঘৃতের ব্যবস্থা করা হয়।) চণ্ডী পাঠ—২৮ রূপ, গীতাপাঠ—২৮ বার, পার্থিব শিবপূজা—২৮টি, দুর্গানাম জপ—৪০৩২, মধুসূদন নাম জপ ৪০৩২, নারায়ণে তুলসী দান—১০০৮, প্রত্যহ নবগ্রহ পূজা, হোম, কীর্তন প্রভৃতি। এই যজ্ঞে প্রায় দ্বাদশ-সহস্র নরনারায়ণ সেবা গ্রহণ করেন।

কয়েকজন ধর্মনিষ্ঠ যতি এবং পণ্ডিত যজ্ঞকার্যে ব্রতী ছিলেন।

*　*　*　*

শ্রীমৎ দণ্ডীস্বামী বিশুদ্ধানন্দতীর্থ মহারাজ বর্ধমান জেলার বিভিন্ন গ্রামে (জৌগ্রাম প্রভৃতি) নামযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

*　*　*　*

৪ঠা 'বৈশাখ শ্রীশ্রীমা'র তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে জয়গুরু সম্প্রদায়ের আশ্রমে নামযজ্ঞ, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

*　*　*　*

১লা বৈশাখ শ্রীনীলাচল-আশ্রমে (পুরীধাম) অষ্টপ্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ হইয়াছে। প্রায় দুইশত নরনারায়ণ অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

*　*　*　*

কিঙ্কর শ্রীগোঁসাইজীর নেতৃত্বে জয়গুরু সম্প্রদায়ের একটি কীর্তনদল সম্প্রতি নিম্নলিখিত স্থান সমূহে মহামন্ত্র-নাম প্রচার করেন—গয়া, এলাহবাদ, জব্বলপুর, ওঙ্কারেশ্বর, উজ্জয়িনী প্রভৃতি।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৬শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার গুরু-পূর্ণিমা দিবসে ডুমুরদহ রামাশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশক্রমে শ্রীসত্যধর্মপ্রচার সঙ্ঘের প্রবর্তন-উৎসব হইবে।

জয়গুরু সম্প্রদায়ের সকল শিষ্য-ভক্ত ও সঙ্ঘের সংসেবকগণের যোগদান প্রার্থনীয়।

নিবেদক
শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ
সর্বাধীশ
শ্রীসত্যধর্মপ্রচার সংঘ।

—০—

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

"জয়গুরু" পাক্ষিক পত্রিকা

সপ্রেম জয়গুরু,

গত ১৩৬২ সনের পৌষ মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন ওঙ্কারেশ্বরের ওঙ্কারমঠে মৌন, কয়েকজন গুরুভাই ও বিরক্তভাই সহ আমাদের সম্প্রদায়ের একটি পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন জানাই।

১। শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যাদি ও ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পত্রাদি ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সংবাদাদি লইবার আগ্রহ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে পত্রাদির উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ায় একটি পত্রিকা মারফৎ পত্রাদির উত্তর দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।"

২। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শ প্রচার ও নাম প্রচার করা।

৩। শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সঙ্ঘ শক্তি ও সহযোগিতার ভাব ও ভায়েদের পারস্পরিক সম্বন্ধ গ্রথিত করা।

৪। 'দেবযান' পত্রিকা জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রচার পত্র নয়, সেইহেতু জয়গুরু সম্প্রদায়ের ধারাবাহিক কোন প্রচার 'দেবযানে' প্রকাশিত হইবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার মৌনের মধ্যে পত্রে তাঁহার মত দেন। এবং স্বয়ং পত্রিকার 'জয়গুরু' নামকরণ করেন। কিন্তু তিনি 'দেবযান' মাসিক পত্রিকার কোনরূপ ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ গ্রাহক সংখ্যা না কমিয়া যায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 'জয়গুরু' পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের মত দেন।

কিন্তু তখন 'দেবযান' পত্রিকার ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহস করা যায় নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর মৌন ত্যাগের পর বাংলায় নাম প্রচার কালে ও পরে মৌন কালে ওঙ্কারমঠে "জয়গুরু" পত্রিকা প্রকাশ সম্বন্ধে খোঁজ খবর লন।

অদ্য "জয়গুরু" পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ও 'দেবযান' মাসিক পত্রিকা বহুল প্রচারের সঙ্কল্প লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে নিবেদন জানাইলে তিনি আমাদের এই কার্য্যে সম্মতি ও আশীর্ব্বাদ জানান।

'জয়গুরু' পত্রিকার বৎসর আরম্ভ—১৪ই আষাঢ়, ১৩৬৪ (রথযাত্রার দিন)

প্রকাশের স্থান—৯৪ শান্তিরাম রাস্তা, বালি, হাওড়া।

কি কি বিষয় থাকিবে—

১। শ্রীশ্রীপরম গুরুদেবের বাণী ব্লকসহ।

২। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও প্রবন্ধাদি।

৩। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্যগণের পত্রাদির উত্তর।

৪। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধীয়, জীবনী, স্তুতি ও গঠনমূলক আলোচনা।

৫। ভক্ত ও শিষ্যগণের অনুভূতিমূলক পত্র, ধর্ম্ম ও সমাজ কল্যাণ সম্পর্কিত প্রবন্ধাদি।

৬। জয়গুরু সম্প্রদায়ের যথা, সত্যধর্ম্ম প্রচার সঙ্ঘ, অখিল ভারত মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল, বিরক্ত সঙ্ঘ, রামানন্দ শিক্ষা পরিষদ, রামায়ণ মন্দির মঠ ও আশ্রমাদির পুস্তক প্রকাশন ও প্রচার বিভাগ, দেবযান সঙ্ঘ, রামনাম লিখন প্রচার সঙ্ঘ, যাবতীয় প্রচার কার্য্যকলাপের তথ্যাদি প্রকাশ।

৭। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিনপঞ্জী রাখা।

৮। সাময়িক সমালোচনা।

(ক) পত্রিকা বাংলা ভাষায় হইবে। সম্ভব হইলে ২।৪ পৃষ্ঠা হিন্দি ভাষায় প্রকাশ করা হইবে।

(খ) 'দেবযান' পত্রিকার প্রচারের জন্য এই পত্রিকার মাধ্যমে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইবে। 'দেবযান' গ্রাহকগণ, 'জয়গুরু' পত্রিকা লইয়া 'দেবযান' বন্ধ করিলে তাঁহাদেয় 'জয়গুরু' পত্রিকা দেওয়া হইবে না।

(গ) পত্রিকা ১২ পৃষ্ঠায় হইবে। মূল্য বার্ষিক ২৲ হইবে। বৎসরে ২৪টি পত্রিকা বাহির হইবে।

(ঘ) পত্রিকায় কোন প্রকার বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

(ঙ) পত্রিকার বাৎসরিক চাঁদা ও প্রবন্ধাদি ৯৪, শান্তিরাম রাস্তার অফিসে পাঠাইয়া দিবেন।

ইতি—

ওঙ্কারমঠ
মান্ধাতা ওঙ্কারজী
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪ সাল

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত
কিঙ্কর গোবিন্দদাস
কিঙ্কর নারায়ণ

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীঠাকুর পরিকল্পিত

॥ শ্রীশ্রীরামানন্দ রামায়ণ-মন্দির ॥

"এই মন্দির কেওটা প্রাণকৃষ্ণ আশ্রমে নির্ম্মিত হইবে।

সংগ্রহ করিতে হইবে যত ভাষায় যত প্রকার রামায়ণ আছে। যত সংস্করণে বাংলা কৃত্তিবাসী রামায়ণ যত প্রকার আছে। বাল্মীকি রামায়ণ, রামায়ণ তিলক সহ মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মূল বঙ্গানুবাদ সহ (তর্করত্ন মহাশয় সম্পাদিত) আর—কাহারও অনুবাদ যদি থাকে। রামরসায়ন, জগদ্রামী রামায়ণ, কথকতার রামায়ণের পুঁথি, সংস্কৃত মূলের পুঁথি। রামায়ণ গায়কগণের পুঁথি। অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, দাশুরায়ের পাঁচালীতে রামলীলা, ব্রজরায়ের পাঁচালীতে রামলীলা, রামায়ণ অবলম্বনে যত প্রকার সংস্করণ আছে। সীতা বনবাস, সীতা শ্রীরাম ইত্যাদি। ছেলেদের রামায়ণ, রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্য, বাল্মীকি রামায়ণ, তুলসীদাসী রামায়ণের বঙ্গানুবাদ। সংস্কৃত অগ্নিবেশ রামায়ণ, আনন্দ-রামায়ণ আত্ম রামায়ণ, বেদান্ত রামায়ণ। সংস্কৃত ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, উত্তর রামচরিত, প্রতিমা নাটক, মহানাটক, মহাবীরচরিত। আরও রামায়ণ ঘটিত যে সমস্ত নাটক কাব্য, যতরকম সংস্করণ আছে। হিন্দী তুলসীদাসী রামায়ণ যতরকম সংস্করণ আছে, হিন্দী বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ। অন্যান্য যে সমস্ত কাব্য নাটক রামায়ণমূলক আছে। উড়িয়া, তেলেগু, তামিল, মহারাষ্ট্র, গুজরাটী, উর্দ্দু, ফার্সী। এ্যামেরিকায় ও ইংলণ্ডে যদি কোন রামায়ণ থাকে—এবং অন্যান্য ভাষায়।

শ্রীশ্রীরামানন্দ রামায়ণ মন্দির সঙ্ঘ

নিয়ামক—শ্রী১০৮ শ্রীমৎ লক্ষ্মীনারায়ণদাস মহারাজ।
মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ ডি-লিট্।
শ্রীকেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ।

সংস্থাপক—শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ, শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিমলকৃষ্ণ বিদ্যারত্ন, শ্রীরঘুনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ।

সম্পালক—ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ-ডি; অধ্যাপক শ্রীবঙ্কুবিহারী পণ্ডিত, ডক্টর শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ডি-লিট্, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই-সি-এস্, শ্রীজগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধাকান্ত মুখোপাধ্যায়,

শ্রীরঞ্জিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযামিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাস গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-বি, ডি-টি-এম্, ডি-পি-এইচ্, অধ্যাপক শ্রীভুজঙ্গভূষণ মিত্র এম্-এ, শ্রীবাহুবল চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি টি, অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীজটিলকুমার সরকার এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীযোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, শ্রীকালীচরণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুধীর কুমার বিশ্বাস, শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সন্দর্শক—ডাক্তার শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ বি-এস্-সি এম্-বি, শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীজয়ন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ, শ্রীবিজয়চন্দ্র দে, ডাক্তার শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত, শ্রীবনমালী. শ্রীভুজেন্দ্রনাথ সরকার।

সঙ্কলক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ করঞ্জাই, শ্রীললিতমাধব চৌধুরী,

সহকারী সঙ্কলক—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমণীন্দ্র দত্ত,

মধ্যভারতের সঙ্কলক—শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী এম্-এ, এল-এল-বি।

রাজস্থানের সঙ্কলক—কুমার মানসিংহ।

সভ্য ইঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন :—

১। পণ্ডিত অনন্তনাথ তর্কতীর্থ—কলিকাতা

২। " তারাপদ কাব্যতীর্থ }—চাঁচাই, বর্দ্ধমান

৩। " অভয়াপদ কাব্যতীর্থ }

৪। " সুশীলকুমার কাব্যস্মৃতিতীর্থ—জোগ্রাম, বর্দ্ধমান

৫। " খগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ—বেলুন, হুগলী

সর্ব্বাধীশ—শ্রীসদানন্দ চক্রবর্ত্তী

সহকারী সর্ব্বাধীশ—অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদরঞ্জন গুপ্ত।

কোষাধীশ—অধ্যপক শ্রীমনোজকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতার সঙ্কলকদের কার্য্য—যত লাইব্রেরী আছে তাহাতে রাম সম্বন্ধীয় যত পুস্তক আছে জানা ও কত মূল্য আছে তাহা জানা।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

দেবযানের গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ একটি দেবযানের গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

বিনীত

কর্ম্মাধ্যক্ষ

দেবযান—মগরা (হুগলি)

॥ শ্রীঃ ॥
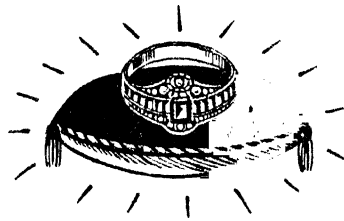
নবম বর্ষ,
একাদশ সংখ্যা

আষাঢ়
১৩৬৪

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢমানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

জীবন্মুক্তি

[শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ]

সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধিদ্বয় জীবন্মুক্তেই লাভ করেন। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান দ্বারা অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হন। তখন অজ্ঞান এবং অজ্ঞান কল্পিত পুণ্য, পাপ, সংশয়, ও বিপর্য্যয় প্রভৃতি নিবৃত্ত হয়। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সর্ববন্ধন রহিত ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।৮) জীবন্মুক্তির অবস্থা এইরূপ বর্ণিত আছে। —

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

অনুবাদ—সেই সর্বাত্মক পরব্রহ্ম স্বাত্মরূপে দৃষ্ট হইলে দ্রষ্টার হৃদয়স্থ গ্রন্থিসমূহ, বুদ্ধিগত ভ্রমজাল বিনষ্ট হয়, সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষীণ হয়।

শংকরাচার্য্য বলেন—

জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তি হেতবে দেহধারিতম্।
আত্মনা নিত্যমুক্তেন ন তু সংসারকাম্যয়া॥

অনুবাদ—নিত্য মুক্ত আত্মার মানব দেহধারণ জীবন্মুক্তির সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত, সংসার সুখ ভোগের জন্য নহে।

জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে ঈশ উপনিষদের নিম্নলিখিত ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রদ্বয় অনুধাবনীয়।

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ॥

অনুবাদ—যিনি ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত বস্তুবর্গ স্বীয় আত্মাতেই দেখেন এবং সর্ববস্তুতে নিজ আত্মাকে দেখেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যখন সর্ববস্তু আত্মজ্ঞের আত্মাই হইয়া যায় তখন সেই একত্বদর্শনকারীর মোহই বা কি, শোকই বা কি?

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।৭) আছে, 'তদ্‌যথার্থাহি নির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতে।' ইহার অর্থ যেমন সাপের খোলস বল্মীক স্তূপে পড়িয়া থাকে জীবন্মুক্তের শরীরও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। গীতায় (৪।৩৭ এবং ১৮।৫৪) শ্লোকদ্বয়ে জীবন্মুক্ত অবস্থা নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত।—

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥
ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, সমিদ্ধ অনল যেমন কাষ্ঠস্তূপকে ভস্মীভূত করে তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি শুভ ও অশুভ কর্মসমূহ বিনষ্ট করে। মুক্তপুরুষ ব্রহ্মময় ও সদানন্দ হন। তিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টি করেন, পরাভক্তি লাভ করেন। তিনি কোন কালে শোক করেন না এবং কোন বিষয় আকাংক্ষাও করেন না।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ব্যুত্থিত সময়ে রক্ত, মাংস, মলমূত্রাদির আধার শরীর এবং অন্ধতা, অপটুতাদির আশ্রয় ইন্দ্রিয়বর্গ এবং ক্ষুৎপিপাসা, শোক মোহাদির আকর অন্তঃকরণ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অবিরোধী প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করেন। তিনি দৃশ্যমান জগৎ দেখিয়াও দেখেন না। যেমন ঐন্দ্রজালিক পদার্থের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দৃশ্যমান ইন্দ্রজালকে অসত্য মনে করেন সেইরূপ তিনি এই জগৎকে অনিত্য

ভাবেন। শ্রুতিতে আছে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি যেন সচক্ষু হইয়াও অচক্ষু, যেন সকর্ণ হইয়াও অকর্ণ, যেন সমনস্ক হইয়াও অমনস্ক এবং যেন সপ্রাণ হইয়াও অপ্রাণ। 'উপদেশ সাহস্রী' গ্রন্থে উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়। —

সুষুপ্তবৎ জাগ্রতি যো ন পশ্যতি
দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ।
তথা হি কুর্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ
স আত্মবিন্নান্যইতীহ নিশ্চয়ঃ॥

অনুবাদ—যিনি জাগ্রৎ অবস্থাতেও সুষুপ্তবৎ থাকেন, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য সত্ত্বেও যিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু দর্শন করেন, এবং যিনি বাহ্য কর্ম করিয়াও অন্তরে অনাসক্ত থাকেন তিনিই আত্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত, অন্যে নহে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (৫।১৬।১৯) আছে, 'সুষুপ্তবৎ যশ্চরতি স মুক্ত ইতি কথ্যতে।' ইহার অর্থ, যিনি জাগ্রৎকালে সুষুপ্তবৎ অনাসক্ত আচরণ করেন তিনিই জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। টীকাকার রামতীর্থ বলেন, 'জীবন্মুক্তো দেহাদিভির্ব্যবহরন্নিব দৃশ্যমানোঽপি ন পরমার্থতো ব্যবহরতি।' ইহার অর্থ, জীবন্মুক্তকে দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ব্যবহার করিতে দেখিলেও যথার্থতঃ তিনি ব্যবহার করেন না; কারণ তাঁহার দেহবোধ চিরতরে তিরোহিত, এবং নিরন্তর আত্মবোধ সমুদিত।

গৌতম সংহিতাতে (৩।২৪।২৫) আছে, 'হিংসানুগ্রহয়োঃ অনারম্ভী।' ইহার অর্থ, জীবন্মুক্ত অনুগ্রহ ও নিগ্রহের অতীত। তিনি সর্বদা নির্বাসন ও নিরভিমান। তিনি শুভাশুভ কর্মে ও আহারবিহারাদিতে উদাসীন। মুক্ত পুরুষের যথেচ্ছ আচরণ অসম্ভব। কৌষিতকী উপনিষদে (৩।১) আছে, 'ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন।' ইহার অর্থ, মাতৃবধ বা পিতৃবধের পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করেনা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৯) আছে, "এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু নাকরবম্। কিমহং পাপ মকরমিতি।" ইহার অর্থ, 'উক্তরূপ জীবন্মুক্ত বা ব্রহ্মজ্ঞানীকে এইরূপ অনুতাপ উদ্বিগ্ন করেনা—কেন আমি সাধু কর্ম করি নাই, কেন পাপ কর্ম করিয়াছিলাম।' মহাভারতে (২২।১৬৪) আছে।—

নিরাশিষমনারম্ভং নির্নমস্কারমস্তুতিং।
অক্ষীণং ক্ষীণকর্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।

অনুবাদ—নিষ্কাম নিষ্কর্ম নির্নমস্কার স্তুতিহীন ক্ষয়শূন্য ক্ষীণকর্ম ব্যক্তিকে দেবগণ ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

গীতাতে (১৮।১৭) উক্ত হইয়াছে। —

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

অনুবাদ—যাঁহার অহংকর্তাবোধ নাই ও যাঁহার বুদ্ধি কোন কর্মে লিপ্ত হয় না তিনি জগতের সর্বপ্রাণীকে বধ করিয়াও বধ করেন না।

'পরমার্থসার' গ্রন্থে ৭৮ শ্লোকে আছে।—

হয়মেধশতসহস্র্যাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মঘাতলক্ষাণি।
পরমার্থবিৎ ন পুণ্যৈর্নচ পাপৈর্লিপ্যতে মনুজঃ॥

অনুবাদ—লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণহত্যা ও শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ মানব কোন পুণ্যে বা পাপে লিপ্ত হন না।

সুতসংহিতায় ৯১৮ শ্লোকে আছে। —

অশ্বমেধসহস্রাণি ব্রহ্মহত্যাশতানি চ।
কুর্বন্নপি ন লিপ্যেত যদ্যেকত্বং প্রপশ্যতি॥

অনুবাদ—যদি কেহ সর্বত্র আত্মার একত্ব দর্শন করেন তিনি সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত ব্রাহ্মণবধ করিলেও তৎ তৎ পুণ্যে বা পাপে লিপ্ত হন না।

'উপদেশসাহস্রী'তে ৬৪০ শ্লোকে আছে। —

সভয়াৎ অভয়ং প্রাপ্ত স্তদর্থং যততে চ যঃ।
স পুনঃ সভয়ং গন্তুং স্বতন্ত্রশ্চেন্ন হীচ্ছতি॥

অনুবাদ—যিনি সভয় আবদ্ধ অবস্থা হইতে অভীপ্রাপ্ত হইয়া তন্নিমিত্ত প্রযত্ন করেন তিনি পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে পূর্ব ভীতাবস্থায় যাইতে ইচ্ছা করেন না।

'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' গ্রন্থে (৪।৬।২১) আছে।—

বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে॥

অনুবাদ—অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে যদি যথেচ্ছ আচরণ হয় তবে অশুচি ভক্ষণাদি বিষয়ে কুক্কুরাদির সহিত তত্ত্বজ্ঞের প্রভেদ কি ?

তত্ত্বজ্ঞান হইলে যাহার যথেচ্ছ আচরণ নিবৃত্ত হয় তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনিই যথার্থ আত্মজ্ঞ, অন্যে নহে।

জীবন্মুক্তের জীবনে যথেচ্ছাচরণের সম্ভাবনাও নাই; কারণ তিনি পূর্বে শুভ কর্মের অভ্যাস ও অশুভ কর্ম বর্জন করিয়াছিলেন, কিংবা তিনি শুভাশুভ উভয় কর্মেই উদাসীন ছিলেন। উক্ত মর্মে প্রসিদ্ধ 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি' গ্রন্থে (৪।৬৩, ৬৫-৬৭) নিম্নোক্ত চারিশ্লোক পাওয়া যায়।—

অধর্মাৎ জায়তেঽজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ।
ধর্মকার্য্যে কথং তৎ স্যাৎ যত্র ধর্মোঽপি নেষ্যতে॥
যো হি যত্র বিরক্তঃ স্যাৎ নাসৌ তস্মিন্ প্রবর্ততে।
লোকত্রয়াৎ বিরক্তত্বাৎ মুমুক্ষুঃ কিমিতীহতে॥
ক্ষুধয়া পীড্যমানোঽপি ন বিষং হ্যত্তুমিচ্ছতি।
মিষ্টান্নধ্বস্ততৃড্ জানন্ নামূঢ়স্তজ্জিঘৎসতি॥
রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু।
কুতঃ শাদ্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরে তরোঃ॥

অনুবাদ—অধর্ম হইতে অজ্ঞান জন্মে, অজ্ঞান হইতে যথেচ্ছ আচরণ হয়। ধর্মাচরণে কিরূপে তাহা সম্ভব? যেখানে ধর্ম ও আকাংক্ষিত নয় ও ধর্মাতীত হইবার সাধনা চলে তথায় অধর্মাচরণ অসম্ভব। যিনি যে বিষয়ে অনাসক্ত হন তিনি সেই বিষয়ে কদাপি প্রবৃত্ত হন না। ত্রিভুবনে অনাসক্ত মুমুক্ষু কিরূপে অন্যায় আচরণ করিবেন? ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত হইলেও কেহ বিষপান করিতে ইচ্ছা করে না। মিষ্টান্নে তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় জানিয়া অমূঢ় ব্যক্তি উহা কদাপি ঘৃণা করেন না। চিত্তপ্রবৃত্তির বিষয়ে আসক্তি অজ্ঞের লক্ষণ। যে তরুর কোটরে অগ্নি বিদ্যমান তাহার শাদ্বলতা বা হরিৎবর্ণ কিরূপে সম্ভব?

জীবন্মুক্ত অবস্থায় জ্ঞানসাধন অমানিত্বাদি সদ্গুণ ও অহিংসাদি সদ্গুণ অলঙ্কারবৎই অনুবর্তিত হয়। এই সকল সদ্গুণ পূর্বাভ্যাসবলে স্বভাবগত হওয়ায় স্বতঃই উপস্থিত, প্রযত্ন পূর্বক করিতে হয় না। 'নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি'তে (৪।৬৯) উক্ত মর্মে আছে—

উৎপন্নাত্মবোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যস্য নতু সাধনরূপিণঃ॥

অনুবাদ—যাঁহার আত্মবোধ উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার জীবনে অদ্বেষ্টৃত্বাদি সদ্গুণ বিনা যত্নেই প্রকটিত হয়।

অদ্বৈত বেদান্তসিদ্ধান্ত এই যে, জীবন্মুক্ত পুরুষ কেবল দেহযাত্রানির্বাহের জন্য ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছা—এই তিন প্রকারে প্রাপ্ত বা আগত সুখ দুঃখরূপ প্রারব্ধ কর্মফল আভাসরূপে অনুভবপূর্বক অন্তঃকরণাদির প্রকাশক চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন। প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাঁহার প্রাণ প্রত্যগানন্দ পরব্রহ্মে লীন হয় এবং অজ্ঞান ও তৎ কার্য্যসংস্কার সমূলে বিনষ্ট হয়। তখন তিনি পরম কৈবল্য লাভ করেন, সৈন্ধবপিণ্ডবৎ একরস ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হন। এই সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।৬, ৩।২।১১) উক্ত হইয়াছে,

"ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি। অত্রৈব সমবলীয়ন্তে।" এই শ্রুতি মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ, দেহাবসানে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাণাখ্য লিঙ্গশরীর লোকান্তরে গমন করে না, অতিতপ্ত লৌহে ক্ষিপ্তনীরবিন্দুবৎ ব্রহ্মেই লীন হয়। কঠ উপনিষদে (২।২।১) আছে, 'বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে।' ইহার অর্থ, আত্মজ্ঞ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মকৈবল্য প্রাপ্ত হন।

গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যকারিকাতে (২।৩২) এবং ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদের দশম শ্লোকে নিম্নোক্ত শ্লোক আছে।—

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বা মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

অনুবাদ—কাহারো মৃত্যু বা জন্ম নাই, বন্ধন বা সাধন নাই। কেহ মুক্ত বা মুমুক্ষু নাই। ইহাই পরমার্থ দৃষ্টিভঙ্গী। ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।৭) আছে—

যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

অনুবাদ—যখন হৃদয়স্থ সমস্ত কামনা হইতে মর্ত্য প্রমুক্ত হয় তখন যোগী ইহলোকেই অমৃতত্বের অধিকারী হয় ও ব্রহ্মলাভ করে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (৩।৯।১৪) আছে—

জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে।
ভবত্যদেহমুক্তত্বং পবনোস্পন্দতামিব॥

অনুবাদ—স্থূলদেহ কালগ্রস্ত হইলে বায়ু স্পন্দনবৎ বিদেহমুক্তি লাভ হয়।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি—এই দুই প্রকার মুক্তি বেদান্তে স্বীকৃত। জীবদ্দশায় যে মুক্তিপদ লাভ হয় তাহাই জীবন্মুক্তি। দেহ-ত্যাগের পর বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

বশিষ্ঠ, ভীষ্ম প্রভৃতি অপরোক্ষ জ্ঞানিগণের পুনর্জন্ম শাস্ত্রে কথিত আছে। কিন্তু তাঁহারা আধিকারিক মহাপুরুষ। সাধারণ মুক্তপুরুষের জন্মান্তর হয় না। শাস্ত্রে আছে—

আত্মাজ্ঞানমলং নিরস্তমমলং প্রাপ্তঞ্চ তত্ত্বং পরং
কণ্ঠস্থাভরণাদিবৎ ভ্রমবশাৎ ছায়াপিশাচী যথা।
আপ্তোক্ত্যাপ্তিনিবৃত্তিচ্ছ্রুতিশিরোবাক্যাৎ গুরোরুত্থিতা-
ধ্বস্তধ্বান্তনিরাসতঃ পরসুখং প্রাপ্তং তয়োরুচ্যতে॥

অনুবাদ—আমার আত্মস্বরূপবিষয়ক অজ্ঞানমল তিরোহিত হইয়াছে এবং আমি

সুনির্মল পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন ছায়াতে অধ্যস্ত পিশাচী অপসৃত হইলে অভীঃ লাভ হয়, অথবা কণ্ঠস্থ আভরণ ভ্রমবশে অন্যত্র খুঁজিয়া অবশেষে স্বকণ্ঠে পাওয়া যায়, অজ্ঞাননিবৃত্তি ও আত্মজ্ঞান লাভ ঠিক তদ্রূপ। গুরুমুখ হইতে নিঃসৃত উপনিষদ্বাক্যবলে ধ্বান্ত (তমঃ) নিরস্ত হইয়াছে এবং আমি পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। আপ্তপুরুষের উপদেশেই অজ্ঞান অপসৃত ও জ্ঞান আবির্ভূত হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১।৩) আছে, 'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ।' ইহার অর্থ, আত্মজ্ঞ শোকাতীত হন। পরমার্থ সার গ্রন্থে ৮২ শ্লোকে আছে—

তীর্থেশ্বপচগৃহে বা নষ্ট স্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহং।
জ্ঞানসমকালে মুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ।

অনুবাদ—তীর্থস্থানে বা চণ্ডালগৃহে মুক্তপুরুষ নষ্টস্মৃতি হইয়াও দেহত্যাগ করিলে জ্ঞানকালের ন্যায় হতশোক হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

সুতসংহিতায় (৩।৭।৭৬-৭৮) নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকত্রয় আছে। —

যস্মিন্ দেহে দৃঢ়ং জ্ঞানপরোক্ষং বিজায়তে।
তদ্দেহপাতপর্যন্তমেব সংসারদর্শনম্॥
পুরাপি নাস্তি সংসারদর্শনং পরমার্থতঃ।
কথং তদ্দর্শনং দেহবিনাশাদূর্দ্ধমুচ্যতে॥
তস্মাদ্ ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানং দৃঢ়ং চরমবিগ্রহে।
জায়তে মুক্তিদং জ্ঞানং প্রসাদাদেব মুচ্যতে॥

অনুবাদ—যে দেহে সুদৃঢ় অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই দেহপাত পর্য্যন্তই সংসারদশা চলে। পরমার্থদৃষ্টিতে পূর্বেও সংসারদশা ছিল না। অতএব জ্ঞানীর দেহপাতের পরেও কিরূপে সংসারদশা সম্ভব হয়? সেইহেতু ব্রহ্মাত্ম বোধ সুদৃঢ় হইলে বহুজন্ম বাঞ্ছিত আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞান-বলে মুক্তি লাভ হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মানব জীবনের চরম সার্থকতা। বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করিলে মানুষের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং চতুর্থ বর্গলাভে আগ্রহ জন্মে। হরি ওঁ তৎ সৎ।

—০—

ক্ষেপার ঝুলি

কন্ধ-কাটা

[শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

ক্ষেপা বেলতলায় বসিয়া আপন মনে রাম রাম করিতেছে এই সময় হরিধন আসিয়া বলিল "ও ক্ষেপা শুনেছ ?"

ক্ষেপা। রাম, রাম কি সীতারাম ?

হরি। ঐ তেষট্টি বৎসরের বুড়ো সাধুর দুর্নামের কথা ?

ক্ষেপা। রাম, রাম সীতারাম, না সীতারাম।

হরি। তার চরিত্র দোষের জন্য দেশে একবারে হৈ হৈ ব্যাপার। সকলে নিন্দা করছে। এসব কি ক্ষেপা বাবা! এতবড় সাধু ২৫০০ হাজার তাঁর শিষ্য, তবু এমন দুষ্প্রবৃত্তি। একি ক্ষেপা বাবা!

ক্ষেপা। রাম, রাম সীতারাম, ও কিছু নয় কিছু নয়, কন্ধ কাটার খেলা। রাম, রাম, সীতারাম।

হরি। দেখ ক্ষেপা বাবা, আমি এসব কিছু বুঝতে পারি না। সাধুদের চরিত্রের নানা কথা শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

একি ব্যাপার! যাঁরা লোক-শিক্ষক, ভজন সাধন নিয়ে সারা জীবন কাটাচ্ছেন, তাঁদেরও এ মতিভ্রম হয়? শুধু এঁর কথা নয়—আরও ক'জনের কথা বল্‌ছি শোনো।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। অনেক দিনের কথা। একজন নামজাদা সাধু, তাঁর বক্তৃতায় তখন দেশের স্রোত ফিরে গেছলো, তাঁকেও স্ত্রী ঘটিত মোকর্দ্দমায় জেল পর্য্যন্ত খাটতে হয়েছিল শুনেছি। বহু বৎসর অতীত হ'ল বৈদ্যবাটীর কাছে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে গঙ্গার ধারে এক বুড়ো সাধু থাক্‌তেন। তিনি তাঁর এক যুবতী বন্ধ্যা শিষ্যার স্তন পান করেন, তা নিয়ে কি হৈ হৈ, সাধুকে কত লোকে নিন্দা কর্‌তে লাগলো।

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। বহুদিন পূর্ব্বে নিত্যানন্দপুরের এক মায়ীর মুখে শুনেছিলাম একদিন তাঁদের বাটীতে তাঁদের এক বৃদ্ধ শিষ্য ও একটী যুবক সাধু আসেন। যুবক সাধু তাঁকে বলেন "তুমি আমার গত জন্মের মা"—এই বলে সে বাড়ীতেই কতকগুলি

চিহ্ন দেখান যে এইগুলি গতবারে আমি করে গেছলাম। আমি লক্ষণের দ্বারা আমার মৃত প্রথম পুত্র বলে জান্‌তে পারি। রাত্রে সে মাই খেতে চায়। তাকে মাই দিই। আমার স্বামী খাঁড়া নিয়ে তাঁকে কাটতে যান, আমি তখন দুটী ছেলেকে নিয়ে কলিকাতা "মহা—" মঠে যাই, সে মঠের কর্ত্তা বলেন, অমুককে —কি—অমুক ভট্টাচার্য্য কেটে ফেলেছে? আমি বলি, না। তিনি বলেন,— আমি তাকে তার পূর্ব্বজন্মের মাতার কাছে মাই খাবার জন্য পাঠিয়েছিলাম। বেঁচে আছে তো—যাক্‌ তার বাসনা ক্ষয় হয়ে গেল। আরও কত রকম কথা সাধুদের সম্বন্ধে শোনা যায়।

সাধারণ লোকের সম্বন্ধে হয় সে এক কথা, সাধুদের চরিত্রে দোষারোপ করে এতে বড় দুঃখ হয়। এসব কি ক্ষেপা বাবা!

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, এসব হ'ল "কবন্ধের অত্যাচার" সাধুরা একথা বলে থাকেন। সীতারাম রাম রাম সীতারাম। যেমন যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুর শিরশ্ছেদন করে দিলেও কবন্ধ উঠে নাচে, সেইরূপ সংসার সংগ্রামে জয়লাভকারী সাধুর সম্বন্ধে এ সব গুলি হ'ল "কন্ধ কাটার অত্যাচার" রাম রাম সীতারাম।

হরি। এতে সাধুদের কোন ক্ষতি হয় না?

ক্ষেপা—রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। মানুষ কত কর্ম্ম নিয়ে জন্মায়, দুষ্ট প্রারব্ধ সাধুদের ঐরূপ মাই টাই খাইয়ে নিন্দাভাজন করিয়ে পবিত্র করে নেন। তাঁরা লোক সঙ্গ হতে দূরে চলে যান। সাধুদের পক্ষে লোকসঙ্গ, সম্মান প্রতিষ্ঠা বিষের মত বিপজ্জনক। যে মূর্খ সাধু লোকসঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে পারে না তার দুর্গতির সীমা থাকে না, রাম রাম সীতারাম। স্বয়ং ভগবান বলেছেন "স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গী পুরুষের সঙ্গত্যাগ করে আত্মজ্ঞানী পুরুষ অনলস ভাবে আমার ধ্যান করবে"। চুম্বককে বল্‌তে হয় না "তুমি লোহাকে আকর্ষণ কর," আগুনের নিকটস্থ ঘিকে বল্‌তে হয় না "ঘি তুমি গলে যাও" চুম্বক আকর্ষণ কর্‌বেই, ঘি গল্‌বেই। তাই সাধুদের সাবধান হওয়া খুব দরকার। সাবধান না হ'লেই জয় জয় রাম সীতারাম, মুখে চুণ কালি রাম রাম সীতারাম।

সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্যো যোষিৎসঙ্গঃ সুদুর্ম্মদঃ।
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং সত্যং চৈবোর্দ্ধরেতসাম্‌॥

—৯৪ অঃ প্রপন্নামৃত

উর্দ্ধরেতা যোগিগণেরও সুদুর্ম্মদ নারীসঙ্গ সর্ব্ব প্রকারে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অজেয়া বৈষ্ণবী মায়া যোষিদ্ রূপা ন সংশয়ঃ।
ন শক্নুবন্তি তাং জেতৎ ব্রহ্মেশানাদয়োঽপিহি॥

—ঐ

সংসার রক্ষিণী রমণীরূপিণী বৈষ্ণবী মায়া অজেয়া। ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি দেবগণও তাঁকে জয় করতে সমর্থ হন না। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। সাধুরা তা জানেন এবং সাবধানও হন, তবু কেন পড়েন?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম, এ পতনে জন্ম জন্মান্তরের কামনার ক্ষয় হয়ে যায়, এ সব পতন প্রারব্ধের উপহাস, এ পতন উত্থানের মূলকে দৃঢ় করে, "আমি শ্রেষ্ঠ" এ অভিমান দূর করে দিয়ে তাঁকে সাবধানে সাধন পথে চল্‌তে শেখায়—রাম রাম সীতারাম।

হরি। আচ্ছা ক্ষেপা বাবা, এ প্রারব্ধ, কি বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্ম কিরূপে বোঝা যাবে?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম। কেউ যদি খেতে বসে এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েছে এমন সময় কোন লোক বলে "ও ভাই খেওনা খেওনা ও ভাতে বিষ দেওয়া আছে।" তা শুনে সে যেমন ভাতের দিকে আর না চেয়ে মুখের ভাত ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে তদ্রূপ যার প্রারব্ধ কর্ম্মফলে অশাস্ত্রীয় কোন কাজ হয় সে আর সেদিকে তাকায় না, একবারে অন্য পথে চলে যায়। রাম রাম সীতারাম সীতারাম, তাদের কবন্ধের নৃত্য মত প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হয়ে যায়। আর যারা অন্যায় কর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে না, পুনঃ পুনঃ অসদ্ আচরণ করে—তাদের এ জন্মের কৃত কর্ম্মের ফলে পরজন্মে দুর্গতি ভোগ কর্‌তে হয়। রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

হরি। এ প্রারব্ধ কি জয় করা যায় না?

ক্ষেপা। রাম রাম সীতারাম, যায় যায় কেবল নাম কর্‌তে পার্‌লে প্রারব্ধ আর কোন প্রভাব দেখাতে পারে না। নাম নাম, কেবল নাম। উঠ্‌তে বস্‌তে কেবল নাম কর্‌তে হয়, রাম রাম সীতারাম জয় জয় রাম সীতারাম।

(ক্ষেপা সুর করে গাইতে লাগলো—শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম)।

—০—

সবার কথা

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

যত যত দিন ফুরাবে জগতের আকর্ষণ ততই কমিবে, শেষে দেখ্‌বে সব অসার, এক সার বস্তু সেই, যাঁর নাম নিতে তিনিই বলেন, শাস্ত্র বলেন, সাধু বলেন, সবাই বলেন। যদি কাঁচা বয়সে ইহা বুঝিতে না পার, অপেক্ষা কর একদিন বুঝবেই। যতই ভুলে থাক না কেন, এমন দিন আস্‌বে যখন তোমার জীবনের কু সু সকল কর্ম্মের চক্র তোমার সামনে ঘুরিবেই। এ কথা তাঁহারই কথা—শাস্ত্রে ইহা দেখা যায়। এখন ত বুদ্ধিমান্ হয়ে কুকর্ম্ম, কদাহার, কুব্যবহার প্রভৃতি পাপ কর্ম্ম চাপা দিতে চাও কিন্তু চিত্তে ইহাদের সংস্কারের—রেখাপাত যাইবে না, অতএব দিন থাকিতে দীন হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর নিত্য তাঁর আজ্ঞা পালনে যত্ন কর। আমাদের মত লোকের অপরাধ ত হয় পদে পদে কারণ আমরা যেমন ভাবে চলা উচিত তেমন ভাবে চলিতে জানিনা। সেরূপ শিক্ষাও আমাদের হয় নাই। আর যেরূপ যত্ন করিলে সংযমী হইয়া চলিতে পারা যায় সেরূপ আমাদের কিছুই হয় নাই।

যাহারা অনেক পাপ করিয়া ফেলিয়াছে, এবং এখনও প্রলোভনে পড়িয়া করিয়া ফেলিতেছে, তাহাদের উদ্ধারের উপায় কি? ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, এই বলিয়া আশ্রয় ভিক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তিনি ক্ষমাসার—তিনি সকল মানুষকেই ক্ষমা করেন। যদি মানুষ কাতর হইয়া বলে "মৎসম পাতকী নাস্তি, পাপঘ্নী তৎ সমা নহি। এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্য তথা কুরু।" তোমার দিকে চাহিলে বড় আশ্বাস পাই—যাহাই করিয়া ফেলিনা কেন— আর করিব না —আর আমায় পাপ পথে যাইতে দিও না—বলিয়া বলিয়া যদি বলি "নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতং"—মা কখন সন্তানকে উপেক্ষা করেন না, তবে নিশ্চয়ই ক্ষমা পাওয়া যায়। করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় ইহা ধ্রুব সত্য। রত্নাকর সৎসঙ্গে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে নাম করিয়া বাল্মীকি হইয়া রহিয়াছেন—লোকের উদ্ধারের জন্য এই মহাগ্রন্থ রামায়ণ রাখিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ নিত্য পাঠ কর—যতই পাপী তাপী হওনা কেন এই মহাগ্রন্থই তোমাকে পাপ শূন্য করিবেই। নিত্য কর্ম্ম যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা কর আর স্বাধ্যায় জন্য রামায়ণ, ভাগবত, গীতা মহাভারত, আর যাতে যার রুচি তাহাতে কিছু সময় দাও দেখিবে চিত্ত নির্ম্মল হইবেই।

চিত্তকে নির্ম্মল কর। বিষয়ের কোথাও অনুরাগ, কোথাও বিরাগ - ইহাই চিত্তের মলিনতা। এই রাগ ও দ্বেষ যে দূর করিতে না পারিয়াছে, তাহার চিত্ত নির্ম্মল হয় নাই। চিত্ত নির্ম্মল না হইলে ভগবানকে বসাইবে কোথায়, ভগবান্ সর্ব্বত্র নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বত্র আছেন সত্য কিন্তু সেই সর্ব্বব্যাপী—নিরাকার নির্ব্বিকার ভগবানে তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। মূর্ত্তি ধরিয়া যখন তিনি হৃদয়ে স্মেরাননে উপবেশন করেন, আর তাঁহার, চন্দ্রের অমৃত কিরণ যেমন শীতল সেইরূপ শীতল আর লাক্ষা রসাভ পরামামৃতের যে নির্ম্মল ঝরণা তাহাই হইতেছে যার তাদৃশ "কুঙ্কুমাসব ঝরী মরন্দয়োঃ নাথ চরণারবিন্দয়োঃ" যতদিন তোমার হৃদয়ে তোমার নিত্য স্মরণের বস্তু না হইবে—যতদিন না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার অনুমতি না লইয়া সকল কার্য্য করিতে অভ্যাস না করিবে ততদিন তোমার চিত্তের রাগ দ্বেষ যাইবে না। অর্থাৎ চিত্ত নির্ম্মল হইবে না।

কত দুঃখ নিরন্তর পাইতেছ—কত ক্লেশ তুমি নিরন্তর পাইতেছ—এই সমস্তই তোমার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল, ইহা স্মরণে আনিয়া নিরন্তর নাম জপ করার অভ্যাস কর—কবিরের মত "শোয়ত আঁচায়ত" রাম রাম করার অভ্যাস কর—দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা লইয়া থাক—আর তুলসী গোঁসাইএর সেই কথা "সচ কহো লাগ রহো ছোড় পরধন কি আশ" এই সব কর তবে তাঁর কৃপা অনুভব করিবে—তাঁর কৃপা ভিন্ন তাঁর রাজ্যে প্রবেশের অধিকার কাহারও নাই, কেহই তোমাকে সে দেশে লইয়া যাইবে না—তোমাকেই চেষ্টা করিতে হইবে—হৃদয়ে ধ্যান আর মুখে নাম করিতে করিতে লাগিয়া রহিতে পারিলে তবেই তোমার মন হইতে বিষয় বাসনা ছুটিয়া যাইবে আর তুমি তাঁহার হইবে—ইহা হইলেই তুমি জরামরণ দুঃখের হাত এড়াইতে পারিবে।

মুখে "গুরুজীকে ফতে" বলিলে কি হইবে—প্রাণপণে গুরুজীর আজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করা চাই—যতদিন ধ্যানের বস্তুর কাছে সর্ব্বদা না থাকিতে পারিতেছ সব কাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করিতে অভ্যস্ত হইতেছ ততদিন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে—প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও বলিয়া নিত্য কর্ম্ম করিতে হইবে, প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও বলিয়া স্বাধ্যায় করিতে হইবে তবে তাঁর ভালবাসা অনুভব করিতে পারিবে।

সর্ব্বদার কার্য্য তোমার নাম করা—"কলৌ নাস্ত্যেব কেনচিৎ" জানিয়া রাখিয়া নাম অবলম্বন কর।

আর কি বলিব? করা চাই, শুধু শুনিলে, বলিলে হইবে না, করা চাই। জীবনের প্রধান কার্য্যই ভগবৎ সঙ্গে থাকা, ইহার জন্য প্রাণপণ কর, সকল কর্ম্মে

শৃঙ্খলা রাখিয়া করিয়া যাও—এখনও হইতেছে না কেন বলিয়া ছাড়িয়া দিও না—তাঁর কথা স্মরণ রাখ—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্ম্মেই তোমার অধিকার—কর্ম্মফল যে ঝটফট হওয়া—ইহাতে তোমার অধিকার নাই—এই মনে রাখিয়া কর্ম্ম কর। আর যাঁর নাম কর তিনিই যেন পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি লইয়া জগতে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন—সৎসঙ্গে এইসব কথায় আলোচনা কর—ধর্ম্মজগতে উঠিবার এই ত পথ—ইহাতে হইবেই। আর "ইসমে যব্ হরি না মিলে জামিন তুলসীদাস"—ইহাই নিশ্চয়।

গীতাতে ভগবান্ বলিতেছেন—আমাতে আসক্ত মন হইতে হইলে আমার অষ্ট অচেতন প্রকৃতি ও চেতন প্রকৃতির আলোচনা করিতে হয়। তাঁহাকে জানাইয়া সকল কর্ম্ম করার অভ্যাস কর, তবে যথার্থ সুখের বস্তু যিনি তোমারই ভিতরে তাঁহার সন্ধান মিলিবে তাঁহার স্পর্শে সুখ কি বস্তু তাহা বুঝিবে আর বিষয় সুখ যে কেবল দুঃখ তাহা বুঝিবে।

সে পুরুষ কি নারী তাহা লইয়া গোলমালে পড়িও না! সেই একেরই নাম বহু। সকলেই সেই এক বস্তুকেই ভজিবে। ইহাই বিধি।

—•—

সন্তবাণী

১১০৮। পরমাত্মার বাচক প্রণব তার জপ এবং তার অর্থের ভাবনা করা কর্ত্তব্য, এর দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্তি এবং বিঘ্ন সমূহের অভাব হয়।

১১০৯। পরলোকে সহায়তার জন্য মাতা পিতা পুত্র স্ত্রী এবং সম্বন্ধী কেহ থাকে না। সেখানে একমাত্র ধর্ম্মই কাজে আসে। মৃত শরীরকে বন্ধু বান্ধব কাঠ এবং মাটীর ডেলার মত মাটীতে আছড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে চলে আসে। এক ধর্ম্মই তার সঙ্গে যায়।

১১১০। মন বাণী এবং কর্ম্ম সমূহের দ্বারা প্রাণিমাত্রের সহিত অদ্রোহ, সকলের উপর কৃপা এবং দান ইহা সাধুপুরুষগণের সনাতন ধর্ম্ম।

১১১১। যিনি আত্মনিষ্ঠ আর যিনি আত্মা ব্যতীত কিছুই চাহেন না, তিনি বিষয়ী মনুষ্যগণের ন্যায় রমণীয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হর্ষিত হন না এবং দুঃখদায়ক বস্তু প্রাপ্ত হলে উদ্বিগ্ন হন না।

১১১২। যেমন বন্যা শায়িত গাভীকে বহন করে লয়ে যায় তদ্রূপই পুত্র

পশু সমূহে লিপ্ত মনুষ্যগণকে মৃত্যু নিয়ে যায়। যখন মৃত্যু ধারণ করে সে সময় পিতা পুত্র বন্ধু কিম্বা স্বজাতি কেহই রক্ষা করতে সমর্থ হয় না। এই কথা জেনে বুদ্ধিমান পুরুষের কর্ত্তব্য যে সে চরিত্রবান তৈরী হয় এবং নির্ব্বাণের দিকে নিয়ে যাবার পথ সত্বর অবলম্বন করে।

১১১৩। ভগবানের মায়ার দোষ গুণ হরিভজন বিনা যায় না, অতএব সমস্ত কামনা ত্যাগ করে শ্রীরামকে ভজনা করো।

১১১৪। যে দিন আজ আছে সে কাল থাকবে না, জাগ্‌তে হয় তো শীঘ্র জেগে উঠ, দেখ মৃত্যু তোমার বিনাশের জন্য বেড়াচ্ছে।

১১১৫। শ্রীরামের চরণের পরিচয় বিনা মানুষের মনের দৌড় মিটে না, যে লোক কেবল সাধু সেজে দ্বারে দ্বারে ঘোরে কিন্তু ভগবানের চরণে প্রেম করে না তার জন্ম বৃথা।

১১১৬। যিনি শান্ত দান্ত উপরত সহনশীল এবং সমাহিত হন তিনি আত্মাকে দেখেন আর তিনি সকলের আত্মরূপ হন।

১১১৭। যিনি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মৎসর (পরশ্রীকাতর্য্য) এই ছয় শত্রুকে জয় করে নিয়েছেন সেই পুরুষ ঈশ্বরকে এমন ভক্তি করেন যার দ্বারা ভগবানে পরম প্রেম উৎপন্ন হয়ে যায়।

১১১৮। যেমন প্রবাহের বেগে একস্থানের বালুকা আলাদা আলাদা বয়ে যায় এবং দূর দূর থেকে এসে এক জায়গায় একত্র হয়ে যায় এইরূপই কালের দ্বারা সব প্রাণিগণের কখন বিয়োগ আর কখন সংযোগ হয়।

১১১৯। সরলতা কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রসন্নতা এবং জিতেন্দ্রিয়তা আর বৃদ্ধ পুরুষগণের সেবা এর দ্বারা মানুষের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

১১২০। যাঁর দ্বারা সর্ব্বজীব নির্ভয় থাকে এবং যে সব প্রাণী হতে নির্ভয় থাকেন তিনি মোহ হতে মুক্ত হয়ে সদা ভয়শূন্য থাকেন।

১১২১। যে মানুষ সমস্ত ভোগ লাভ করে আর যিনি সকল ভোগ ত্যাগ করেন এর মধ্যে সকল ভোগ প্রাপ্তের অপেক্ষা সব ত্যাগকারী শ্রেষ্ঠ।

১১২২। যিনি সংগ্রহ ত্যাগ করে অপরিগ্রহে রত এরূপ চিত্তমলশূন্য জ্ঞানবান পুরুষই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

১১২৩। যতক্ষণ শরীর সুস্থ আছে, বৃদ্ধত্ব আসে নাই, ইন্দ্রিয়গণের শক্তি আছে, আয়ুর দিন বাকী আছে সে পর্য্যন্ত বুদ্ধিমান পুরুষের আপনার কল্যাণের চেষ্টা উত্তমরূপে করে লওয়া কর্ত্তব্য। ঘরে আগুন লাগার পর কূপ খননের দ্বারা কি লাভ ?

১১২৪। যখন দৃশ্য নাই তখন দৃষ্টিও কিছু নাই। দৃশ্য ব্যতীত দর্শন কোথায়? দৃশ্যের জন্যই দ্রষ্টা এবং দর্শন।

১১২৫। কাম ক্রোধ মদ লোভের খনি যে পর্য্যন্ত মনে আছে ততক্ষণ পণ্ডিত এবং মূর্খে কি ভেদ, দুই সমান।

১১২৬। সব দিক্ থেকে মনকে সরিয়ে নিয়ে ভগবানের চরণে আশ্রয় গ্রহণকারী ভগবানের প্রিয় পুরুষে যদি কোন দোষও হয় তা'হলে হৃদয়ে অবস্থানকারী সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ তা নষ্ট করে দেন।

১১২৭। এই অখিল জগৎ সর্ব্বভূতময় বিষ্ণুরই বিস্তার অতএব জ্ঞানী পুরুষ একে আপনার সহিত আত্মার মত অভেদ রূপে দেখেন।

১১২৮। এই অক্ষর (কখন নাশ হয় না)-ই ব্রহ্ম, অক্ষরই পরম এই অক্ষরকেই জেনে যে পুরুষ যা ইচ্ছা করে তার তাহাই প্রাপ্তি হয় এই অক্ষর পরমাত্মার আশ্রয়ই শ্রেষ্ঠ। এই আশ্রয় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এই আশ্রয়ের রহস্য জেনে জীব ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়।

১১২৯। চিত্তের দ্বারা নিরন্তর পরমাত্মতত্ত্বের চিন্তা কর্তে থাকো, অনিত্য ধনের চিন্তা ছেড়ে দাও, ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গও ভবসাগর উত্তীর্ণ হবার নৌকা স্বরূপ বুঝ্বে।

১১৩০। ভোগসকলে রোগের ভয়, কুলে চ্যুত হবার ভয়, ধনে রাজার ভয়, মৌনে দীনতার ভয়, বলে শত্রুর ভয়, রূপে বার্দ্ধক্যের ভয়, শাস্ত্রে বিবাদের ভয়, গুণে দুষ্টগণের ভয়, শরীরে মৃত্যু ভয় এইরূপ সংসারের সকল বস্তুতে মানুষের কোন না কোন ভয় আছে। কেবল একমাত্র বৈরাগ্যে কোন ভয় নাই।

১১৩১। পাপ করা কর্ত্তব্য নয়, পাপকারীকে পশ্চাতে অনুতাপ কর্তে হয়। পুণ্য করা উচিৎ, পুণ্যকারীকে কখন অনুতাপ কর্তে হয় না।

১১৩২। সংসার ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য, এখানে এক পলেরও ভরসা নাই, যে-কিছু কল্যাণজনক কাজ কর্বে সত্বর করে নাও।

১১৩৩। গাভীর সবেমাত্র প্রসূত হওয়া বাছুর যেমন বিশবার পড়া উঠার পর দাঁড়াতে পারে, এপ্রকার সাধনা কর্বার কালে সাধক অনেকবার পতিত হবার পর শেষে সিদ্ধিলাভ করে।

১১৩৪। যদি আমার হৃদয়ে তীরের অগ্রভাগ (কোণ) বিদ্ধ না হয় তাহ'লে তীরের কি দোষ? কেন না আমার হৃদয়ে যে প্রেমের আগুন জ্বলছে তা এমন প্রজ্জ্বলিত আছে যে যদি তাতে লোহাও পড়ে তা'হলে তাও গলে যায়।

১১৩৫। যে কোমল এবং দীন হৃদয়, বিরহে ব্যাকুল তাতে প্রভুর আগমন হয়।

১১৩৬। সাংসারে আমার যত নিন্দা করুক্ আমি এর কিছু বিচার করি না যার মুখ আছে সে যা ইচ্ছা হয় বলুক। আমি তো হরিরসে উন্মত্ত হ'য়ে কখন মাটীতে লুটিয়ে পড়ি কখন নাচি আর কখনও শুয়ে পড়ি।

১১৩৭। মানুষ মানুষের চোখে ধুলা দিতে পারে। কিন্তু পরমাত্মার চোখে ধুলা দিতে পারে না।

১১৩৮। স্ত্রীগণের মিষ্ট কথায় ভোলা উচিত নয়, এদের কথা রসময়ী, কিন্তু বৈরাগীর পক্ষে তলবারের ধারের সমান। তা হ'তে আপনাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

১১৩৯। যে পরস্ত্রীগণকে মাতার স্তায় মনে না করে (মানে না) সে মহামূর্খ। তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

১১৪০। যিনি পরস্ত্রী সকলকে মাতার সমান, পরধনকে মাটীর ঢেলার মত আর সমস্ত প্রাণীকে আপনার সমান বুঝেন তিনি বাস্তবিক সত্য দেখেন, আর তো সব অন্ধ!

১১৪১। শরীর অনিত্য, ঐশ্বর্য্য অনিত্য, মৃত্যু সর্ব্বদা পার্শ্বে বর্ত্তমান—এজন্য ধর্ম্ম ক'রো।

১১৪২। যে আপনার সুখে জীবন অতিবাহিত কর্‌তে চায়-সে বিষয় সকলের সঙ্গ করবে না, আর যিনি পরম পদের অভিলাষী তিনি তো বিষয়ের নামই গ্রহণ কর্‌বেন না।

১১৪৩। যে তোমার কথা-সকল শুন্‌তে চায় তাকে আপনার কথা শোনাও। যে তোমার কথা শুন্‌তে চায় না তার গলায় পড়ো না।

১১৪৪। বিষয়-ভোগে সুখ নাই, একদিন না একদিন মানুষকে এ থেকে স্বতন্ত্র হ'তেই হবে, পৃথক হবার সময় বিষয়ভোগীর বড় দুঃখ হয়।

১১৪৫। আত্ম-চিন্তন ক'রো কিন্তু আত্মচিন্তা করা সহজ কর্ম্ম নয়, এর জন্য মনকে বশ কর্‌তে হবে। তাকে বিষয় সকল থেকে সারিয়ে দিতে হবে, তাকে চিত্তবৃত্তিসমূহ হ'তে আলাদা করে একাগ্র কর্‌তে হবে তবে সফলতা হবে।

১১৪৬। মূর্খ মনুষ্য ভাগ্যের উপর সন্তোষ করে না (সন্তুষ্ট হয় না) ধনের জন্য ছুটে ছুটে বেড়ায়। যখন কিছু পায় না তখন কাঁদে এবং বিলাপ করে।

১১৪৭। যদি তুই সুখ শান্তিতে বাস কর্‌তে চাস তাহ'লে তৃষ্ণাপিশাচীর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট হ।

১১৪৮। অরে পামরী তৃষ্ণা, আমি তোকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি যে এত কুকর্ম্ম করেও তুই সন্তোষ হলিনে।

১১৪৯। সূর্য্যের উদয় এবং অস্তের সহিত মনুষ্যগণের আয়ু নিত্য কমে যায়, সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু বিষয়ে নিমগ্ন থাকার জন্য সে গমনশীল আয়ুকে দেখছে না লোকসকলকে বিপত্তিগ্রস্ত হতে এবং মর্‌তে দেখেও মনে ভয় হয় না। এতে বিবেচনা হচ্ছে কি, মোহময়ী প্রমাদরূপা মদিরার নেশায় সংসার উন্মত্ত হয়ে আছে।

১১৫০। মানুষ অপরকে বৃদ্ধ হতে এবং মরণশীল দেখ্‌ছে কিন্তু স্বয়ং ইহা বুঝছে আমি সদা যোয়ান থাকৃবো, অমর থাকৃবো।

১১৫১। মনুষ্য মিথ্যার আশার ছলনায় দুর্লভ মনুষ্য দেহকে এইরূপেই নষ্ট ক'রো না। দেখ মাথার উপর কাল নৃত্য কর্‌ছে। একটী শ্বাসেরও ভরসা ক'রোনা। যে শ্বাস বাহিরে নির্গত হয়েছে সে ফিরে আসৃবে না আসবে এর জন্য অবহেলা (ভুল) এবং অজ্ঞানতা ছেড়ে আপনার দেহকে ক্ষণভঙ্গুর বুঝে অপর সকলের ভাল ক'রো আর আপনার সৃষ্টিকর্ত্তায় মন লাগাও কেন না তাঁর সম্বন্ধ সত্য।

১১৫২। ভিক্ষা করা আর মরা দুই সমান বরং চাওয়ার চেয়ে মরণ ভাল। প্রার্থনা কর্‌বার জন্য ত্রিলোকনাথ ভগবানকেও ছোট হ'তে হয়েছিল তখন অপরের কথা কি বলা যাবে!

১১৫৩। হাতের উপর হাত করো কিন্তু হাতের নীচে হাত ক'রো না, যেদিন অপরের কাছে হাত পাতবার অবস্থা আসবে সেদিন মরণ হয়ে যায় তো তা উত্তম।

১১৫৪। স্ত্রী ও পুত্রগণের পালন পোষণের চিন্তাতে মনুষ্যের সমস্ত আয়ু গত হয়ে যায় কিন্তু পরমাত্মার ভজনে তার মন লাগে না।

১১৫৫। স্ত্রী-মায়াই সংসার বৃক্ষের বীজ। শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ আর গন্ধ তার পাতা, কাম ক্রোধাদি তার শাখা সকল, পুত্র কন্যা প্রভৃতি তার ফল, তৃষ্ণারূপী জলের দ্বারা এই সংসার বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়।

১১৫৬। লৌহ এবং কাঠের বেড়ী হতে হয়তো কখন মুক্ত হওয়া যায় কিন্তু স্ত্রী পুত্রাদির মোহরূপী শৃঙ্খল হতে মোহ অপগত হয় না। যার মুখ দেখ্‌তে পাপ হয় স্ত্রীর জন্য তার খোসামোদ কর্‌তে হয়।

১১৫৭। সেই ভজনই সর্বোত্তম যাহাতে কোনও সর্ত্ত নাই—কেবল ভজনের জন্যই ভজন।

১১৫৮। স্ত্রীর বশ হওয়া সর্ব্বনাশের বীজ বোনা।

১১৫৯। ঘাড়ে বিস্তারিত-কেশর করালমুখ সিংহ, অত্যন্ত মত্ত মাতঙ্গ এবং বুদ্ধিমান যুদ্ধজয়ী পুরুষও স্ত্রীগণের নিকট অতি কাপুরুষ হয়ে যায়।

১১৬০। মানুষ আপনার পাপকে কতদিন লুকাবে, একদিন না একদিন তা প্রকট হয়েই যাবে।

১১৬১। ঘী, নুণ, তেল, চাউল, শাক এবং কাষ্ঠের চিন্তায় বড় বড় বুদ্ধিমানগণেরও জীবন পূর্ণ হয়ে যায়, এই জন্য মানুষের ভজনের সময় মেলে না।

—০—

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ডি-লিট্]

অতিপ্রাচীন শবরস্বামী যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়াছেন তিনি যে অতি সু-প্রাচীন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ উপবর্ষ উভয় মীমাংসারই বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য ৩।৩।৫৩ ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"অতএব চ ভগবতা উপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ।" (৮৫০ পৃঃ ব্রঃ সূঃ, নির্ণয়সাগর সং)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিহিত কর্ম্মফলের ভোক্তা দেহাত্যতিরিক্ত আত্মা আছে কি না এইরূপ সন্দেহের নিরসনের জন্য ১।১।৫ জৈমিনি সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী দেহাত্যতিরিক্ত নিত্য আত্মা আছে ইহা সমর্থন করিয়াছেন। শবরস্বামী যে দেহাত্যতিরিক্ত আত্মার সমর্থন করিয়াছেন তাহা ব্রহ্মসূত্রের ৩।৩।৫৪ সূত্রাভিপ্রায় গ্রহণ করিয়াই করিয়াছেন। উত্তর মীমাংসার অভিপ্রায়ানুসারে শবরস্বামী পূর্ব্বমীমাংসার ১।১।৫ সূত্রের ভাষ্যে দেহাত্যতিরিক্ত আত্মবাদও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ উপবর্ষ পূর্ব্ব-মীমাংসার বৃত্তিতে দেহাত্যতিরিক্ত আত্মবাদ স্থাপন করেন নাই। কিন্তু দেহাত্যতিরিক্ত আত্মবাদ সিদ্ধ না হইলে পরলৌকিক কর্ম্মফলের জন্য কেহই বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। এইজন্য বৃত্তিকার উপবর্ষ বলিয়াছেন—যদিও প্রথম তন্ত্রে দেহাত্যতিরিক্ত আত্মার স্থাপন করা উচিত ছিল, তথাপি দেহাত্যতিরিক্ত আত্মার স্থাপন শারীরক সূত্রে প্রদর্শন করিব এইরূপ বলিয়াছেন। "শারীরকে বক্ষ্যামঃ" এই কথার অর্থ ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিতে ইহা প্রদর্শন করিব। বৃত্তিকারের এইরূপ বলার অভিপ্রায় এই যে,

পূর্ব্বমীমাংসার সূত্রকার জৈমিনি দেহাত্যতিরিক্ত আত্মার প্রতিপাদনের জন্য কোন সূত্র প্রণয়ন করেন নাই। সূত্রকার যাহার জন্য সূত্র প্রণয়ন করেন নাই তাহার প্রতিপাদন করিলে সেই প্রতিপাদন উৎসূত্র হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মমীমাংসাতে সূত্রকার নিজেই "ব্যতিরেকস্তদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ" (৩।৩।৫৪, ব্রঃ সূঃ) সূত্রে দেহাত্যতিরিক্ত আত্মার স্থাপন করিয়াছেন। এই সূত্রের বৃত্তিতে বৃত্তিকার উপবর্ষ দেহাত্যতিরিক্ত আত্মবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। শারীরক সূত্রের বৃত্তিতে দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রতিপাদন উৎসূত্র হইবে না এইরূপ মনে করিয়াই ভগবান্ উপবর্ষ শারীরকসূত্রের বৃত্তিতে দেহাতিরিক্ত আত্মার স্থাপন করিয়াছেন। শবরস্বামী উত্তরমীমাংসায় ভাষ্য রচনা করেন নাই বলিয়া তিনি শারীরকসূত্রের অভিপ্রায় অনুসারেই পূর্ব্বমীমাংসায় অপেক্ষিত বলিয়া পূর্ব্ব-মীমাংসাভাষ্যেই দেহাতিরিক্ত আত্মবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনার দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, ভগবান্ উপবর্ষ পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা উভয়েরই বৃত্তিকার।

ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে এবং পূর্ব্বমীমাংসার শাবরভাষ্যে এই বৃত্তিকারের মত পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভণসূত্রের (২।১।১৪) ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্কর "ননু অনেকাত্মকং ব্রহ্ম যথা বৃক্ষোঽনেকশাখঃ এবমনেক-শক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম। অত একত্বং নানাত্বঞ্চ উভয়মপি সত্যমেব।" (৪৫৬ পৃঃ; ব্রহ্মসূত্র, নির্ণয়সাগর সং) ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মপরিণামবাদ যে বৃত্তি-কারের মত প্রদর্শন করিয়াছেন। এই বৃত্তিকার উপবর্ষ যে অতি সুপ্রাচীন তাহা বলাই হইয়াছে। উপবর্ষ নিজেই বলিয়াছেন—"আমি শারীরক সূত্রের বৃত্তিতে ইহাই বলিব।" বৃত্তিকার প্রদর্শিত এই ব্রহ্মপরিণামবাদ মাধ্যন্দিন শতপথের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভর্তৃপ্রপঞ্চকৃত ভাষ্যে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চমধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" এই ঋক্‌মন্ত্রটি সমাম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার শঙ্কর ভর্তৃপ্রপঞ্চের সিদ্ধান্ত বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই ভাষ্যের বার্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ সম্মত ব্রহ্মপরিণামবাদ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার শঙ্করের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত হইয়া ভগবদ্‌ভাস্কর এই ব্রহ্মপরিণামবাদ অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্‌ভাস্কর ভামবতীকার বাচস্পতি মিশ্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ১।১।৪ ব্রঃ-সূত্রের ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্র—"কার্য্যরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা" এই যে

কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা ভগবদ্‌ভাস্করেরই কারিকা। কাশী-মুদ্রিত ভাস্কর ভাষ্যের ১৮ পৃষ্ঠায় এই কারিকাটি আছে। ব্রহ্মপরিণামবাদী ভগবদ্‌-ভাস্কর শাঙ্করভাষ্য খণ্ডনের জন্য ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। এজন্য ভামতী গ্রন্থে ভাস্করীয় ভাষ্যের খণ্ডন প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ভামতীতে ভাস্করের নামের উল্লেখ করা হয় নাই। কল্পতরুতে প্রায় প্রত্যেক স্থলেই ভাস্করের নামের ও তাহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডনপূর্ব্বক ভামতীর অভিপ্রায় দেখান হইয়াছে। এই সমস্ত কথা না জানার জন্য ভাস্করভাষ্যের ভূমিকাতে ভগবদ্‌-ভাস্করকে উদয়নের সমসাময়িক বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ভাস্কর বাচস্পতিরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

"যোনিশ্চ হি গীয়তে" (ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৭) সূত্রের ভাষ্যে ভগবদ্‌ভাস্কর বলিয়াছেন যে ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্যকার ব্রহ্মনন্দী ব্রহ্ম-পরিণামবাদই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ ব্রহ্ম-সূত্রকার নিজেই "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) ও "যোনিশ্চ হি গীয়তে" (১।৪।২৭) সূত্রে "পরিণাম" ও "যোনি" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মপরিণামবাদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন আচার্য্যগণ ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করিতেন। ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য ২।৪।১৪ ব্রহ্মসূত্রের শেষে বলিয়াছেন যে, "অপ্রত্যাখ্যায়ৈব কার্য্য-প্রপঞ্চং পরিণামপ্রক্রিয়াঞ্চাশ্রয়তি সগুণেষূপাসনেষু উপযোক্ষ্যত ইতি।" প্রস্থান ভেদ গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, বেদের কর্ম্মকাণ্ড আরম্ভবাদ অনুসারে, উপাসনাকাণ্ড পরিণামবাদানুসারে ও জ্ঞানকাণ্ড বিবর্ত্তবাদ অনুসারে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ—এই তিনটি বাদ বেদের কাণ্ডত্রয়ে ব্যবস্থিত আছে। আমরা এই প্রবন্ধে যে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা দেখাইতেছি এই ঈশ্বরতত্ত্বই পরম উপাস্য তত্ত্ব। এইজন্য উপাস্য তত্ত্বের বিবরণ পরিণামবাদানুসারে ব্যাখ্যাত হইলেই এই ঈশ্বরতত্ত্বের সম্যক্‌ উপলব্ধি হইতে পারে। ঋকৃসংহিতার চতুর্থ অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের তেত্রিশ বর্গে একটি মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥" (ঋক্‌ সং ৪।৭।৩৩)। সাধারণজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও এই মন্ত্রটি পাঠ করিলেই ইহা অনায়াসে বুঝিতে সমর্থ হইবে যে, কোন একটি ইন্দ্রনামধেয় বস্তু অনন্তরূপে ভাসমান রহিয়াছে। এই ঋক্‌মন্ত্রটি বৃহদারণ্যকোপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইন্দ্রনামধেয় পরমেশ্বর স্বীয়রূপ প্রখ্যাপনের জন্য অনন্তরূপে ভাসমান হইয়াছেন বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রেও

"তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়" বলা হইয়াছে। অস্য পরমেশ্বরস্য রূপং স্বরূপং, পরমেশ্বরস্য যৎ স্বকীয়ং রূপং তস্য প্রতিচক্ষণায় প্রতিখ্যাপনায়। যাঁহারা মনে করেন—ঋক্ সংহিতায় আধ্যাত্মিক মন্ত্র থাকিলেও তাহা প্রথম মণ্ডলে বা দশম মণ্ডলেই আছে। অপর মণ্ডলগুলিতে কিছুই নাই। আমরা যে মন্ত্রটি এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম এই মন্ত্রটি চতুর্থ অষ্টকের বা ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রথম বা দশম মণ্ডলের নহে। ঋক্ সংহিতা পাঠ করিয়া মত প্রকাশ করা এক কথা ও না পড়িয়া যা' তা' বলা অন্য কথা। আমরা এই মন্ত্রের সায়ণভাষ্য দেখাইতেছি। ভাষ্য-ভাবার্থ—ইদি পরমৈশ্বর্য্য, পরমৈশ্বর্য্যবাচক ইদি ধাতু হইতে "ইন্দ্র" পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এজন্য ইন্দ্র পদের অর্থ পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বর বা পরমাত্মা আকাশের মত সর্ব্বগত সদানন্দরূপ। তিনি প্রতি জীবশরীরে অন্তঃকরণরূপ উপাধিবশতঃ পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মারূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এই পরমেশ্বর অনাদি মায়াশক্তিসমূহ দ্বারা আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে ভাসমান হইয়া থাকেন এবং শব্দাদি বিষয়গ্রাহক, শব্দাদিবিষয় আহরণশীল ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহও এই পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধ। জীবাত্মরূপে, আকাশাদি প্রপঞ্চরূপে ও গ্রাহ্যপ্রপঞ্চের গ্রাহক ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপে একই পরমেশ্বর প্রকাশিত হইয়াছেন। পরমেশ্বর কেন এইরূপ হইয়াছেন ইহার উত্তরে মন্ত্র বলিতেছেন—পরমেশ্বরের যাহা বাস্তব রূপ, সর্ব্বগত সদানন্দরূপ তাহার প্রদর্শনের জন্য—তাহার খ্যাপনের জন্য, সেই ইন্দ্র পরমেশ্বর বহুমায়াশক্তির দ্বারা পুরুরূপ হইয়া অর্থাৎ আকাশাদি সর্ব্বপ্রপঞ্চরূপ হইয়া ঈয়তে চেষ্টতে বহুবিধ চেষ্টাযুক্ত হইয়াছেন, তিনি স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইয়াও মায়াশক্তির দ্বারা চেষ্টাবান্ হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরের এই প্রপঞ্চরূপধারণও পরমাত্মার স্বীয়রূপ প্রতিখ্যাপনের জন্য। মন্ত্রে হরিশব্দের অর্থ শব্দাদিবিষয় আহরণশীল চিত্তবৃত্তি-সমূহ। যদিও মন্ত্রে শতা দশ অর্থাৎ সহস্র ইন্দ্রিয়বৃত্তি বলা হইয়াছে তথাপি এই সহস্র পদ অনন্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তির বোধক। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি বিষয়গ্রহণে উপযুক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরই এই অসংখ্য বৃত্তিরূপে প্রকাশমান হইয়াছেন। ইহাও তাঁহার রূপ প্রতিখ্যাপনের জন্য। পরমেশ্বর এই স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও আকাশাদি মহাপ্রপঞ্চরূপধারণ তাহা পরমেশ্বরবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের জন্যই। পরমেশ্বরের যাহা তাত্ত্বিকরূপে তাহা এই সপ্রপঞ্চরূপের বিশ্লেষণের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। শাস্ত্র আচার্য্য প্রভৃতির উপদেশের সাহায্যে এই সপ্রপঞ্চরূপের মধ্যে এবং প্রপঞ্চের সাহায্যে পরমেশ্বরের তাত্ত্বিকরূপ দর্শন করিতে পারা যায়। শাস্ত্রোপদেশ ও আচার্য্যোপদেশ ব্যতীত জানা যায় না। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশের রীতির আভাস আমরা "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্" এই মন্ত্রের শাকপুণি-

সম্মত ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। এই মন্ত্রটি যে সূক্তের অন্তর্গত সেই সূক্তে ৩১টি মন্ত্র আছে। এই সূক্তের দ্রষ্টা ভরদ্বাজের পুত্র গর্গ। পরমেশ্বরের মাধাত্ম্য এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমাদের উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহের মধ্যে যে সমস্ত মন্ত্রে ঈশ্বর, পিতা, বন্ধু, সখা, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পরমেশ্বরেরই স্ত্রী, পুরুষ, কুমার, কুমারী, বৃদ্ধরূপে প্রকাশমান হইয়া থাকেন বলা হইয়াছে সেই সমস্ত মন্ত্রগুলি এই "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব"—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা মাত্র, যিনি সর্ব্বাত্মক তিনি পিতাও বটেন, মাতাও বটেন, বন্ধুও বটেন। এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে—পরমেশ্বর স্বীয় তাত্ত্বিকরূপ সর্ব্বগত সদানন্দরূপ প্রকাশের জন্যই সর্ব্বাত্মকরূপে ভাসমান হইয়াছেন। শাস্ত্র, আচার্য্য, যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা পরমেশ্বরের এই সর্ব্বগত সদানন্দরূপ জানিতে পারা যায়। ভারতীয় সমস্ত দার্শনিক প্রস্থান পরমেশ্বরের এই সদানন্দরূপের অপরোক্ষীকরণের জন্য মন্ত্র প্রতিপাদ্য পরমেশ্বররূপের উপলব্ধির জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন—ভারতের দার্শনিক প্রস্থান দুঃখবাদে বিশ্রান্ত হইয়াছে তাঁহাদিগকে আমরা এই মন্ত্রার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলি। পরমেশ্বরের রূপ যদি দুঃখময় হইত তবে আর পরমেশ্বরের স্বীয় রূপ প্রতিখ্যাপনের জন্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিলেন কেন? লৌকিক দৃষ্টিতে বিশ্বপ্রপঞ্চের যে রূপ আমরা অনুভব করি, পরমেশ্বর রূপও যদি তাহাই হয় তবে আর বিশ্বপ্রপঞ্চের সাহায্যে পরমেশ্বর রূপ দর্শনে কাহারও অভিলাষ হইতে পরে না। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" এই মন্ত্রটি কর্ম্মেও বিনিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অধিযজ্ঞ পক্ষেও ইহার ব্যাখ্যা সায়ণ করিয়াছেন। এক একটি মন্ত্রের যে বহুবিধ অর্থ আছে তাহা আমরা ইতঃপর প্রদর্শন করিব। (ক্রমশঃ)

—০—

এই ত' আছ তুমি !

[শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী]

ধ'র্‌তে তোমায় যতই ছুটে যাই,
লুকিয়ে পড় সে কোন্ আড়ালে !
পালিয়ে বেড়াও সে কোন্ সুদূর ঠাঁই,
আকুল হ'য়ে দু'হাত বাড়ালে !

নয়ন মেলে যখন তোমায় দেখি—
দেখি তুমি আছ ভুবনময় !
সকল রূপে তোমার রূপ যে ভরা,
কী মাধুরী ছেয়ে যেন র'য় !

ডেকে ফিরি—"কোথায় আছ তুমি ?"
তোমার বাণী সকল সুরে বাজে !
সেই ভাষাতেই জাগে তোমার সাড়া,
কাণ পেতে হায়, আমি শুনি না যে !

নিত্যরূপে এই ত' আছ তুমি !
খোঁজার পালা সাঙ্গ এবার হোক্,
বিশ্বময় তোমায় অনুভবি'
ভ'রে উঠুক্ আমার চিত্তলোক !

—০—

সীতা চরিত্র

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

"কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ" সমগ্র রামায়ণ কাব্য (হইতেছে) সীতার মহৎ চরিত্র। যদিও রামের চরিত্র বলিয়া নাম হইয়াছে রামায়ণ, তথাপি রামের চরিত্রের সহিত সীতার চরিত্র এত বেশী সম্বন্ধ এবং সীতার চরিত্র এত উর্ধ্বস্তরে উঠিয়াছে যে ঋষি সমগ্র রামায়ণকে সীতার চরিত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সীতার যখন বিবাহ হয় তখন বয়স ছয় বৎসর মাত্র, রামের বয়স তের(১)। বিবাহের পর সীতা অযোধ্যায় আসিয়া বার বৎসর বাস করিবার পর বনবাসে গিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে তিনি যে পিত্রালয় জনকপুর গিয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বনবাসের সময় সীতার বয়স ১৮, রামের বয়স ২৫।

কৈকেয়ীর মুখে প্রথম বনবাসের কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্থির করিলেন, তিনি একাই বনে যাইবেন, সীতা অবশ্য অযোধ্যাতে থাকিবেন। এ বিষয়ে তিনি বেশ দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। তিনি জানিতেন না যে তাঁহার এই দৃঢ় সংকল্প সীতার উচ্ছ্বসিত পাতিব্রত্যের সম্মুখে ভাসিয়া যাইবে।

কাল রামের রাজ্যাভিষেক হইবে এজন্য সীতা বেশ প্রফুল্ল মনেই ছিলেন। রাম যখন তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন রামের মুখ বিষণ্ণ দেখিয়া সীতা বলিলেন, "প্রভু, একি? কাল আপনার অভিষেক আপনার মুখ বিষণ্ণ কেন?" রাম বলিলেন, "সীতা, পিতা আমাকে বনবাসে পাঠাইতেছেন।" এই বলিয়া কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রের কথা বলিলেন। "আমি আজই বনে যাব। তুমি কাল উঠিয়া যথারীতি দেবপূজা করিয়া আমার পিতাকে প্রণাম করিবে। মাতা কৌশল্যা বৃদ্ধা এবং শোকগ্রস্তা। তাঁহাকে এবং অন্য মাতৃবৃন্দকে প্রণাম করিবে।" সীতা কাহার

---

(১) পঞ্চবটীতে কপট ব্রহ্মচারীবেশধারী রাবণকে সীতা বলিতেছেন,—

মম ভর্ত্তা মহাতেজা, বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মনি গণ্যতে॥

—অযোধ্যাকাণ্ড ৪৭।১০,১১

"আমার স্বামী মহাতেজস্বী, বয়স ২৫। আমার জন্ম হইতে ১৮ বৎসর হইয়াছে।"

ইহার পূর্বে সীতা বলিয়াছেন—

উষিত্বা দ্বাদশ সমাঃ ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে।

—অযোধ্যাকাণ্ড ৪৭।৪

"ইক্ষ্বাকুদের গৃহে ১২ বৎসর বাস করিবার পর" (রামের রাজ্যাভিষেকের কথা হয়)।

সহিত কি ব্যবহার করিবেন, এবিষয়ে রাম আরও অনেক উপদেশ দিলেন। রামের বক্তব্য শেষ হইলে সীতা একটু ক্রুদ্ধভাবেই বলিলেন, "এ সব আপনি কি বলিতেছেন? শুনিলে হাসি পায়। আপনি বীর, রাজপুত্র, অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী। এ কথা ত আপনার উপযুক্ত নয়। দেখুন, আর্য্যপুত্র—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, পুত্রবধূ সকলেই নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে। কেবল নারীই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করে। সুতরাং আপনাকে যখন বনে যাইতে বলা হইয়াছে তখন আমাকেও বনে যাইতে বলা হইয়াছে। পিতা, পুত্র, মাতা বা সখীগণ কেহই নারীর গতি নহে। ইহলোক-পরলোকে নারীর স্বামীই একমাত্র গতি। আপনি বলিতেছেন যে আজই বনে যাইবেন। আমি আপনার আগে আগে যাইব কুলের কাঁটাগুলি আমি পা দিয়া ভাঙ্গিয়া দিব, যাহাতে আপনার পায়ে না কষ্ট হয়। নারী প্রাসাদের উপরেই থাকুক আর বিমানেই থাকুক, স্বামীর পদচ্ছায়াতেই তাহার শ্রেষ্ঠ স্থান। পিতামাতার নিকট আমি যথেষ্ট উপদেশ পাইয়াছি, আপনি যেখানে যাইবেন আমিও সেখানে যাইব, আমাকে আর উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।' সীতা আরও অনেক কথা বলিলেন। তিনি বনে খুব সুখে থাকিবেন। রাজপ্রাসাদের কথা মনেও আনিবেন না। বনের ফলমূল খাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তাঁহার পাহাড়, নদী, জলাশয় দেখিতে খুব ইচ্ছা হইতেছে। পদ্মশোভিত জলাশয়ে স্নান করিতে তাঁহার খুব ভাল লাগিবে। এইভাবে তিনি রামের সহিত শত বৎসর বা সহস্র বৎসর থাকিতে পারিবেন। স্বর্গের চেয়ে বেশী সুখে থাকিবেন। যদি রামকে ছাড়িয়া তাঁহাকে স্বর্গে থাকিতে বলা হয়, তাহাও তিনি চান না। সীতা এত কথা বলিলেন। তথাপি রামের সীতাকে বনে লইয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। তাঁহার কেবল মনে হইতে লাগিল, বনে যে অনেক দুঃখ হইবে। সীতার চোখে জল আসিয়াছিল। রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন। "সীতা, তোমার কত উচ্চ বংশে জন্ম, সর্বদা তুমি ধর্মপথে থাক। তুমি এখানে থাকিয়া ধর্ম পালন কর। তাহাতেই আমার মনের সুখ হইবে। আমি যেরূপ বলি তোমার সেইরূপ করা উচিত। বনে অনেক দুঃখ। পাহাড়ে সিংহ থাকে। সিংহের গর্জন শুনিলে তোমার কষ্ট হইবে। নদীতে কুমীর আছে, বনে পাগলা হাতী আছে, পথ লতা এবং কাঁটায় পরিপূর্ণ, ভাল জল প্রায়ই পাওয়া যায় না, ক্লান্ত শরীরে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া মাটির উপর তাহার পাতা পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া শুইতে হইবে। অনেক সময় খাদ্যের অভাবে উপবাস করিতে হইবে, মাথার উপর জটার ভার বহন করিতে হইবে। বনে যে কত দুঃখ কি বলিব? তোমার বনে যাওয়া হইতে পারে না।" রামের

কথা শুনিয়া সীতা দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "আপনি বনের যে সকল দোষ বলিলেন আমি সে সকল গুণ বলিয়া মনে করি, কারণ উহাদের সহিত আপনার স্নেহ বিদ্যমান থাকিবে। আপনি বলিতেছেন যে বনে সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ ভয়ঙ্কর পশু আছে। এ সকল পশু আমি কখনও দেখি নাই। সুতরাং দেখিতে খুব ভাল লাগিবে। আপনি ভয়ের কথা বলিতেছেন। কিন্তু উহারা আপনাকে দেখিয়া ভয় পাইবে। কিন্তু আমার ভয়ের কোনও কারণ থাকিবে না। আপনার নিকটে থাকিলে দেবরাজ ইন্দ্রও আমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আপনি আমাকে ছাড়িয়া গেলে আমি বাঁচিব না। পিতা কন্যাকে যাহার হস্তে প্রদান করেন মৃত্যুর পরও তাহার সহিত একত্র থাকে। আপনি আমাকে না লইয়া গেলে আমি বিষ, অগ্নি বা জলের সাহায্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইব।" কিন্তু তথাপি রাম সীতাকে লইয়া যাইতে চাহিলেন না। রাম বনে যাইবেন, সীতাকে একা অযোধ্যাতে থাকিতে হইবে, এই চিন্তা সীতাকে পাগল করিয়া তুলিল। তিনি ক্ষণে ক্রন্দন করেন, ক্ষণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে ভৎর্সনা করেন। সীতা বলিলেন, "আপনার সহিত বিবাহ দেওয়া আমার পিতার ভুল হইয়াছিল। আপনাকে দেখিতে পুরুষের ন্যায় হইলে কি হইবে, আপনি রমণীর ন্যায় ভীরু। নচেৎ আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিবেন কেন? আপনি জানিবেন সাবিত্রী যেমন সত্যবানের অনুব্রত, আমিও সেইরূপ আপনার অনুব্রত। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার বনে যাওয়া কিছুতেই উচিত হয় না। আমার কিছুই কষ্ট হইবে না। বনের কণ্টক আমার তুলার মত ভাল লাগিবে। পথের ধূলি চন্দনের ন্যায় মনোরম হবে। আপনার কাছে থাকাই আমার স্বর্গ। আপনার কাছে না থাকাই আমার নরক। যদি না নিয়ে যান আজই বিষপান করিব। আমি এই বিয়োগ শোক এক মুহূর্তও সহ্য করিতে পারিব না, চতুর্দ্দশ বৎসর ত দূরের কথা"। সীতা রামকে জড়াইয়া ধরিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনোহর চক্ষু হইতে বড় বড় অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। মুখ শুষ্ক হইল। রাম তাঁহাকে দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তুমি দুঃখিত হইলে আমার স্বর্গও ভাল লাগে না। আমি বনে কাহাকেও ভয় করি না। আমি তোমাকে লইয়া যাইব। তুমি বনবাসে যাইবার আয়োজন কর।"

এইভাবে ভগবান রামচন্দ্র জীবনে একবার পরাজয় স্বীকার করিলেন—সীতার পাতিব্রত্য-ধর্মের নিকট। জীবনে আর কেহ কখনও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই।

তত্ত্ব সাক্ষাৎকারে ভক্তি

[শ্রীসিতাংশু কুমার দাশগুপ্ত]

তত্ত্বসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কৃতার্থ হইতে পারে না। শ্রীগুরু শ্রীবৈষ্ণব পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া পরতত্ত্ব এবং তৎ সাক্ষাৎকারের উপায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার অবতারণা করা যাইতেছে।

স্বর্গলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক যেখানেই গতি হউক না কেন, তত্ত্ব সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' তাই শ্রুতি পুনঃ পুনঃ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের আদেশ দিয়াছেন। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্য।"

তত্ত্বজ্ঞগণ অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ বস্তুকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন।

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।

—শ্রীমদ্ভাগবত।

তত্ত্বজ্ঞগণ অদ্বিতীয় অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তুকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন সেই অদ্বয় তত্ত্ববস্তুকেই জ্ঞানীগণ ব্রহ্ম, যোগিগণ পরমাত্মা এবং ভক্তগণ শ্রীভগবান বলিয়া থাকেন।

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পরতত্ত্বের অস্তিত্ব সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। কাজেই ইঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও সম্প্রদায়ে বিবাদ নাই। তবে তাঁহার স্বরূপানুভূতি এবং প্রকাশ নিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবিরোধ অবশ্যই আছে। কিন্তু একটু বিশেষভাবে অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নানা মত এবং পথ থাকা সত্ত্বেও একটি বেশ ঐক্য আছে। কাজেই এই বিষয়ে তর্ক না করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসাই সমিচীন। আমাদের যাবতীয় দৃষ্ট, শ্রুত এবং অনুভূত পদার্থের একটি মূল পদার্থ আছে। সর্ব্বমূল বস্তুটিকেই তত্ত্ব বলিতে পারি। কারণ ছাড়া কার্য্য হয় না। 'কারণং বিনা কার্য্যং নোদেতি।' সর্ব্বকারণের যিনি কারণ তিনিই পরতত্ত্ব।

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণং॥ —ব্রহ্ম সংহিতা।

অর্থাৎ পরমেশ্বর গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; তিনিই সকলের আদি। তিনি সকল কারণের কারণ।

এখন, এই সর্ব্বকারণকারণরূপী পরতত্ত্বকে সাধনভেদে সাধকের দর্শন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীকবিরাজ গোস্বামী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

প্রকাশ বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, আর স্বয়ং ভগবান॥

তিনি জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর আত্মা এবং ভক্তের নিকট অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বয়ং ভগবান। তিনি সচ্চিদানন্দময়।

তারপর তাঁহার প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তি সাধকাঃ।

কর্ম্মযোগো, জ্ঞানযোগো, ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ॥

—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই তিনটি পথই শাশ্বত পথ। ভক্তিশূন্য কেল কর্ম্মযোগে বা কেবল জ্ঞানযোগে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। উহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্নভাবে ভক্তির সহায়তার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু 'ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবলা।'

সংসারের আসক্তি সর্ব্বপ্রকারে না ছাড়িতে পারিলে জ্ঞানমার্গের অধিকারী হওয়া যায় না। আর প্রথমতঃ ভক্তির প্রয়োজন। 'ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি নহি জায়তে।'

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।

কৃষ্ণোন্মুখের সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

তুষে আঘাত করিলে যেমন তণ্ডুল পাওয়া যায় না, তেমন শুষ্ক জ্ঞানে ভগবৎ সাক্ষাৎকার অসম্ভব।

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো,

ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধ লব্ধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে

নান্যদ্ যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবত।

হে বিভো! মঙ্গলের হেতুভূতা ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল যাঁহারা সকল প্রকার জ্ঞানলাভের আশায় শাস্ত্রাভ্যাসাদির ক্লেশ স্বীকার করেন, তাঁহারা স্থূল তুষাবঘাতী ব্যক্তিদিগের ন্যায় কিছু ফল লাভ করিতে পারেন না।

যদি জ্ঞানযোগে জীবন্মুক্তি দশা প্রাপ্ত হওয়া যায়ও, তথাপি তাহা ভক্তি-রহিত হইলে অনিশ্চিত।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তি দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত

হে কমলাক্ষ! যাহারা তোমাতে ভক্তির অভাব বশতঃ অবিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, সংসার মধ্যে পতিত হইয়াও আপনাকে মুক্ত মনে করেন অথচ তোমার পাদ-পদ্মের আদর করেন না, তাঁহারা তপস্যাদি সাধন দ্বারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও উহা হইতে পতিত হইয়া থাকেন।

বিশেষ এই যে, জীবন্মুক্ত পুরুষও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অপরাধী হন তাহা হইলে তাঁহারাও আবার সংসারে আবদ্ধ হন।

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥

অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের নিকট অপরাধী হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও সেই অপরাধের জন্য পুনরায় বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে জ্ঞানের পথ—বিচারের পথ—বিঘ্নসঙ্কুল। পদে পদে স্খলন, পতনের আশঙ্কা। কিন্তু ভক্তিপথে 'ন স্খলেৎ ন পতেদিহ।'

আহার বিহারাদির বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিই যোগমার্গের অধিকারী—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন।
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

—শ্রীগীতা।

অতি ভোজীর, একান্ত অনাহারীর, অত্যন্ত নিদ্রালুর এবং অতি অনিদ্রা অভ্যাসীর ধ্যান হয় না। যিনি পরিমিত আহার বিহার করেন, মন্ত্রজপ ও শাস্ত্র

পাঠাদি কর্ম্মে পরিমিত চেষ্টা করেন, যাহার নিদ্রা ও জাগরণ কালে ও পরিমানে নিয়মিত তাহার ধ্যান সংসার দুঃখের নাশক হয়।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখ-নীরিক্ষক কর্ম্মযোগ জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে বল॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কর্ম্মযোগে কর্ম্মযোগীর সমস্ত কর্ম্মের ফল শ্রীভগবানে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ না করিলে সিদ্ধি অসম্ভব। যিনি তাঁহার সমস্ত কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করেন তিনি ইহজন্মেই মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥

— গীতা ৯।২৭

হে কৌন্তেয়, যাহা অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্যা কর সে সমস্তই আমাতে সমর্পণ করিবে।

করিলে কি হইবে?—না আমাতে ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পণ করিলে তবে মুক্তি হইবে।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ —ঐ ২৮

এইরূপে আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ দ্বারা সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। আমাতে শুভাশুভ-কর্ম্ম সমর্পণরূপ যোগে যুক্ত হইয়া ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করিবে এবং দেহান্তে আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই একই ধরণের কথা আছে। শ্রীভগবানে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ না করিলে যোগে মুক্তিলাভ অসম্ভব।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ২।৪।১৭

কর্ম্মী, জ্ঞানী, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, যোগী, তান্ত্রিক এবং সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ যে শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণে সমর্পণ ব্যতীত কোনও সাধনেরই ফল লাভ করিতে পারেন না, সেই সর্ব্বফলপ্রদাতা শ্রীগোবিন্দচরণে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত শাস্ত্রবচনানুসারে দেখা যাইতেছে যে, কেবল কর্ম্ম অথবা কেবল জ্ঞানযোগে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার অসম্ভব। ভক্তির সংযোগ উহাদের সঙ্গে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ভক্তিপথই কৃতার্থ হইবার সহজ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। জ্ঞান এবং কর্ম্মযোগে অধিকারী অনধিকারীর ভেদ আছে কিন্তু ভক্তিযোগে অধিকারী—অনধিকারীর প্রশ্ন নাই। "তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকারিণামধিকারিণাম ভক্তিযোগঃ প্রশস্যতে।" সাধারণভাবে শ্রীভগবানে শ্রদ্ধাবান জনই ইহার অধিকারী হইতে পারেন। আমরা কলিহত জীব। কালপ্রভাবে ও যুগধর্ম্মগুণেই আমরা সংসারাসক্ত। যদি বা মন মাঝে মাঝে ঐ দিকে একটু যাইতে চাহে, চিত্তগত দুর্ব্বলতা এবং প্রবল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে কিছুক্ষণ পরেই আবার এদিকের আসক্তিতে ভুলিয়া যাই। সংসারের অসারতা জানিয়াও অতি আসক্তিবশতঃ ছাড়িতে পারিতেছেন না, অথচ শ্রীভগবানের প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এরূপ জনও ভক্তিপথের অধিকার পাইতে পারেন।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০।৮

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'যাঁহার সংসারে নিতান্ত আসক্তিও নাই, আবার পূর্ণ বৈরাগ্যেরও উদয় হয় নাই, অথচ সৌভাগ্য-বশে আমার প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; ভক্তিযোগ তাঁহার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ।'

জ্ঞান, কর্ম্মাদি যোগে ভক্তির অপেক্ষা থাকে, কিন্তু ভক্তি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না, ইঁহার বিশেষত্ব এই যে, ভক্তি সাধনায় জ্ঞান ও যোগ সাধনার ফল অজ্ঞান নিবৃত্তি ত হয়ই পরন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম লাভে ভক্ত কৃতকৃতার্থ হইয়া যান।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্ব্বং তৎ ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।

—শ্রীমদ্ভাগবত

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিলাভ করিলেই কি সমস্ত সাধনের ফল লাভ হয়? হাঁ, নিশ্চয়ই হয়। শাস্ত্র এই কথাই বলেন। ঋষিবাক্য অভ্রান্ত, তাহাতে ভ্রম, প্রমাদ নাই। ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ এরাই সচ্চিদানন্দময় পরতত্ত্বের নির্দ্দেশ দেয়। জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি একজনের নিকটই যাইবারই পথ, তথাপি ভক্তিযোগে ভক্ত সরসপ্রাণে রসময় শ্রীভগবানকে আস্বাদন করেন বলিয়াই অবশ্যই কিছু বিশেষত্ব স্বীকার করিতে হয়।

'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা

"শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।" যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন তিনি 'যুক্ততমো' অর্থাৎ তিনি সকল যোগির মধ্যে উৎকৃষ্ট—ইহাই আমার (শ্রীভগবানের) অভিমত।

শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

'সর্ব্ব গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

হে অর্জ্জুন, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়; এইজন্য তোমার হিতকর, সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্য এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতবাক্য—পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইলেও—পুনরায় বলিতেছি।

কি? না—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

তুমি আমাতে চিত্তস্থির কর। মদ্ভক্ত ও মদর্চ্চনপরায়ণ হও এবং আমার পূজনশীল হও ইত্যাদি। আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এইরূপেই তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

'পূর্ব্বে আজ্ঞা বেদ কর্ম্ম ধর্ম্ম যোগ-জ্ঞান।
সব সাধি অবশেষে আজ্ঞা বলবান॥"

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে অন্যান্য যোগের কথা বলিয়া অবশেষে ভক্তিযোগের আজ্ঞা করিয়াছেন। ইহা শ্রীভগবানের স্বমুখনিঃসৃত বাণী। তিনি 'সত্য-

প্রতিজ্ঞ'। তাঁহার আশ্বাস বাণী কখনও মিথ্যা হয় না। তাই শুধু ক্ষীণশক্তি এবং বিষয়াসক্ত কলিজীবের জন্যই নহে, পরন্তু ইহা সর্ব্বকালের—জন্ম, জরা ও মরণশীল—সকল মানুষের জন্যই শ্রীভগবানের পরম আশ্বাস এবং অভয়বাণী।

"তস্মামপি সর্ব্বোপায়ান সর্ব্বোপায়ান পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়।
ভক্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ সিদ্ধন্তি।"

—০—

শ্রীশ্রীএকাদশী মহিমামৃত

॥ তৃতীয় হিল্লোল ॥

[শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

শিষ্য। আপনি মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীর কথা বলুন।

গুরু। মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম ষট্‌তিলা। কোন সময়ে দাল্‌ভ্য মুনি পুলস্ত্য মুনিকে বলেন. মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ ব্রহ্মহত্যা ও অন্যান্য বিবিধ পাপকর্ম্মকারী পরদ্রব্যাপহারী পরস্ত্রীগামী, তাহাদের উপায় কি, তাহারা অনায়াসে; অল্প দানের দ্বারা যাহাতে নরক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহা আপনি বলুন।

পুলস্ত্যমুনি কহিলেন—হে মহাভাগ, আপনি সাধু সাধু! ইহা গোপনীয় সুদুর্লভ, আমি আপনাকে বলিতেছি, এই কথা বলিয়া তিনি পৌষ মাসের করণীয় কার্য্যের কিছু উপদেশ করিয়া বলিলেন—ব্রতচারী মাঘ মাসে কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে স্নান করিয়া শুচি জিতেন্দ্রিয় হইয়া কৃষ্ণনামকীর্ত্তন পুরঃসর উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে জাগরণ হোম ও দেবদেব হরির অর্চ্চনা করিয়া দ্বাদশী দিবসে চন্দন অগুরু কর্পূরাদির দ্বারা হরির পূজা করিবে নৈবেদ্যের দ্বারা ও ফলাদিযুক্ত অর্ঘ্যদান পূর্ব্বক যথাবিধানে জনার্দ্দনকে পূজা করত স্তব করিবে—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বমগতিনাং গতির্ভব।
সংসারার্ণবমগ্নানাং প্রসীদ পরমেশ্বর॥
নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন্।
সুব্রহ্মণ্য নমস্তেঽস্তু মহাপুরুষ পূর্ব্বজ॥
গৃহাণার্ঘ্যং ময়াদত্তং লক্ষ্ম্যাসহ জগৎপতে॥

অনন্তর বিপ্রকে জলপূর্ণ কুম্ভ ছত্র পাদুকা কৃষ্ণা ধেনু দান করিতে হয়। (দানের ব্যবস্থা সমর্থ পক্ষে একথা বলাই বাহুল্য)। স্নান এবং প্রাশনে প্রশস্তা শ্বেত ও কৃষ্ণ তিলপাত্র যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবে।

তিলস্নায়ী তিলোদ্বর্ত্তী তিলোহোমী তিলোদকী।
তিলভুক্ তিলদাতা চ ষট্‌তিলা পাপনাশকাঃ॥

তিলস্নায়ী, তিলের দ্বারা উদ্বর্ত্তনকারী, তিলহোমী, তিলোদকী, তিলভুক্ ও তিলদাতা এই ষট্‌তিল কর্ম্ম পাপ নাশক।

শিষ্য। ষট্‌তিলা একাদশীর কোন উপাখ্যান আছে?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নারদকে এক ভক্তিমতি রমণীর কথা বলিয়াছিলেন। তিনি দেবপূজারতা, উপবাসকারিণী, অন্যান্য শারীরিক ক্লেশকর ব্রত করিতেন, দীন ব্রাহ্মণকুমারীদিগকে গৃহাদি দিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণকে অন্নাদির দ্বারা পূজা কখনও করেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিকট ভিক্ষার্থ উপস্থিত হন তাঁহাকে তিনি একডেলা মাটী দেন। তার ফলে পরলোকে তাঁহার সুন্দর গৃহ হয়। ভক্ষ্যদ্রব্য ধনধান্যাদি না দান করায় তাহা প্রাপ্ত হন নাই। ভগবানের কাছে আসিয়া তাহা বলেন, তিনি ষট্‌তিলার পুণ্যাহ বাচন করিয়া দ্বার খুলিতে বলিয়াছিলেন, তার ফলে ধনাদি প্রাপ্ত হন।

অতি তৃষ্ণা করা কর্ত্তব্য নয়, আপনার বিভব অনুসারে বস্ত্র তিলাদি দান করিতে হয়। ষট্‌তিলা একাদশী তিথিতে তিল ও বস্ত্রাদি দানে জন্ম জন্ম আরোগ্য লাভ হয়। দারিদ্র্য কষ্ট দুর্ভাগ্য ষট্‌তিলা একাদশীতে উপবাসকারীর কখন হয় না। এইরূপ বিধিতে তিলদান করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়।

শিষ্য। তিলের এত প্রশংসার কারণ কি?

গুরু। মানবের দুঃখের কারণ হইল বহির্ম্মুখতা। রজোগুণই মানুষকে বহির্ম্মুখ করে, তিল সত্ত্বগুণ বর্দ্ধক, তজ্জন্য তিলের প্রশংসা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তিল তুলসী কুশ গঙ্গাজল কাঁচকলা মটরদাল গব্য দুগ্ধ ঘৃত ইক্ষুগুড় সৈন্ধব লবণ প্রভৃতি দ্রব্য সমুদয় সত্ত্বগুণ বর্দ্ধক। ভগবৎ কৃপাভিলাষী—শান্তিকামী মানবগণের সাত্ত্বিক আহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইলেই মানুষ শান্তিলাভ করে। অতঃপর শ্রবণ কর—রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন মাঘ মাসের শুক্লা একাদশীর কি নাম কি বিধি এবং কোন্ দেবতাকে পূজা করিতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম জয়া, ইহা সর্ব্বপাপহরা, পবিত্রা, কামদায়িনী, ব্রহ্মহত্যাদি পাপহন্ত্রী, পিশাচত্ববিনাশিনী। মানুষ এই ব্রতের আচরণ করিলে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় না। এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

পাপনাশিনী মোক্ষদায়িনী ব্রত আর নাই। হে নৃপোত্তম, আপনি শ্রবণ করুন। পঙ্কজ নামক পুরাণে আমি ইহার মহিমা বলিয়াছি।

কোনদিন পরম রমণীয় সুরলোকে ইন্দ্র সভায় পঞ্চাশৎ কোটি নায়িকা নৃত্য করিতেছিল, পুষ্পদন্তক চিত্রসেন তাহার পুত্র পুষ্পবান্ তৎপুত্র মাল্যবান্ প্রভৃতি গন্ধর্বগণ সুস্বরে গান করিতেছিল, পরম সুন্দর মাল্যবানকে দেখিয়া পুষ্পবতী নাম্নী গন্ধর্ব্বী মোহিত হইয়া কটাক্ষের দ্বারা তাহাকেও বিবশ করে। পরস্পরের চিত্ত কাম কলুষিত হওয়ায় নৃত্যগীতে তালভঙ্গ হইয়া যায়, তাহা দেখিয়া দেবরাজ কুপিত হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন, তোমরা পিশাচ-দম্পতি হইয়া মর্ত্ত্যলোকে গমন করত আপনাদের কর্ম্মফল ভোগ কর। অনন্তর ইন্দ্রশাপে উভয়ে দুঃখিত-মনে হিমালয়ে পিশাচ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। একদিন পিশাচ দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সন্তপ্তচিত্তে গিরিগহ্বরে বিচরণ করিতে করিতে শীতে অতিশয় পীড়িত হইয়া স্বপত্নী পিশাচীকে বলিল, আমরা কি দুঃখদায়ক অত্যন্ত পাপ করিয়াছিলাম তাহার জন্য পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। গর্হিত পিশাচত্ব দারুণ নরক বলিয়া মনে করি সেই হেতু সকলে সর্ব্বপ্রযত্নে পাপাচরণ করিবে না। দৈবযোগে মাঘ শুক্লা জয়া নাম্নী বিখ্যাতা একাদশী তিথি উপস্থিত হয়। তদ্দিনে তাহারা নিরাহারে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে পতিত হইয়া দিন অতিবাহিত করে, রাত্রে দারুণ শীতে কম্পিত হইতে থাকে, শীতের জন্য নিদ্রা হয় না, জাগরণ করিয়া অতি কষ্টে সমস্ত রাত্রি যাপন করে। মাল্যবান ও পুষ্পবতীর জয়া একাদশী ব্রতের ফলে শ্রীভগবানের কৃপায় শাপাবসান হয়, তাহারা দিব্য বিমান আরোহণ-পূর্ব্বক অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সেবিত গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা স্তুত হইয়া সুরলোকে গমন করিয়া ইন্দ্রকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন, কোন্ পুণ্যের দ্বারা তোমাদের পিশাচত্ব দূরীভূত হইল, কোন্ দেবতা আমার শাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত তোমাদের শাপমুক্ত করিয়াছেন তোমরা তাহা বল।

মাল্যবান্ বলিল—হে প্রভো, বাসুদেবের প্রসাদে জয়া ব্রতের অনুষ্ঠানে আমাদের পিশাচত্ব দূর হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বলিলেন হরিভক্তি প্রভাবে হরিবাসরকারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ তোমরা উভয়ে পবিত্র পাবন এবং আমারও বন্দনীয় হইয়াছ।

হরিভক্তিরতা যে চ শিবভক্তি রতাস্তথা।
অস্মাকমপি তে মর্ত্ত্যা পূজ্যা বন্দ্যা ন সংশয়ঃ॥

যারা হরিভক্তিরত শিবভক্তিপরায়ণ সেই মানবগণ আমাদেরও পূজনীয় এ সম্বন্ধে সংশয় নাই। পুষ্পবতীর সহিত যথাসুখে বিচরণ কর।

এইজন্য হে রাজন্, হরিবাসর করা কর্ত্তব্য এই জয়া ব্রহ্মহত্যা পাপনাশকারিণী যিনি জয়াব্রত করেন তাঁহার সমস্ত দান নিখিল যজ্ঞ ও সর্ব্বতীর্থে স্নান করার পুণ্য লাভ হয়। যে মানব শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে এই জয়া ব্রত করে সে শত কোটি কল্পকাল আনন্দে বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া থাকে। জয়া ব্রতের মহিমা পঠনে শ্রবণে যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

শিষ্য। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা একাদশীর কি নাম?

গুরু। রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ফাল্গুনী কৃষ্ণা একাদশীর কি নাম, পূজার বিধান কি? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলেন, ফাল্গুনী কৃষ্ণা একাদশীর নাম বিজয়া, ব্রতশীলগণের সদা জয়দায়িনী সর্ব্বপাপনাশকারিণী। নারদ ব্রহ্মাকে এই ব্রতের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে কমলাসন ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—হে নারদ, এই ব্রতের সর্ব্বপাপহরা কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। পবিত্র পাপনাশন পুরাতন এই বিজয়া ব্রতটী আমি কাহাকেও বলি নাই, বিজয়া মনুষ্যগণকে জয়দান করে ইহাতে কোন সংশয় নাই।

পিতৃসত্য পালনার্থ ভগবান রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে গমন করেন। পঞ্চবটীতে বাসকালে শূর্পনখা কর্ত্তৃক প্রেরিত রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, পক্ষীরাজ জটায়ু সীতাকে রক্ষা করিতে যাইয়া রাবণের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। রাম তাঁহাকে উর্দ্ধগতি দান করিয়া কবন্ধ রাক্ষসকে বধ করেন, কবন্ধ সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইবার কথা বলে, রাম শবরীকে উদ্ধার করিয়া ঋষ্যমূকে উপস্থিত হইলে হনুমান রাম লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের কাছে লইয়া যায়। উভয়ে অগ্নি সাক্ষী করিয়া সখ্যতা সূত্রে বদ্ধ হন। রামচন্দ্র এক বানে বালিকে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে বানর-রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ষান্তে সুগ্রীব দেশদেশান্তর হইতে মহাবল বানরগণকে আনয়ন করিয়া সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করেন। হনুমান, অঙ্গদ, জাম্বুবান প্রভৃতি দক্ষিণদিকে গমন করিয়া সম্পাতির মুখে সীতার সংবাদ শুনিয়া হনুমান শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন করত সীতাকে দেখিয়া রামকে সীতার সন্ধান দেন, রামচন্দ্র বানর সৈন্য সহ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্র কিরূপে উত্তীর্ণ হইব লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণ বলেন এখান হইতে এক যোজন দূরে দ্বীপ মধ্যে দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রম আছে, চলুন তথায় গমন করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিব। লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাম দাল্‌ভ্য মুনিকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করত তাঁহাকে প্রণাম করিলে মুনিবর ভগবান পুরুষোত্তম জানিয়া সাদরে গ্রহণান্তে পাদ্য অর্ঘ্যাদির দ্বারা পূজা পূর্ব্বক আগমনের

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাম সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া সমুদ্র কি উপায়ে পার হইব জিজ্ঞাসা করিলেন।

মুনি বলিলেন আমি হে রাম, তোমাকে ব্রত সমূহের মধ্যে উত্তম ব্রত বলিতেছি যাহার অনুষ্ঠানে তুমি লঙ্কা জয় করিয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তিলাভ করিবে। একাগ্র-চিত্তে ব্রতের অনুষ্ঠান কর। ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষে বিজয়া নাম্নী একাদশী ব্রত করিলে তুমি জয়লাভ করিবে। বানরগণের সহিত অনায়াসে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে রাম এই ব্রতের বিধি শ্রবণ কর। দশমীর দিনে স্বর্ণ রজত তাম্র অথবা মৃন্ময় একটী পল্লবযুক্ত জলপূর্ণ কলস স্থণ্ডিলে স্থাপন করিবে, সপ্ত ধান্য তাহার তলদেশে দিবে, কলসের উপর স্বর্ণ নির্ম্মিত নারায়ণকে স্থাপন করিবে। একাদশীর দিন প্রাতঃস্নানপূর্ব্বক গন্ধমাল্য অনুলেপিত কুম্ভে গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ বিবিধ নৈবেদ্য ও দাড়িম নারিকেল আদির দ্বারা নারায়ণের অর্চ্চনা করত কুম্ভাগ্রে নৃত্যগীত পাঠ আদির দ্বারা রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক দ্বাদশীর দিন প্রাতে সেই কুম্ভ নদী তড়াগ আদি যে কোন জলাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক হেমময় দেবতার সহিত সেই কলস ও মহীদান সঙ্কল্প বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই প্রকার বিধানে যদি সসৈন্যে এই ব্রত কর তাহা হইলে তুমি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ভগবান্ রামচন্দ্র তাহা শুনিয়া যথোক্ত বিধিক্রমে এই ব্রত করিয়া বিজয়ী হইয়াছিলেন। হে রাজন্ যে ব্যক্তি এই ব্রত যথাযথ অনুষ্ঠান করিবে সে ইহলোকে জয় এবং অক্ষয় পরলোক প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন—হে পুত্র, এই কারণে বিজয়া ব্রত করা কর্ত্তব্য, ইহার মাহাত্ম্য পাপনাশ করে, পাঠ অথবা শ্রবণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হয়।

শিষ্য। ফাল্গুন মাসের শুক্লা একাদশীর নাম কি?

গুরু। আমলকী।

শিষ্য। ইহার মহিমা আমায় বলুন।

গুরু। রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা গুরুদেব বশিষ্ঠ মুনিকে বলেন—হে ব্রহ্মণ্, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাকে শ্রেয়োজনক উত্তম ব্রতের কথা বলুন—যাহার অনুষ্ঠানে আমি কৃতার্থ হইব। ভগবান বশিষ্ঠদেব তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন বৎস, আমি তোমাকে সর্ব্বব্রতের ফলপ্রদ মহাপাতক নাশক মোক্ষদ সহস্র গোদানের ফলদায়ক আমলকী ব্রতের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর, এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস বলিব যাহাতে হিংসাযুক্ত ব্যাধের মুক্তিলাভের কথা আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র বৈশ্য সমলঙ্কৃত হৃষ্টপুষ্ট জনাবৃত বৈদিশ নামক এক

নগর ছিল, সে নগর সর্ব্বদা বেদধ্বনিতে নিনাদিত হইত সেখানে নাস্তিক দুষ্কৃত-কারিগণ ছিল না। চন্দ্র বংশীয় বিখ্যাত শশবিন্দু রাজার পুত্র ধর্ম্মাত্মা সত্যপরায়ণ শ্রীমান বলসম্পন্ন অস্ত্র ও শাস্ত্রার্থপারগ চৈত্ররথ নামক জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার শাসনকালে কৃপণ নির্ধন দেখা যাইত না। সকলেই মঙ্গল ও আরোগ্য সম্পন্ন ছিল, দুর্ভিক্ষ সে রাজ্যে ছিল না। প্রজাগণ হরিভক্তিপরায়ণ, হরিপূজারত, বিশেষ রাজার ভক্তির কথা বর্ণনা করা যায় না। শুক্লা কৃষ্ণা কোন একাদশীতেই নগরবাসীগণ ভোজন করিত না। সর্ব্বধর্ম্মপরিত্যাগ করত সকলে একান্তভাবে হরিভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। হরিপরায়ণ রাজা হরিভক্ত প্রজাগণের সহিত বহুকাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর একবার ফাল্গুন মাসের শুক্লা আমলকী নাম্নী একাদশীতে বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী সকলেই নিয়ম-পূর্ব্বক উপবাস করিয়াছিল। আমলকী একাদশী মহাফলদায়িনী জানিয়া সকলের সহিত রাজা নদীজলে স্নান করত তত্রস্থ দেবালয়ে পঞ্চরত্ন সমাযুক্ত দিব্যগন্ধাদি বাসিত ছত্র উপানহ সহিত পূর্ণ কুম্ভ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে ভগবান পরশুরামের মূর্ত্তি রক্ষা করিয়া দীপমালা দান করেন। তথায় আমলকী বৃক্ষ ছিল। সকলে

জামদগ্ন্য নমস্তেঽস্তু রেণুকানন্দবর্দ্ধন।
আমলকী কৃতচ্ছায়া ভুক্তি মুক্তি বরপ্রদ॥
ধাত্রি ধাতৃ সমুদ্ভূতে সর্ব্বপাতকনাশিনী।
আমলকী নমস্তুভ্যং গৃহাণার্ঘ্যোদকং মম॥
ধাত্রি ব্রহ্মস্বরূপাসি ত্বং তু রামেন পূজিতা।
প্রদক্ষিণ বিধানেন সর্ব্বপাপ হরা ভব॥

এইরূপ মন্ত্র পাঠান্তে অর্ঘ্যদান প্রদক্ষিণ করত ভক্তিসহকারে শ্রীভগবানের নাম লীলা গান করত রাত্রি জাগরণ করেন।

এই সময় মহাভারপীড়িত ক্ষুধা-পিপাসাকুল শ্রান্ত জীবঘাতী সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত এক ব্যাধ আসিয়া উপস্থিত হয়, কুম্ভস্থিত দেবতা আমলকী বৃক্ষ দীপমালা এবং পূজাপাঠ নিরত বৈষ্ণবগণকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কি ব্যাপার জানিবার জন্য মাংসভার মাটীতে রক্ষা করত উপবিষ্ট হইয়া একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে, হরিবাসরে সমস্তদিন উপবাস এবং রাত্রিজাগরণে শ্রীভগবান তাহার উপর প্রসন্ন হন। পরদিন প্রভাতে সকলে নিজ নিজ ভবনে গমন করিলে ব্যাধ স্বগৃহে আসিয়া আনন্দিত চিত্তে ভোজন করে। অনন্তর কালক্রমে দেহত্যাগ করিয়া একাদশীর প্রভাবে রাত্রি জাগরণে জয়ন্তী নামক নগরে রাজা বিদূরথের পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। রাজা পুত্রের নাম বসুরথ রাখেন।

যথাকালে বসুরথ রাজা হইয়া চতুরঙ্গ বলযুক্ত ধনধান্য সমন্বিত দশ অযুত গ্রাম ভোগ করিতে থাকেন। তিনি তেজে সূর্য্যের মত, কান্তিতে চন্দ্রের ন্যায়, পরাক্রমে বিষ্ণুসদৃশ, ক্ষমাগুণে পৃথিবী সম, ধার্ম্মিক সত্যবাদী বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ কর্ম্মশীল প্রজাপালন-তৎপর দর্পহারী সেই রাজা বিবিধ যজ্ঞ করেন। সর্ব্বদা বহুবিধ দান করিতে থাকেন। একদা তিনি মৃগয়ায় গমন করিয়া দৈবক্রমে পথচ্যুত হন। দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া গহন কাননে বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। ঘটনাক্রমে তাঁহার পূর্ব্ব শত্রু ম্লেচ্ছগণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্ববৈর স্মরণ করত তাঁহার উপর অস্ত্রাঘাত করে কিন্তু রাজার অঙ্গস্পর্শে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। অনন্তর রাজার শরীর হইতে সর্ব্বাবয়ব শোভনা দিব্যগন্ধযুক্তা দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যমাল্যাম্বরধারিণী কালরাত্রির ন্যায় চক্রহস্তে এক নারী আবির্ভূতা হইয়া সমস্ত ম্লেচ্ছগণকে সংহার করেন।

অনন্তর রাজা জাগরিত হইয়া নিহত ম্লেচ্ছগণকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, কে আমার হিতার্থী এই পরম শত্রু ম্লেচ্ছগণকে সংহার করিল ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দৈববাণী হইল—

"শরণং কেশবাদন্যো নাস্তি কোঽপি দ্বিতীয়কঃ।"

—কেশব ভিন্ন দ্বিতীয় কোন আশ্রয়দাতা নাই।

রাজা এই অকাশবাণী শুনিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে কুশলে রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া সেই ধর্ম্মাত্মা রাজা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠদেব বলিলেন—হে রাজন্, যে মানব আমলকী একাদশী ব্রত করেন তিনি নিশ্চয়ই বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন।

শিষ্য। এই ব্রত নদীতীরে আমলকী তলায় করিতে হয়?

গুরু। হাঁ।

শিষ্য। আমলকীর মহিমা আমায় কিছু বলুন।

গুরু। একদিন প্রভাসতীর্থে স্ব স্ব পত্নীগণের সহিত দেবগণ গমন করেন। পার্ব্বতী দেবীর ইচ্ছা হয় স্বকল্পিত দ্রব্যের দ্বারা নারায়ণের পূজা করিব। কমলার স্বকল্পিত দ্রব্যের দ্বারা শিবপূজার অভিলাষ হয়। উভয়ে উভয়ের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করেন, এই সময়ে তাঁহাদের নেত্র হইতে অমল আনন্দাশ্রু ভূমিতলে পতিত হয় তাহাতে আমলকী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। অমল নেত্রজল হইতে উৎপন্না হইয়াছেন বলিয়া উহার নাম আমলকী। তুলসী ও বিল্ববৃক্ষে যে গুণ আছে একমাত্র আমলকীতে সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান। আমলকী পত্রের দ্বারা হরি হর

উভয়েই পূজিত হন। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর কথা শ্রবণ কর। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম কি ? তাহার বিধি, ফল কি ? শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলেন রাজচক্রবর্ত্তী মান্ধাতা এই ব্রতের কথা লোমশ মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন ভগবান্ চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম ও বিধি এবং ফলের কথা বলুন। লোমশ মুনি বলেন চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর নাম পাপমোচিনী ইনি পিশাচত্ব বিনাশ করেন। কামদায়িনী সিদ্ধিদায়িনী তাহার কথা শ্রবণ কর। পূর্ব্বে চৈত্ররথ নামক বনে দেবগণ গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরাগণ ক্রীড়া করিত, মনোরম নানা পুষ্প বিরাজিত সেই কাননে দেবরাজ ইন্দ্রও দেবতাগণের সঙ্গে আসিয়া বিহার করিতেন, সে অপূর্ব্ব কাননের শোভা বর্ণনাতীত। তথায় মুনিগণও তপস্যা করিতেন।

মেধাবী নামক জনৈক পরম সুন্দর যুবক মুনি কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। মঞ্জুঘোষা নাম্নী জনৈক অপ্সরা তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার জন্য চেষ্টিতা হয়। অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী অপ্সরাকে দেখিয়া মুনি মোহিত হন। অপ্সরা মঞ্জুঘোষাও তাঁহার রূপে আকৃষ্টা হয়। মঞ্জুঘোষা রূপলাবণ্য কটাক্ষাদির দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করে, মেধাবী মুনি সাতান্ন বৎসরকাল তাঁহার সহিত বিহার করেন, পরে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয়, তখন অপ্সরাকে পিশাচী হও বলিয়া শাপ প্রদান করেন। অপ্সরা তাঁহার শাপ বিমুক্তির কথা বলিলে তিনি বলেন চৈত্র মাসে সর্ব্ব পাপক্ষয়কারী পাপমোচিনী নাম্নী একাদশী ব্রত করিলে তোমার শাপ অবসান হইবে।

অনন্তর মেধাবী পিতার আশ্রমে উপস্থিত হইলে পিতা তাঁহাকে তেজোভ্রষ্ট দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মেধাবী পিতার নিকট সমস্ত কথা নিবেদন করিয়া কি করিলে পাপক্ষয় হইবে জিজ্ঞাসা করেন। মহামুনি চ্যবন তাঁহাকে পাপমোচিনী একাদশী করিতে বলেন। পিতার আদেশে মেধাবী পাপমোচিনী একাদশী ব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা নিষ্পাপ হন। মঞ্জুঘোষাও পাপমোচিনী ব্রত করিয়া পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্ব দেহ লাভ করে। লোমশ মুনি বলিলেন এই পাপমোচিনী ব্রত যে মানব অনুষ্ঠান করিবে তাহার সমস্ত পাপ দূর হইবে। ইহার মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। ব্রহ্মহত্যাকারী স্বর্ণস্তেয়ী সুরাপানরত গুরুতল্পগামী-ও এই ব্রত করিলে পাপমুক্ত হইবে। এই ব্রত বহুপুণ্য প্রদান করিয়া থাকে।

শিষ্য। মুনিগণের তপোভ্রংশের কথা প্রায়ই শুনা যায়, ইহার কারণ কি ?

গুরু। জগন্মাতা যাঁহাকে আপনার বক্ষে ধারণ করিতে চান তাঁহার জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপের লেশ পর্য্যন্ত রাখেন না। পতনই উত্থানের সুদৃঢ় সোপান। পতন মানুষকে শান্ত করে, দম্ভশূন্য করে, মাতৃ-আশ্রিত করিয়া দেয়।

বন্যার পরে

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

দিনগুলি মোর যায় রে, মোরে
সাড়া না দিয়া,
কি ফল বিফল এমন নীরস
জীবন যাপিয়া ?
চারিদিকেই কাজ
লাগছে আমার লাজ,
'বাবুই পাখী' হলো, মনের
বনের পাপিয়া।

(২)

ভ্রমর আমার ভুলেই গেছে
মধুর সে কারবার-
চক্র-রচার কর্ম্মে দেখি
মগ্ন সে এবার।
ভুলে গেছে সে মৃদু গুঞ্জন
ভুলে গেছে অমৃত ভূঞ্জন,
মধুর চেয়ে বাড়ছে তাহার
হুলের অহঙ্কার !

(৩)

বাঁশীর সাড়া পায় না—উজান
বয়না কালিন্দী,
সমীর তো নয়—রাধাশ্যামের
সে অঙ্গগন্ধী !
হয় না গাঁথা সে গুঞ্জাহার
থামে না কো এ অশ্রুধার,
গড়াই এখন মণিকোঠা
কুঞ্জকে নিন্দি'।

—*—

শান্তিনিকেতনের পথে

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ]

সাতুই পৌষ। শান্তিনিকেতন উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে। পৌষ উৎসবে যোগদান করতে বাঙ্গালী, দেশী বিদেশী, শিক্ষিত অশিক্ষিত নরনারীর সমাবেশ। উৎসবের প্রধান দুটো দিন ৭ই ও ৮ই কিন্তু মেলা চলে অনেক দিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার পীঠস্থান, তাঁর সুযোগ্য পুত্র বিশ্ববরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাধনালব্ধ অভিনব বিদ্যায়তন ও সমাজকল্যাণকেন্দ্র, বিশ্বের দরবারে এক নতুন বাণীর দ্বার খুলে দিয়েছে, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মহামিলনক্ষেত্র গড়ে তুলেছে। রবীন্দ্র সাহিত্য ও তাঁর নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা জগতের বুকে এক অপূর্ব্ব অবদান, তাই ভারতদর্শনের তালিকায় বোলপুর শান্তিনিকেতন দেশী বিদেশী সকলের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।

শান্তিনিকেতনে এসেই মনে হলো পূর্বসাধনা ও বৈশিষ্ট্যের কিছু সংবাদ এখানে নিশ্চয়ই মিলবে। বীরভূম শুধু বীরেরই ভুমি নয়, এই ভূমি হিন্দুতীর্থের পীঠভূমি বলে অনাদিকাল থেকে খ্যাতিলাভ করে এসেছে। শুনলাম এই শান্তিনিকেতনের প্রায় তিন মাইল দূরে প্রাচীন তীর্থ কঙ্কালীতলা। মেঠো রাস্তা হলেও বর্ষাকাল ছাড়া পথচলার অসুবিধা নেই। গ্রাম বলতে বিশেষ কিছু নেই, দূরে দূরে ২।৪টি খড়ের ঘর। দেশ বিভাগের পর বহু পূর্ব্ববাঙ্গালী হিন্দু এখানে এসেছেন কিন্তু তাঁরা সাধারণতঃ ভীড় করেছেন বড় বড় সহরকে কেন্দ্র করে ও বড় নদীর ধারে ধারে। ছোট ছোট গ্রাম ও মাঠ পার হয়ে বেলা ১০টা নাগাৎ কঙ্কালীতলা আসা গেল। কোপাই নদীর ধারে স্থানটী বেশ নির্জ্জন, সাধন-ভজনের উপযুক্ত। কয়েকজন সাধুর কুটীর রয়েছে। কেউ কেউ অনেকদিন থেকে আছেন, গ্রামে ভিক্ষা করে ইষ্ট-চিন্তায় নির্জ্জনস্থানের পবিত্র পরিবেশের মধ্যে দিন কাটান। স্থানটি বোলপুরের ঘোষ বংশের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। তাঁদের খামারবাড়ীর সঙ্গে সদাব্রত আছে, সাধু অতিথি আসলে অভুক্ত না থাকেন তার ব্যবস্থা আছে। এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্থানের মাহাত্ম্য বললেন—এখানে দক্ষকন্যা শিবরাণী সতীর কঙ্কাল পড়েছিল তাই এর নাম কঙ্কালীতলা। যে স্থানে কঙ্কাল পড়েছিল তা একটি ছোট ডোবায় পরিণত হয়ে আছে, এর পাড়ে দুটি পূজার বেদী, একটি জমিদারের নিজস্ব ও অপরটি সর্ব্বসাধারণের, বেদীর উপরে চালা। জনশ্রুতি ক' বছর আগে নাকি ডোবার জল শুকিয়ে যাওয়ায় কাদার

মধ্যে প্রকাণ্ড মেরু দণ্ডের মত লম্বা জীর্ণ প্রস্তর দেখা যায়। ডোবার পাড়ে বেদীর সংলগ্ন সিঁদুর মাখান ত্রিশূল, পূজার নৈবেদ্যের কিছু অংশ ডোবার জলে কঙ্কালী-মার নামে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

ডোবার পূজার স্থান ছাড়া প্রায় চারিদিক জঙ্গলে ঢাকা। পুরোহিত চৌধুরী মশায় বল্‌লেন রাণী ভবানীর দান দেওয়া আছে, তা থেকে কিছু খাজনা ও ১৮ পোলি ধান পেতেন। যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু কিছু প্রণামীও পান। শনি ও মঙ্গলবারে কিছু যাত্রী হয়, অন্যদিন বিশেষ কেউ আসে না। পুণ্যার্জ্জন বিশেষ রোগ-শান্তির জন্য যাত্রীরা কঙ্কালীতলার মাটী খায় ও গড়াগড়ি দেয়। দেখলাম মা কত আগ্রহ ও বিশ্বাসের সঙ্গে ছেলেকে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়াচ্ছেন। এই ঐকান্তিকতা আধুনিক ব্যাখ্যায় অন্ধ বিশ্বাস হলেও মনোবলে এ সত্যবিশ্বাস থেকে কম বলীয়ান নয়। যুগে যুগে এই বিশ্বাস শাশ্বত হয়ে আছে এক মহাশক্তির শক্তিতে, এই দ্বিধাহীন ভক্তিবিশ্বাসই তো আমাদের অমৃতলোকের সন্ধান দেয়।

ঝির ঝির করে কোপাই বয়ে চলেছে ক্ষীণধারায়। চারিদিকে ঝোপ গাছপালা ঝুকে পড়েছে, যেন স্পর্শ করতে চায় তাদের শক্তিদায়িনীকে। নদীর স্থানে স্থানে গর্ত্ত আছে, একটু বেশী জল সেখানেই, অনেকে স্নান করেন। কোপাই ক্ষীণকায়া হলেও জীবজন্তু এমনকি মানুষেরও পানীয় জলের অভাব মেটায়। এই উত্তরবাহিনী কোপাই বর্ষাগমে যৌবনমদেমত্তা স্রোতঃস্বিনীতে পরিণত হয়ে পাশের গ্রামবাসীদের ভয় দেখাতে ছাড়ে না। আজ ক্ষীণাঙ্গী কিন্তু তবুও উৎস থেকে সারাপথই নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

কঙ্কালীতলার ডোবা ও কোপাইএর সঙ্গে নালার মাধ্যমে একটি ছোটসূত্র দেখ্‌লাম, নদীর জলের প্রবেশপথ তৈরী করা আছে। ডোবার ধার ঘেসেই একটা পড়া উঁচু জমী, তাতে ক'টি ছোট ছোট মন্দির, পঞ্চবটী ও অতিথিদের জন্যে জমীদার ৺ধরণী ঘোষের তৈরী টিনের চালা। আজ বিগ্রহ ধনীদরিদ্রের কাছে 'নিগ্রহ' বা গলগ্রহ পর্য্যায়ভুক্ত হলেও ধর্ম্মপ্রাণ ঘোষ মহাশয়দের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। বাংলার ধনীরা আজ প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা জন্যে ব্যগ্র. বিলাসব্যসন এবং এই সব নামের মধ্যেই বেছে নিয়েছেন শান্তির পথ! ঘোষ মহাশয়েরা তামচোর জমীদারী কিনে তীর্থের সেবা ভুলে যাননি।

এই দেশটি নাকি আগে কাঞ্চিদেশের অন্তর্গত ছিল তাই এখানে কাঞ্চীশ্বর শিবের মন্দির রয়েছে। বেদগর্ভা এখানে ভৈরবী ও রুরু ভৈরব। এই দুই শিবস্থান ছাড়াও বাণেশ্বর শিবের পূজা করা হয়। শিবমন্দিরটি ঘোষ মহাশয়েরা তৈরী করে প্রস্তর ফলকে লিখে রেখেছেন—

"মুহুর্মুহুর্মিথ্যা ভবকালেঽস্মিন্
নিরন্তরং দুঃখ শতানি ভুঙ্ক্তে।
তৎ প্রার্থতে দীনজনেন শম্ভো
মাভূৎ পুনর্মে জনদুঃখমিত্থং।
অর্পিতং তৎপদে দেব! ধনপুত্রদেহাদিকং
ময়া লোটনচন্দ্রেন দীনেন পরমেশ্বর!

—কঙ্কালীতলা, ৯ই পৌষ, ১৩৫৮।

শরণাগতির ভাব ও ভাষাটি বড়ই ভাল লাগলো, টাকাতেই সুখ, এই মোহে কৃতীপুরুষটি আচ্ছন্ন হননি তাই প্রার্থনাটি এত হৃদয়স্পর্শী!

শিবের মন্দির ছাড়া আরও ২।৩টি ছোট ছোট দেবদেবীর স্থান। কাছেই এক ভক্তের কুটীর। দুটি সমাধি রয়েছে, এই ভৈরব ও ভৈরবী এক সময়ে এই তীর্থের মহিমা উজ্জ্বলতর করে তুলেছিলেন তাঁদের সাধনায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে মেলা বসে।

কঙ্কালীতলার স্মৃতি বুকে নিয়ে বোলপুরে ফিরে এলাম। এই বোলপুরের নাম নাকি বলিপুর থেকে হয়েছে। ষ্টেশনের কাছেই সুপুর পল্লীতে সুরথরাজার পূজিত সুরথেশ্বর শিবের অর্দ্ধভগ্ন মন্দির অনেকটা আত্মগোপনের পথে। জনশ্রুতি সুরথরাজা চণ্ডিকার কাছে এইখানে একলক্ষ বলি দেন তাই এ স্থানের নাম বলিপুর বা বোলপুর হয়।

বোলপুরের কাছে আর এক গ্রামে ভক্তলীলার কথা শুনলাম। এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে মুলুক নামে এক গ্রাম আছে, রামকানাই ঠাকুরের স্মৃতিরসে পুষ্ট। মুলুকের ঠাকুরবাড়ী এসে দেখ্‌লাম বেশ প্রশস্ত স্থান দখল করে রয়েছে মন্দির অতিথিশালা প্রভৃতি। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছ থেকে রামকানাই ঠাকুরের ও তাঁর বিগ্রহসেবার কথা শুন্‌লাম।

বীরভূম জেলার নানুর থানার অন্তর্গত জলুন্দি নামে ছোট এক গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের সেবানিরত শ্রীরামকানাই ঠাকুরের বাসস্থান। শ্রীঠাকুর মনে তেমন শান্তি পান না, শান্তিময়ের ক্রোড় শ্রীবৃন্দাবনে যাবার জন্যে মন চঞ্চল। একদিন বাড়ী ছেড়ে পদব্রজে বার হলেন শ্রীবৃন্দাবন উদ্দেশ্যে। সারাদিন ভ্রমণ করে সূর্য্যাস্ত সময়ে মুলুকগ্রামে আসবার পর এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে। রাখাল বালকেরা গাভী নিয়ে, কেউবা বাঁশী বাজায়। দৃশ্য দেখে রামকানাই ঠাকুরের মনে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার কথা মনে পড়ে গেল। প্রেমের বিকাশ ঠাকুরকে উন্মত্ত করে তুল্‌লো, রাখাল বালকেরা তাঁকে ঘিরে ধর্‌লো, সকলের মনে এক অভাবনীয়

আকর্ষণের অনুভূতি জেগে উঠলো। ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে সকলে সযত্নে বাড়ী নিয়ে গেল। গ্রামবাসীদের আকিঞ্চনে তিনি সেখানেই মন্দির নির্ম্মাণ করে বাস করার জন্যে 'আড়াই কোদাল' জায়গা দিতে বল্লেন। গ্রামবাসীরা ভাবলে, 'আড়াই কোদালে' আবার কি হবে! বলিরাজা ভাবলেন 'তিনপা' জমী এক খুদে ব্রাহ্মণকে দেবে তাতে আবার আপত্তি! শ্রীরামকানাইএর আড়াই কোদালে দেখা গেল এক কোদালে গায়ের পুকুর, এক কোদালে বিস্তীর্ণ ঠাকুরবাড়ী, আর আধ কোদালে মেলাতলা দখল হয়ে গেল। মন্দির নির্ম্মাণের ব্যবস্থায় সাহায্যের অভাব হোলো না। জনশ্রুতি মন্দির নির্ম্মাণে কড়িকাঠ ছোট হয়ে যায় কিন্তু ঠাকুরের অলৌকিক প্রভাবে কাঠে জল দেবার সঙ্গে সঙ্গে একহাত বৃদ্ধি পায়। শ্রীঠাকুর রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা করলেন। বরাদ্দ হোল প্রতিদিন ১২ সের করে চাল রান্না হবে, সদাব্রত অন্নদান চলবে।

শ্রীরামকানাই ঠাকুর সপরিবারে শ্রীপাট মুলুকে বাস করতে থাকেন। কানাইএর একমাত্র কন্যা মহাপ্রভুর শুভাগমনের দৈববাণী শোনেন। আতপ বা উষ্ণ ভোগের বিধি আছে। খোসাকলাইএর ডাল, কলমী শাক ও চর্চ্চরী বিশেষ বরাদ্দ। শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরও ৪ সের চাল বরাদ্দ হয়, মোট ১৬ সের চাল। পরে অপরাজিতা (দুর্গা) দেবী ও রামেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত হন। কথিত আছ মাটি ভেদ করে শিবের আবির্ভাব হয়। একই মন্দিরে শিবদুর্গা অবস্থান।

শ্রীরামকানাই সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার বিবৃতি শোনা গেল। গ্রামের উত্তর সীমায় জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্যে লোক লাগান হয়। শ্রীঠাকুর একভাণ্ড ভাত থেকে সবাইকে খাওয়ান। নবাবের লোক বিশ্বাস না করে অনেক লোক নিয়ে অতিথি হন তারাও যথোপযুক্ত আহার্য্য পান। নবাব কিছু জমী দান করতে ইচ্ছুক হন কিন্তু দান গ্রহণ না করে 'এক আনা' খাজনায় জমী নিতে রাজী হন। শ্রীরামকানাই একমুঠা ভাত ছড়ানোর পরিমাণ জমী গ্রহণে স্বীকার করেন। এক মুঠা ভাতে ৩৬০ (তিনশত ষাট) বিঘা জমী দখলে আসে। এই বিস্তীর্ণ মাঠের জমী এখনও ভাতুরিয়া মাঠ নামে খ্যাত। শিষ্য মনোহরদাসের সঙ্গে শ্রীরামকানাই ঠাকুর আসানসোলে এসে পাষণ্ড উদ্ধার করেন ও বহু শিষ্যশাখার সৃষ্টি করেন।

শ্রীবিগ্রহাদি দেখলাম, ঘটনাচক্রে আজ কীর্ত্তির কথা জনশ্রুতিতে পরিণত। সেবার সে গৌরব নেই, সবই যেন অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। রাজনীতির সুরুচিতে হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তুলতে না পারলেও আমরা কি আমাদের পুরাতন

কৃষ্টির বাহক হতে পারিনা, পরিকল্পনার শতসহস্রের মধ্যে মঠ ও মন্দির রক্ষা স্থান পেতে পারে না ?

—০—

বৈদিকধর্ম ও বৌদ্ধমত দর্শন

[শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী, এম্-এ, এল্-এল্-বি]

বৌদ্ধমত সনাতন ধর্ম্মের এক শাখা*। ভারতের বাহিরে বহুদেশে দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্ব হইতে ইহা প্রসারিত হইয়া পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ নরনারীকে বৈদিক ধর্ম তথা সভ্যতার ভাবধারায় প্রভাবিত করিয়াছে, এবং এইরূপে তাহাদিগের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ঘটিয়াছে। বৈদিক ধর্ম বর্ণাশ্রমী, সেজন্য অনার্য্য জাতিসমূহকে ভারতে বৈদিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে আনিবার কোনও চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু অন্ততঃ অশোকের সময় হইতে ভারতের বাহিরে বহুদূর দেশেও বৌদ্ধমত প্রচারের বিরাট পরিকল্পনা যে আরম্ভ হইয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ উপলব্ধ হয়। বৈদিক সমাজ ও জাতি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট শাসন ব্যবস্থার মর্য্যাদা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধমতে স্থান ও কালের প্রয়োজনানুসারে নিয়ম ও ব্যবহার পরিবর্ত্তন সম্ভব হওয়াতে আজ যেখানে বৈদিক সমাজ ভারতের মধ্যেও ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও বৌদ্ধমত বহির্ভারতে বহুদেশে সগৌরবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে।

বৌদ্ধমত নূতন ধর্ম নহে ঃ

ভগবান্ বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্যক্ আলোচনা করিলে বুঝা যায় তিনি সনাতন ধর্মের বাহিরে কোনও নূতন বা অভিনব মত প্রচারে অগ্রসর হন নাই† অথবা বৈদিক ধর্মের বিপরীত

* "Buddhism was the child—the product of Hinduism. Goutama's whole training was Brahmanism." Rhys David's *Buddhism*.

† "It would be historically wrong to suppose that Gautama Buddha consciously set himself up as the founder of a new religion. On the contrary, he believed to be the last that he was proclaiming only the ancient and pure form of religion which had prevailed among the Hiudus, among Brahmans Sramans and others, but which had been corrupted at a later date."

R. C. Dutt, *Civilization in Ancient India*

কোনও পথ অনুসরণ বা অনুমোদন করেন নাই। বৈদিক ধর্মে মানবের ক্রম-মুক্তির বহু ভাবে বহু দিক্ দিয়া পথ আছে। বুদ্ধদেব তাহারই কয়েকটি বিশেষ পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র।

* অনেকের ধারণা যে বৌদ্ধমত বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধবাদী এক নূতন সম্প্রদায়, যেমন প্রটেষ্ট্যাণ্টগণ পোপ শাসিত রোমান্ ক্যাথলিকদের সহিত সংঘর্ষমূলক সম্প্রদায় ছিল। ইঁহারা দেখাইতে চাহেন যে বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রমী সমাজের অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণ ও অপর বর্ণ ও জাতির উপর এক বিদ্রোহাত্মক আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেজন্য তাঁহাকে তাঁহার মত প্রচারে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

বুদ্ধদেব স্বয়ং ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। সাধারণ শিষ্যগণও বর্ণাশ্রমী সমাজ-ভুক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব কখনও বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই। বরং তিনি তাহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আদি বৌদ্ধমত কোনও নূতন ধর্ম নহে। উহা বৈদিক ধর্মেরই অন্তর্গত এক অঙ্গের বিকাশমাত্র। বুদ্ধদেব যে ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন উহাতে সনাতন ধর্মের বিরোধী কোন কথা আছে তাহা জানা যায় না। বুদ্ধদেব তাই সনাতন ধর্মে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন। তিনি বেদবিরুদ্ধ ধর্ম প্রবর্ত্তন করিলে কখনই অবতার বলিয়া মান্য হইতেন না।

ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার ধর্মমত বা উপদেশ লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ ভগবানের উপদেশ-পরম্পরা সংরক্ষণ

---

* 'People are accustomed to speak of Buddhism as opposed to Brahmanism, somewhat in the way that it is allowable to speak of Lutherism as an opponent of Papacy. But if they mean, as they might be inclined from this parallel to do, to picture to themselves a kind of Brahmnical hierarchy which is assailed by Buddha, which opposed its resistance to its operations like the resistance of the party in possession to an upstart, they are mistaken."

'Religions of the Past and Present', Montgomery.

'মিথ্যা লোকপ্রবাদ রটিয়াছে যে বুদ্ধদেব স্বাধীন পথে অর্থাৎ নিজ উদ্ভাবিত উপায়ে নির্বাণ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বুদ্ধদেব কিছুমাত্র নিজে উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মোক্ষতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ও মুক্ত হইয়াছিলেন, সে প্রণালী সমস্তই পাতঞ্জলসূত্রের প্রণালী।'

ডক্টর রামদাস সেন, 'বুদ্ধদেব।'

করেন। প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘ সম্মেলনে তাঁহার প্রবর্ত্তিত বা অনুমোদিত যে ধর্ম্মমতের আবৃত্তি হইয়াছিল তাহা 'থেরা বেদ' নামে প্রসিদ্ধ। 'থেরা বেদ' অর্থ ত্রয়ী বা ত্রিবেদও হইতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সর্ব্বপ্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র সংগ্রহের নামও 'বেদ' রাখা হইয়াছিল। 'বেদ' ইহার বহু পূর্ব্বের বলা বাহুল্য মাত্র।

'থেরা' অর্থ 'ভিক্ষু' এবং 'বেদ' অর্থ 'জ্ঞান'। থেরাবেদ এই অর্থে ভিক্ষু বা বৌদ্ধ যতিগণ ভগবান্ বুদ্ধের নিকট যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা বুঝায়। ইহা সম্ভবতঃ বেদের জ্ঞানকাণ্ডমূলক। কিন্তু থেরা বেদ এখন উপলব্ধ নহে। দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র 'ত্রিপিটক'কে প্রাচীন থেরা বেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু থেরা বেদ ত্রিপিটকের ন্যায় সুবৃহৎ হইতে পারে না. তাহাতে জাতকাদির ন্যায় গল্পও থাকিতে পারে না। সুতরাং আদি বৌদ্ধ ধর্মমতের উদ্দেশ এখন পাওয়া কঠিন। পরে ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্য প্রশিষ্যগণের দ্বারা তাঁহার ধর্মমত রূপান্তরিত হইয়াছে। তথাপি বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহার যে সকল উপদেশ রক্ষিত আছে তাহা হইতেও বুঝা যায় তিনি বৈদিক ধর্মের জ্ঞানকাণ্ড হইতে কিছু নিজ মতের ভিত্তিরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সনাতন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য ও ঐক্য ঃ

বৈদিক ধর্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্মমতের সম্বন্ধ (১) লক্ষণ (২) আচার অনুষ্ঠান এবং (৩) নীতি ও উপদেশ বিষয়ে আলোচনা দ্বারা বিশদরূপে পরিস্ফুট হইবে।

(১) লক্ষণ—

সনাতন ধর্মের (১) প্রবৃত্ত ও (২) নিবৃত্ত প্রধানতঃ এই দুই লক্ষণ। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ। প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকম্ ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্ত্যতে। নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে। প্রবৃত্তং কর্মসংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্। নিবৃত্তিং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ॥

—মনু।১২।৮৮-৯০॥

'প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর্মবৈদিকম্।'—মাঃ পুরাণ।

অর্থাৎ—বৈদিক কর্ম যজ্ঞাদি ও প্রতীকোপাসনা, এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস, এই দুই প্রকার—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্মের ফল সুখ এবং অভ্যুদয়াদি। নিবৃত্ত কর্মফলে মুক্তিলাভ হয়। ইহলোক বা পরলোকের সম্বন্ধে কোনও কামনা

করিয়া যে কর্ম করা যায় তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম বলে। আর জ্ঞান পূর্ব্বক নিষ্কাম যে কর্ম তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম বলা হয়। প্রবৃত্ত কর্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানদ্বারা দেবতাদের সমান হওয়া যায়। আর নিবৃত্ত কর্মের সেবা করিলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করা যায় অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।'

মোটের উপর কাম্য কর্ম প্রবৃত্তিমূলক আর নিষ্কাম কর্ম নিবৃত্তিমূলক। তিন ভাগেও ধর্মলক্ষণ নির্দ্ধারিত হয়। এই মতে সনাতন ধর্ম (১) প্রবৃত্তিমূলক (২) প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মূলক এবং (৩) নিবৃত্তি-মূলক। (১) প্রবৃত্তি-মূলক ধর্ম একমাত্র ইহলোকের সুখের কামনার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে চার্বাকাদি, ইউরোপের এপিকিউরাস প্রভৃতি প্রবৃত্তি-বাদী। ইঁহারা পরলোক স্বীকার করেন না এবং নাস্তিক্যমতাবলম্বী। যে ভাবেই হউক সুখভোগই ইঁহাদের উদ্দেশ্য,—'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' মনু ইহাকে ধর্মমধ্যে গণনা করেন নাই।

(২) প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মূলক ধর্ম মধ্যপথ, স্বর্গাদিলাভের আশায় যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় তাহা মনু কথিত প্রবৃত্ত কর্ম।

(৩) নিবৃত্তি-মূলক ধর্ম নিষ্কাম কর্ম—যোগী মহাপুরুষগণ এই ধর্মের আদর্শস্থানীয়। ইহা সংসারত্যাগী কর্মসন্ন্যাসীর দ্বারাই অনুষ্ঠেয়। গীতায় এই ধর্মের উপদেশ আছে।

ভগবান্ বুদ্ধ প্রবৃত্তিমূলক মতের উত্থাপনই করেন নাই। এমন কি প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বাদ—মধ্যপন্থারও তিনি অনুমোদন করিতেন না—কারণ যাগ-যজ্ঞ তাঁহার সম্প্রদায়ে কখনও ছিল না। তাঁহার মত সম্পূর্ণ নিবৃত্তিমূলক—কামনানাশ, তৃষার মূলোচ্ছেদ, প্রকৃত জ্ঞানান্বেষণই তাঁহার উপদেশ। নিষ্কামব্রতী সন্ন্যাসীই তাঁহার প্রবর্ত্তিত আদর্শ। এই আদর্শ সনাতন ধর্মের বাহিরের নহে। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তি, দুঃখনিবৃত্তির উপায়—তাঁহার উপদিষ্ট এই চারি আর্য্য সত্য—কোনটিই নূতন কথা নহে।

শ্রমণ ও ভিক্ষুঃ

শ্রমণ শব্দ বুদ্ধের পূর্ব্বেও অরণ্যবাসী ফলমূলাশী বানপ্রস্থী বা বিরক্ত সন্ন্যাসী পরিব্রাজককে বুঝাইত।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে শ্রমণ শব্দের উল্লেখ আছে। *

* 'অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহাঽভ্রূণহা চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ পৌলকসোঽপৌলকসঃ শ্রমণোঽশ্রমণ-স্তাপসোঽতাপসোঽনন্বাগতং পুণ্যেনানন্বাগতং পাপেন তীর্ণো হি তদা সর্বাঞ্ছোকান্ হৃদয়স্য ভবতি।'

—বৃহদারণ্যক। ৪।৩।২২

ভিক্ষু অর্থ সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, যতি—বর্ণাশ্রমের 'ভৈক্ষ্য'—চতুর্থ আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণ। বাল্মীকী রামায়ণে আছে হনূমান্ যখন প্রথম রামলক্ষ্মণের নিকট ছদ্মবেশে গমন করেন, তখন তিনি ভিক্ষুর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। গৌতম ও বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র অতি প্রাচীন। ইহাতে বৈখানস ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা পাওয়া যায়। বৈখানস শাস্ত্রের একটি নাম শ্রমণক। ইহা বৈখানস, শ্রমণ বা বানপ্রস্থীর বিধি নির্দ্দেশ করে। ভিক্ষুসূত্রে বিক্ষু বা পরিব্রাজকের কি নিয়মে চলিতে হইবে তাহা পাওয়া যায়। ইহা পাণিনির সমকালীন বলিয়া মনে করা হয়। ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী, শমণ বা বানপ্রস্থীর জীবনও অতি কঠোর ছিল।

ভিক্ষু ও শ্রমণ শব্দ বর্ণাশ্রমীয় চতুর্থ বা তৃতীয় আশ্রমবাচক হইলেও বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষু বা শ্রমণ একার্থবাচক হইয়া দাঁড়ায়। বৌদ্ধ শ্রমণ (পালী সমন) ভিক্ষু—ভিক্ষোপজীবী—তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহ গৃহীর দ্বারে নিয়মিত ভিক্ষা ও দানগ্রহণ দ্বারা হইত। ইঁহারা মঠবাসী, এবং ইঁহাদের জীবনযাত্রার প্রণালী সনাতন ধর্মী ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী কেন, বানপ্রস্থীর অপেক্ষাও অনেক সহজ ও কম কঠোর। বানপ্রস্থেও বনবাস ও ফলমূলাশন করিতে হয়। ভগবান্ বুদ্ধকে অনেকস্থানে সমন-গোতম বা মহাশ্রমণ বলা হয়।

ভিক্ষু বা শ্রমণ নাম শুধু নয়, বৌদ্ধ সঙ্ঘবাসী ভিক্ষুগণের নীতি ও নিয়মাবলীও মূলতঃ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর আচার হইতে গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

আচার অনুষ্ঠানঃ

লক্ষণের ন্যায় সনাতন ধর্ম ও বৌদ্ধমতের বিধি বিধান এবং আচার অনুষ্ঠানেও যথেষ্ট ঐক্য দেখা যায়। *

বৌদ্ধ ধর্মমত গ্রহণের আদি ও প্রধান অনুষ্ঠান—ত্রিশরণ—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। তাহার পর যে দশশীল বা দশবিধ সঙ্কল্প তাহা মনুকথিত দশবিধ ধর্মের বা দশপাপের অনুস্মৃতি ভিন্ন কিছু নহে। খৃষ্টমতের দশবিধ আজ্ঞাও তুলনীয়।

বৌধায়ন গৃহ্য সূত্র অনুসারে সন্ন্যাসিগণের দশটি প্রতিজ্ঞা। তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান; পাঁচটি অপ্রধান।

প্রধান প্রতিজ্ঞা পঞ্চক : (১) বাক্ চিন্তা ও কার্য্যদ্বারা জীবিত প্রাণীমাত্রকে কষ্ট দান হইতে বিরতি (২) সত্য বাক্ (৩) অন্যের সম্পত্তি গ্রহণে বিরতি (৪) মাদক দ্রব্য গ্রহণে বিরতি (৫) দান।

---

* পৃথিবীর ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী; পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ড

অপ্রধান পাঁচটি প্রতিজ্ঞা :—(৬) অক্রোধ (৭) গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তিতা (৮) অনৌদ্ধত্য (৯) পরিচ্ছন্নতা (১০) পবিত্র আহার।

বৌদ্ধমতের দশশীল প্রতিজ্ঞা (১) প্রাণীহত্যা করিব না (২) চুরি করিব না (৩) অপবিত্রতা পরিহার করিব (৪) মিথ্যা কহিব না (৫) ধর্ম্মোন্নতির হানিকর মাদকদ্রব্য ভক্ষণ করিব না (৬) অনির্দ্দিষ্ট কালে আহার করিব না (৭) নৃত্য-গীতবাদ্য বা অভিনয়ে বিরত থাকিব (৮) মাল্যগন্ধদ্রব্য অলঙ্কার প্রভৃতি ব্যবহার করিব না (৯) উচ্চ বা প্রশস্ত শয্যায় শয়ন করিব না (১০) কাহারও নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য গ্রহণ করিব না।

অষ্টাঙ্গশীল দশশীলেরই অনুরূপ। উহার প্রথম পাঁচটি পঞ্চশীল নামে অভিহিত, এবং ঐগুলি বৌদ্ধ মাত্রেরই পালনীয়।

অষ্টাঙ্গশীল যথা—(১) প্রাণিহত্যা (২) অদত্ত গ্রহণ (৩) মিথ্যা কথা বলা (৪) মাদকদ্রব্য পান (৫) অগম্য গমন (৬) রাত্রে অসিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ (৭) মাল্যগন্ধ ব্যবহার এই সকল নিষেধ (৮) সকলকে মৃত্তিকায় মাদুরে শয়ন করিতে হইবে।

শেষ তিনটি কেবল ধাম্মিক বৌদ্ধদিগের জন্য।

জৈন নিগ্রন্থদিগের পঞ্চ প্রতিজ্ঞাও অনুরূপ—(১) অহিংসা (২) অনৃত না বলা (৩) অস্তেয় (৪) ব্রহ্মচর্য্য (৫) অপরিগ্রহ।

বলা বাহুল্য বৈদিক ধর্মশাস্ত্রে বহুস্থানেই বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীর জন্য কেন, সাধারণ গৃহস্থের জন্য এই সকল যম নিয়ম প্রভৃতি আদর্শও প্রতিপাল্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ—* শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় দৈবী সম্পদ্ ও পাতঞ্জল যোগদর্শনের সূত্র উল্লেখ করা যায়। মনু চাতুর্বর্ণ্যের সামাসিক ধর্মরূপে পাঁচটির উল্লেখ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য গবেষক জ্যাকোবি † বলিয়াছেন কি বৌদ্ধ, কি জৈন, কোন সম্প্রদায়ই কোন মৌলিকত্বের দাবী এই বিষয়ে করিতে পারেন না। পরন্তু তাঁহাদের পঞ্চশীল, পঞ্চপ্রতিজ্ঞা বা পঞ্চমহাব্রত সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্যধর্মানুসারী সন্ন্যাসিগণেরই প্রতিপাল্য বিধি বিধানের অনুবর্ত্তী।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

---

* অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ।

—পাতঞ্জল যোগসূত্র, সাধনপাদ। ৩০

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥ —মনু।১০।৬৩

† "It can be shown, however, that neither the Buddhists nor the Gainas have in this regard any claim to originality, but that both have only adopted the fize vows of the Brahmanic ascetics (Sannyasin)".—

'*Introduction to Gain Sutras* by Harmann Jacobi.

আলবার লীলামৃত

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

॥ শ্রীপরকাল, তিরুমঙ্গাই আলবার নীলম্ ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

তাহারা নরহত্যা মহাপাপ, একথা বলিলে পরকাল বলিলেন, ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি নির্ণয় করা অতীব কঠিন ব্যাপার। নরহত্যা পাপ হইলেও যদি কোন সতীর সতীত্ব রক্ষার জন্য কেহ নরহত্যা করে তাহা হইলে সে নরহত্যা তাহাকে পুণ্যই দান করিয়া থাকে। ইহাদের যখন শ্রীভগবানের নিকট পাঠাইতেছি তখন আপাততঃ নরহত্যা বলিয়া মনে হইলেও ইহা হত্যা করা নহে, মহামুক্তি দান। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মন্নিমিত্তমিদং পাপমপি পুণ্যায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য পুণ্যং বা অপি পাপায় কল্পতে ॥ ৫৯ ॥

—প্র ১০১ অঃ।

আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত পাপ পুণ্যরূপে পরিণত হয়, আর আমাকে অনাদর করত যে পুণ্য অর্জ্জন করা হয় তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয়।

নাবিকগণ অসম্মত হইলে, তিনি রাজমিস্ত্রীগণকে বলিলেন, পরপারে আমার অর্থ আছে, আমার সহিত চল, আমি তোমাদের সেই স্থানেই বেতন দিব।

অনন্তর নৌকারোহণে তাঁহাদের সহিত পরকাল শ্বেতাচলে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ দেবতা পদ্মলোচনকে সকলে প্রণামপূর্ব্বক তীর্থ-প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। পরে রাজমিস্ত্রীগণের সমস্ত বেতন মিটাইয়া দিয়া সকলে আসিয়া নৌকায় উঠিলেন। অনন্তর নাবিকগণ পরকালকে একখানি ভেলায় উঠাইয়া গভীর আবর্ত্তপূর্ণ কাবেরীর নদীতে রাজমিস্ত্রীদের নৌকাখানি ডুবাইয়া দিলে তাঁহারা কাবেরী অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া পরমপদে প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর শিল্পীগণের আত্মীয়েরা আসিয়া পরকালকে বলিল, আপনি আমাদের আত্মীয়গণকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করিয়াছেন।

পরকাল বলিলেন, আমি ক্ষুদ্র কীটানুকীট, কাহাকেও হত্যা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। মানুষ কালে উৎপন্ন হয় কালের দ্বারাই জীবিত

থাকে আবার কাল পূর্ণ হইলে কলিই তাহাদিগকে পরলোকে লইয়া যায়, তোমরা আমায় বৃথা দোষ দিতেছ।

তখন তাহারা বলিল, আমাদের আত্মীয় রাজমিস্ত্রীগণ এতদিন ধরিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিল, সেই বেতন আমাদের দিন।

পরকাল উত্তর করিলেন, আমি তাহাদিগকে সমস্ত বেতন দিয়াছি, আমার কথায় যদি বিশ্বাস না করিতে পার তাঁহারা বিষ্ণুপদ হইতে আসিয়া সেকথা যদি তোমাদের বলেন, তাহা হইলে আমার বাক্য তো বিশ্বাস করিতে পারিবে? তোমরা আত্মীয়গণের যথাবিধি অগ্নিসংস্কারাদি কর। তাহারা তাহাই করিল।

পরে পরকাল স্নান করিয়া আকাশপানে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া শিল্পীগণকে আহ্বান করিলেন। তৎক্ষণাৎ বিমান আরোহণে পরমপদগত শিল্পীসকল আকাশে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে কলিহন্! আপনার কৃপায় আমরা অনাদি মায়াকল্পিত সংসার হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত হইয়া পরম আনন্দময় ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছি, আপনাকে প্রণাম।

অনন্তর তাঁহারা আত্মীয়গণকে সম্বোধন করত বলিলেন, তোমরা তুচ্ছ ধনের জন্য কেন ইঁহার সহিত কলহ করিতেছ, ইনি আমাদের দেয় বেতন অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ধনদান করিয়াছেন। ইঁহার মত কৈঙ্কর্য্যনিষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণ প্রধানভক্ত জগতে আর নাই। তোমরা যদি ইহ পরকালে সুখলাভ করিতে চাও তাহা হইলে ইঁহার সেবা কর। তত্রস্থ জনমণ্ডলী এই সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। পরকাল যে সামান্য মানব নহেন ইহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

অনন্তর তিনি ভগবদাদিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণরূপ কৈঙ্কর্য্য ও মন্দিরের শোভা সম্পত্তি বর্দ্ধনরূপ কৈঙ্কর্য্য পঞ্চগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রীরঙ্গনাথ তাহা শুনিয়া পরকালকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তিনি দুইটী বর চাহিলেন; প্রথম বর—শঠকোপ যে তামিল বেদ রচনা করিয়াছেন, প্রতিবৎসর একবার করিয়া শ্রীরঙ্গমে আপনার মন্দিরে যেন পঠিত হয়। উহার নাম 'অধ্যয়নোৎসব' হইবে। আর আমাদের পরমাচার্য্য শঠকোপ স্বামীর আত্মা যেন তাহা দর্শন করিবার জন্য এখানে আসেন।

এখনও পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে তিরুনগরী হইতে আচার্য্য শঠকোপের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীরঙ্গমে আনয়ন করিয়া তৎসমক্ষে অধ্যয়ন-উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীরঙ্গনাথ বলিলেন, তথাস্তু! আর কি চাও বল। পরকাল প্রার্থনা

করিলেন—আপনার দশ অবতার দেখিতে ইচ্ছা হয়। শ্রীরঙ্গনাথ বলিলেন 'তুমি আমার দক্ষিণ মন্দির তার্ক্ষ্যবিন্দু নামক স্থানে আছে ইহা তিরুপুরুক্সুদি নামে বিখ্যাত। তথায় গেলে তুমি তাহা দেখিতে পাইবে। সেখানে ইঁহাদের শ্রীবিগ্রহ আছেন।"

শ্রীভগবানের আদেশে পরকাল সেই ভদ্রাশ্রমে গমন করিলেন। তথাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। সেই সিন্ধুনদের তীরে কুমুদবল্লী সহ ভগবৎ কৈঙ্কর্য্য করিতে লাগিলেন। দশাবতার প্রত্যক্ষ করত কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি ১০০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। শেষ জীবন সস্ত্রীক ভগবদ্ধ্যানেই অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবযান্ মার্গে পরমপদে গমন করিয়া আপনার স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। দেববালা কুমুদবল্লীও বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়া পরমানন্দে কৈঙ্কর্য্য করিতে লাগিলেন।

অতঃপর একদিন শ্রীভগবান রঙ্গনাথ জ্যোতিঃশরণকে বলিলেন, জ্যোতিঃশরণ! পরকালের সহিত মিলিত হইয়া আমার যথেষ্ট কৈঙ্কর্য্য করিয়াছ, দেহান্তে পরমপদে গমন করিবে। উপস্থিত তোমার গুরু পরকালের জন্মস্থান তিরুকাক্কইলুর নামক স্থানে গমন করত বলিয়ানের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহার কৈঙ্কর্য্য নিরত হও। নিত্য নৈমিত্তিক পূজার ব্যবস্থা কর। ভগবদাদেশে সস্ত্রীক জ্যোতিঃশরণ তথায় যইয়া পরকালের শ্রীবিগ্রহের সেবা করিয়া দীর্ঘকাল ধরাধামে অবস্থান করত অন্তিমে অর্চ্চিরাদি মার্গে পরমপদে প্রবিষ্ট হন্।

—০—

॥ শ্রীভগবান রামানুজাচার্য্য ॥

নমামি রামানুজ পাদপঙ্কজং
বদামি রামানুজ নাম নির্ম্মলম্।
স্মরামি রামানুজ দিব্যবিগ্রহম্
করোমি রামানুজ দাস দাস্যম্॥

দ্রাবিড় দেশে ত্রিলোকবিখ্যাত ভূতপুরী বলিয়া একটী নগরী ছিল, তাহা শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রীতিকরী। তথায় বহু ধনধান্যসম্পন্ন ধনবানগণ ও বেদবিদ্যাবিশারদ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণসমূহ বাস করিতেন। নাগ পুন্নাগ, বকুল অশ্বত্থ কপিত্থ চন্দন অগুরু আম্র বিল্ব কোবিদার খর্জ্জুর জম্বু আমলকী দাড়িম্ব তাল তমাল পনস নারিকেল বট প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে নগরী শোভিতা। বাপী কূপ তড়াগ, পঙ্কজ শোভিত সরোবর সমূহ ও স্থানে স্থানে পুষ্পোদ্যান এবং অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল, বহু নরনারী সমাকুল সে নগরীর শোভা শতগুণ সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল।

ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠ ধ্বনিতে ভূতপুরী মুখরিত থাকিত, তথাকার অধিবাসিগণ পরস্পর প্রীতিযুক্ত হইয়া আনন্দিতমনে বাস করিতেন। দেবালয়ে নিত্য প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সয়াহ্নে আরত্রিক হইত, সেই কাংস্য ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি বহু বাদ্যধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব আকার ধারণ করত তথাকার অধিবাসিবৃন্দের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত। ভগবৎ স্মৃতিতে তাহাদের প্রাণ পূর্ণ করিয়া দিয়া সেই মঙ্গল নিনাদ আকাশের কোলে মিশিয়া যাইত।

সেইস্থানে সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সদাচার সমাযুক্ত সত্যধর্ম্মপরায়ণ দেব দ্বিজাদির শুশ্রূষানিরত মহাভাগবত হারীত বংশোদ্ভব কেশব নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী কান্তিমতীও সুশীলা; পতিসেবা ও অতিথি সেবা তাঁহার ব্রত ছিল। সমস্ত সদ্‌গুণ কান্তিমতীতে আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছিল। সন্তানাদি কিছু হয় নাই, ভগবৎসেবা, ভগবৎধ্যান লইয়া উভয়ে বহুক্ষণ থাকিতেন। একবার চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে মহোদধি-স্নান করিবার জন্য সস্ত্রীক কেশব গমন করেন। সমুদ্রে ও কৈরবিনীতে স্নান পূর্ব্বক পার্থসারথিকে প্রণাম করত পুত্রপ্রার্থনা ও পুত্রকামনায় তথায় যথাবিধি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে পার্থসারথি প্রীত হইয়া স্বপ্নে দর্শন দান করত বলেন, আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। এই অপূর্ব্ব স্বপ্নদর্শনে আনন্দিতচিত্তে তাঁহারা ভূতপুরীতে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর কিছুদিনের মধ্যেই কান্তিমতী গর্ভবতী হইলেন। কেশব যাজ্ঞিকের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি দীন দুঃখী ও ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করিলেন।

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চম্যাং গুরুবাসরে।
মধ্যাহ্নে কর্কটে লগ্নে নক্ষত্রে রুদ্রদৈবতে॥

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে গুরুবারে, মধ্যাহ্নে কর্কট লগ্নে, আর্দ্রা নক্ষত্রে যেমন কৌশল্যার গর্ভ হইতে শ্রীরামচন্দ্র, অদিতির গর্ভ হইতে বামন, দেবকীর গর্ভ হইতে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, তদ্রূপ ফণিরাজ অনন্তদেব কান্তিমতীর গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কান্তিমতী সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন পুত্রকে দর্শন করত অতীব আনন্দিতা হইলেন। কেশব যাজ্ঞিকও সুন্দর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিতমনে ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করেন। ভূতপুরীতে গৃহে গৃহে আনন্দ উৎসব আরম্ভ হয়, কেশবদেবের অলৌকিক রূপসম্পন্ন পুত্ররত্ন দর্শনে সকলেই পরম প্রীতিযুক্ত হইয়া 'এ বালক সামান্য বালক নহে কোন দেবশিশু আবির্ভূত হইয়াছেন' ইহাই মনে করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

অনন্তর শ্রীশৈলপূর্ণাচার্য্য ভগিনীর সন্তান হইয়াছে শ্রবণ করিয়া আনন্দিতান্তঃ-

করণে সত্বর ভূতপুরীতে আগমন পূর্ব্বক অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন বালককে দর্শন করত 'এটী মানব শিশু নহে' ইহা ভাবিয়া হৃষ্ট হইলেন। দ্বাদশ দিনে কেশব যাজ্ঞিক বন্ধুগণের সহিত তাঁহার রামানুজ নামকরণ করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে লক্ষ্মণও বলিতেন। যথাকালে অন্যান্য সংস্কার সকল করত গর্ভাষ্টমে উপনীত করিয়া তাঁহাকে স্বয়ং বেদাদি শাস্ত্র সকল শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। রামানুজ আপনার অলৌকিকী প্রতিভাবলে বেদ পুরাণ, সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জল দর্শন, বৈশেষিক ন্যায়দর্শন ও পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্র সমুদয় অধ্যয়ন করিয়া সকলের নিকট যশোভাজন হইয়াছিলেন। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কেশব যাজ্ঞিক তাঁহার সমাবর্ত্তন করাইয়া বিবাহ দেন। কান্তিমতী স্বামী পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সুখে সংসার করিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিগণ তাঁহার শুভাদৃষ্টের প্রশংসা প্রায়ই করিত। এরূপ স্বামীপুত্র লাভ বহু জন্মান্তরের তপস্যা ভিন্ন হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরু

[শ্রীতারক কৃষ্ণ চৌধুরী]

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী শক্তির স্পন্দন—
গুরুশক্তি করে খেলা আকাশে বাতাসে।
তাহার রূপেতে ওই বিশ্ব বিমোহন
জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মাঝে তারই রূপ ভাসে।

জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়
অশান্ত হৃদয়ার্ণবে তুমি কর্ণধার।
প্রাণ মম আজ তব অনুভূতিময়
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শুধু তোমারই ঝঙ্কার!

—০—

পুস্তক পরিচয়

ঈশ্বরচিন্তন ও পূজন : শ্রীমৎ দণ্ডি স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রণীত; প্রকাশিকা শ্রীমতী মনোরমা সিংহ, পাটনা বাজার, মেদিনীপুর। মূল্য ১।০ টাকা।

ভারতের এই ভীষণ দুর্দিনে, যখন ধর্ম লুপ্তপ্রায়, অধর্মের অট্টহাসে চারিদিক নিনাদিত, এখনও কত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইতেছে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দণ্ডি স্বামী শিবানন্দ মহারাজ এইরূপ একজন মহাপুরুষ। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে দোল পূর্ণিমার দিন তিনি মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল উপেন্দ্রনাথ মিশ্র। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া একটি টোলের অধ্যাপক হন। তাঁহার বিবাহ হয় কিন্তু অল্পদিন পরে তাঁহার পত্নী-বিয়োগ হয়। ইহার পর ২৯ বৎসর বয়সে তিনি, গৃহত্যাগ করেন। তিনি সমগ্র ভারতের তীর্থ দর্শন করিয়া তিব্বত গিয়া মানসসরোবরে এক সাধুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। গঙ্গোত্তরীর কিছু উপরে গুহার মধ্যে তিনি আশ্রম স্থাপন করেন এবং যোগ অভ্যাস করেন। শীতকালে তিনি সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিতেন। ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি লছমনঝোলা ও গরুড় চটির মধ্যে গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের সময় তিনি পূর্ব হইতে তাঁহার শিষ্যদিগকে জানাইয়াছিলেন।

স্বামীজি যে কয়টি ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন—যেগুলি তাঁহার শিষ্যগণ প্রকাশিত করিতেছেন তাহার মধ্যে "ঈশ্বরচিন্তন ও পূজন" একটি। ঈশ্বরচিন্তনের প্রথমাঙ্কে ঈশ্বর, জীব ও জগতের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বর-চিন্তনের দ্বিতীয়াঙ্কের নাম "প্রণবাভ্যন্তরে ঈশ্বর চিন্তন।" গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ ঈশ্বর পূজন অংশে বাহ্য ও মানস পূজার কথা বলা হইয়াছে। শাস্ত্র হইতে বহু উৎকৃষ্ট অথচ সাধারণে অজ্ঞাত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্বামীজি তাঁহার উক্তিগুলি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার ভাব সকল ওজস্বিনী ভাষায় প্রকাশ হওয়াতে হৃদয় মধ্যে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়। আমরা নিম্নে পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—"যদি মায়ামুক্ত হইতে চাও, ভগবানের শরণাগত হও। সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে শয়নে স্বপনে সর্ব্বদা সর্বত্র ভগবানের প্রতি লক্ষ্য কর। তাঁহার অর্চনাতে নিরত হও। প্রেমপুষ্পে তাঁহার পূজা কর। তাঁহার প্রতি প্রেম কর। শান্তি পাইবে। সুখ পাইবে। আনন্দ পাইবে।" কি ভাবে পূজা করিতে হইবে এ বিষয়ে স্বামীজি বলিতেছেন, "হৃদয়ের কাম ক্রোধাদি দোষ সকল দূরীভূত করিয়া, প্রেম ভক্তির অমৃতরসে হৃদয় আপ্লুত করিয়া" ঈশ্বরের পূজা করিতে হয়।

অহিংসা প্রথমং পুষ্পং দ্বিতীয়ং করণগ্রহঃ
তৃতীয়কং ভূতদয়া চতুর্থং ক্ষান্তিরেব চ।
শমোদমস্তু দ্বে পুষ্পে ধ্যানঞ্চৈব তু সপ্তমম্
সত্যঞ্চৈবাষ্টমং পুষ্পম্ এতৈ স্তুষ্যতি কেশবঃ॥

পদ্মপুরাণ—পাতাল—৫৩

অহিংসা প্রথম পুষ্প, ইন্দ্রিয়সংযম দ্বিতীয় পুষ্প, দয়া তৃতীয় পুষ্প, ক্ষমা চতুর্থ পুষ্প, অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুষ্প, ধ্যান সপ্তম পুষ্প, সত্য অষ্টম পুষ্প, এই সকল পুষ্পে কেশব তুষ্ট হন। আড়ম্বরপূর্ণ ভক্তিহীন পূজায় ভগবান সন্তুষ্ট হন না। "আমার ভক্তির পূজায় বিশেষ কোনও উপকরণ আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। সম্মুখে পত্র পুষ্প ফল ও জল যাহা কিছু পাওয়া যাইবে তদ্দ্বারাই আমার পূজা করিলে আমি সাতিশয় প্রীত হইয়া থাকি।"

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২।৪১

"আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, সূর্য্যচন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ, বিবিধ প্রাণী, বিভিন্ন দিক, বৃক্ষলতাদি, নদী, সমুদ্র—যাহা কিছু আছে—সকলই শ্রীহরির শরীর ভাবিয়া অনন্যমনে প্রণাম করিবে।"

রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টানৃতাদিনা।
হিংসাদিরহিতং কর্ম যত্তদীশ্বরপূজনম্॥

—জাবালদর্শনোপনিষৎ

"হৃদয় যদি রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মুক্ত হয়, বাক্য যদি মিথ্যাদি দুষ্ট না হয়, কর্ম যদি হিংসাদি দোষ রহিত হয়,—তাহাই ঈশ্বরের পূজা।"

প্রণব বা ওঁকার ঈশ্বরের নাম। ওঁকার জপ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করা যায়। যাহার ওঁকার জপ করা নিষেধ সে রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা যে কোনও নাম জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

কর্ম জ্ঞান যোগ—বিভিন্ন পথে ঈশ্বরকে পূজা করিবার উপায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—**শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়**

সংবাদ

বেলুন (হুগলি) জয়গুরু-আশ্রমে ১৩৪৭ সাল হইতে প্রতি বৎসরেই দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, দোলযাত্রা প্রভৃতি এবং জয়গুরু সম্প্রদায়ের উৎসবসকল সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতেছে। এই উপলক্ষ্যে নামকীর্ত্তন, নরনারায়ণ-সেবাদির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীপদ্মলোচন চৌধুরী ও শ্রীদাশরথি মালিকের শুভ-প্রচেষ্টায় এই আশ্রমে গত চৈত্রে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীমঙ্গলাচরণ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আশ্রমসেবকগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে নাম প্রচার করেন।

এই আশ্রম পরিচালনা করেন শ্রীমৎ অসীমানন্দ কিঙ্কর।

* * * *

১৩৫৯ সাল হইতে প্রত্যহ রাণাঘাট-সিদ্ধেশ্বরীতলায় শ্রীমণিমোহন পালের বাটীতে বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত নামকীর্ত্তন হয়। স্থানীয় বহু নরনারী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

সম্প্রদায়ের উৎসবগুলি শ্রীযুক্ত পালের বাসভবনে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

* * * *

২৩শে বৈশাখ অরুণোদয় হইতে ২৬শে অরুণোদয় পর্য্যন্ত গলসী (বর্ধমান) রামকমলস্মৃতি-হরিসভার দ্বিতীয় বার্ষিক মহোৎসব পালিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে পূজাপুষ্পাঞ্জলি, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। চব্বিশপ্রহরব্যাপী নামযজ্ঞ হয়। মীরহাট জয়গুরু সম্প্রদায়; রসুলপুর—অনাথ সমিতি এবং ব্রজধামের জনৈক শ্রীবৈষ্ণব এই যজ্ঞে সহযোগিতা করেন। স্থানীয় বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

দেবযানের গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ একটি দেবযানের গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

বিনীত

কর্ম্মাধ্যক্ষ

দেবযান—মগরা (হুগলি)

॥ শ্রীঃ ॥

নবম বর্ষ,
দ্বাদশ সংখ্যা

শ্রাবণ
১৩৬৪

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ়মানসঃ।
নামযুক্তঃ প্রিয়োঽস্মাকং নামযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ ॥ শ্রীমতে রামানন্দায় নমঃ ॥

শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী

॥ চতুর্থ প্রকরণ,—পঞ্চদশ উচ্ছ্বাস ॥

[শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ]

॥ শ্রীরামঃ শরণং মম ॥

গুর্বর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ
পানিস্পর্শাক্ষমেণোন্মৃজিত পথিরুজোযোহরীন্দ্রামুজেন।
বৈরূপ্যাৎ শূর্পনখ্যা প্রিয়বিরহরুষা রোপিত ভ্রূবিজৃম্ভ
ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধ সেতুঃ খলদব দহনঃ কোশলেন্দ্রোঽবতান্নঃ ॥

কনকনিকষভা সা সীতয়ালিঙ্গিতাঙ্গো
নবকুবলয়দাম শ্যামবর্ণাভিরামঃ।
অভিনব ইব বিদ্যুন্মণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ
শময়তু মম তাপঃ সর্ব্বতো রামচন্দ্রঃ ॥

বৃথালাপং বদন্ ব্রীড়া যেষাং নায়াতি সত্বরম্।
হিত্বা শ্রীরামনামেদং তে নরাঃ পশবঃ স্মৃতাঃ।
স্মর্ত্তব্যং হি সদা রাম নাম নির্ব্বাণ দায়কম্।
ক্ষণার্দ্ধমপি বিস্মৃত্য যাতি দুঃখালয়ং জনঃ॥

—লিঙ্গপুরাণ

এই শ্রীরামনাম ত্যাগ করে বৃথা কথোপকথনে যাদের সত্বর লজ্জা না আসে সে মানবগণ পশু বলে কথিত হয়। নির্ব্বাণপ্রদ রামনাম নিশ্চিত সতত স্মরণ করা কর্ত্তব্য, অর্দ্ধক্ষণ বিস্মৃত হলে নর দুঃখের আগারে গিয়ে উপস্থিত হয়।

রামনাম না কর্‌লে পশুর মধ্যে গণ্য হয়। সবাই তো রাম উপাসক নয়?

যে যাঁর উপাসক তাঁর নামই রাম নামের দ্বারা বলা হয়েছে: আরও—

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনা পশুভিঃ সমানাঃ॥

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারিটী পশুগণের ও মানব সকলের সমান, ধর্ম্ম হ'ল তার মধ্যে বিশেষ অর্থাৎ কে পশু কে নর তা চেনবার উপায়, ধর্ম্মহীন নর পশুর সমান। চার পা, সিং বা লেজ যদি না-ও থাকে তথাপি ধর্ম্মহীন নর পশু।

ধর্ম্ম কাকে বলে?

ধৃ+ম, ধরতি বিশ্বং যঃ স ধর্ম্মঃ। যিনি সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন তিনি ধর্ম্ম। "বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মহ্যধর্ম্মস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ"—শ্রীমদ্ভাঃ। বেদে যে আচার কথিত হয়েছে তা ধর্ম্ম তদ্‌বিপরীত অধর্ম্ম।

বেদ আর কটা-লোক জানে?

বেদস্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ —মনু॥

বেদ, স্মৃতি, সদাচার, যে আচরণে আপনার হৃদয় প্রসন্ন হয় এই চারিটিকে ভগবান্ মনু সাক্ষাদ্ ধর্ম্মের লক্ষণ বলেছেন।

বিহিত ক্রিয়য়াসাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসোগুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্য স গুণোঽধর্ম্ম উচ্যতে॥

—ধর্ম্মদীপিকা।

মানবের বিহিত ক্রিয়া সাধ্যগুণের নাম ধর্ম্ম আর তাহা ভিন্ন অধর্ম্ম, পুরাণ মতে যার দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয়।

মনু অন্যত্র বলেছেন যাহা রাগদ্বেষহীন সাধুগণ একান্ত হৃদয়ে সাধন করেন —তাহা ধর্ম।

হারীত বলেছেন,—ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণম্। শ্রেয় যার সম্যক অভিপ্রেত বা উপদিষ্ট তাহাই ধর্ম্ম। শ্রেয়ের অর্থ যাহা জগতের কল্যাণ-জনক, তাঁর মতে শ্রুতি প্রমাণ।

তা হলে শাস্ত্রবিহিত আচারের নাম ধর্ম্ম ?

হাঁ, এই শাস্ত্রাচারই বিশ্বকে ধরে রেখেছে। যে যত আচারহীন সে তত ইহজন্মে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় এবং দেহান্তে দুর্গতি ভোগ করে।

ধর্ম্মের লক্ষণ কি ?

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধং দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ —মনু।

ধৈর্য্য, ক্ষমা, বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ, অচৌর্য্য বাহ্য ও আভ্যন্তর শৌচ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ শাস্ত্রগ্রাহিণী সদ্‌বুদ্ধি অধ্যাত্মবিদ্যা বাক্য মনের যাথার্থ্য, অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

এদের লক্ষণ ব্যাখ্যা করে বল।

ধৃতি ; সাধারণতঃ রোগ শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা মানুষমাত্রকেই ভোগ কর্ত্তে হয় যে অবস্থা আসুক না কেন ধৈর্য্য ধীরতা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করার নাম ধৃতি। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—চিত্তের একাগ্রতা হেতু বিষয়ান্তর গ্রহণ না করে যে ধৃতির দ্বারা মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে তাহা সাত্ত্বিকী। যে ধৃতির দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ কাম প্রধান ভাবে ধারণ করে ত্যাগ করে না তৎপ্রসঙ্গে ফলাকাঙ্ক্ষী হয় তাহা রাজসী।

দুষ্ট মেধাযুক্ত পুরুষ যে ধৃতির দ্বারা স্বপ্ন ভয় শোক বিষাদ গর্ব্বাদি ত্যাগ করতে পারে না তাহা তামসী ধৃতি॥

সমস্ত অবস্থাতে ব্যাকুল না হইয়া প্রসন্ন থাকাই ধর্ম্মাঙ্গ ধৃতি।

ক্ষমা—সামর্থ্য থাকতেও অপকারীর অপকার না করার নাম ক্ষমা।

বাহ্যেন্দ্রিয়—বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এদের নিগ্রহের নাম দম।

বাক্য, হস্ত, পদ, জননেন্দ্রিয় এ চারিটীর নিগ্রহ না হয় হলো—পায়ুর নিগ্রহ কি করে হয় ?

সাত্ত্বিক ও অল্প আহারের দ্বারা পায়ুর নিগ্রহ হয়ে থাকে।

অস্তেয় অর্থে কায়মনোবাক্যের দ্বারা কারও কিছু অপহরণ না করা, আর ভাব চুরী অর্থাৎ আমি অসাধু লোককে দেখাই আমি বড় সাধু, এ চুরী বড় ভীষণ চুরী, জন্ম জন্মান্তর এর দণ্ডভোগ কর্‌তে হয়।

শৌচ, মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা বাহ্য ও সমানে মৈত্রী, অধমে করুণা, শ্রেষ্ঠে মুদিতা ও দুর্জ্জনে উপেক্ষা দ্বারা আন্তর শুদ্ধির নাম শৌচ।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, শ্রোত্র ত্বক চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের যথেচ্ছগতি নিবারণ করে ভগবৎ পথে চালিত করা।

ধী, শ্রীভগবান গীতায় এই বুদ্ধির-ও ত্রিবিধ ভেদ বলেছেন, যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, অধর্ম্মে নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয়-অভয়, বন্ধ-মোক্ষ জানা যায় তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।

যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম কার্য্য ও অকার্য্য প্রকৃতরূপে বিদিত হওয়া যায় না, তাহা রাজসী।

যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে সমস্ত অর্থকে বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, তমের দ্বারা আবৃত সেই বুদ্ধি তামসী বুদ্ধি।

"তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে।"

তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম যাহা বন্ধের হেতু হয় না আর যে বিদ্যা মুক্তির হেতুভূতা তাহাই প্রকৃত বিদ্যা। ভগবৎ ভক্তি বৃদ্ধিকারিণী আধ্যাত্মিকী বিদ্যাই ধর্ম্ম লক্ষণের অন্তর্গতা বিদ্যা।

সত্য,—বাক্য মনের যাথার্থ্য এবং জগতের যাতে হিত হয় তাই সত্য। শ্রীভগবান বলেছেন "সত্যঞ্চ সমদর্শনম্" ভগবৎ আলোচন, প্রিয়-সত্য-বাক্য—সত্য।

অক্রোধ—ক্রোধের কারণ উপস্থিত হলেও নির্ব্বিকারে অবস্থান। এই অষ্টবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ। যে পুরুষে ইহা সতত সুপ্রতিষ্ঠিত তিনিই ধার্ম্মিক।

ওরে বাবা! 'ধার্ম্মিক ধার্ম্মিক' শোনা যায় ধার্ম্মিক হওয়াতো সহজ কথা নয়!

ধর্ম্মের পথ আটটী—

ইজ্যাধ্যয়ন দানানি তপঃ সত্যং ধৃতি ক্ষমা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম্মশ্চাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥

যাগ অধ্যয়ন দান তপস্যা সত্য ধৃতি ক্ষমা আর অলোভ ধর্ম্মের এই আটটী মার্গ। তার মধ্যে আগেকার চারিটি শঠ ব্যক্তি অহঙ্কার প্রকাশ করেও করতে পারে, কিন্তু সত্য ধৈর্য্য ক্ষমা অলোভ মহাত্মাতেই অবস্থান করে।

মৎস্যপুরাণে ধর্ম্মের মূল বলেছেন—

অদ্রোহশ্চাপ্য লোভশ্চ দমোভূতদয়াতপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্য মনুকোশ ক্ষমা ধৃতিঃ।
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্॥

অহিংসা অলোভ দম ভূত দয়া তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য সত্য অনুকম্পা ক্ষমা ধৃতি সনাতন ধর্ম্মের এই দুষ্প্রাপ্য মূল।

ধর্ম্মের কথা যা বল্‌লে তাতে বুঝতে পাচ্ছি মাত্র ধর্ম্মাচরণের দ্বারাই মানুষ কৃতার্থ হয়।

আরো শোন, পদ্মপুরাণ ধর্ম্মের লক্ষণ বলেছেন—

পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতা পিত্রোশ্চ পূজনম্।
শ্রদ্ধা বলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণং॥

সৎপাত্রে দান, সুবুদ্ধি, মাতা পিতা ও গুরুগণের পূজা, শ্রদ্ধা, গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাস, বৈশ্বদেব বলি প্রভৃতি পঞ্চযজ্ঞ, আর গোগ্রাস দান—এই ষড়্‌বিধ ধর্ম্মের লক্ষণ।

পদ্মপুরাণ ধর্ম্ম কিভাবে উপার্জ্জন কর্‌তে হবে তাই বল্লেন।

হাঁ, ধর্ম্মের আর একটি বিশেষ লক্ষণ অহিংসা।

"অহিংসা লক্ষণা ধর্ম্মো হিংসা চাধর্ম্ম লক্ষণা।" —মহাভারত।

শ্রীভগবান রামানন্দ স্বামী বলেছেন—

"দানং তপস্তীর্থ নিষেবণং জপো
ন চাস্ত্যহিংসা সদৃশং সুপুণ্যং"

দান, তপস্যা, তীর্থ, সেবা, জপ—অহিংসার সমান সুপুণ্যদায়ক নহে, এইজন্য শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্মনিষ্ঠ ধর্ম্মবুদ্ধির জন্য হিংসা ত্যাগ করবে। ১১২॥

'শ্রয়ন্তি ধর্ম্মাংস্তু তথাবিহীনান্
সুবক্রগাঃ সিন্ধু মিবাপিনদ্যঃ।'

সুবক্রগামিনী নদী যেরূপ সমুদ্রে মিলিত হয় তদ্রূপ নিখিল ধর্ম্ম স্বতঃই হিংসাবিহীন জনগণকে আশ্রয় করেন—জন্তুর হিংসাকারী কাষ্ঠস্থ বহ্নির ন্যায় চরাচরস্থিত হরিরই ঘাতক। ১১৩॥

উদার বুদ্ধিবিশিষ্ট দয়ালু পুরুষ, সর্ব্বত্র পরমাত্মা ব্যাপ্ত হয়ে আছেন সকলেই পূজ্য এই মনে ক'রে—অধোগতির কারণ জল-স্থল-উৎপন্ন জন্তুর, হিংসার দ্বারা প্রাপ্ত মাংস, জন্মমরণের ভয় নিবৃত্তির জন্য ত্যাগ করবে॥১১৪॥

শ্রুতিও বলেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি।"—সর্ব্বভূতকে হিংসা করবে না।

তাহ'লে হিংসাবিহীনকে স্বতন্ত্ররূপে কোন সাধনা করতে হয় না, সমস্ত ধর্ম্ম এসে তাঁকে আশ্রয় করেন ?

হাঁ, পাতঞ্জল দর্শনেও কথিত হয়েছে "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" অহিংসার প্রতিষ্ঠা হলে হিংস্র জন্তুগণও তার কাছে হিংসা করবে না। পূর্ব্বেকার মুনি-ঋষিদের আশ্রমে সিংহ ব্যাঘ্র হরিণ প্রভৃতি সব একসঙ্গে বিচরণ করতো।

অন্যত্র কথিত হয়েছে—

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনু যাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি।

মরণেও যিনি অনুগমন করে সেই ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ, অন্য সমস্ত দেহের সহিত নাশ হয়।

অধার্ম্মিক হিংসারত মানব ইহলোকে সুখী হয় না। অধর্ম্মাচরণ সদ্যঃ ফল দান না করলেও তার ফলভোগ অনিবার্য্য।

ধর্ম্মহানি ন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ হি সর্ব্বেষাং সুখ দুঃখোপপাদকৌ॥

ধর্ম্মহানি করা কর্ত্তব্য নহে, ধর্ম্ম সঞ্চয় করা উচিত, ধর্ম্মের ফলে সুখ ও অধর্ম্মের আচরণে দুঃখভোগ হয়ে থাকে।

পরলোকের সহায়ের জন্য পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি কেহ থাকে না। থাকেন একমাত্র ধর্ম্ম। "ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্।"

প্রাণী একাকী জন্মায় এককই নাশ হয়, সুকৃত বা দুষ্কৃত একাকীই ভোগ করে।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্র সমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥

কাষ্ঠ বা ইষ্টকের ন্যায় মৃতদেহকে মাটীতে ফেলে রেখে বান্ধবগণ বিমুখ হয়ে গমন করে, কেবল ধর্ম্মই তার অনুগমন করে থাকেন।

সেই শেষের দিনের সহায়ের জন্য নিত্যধর্ম্ম উপার্জ্জন করবে, ধর্ম্মের সহায়েতে "তমস্তরতি দুস্তরম্" দুস্তর তম উত্তীর্ণ হয়।

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এব চ।
অহিংসয়াচ ভুতানামমৃতত্বায় কল্পতে॥

শ্রুতিস্মৃতি কথিত অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ভুতগণের অহিংসার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়ে থাকে।

বেদ স্মৃতি সদাচার এই হ'লো ধর্ম্ম, এই ধর্ম্ম সকলের পালন করা কর্ত্তব্য, এইতো ?

শাস্ত্র—বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ইত্যাদির বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করেছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পালনীয় ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শাস্ত্রে কথিত হয়েছে। তার মধ্যে—

"ঈশ্বরারাধনন্তু সর্ব্বেষাং বর্ণানাং আশ্রমানাঞ্চ সাধারণো ধর্ম্মঃ॥"

ঈশ্বর উপাসনা সমস্ত বর্ণের এবং আশ্রম চতুষ্টয়ের সাধারণ ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়, স্ত্রী এবং অন্য হীনবর্ণ সকলেরই ত ঈশ্বর আরাধনা করা কর্ত্তব্য ?

প্রাণীমাত্রেরই ভগবদারাধনা কর্ত্তব্য। ভগবান মনু বলেন,—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতৎ সামাসিকং ধর্ম্মং ধর্ম্মং সর্ব্ববর্ণেঽব্রবীন্মনুঃ॥

অহিংসা সত্য অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সমস্ত বর্ণের ইহা সাধারণ ধর্ম্ম।

শ্রীভগবান বলেছেন—

অহিংসা সত্যমস্তেয় কামক্রোধমলোভতা।
ভূত প্রিয়হিতেহাচ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥

অহিংসা সত্য অস্তেয় কাম ক্রোধ লোভশূন্যতা ভূতগণের প্রিয় ও হিত ইচ্ছা, ইহা সমস্ত বর্ণের ধর্ম্ম।

তা'হলে সকল বর্ণের সংযমই সাধনা ?

এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই ! আচ্ছা, আরও শোন ধর্ম্ম থাকেন কোথায়—

বৈষ্ণবেষু চ সর্ব্বেষু যতিষু ব্রহ্মচারিষু।
প্রতিব্রতাসু প্রাজ্ঞেষু বানপ্রস্থেষু ভিক্ষুষু॥ —ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

সমস্ত বৈষ্ণবে, যতিগণে, ব্রহ্মচারিসমূহে, পতিব্রতা সকলে, প্রাজ্ঞ বানপ্রস্থ ও নিখিল ভিক্ষুতে। ধর্ম্মশীল রাজবর্গে সাধুবৃন্দে সদ্‌বৈশ্য জাতি সমুদয়ে, দ্বিজসেবী শূদ্র নিচয়ে, সৎসংসর্গস্থিত মানবনিকরে, এই সবস্থলে ধর্ম্মরাজ বিরাজ করেন। কথিত —পুণ্যতম জনগণ যুগে যুগে ধর্ম্মের আধার। আরও

অশথবটবিল্বেষু তুলসীচন্দনেষু চ।
দেবার্হেষু চ পুষ্পেষু বিদ্যমানোঽসি শাখিষু॥

অশথ বট বিল্ব বৃক্ষে তুলসী চন্দন দেবযোগ্য পুষ্পনিচয়ে পবিত্র বৃক্ষসকলে। দেবালয়ে তীর্থে সাধুগণের গৃহে বেদ বেদাঙ্গ শ্রবণানুরাগী জনগণে, সৎসভায় যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের গুণনাম শ্রবণ কীর্ত্তন হয়, ব্রত পূজা তপস্যা ছায় যজ্ঞ ও সাক্ষিস্থল সকলে দীক্ষা পরীক্ষা শপথ গোষ্ঠ গোষ্পদ গো-গৃহে গোষ্ঠে—ধর্ম্ম অবস্থান করেন।

কৃশতা তে ন ভবিতা ধর্ম্মৈতেষু স্থলেষু।—ব্রহ্ম বৈ কৃতজন্ম খ, ৪২ অঃ

হে ধর্ম্ম এই সকল স্থানে তোমার কৃশতা হবে না।

ধর্ম্মের অনেক কথাই শুন্‌লাম এই ধর্ম্ম আচরণের মূল লক্ষ্য কি ?

শ্রীভগবান্ বলেছেন—

ধর্ম্মোমদ্ভক্তি কৃত্ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্।
গুণেষ্বসঙ্গ বৈরাগ্য মৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদয়ঃ॥ ২৭॥ শ্রীমদ্ভা ১১।১৯

আমার ভক্তিজনক কার্য্য ধর্ম্ম, সর্ব্ব পদার্থের সহিত আত্মার অভিন্ন দর্শন জ্ঞান, গুণে অনাসক্তি বৈরাগ্য, আর 'অণিমাদি' ঐশ্বর্য্য ব'লে অভিহিত হয়। সমস্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হ'ল ভক্তিলাভ। ভক্তিলাভ কর্‌লেই মানুষ কৃতার্থ হয়।

তুমি নামের মহিমা বল।

আদিপুরাণে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে বল্‌ছেন।

রামনাম সদাগ্রাহী রামনাম প্রিয়ঃ সদা।
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন চ মুক্তিঃ কদাচন॥
গায়ন্তি রাম নামানি বৈষ্ণবাশ্চ যুগে যুগে।
ত্যক্ত্বাচ সর্ব্বকর্ম্মাণি ধর্ম্মাণিচ কপিধ্বজ॥
রামনামৈব নামৈব রামনামৈব কেবলম্।
গতিস্তেষাং গতিস্তেষাং গতিস্তেষাং সুনিশ্চিতম্॥

যে সতত রাম নাম জপ করে যার রাম নাম নিয়ত প্রিয় তাকে ভক্তিদান করি, কখনও মুক্তি দিই না। হে অর্জ্জুন, যুগে যুগে বৈষ্ণবগণ সমস্ত কর্ম্ম ও ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে রাম নাম গান করে, রাম নামই, একমাত্র রাম নাম। কেবল রাম নামই, সুনিশ্চিত তাদের গতি তাদের গতি তাদের গতি।

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম বদন্তি মনুষা ভুবি।
তেষাং নাস্তি ভয়ং পার্থ রাম নাম প্রসাদতঃ॥
রাম নাম রতা যত্র গচ্ছন্তি প্রেম সংপ্লুতাঃ।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ স্তুতিভি সহ॥

যারা এ সংসারে শ্রদ্ধা হেলা যে কোন প্রকারে হোক নাম উচ্চারণ করে হে পার্থ, রাম নাম প্রসাদে তাদের কোন ভয় নাই। প্রেম বিগলিত রাম নাম প্রেমীগণ যেখানে যায় সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সাযুয্য প্রভৃতি মুক্তি সকল স্তব কর্‌তে কর্‌তে ত সেই ভক্তগণের অনুগমন করে॥

জয় রাম সীতারাম !

ভবে আসিয়া ভাবে ভাসিয়া
মোহ নাশিয়া মধুনাম,
কাম-কাঞ্চনে ত্রাস-লাঞ্ছনে
সাধ-বাঞ্ছনে মধুনাম।
বল—শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

—•—

সন্তবাণী

১১৬২। যত আবশ্যকতার কম হবে ততই সুখ বাড়বে, এইজন্য মহাত্মা লোক-মহলে না থেকে বৃক্ষতলে জীবন কাটিয়ে দেন।

১১৬৩। বিষয় সকলকে আমি ভোগ করিনি কিন্তু বিষয়সমূহ আমাকেই ভোগ করেছে (কষ্ট দিয়েছে)। আমি তপস্যা করিনি কিন্তু তপস্যা আমাকেই তপস্যা করিয়ে নিয়েছে। কালের অন্ত হয়নি কিন্তু আমারই সমাপ্তি হয়ে গেছে। তৃষ্ণার বার্দ্ধক্য আসে নাই, আমারই বার্দ্ধক্য এসেছে।

১১৬৪। লোক পৃথিবীকে ছাড়ে না, দুনিয়াই তাকে অকর্ম্মা করে ছেড়ে দেয়।

১১৬৫। যে লোক শক্তি সামর্থ্য থাকতে বিষয় সকল ত্যাগ করেন তিনিই প্রসংশার ভাজন হন।

১১৬৬। ঘর-জঞ্জাল সকলে থেকে সর্দী গর্ম্মী এবং শোক তাপ আদি কষ্ট ভোগ করতে হয়। তপস্যাই কেন করো না-হয়, কেন না ঘরের ঝঞ্ঝাট সমূহের দুঃখে কোন লাভ নাই কিন্তু তপস্যার দ্বারা স্বর্গ এবং মোক্ষের প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

১১৬৭। ধনের ধ্যানে যে সুখ পাওয়া যায় তা ক্ষণস্থায়ী এবং মিথ্যা, এজন্য ধনের ধ্যান ত্যাগ করে আশুতোষ ভগবান শিবের চরণ কমল ধ্যান করা উত্তম, যার দ্বারা সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয় এবং অন্তে জন্ম মরণের কলহ হতে মুক্ত হয়ে পরমপদ মোক্ষ মিলে যায়।

১১৬৮। চেহারার উপর বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়ে গেছে, মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, সারা অঙ্গ ঢীলে হয়ে গেছে কিন্তু তৃষ্ণা তো তরুণ হোতে যাচ্ছে।

১১৬৯। যৌবন বৃদ্ধত্বের দ্বারা, আরোগ্য ব্যাধি সকলের দ্বারা এবং জীবন মৃত্যুর দ্বারা গ্রস্ত, কিন্তু তৃষ্ণার কোন উপদ্রবের ভয় নাই।

১১৭০। মনুষ্য নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও জর্জ্জরিত শরীর হলে পরও তৃষ্ণাকে ত্যাগ করে না, এ বড় আশ্চর্য্যের কথা!

১১৭১। অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে, বার্দ্ধক্যে মস্তক সাদা হয়ে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে, হাতে নেওয়া (হস্তস্থিত) লাঠীর শরীর কাঁপছে তবুও মানুষ আশা-রূপী পাত্রকে ত্যাগ করে না।

১১৭২। বন্ধনে কে আছে? বিষয়ানুরাগী।

১১৭৩। বিমুক্তি কি? বিষয় সমূহের ত্যাগ।

১১৭৪। ঘোর নরক কি? আপনার শরীর।

১১৭৫। স্বর্গ কি? তৃষ্ণার নাশ।

১১৭৬। হৃদয়ে কামনাসকলের নিবাস, তাকে সংসার বলে, আর তার সব প্রকারে নাশ হয়ে যাওয়াকে মোক্ষ বলে থাকে।

১১৭৭। যিনি স্পৃহাহীন, যাঁর কামনা কিংবা তৃষ্ণা নাই তিনি মনুষ্য-রূপেই দেবতা।

১১৭৮। যিনি জন্ম মরণ হতে মুক্ত হতে চান তিনি তৃষ্ণা রাক্ষসীর প্রলোভনে আসবেন না, এর চক্রে আবর্ত্তে জড়ালে মনুষ্য বাধ্য হয়ে নীচ হতে নীচ কর্ম্ম করবার জন্য উদ্যত হয়।

১১৭৯। সূর্য্য এবং চন্দ্রকে দিবারাত্র আবর্ত্তিত হতে হয়, একদিন কি একক্ষণও সে ইচ্ছামত আরাম করতে সমর্থ হয় না। তখন আমি কোন্ ছার!

১১৮০। জ্যেষ্ঠগণের দুর্দ্দশা দেখে কনিষ্ঠসমূহের বিপত্তিকালে ক্রন্দন ও বিলাপ না ক'রে বরং সন্তোষ হওয়া উচিত। সংসারে কেউ সুখী নয়।

১১৮১। বিষয়সমূহে যতদিন পর্য্যন্ত ভোগ কর না কেন সে একদিন তোমাকে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিবে, তা'হলে তাকে তুমি স্বয়ংই কেন না ছেড়ে দিবে, তুমি ছাড়লে অত্যন্ত সুখ পাবে আর বিষয় ত্যাগ করলে তোমাকে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে।

১১৮২। বিষয় সকলের সংসর্গে তৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়ে।

১১৮৩। যিনি তৃষ্ণাকে ত্যাগ করেন, তৃষ্ণাকে ঘৃণা করেন, তাকে কাছে আসতে দেন না, তৃষ্ণাও তাঁর কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যায়।

১১৮৪। তৃষ্ণাকে শীঘ্র ত্যাগ ক'রো, পুরাতন হ'লে সে আরও বলবতী হয়ে যাবে, ফের তাকে ত্যাগ করা আপনার শক্তির বা'র হয়ে যাবে।

১১৮৫। পাতা এবং জলের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহকারী ঋষিও যখন স্ত্রী-গণের উপর মোহিত হয়ে গেছেন তখন ঘি-দুধ-ভোজন-পানকারীর আর কি কথা!

১১৮৬। স্ত্রীর দর্শনই এমন যে যার দ্বারা দেবতাও ধৈর্য্যহীন হন।

১১৮৭। *যেখানে স্ত্রী সেখানে সমস্ত বিষয়, এই সাধুগণের অনুভব।

১১৮৮। স্ত্রীর সহিত কথা কহাই কর্ত্তব্য নয়, পূর্ব্বদৃষ্টা রমণীকে মনে করবে না, আর তার চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য নয়, এমন কি স্ত্রীর চিত্র পর্য্যন্তও দেখ্‌বে না।

১১৮৯। বিষয় বিষ। তার ত্যাগই সুখের মূল।

১১৯০। যিনি কামকে জয় করেছেন তিনি সব কিছু জয় করে নিয়েছেন।

১১৯১। আপনার স্বার্থের জন্য স্ত্রীর স্বামী প্রিয়। পতির জন্য স্ত্রীর পতি প্রিয় নয়, এই অবস্থা অপর দিকেও বুঝ্‌বে।

১১৯২। সকলের প্রীতি মিথ্যা, প্রেম তো একমাত্র প্রভুতেই প্রকৃত আছে।

১১৯৩। স্ত্রী সাপ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর, সাপ তো দংশন কর্‌লে মানুষ মরে কিন্তু স্ত্রীর রূপ চিন্তনমাত্রেই মানুষ মরে যায়।

১১৯৪। কামী পুরুষসকলের এবং কামিনীগণের সংসর্গে পুরুষ কামী হয়ে যায়। আর আগামী জন্মেও ক্রোধী লোভী এবং মোহী হয়।

১১৯৫। রূপের দর্শন মাত্রেই বিষ চড়ে যায়, তুই রূপ লালসা ছেড়ে দে।

১১৯৬। রূপের লালসা কাল-নাগিনী, কেবল ঈশ্বরের নাম জপকারী তা থেকে বাঁচে।

১১৯৭। জলে ডোবা লোক বাঁচে কিন্তু বিষয় সমূহে ডোবা (নিমগ্ন) বাঁচেই না।

১১৯৮। এক কাঞ্চন দ্বিতীয় কামিনী এ থেকে বেঁচে থাক, এ ভগবান্ এবং জীবের মধ্যে পরিখা তৈরী করে।

১১৯৯। আপনার যতটা প্রেম জগতের রূপ সমূহে আছে ততটুকু সেই জগদীশ্বরে হয়তো আপনার ভাল হয়ে যায়।

১২০০। শুষ্ক হাড়ে (অস্থিতে) রক্ত নাই কিন্তু কুকুর শুষ্ক হাড় চর্ব্বণ করে, তাতে আপনার রক্তের স্বাদ আসে, কিন্তু সে অজ্ঞানী, ঐ আনন্দ হাড়ে আছে মনে করে, এই দশা বিষয়ী পুরুষগণের হয়।

১২০১। দুর্লভ মনুষ্য দেহ পেয়ে আর বেদশাস্ত্র পড়েও যদি মানুষ সংসারে আবদ্ধ থাকে তা'হলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হবে কে ?

১২০২। কাম ক্রোধ লোভ এবং মোহকে ছেড়ে আত্মায় দেখ যে আমি কে ? যে আত্মজ্ঞানী নয়, যে আপনার স্বরূপ বা আত্মার সম্বন্ধে জানে না (আত্মজ্ঞানী নয়) সে মূর্খ নরকে প'ড়ে পচ্‌তে থাকে।

১২০৩। যাঁর কোন দ্রব্যের প্রয়োজন নাই তিনি কা'রও খোসামোদ কেন করবেন। নিস্পৃহের তো জগৎ তৃণতুল্য। এজন্য সুখ চাও তো ইচ্ছাকে ত্যাগ কর।

১২০৪। যে যত ছোট হয় সে তদ্রূপই অহঙ্কারী এবং লাফিয়ে চলনশীল হয়, মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী হয়। যিনি যেরূপ বড় এবং পূর্ণ তিনি সেই পরিমাণ গম্ভীর ও অভিমানশূন্য হন্। নদী নালা সামান্য মাত্র জলের দ্বারা ছাপিয়ে উঠে কিন্তু সাগর, যাতে অনন্ত জল পরিপূর্ণ সে গম্ভীর থাকে।

১২০৫। অভিমান কিংবা অহঙ্কার মহান্ অনর্থ সমূহের মূল, ইহা নাশের চিহ্ন।

১২০৬। এই রাজ্য এবং ধন দৌলত কি সদা আপনার কুলে থাক্‌বে কিংবা আপনার সঙ্গে যাবে তাহাই বিচার করুন।

১২০৭। হে মনুষ্য, মনের বেগে এরূপ উৎসাহ অভিমান দেখিও না, এ সংসারে অনেক নদী বর্দ্ধিত হয়ে নেমে গেছে; কত বাগান হয়ে গেছে এবং শুকিয়ে গেছে।

১২০৮। হে মানব মৃত্যুকে ভয় কর, অভিমান ছাড়ো।

১২০৯। মানুষের অহঙ্কারের কিছু ঠিকানা আছে—কাহাকেও গণ্য মনে করে না! মৃত্যু একে অকর্ম্মণ্য করে রেখেছে, তা না হলে এ ঈশ্বরকেও গণ্য বলে মনে করত না।

১২১০। আপনার প্রবল শত্রু অভিমানকে নাশ কর।

১২১১। মানুষের যা চাবার তা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত, তিনি সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন।

১২১২। রে দাস, রাম মালিক তোমার মস্তকের উপর খাড়া আছেন, তোর কি অভাব! তাঁর কৃপাতে ধন ঐশ্বর্য্য অষ্টসিদ্ধি তোমার সেবা করবে, আর মুক্তি তোমার পেছুনে পেছুনে ফিরবে।

১২১৩। যদি সেবক দুঃখী থাকে তা'হলে পরমাত্মাও তিন কালে দুঃখী থাকেন, তিনি দাসের কষ্ট দেখলেই ক্ষণকালের মধ্যে প্রকট হয়ে তাকে সফল-কাম করেন।

১২১৪। যার গাঁটে রাম আছেন তার কাছে সকল সিদ্ধিই আছে, তার আগে অষ্টসিদ্ধি এবং নবনিধি হাতজোড় করে খাড়া হয়ে থাকে।

১২১৫। যেমন সূর্য্যে রাত ও দিনের ভেদ নাই, ঐরূপই অখণ্ড চিৎস্বরূপ কেবল শুদ্ধ আত্মতত্ত্বে না আছে বন্ধন আর না আছে মোক্ষ। কত আশ্চর্য্যের

কথা, প্রভুকে যিনি আমার আত্মার আত্মা আমি তাঁকে পর মনে করে বাইরে বাইরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

১২১৬। মাঝী আমার ব্যাধি দূর করবে, আমি তো আপনার নৌকা ঈশ্বরের নামের উপর ছেড়ে দিয়েছি—নোঙর পর্য্যন্ত তুলে নিয়েছি।

১২১৭। যখন বুদ্ধিমানগণের সংসর্গে কিছু অবগত হলাম, তখন আমি বুঝ্‌লাম যে আমি তো কিছুই জানি না।

১২১৮। হে মলিন মন, তুই অপরের মনকে প্রসন্ন করবার জন্য কেন লেগে আছিস! যদি তুই তৃষ্ণা ত্যাগ করে আপনাতে সন্তুষ্ট থাকিস্ তো তুই স্বয়ং চিন্তামণি স্বরূপ হয়ে যাবি, তোর কোন ইচ্ছা অপূর্ণ হবে না।

—০—

নামের অর্থ ভাবনা

[মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার]

নাম জপ কর কিন্তু অর্থ ভাবনার সহিত জপ কর এই শ্রুতির আজ্ঞা। অর্থ ভাবনার সহিত জপ করিলে জপের রস অনুভূত হইবেই। কিরূপে অর্থ ভাবনা করিতে হইবে—সেই কথারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। কোথা হইতে প্রথম নাম উঠিল?

সতত পরিবর্ত্তনশীল এই জগৎ ভাসিতেছে, খেলা করিতেছে, ভাঙ্গিতেছে কাহার উপরে? তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ সাগরের তলে কি কোন স্থির অচঞ্চল বস্তু আছে? সদা পরিবর্ত্তনশীল চিত্ত কি কোন শান্ত পদার্থ অবলম্বনে ক্রীড়া করে? যদি তাহাই না করিত তবে চিত্তকে শান্ত করিলে একটি অতি সুখময় আনন্দময় অবস্থায় মানুষ জুড়াইয়া যায় কিরূপে? চিত্তকে চিন্তাশূন্য করিলে চিত্তটা যখন অচিত্ত হইয়া যায়—চিত্তটা যখন সঙ্কল্প শূন্য হয় তখন কোন্ রমণীয় দর্শনের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়?

কোন চিন্তা করিব না এই সঙ্কল্প তুলিয়া মানুষ যদি ক্ষণিকের জন্যও চিত্তকে চিন্তাশূন্য করে তবে সর্ব্বচিন্তা বিগলিত-চিত্ত কি হইয়া দাঁড়ায়?

ভূর্ভুব স্বঃ ব্যাপী পরম পদার্থ সদা পূর্ণ। পূর্ণ যাহা তাহা চির-শান্ত চির-স্থির, নিস্তরঙ্গ সর্ব্বব্যাপী সাগরের মত। সমন্তাৎ প্রসারিত সদা অচঞ্চল সাগরের মত পরম পদার্থে তাহারই শক্তির আদি স্পন্দন এই নাম। নামীর প্রথম প্রকাশ

এই নামের স্পন্দন হইতে। ব্রহ্মের প্রথম স্পন্দন এই প্রকৃতি। চিন্ময় পুরুষের প্রথম স্পন্দন এই চিত্ত। সদা ঘূর্ণিত এই মায়াচক্রের নাভি হইতেছে এই চিত্ত। নাভি ধরিলে যেমন চক্র স্থির করা যায় সেইরূপ চিত্ত অবরুদ্ধ করিলে এই মায়াচক্র থামিয়া যায়। ক্ষণকালের জন্যই হউক না কেন—কোন কিছু ভাবিব না—এই করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় একটি রমণীয় অবস্থা চিন্তাশূন্য-চিত্তের সঙ্গেই আছে। ফলে চিন্তাশূন্য-চিত্তই সেই সর্ব্বজন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। সকল মানুষের চিত্ত আছে বলিয়াই বলা যায় সকল মানুষেই সেই সুখময় আনন্দময় পুরুষ আছেন।

একদিন ছিলে সব পরিবেষ্টন করিয়া—এখন সে ভাব আর নাই। এখন আপন দেহ, ছেলেমেয়ের দেহ, ঘর বাড়ী বাগান পুকুর—এই সব 'আমি' 'আমার' পরিবেষ্টন করিয়া যে যত আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবনা করে সে তত কষ্ট পায়। যে যত আমি আমার লইয়া থাকে সে তত আপনার স্বরূপ ভুলিয়া ক্ষুদ্র হইয়া যাতনা পায়। আত্মা সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বের উপরেও যদি কিছু থাকে তাহাও পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। বড় হও—আনন্দ স্বরূপে যাইয়া আনন্দ হইয়াই থাকিবে। সকলের জন্য কর্ম্ম কর, সকলের মঙ্গলের কথা কও, সকলের ভাবনা কর আবার বড় হইয়া যাইবে।

সর্ব্বব্যাপী যিনি ছিলেন তাঁহার নাম রূপ ছিল না। তাঁহার উপরে যখন তাঁহার শক্তি নাম রূপ তুলিল তখন শান্তে একটা বিক্ষোভ উঠিল। 'আমি' 'আমার' করিয়া ক্ষুদ্র হইয়া যখন গেলে তখনও তুমি রহিলে কর্ত্তিত ত্রিভুজদ্বয়ের মধ্যস্থানে। কর্ত্তিত ত্রিভুজ দুইটী পিতা মাতা—তুমি পিতামাতার মধ্যে সেই সূক্ষ্ম জ্যোতিরাকাশসার স্থানে। এই স্থানেই ত আছ—ইহা সর্ব্বদা মনে কর, করিয়া সেই সেই পিতামাতার বেষ্টিত জ্যোতিরাকাশসার দেশে বসিয়া নাম কর আর বাহিরে যে বিশ্ব ভাসিয়া উঠিয়াছে, তাহার সকলের বস্তুর তলায় তলায় যিনি আছেন তাঁহার নামের সঙ্গে, তিনিই মনে করিয়া তাহাকে প্রণাম কর একক্ষণও তাঁহাকে ভুলিয়া কোন কিছুই করিও না। তিন বেলা ত ইহা যত দূর পার নিয়ম রাখিয়া করিবে আর সমস্ত সময় শতকাজে ব্যাপৃত হইলেও নাম ও প্রণাম এমন অভ্যাস করিবে যাহাতে প্রতি কর্ম্ম, প্রতি বাক্য ও প্রতি ভাবনার বিরাম-কালে আবার নামে প্রণামে চলিতে পার। সর্ব্বদা নাম ও প্রণাম লইয়াই থাকাই ইহা। ইহাই উদ্ধারের পথ।

যতদিন না একে থাকা অভ্যাস করিতে পার ততদিন একঘেয়ে বকবকানি ত থাকিবেই। একঘেয়ে না হইলে সেইস্থানে পৌছিতে পারিবে না। অভ্যাসটাও

একঘেয়ে আর বৈরাগ্যও একঘেয়ে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য লইয়া একঘেয়ে হইয়া যাও—তবে আপনার ভুল-স্বরূপ স্মৃতি-পথে আনিয়া আবার প্রবুত্ত মানুষ হইয়া 'তবাস্মি' হইতে পারিবে—নতুবা যে দুঃখে আছ তাহা নিরন্তর বাড়িয়া যাইবে।

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে"

[শ্রীমৎ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম্‌-এ, পি এইচ-ডি, ডি-লিট্‌]

সংসার-চক্রে ঘূর্ণমান অগণিত জীবনিবহ। সকলের জীবনই দুঃখভারাক্রান্ত। যাহা চাই না-তাহা আসে, যাহা চাই তাহা পাই না। যদি বা কিছু পাই তাহা আর একটা আদরের বস্তু বলি দিয়া। যখন একটি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাইতে গিয়া আর একটি আকাঙ্ক্ষিত ধন হারাইতে হয় তখন জীবনের মাঝে দুঃখের উদয় হয়। সত্য রাখিতে গেলে অযোধ্যা ছাড়িতে হয়, রাজাদর্শে অটল রহিতে গেলে পত্নীকে বনবাসে পাঠাইতে হয়, স্বাধীনতা পাইতে গেলে মাতৃভুমি দ্বিখণ্ডিত করিতে হয়। অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে গেলে যৌবন চলিয়া যায়। এইরূপ ছোটবড় দুঃখময় ঘটনা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই অগণিত। যে যত বড় মানুষ, যাহার কর্ম্মের পরিধি যত বড়, তাহার দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভুমি তত প্রকাণ্ড, তাহার বেদনা তত গভীর ও নির্ম্মম, তাহার দুঃখ তত বেশী।

আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই এই দুঃখ। এই দুঃখ এক নাই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের, আর নাই প্রস্তরখণ্ডের। যাহা পূর্ণ চেতন আর যাহা পূর্ণ অচেতন এই দুই প্রান্ত মধ্যে যাহারা বর্ত্তমান তাহাদের সকলেরই দুঃখ আছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বিষাদযোগে আমরা এই দুঃখই অর্জ্জুনের জীবনের মধ্যে নির্ম্মম মূর্ত্তিতে উপস্থিত দেখিতে পাই। দুইটী আদর্শের সংঘাতে অর্জ্জুন বিষাদিত। একটি আদর্শ আসিয়াছে রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্য হইতে। আর একটি আসিয়াছে পারিবারিক প্রীতি হইতে। রাষ্ট্রনীতি বলে, দুর্ব্বৃত্ত আততায়ীকে বধ কর। পারিবারিক নীতি বলে, প্রিয়জনদের রক্তে হস্ত কলুষিত করিও না।

দুই বিরোধী নীতির দ্বন্দ্বে অর্জ্জুন বিষাদযুক্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় সকলেই ভাঙ্গে। মানব মাত্রেরই দুঃখের উদয় এই আদর্শের সংঘাতে। এই প্রকার অবস্থায় পতিত মানবনিবহের শান্তিলাভের পন্থাই শ্রীগীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার আঠারটি অধ্যায় যেন আঠারখানা সিঁড়ি।

প্রথমটি বিষাদযোগ, শেষটি মোক্ষযোগ। বিষাদিত অর্জ্জুনকে একটির পর আর একটি সিঁড়িতে ধাপে ধাপে লইয়া যাওয়া হইতেছে। শেষ ধাপে একেবারে মুক্তির রাজ্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই মুক্তি শুধু মৃত্যুর পরবর্ত্তী কোন অবস্থা বিশেষ নহে। সেদিকে গীতার তেমন আকুল দৃষ্টি নাই। জীবন্ত অবস্থাতেই, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যস্থলেই "অসংখ্য বন্ধন মাঝে"ই দ্বন্দ্বময় বিষাদভূমি হইতে দ্বন্দ্বাতীত শান্তির ভূমিতে উন্নয়নই গীতার মোক্ষ। জীবন্মুক্তিই গীতার মূল লক্ষ্য।

শ্রীগীতায় যত কথা বলা হইয়াছে, তাহার বীজ রহিয়াছে শ্রীভগবানের প্রথম উক্তিটির ভিতর। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।" আর পরম রহস্যময় এই গীতা-শাস্ত্রের সকল রহস্যের অর্গল বা কীলক রহিয়াছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এই চরম মন্ত্রের মধ্যে। "অশোচ্যানন্বশোচঃ" বলিয়া যিনি মুখ খুলিয়াছেন, "মা শুচঃ" বলিয়া তিনি থামিয়াছেন। উপক্রম ও উপসংহারে এই "শুচ্" ধাতুর প্রয়োগাত্মক একবাক্যতা চমৎকার বটে!

অর্জ্জুনের কথাগুলি জ্ঞানীর মত, কিন্তু তাঁহার কার্য্য তদ্বিপরীত। অর্জ্জুন শ্রেয়স্কামী। তাঁহার কাম্যবস্তু শ্রেয়ঃই। "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি," "যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে"—তাঁহার এই সকল কথায় তিনি যে শ্রেয়ঃই অনুসন্ধান করিতেছেন, ইহা সুস্পষ্ট। এই সব কথা জ্ঞানীর মতই। অজ্ঞজন শ্রেয়ঃ চায় না, আপাত-তৃপ্তিকর প্রেয়ঃই খোঁজে। অর্জ্জুনের বাক্যগুলি তাই প্রাজ্ঞজনোচিত। কিন্তু তাঁহার কাজগুলি একেবারে বিপরীত। অর্জ্জুন অশোচ্যের জন্য শোক করিতেছেন। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি তাহা করেন না।

যুদ্ধ-করা কি না-করা এই দুইটি পক্ষ। সংশয়ের এই দুইটি কোটী। এই দুইটি কোটী বা সীমান্ত মধ্যে অর্জ্জুনের চিত্ত দোল খাইতেছে। সংশয়ের লক্ষণই এই। দুইটি প্রান্তে মন দুলিতে থাকে। সংশয় ছেদনের ভার অর্জ্জুন গোবিন্দের উপর দিয়াছেন। দিয়া আবার "ন যোৎস্যে" বলিয়া একটি পক্ষকে ধরিতে চাহিতেছেন। মনে মনে গোবিন্দের নিকট ঐ পক্ষটির সমর্থন চাহিতেছেন। ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ কী উত্তর করেন তাহা শুনিবার জন্য অর্জ্জুনের সঙ্গে আমরাও উৎকর্ণ; উত্তর আসিল: "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।"

উত্তরটা কিন্তু অত্যদ্ভুত। ভগবান্ বলিলেন, অর্জ্জুন তোমার দুইটা কোটীই অশোচ্য। দুইটা 'বিকল্পই' দোষযুক্ত। যুদ্ধ করা আর না করা, তোমার দুইটা

পক্ষই সমভাবে নিন্দনীয়। যুদ্ধ করিলে লোক মরিবে, যুদ্ধ না করিলে আত্মীয় বাঁচিবে। এই তো তোমার কথা? কিন্তু জ্ঞানীর দৃষ্টিতে হত কি জীবিত কেহই অনুশোচনার বিষয় নয়!

যুদ্ধ-করা আর না-করা কোন্‌টি ভাল, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ভগবান্ উত্তর করিতেছেন, সন্দেহ-দোলার ঐ দুইটা প্রান্তই মন্দ। সংশয় ভূমিকাটাই দোষ-যুক্ত। আদালতে মোকদ্দামায় দুইটা পক্ষ থাকে। দুই পক্ষেই ওকালতী চলে। কৌঁসিলীর বুদ্ধির কৌশলে—একবার এপক্ষ আর একবার ওপক্ষ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কোন্‌টা ঠিক জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞানী ব্যক্তি বলিবেন; দুইটাই অঠিক—কারণ দ্বন্দ্বের ভূমিটাই অঠিক। যুদ্ধ করিব আর করিব না, এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তাই "অহং"। এই অহং-কর্তৃত্বের ভূমিটাই অসত্যের ভূমি। এই ভূমির কোন বস্তু বা বিষয়ই অনুতাপ, অনুশোচনার, শোক বা ভাবনার বিষয় হইতে পারে না।

বাঁচা আর মরা কোন্‌টা ভাল? ভগবান্ বলেন, দুইটাই মিথ্যা কথা। দুইটাই "মাত্রাস্পর্শাঃ", দুইটাই "আগমাপায়িনঃ", দুইটাই "আদ্যন্তবস্তু"। ইহার একটাও ভাল নহে—"ন তেষু রমতে বুধঃ", "ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি"। বাঁচা ও মরা এই দ্বন্দ্বের আড়ালে যে একটা দ্বন্দ্বাতীত তত্ত্ব আছে তাহার সন্ধান যে জানে সে মরিলেও বাঁচিয়া থাকে, যে না জানে সে জীবিত থাকিয়াও মৃতের সামিল।

যতক্ষণ মানুষের কাম্যবস্তু একাধিক অর্থাৎ দুই বা ততোধিক ততক্ষণ দ্বন্দ্ব আছেই। ইহা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় চিত্তকে দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে লইয়া যাওয়া। দ্বন্দ্বময় শোকভূমিতে তাহার শোকদুঃখ ভোগ সংবেদন আছেই।

সকল দ্বন্দ্বের অতীত একটা মহত্তম ভূমি আছে। সেখানে বৃহত্তম একটা বস্তুও আছে। সেখানে সর্ব্বাতিশায়ী একটা পাওয়াও আছে। তাঁহাকে সবখানি জীবন দিয়া চাইতে ও পাইতে হইবে। যাঁহাকে পাইলে আর-সব পাওয়া মিটিয়া যাইবে। যাঁহাকে পাইলে আর সকল রকম প্রাপ্তি, সকল প্রকারের লাভ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে হইবে। এমন একটি বস্তুকে সর্ব্বাগ্রে খুঁজিতে হইবে, যাঁহাকে পাইলে আর কোন লাভকেই বড় মনে হইবে না। ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ মন্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখি—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" যতক্ষণ জীবনের লক্ষ্য (end) একাধিক বস্তু, ততক্ষণ দ্বন্দ্ব আছে, ঘাত প্রতিঘাত আছে, তাপ "জ্বালা দুঃখ" অশান্তি আছে। যখন একটি মাত্র সব চাইতে বৃহত্তম ও মহত্তম বস্তুর দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে ও অন্যান্য লক্ষ্যগুলি সেই পরম লক্ষ্যের উপায় রূপে

(means) দৃষ্ট হইতেছে, তখনই শান্তির তোরণ উন্মুক্ত হইতেছে। জীবনের মধ্যে একটি (goal) সাধ্যবস্তু চাই। যাহা হইবে (be-all and end-all) জীবনের যথা সর্ব্বস্ব। আর যাহা কিছু তাহারই জন্য। যাহা যাহা সেই সাধ্য-বস্তুকে পাইবার পক্ষে অনুকূল, তাহা ততটুকুই হইবে চাওয়া ও পাওয়া। স্বাস্থ্য চাই, অর্থ চাই, বিদ্যা চাই, সমাজ চাই, পরিবার চাই, রাষ্ট্র চাই, স্বর্গসুখ চাই—সব কিছু চাই। এই সব-কিছু চাওয়া পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বের ভূমির উর্দ্ধে উঠিবার উপায় নাই। সেই পরম-কিছুর জন্য যখন সব-কিছু তখনই দ্বন্দ্বের ভূমি চলিয়া যাইতে থাকিবে। সেই একটি পরম-কিছু পাইবার পক্ষে যাহা যাহা প্রতিকূল, যত মূল্যবান হউক না কেন কিছুতেই সে সকল চাই না। এইরূপ দৃষ্টি-ভঙ্গি ও জীবন-নীতি অবলম্বন করিলেই দ্বন্দ্বের অবসান।

সবখানি জীবন দিয়া সেই একটি বস্তুকে চাহিতে হইবে। সমস্ত মন প্রাণ সমগ্রভাবে সেই একটি বস্তুর চিন্তায় ও ধ্যানে ভরপূর রহিবে। অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর প্রাপ্তিতে বা নাশে শোক থাকিবে না। কারণ, তাহারা সকলই অশোচ্য। যে সকল অশোচ্য বস্তুর অভাবের জন্য একসময় দুঃখ দুর্ব্বিষহ মনে হইত, সেই সকল বস্তুর অভাব নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় হইবে। তাহাই বলিয়াছেন ৬।২২ মন্ত্রের শেষ পাদদ্বয়ে, "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

যমুনার তীরে মালা জপিতে জপিতে এক সাধু যখন পায়েঠেকা পরশপাথর খানাকে পায়েই ঠেলিয়া বালুর তলে রাখিতেছেন "যদি কভু লাগে দানে" এই মনে করিয়া, তখন বুঝিতে হইবে "যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মান না মণি" এমন এক ধন তিনি পাইয়াছেন! সেই জন্যই "চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকম্"। যাহা পাইলে সব ধন তুচ্ছ, সব দুঃখ উপেক্ষণীয়, সেই দ্বন্দ্বাতীত এক ভূমিতে চিত্তকে, তিনি তুলিয়াছেন। পরাশান্তির আঙ্গিনায় তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। সেই দ্বন্দ্বাতীত ভূমির স্বরূপ কি এবং কি উপায়ে তাহা পাইতে হইবে সমস্ত গীতা ভরিয়াই সেই কথা। ষষ্ঠ অধ্যায়ের এক মন্ত্র দেখিয়াছি, এবার দ্বাদশ অধ্যায়ের এক মন্ত্র দেখিব। সেখানে ঐ কথা বলা হইয়াছে সংশয়হীন ভাবে—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥" ৮॥

হে অর্জ্জুন, তুমি আমাতেই মন, বুদ্ধি সংলগ্ন কর। তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ইহাতে লেশমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই। এই সব মন্ত্রে 'ময়ি' এই অস্মদ্ শব্দের পদ সেই জীবনের পরম লক্ষীভূত একটি বস্তুর দ্যোতক। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সেই কথা বলিয়াছেন, দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা বাক্যের সহিত।—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥" ৬৫॥

প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিয়াছেন, "অর্জ্জুন, তুমি আমাতে মন রাখ, আমাতেই পরানুরক্তি সম্পন্ন হও, আমার উদ্দেশ্যেই সমস্ত কর্ম্ম কর, আমার কাছে মাথা নীচু করিয়া রাখ—তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। কারণ, তুমি আমার পরম প্রিয়জন।"

ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও অষ্টাদশ তিন অধ্যায়ের তিন ষট্‌কের তিনটি উক্তির। একবাক্যতা দেখা গেল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বীজমন্ত্র তিন ষট্‌কের মধ্য দিয়া পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" মন্ত্রে ফলবান্ হইয়াছে। কীলকসদৃশ এই ফলের প্রাপ্তিতেই সকল রহস্যের অর্গল খুলিয়া গিয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন, "অর্জ্জুন, যুদ্ধ করা বা না-করা কোনটাই ভাবিও না। আগে নিজেকে আমাকে অর্পণ কর। আমার হইয়া যাও। আমার হাতের ক্রীড়নকসদৃশ হও। তাহার পর আমি যাহা করাই তাহাই কর। তাহা হইলেই শোকের কারণ আর থাকিবে না। যে গুলিকে জীবনের চরম প্রাপ্য মনে করিয়া বসিয়া আছ, সেগুলিকে (means to a greater end)—পরম বস্তু লাভের উপায় মাত্র মনে কর। তাহা হইলেই শোকের হেতু চলিয়া গেল। "অশোচ্যানন্বশোচঃ" তাই তো তোমার দুঃখ দৈন্য বিষাদ। তুমি "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং নাধিকম্" তাঁহাকে খোঁজ, পরাশান্তির উৎস নামিয়া আসিবে।

অশোচ্যের জন্য যে শোক তাহাই বিষাদ-যোগ। যাঁহাকে না পাইলে জীবন বাস্তবিকই শোচ্য, তাঁহার জন্য নিজেকে ঢালিয়া দেওয়াই মোক্ষযোগ। বিষাদযোগ হইতে মোক্ষযোগ পর্য্যন্ত যত কথা, শ্রীভগবানের প্রথম উক্তিটির মধ্যেই তাহার বীজ লুক্কায়িত আছে।

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" গীতার বীজমন্ত্র আমাদের জীবন-জমিতে পুষ্পফলে জয়যুক্ত হউক!

—০—

বেদের মন্ত্রভাগে ঈশ্বর ও দার্শনিক তত্ত্ব

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ডি-লিট্]

ভারতীয় দার্শনিকবৃন্দ বেদপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রতিপাদনের জন্য নানাবিধ দর্শনপ্রস্থানের স্মরণাতীত কাল হইতে আবির্ভাবন করিয়াছিলেন। ভারতীয় দার্শনিকগণের যে কোনও প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা যে দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন তাহার দ্বারা বেদ-প্রতিপাদ্য অর্থই উপপাদিত হইয়াছে। এই দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ বা বেদ-প্রতিপাদ্য তত্ত্বই প্রথমতঃ উপস্থাপিত করিয়া সেই উপস্থাপিত বেদ প্রতিপাদ্য তত্ত্বের উপপাদনের জন্য দার্শনিক প্রক্রিয়া রচনা করিয়াছেন। যেমন পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। আবার কেহ স্ব স্ব দৃষ্টি অনুসারে দার্শনিক প্রক্রিয়া রচনা করিয়া তাহার দ্বারা যে বেদ প্রতিপাদিত অর্থ উপপাদিত হইয়াছে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন ন্যায়বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন। এই সমস্ত দার্শনিকগণের পরস্পর প্রক্রিয়াভেদ থাকিলেও বেদপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের উপপাদনে সকলেই অবহিত চিত্ত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণ বেদার্থের উপপাদনের জন্য যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে বেদের অনপেক্ষিত যুক্তিভার বেদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা হয় নাই। কিন্তু বেদেরই অত্যন্ত অপেক্ষিত উপপত্তিসমূহ বৈদিক দার্শনিকগণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইহাতে অনেকে মনে করেন যে, ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তার কোন স্বাতন্ত্র্য ছিল না তাঁহারা যে সমস্ত দার্শনিক চিন্তা করিয়াছেন তাহা সমস্তই বেদ-প্রতিপাদিত অর্থেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। বেদ বহির্ভূত অর্থের চিন্তাতে ভারতীয় দার্শনিকগণ উদাসীন ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের চিন্তার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। পরতন্ত্র চিন্তা দার্শনিক চিন্তাই নহে।

ইহাতে আমাদের প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, অনন্তগমনপথে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি অবিশ্রান্ত স্বৈর গতিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সমস্ত গ্রহনক্ষত্রাদির সম বিষম গতি ও গতিবেগের তারতম্য নিরূপণ করিবার জন্য ভারতীয় খগোল বিদ্যাবিদ্ গণিতজ্ঞগণ প্রণিহিত চিত্তে স্মরণাতীত কাল হইতে গ্রহনক্ষত্রাদির চার নিরূপণ করিবার জন্য নানাবিধ গণিতপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। গগনের কোন্ প্রান্তে কোন্ জ্যোতিষ্ক কোন্ সময়ে কোথায় উদিত বা অস্তমিত হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ জ্যোতিষ্কের সমাচার ও বিষমচার ঘটিবে তাহার নিরূপণ

গণিতজ্ঞগণ শ্রদ্ধার সহিত করিয়া আসিতেছেন। এই সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের চার নিরূপণে গণিতজ্ঞগণের মধ্যেও বহু মতভেদ অনাদি কাল হইতেই সুপ্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কোন সুস্থ চিত্ত পুরুষই আজ পর্য্যন্ত এমন কথা বলে নাই যে, নানাবিধ স্বৈর গতিতে পরিভ্রমণশীল পরিদৃশ্যমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতি, উদয় ও অস্তাদির নিরূপণে গণিতজ্ঞগণের যে প্রচেষ্টা তাহাতে তাহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, কেবল পরতন্ত্রভাবেই তাঁহাদের এই গণিতবিদ্যা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গণিতজ্ঞগণের এই চিন্তা নিতান্তই পরতন্ত্র চিন্তা, ইহাতে তাঁহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই—এইরূপ অধিক্ষেপ গণিতজ্ঞগণের প্রতি আজ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই। খগোল স্বৈরগতিতে পরিভ্রমণশীল জ্যোতিষ্করাশির মত বেদের অসংখ্য মন্ত্ররাশি স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যবশতঃ নানাবিধ লৌকিক ও অলৌকিক অর্থের প্রকাশ করিতেছে; স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণশীল জ্যোতিষ্করাশির মত মন্ত্ররাশিও স্ব স্বাতন্ত্র্য বশতঃ নানাবিধ অর্থের প্রকাশক হইয়াছে। গণিতজ্ঞগণ যেমন কোনও জ্যোতিষ্কের গতিবশতঃ অন্য জ্যোতিষ্কের গতির অন্যথাভাব দেখিবার জন্য গণিতের নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেন, এইরূপ নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য মন্ত্রসমূহের মধ্যেও কোন্ মন্ত্র দ্বারা কোন্ মন্ত্রের অর্থপ্রকাশনের সঙ্কোচ ও অর্থপ্রকাশনের বিকাশ প্রভৃতি দার্শনিকগণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রহগণের পরিদৃশ্যমান উদয়াস্ত-মানাদির যুক্তি দ্বারা সমর্থনের জন্য গণিতশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের গতির অন্যথাকরণের জন্য শাস্ত্র প্রবৃত্ত হয় নাই। জ্যোতিষ্কগণের স্থিতিগতিই গণিতশাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত হয় কিন্তু গণিতশাস্ত্র দ্বারা কোন জ্যোতিষ্কের গতি অন্যথাকৃত হইতে পারে না। গণিতশাস্ত্র দ্বারা জ্যোতিষ্কগতির অন্যথাকরণের প্রয়াস উচ্ছৃঙ্খল বাতুল প্রয়াস এইরূপ বেদমন্ত্রপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের উপপাদন প্রয়াসই ভারতীয় দার্শনিকগণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যথাকরণের প্রয়াস করেন নাই, তাহার কারণ তাঁহাদের বেদমন্ত্রের স্বাতন্ত্র্যের প্রতি পূর্ণজ্ঞান ছিল। বেদমন্ত্র কাহারও অধীন হইয়া কোন অর্থের প্রকাশক নহে। মীমাংসক ভট্ট কুমারিল বলিয়াছেন—"স্বতন্ত্রো বেদ এবৈতৎ কেবলো বক্তুমর্হতি।" (তন্ত্রবার্ত্তিক)

ভারতীয় সভ্য সমাজের নিকটে বেদের মন্ত্ররাশি কিরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাঁহারা এই মন্ত্রের গৌরব কীদৃশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা সামান্য একটি উদাহরণের দ্বারা সুস্পষ্ট হইবে। পৃথিবীর মানবসভ্যতায় ঋক্‌সংহিতার মত প্রাচীন গ্রন্থ আর নাই। ইহা অভারতীয় বিদ্বদ্‌বৃন্দও স্বীকার করিয়াছেন। স্মরণাতীত কাল হইতে সমগ্র ভারতে এই ঋক্‌মন্ত্রসমূহ অধীত, অধ্যাপিত ও লিখিত হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে

নানা ভাষাভাষী সভ্যজনবৃন্দ নানা লিপিতে এই ঋক্ মন্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন কত সুপ্রাচীন কাল হইতে এই মন্ত্র নানা লিপিতে নানাদেশে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং নানাকণ্ঠে এই মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সুপ্রাচীনকাল হইতে সুবিশাল ভারতবর্ষে যে মন্ত্ররাশি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল অতি অল্পদিন হইল সেই সমস্ত মন্ত্ররাশি যন্ত্রদ্বারা মুদ্রিত হইয়াছে। এই মুদ্রণ সময়ে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, দশ সহস্র মন্ত্রেরও অধিক ঋক্‌সংহিতার মন্ত্ররাশি কোন স্থলেই একটি রেখার দ্বারাও বিপ্লুত হয় নাই। নানা লিপিতে লিপিবদ্ধ নানা প্রদেশীয় জনগণ কর্ত্তৃক লিখিত ঋক্-সংহিতার মন্ত্ররাশির কোন স্থলেও ঈষন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইরূপ সাম-সংহিতা. যজুঃ সংহিতা সম্বন্ধেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র সমাদৃত গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি নিত্যপাঠ্য গ্রন্থসমূহেও বহু পাঠভেদ উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু এই অসংখ্য দুরুচ্চার্য্য বহুস্বরনিয়ন্ত্রিত দুর্লেখ্য দুর্ধার্য্য মন্ত্ররাশির কোনও স্থলেও একটিও পাঠভেদ ঘটে নাই। যাঁহারা মনে করেন বেদমন্ত্র ঋষিদের সমাধিলব্ধ জ্ঞান মাত্র, সমাধিলব্ধ জ্ঞান ভারতবর্ষে বহুলোকের হইয়াছে, এইরূপ আর্য্যজ্ঞান, প্রাতিভজ্ঞান প্রসিদ্ধই আছে কিন্তু সেই সমস্ত মহাত্মাগণের বাক্যরাশিও বহুধা বিপ্লুত হইয়া গিয়াছে। গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সমস্ত গ্রন্থে অসংখ্য পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শনের সূত্রগ্রন্থ সমূহের পাঠভেদ উপলব্ধ হয়। অথচ ইহাদের বেদমন্ত্রের মত দুরুচ্চার্য্যতা, দুর্ধার্য্যতা, দুর্লেখ্যতার লেশমাত্র নাই। কীদৃশ লোকাতিশায়ী প্রযত্ন দ্বারা ভারতে এই বেদমন্ত্ররাশি সুরক্ষিত হইয়াছে তাহা চিন্তারও অতীত। ভারতে সমস্ত ঐশ্বর্য্য গৌরব ধূলিসাৎ হইয়া গেলেও ভারতে বেদমন্ত্ররাশির রেখামাত্রও বিপ্লুত হয় নাই। এই সুবিস্ময়কর ব্যাপারের গৌরব আজ আমরা উপলব্ধি করিতেও অসমর্থ। কারণ ভারতের বাহিরের কোন মনীষী আমাদিগকে একথা শুনান নাই বা জানাইয়া দেন নাই। গগনমণ্ডলের জ্যোতিষ্কগণের গতি সংকলন প্রয়াস যদি পরতন্ত্র প্রয়াস না হইয়া থাকে তবে অগণিত বেদরাশির অর্থ উপপাদনের প্রয়াসই বা পরতন্ত্র প্রয়াস হইবে কেন? গগনমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রাদি কীদৃশ গতিতে কোন গগনপ্রান্তে কেন যাইতেছে ইহা যেমন বলে না এইরূপ বেদমন্ত্রসমূহও কাহার জন্য কোন্ অর্থ কেন প্রকাশ করিতেছে ইহাও বলে না। কেবলমাত্র শব্দ স্বাভাব্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই দার্শনিকগণ বেদের নানাবিধ তথ্য নিরূপণ করিয়াছেন। বেদমন্ত্র সংখ্যায় যেমন বিপুল, তাহার অর্থও তেমনি অসংখ্যাত। যে কোন চিন্তাই মন্ত্রার্থের অন্তর্গত। কিন্তু তাহা সমঞ্জস কি

অসমঞ্জস ইহাই দার্শনিক চিন্তার বিষয়। যে কোন বাক্যেই মাতৃকা বর্ণের (alphabet) অন্তর্গত। এজন্য কি ইহাই মনে করিতে হইবে যে, সমস্ত বাক্যই যখন পরিমিত কয়েকটি মাতৃকাবর্ণের অন্তর্গত তখন বাক্যের আর নবীনতা কোথায়? কিন্তু এরূপ চিন্তা তো কেহ কখনও করেন না। এইরূপ অসংখ্যাত তত্ত্ব বেদমন্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দার্শনিক যুক্তির দ্বারা যে কোনটির উপপাদন করিলে দার্শনিক দৃষ্টির পরতন্ত্রতা হইবে কেন? উচ্ছৃঙ্খল চিন্তাই কি স্বতন্ত্রচিন্ত। আমরা দেখিতে পাই—আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে প্রাণিমাত্রের নানাবিধ রোগের নিদান, ভৈষজ্য প্রভৃতির সুনিরূপণের জন্য বৈদিক, তান্ত্রিক, নানাবিধ গ্রন্থরাশি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত গ্রন্থের ভাষ্যকার, টীকাকার প্রভৃতি জীবজগতের কল্যাণের জন্য নানাবিধ পরিদৃশ্যমান ব্যাধির নিদান ও ভৈষজ্যের জন্য নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাতে স্থলবিশেষে চিকিৎসকদের মতভেদও ঘটিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদবিদ্‌গণ জীবদেহে উপলভ্যমান রোগেরই নিদানাদি নিরূপণের জন্য নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যে ব্যাধি আজ পর্য্যন্ত জীবদেহে প্রকাশমান হয় নাই সেই ব্যাধির নিদানই বা কি এবং তাহার ভৈষজ্যই বা কি ইহা নিরূপণের জন্য ভিষগ-বৃন্দ স্ব স্ব মনীষার দুরুপযোগ করেন নাই। যে ব্যাধি প্রসিদ্ধ নহে তাহা কোন কারণে হইতে উৎপন্ন হয় এবং তাহার ঔষধই বা কি ইহার নিরূপণের জন্য কোন স্বস্থ চেতা ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারে না। নানা উপদ্রব সমন্বিত রোগ জীবদেহে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এই রোগের নিদানাদি নিরূপণের প্রয়াস তো পরতন্ত্র চিন্তাই বটে এরূপ কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলেন নাই। রোগের অনুভব সিদ্ধ হইলেও, রোগী রোগের যন্ত্রণা স্বয়ং অনুভব করিলেও রোগ উৎপন্ন হইল কিরূপে ইহা তো রোগী জানে না। আর ইহার নিরূপণ করিবার জন্যইত' আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞাত অথবা সম্পূর্ণরূপে অবিজ্ঞাত বিষয়ে ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু সন্দিগ্ধ বিষয়েই ন্যায়ের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। স্বতন্ত্র বেদরাশি যে সমস্ত তথ্য দর্শন করিয়াছিলেন সেই মন্ত্র দৃষ্ট অর্থের অল্পজ্ঞ-জনের নানাবিধ অনুপপত্তির প্রতিসন্ধান হয়। অনুপপত্তির প্রতিসন্ধানবশতঃ মন্ত্রদৃষ্ট অর্থে অল্পজ্ঞ জনের নানাবিধ অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা বশতঃ বহুশাখ সংশয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর ইহারই সমাধানের জন্য মন্ত্রদৃষ্ট অর্থের দার্শনিকগণ নানাবিধ সদুপপত্তিসমূহ উপস্থাপন করিয়া অল্পজ্ঞগণের চিত্তকে অনাবিল করিয়া থাকেন। চক্ষুরাদি প্রমাণের সাহায্যে যাঁহারা প্রমেয় বস্তুর দর্শন করেন তাঁহাদের সেই প্রমাণ দোষসংস্পৃষ্ট হইলে দর্শনও

অযথার্থই হইয়া থাকে। পরমেশ্বর বা বেদ প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয় দর্শন করেন না। এজন্য পারমেশ্বরী দৃষ্টি বা বেদ দৃষ্টি সর্ব্ববিধ অযথার্থত্ব শঙ্কার অতীত। সর্ব্ববিধ অযথার্থত্বশঙ্কার অতীত দৃষ্টির দ্বারা দৃষ্ট বস্তুতে অল্পজ্ঞজনের আশয় দোষ বশতঃ যে বিভ্রম ঘটিয়া থাকে তাহারই চিকিৎসার জন্য ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহ প্রবৃত্ত হইয়াছে। পুরুষাপরাধের নিবারণের জন্যই শাস্ত্রের আবশ্যকতা। শাস্ত্র জ্ঞাপক—কারক নহে। যথাবস্থিত বস্তুর প্রকাশনই শাস্ত্রব্যাপার। শাস্ত্র দ্বারা যথাবস্থিত বস্তু প্রকাশিত হইলেও গ্রহীতৃপুরুষের প্রজ্ঞার মালিন্যপ্রযুক্ত যথাবস্থিত প্রভাশিত বিষয়েও নানাবিধ সংশয় উৎপন্ন হয় আর তাহার নিরসনের জন্যই যুক্তিশাস্ত্রের আবশ্যক হয়।

এই প্রবন্ধে আমরা পরমেশ্বর তত্ত্বপ্রকাশক যে কয়টি ঋক্ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছি সেই সমস্ত মন্ত্রের অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের উক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারা যাইবে। এই উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্র কয়েকটিতেই ঈশ্বরকে পিতা, বন্ধু, সখা, পিতামাতা, পুত্র, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কনিষ্ঠভ্রাতা প্রভৃতি বলা হইয়াছে। আবার এই ঋক্ মন্ত্রে ঈশ্বরকে সমস্ত স্ত্রী, সমস্ত পুরুষ, সমস্ত কুমার, সমস্ত কুমারী, সুবৃদ্ধ এবং সমস্ত প্রাণিবর্গ বলা হইয়াছে। এই ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা, জগতের ধারয়িতা, জগতের বিধানকর্ত্তা, সমস্ত বস্তুর কামকর্ত্তা, সমস্ত জগতের সংহারকর্ত্তা, সমস্ত জগতের পালয়িতা, সমস্ত বস্তুতে সদ্রূপে ভাসমান, সমস্ত চেতন জীবের হৃদয়ে চিদ্রূপে প্রকাশমান, সকলের প্রীতিপাত্র এইরূপ অসংখ্য পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ঈশ্বরের বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও বহু ঋক্‌মন্ত্র আছে যাহাতে ঈশ্বরের আরও বহুবিধরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। আবার এই ঈশ্বরকেই ঋক্‌মন্ত্র সর্ব্বাত্মক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরে এই সমস্ত রূপের উপপাদনের জন্য দার্শনিকগণের দৃষ্টি বৈচিত্র্য ও তাহাদের প্রক্রিয়াভেদ আমরা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। পরম উপাস্য ও পরম ধ্যেয় পরমেশ্বরে এইরূপ বৈচিত্র্য ও সর্ব্বাত্মকতা উপপাদনের জন্য ব্রহ্মপরিণামবাদী দার্শনিকগণের সুপ্রাচীন সিদ্ধান্তেরও আলোচনা আমরা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। সমস্ত দার্শনিক প্রক্রিয়াতেই ঋক্ মন্ত্র প্রতিপাদ্য ঐশ্বর রূপের কথঞ্চিৎ উপপাদন করা হইয়াছে। কোন দার্শনিক প্রক্রিয়াতে বেদমন্ত্রসমূহের আংশিক ভাবে অর্থের উপপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, আবার কোনও দার্শনিক প্রক্রিয়াতে সমস্ত ঋক্‌মন্ত্র প্রতিপাদ্য ঈশ্বরতত্ত্বের উপপত্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই দার্শনিক উপপত্তি প্রদর্শনের বৈচিত্র্য ও অধিকারী গ্রহীতৃ পুরুষের আশয় বৈচিত্র্যপ্রযুক্তই হইয়াছে এবং দার্শনিকগণের প্রয়োজন বৈচিত্র্যও এই দার্শনিক প্রক্রিয়া বৈচিত্র্যের অন্যতম কারণ। একান্ত-

ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যানে নিরত ব্যক্তিগণের জন্যই ঈশ্বরের সর্ব্বাত্মকতা উপপাদন একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সমস্ত পুরুষই একান্ততঃ ঈশ্বরের উপাসনা বা ধ্যানের অধিকারী নহে। দুই চারিজন পুরুষধুরন্ধরই ইহার অধিকারী হইতে পারে। এজন্য বলপূর্ব্বক অনধিকারীকেও তাহার সামর্থ্যের অতীত বিষয়ে প্রবৃত্ত করাইলে তাহার বিষময় ফলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দার্শনিকগণ সকলেই ব্রহ্মপরিণামবাদ সমর্থন করেন নাই। যাঁহারা অভ্যুদয়কামী তাঁহাদের জন্য ন্যায়বৈশেষিক পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি দর্শন, পরমেশ্বরকে জগতের মাত্র নিমিত্ত-কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার আলোচনাও আমরা পাশুপত সিদ্ধান্তে আলোচনা প্রসঙ্গে করিয়াছি। যে সমস্ত দার্শনিক ঈশ্বরের মাত্র নিমিত্তকারণতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহারাও নিঃশ্রেয়সের প্রতিও পরম উপাদেয়তা বুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু তীব্র নিঃশ্রেয়সাকাঙ্ক্ষায় অভ্যুদয় উপেক্ষা করেন নাই বস্তুতঃ যে সমস্ত দার্শনিকের নিকটে অভ্যুদয় উপেক্ষিত হয় নাই তাহা জাগতিক মর্য্যাদা পরিপালনের জন্যই অভ্যুদয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যাহা হইক, ব্রহ্মপরিণামবাদের উপসংহারে একটি ঋক্‌মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের পূর্ণ তাৎপর্য্য প্রদর্শণ করিব। অদিতি দ্যৌরদিতিরন্ত-রিক্ষমদিতির্ম্মাতা স পিতা স পুত্রঃ। বিশ্বে দেবাঃ অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাত-মাদিতির্জনিত্বম্‌॥ (ঋক্‌ সং ১।৮।১৬)। জগৎস্রষ্টা প্রজাপতিই অদিতি নামে এই মন্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যকের ১।২।৫ খণ্ডের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর এই ঋক্‌ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া ভগবান্‌ প্রজাপতির স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃহদারণ্যকের ১।২।৫ খণ্ডে অদিতি শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রদর্শিত ঋক্‌ মন্ত্রে অদিতি শব্দের উক্ত নির্ব্বচন অনুসারেই অদিতির সর্ব্বাত্মকতা সিদ্ধ হইয়াছে। এই মন্ত্রযুক্ত সূক্তটি সহাব্রতে নিষ্কেবল্যশাস্ত্রে বিনিযুক্ত হইয়াছে। (ঐতরেয় ব্রহ্মণ ৩।১।৩১)।

॥ ঈশ্বরবাদ প্রবন্ধ সমাপ্ত ॥

—•—

উদ্বোধন

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

ভগবান এ ধরণী হিংসা দম্ভে হল ছারখার
খোল অমৃতের সত্র—পাত তুমি আনন্দবাজার !
গড়াও নূতন পৃথ্বী—তুমি ভিন্ন হেন সাধ্য কার ?
দেবতা নরের মধ্যে ব্যবধান কমাও এবার।
একদিকে দর্পহারী—একদিকে বিপদভঞ্জন
নূতন ধাতুতে গড় অনাগত মানবের মন।
স্বার্থ হ'ক শীর্ণতম—পঙ্গু হ'ক অন্ধ অহঙ্কার
মানবের বুক হ'ক পুণ্যভূমি মহাপ্রাণতার।

কর্ম্মময় ধর্ম্মময় পুণ্যপ্রভ আনন্দ উচ্ছল,
লভি আয়ু হ'ক নর ধরিত্রীর গৌরবের স্থল।
আসুক মানব গেহে ফিরে পুনঃ স্বরগের ধন
বিশুদ্ধ বিবেক আর সত্যব্রত ন্যায়নিষ্ঠ মন।
সবে হ'ক সমুন্নত, সবে মুক্ত, সকলে স্বাধীন
মানব মানবে যেন রাখিতে পারে না করি হীন।
প্রতিভায় উদ্ভাসিত হক লক্ষ জ্ঞানের দেউল
সর্বভূত হিতে রত মানব দেবের সমতুল।

কোথায় প্রেমের ধর্ম ! কোথা হায় অহিংসার জয় ?
বৃথা বুদ্ধ খৃষ্ট এলো, হলো নাকো বুদ্ধির উদয়।
শাস্ত্রের পুঁথিই বাড়ে—অস্ত্র তার বাড়ে চতুর্গুণ,
মানুষ সকল যুগে মানুষে করিছে শুধু খুন।
পুণ্যের পূজারী দেয় প্রাণপণে পাপেরে আশ্রয়
সৃষ্টির মালিক যারা সৃষ্টিরে করিতে চাহে লয়।
জ্ঞান-হত বিজ্ঞানের বর হলো বড় অভিশাপ
গেল না লেজের বহ্নি একি লজ্জা একি পরিতাপ ?

উঠুক ভুবন ভরি মিলনের উৎসবের রব
চূর্ণ হ'ক ভেদবুদ্ধি ব্যাবেলের বৃহৎ মণ্ডপ।
সুদূর নিকট হ'ক স্বল্পতম হক ব্যবধান
গ্রহে গ্রহে নিত্য হ'ক অমৃতের আদান প্রদান।
ভক্তিরস অভিষিক্ত চিত্ত যেন লাভ করে নর,
হরি-অভিমুখী হৃদি পায় না হিংসার অবসর।
হউক নির্মল শান্ত নিরাপদ বক্ষ বসুধার।
রথযাত্রা হোক সুরু, বসাও হে আনন্দবাজার।

—০—

তিলক-ধারণ

প্রশ্ন—এই যে তিলক চিহ্ন এবং কণ্ঠে মালাদি ধারণ, ইহা ত বাহিরের ভূষা মাত্র? এই সকল বেশ-চিহ্ন ধারণ না করিলে কি সাধন ভজন হয় না?

উত্তর—সাধনভজন-রহস্য যাঁহারা ভাল করিয়া জানেন এবং যাঁহারা শাস্ত্র মর্য্যাদা প্রতিপালনে তৎপর তাঁহাদের জ্ঞানে তিলক চিহ্নমালাদি ধারণ বেশ মাত্র নহে, উহা সাধনের বিশেষ অঙ্গ বলিয়াই জানেন। এমন কতকগুলি সাধারণ স্তর আছে যাহাতে তিলকাদি ধারণের অবশ্যকর্ত্তব্যতা আছে বলিয়াই শাস্ত্রে বিধি দেওয়া হইয়াছে। যাহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা নাই শাস্ত্রে তাহার নিত্য বিধি দেওয়া হয় না। এই বিধি প্রতিপালন না করিলে সাধনের অঙ্গহানি হয়। সাধনের অঙ্গহানির অর্থই এই যে, যে সাধনের দ্বারা যে শক্তি সঞ্জাত হইয়া যে ফল প্রসব করে, অঙ্গহানি হইলে সেই শক্তি সঞ্জাত হয় না। সুতরাং ফলও তাদৃশ হয় না।

প্রশ্ন—তিলক মালায় এমন কি বিশেষ আছে যাহার অভাবে সাধনার অঙ্গহানি হইয়া ফলোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মাইবে?

উত্তর—শ্রাদ্ধাদিতে যেমন কুশ তণ্ডুলাদি দ্রব্যের অভাবে অঙ্গহানি হয়, যথাযথ দ্রব্যাদি মিলিত হইলে যেমন পূর্ণাঙ্গ হয় তেমনই সাধনাঙ্গে যাহার যে অঙ্গ তাহার হানি হইলে ফলোৎপাদনে ব্যাঘাত অবশ্যই হইবে।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবেরা ত তাঁহাদের সাধনকে শ্রাদ্ধাদির মত কর্ম্ম বলেন না,

তাঁহারা ত কর্ম্ম হইতে পৃথক একটি ভক্তি সাধন বলেন। ভক্তি সাধনে বাহিরের বেশ চিহ্নাদির অভাব হইলে অঙ্গহানি হইবে কেন? আর যদি অঙ্গহানির জন্য ভক্তি সাধনটি ফলদানে অসমর্থ হয় তাহা হইলে ভক্তি সাধনটি কর্ম্মের মতই হইয়া পড়ে।

উত্তর—বিশেষ বিশেষ ফল লাভের জন্য ভক্তি শাস্ত্রে যে সকল ভক্তি সাধন বিহিত হইয়াছে তাহার যথাযোগ্য অঙ্গের হানি করিলে সেই সেই সাধনে সেই সেই বিশেষ ফল শীঘ্র লাভ করা যায় না। বহুকালে অঙ্গহীন ভক্তি সাধনে তাদৃশ বিশেষ ফল লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডে অঙ্গহীন কর্ম্ম একেবারে বিফলই হয়, ভক্তি সাধনে অঙ্গহীন ভক্তি সাধন তেমন বিফল হয় না, কিন্তু ফল লাভে বিলম্ব ঘটে। ইহাই কর্ম্মের সহিত ভক্তিসাধনের ভেদ। প্রকৃত সাধন রহস্যজ্ঞ বৈষ্ণব দিগের তিলক ধারণের মহিমা শুনিলে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন। এবং উহা যে মাত্র বাহিরের বেশ বা বৈষ্ণবদিগের চিহ্নমাত্র এই প্রকার ধারণা চিরবিলুপ্ত হইবে। সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা এমন কি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে মনে করেন তিলক মালা বৈষ্ণবের চিহ্ন মাত্র। ইহার মধ্যে আবার কেহ কেহ বিজ্ঞ সাজিয়া অবোধ লোকদিগকে বুঝাইয়া থাকেন যে, "এই প্রকার সাধু বেশের একটা মহিমা আছে। যেমন হ্যাট্ কোট্ প্যাণ্ট্ কলার নেকটাই ইত্যাদি বেশে সজ্জিত হইয়া একখানি চেয়ারে বসিলে মনে একটা উগ্র ভাব প্রকাশ পায় এবং বিলাসের দিকে মন অগ্রসর হয় তেমনই তিলক মালা নামাবলী বস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক কুশাসনাদিতে উপবিষ্ট হইলে মন সাত্ত্বিক ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অতএব মনকে সাত্ত্বিক ভাবের দিকে অগ্রসর করাইতে এই তিলক মালাদি সাধুবেশের একটা উপযোগিতা আছে," ইত্যাদি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল বিজ্ঞের বিজ্ঞতা তিলক মালা প্রভৃতিকে বেশ ভূষা চিহ্ন ইত্যাদির কবল হইতে উদ্ধারে কৃতকার্য্য হয় নাই। এই সকল অজ্ঞ পরম্পরা সিদ্ধান্ত বাচালতা সাধনশাস্ত্রবিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গ্রাহ্যই নহে।

প্রশ্ন—আমরা ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বড় বড় পণ্ডিত ভাগবত-ব্যাখ্যাতা অনেক গোস্বামী বাবাজী মহাশয়দিগের নিকট তিলক মালার মহিমা বারংবার ঐরূপই শ্রবণ করিয়া থাকি। ইহার বেশী কিছু রহস্য আছে তাহা ত শুনি নাই।

উত্তর—ভাগবত ব্যাখ্যায় নানা প্রকার প্রাকৃত গ্রাম্য গল্প, নাটকীয় হাবভাব প্রকটন ও গান বক্তৃতাদিতে পটুতা লাভ করিয়া পণ্ডিত হওয়া আর প্রকৃত শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং শাস্ত্র বিহিত সাধন রহস্য অবগত হওয়া পরস্পর ভিন্ন বিষয়। ব্যবসায় উপযোগী কয়েকখানি গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া অর্থ প্রতিষ্ঠার লালসায় গ্রন্থ

ব্যাখ্যা করিয়া বেড়াইলেই যে প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ বা সাধন রহস্যজ্ঞ হওয়া যায় তাহা নহে।

প্রশ্ন—তিলক মালা সম্বন্ধে বৈষ্ণব শাস্ত্রে কি সাধন রহস্য আছে তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি?

উত্তর—যে বৈদিক উপাসনার প্রভাবে ব্রাহ্মণ সকল ব্রহ্মণ্য তেজঃ ধারণ করিয়া জগতে সর্ব্বপূজ্য হইয়াছেন সেই বৈদিক উপাসনার সার রহস্য বৈষ্ণব দিগের একমাত্র তিলক ধারণের মধ্যেই রহিয়াছে। বৈষ্ণবের ইষ্টার্চ্চনের সর্ব্ব-প্রাথমিক কার্য্যই এই তিলক ধারণ। তাঁহারা প্রথমতঃ ব্রহ্মতেজঃ অঙ্গে ধারণ করিয়াই ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ অর্চ্চনে অগ্রসর হয়েন। শাস্ত্র বিহিত তিলক ধারণ রহস্য জ্ঞান লাভ করিয়া সেইভাবে ত্রিসন্ধ্যা একমাত্র তিলক ধারণ সাধনেই শূদ্রকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় ব্রহ্মতেজঃ ধারণ করিতে সক্ষম হইয়া ব্রাহ্মণের ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন। ব্রাহ্মণের বৈদিক উপাসনার মূল গায়ত্রীর উপাসনা। এই গায়ত্রী উপাসনা সম্বন্ধে "অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষঃ" এই শ্রুতির স্বারস্যলব্ধ অর্থকে গ্রহণ করিয়া পুরাণে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনঃ" ইত্যাদি সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত তেজোময় বপুঃ নারায়ণের ধ্যান এবং তদধিষ্ঠান সূর্য্যের উপস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। এখন বিচার করিলে দেখা যায় এই উপাসনায় প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত যাবতীয় তেজোনিদান তত্ত্বের ধ্যান ধারণাই মুখ্যরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত প্রকার পদার্থের মধ্যে তৈজসিক তত্ত্ব নিহিত আছে তদ্বৎ তেজঃ সমূহের মূলাশ্রয় একমাত্র মহাসৌরমণ্ডলই এবং সমস্ত স্থূল বিশ্বের জীবন শক্তির পরিপুষ্টির মূল সহায় এই মহাসৌরমণ্ডলই। এই সৌরমণ্ডলের সাহায্যে পৃথিবী অন্ন জল তেজ বায়ু প্রভৃতি ভূত ভৌতিক পদার্থ সকল যাবতীয় প্রাণীর প্রাণকে পরিপোষণ করে। সমগ্র প্রাণের প্রাণন এই সূর্য্যমণ্ডলের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত রহস্য গায়ত্রী উপাসনায় মন্ত্রাদির মধ্যে নিহিত আছে। ব্রাহ্মণগণ সেই সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত অপ্রাকৃত তেজোনিদান শ্রীভগবান নারায়ণকে উপাসনা করেন। উক্ত ধ্যানের মধ্যে নারায়ণকে "হিরণ্ময় বপুঃ" বলায় প্রাকৃত কলুষ রহিত বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত তেজোময় বিগ্রহই বলা হইয়াছে। এখন দেখুন গায়ত্রী মন্ত্রে মহাসমষ্টি তেজোময় সূর্য্যাধিষ্ঠানে অপ্রাকৃত তেজোময় বপুঃ নারায়ণের উপাসনার দ্বারাই ব্রাহ্মণগণ পরম সত্য ব্রহ্মণ্য তেজেরই উপাসনা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ যখন যথেচ্ছ আহার বিহারে প্রলুব্ধমনা হইয়া রজস্তমঃ প্রধান সাধনে অগ্রসর হইলেন তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই ব্রহ্মণ্য উপাসনাতেও

শিথিলতা আসিতে থাকিল। ফলতঃ তাঁহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মণ্য হারা হইয়া শুধু নামেতেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। বৈষ্ণবদিগের তিলক ধারণে সেই ব্রহ্মণ্য তেজেরই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। বরং ব্রাহ্মণদিগের তাদৃশী গায়ত্রী উপাসনায় সামান্যতঃ ব্রহ্মণ্য তেজের উপাসনা বিহিত হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবদিগের তিলক ধারণ সাধনায় ব্রহ্মণ্য তেজের বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়া অধিকতর মহিমাই প্রকটিত হইয়াছে।

প্রশ্ন—তিলক ধারণ সাধনে ব্রহ্মণ্য তেজের উপাসনা কি প্রকারে সাধিত হয় তাহা একটু বিস্তারভাবে বলুন।

উত্তর—শুনুন "ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোহংশুর্ভগস্তথা। বিবস্বানিন্দ্রঃ পূষা চ পর্জ্জন্যস্ত্বষ্টৃবিষ্ণবঃ॥" একই আদিত্য এই দ্বাদশ রূপ ধারণ করেন বলিয়া শাস্ত্রে দ্বাদশ আদিত্য নামে কথিত হয়েন। একই সূর্য্যের গুণ ও ক্রিয়াভেদে দ্বাদশ অবস্থা হয়, তাই দ্বাদশ আদিত্য নাম। একই বস্তু বিশেষ গুণ-ক্রিয়া ভেদে বিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করে। যেমন বেদান্ত শাস্ত্রে একই অন্তঃকরণকে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ভেদে মনঃ চিত্ত বুদ্ধি অহঙ্কার এই চতুর্বিধ নামে কীর্ত্তন করা হইয়াছে তদ্বৎ পৃথক পৃথক দ্বাদশ প্রকার গুণ ক্রিয়া বিশিষ্ট দ্বাদশ আদিত্যের এক এক আদিত্যাধিষ্ঠানে ভগবান নারায়ণের দ্বাদশ রূপের এক একটি রূপ অধিষ্ঠিত আছেন। ভগবানের এই দ্বাদশরূপ যথা—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর। এই দ্বাদশ নারায়ণ আবার দ্বাদশ নারায়ণী শক্তি সমন্বিত, যথা—কেশবের শক্তি কীর্ত্তি, নারায়ণের শক্তি কান্তি, মাধবের তুষ্টি, গোবিন্দের পুষ্টি, বিষ্ণুর ধৃতি, মধুসূদনের শান্তি, ত্রিবিক্রমের ক্রিয়া, বামনের দয়া, শ্রীধরের মেধা, হৃষীকের হর্ষা, পদ্মনাভের শ্রদ্ধা, দামোদরের শক্তি লজ্জা। এই দ্বাদশ নারায়ণী শক্তির সহিত কেশব নারায়ণ মাধব ইত্যাদি ক্রমোল্লিখিত দ্বাদশ নারায়ণ মূর্ত্তি ঐ ধাতা অর্য্যমা মিত্র ইত্যাদি ক্রমোল্লিখিত দ্বাদশ আদিত্যরূপ অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন এইরূপ ধ্যান পূর্ব্বক ঐ দ্বাদশ আদিত্য অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত দ্বাদশ নারায়ণী শক্তি সমন্বিত দ্বাদশ নারায়ণ মূর্ত্তিকে দ্বাদশ স্বরের বীজ অর্থাৎ অং আং ইং ঈং ইত্যাদি রূপে সমাযুক্ত করিয়া বৈষ্ণব সাধকগণ ললাটাদি ক্রমে তিলক ধারণের দ্বাদশস্থানে ন্যাস করিয়া থাকেন। ইহার প্রয়োগ হইবে, যথা "ললাটে, অং ধাতৃসহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ," "উদরে আং অর্য্যম-সহিতায় নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ" "বক্ষস্থলে, ইং মিত্র সহিতায় মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমঃ" ইত্যাদি ক্রমে। এখন বিবেচনা করুন বৈষ্ণবগণ একই তেজোমণ্ডল সূর্য্যের যে সকল পৃথক পৃথক ক্রিয়া ভেদে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাণিবর্গের ধারণ, শোষণ, রস সঞ্চালন, কর্ষণ, পোষণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হয় সেই সকল ক্রিয়ার আশ্রয়ভূত তেজোহংশকে শরীরের মুখ্য মুখ্য দ্বাদশ স্থানে ধারণ করেন। শুধু তাহাই নহে, একবার এই দ্বাদশ নারায়ণী শক্তির রহস্যও মনে ভাবুন, আহা, যে সকল শক্তির কণিকার আবির্ভাবেও মানব-দেহ দেব সদৃশ হইতে পারে। বুঝুন, এই জগতে সামান্য যৎকিঞ্চিত একটু "কীর্ত্তি" লাভের আকাঙ্ক্ষায়, একটু রূপ যৌবন সৌন্দর্য্যাদি "কান্তি" লাভের লালসায়, একটু "তুষ্টি" "পুষ্টি" প্রাপ্তির বাসনায় মনুষ্য কতপ্রকারে তীব্র চেষ্টায় কাল অতিবাহিত করিতেছে। কত প্রাণপণ যত্নেও একটু "ধৃতি" অর্থাৎ ধৈর্য্য শান্তির লেশও পাইতেছে না। প্রকৃত ক্রিয়া শক্তি রহিত মৃতপ্রায় প্রাণ ধারণ করিয়া আমরা হাহাকারেই জীবন অতিবাহিত করিতেছি। ক্ষুদ্র স্বার্থলোলুপতার তীব্র কিরণে হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া নির্দ্দয়তার মরুভূমিতুল্য করিতেছি। "মেধা" "হর্ষা" "শ্রদ্ধা" "লজ্জা" হারাইয়া আমরা সংসার পথ এবং পরমার্থপথ এই উভয় পথেই নিঃসম্বল বুভুক্ষু দরিদ্রের ন্যায় হা হুতাশ করিতেছি। "কীর্ত্তি" "কান্তি" "তুষ্টি" "পুষ্টি" "ধৃতি" "শান্তি" "ক্রিয়া" "দয়া" "মেধা" "হর্ষা" "শ্রদ্ধা" "লজ্জা" এই সম্পত্তিগুলি ভাগবতী সম্পত্তি, ভগবদ ভক্তি সহচরী। এই মহতী সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিলে এই মানবাত্মা সর্ব্বোতোভাবে পরম সুখী হইতে পারে। বৈষ্ণবগণ তিলক ধারণ সাধনে এই মহতী ভাগবতী শক্তি সমূহকে নিজ শরীরে অধিষ্ঠাপিত করিয়া মনে প্রাণে এই ভাগবতীয় শক্তির তেজঃ ধারণ পূর্ব্বক ভগবৎ পাদপদ্ম উপাসনা করেন। মহাভারতে ব্রাহ্মণের মুখ্য যে দ্বাদশ গুণ কথিত হইয়াছে তদপেক্ষাও অধিকতর মহদগুণে পরিপূর্ণ নারায়ণের কীর্ত্তি আদি এই দ্বাদশ শক্তির অধিষ্ঠানে সূর্য্যের ঐ দ্বাদশ তেজকে অধিকতর পুষ্টি বিধান করিয়া তাহাদের প্রাণ স্বরূপ নারায়ণ মূর্ত্তি তাহাতে অধিষ্ঠাপিত করিয়া দ্বাদশ বীজ মন্ত্রে নিজ শরীরের দ্বাদশস্থানে ত্রি-সন্ধ্যা যাঁহারা ন্যস্ত করেন, বলুন ব্রাহ্মণ দিগের সামান্যরূপে গায়ত্রী উপাসনা অপেক্ষা তাঁহাদের এই সাধন কোন অংশে কম কি ? যে সাধনার বলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজঃ লাভ হয় উপযুক্ত বিজ্ঞ বৈষ্ণব সাধকগণ তাঁহাদের প্রাথমিক সাধনেই সেই ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। তাই বৈষ্ণবীয় সাধন রহস্য পরম বিজ্ঞ মুনি ঋষিবৃন্দ ব্রাহ্মণেতর জাত্যুৎপন্ন বৈষ্ণব দিগকেও বিপ্রসাম্য বলিয়া শাস্ত্রে যে কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা অমূলক বা অযৌক্তিক নহে। প্রকৃত ভগবৎ শক্তি উপাসক বৈষ্ণবই, ইহা একবার বিচার করুন।

প্রশ্ন—আচ্ছা, ঐ প্রকার অধিষ্ঠান সহ শক্তিযুক্ত বিষ্ণুধ্যান করিয়া ললাটাদি

স্থানে অং আং ইত্যাদি বীজপুটিত মন্ত্রগুলি ন্যাস করিলেও ত হয় ত যে আবার মৃত্তিকাদি দ্বারা ললাটাদি স্থানে নানা প্রকার চক্‌রা বক্‌রা চিহ্নাদি রচনা করার উদ্দেশ্য কি ? ঐ চিহ্নগুলি দেখিয়া বেশভূষা বলিয়াই মনে হয়।

উত্তর—হরি, হরি ! মৃত্তিকাদি লেপন দ্বারা শরীরের স্থান বিশেষে কথিত চক্‌রা বক্‌রা চিহ্ন করাটাই আপনাদের মত মহাবিজ্ঞদের মতে খুব একটা মনোহর বেশ না কি ? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আর সুন্দর মনোহর বেশ ধারণের উপযুক্ত দ্রব্যাদি বৈষ্ণবেরা খুঁজিয়া পাইলেন না। তাই তাঁহারা মনের দুঃখে মাটি লইয়া গায়ে নানা প্রকার চিহ্ন করিয়া বেশভূষার সাধ মিটাইতেছেন। আহা আপনাদের কি গবেষণা। কি মহামহিম বিজ্ঞতার পরিচয়। আপনাদের গবেষণার বালাই যাই।

প্রশ্ন—বলুন, তাহা হইলে ঐ প্রকার চিহ্নাদি ধারণ কেন ?

উত্তর—দেখুন, সবস্থলে সব 'কেন'র উত্তর সহজ নহে। বৈদিক স্মার্ত্ত যাগাদিতে "সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডল," তান্ত্রিক অর্চ্চনাদিতে "ভুবনেশ্বরী" প্রভৃতি যন্ত্রাকৃতিকেও চক্‌রা বক্‌রা বলা যাইতে পারে। স্মার্ত্ত কর্ম্ম সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাদি অঙ্কন এবং তান্ত্রিক পূজাদিতে যন্ত্রাদি অঙ্কনের ব্যবস্থা যে সকল গভীর তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বৈষ্ণবদিগের তিলক চিহ্নে তদপেক্ষা কম তত্ত্ব নিহিত নহে, বরং অনেকাংশে অধিক গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। ঐ সমস্ত যন্ত্রমণ্ডল চক্রাদির তত্ত্বরহস্য জ্ঞান জগতে বড়ই দুর্লভ, উহার প্রকৃত উপদেষ্টা জগতে অতীব বিরল। যাহা হউক বৈষ্ণবদিগের তিলক চিহ্নের রহস্য একটু মাত্র সংক্ষেপে বলি। বৈষ্ণবদিগের তিলকের সাধারণ ভাবে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চিহ্নটি বস্তুতঃ "হরি পদাকৃতি"। পদ শব্দের অর্থ স্থান, অর্থাৎ নিবাস স্থান, আর আকৃতি শব্দের অর্থ চিহ্ন, তাহা হইলে "হরিপদাকৃতি" শব্দের অর্থ হইল— "হরি বাসস্থলের চিহ্ন"। শাস্ত্রে এই প্রকার হরি পদাকৃতির লক্ষণ করিয়াছেন, ঊর্দ্ধভাবে দুই পার্শ্বে দুইটি রেখা, মধ্যে ছিদ্র (ফাঁক রাখা), এবং দুই রেখার নিম্নে সম্মিলিত স্থানের নিম্নে লেপন, ইহাই পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যাধিষ্ঠান যুক্ত সশক্তিক শ্রীহরির অধিষ্ঠান স্থল। নিম্ন স্থলটি সূর্য্যাধিষ্ঠানের স্থান, মধ্যের ফাঁক স্থানটি পূর্ব্বোক্ত কীর্ত্তি কান্তি আদি শক্তি সমম্বিত নারায়ণের নিবাসস্থল, ইহার শাস্ত্র বিহিত অঙ্কনই বৈষ্ণবের তিলক চিহ্ন। সংক্ষেপে তিলক চিহ্নের কিঞ্চিত রহস্য বলিলাম।

প্রশ্ন—আপনি বলিতেছেন ব্রাহ্মণের গায়ত্রী উপাসনার ফল বৈষ্ণবদিগের তিলক ধারণ ব্যাপারেই সম্পন্ন হয়, যেহেতু সূর্য্য মণ্ডলে নারায়ণের ধ্যান

ধারণাদিই বৈদিক গায়ত্রীর উপাসনা, আর বৈষ্ণবেরাও তিলক ধারণে সেই সূর্য্য মণ্ডলে নারায়ণ ধ্যানাদি করেন এবং তিলক ধারণ স্থলে সেই ধ্যেয় নারায়ণকে ন্যাস করেন। এখানে আমার একটি সংশয় আছে। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক গায়ত্রী উপাসনায়ও শুধু নারায়ণকে ধ্যান করেন না। ব্রাহ্মী শক্তি রৌদ্রী শক্তি সমন্বিত ব্রহ্মরুদ্রের ধ্যানও গায়ত্রী উপাসনার মধ্যে করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবেরা কেবল নারায়ণের ধ্যান দ্বাদশ স্থলে করেন, ব্রহ্মরুদ্রের ধ্যান বা ন্যাস ত করেন না. তিলক ধারণে বৈদিক গায়ত্রী উপাসনার সমতা কি প্রকারে সামঞ্জস্য হয়?

উত্তর—পূর্ব্বে বলিয়াছি—"অস্বরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ" এই শ্রুতির তাৎপর্য্যটি পুরাণে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী" নারায়ণঃ ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এখানে "সদা" এই পদটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বৈষ্ণবগণ যদি সর্ব্বস্থলে কেবল নারায়ণেরই ধ্যান করেন তাহাতে ব্রহ্মণ্য শক্তি লাভের কোনও হানি হয় না। কারণ নারায়ণই একমাত্র ব্রহ্মণ্যদেব। তথাপি আপনার সন্দেহ নিরসনের নিমিত্ত বৈষ্ণবদিগের তিলকের ব্যবস্থার আরও একটু সংক্ষেপে বলিতেছি। বৈষ্ণবেরা তিলক ধারণে ললাটাদি স্থলে ব্রহ্ম রুদ্রেরও ধ্যান ধারণা এবং ন্যাস করেন। পূর্ব্বকথিত উদ্ধপুণ্ড্রের দুই পার্শ্বেই ব্রহ্ম রুদ্রের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "বাম পার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদা শিবঃ। মধ্যে বিষ্ণুঃ সদা স্থিত স্তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥"

প্রশ্ন—আর একটু সন্দেহ; ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী উপসনায় নারায়ণকে তেজোময় হিরণ্ময়বপুঃ চিন্তা করেন; বৈষ্ণবেরা কি তেজোময় হিরণ্ময়বপুঃ নারায়ণকে তিলক ধারণে চিন্তা করেন?

উত্তর—বৈষ্ণবগণ তিলক ধারণ ব্যাপারে মস্তকে একটি কিরীট মন্ত্র ন্যাস করিয়া থাকেন, সেই মন্ত্রটী শ্রবণ করিলে আপনার সন্দেহ নিরসন হইবে। মন্ত্র যথা—ওঁ শ্রীকিরীট কেয়ুর হার মকর কুণ্ডল চক্র শঙ্খ গদা পদ্ম হস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষঃস্থল শ্রীভূমীসহিতায় স্বাত্মজ্যোতি দীপ্তি করায় সহস্রাদিত্য তেজসে নমো নমঃ। এখন ভাবুন প্রকৃত শাস্ত্র বিহিত বৈষ্ণবীয় তিলক ধারণ এবং মনের এই প্রকার বিষ্ণুতেজ ধারণে অভ্যাস দ্বারা বৈষ্ণবের দেহ মন আদি বিষ্ণুময় হইয়া উঠে কিনা। অথচ সাধারণ অজ্ঞেরা বৈষ্ণবের তিলক ধারণ ব্যাপারটীকে কত তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। শাস্ত্রদৃষ্টি আর সাধারণ দৃষ্টিতে অনেক পার্থক্য।

এস হে জীবন-স্বামী

[শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, কাব্যশ্রী]

বেদনা-আগুনে দগ্ধ ক'রেছ
আঘাত দিয়েছ হরি,
দুঃখ ও শোকে জর্জ্জর হ'য়ে
তাই ত' তোমারে স্মরি!

বিলাসের মাঝে ডুবে যাই আমি—
তোমারে ভুলিয়া যাই,
সুখ চাই আমি, বারেকের তরে
তোমারে নাহিক চাই!
তাই তব কৃপা হ'য়ে সুকঠোর
আমারে পরালো দুঃখের ডোর,
দু'নয়নে মোর ভ'রে দিল তাই
ব্যথার অশ্রুজল,
দুঃখ যে মোর তোমার কৃপার
তাই চির সম্বল!

কাটায়েছি আমি জীবন আমার
কত না স্বপ্ন ল'য়ে,
চলিয়াছি পথ ব্যর্থ-লক্ষ্য
মিথ্যার বোঝা ব'য়ে!
নামায়ে এবার এ বোঝা আমার,
কর তব অনুগামী,
মোহ-ঘোর মোর ভেঙে দিয়ে আজ,
এস হে জীবন-স্বামী!

—:—

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৌদ্ধমত দর্শন

[শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী, এম্-এ এল-এল-বি]

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

পূর্ব্বোক্ত প্রধান ও অপ্রধান দশ প্রতিজ্ঞা ব্যতীতও সন্ন্যাসীগণের কতকগুলি নিয়ম কি ভাবে বৌদ্ধ ও জৈনগণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) 'সন্ন্যাসীর কোনও রূপ সঞ্চিত ভাণ্ডার থাকিবে না।' গৌতম সূত্রে ও বৌধায়ন সূত্রে এই বিধি আছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জৈন মুনিগণের এই নিয়ম প্রতিপাল্য।

(২) 'সন্ন্যাসীগণ বর্ষাকালে আশ্রম পরিবর্ত্তন করিবেন না।' বৌধায়ন সূত্র। বৌদ্ধ ও জৈনগণের বর্ষাবাস ইহারই অনুসরণ।

(৩) 'ভিক্ষা ভিন্ন অন্য কারণে সন্ন্যাসীগণ কখনও গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিবেন না।' এবং 'কাল অতীত হইলে কোনও গ্রামে দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিতে পারিবেন না।' জৈন ভিক্ষুগণ এই নিয়মের অনুবর্ত্তী ছিলেন। বৌদ্ধগণ গ্রামের নিকটে সঙ্ঘারাম বা বিহারে বাস করিতেন।

(৪) বৌধায়ন বলেন, 'সন্ন্যাসীগণ হরিতাভ রক্ত (গৈরিক) বস্ত্র পরিধান করিবেন।' বৌদ্ধগণ পীত বস্ত্র ব্যবহার করেন। জৈন সাধু উলঙ্গ থাকেন বা শ্বেত পরিচ্ছদ পরেন।

(৫) 'যাহাতে কোন বীজ ধ্বংস হয়, সন্ন্যাসীগণ কখনও এরূপ কার্য্য করিবেন না।' জৈনগণ সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ রাজ্যের প্রতি বিশেষ সতর্ক ও করুণাপরায়ণ।

(৬) বস্ত্রে ছাঁকিয়া জলপান। ইহার ব্যবস্থা বৌধায়ন সূত্রে এবং মনুস্মৃতিতেও পাওয়া যায়।

এইভাবে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান বিষয়েও ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণার্থ বৌদ্ধগণ প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিজকৃত পাপের বিষয় সমবেত ভিক্ষুমণ্ডলীর সমক্ষে ব্যক্ত করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ইহাতে পাপ ক্ষালন হয়। যিনি নিষ্পাপ বলিয়া নিজকে মনে করিতে পারেন, তিনি নীরব থাকেন। ইহার নাম পাতিমোক্খ (প্রাতিমোক্ষ)। অনেকের ধারণা এই পাপখ্যাপন প্রথা বৌদ্ধগণের নিজস্ব।

কিন্তু খ্যাপনে যে পাপের ক্ষয় হয়, তাহা মনু বহুপূর্ব্বে ঘোষণা করিয়াছেন।

'খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ। পাপকৃন্মুচ্যতে পাপা-ত্তথা দানেন চাপদি ॥
যথা যথা নরোঽধর্ম্মং স্বয়ং কৃত্বানুভাষতে। তথা তথা ত্বচেবাহিস্তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে ॥
যথা যথা মনস্তস্য দুষ্কৃতং কর্ম গর্হতি। তথা তথা শরীরং তত্তেনাধর্ম্মেণ মুচ্যতে ॥
কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥

—মনু ১১।২২৮-৩১ ॥

অর্থাৎ 'লোকসমাজে নিজের পাপখ্যাপন, পাপের জন্য অনুতাপ, তপস্যা এবং অধ্যয়ন দ্বারা পাপকারী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, এবং আপৎপক্ষে দানের দ্বারাও পাপমুক্তি হয়। লোক অধর্ম করিয়া স্বয়ং যে পরিমাণে তাহা লোকসমাজে ভাষণ করে, সর্প যেমন নির্মোকমুক্ত হয়, তেমনি সেও পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। এবং যে পরিমাণে পাপকারীর মন দুষ্কৃত কর্মকে নিন্দা করিতে থাকে, সেই সেই পরিমাণে তাহার শরীরও সেই অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। পাপ করিয়া যদি সন্তাপ হয়, তাহা দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পরন্তু পুনর্ব্বার আর এইরূপ করিব না—এই বলিয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে—সে পাপ হইতে পবিত্র হয়।'

অতএব এই পাপখ্যাপন প্রথাতেও বৌদ্ধমত সনাতন ধর্মের অনুযায়ী মাত্র। খৃষ্টীয় মতে রোমান ক্যাথলিকগণ প্রধান ধর্মযাজকের নিকট পাপের কথা গোপনে স্বীকার (confession) করিলে পাপ ক্ষয় হয়। সম্ভবতঃ এই প্রথা খৃষ্টসম্প্রদায়ে বৌদ্ধগণের নিকট হইতে আসিয়াছে।

মনু পাপখ্যাপনের কোন গণ্ডী নির্দেশ করেন নাই। হঠাৎ গোহত্যা হইয়া গেলে দন্তে তৃণ লইয়া গোচর্ম দ্বারা দেহ আবৃত করিয়া প্রকাশ্যে নিজ পাপ ব্যক্ত করা নিয়ম। বৌদ্ধগণ পাপকথা মাত্র সঙ্ঘভুক্ত ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রকাশ করেন। খৃষ্টমতে আরও সীমাবদ্ধ করিয়া গোপনে ধর্মযাজকের নিকট প্রকাশের উপদেশ হইয়াছে।

ভিক্ষু ও সন্ন্যাসী:

কেহ তর্ক তুলিতে পারেন যে সন্ন্যাসিগণের আচার ব্যবহার বৌদ্ধ বা জৈন ভিক্ষুর অনুকৃতি। কিন্তু ইহা একেবারেই সম্ভব নহে।

প্রথমতঃ সন্ন্যাস বর্ণাশ্রমের চতুর্থ আশ্রম, সুতরাং সুপ্রাচীন কাল হইতে বৈদিক সমাজের অঙ্গাঙ্গীভূত ছিল সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসিগণ দেশের সর্বত্র বহু পূর্ব্ব হইতেই বিস্তৃত হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বুদ্ধের সময় হয়ত কয়েক সহস্র মাত্র ছিলেন, পরেও তাঁহাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল, এবং ভারতের সকল প্রদেশে বৌদ্ধমত সমানভাবে বিস্তার লাভ করে নাই। বর্ত্তমানে ভারতে মাত্র সাঁচী, অজন্তা, ইলোরা, বাগ, নাগার্জ্জুন-কোণ্ডা, বুদ্ধগয়া, নালন্দা, পাটনা, সারনাথ, তক্ষশিলা, লুম্বিনী প্রভৃতি কয়েকটি কেন্দ্রস্থানে বৌদ্ধমঠ, গুহা, স্তূপ, মূর্ত্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ইহা স্থির করা অনুচিত যে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা বৌদ্ধমত ভারতে সনাতন ধর্মকে অতিক্রম বা পরিভব করিয়াছিল। জৈন সম্প্রদায়ের সংখ্যা তো ভারতে মুষ্টিমেয় বলা যায়।

তৃতীয়তঃ সূত্রকার গৌতম ও বৌদ্ধায়ন বুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। বুলারের (Buhler) মতে কমপক্ষে অন্ততঃ চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী (খৃঃ পূঃ) আপস্তম্ব সূত্রের রচনা কাল। বৌধায়ন আপস্তম্বের পূর্ববর্ত্তী। গৌতম বৌধায়নেরও পূর্ব্বকালের।

চতুর্থতঃ সনাতন ধর্ম স্বয়ং সম্পূর্ণ—কখনও অপর কোন সম্প্রদায় বা মত হইতে কিছু গ্রহণ করে নাই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মগ্রন্থে বহুস্থানে বৌদ্ধগণের অপযশ আছে। যাহা নিন্দনীয় তাহা কেহ গ্রহণ করে না।

(৩) নীতি ও উপদেশঃ

অনেকের ধারণা ভগবান্ বুদ্ধ এক নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বর-আত্মা পরমাত্মা মানিতেন না। তিনি বেদ মানিতেন না, ব্রাহ্মণদিগের উপর তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। তিনি কর্ম জন্মান্তরবাদ মানিতেন না। নীতিমাত্র তাঁহার ধর্মের ভিত্তি ছিল—তাহা 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' তাঁহার নির্ব্বাণ—শূন্যবাদ মাত্র। কিন্তু আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে এই ধারণা ভ্রান্ত।

আত্মা ও পরমাত্মাঃ

বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার ধর্মদর্শন বা মতসমূহ লিপিবদ্ধ হয় নাই। তাঁহার তিরোধানের পর যে উপদেশাবলী সংগৃহীত হইয়া 'থেরাবেদ' নামে প্রসিদ্ধ হয়, পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহাও এখন উপলব্ধ নহে। সুতরাং বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ত্তমানে যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেই তাঁহার মত কি ছিল তাহার ধারণা করিতে হয়।

বুদ্ধদেব পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া তিনি প্রথম যে বাক্য উচ্চারণ করেন, তাহা হইতেই ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ হয়। তিনি বলেন, 'গহকারক! দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।' অর্থাৎ—'হে গৃহনির্মাতা

(সৃষ্টিকর্তা)! তুমি দৃষ্ট হইয়াছ (আমি তোমাকে দেখিয়া লইয়াছি)। আর তুমি গৃহনির্মাণে আমাকে বন্ধনে ফেলিতে পারিবে না।'

আত্মা-পরমাত্মার প্রসঙ্গে স্বয়ং বুদ্ধদেবকে ভিক্ষু বচ্ছগোত্ত জিজ্ঞাসা করিয়া কোন পরিষ্কার উত্তর পান নাই। পদার্থে আত্মা আছেন, কি নাই, এই উভয় প্রশ্নেই ভগবান নিরুত্তর ছিলেন। পরে এ বিষয়ে আনন্দকে তিনি যাহা বলেন তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মতত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সনাতন ধর্মে অধিকার ভেদ আছে। ভগবান্ অধিকারভেদ মানিতেন। সকলের পক্ষে সকল তত্ত্ব আয়ত্ত করা সম্ভব নহে। তাই তিনি সকল প্রশ্নের উত্তর সকলকে দিতে কুণ্ঠিত হইতেন।

সম্যুত্তনিকায় গ্রন্থে এক উপদেশে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে ভগবান্ বলিতেছেন, 'হে শিষ্যবর্গ! আছেন—এক অজ, অনাদি, অসৃষ্ট, নিরাকার। তিনি না থাকিলে যে পৃথিবীতে জন্ম আছে, আদি আছে, আকার আছে, সৃষ্টি আছে, সে পৃথিবী হইতে জীব কখনও পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হইত কি?'

এই এক উক্তি হইতেই বুদ্ধদেব আত্মা পরমাত্মা স্বীকার করিতেন তাহা প্রমাণ হয়।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে আত্মার বিষয়ে সনাতন ধর্মের অনুরূপ উক্তি পাওয়া যায়। 'সামঞ্ঞ্‌ ঞফলসুত্তন্তে' আছে—

'তত্থ নত্থি হন্তা বা ঘাতেতা বা সোতা বা সাবেতা বা বিঞ্ঞ্‌ঞাতা বা
বিঞ্ঞ্‌ঞাপেতা বা।

যো পিতিনং হেন সত্থেন সীসং ছিন্দতি ন কোচি কিঞ্চি জীবিতা যোরোপেতি,
সত্তন্নং য়েব কায়ানং অন্তরেন সত্থ-বিবরং অনুপতীতি।'

অর্থাৎ—'তাহার (আত্মার) হন্তা নাই, হনন নাই। শ্রোতা নাই, শ্রোত্র নাই। জ্ঞাতা নাই, জ্ঞাত নাই। তীক্ষ্ণ শস্ত্রে শিরশ্ছেদ করিলেও কেহ তাহার হনন বা নাশ করিতে পারে না। সপ্ত কায়ের মধ্যে শস্ত্র বিবরেই নিপতিত হয়।'

ইহা 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।' এবং 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি' 'অজো নিত্যং শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্র বাক্যের অনুরূপ।

(৪) বেদ ও ব্রাহ্মণঃ

বুদ্ধদেব বেদবিরুদ্ধ ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যে ধারণা আছে তাহা অভ্রান্ত নহে। তিনি বেদের বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলিয়াছেন জানা যায় না।

বেদাবী হত ধর্মের একাংশ—জ্ঞানকাণ্ডমূলক মত তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল। পরে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্তৃক সে ধর্মমত রূপান্তরিত হইয়া অনেকাংশে বেদবিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক কালেও ধর্মমতের ক্রমবিকাশের এইরূপ পরিণতির দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বুদ্ধের যে সকল উক্তি পাওয়া যায় তাহা মনুস্মৃতি ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের অনুরূপ। পরবর্ত্তী কালেও বৌদ্ধ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ শব্দটি গৌরবাত্মক ভাবে ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে। জাতি ব্রাহ্মণ না হইলেও কি বৌদ্ধ কি জৈনগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জ্ঞানী ও গুণিজনকে 'ব্রাহ্মণ' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যাহাকে সৎ বলিয়া মনে করে, মানুষ তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং এইভাবেও বৌদ্ধমতে ব্রাহ্মণগণেরও বৈদিক উচ্চ আদর্শেরই অনুসরণ করা হইয়াছে বলা চলে। 'কে ব্রাহ্মণ' এই বিষয়ে মহাভারতের অনুরূপ কথাও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ধম্মপদ গ্রন্থে ব্রাহ্মণবগ্গে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব মত প্রকাশ করিয়াছেন—

'যস্স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং।
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥
ন জটাহি ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো।
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণো॥
গম্ভীর পঞ্ঞং মেধাবিং মগ্গামগ্গস্স কোবিদং।
উত্তমত্থ অনুপত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥
যস্স রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতো।
সাসপোরিব আরগ্গা তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং॥'

'যাঁহার কায় মন ও বাক্য এই তিনস্থানে পাপ নাই; যিনি অতিশয় সংযমশীল,—সেই লোককে আমি ব্রাহ্মণ বলি। জটাজুট পরিধান দ্বারা, গোত্র দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। কিন্তু যিনি ধার্মিক, সত্যবাদী ও শুচি, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। যিনি অতি প্রগাঢ় জ্ঞানী, মেধাবী, সত্য সত্য পথের সূক্ষ্মদর্শী এবং যিনি উত্তম পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। যাঁহার রাগ, দ্বেষ মান ও কপট সূচ্যগ্রস্থিত সর্ষপের ন্যায় পতিত হইয়াছে, তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।'

॥ সমাপ্ত ॥

—•—

আলবার লীলামৃত

[শ্রীশ্রীঠাকুর]

॥ শ্রীভগবান রামানুজাচার্য্য ॥

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কমলা যেমন চির চঞ্চলা আনন্দও তদ্রূপ। একমাত্র শ্রীভগবান ব্যতীত কোনস্থানে স্থিরভাবে থাকেন না। কেশবদেবের সংসারেরও আনন্দ বেশীদিন রহিলেন না। যাইবার সময় কেশব যাজ্ঞিককে লইয়া যেখানে তিনি নিশ্চল হইয়া অবস্থান করেন সেই নিত্যলোকে উপস্থিত হইলেন। পতিশোকে কান্তিমতী অতিশয় কাতরা হইলেন, রামানুজ আপনার ধৈর্য্যবলে পিতৃশোক সহ্য করিয়া যথাকালে পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার উপদেশে মাতাও সত্বর অনিত্য শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্যবস্তুর জপধ্যানে মনোনিবেশে যত্নবতী হইয়াছিলেন।

(২)

রামানুজ অধীত শাস্ত্রালোচনা করত তথায় দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। জ্ঞান পিপাসা তাঁহার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি বেদান্ত দর্শন পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই সময় লোকমুখে শুনিলেন যাদবপ্রকাশ নামক একজন বৈদান্তিক কাঞ্চীপুরীতে বেদান্ত অধ্যাপনা করেন। শুনিবামাত্র মাতা ও পত্নীসহ কাঞ্চীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে বাসকরত যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্তদর্শন পাঠ করিতে লাগিলেন। যাদবপ্রকাশ বিনীত ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান প্রতিভাসম্পন্ন মেধাবী গুরুভক্ত পরম সুন্দর শিষ্যটিকে পাইয়া যথেষ্ট আনন্দিত হইলেন। ইহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দর্শনে 'ইনি মানব কিনা' এ সম্বন্ধে কখন কখন সংশয়াপন্ন হইতেন।

জন্মজন্মান্তরের ভাব লইয়া মানব জন্ম পরিগ্রহ করে। ইহা সাধারণ নিয়ম। রামানুজ স্বয়ং অনন্তের অবতার, জগতে প্রপত্তিমার্গ প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ভক্তিভাবই তাঁহার স্বাভাবিকভাব, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন পাঠে তাঁহার কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় নাই। পুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ খানি তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। রামায়ণ যে কতবার পাঠ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। সকল শাস্ত্রের মধ্যেই তিনি আনন্দের উৎস অন্বেষণ করিতেন। কোন পথ অবলম্বনে আমার ক্ষুধিত তৃষিত হৃদয় শান্ত হইবে—আর

কোন আনন্দ কন্দ কোন নিস্তরঙ্গ চির সুশীতল আনন্দ সরোবর কোন পরমানন্দ মহাপারাবারের সন্ধান তাপিত ক্ষুভিত তৃষিত হাহাকারপরায়ণ জীবকে দান করিয়া তাঁহাদের ভূমা সুখ সাগরে নিমজ্জিত করিতে সমর্থ হইব—এ চিন্তা তাঁহার নিত্যসহচরী ছিল। যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বেদান্তপাঠ আরম্ভ করিলেন। যাদবপ্রকাশ অদ্বৈতবাদী—"ব্রহ্মাস্মি" তাঁহার মূল মন্ত্র। আর ভক্তিপরায়ণ রামানুজের জীবনের একমাত্র সম্বল মহামন্ত্র "দাসোহহং" শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। মূল উপনিষদ্ বেদান্তদর্শনে ভক্তির ভাব যাহা পাইতেন অধ্যাপক মহাশয়ের বিপরীত ব্যাখ্যা পুনঃ পুনঃ তাঁহার জন্মগত ভাবকে আঘাত করিত, অতিকষ্টে আত্ম সম্বরণ করিয়া কোনক্রমে অদ্বৈত-বাদ হইতেই স্বীয় ভাবধারাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন।

এই সময় চোলরাজ কন্যা ব্রহ্মদৈত্যের গ্রস্ত হন। রাজা বহুবিধ উপায় অবলম্বনে কোনরূপ প্রতিকার করিতে না পারিয়া যাদবপ্রকাশকে আহ্বান করেন। শিষ্যগণসহ যাদবপ্রকাশ তথায় উপস্থিত হইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মন্ত্রধ্বনি শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্তা রাজকন্যা ভীষণ হুঙ্কার ও দন্তকটকট করিতে করিতে প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। তাহার চিৎকারে যাদবপ্রকাশ ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন ব্রহ্ম-রাক্ষস তাঁহার দিকে নিঃশঙ্কচিত্তে পাদপ্রসারিত করিয়া সহাস্যে বলিল—যাদব প্রকাশ তুই—আমার এখানে কি করিতে আসিয়াছিস্। তোর মন্ত্রের সাধ্য নাই যে আমাকে দূর করিতে পারে। তুই জন্মান্তরে কি ছিলি জানিস্ এবং কেন ব্রাহ্মণ হইয়াছিস? যাদবপ্রকাশ ব্রহ্মদৈত্যের ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মরাক্ষস বলিল তুই মথুরার কাছে এক সরোবর তীরে বল্মীক স্তূপে গোসাপ ছিলি, একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ সেইস্থানে পাক করিয়া ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট পত্র ফেলেন। তুই তাঁহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিস্ তার ফলে তুই ব্রাহ্মণ হয়েছিস্। তোর এমন সাধ্য নাই যে তুই আমাকে তাড়াইতে পারিস্। আমি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলাম। যজ্ঞে মন্ত্র ক্রিয়া লোপ হেতু ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি। নানাদেশ ভ্রমণ করত এখানে আসিয়া রমণীয় পুরোদ্যানে ভ্রমণকারিণী এই মনোরমা রাজকন্যাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া গ্রহণ করিয়াছি, বেশ আনন্দেই আছি তোর সাধ্য নাই যে আমাকে দূর করিতে পারিস্। উষরক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় তোর সমস্ত মন্ত্র নিষ্ফল জানবি। তবে এক উপায় আছে, তোর শিষ্যগণের মধ্যে সর্ব্বসুলক্ষণ পুরুষোত্তম রামানুজ নামে যে শিষ্য আছেন, যদি তিনি আমার মস্তকে পদার্পণ করেন চরণামৃত দেন এবং

আমাকে যাইতে অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি এই মুহূর্ত্তেই উদ্ধার হইয়া যাই।

রাজা ব্রহ্মদৈত্যের কথা শুনিয়া রামানুজের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আমি আপনার মহিমা অবগত নহি, এক্ষণে ব্রহ্মদৈত্যের মুখে শুনিলাম। হে শরণাগতবৎসল, আপনি আমার কন্যাকে রক্ষা করুন। এই কথা বলিয়া স্বয়ং রাজা তাঁহার পাদোদক কন্যাকে পান করাইলেন। রামানুজ রাজকান্যার মস্তকে পাদস্পর্শ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মদৈত্য রাজকন্যাকে ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন কালে, অন্তরীক্ষ হইতে বলিলেন—হে ভক্তবর, আপনার কৃপায় আমি নিকৃষ্ট যোনি হইতে মুক্তিলাভ করিলাম। আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। সকলে তাহা শ্রবণ করত অতীব বিস্মিত হইলেন।

রাজকন্যা প্রকৃতিস্থা হইয়া বহুলোকের মধ্যে আপনাকে অবস্থিতা দেখিয়া সলজ্জভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজকন্যাকে সুস্থা দেখিয়া স্বর্ণথালে মণিমুক্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্নাদি আনিয়া রামানুজের পাদমূলে রক্ষা করিলে তিনি তৎসমুদয় শ্রীগুরুদেবের চরণে উপহার দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। চোল নরপতিও যাদবপ্রকাশকে বহুধনরত্নাদি উপঢৌকন দিলেন।

যাদবপ্রকাশ বাহিরে হর্ষ ভাব দেখাইয়া সেই সমস্ত অর্থাদি লইয়া স্বভবনে শিষ্যগণসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রামানুজের গৌরবে তাঁহার হৃদয়ে বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। চাতুর্য্যসহকারে তাহা গোপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। কান্তিমতীর দ্যুতিমতী নাম্নী ভগিনীর পুত্র গোবিন্দ রামানুজের অতিমানুষ বৈভবের কথা শ্রবণ করত তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কাঞ্চীতে উপস্থিত হইলে রামানুজ আনন্দিত চিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। গোবিন্দও তদবধি রামানুজের সহিত যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্তদর্শন পাঠ করিতে লাগিলেন।

একদিন অধ্যাপনাকালে যাদবপ্রকাশ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চেতেতি"—তৈত্তিরীয় ২।১।৩

"সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ ব্রহ্মকে হৃদয়স্থ পরমাকাশে বুদ্ধিরূপ গুহার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মরূপে যুগপৎ সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু উপভোগ করেন"। ইহা শুনিয়া রামানুজ বিনীতভাবে বলিলেন সত্যজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্মের গুণ বলিয়া আমার মনে হয়। এই কথা শ্রবণ মাত্র যাদবপ্রকাশের ঈর্ষাবহ্নি আর লুক্কায়িত রহিল না। রাজার গৃহে রামানুজের

অত্যধিক সম্মান লাভের পর হইতেই যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল আজ তাহা জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল—তিনি সক্রোধে বলিলেন—ওরে দুর্ম্মতি আমি তোর গুরু না তুই আমার গুরু, তুই যদি সব জানিস্ তাহা হইলে আমার কাছে কি জন্য আসিস। গুরুদেবের শ্রীমুখে এই অপূর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করত তিনি স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে কিছুক্ষণ উপবিষ্ট থাকিয়া পরে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করত আবাসে উপস্থিত হইয়া মাতার নিকট এই বৃত্তান্ত বলিলে তিনি যাদব-প্রকাশের নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন। রামানুজ স্বগৃহে স্বয়ং শাস্ত্রালোচনা করত আনন্দিত মনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে, যাদবপ্রকাশ প্রিয় শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—দেখ রামানুজের ধৃষ্টতা—তোমাদের সকলের সাক্ষাতেই আমার সত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যায় সে দোষারোপ করিল. সে আমার শিষ্য নহে, মহাশত্রু ; সেদিন রাজভবনে রাজা আমাকে, অতিক্রম করিয়া তাহার যথেষ্ট পূজা করিলেন, অতঃপর যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি রাজা তাহারই অনুগত হইয়া তাহার মতকেই সমর্থন করিবেন। রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈত মত পোষক, আমার অদ্বৈতবাদকে সে নিশ্চিত খণ্ডন করিবে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য যে সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন—রামানুজ সে মহাসত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবেই। সেই সত্য রক্ষার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শিষ্যগণ বলিলেন—বলুন গুরুদেব, কি করিতে হইবে ? যাদবপ্রকাশ বলিলেন এই বিষবৃক্ষকে আর বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া উচিত নয় ইহাকে হত্যা করিতে হইবে। শিষ্যগণ চমকিতভাবে বলিলেন হত্যা—হত্যা—। যাদবপ্রকাশ বলিলেন—হাঁ হত্যা তবে এ হত্যা ঠিক হত্যা নহে তাহাকে উর্দ্ধগতি দান করা। শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করিল—তাহা কিরূপ ? যাদবপ্রকাশ বলিলেন—অধমতারিণী, পতিতপাবনী, পরমগতিদায়িনী ত্রিবেণী সঙ্গমে লইয়া গিয়া তাহাকে জলে নিমজ্জিত করিয়া মুক্তিদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তোমরা তাহার কাছে যাইয়া বলিবে—যে আমি প্রয়াগে স্নান করিতে যাইব রামানুজকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। ছাত্রগণ রামানুজের নিকট গুরুদেবের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি অতীব আনন্দের সহিত মাতাকে বলিলেন—মা গুরুদেব প্রয়াগ সঙ্গমে স্নান করিতে যাইতেছেন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে চান, আপনি অনুমতি দিন। মাতা অনুমতি দিলেন।

এক শুভদিনে শিষ্যগণসহ যাদবপ্রকাশ প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য গোবিন্দও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। পথিমধ্যে যাদবপ্রকাশ

রামানুজকে বলিলেন বৎস রামানুজ তুমি কয়েকদিন আমার কাছে পাঠ করিতে না আসায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত ছিলাম। তুমিতো জান সমস্ত প্রিয় শিষ্যের মধ্যে তুমি আমার অতি প্রিয়তম শিষ্য। তোমার মত জগতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। পর্ব্বতের মধ্যে যেমন মেরু, ধেনুগণের মধ্যে যেমন কামধেনু, তদ্রূপ তুমি সংসারে নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ হইবে। আমার প্রসাদে তুমি বিদ্যার পারে গমন কর আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। রামানুজ প্রণাম করিয়া বলিলেন আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। তাঁহারা আনন্দিত চিত্তে শাস্ত্রলাপ করিতে করিতে ক্রমে বিন্ধ্যারণ্যের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

গোবিন্দ লক্ষ্য করিলেন যাদবপ্রকাশও শিষ্যগণের মধ্যে কি এক পরামর্শ চলিতেছে। কৌতূহল বশত গোপনে থাকিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া যাইলেন। প্রয়াগে যাইয়া রামানুজকে জলে নিমজ্জিত করিয়া বধ কারবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে, কি সর্ব্বনাশ—কি প্রকারে ইঁহাকে রক্ষা করিব—গোবিন্দ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

একদিন শিষ্যগণসহ যাদবপ্রকাশ অগ্রসর হইয়া কিয়দ্দুর গমন করিয়াছেন—রামানুজ ও গোবিন্দ পশ্চাতে যাইতেছেন, যাদবপ্রকাশ দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে গোবিন্দ বলিলেন দাদা আপনি পলায়ন করুন। আপনাকে প্রয়াগে জলে ডুবাইয়া বিনাশ করিবার জন্য ইঁহারা পরামর্শ করিয়াছেন। যান আর বিলম্ব করিবেন না।

রামানুজ এ অত্যদ্ভুত কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কোন পথে যাইবেন তাহা জানেন না—দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াই ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

ওদিকে হঠাৎ অত্যন্ত বৃষ্টি আসায় শিষ্যগণসহ যাদবপ্রকাশ ভিজিতে ভিজিতে এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন। সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া যাইল—আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ততা প্রযুক্ত রামানুজ বা গোবিন্দের কোন সংবাদ লইবার অবকাশ পান নাই। জল ছাড়িলে গোবিন্দ উপস্থিত হইলেন। যাদবপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন রামানুজ কোথায়—? গোবিন্দ বলিলেন তিনি তো আপনাদের সঙ্গে আসিয়াছেন—আমিই তো সকলের পশ্চাতে ছিলাম। যাদবপ্রকাশ সেকি—রামানুজ তো আমাদের সঙ্গে আইসে নাই। দেখ দেখ সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল ভীষণ অরণ্য একাকী বালক যাইল কোথায়? যাও তোমরা সকলে অন্বেষণ কর।

গোবিন্দ ও অন্যান্য সঙ্গীগণ চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। যাদবপ্রকাশ বাহ্যতঃ রামানুজের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে

লাগিলেন। গোবিন্দ ভ্রাতৃশোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলে যাদবপ্রকাশ তাহাকে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে বৃক্ষমূলে রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

রামানুজ নিরুদ্দেশ হওয়ায় যাদবপ্রকাশের আনন্দের সীমা রহিল না। ভগবান শঙ্করের অসীম কৃপায় ব্রহ্মহত্যা না করিয়া শত্রুনিপাত হইল। প্রয়াগ যাত্রার ফল তথায় যাইবার পূর্ব্বে লাভ করিয়া অতীব আনন্দে একপ্রকার বিনিদ্র অবস্থাতেই তাঁহার রাত্রি অবসান হইয়া যাইল।

বিজন অরণ্যে রামানুজ একাকী চলিয়াছেন, মনুষ্যের কোন চিহ্ন নাই, ক্বচিৎ বন্য জন্তুগণ তাঁহার পদশব্দে পলায়ন করিতেছে, সন্ধ্যার বিলম্ব নাই। রামানুজ ক্লান্ত হইয়া একটী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন—হে বরদ, তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই। আজ আমি বড় বিপন্ন ভীষণ অরণ্যে পথহারা, লোকালয় কোনদিকে তাহা জানিনা, আমি তোমার শরণাগত আমায় রক্ষা কর প্রভো।

ঠাকুরটী আমার সব সহ্য করিতে পারেন কিছুতেই কেহ তাঁহাকে অস্থির করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ভক্তের কাতর আহ্বান শুনিলে তিনি কোনক্রমে স্থির থাকিতে পারেন না। শরণাগত ভক্তের দুঃখনিবারণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হন। পুরাণে দ্রৌপদী গজেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণের কথা শুনা যায়, এযুগেও তিনি সেইরূপই শরণাগতবৎসলতার পরিচয় প্রপন্ন ভক্তকে দান করেন। —হইলও তাহাই। ঠাকুরটী একটী ব্যাধ যুবকের বেশে—আর মা আমার ব্যাধিনীর বেশ ধারণ করত রামানুজকে রক্ষা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। রামানুজ এই মনুষ্য শূন্য গহন কাননে ব্যাধদম্পতিকে দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া আনন্দিতচিত্তে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাধ তুমি কে—? স্ত্রীর সহিত এ মহাবনে কেন আসিয়াছ?

তাঁহার কথা শুনিয়া মায়া-ব্যাধরূপী ঠাকুরটী আমার সহাস্যবদনে বলিলেন—আমি সত্যব্রতক্ষেত্রে যাইব, এই সিংহ ব্যাঘ্র সমাকুল বিজন অরণ্যে তুমি কেন বিচরণ করিতেছ তোমার বাড়ী কোথায়? যাইবে কোথায়? রামানুজের কর্ণে এই কয়েকটী কথা যেন অমৃত বর্ষণ করিল, এরূপ মিষ্ট কথা তিনি আর কখন শ্রবণ করেন নাই।

ধনুর্ব্বাণধারী কৃষ্ণবর্ণ ব্যাধের শরীরে লাবণ্য যেন উথলিয়া পড়িতেছে, তাহার নয়ন দুইটী যেন করুণা দিয়াই গঠিত হইয়াছে। রামানুজের সন্দেহ উপস্থিত হইল কে এ ব্যাধ—ভগবান বরদরাজ কি—আমাকে রক্ষা করিবার

জন্য ব্যাধরূপে দর্শন দিলেন। পরক্ষণে ভাবিলেন আমি এমনকি তপস্যা করিয়াছি যার জন্য ভগবান স্বয়ং আসিবেন, তবে যে এই ব্যাধ ঈশ্বরপ্রেরিত এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন আমার বাড়ি সত্যব্রত ক্ষেত্রে; প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য গমন করিতেছিলাম কোন কারণে সত্যব্রতক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াছি কিন্তু কোন্ পথে যাইব তাহা জানিনা।

ব্যাধপত্নী হাসিয়া বলিলেন—তা তুমি আমাদের সঙ্গে চলো আমরাও সেখানে যাইব। রামানুজ ভাবিলেন, একি কথা—না সুধার ধারা, মানুষের কথা এমন সুমিষ্ট হয়? ব্যাধপত্নীর দিকে চাহিয়া আবার সংশয় হইল—ইনি জগন্মাতা নহেন তো—? না না তাহা অসম্ভব।

তিনি বলিলেন, চল মা। ব্যাধ ব্যাধপত্নী অগ্রে—তিনি তাঁহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন। একক্রোশ যাইবার পর সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, তাঁহারা বৃক্ষমূলে রাত্রি যাপন করিবার জন্য শয়ন করিলেন। মধ্যরাত্রে ব্যাধপত্নী বলিলেন আমার বড় পিপাসা হইয়াছে জল আনিয়া দাও।

ব্যাধ বলিলেন, এই রাত্রিকালে কি প্রকারে তোমায় জল আনিয়া দিব। রামানুজ বলিলেন, আচ্ছা আমি জল আনিয়া দিতেছি। আমার মনে হইতেছে আমার রক্ষার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণই ব্যাধদম্পতিরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। আমি মাতার জন্য জল আনিতেছি।

ব্যাধ বলিলেন, এই রাত্রিকালে তুমি কিরূপে জল আনিবে সকালে জল আনিয়া দিও। রামানুজ তাহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া নীরবে রহিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রামানুজকে ব্যাধ বলিলেন অদূরে কূপ আছে জল আনিয়া দাও, রামানুজ তথায় জল আনিবার পাত্র কিছু না পাইয়া কূপ হইতে অঞ্জলি করিয়া জল আনিয়া দুইবার ব্যাধপত্নীকে দিলেন, ব্যাধপত্নী আনন্দিতমনে তৃপ্তিসহকারে জলপান করিলেন। পুনরায় জল আনয়ন করত রামানুজ দেখিলেন ব্যাধ ও তাঁহার পত্নী তথায় নাই। অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসন্ধান করিয়া চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার ইহার মধ্যে ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী কোথায় অদৃশ্য হইল। এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে তিনি যাহা সন্দেহ করিয়াছেন সত্যই তাই। বরদ ও বরদ-প্রিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিবার জন্য এই খেলা খেলিলেন। শরীর রোমাঞ্চিত হইল। নয়ন দুইটী হইতে মুক্তা-মালার ন্যায় অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর বন হইতে বাহিরে আসিয়া সুন্দর পথ ও গ্রাম দর্শন করিয়া পথিকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন এস্থানের

নাম কি? পথিক বলিল—তোমার বাড়ী কোথায়—এ কাঞ্চীপুরী সত্যব্রতক্ষেত্র, ঐ বরদরাজের মন্দির।

রামানুজ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন সত্যই তো তিনি কাঞ্চীতে উপস্থিত হইয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! পুনঃ পুনঃ বরদরাজকে প্রণাম পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিলেন। মাতা অপ্রত্যাশিতভাবে রামানুজকে দেখিয়া বলিলেন—একি তুই যে ফিরিয়া এলি, রামনুজ মাতার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

কান্তিমতী বরদরাজের অপার করুণার কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হা বরদ দুঃখিনীর ধনকে রক্ষা করিবার জন্য তুমি ব্যাধরূপ ধারণ করিলে কি কৃপা তোমার। রামানুজ বলিলেন—মা গুরুদেবের দুরভিসন্ধির কথা আপনি কাহাকেও বলিবেন না। মাতা বলিলেন—না বাবা একথা কি প্রকাশ করিতে আছে, তবে তুই পরম ভক্ত কাঞ্চীপূর্ণের কাছে যা, গিয়া সব বৃত্তান্ত বল।

রামানুজ মাতার আজ্ঞায় কাঞ্চীপূর্ণের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি বলিলেন, যখন স্বয়ং বরদরাজ ও জগন্মাতা তোমার কাছে জল চাহিয়াছেন, তুমি নিত্য শালকূপ হইতে এককলস জল বরদরাজকে দিবে ইহাই তোমার কৈঙ্কর্য্য।

রামানুজ তদবধি নিত্য প্রাতে এক কলস জল শালকূপ হইতে আনিয়া বরদরাজের কৈঙ্কর্য্য করিতে লাগিলেন।

(৪)

শ্রীরঙ্গমে যামুনাচার্য্য নামে একজন প্রাচীন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবপ্রধান বাস করিতেন। তিনি শ্রীবৈষ্ণব নাথমুনির পৌত্র, পরম ভক্ত শ্রীবৈষ্ণবগণের তৎকালীন নেতা ছিলেন। মহাপূর্ণ গোষ্ঠীপূর্ণ শৈলপূর্ণ মালাধর কাঞ্চীপূর্ণ প্রভৃতি ইঁহারা তাঁহার শিষ্য, সকলেই গুরুভক্ত, ভগবৎপরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং দ্রাবিড় বেদে পারদর্শী ছিলেন।

তন্মধ্যে কাঞ্চীপূর্ণ কৈঙ্কর্য্যনিষ্ঠ ভক্ত, ভগবানের সেবা লইয়াই সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। ইঁহার প্রধান সেবা বরদরাজকে ব্যজন করা, তালপত্রের পাখা লইয়া সর্ব্বদা ঠাকুরকে বাতাস করিতেন। কথিত আছে বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণের সহিত কথা কহিতেন। তিনি জাতিতে শূদ্র হইলেও তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি দর্শনে কাঞ্চীবাসীগণ যথেষ্ট সম্মান করিতেন। রামানুজ এই মহাভাগবতকে গুরুর ন্যায়

ভাবিতেন। কাঞ্চীতে তাঁহার মনের মতন সঙ্গী একমাত্র কাঞ্চীপূর্ণ। এই ভাগবতকে—ইনি শূদ্র বলিয়া মনে করিতেন না।

রামানুজ জলদান কৈঙ্কর্য্য এবং শাস্ত্রপাঠ মাতৃসেবা লইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রয়াগ যাত্রা করিয়াছিলেন, ইহার জন্য তাঁহার প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ আইসে নাই। অধিকন্তু ভগবদ্দর্শন লাভের কারণ তিনি বলিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তিই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। রামানুজ যাদবপ্রকাশের আসাপথ চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

সশিষ্যে যাদবপ্রকাশ প্রয়াগে মাঘস্নান উপলক্ষে একমাস তথায় অবস্থান করিলেন। কোনদিন অরুণোদয়ে স্নানকালে গোবিন্দ গঙ্গাজলমধ্যে একটী শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া গুরুদেবকে দেখাইলেন। তিনি বলিলেন তোমার পরম সৌভাগ্য তজ্জন্য ভগবান শঙ্কর কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করিয়াছেন, তোমার মাঘস্নানের সিদ্ধিলাভ হইল। অনন্তর তথা হইতে অন্যান্য তীর্থে স্নানপূর্ব্বক সশিষ্যে কাঞ্চীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ গুরুদেবের সহিত কাঞ্চীতে আসিয়া তাঁহার আদেশক্রমে আপনার জন্মভূমি মঙ্গলগ্রামে যাইয়া শিবলিঙ্গটী প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিত্য ভস্মাদি ধারণ পূর্ব্বক কালহস্তীপুরে ভগবান উমাপতির অর্চ্চনা করিয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

যাদবপ্রকাশের আগমন সংবাদে রামানুজ তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য গমন করিলেন। যাদবপ্রকাশ তাঁহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিয়া সেভাব গোপন পূর্ব্বক বলিলেন—বৎস রামানুজ, তোমায় যে আবার দেখিতে পাইব তাহা মনে করি নাই। সেদিন তুমি আমাদের সঙ্গছাড়া হওয়ার পর তোমাকে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়াতে—তোমার জীবনেই সন্দেহ হইয়াছিল। যাহা হউক ভগবান শঙ্করের কৃপায় তোমায় লাভ করিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। তুমি দীর্ঘজীবি হও।

(ক্রমশঃ)

—০—

গান

[শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল]

এবার আমায় দেখা দে মা
খেলিস্ নে আর লুকোচুরী
মরণ হ'তে এ মোর মনের
জানি না আর কত দেরী!
মানুষ যেমন মানুষে হেরে
তেমনি দেখা দেখ্‌ব তোরে,
ঐ অভয় পাদ-পদ্ম যুগল
রাখ্ মা আমার চিত্ত জুড়ি'!
নৃমুণ্ডমাল গলায় বেঁধে
কোথায় বেড়াস্ খড়্গ হাতে,
আর কাঁদ্‌বো কত, নে মা কোলে
হলেও মা তুই ভয়ঙ্করী!

—০—

সংবাদ

এই সংখ্যায় দেবযানের নবম বর্ষ পূর্ণ হইল—আজ সে দশমবর্ষের দ্বারে উপনীত। যাঁহার করুণায় 'দেবযান' বিঘ্নবহুল-শৈশব অতিক্রম করিয়া সম্ভাবনাময় প্রাক্-যৌবনে পদার্পণ করিল—তাঁহার উদ্দেশে প্রণতি নিবেদন করি। স্মরণ করি তাঁহাদের—যাঁহাদের রচনায় ও সহযোগিতায় দেবযান সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে।

আগামী বর্ষের জন্য আমারা দেবযানের গ্রাহক-গ্রাহিকা লেখক-লেখিকা শুভার্থী—সকলের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি।

*   *   *   *

২রা চৈত্র পাউনান (হুগ্‌লি) গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী তলায় অষ্টপ্রহরব্যাপী

নামযজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে পূজা, নরনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

*　　　*　　　*　　　*

কাঁচরাপাড়ার অন্তর্গত মল্লিকের বাগ্ নিবাসী শ্রীকানাইলাল মণ্ডলের বাড়ীতে প্রতি বৃহস্পতিবারে গুরুপূজাদি সম্পন্ন হইতেছে।

*　　　*　　　*　　　*

ভাস্কুড় (পোঃ বালুহাটী, হাওড়া) গ্রামের 'বান্ধব সমিতি' প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীনামকীর্ত্তন পরিচালনা করেন।

*　　　*　　　*　　　*

ফুলনগর (বর্দ্ধমান) পল্লীতে শ্রীঅভয়াপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নামযজ্ঞ হয়। বর্ত্তমান বর্ষে এই অনুষ্ঠান পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিল।

*　　　*　　　*　　　*

৭ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১০ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত বোলপুর নায়েকপাড়ার হরিমন্দিরে ২৪ প্রহরব্যাপী অবিরত নামযজ্ঞ উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। বোলপুর জয়গুরু সম্প্রদায় ও অন্যান্য কীর্ত্তনদল এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

*　　　*　　　*　　　*

শিক্ষাব্রতী শ্রীসচ্চিদানন্দ সাঁই মহাশয়ের উদ্যোগে 'সামন্তী' গ্রামের বিভিন্ন ব্যক্তির বাসভবনে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত নামকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। বিজুর, উপলতি, হাটগোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানের জয়গুরু সম্প্রদায় এই কীর্ত্তনে যোগদান করেন।

*　　　*　　　*　　　*

প্রায় দুই বৎসর যাবৎ তোলাফটক জেলেপাড়া (চুঁচুড়া) জয়গুরু সম্প্রদায় প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত নামকীর্ত্তন করিতেছেন।

*　　　*　　　*　　　*

বেলমুড়ি (হুগলি) জয়গুরু সম্প্রদায় গ্রামে এবং অন্যান্যস্থানে শ্রীশ্রীনাম প্রচার করিতেছেন।

*　　　*　　　*　　　*

১৫ই ফাল্গুন হইতে ১৯শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত বিজুর গ্রামে 'বিজুর-হরিসভা' কর্ত্তৃক অবিরত নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। কিঙ্কর শ্রীআনন্দময়জী এবং অন্যান্য বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন।

* * * *

২২শে বৈশাখ পাটভাঙ্গা বীণাপাণি পল্লীমঙ্গল সমিতির উদ্যোগে এই পল্লীতে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ হয়। কিঙ্কর শ্রীকুমারনাথজী ও অন্যান্য ভক্তগণের উপস্থিতি সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

* * * *

জঙ্গলপাড়া (হুগ্‌লি) গ্রামে শ্রীশ্রীসীতারাম মন্দিরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

* * * *

৩রা ফাল্গুন শ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়ের কয়েকজন সেবক হাঁড় গ্রামের শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ করেন।

* * * *

২রা চৈত্র কেওটারা (বর্দ্ধমান) গ্রামের শ্রীকালীপদ কুমারের বাটীতে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ হয়।

* * * *

তোড়গ্রাম (হুগ্‌লি) জয়গুরু সম্প্রদায় হুগ্‌লি ও বর্দ্ধমান জেলার কয়েকখানি গ্রামে শ্রীশ্রীনাম প্রচার করেন।

* * * *

১৯শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ইলাম বাজারে (বোলপুর) গৌরাঙ্গমেলা ও সংকীর্ত্তনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রদত্ত অভিভাষণে ডক্টর শ্রীপ্রফুল্ল কুমার সরকার এম্‌-এ, পি, এইচ-ডি, ডিপ-এড্‌ (এডিনবরা ও ডাব্‌লিন) বলেন—"প্রভুর বাঞ্ছিত সেই কাজ শ্রীশ্রীমৎ সীতারামদাস ঠাকুরের মধ্য দিয়াই প্রবলভাবে চলিতেছে।"

* * * *

১৯শে বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে শ্রীবিষ্ণুপদ মজুমদারের (৯, কালিকুমার মুখার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া) বাসভবনে উদয়াস্ত শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম নামযজ্ঞ হয়। স্থানীয় ভক্তমণ্ডলী ও শালিখা জয়গুরু সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

—০—

বিজ্ঞপ্তি

দেবযানের গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন—প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ একটি দেবযানের গ্রাহক বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট হউন।

বিনীত

কর্ম্মাধ্যক্ষ

দেবযান—মগরা (হুগলি)